বিমল মিত্র অমনিবাস

একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Rupees One hundred fifty Only

বিমল মিত্র অমনিবাস

বিমল মিত্র
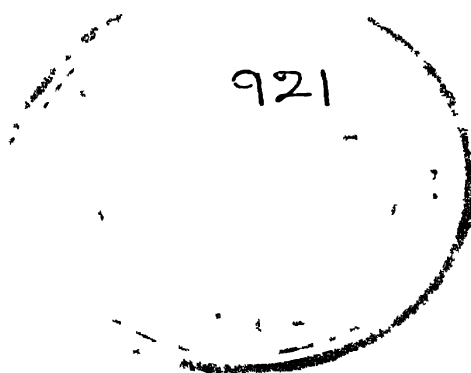
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলকাতা

BIMAL MITRA OMNIBAS
By Bimal Mitra
Published by
Ujjal Sahitya Mandir
C-3, College Street Market
Calcutta-7

পরিবেশক :
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ চিত্র :
রঞ্জন দত্ত

বর্ণসজ্জা ও মুদ্রণ :
প্রিণ্ট-এন্ পাবলিকেশন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
পল্লব মিত্র
কমলেশ বসু
শকুন্তলা বসু
সুনীল দাশ

মুদ্রাকর :
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা

বিমল মিত্রের অনুরাগী পাঠকদের প্রতি—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গকে সতর্কতার জন্য জানাচ্ছি, যে সম্প্রতি চার শতাধিক উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নাম-যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ও নামে কোনোও দ্বিতীয় লেখক নেই। পাঠক-পাঠিকা বর্গের উদ্দেশ্যে আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি সম্পূর্ণ জাল বই। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

সূচি

ভগবান কাঁদছে

ভগবান বলে কি কেউ আছে? যদি থাকে তো সে-ভগবান কি কাঁদে? আর ভগবান যদি সত্যিই কাঁদে তো সে-কান্না কি পৃথিবীর মানুষ শুনতে পায়? মানুষ যদি শুনতে পায়, তাহলে জহরলাল নেহরুই বা তা শুনতে পান না কেন? বল্লভ ভাই প্যাটেল শুনতে পান না কেন? কেন আবুল কালাম আজাদ শুনতে পান না? কেন বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ শুনতে পান না? ইন্দিরা গান্ধীই বা শুনতে পান না কেন?

অথচ একলা দেবব্রত সরকার কেন শুনতে পায়? দেবব্রত সরকারের কাহিনীটা শুনতে শুনতে বার-বার আমার মনে এই প্রশ্নটাই উদয় হচ্ছিল। সত্যিই তো দেবব্রত সরকার কী এমন লোক যে সে একলাই ভগবানের কান্না শুনতে পায়!

সব নদীই গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব মৃগই কস্তুরী মৃগ নয়, সব মানুষই দেবব্রত নয়।

দেবব্রত যদি অন্য মানুষের মতো হতো তাহলে তাকে নিয়ে গল্প লেখা সহজ হতো। অন্য মানুষের মতো দেবব্রতর দুটো পা, দুটো হাত ছিল। অন্য মানুষের মতো তারও একটা মাথা ছিল, একটা নাক ছিল, একটা কপাল ছিল। মানুষের যা-যা থাকলে লোকে একজনকে মানুষ বলে, তার সব-কিছুই ছিল।

তবু দেবব্রত সরকার ছিল এক অনন্য মানুষ।

অনন্য মানুষ বলে দেবব্রত সরকারকে নিয়ে গল্প লেখা বড় শক্ত। বিধাতা-পুরুষ তাকে সৃষ্টি করবার সময়ে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। বিধাতা-পুরুষের ভাঁড়ারে, যা-যা মাল-মশলা ছিল সমস্ত কিছুই দেবব্রত সরকারের মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যমনস্ক হওয়ার ফলেই হয়তো দেবব্রত যখন পৃথিবীতে এলো, তখন সে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠলো।

একদিন এই দেবব্রত সরকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছে। তখন তার বয়েস কম। রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে তার নজরে পড়লো সবাই তার দিকে চেয়ে দেখছে।

সে কিছু বুঝতে পারল না। তার দিকে এত চেয়ে দেখবার কী আছে? এই রাস্তা দিয়ে তো সে রোজই যায়। কিন্তু এমন করে তো কেউ এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখে না।

চিরকাল সে যে-শার্ট পবে তাই-ই তো সে পরেছে। যে-ধুতি সে বরাবর পরে সেই ধুতিই তো পরেছে। তাহলে?

সে ভাবল—যাক্ গে, মরুক গে! লোকে তাকে দেখলে তো বয়ে গেল। সে যদি কোনও অন্যায় করত তো তবু একটা কথা ছিল। কিন্তু সে তো জীবনে কোন অন্যায় করেনি। সিগ্রেট, বিড়ি, পান তো সে জীবনে কখনও খায়নি। মাথার চুলে কখনও তো চিরুনিও ছোঁয়ায়নি। তাহলে তার কিসের সঙ্কোচ?

কিন্তু না, তাকে দেখবার একটা অন্য কারণও ছিল।

সেটা ধরা পড়লো অনেক পরে। একটা বিশেষ কাজে তখন সে একজন বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিল। বন্ধুর কাছে একটা বই ছিল। সে বলেছিল, তার বাড়িতে গেলে সে তাকে তা পড়তে দেবে। বইটা অশ্বিনীকুমার দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ'।

তখন এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল হাঁটা। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনও উপায় কেউ জানতও না। উপায় জানবার দরকারও হতো না কারো। বন্ধু তার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তো। কথায়-কথায় একদিন বলেছিল যে, তার বাড়িতে তার বাবার একটা বই আছে। বইটার নাম, 'ভক্তিযোগ'।

দেবব্রত বলেছিল, আমাকে একবার বইটা দিতে পারিস তুই?

বঙ্কু বলেছিল, না ভাই, বাবা কাউকে বাড়ি থেকে বাইরে বই নিয়ে যেতে দেয় না। যদি কারো বই পড়তে ইচ্ছে করে তো আমাদের বাড়িতে বসে বই পড়তে পারে, তাতে বাবার কোনও আপত্তি নেই।

তা সেই বই পড়বার জন্যেই দেবব্রত বঙ্কুদের বাড়িতে যাচ্ছিল। গ্রীষ্মকাল। চারদিকে টা-টা করছে রোদ্দুর। রাস্তা গরম হয়ে গিয়েছে। স্কুলেরও তখন গরমের ছুটি। দেবব্রত যখন বঙ্কুদের বাড়ি পৌঁছোল তখন দুপুর দুটো। সদর দরজার কড়া নাড়তেই বঙ্কু ভেতর থেকে দরজা খুলেই দেখে দেবব্রত।

—তুই? কী ব্যাপার রে?

দেবব্রত বললে, তুই যে সেই বইটা পড়তে দিবি বলেছিলি?

তখন বঙ্কুর মনে পড়লো কথাটা। বললে, আয়, ভেতরে আয়। কতোদিন আগে আমি বলেছিলুম, সে কথা এখনও তোর মনে আছে? আশ্চর্য ছেলে তো তুই—

সত্যিই আশ্চর্য হওয়ার মতো মানুষই ছিল বটে দেবব্রত! বঙ্কু বাবার বই-এর ভেতর থেকে অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলে বইটা। তারপর সেটা দেবুকে দিলে। দেবব্রত সেটা নিয়ে পাশের একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে-বসে পাতা উল্‌টে-উল্‌টে দেখতে লাগলো। আর তারপর এক মনে ডুবে গেল বইটার ভেতরে।

বঙ্কু বললে, কী রে দেখতে পাচ্ছিস?

দেবব্রত কোনও উত্তর দিলে না। বঙ্কু আবার জিজ্ঞেস করলে, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিস? জানালাটা খুলে দেব?

তবু দেবুর তরফ থেকে কোনও উত্তর নেই।

বঙ্কু আবার বললে, কী রে, অতো কী পড়ছিস?

বলে দেবুর গায়ে ঠেলা মারতেই যেন প্রথম দেবুর হুঁশ হলো। বললে, কী?

বঙ্কু বললে, তুই এই অন্ধকারে পড়তে পারছিস? না, জানালাটা খুলে দেব?

দেবব্রত আবার বইটার মধ্যে চোখ রেখে বললে, দাঁড়া, দেখি কী লেখা আছে পাতাটাতে—

হঠাৎ বঙ্কু হৈ-হৈ করে হেসে উঠলো। হাসতে-হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়বার উপক্রম। তবু দেবব্রতর কোনও দিকে খেয়াল নেই। একেবারে বইটা নিয়ে ধ্যানস্থ।

—এ কী করেছিস রে? এই দেবু, এ কী করেছিস?

এতক্ষণে যেন দেবুর ধ্যান ভাঙলো। বই-এর পাতা থেকে মুখ তুললো। বললে, কী? কী করেছি?

—এ কী জুতো পরে এসেছিস রে তুই? এ কী?

বঙ্কু দেবব্রতর পায়ের দু'পাটি জুতোর দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললে, তোর জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে দেখ—

দেবু এতক্ষণে তার পরে আসা জুতো জোড়ার দিকে নজর দিয়ে দেখলে। সত্যিই বাঁ পায়ের জুতোটা কালো রঙের আর ডান পায়ের জুতোটার রং সাদা। বঙ্কু তখনও হো-হো করে হাসছে।

বললে, সত্যিই তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। তুই ডাক্তার দেখা। এ-রকম করে রাস্তা দিয়ে চললে কোনদিন যে তুই গাড়ি চাপা পড়বি রে। দু'পায়ে দু'রঙের জুতো পরবার সময়ে একবার তোর খেয়ালও হলো না যে কী পরছিস?

দেবু বললে, আমি তখন তোর বাড়িতে আসবার জন্যে এমন হাঁকপাঁক করছি যে জুতোর দিকে অতো খেয়াল হয়নি, যাক্ গে, ওতে কী এমন এসে যায়! জুতো দিয়ে তো কেউ মানুষের বিচার করে না।

বন্ধু বললে, না, তুই দেখছি সত্যিই একটা পাগল! তোকে রাঁচির পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া উচিত।

এ-কথায় কান না দিয়ে দেবব্রত যেমন বইটি পড়ছিল তেমনি আবার পড়ে যেতে লাগলো।

না, লিখতে-লিখতে আবার ভাবলাম এখান থেকে গল্পটা আরম্ভ করলে তো ঠিক জমবে না। দেবব্রত সরকার কোন রঙের জুতো কোন পায়ে পরলো, তাতে পাঠকদের তো কিছু লাভ-লোকসানের হের-ফের হবে না। তাহলে অন্য জায়গা থেকে গল্পটা আরম্ভ করি।

এ-গল্প অন্য আরো অনেক চরিত্রদের আরো অনেক ঘটনা নিয়ে আরম্ভ করা যায়। শুধু দেবব্রত সরকার কেন, মিনতি দেবীকে নিয়েও তো গল্প আরম্ভ করা যায়। সাহাবুদ্দীনকে নিয়েও গল্প আরম্ভ করা যায়।

দেবব্রত সরকার তো সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু কেন যে তার মধ্যে এই বই পড়ার নেশা জন্ম নিয়েছিল, তা বাইরের কেউই জানতো না।

সেই তাকে নিয়ে গল্প আরম্ভ করলে তাই কেউ কোনও আকর্ষণই বোধ করবে না। তাহলে কী করি? মিনতি দেবীকে নিয়ে গল্প আরম্ভ করবো? কিংবা সাহাবুদ্দীনকে নিয়ে?

সত্যিই গল্প আরম্ভ করাটাই আজকাল বড়ো মুশকিলের কাজ হয়েছে। কারণ আমি এমন এক যুগে লেখক হয়েছি, যে-যুগে কোনও পাঠকেরই সময় নেই। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজে-অকাজে ব্যস্ত। ভোরবেলা এমন একজন লোক চাই যে হরিণঘাটার দুধের 'বুথে' গিয়ে লাইন দেবে। আর আজকাল তো তেমন লোক পাওয়াই শক্ত। তারপরে বাজারে যেতে হবে দৈনন্দিন খাদ্য-সামগ্রী কেনা-কাটা করবার জন্যে। তার ওপর সপ্তাহে একদিন চাল-ডাল-তেল-চিনি কিনতে সরকারী রেশনের দোকানে যাওয়ার কাজ আছে। তারপরে আছে বাড়ির বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসার, আর যথা সময়ে তাদের নিয়ে আসার কাজ। যাদেব টাকা-পয়সা আছে, তারা বাড়িব ছেলে-মেয়েদের আবার পাড়ার স্কুলে পড়াতে চান না। কেন না তাতে লোকে মনে করতে পারে যে তুমি গরীব লোক। কেউ চান না যে তিনি প্রতিবেশীদের চোখে গরীব বলে চিহ্নিত হোন্। ব্যাঙ্কে তোমার টাকা থাক আর না থাক, বাইরে তোমাকে অর্থবানের ভান করতেই হবে। এটা ইজ্জতের প্রশ্ন। আর আজকাল টাকাই ইজ্জত!

কথাটা যে হঠাৎ আমার মনে হলো তারও একটা কারণ আছে। সেই কারণটাই বলি।

হঠাৎ সেবার খবরের কাগজের পাতায় 'রিপাবলিক-ডে'তে প্রতি বারের মতো উপাধি বিতরণের তালিকা ছাপা হলো। প্রথম-প্রথম সে তালিকা নিয়ে লোকে একটু আলোচনা করতো বটে, কিন্তু পরে আর তেমন তা আলোচিত হতো না। আর তখনই ওই উপাধিগুলো পাওয়ার জন্য লাখ-লাখ টাকাও খরচ করতে হতো না। বলতে গেলে ওটা তখন সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবেই গণ্য হতো।

সেই সময়ে 'পদ্মশ্রী' প্রাপকদেব তালিকায় হঠাৎ একজন মহিলার নাম উঠলো। মহিলাটির নাম ঝর্ণা দেবী।

রাস্তায় আমার বন্ধু সুপ্রভাতের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বললে, দেখেছ, ঝর্ণা দেবী 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেখেছি, কিন্তু কে এই ঝর্ণা দেবী?

বন্ধু বললে, সে কী, তুমি ঝর্ণা দেবীর নামও শোননি?

স্বীকার করতেই হলো, না শুনিনি—

জীবনে এত বড়-বড় বিখ্যাত লোকের নাম মনে রাখতে হয় যে, কোথায় কে কোন ব্যাপারে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেলো, তার নাম মনে রাখতে গেলে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হওয়াই স্বাভাবিক হবে।

সুপ্রভাত বললে, জানো ওই 'পদ্মশ্রী' পাওয়া উপলক্ষে ঝর্ণা দেবীকে আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি—

—কবে?

সুপ্রভাত বললে, আসছে রবিবার। তুমি যাবে ঝর্ণা দেবীর নাচ দেখতে?

বললাম, নাচের আমি কী-ই বা বুঝি। তবু যদি দেখার সুযোগ করে দাও তো যাবো।

—ঠিক আছে।

বলে সুপ্রভাত চলে গেল। আর ঠিক তার দু'দিন পরেই ডাকযোগে আমার নামে বাড়িতে একটা নিমন্ত্রণ-পত্র এসে হাজির হলো।

নাচের কিছু বুঝি না আমি। বলতে গেলে এক সাহিত্য ছাড়া আমি আর কিছুই তো বুঝি না। কোনও সাহিত্যের বই পড়লে সহজে বলে দিতে পারি বইটা ভালো না মন্দ। আর আজকাল তো সাহিত্য পড়া উঠেই গেছে। গল্প-উপন্যাসকেই তো আজকাল লোকে সাহিত্য বলে মনে করে। আর ছাপানো বইকেই তো লোকে বাইবেল-গীতা-কোরান বলে ধরে নেয়। এখন তো রাজনীতি, খেলাধূলো আর ফুটবল-ক্রিকেট নিয়েই লোকে উন্মত্ত হয়ে থাকে। আমি ও তিনটেই বুঝি না। এবং বোঝবার যোগ্য জিনিস বলেই মনে করি না।

আর নাচ?

ওটা যে একটা আর্ট তাও আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি বুঝতে চেষ্টাও করিনি কখনও। যা হোক, ওই ঝর্ণা দেবী 'পদ্মশ্রী' উপাধি না পেলে আর তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া না হলে, আমি ওর নাচ দেখতেও যেতাম না। আর ওই নাচ দেখতে না গেলে আমি এই গল্পও পেতাম না। আর ওই ঝর্ণা দেবীকে নিয়ে এই গল্পও লিখতে চেষ্টা করতাম না। আর কতকাল আগেকার সেই দেবব্রত সরকারকেও জানতে পারতাম না। জানতে পারতাম না আদর্শ পুরুষ কাকে বলে।

দেবব্রত সরকার 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি উপাধি জীবনে কখনও পাননি। পাওয়ার আকাঙক্ষাও কখনও করেননি। বলতে গেলে তাঁর অতুল ধন-সম্পত্তি বলতেও কিছু ছিল না। তাঁর নিজের বলতে যা ছিল তা হলো তাঁর চরিত্র। নিষ্কাম, নিরহঙ্কার, নির্লোভ এবং নির্ভীক চরিত্রের মানুষ বললেও তাঁর সম্বন্ধে যেন কম বলা হয়।

পৃথিবীতে সে এক অদ্ভুত যুগ তখন চলছে।

পাড়ায়-পাড়ায় ক্লাব বা সঙ্ঘ যেমন আজকাল দেশে গজিয়ে উঠেছে, তখনও তেমনি। তবে এখনকার পাড়ার ক্লাবগুলোতে যে-ধরনের কাজকর্ম চলে, তখন তা চলতো না। এখন লাউড্-স্পীকার বলতে যা বোঝায়, তখন তা আবিষ্কারও হয়নি। তাই ক্লাবের কাজ কর্মের রীতি-পদ্ধতির খবর বাইরের পাড়ার কোনও লোক জানতে পারতো না। তারা সবাই ছিল নীরব কর্মী। নিঃশব্দে কাজকর্ম করাটাই ছিল তখনকার ছেলেদের ব্রত।

এই দেশটাও তখন ইংরেজরা ভাগ করে দিয়ে যায়নি। তাই তখন আমাদের দেশ বলতে বোঝাতো সমস্ত ইণ্ডিয়াটা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' বলতে বোঝাতো পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত এলাকাটা।

সেই ছেলেবেলাতেই কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে দেবব্রতরা ঠিক করলে যে, দেশটাকে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন করতে হলে মানুষকে আদর্শ-চরিত্র হতে হবে। অর্থাৎ এককথায় মানুষকে মানুষ হতে হবে। মানুষকে মানুষ হতে গেলে কী করতে হবে?

তাকে সৎ হতে হবে, তাকে মিতাহারী, মিতাচারী হতে হবে, মদ ও স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করতে হবে। আর তাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

দেবব্রতদের ক্লাবের নাম ছিল 'চরিত্র-গঠন শিবির'। এই চরিত্র গঠন শিবিরের যিনি প্রধান তাঁর নাম ছিল সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব।

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বিড়ি, সিগারেট, মদ তো দূরের কথা পান পর্যন্ত খেতেন না। তাঁর নিজের সংসার বলতে ছিল শুধু এক মা। ছোটবেলাতেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকে ওই সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবকে একজন হিন্দু জমিদার নিজের টাকায় লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। তারপর সেখানকার কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে সেই জমিদারবাবুর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করা স্কুলেই মাস্টারির চাকরি পান। আর পাড়ার যতো হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের নিয়ে ওই গ্রামেই 'চরিত্র-গঠন শিবির'-এর পত্তন করেন।

সেই শিবিরেই নাম লিখিয়েছিলেন দেবব্রত।

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিলেন, তুমি যে এই শিবিরে ভর্তি হতে চাইছো, তাতে তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছ তো?

দেবব্রত বলেছিল, হ্যাঁ স্যার।

আহ্‌মেদ সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানকার শিবিরের অনেক নিয়ম-কানুন আছে, তুমি তা ঠিক মতো পালন করতে পারবে তো?

দেবব্রত বলেছিল, হ্যাঁ স্যার। আপনি যা করতে বলবেন সব করবো।

সত্যিই সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র নিয়ম-কানুনের বড় কড়াকড়ি ছিল। স্কুলের ছুটির পর বিকেল চারটে থেকে সমস্ত ছেলেদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে ড্রিল করাতেন স্যার। কখনও স্ট্যাণ্ড স্টীল্, কখনও মার্চ, কখনও কুইক মার্চ, কখনও হল্ট্ আবার কখনও রাইট-টার্ন বা লেফ্ট্-টার্ন...

শুধু তাই-ই নয়। তার সঙ্গে প্রতিদিন কী-কী কাজ করলাম তারও উল্লেখ করে ডায়েরী লিখতে হবে। রোজকার করণীয় কাজের হিসেব-নিকেশ।

ডায়েরীর মাথায় প্রত্যেক দিনের তারিখ। তার নিচেয় লেখা—(১) আজ ক'টা সত্য কথা বলেছি। (২) আজ ক'টা মিথ্যে কথা বলেছি। (৩) আজ স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থের বাইরে অন্য কী-কী বই পড়েছি। (৪) আজ সকালবেলা কখন ঘুম থেকে উঠেছি। (৫) রাত্রে কখন বিছানায় ঘুমোতে গিয়েছি। (৬) আজ বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কার সঙ্গে কি'রকম ব্যবহার করেছি। (৭) আজ স্কুলে মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের কি'রকম উত্তর দিয়েছি—

শিবিরের মেম্বার ছিল সব মিলিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন। এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন মেম্বারকে নিজের-নিজের ডায়েরী স্যারকে দিতে হতো। তিনি সেইদিনই সেগুলো দেখে নিচে নিজের সই দিয়ে প্রত্যেকের ডায়েরী ফেরত দিতেন।

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বলতেন, তোমাদের সকলেরই চরিত্রের উন্নতি হচ্ছে, এটা লক্ষ্য করে আমি খুশী হয়েছি। আমি এই চরিত্র গঠনের ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন বলো তো?

উত্তরে একজন ছেলে বলেছিল, চরিত্র গঠন না হলে কোনও মানুষ, মানুষ হিসেবে বড়ো হতে পারে না।

আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিল, ঠিক আছে, তুমি বলো তো?

আর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চরিত্র গঠন না হলে মানুষ জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

—ঠিক আছে, এবার তুমি বলো তো?

আর একজন বললে, চরিত্রই হলো মানুষের জীবনের মেরুদণ্ড, চরিত্র গঠন করতে পারলে সেই মেরুদণ্ড মজবুত হয়।

—ঠিক আছে, এবার তুমি বলো।

'এই রকম একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে উঠে তাদের বক্তব্য বলে বসে পড়লো।

—তুমি? তুমি?

এবার দেবব্রতের পালা। দেবব্রত উঠে দাঁড়ালো। ভয়ে, উদ্বেগে, উত্তেজনায় এতক্ষণ সে ঘামছিল, কাঁপছিল, মনে-মনে ছট্‌ফট করছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন তখুনি অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাবে।

কোনও রকমে তার মুখ দিয়ে বেরোল, কোনও কিছু পাওয়ার আশায় নয়, কোনও কিছু লাভের আশায় নয়, কোনও কিছু ফলের আশায় নয়, চরিত্রের জন্যেই চরিত্র গঠন করা উচিত।

কথাটা কোনও রকমে বলেই দেবব্রত বসে পড়েছিল। মনে আছে তখনও সে থরথর করে কাঁপছে। সেদিন সুলতান আহ্‌মেদ কী বললেন, কী মন্তব্য করলেন, কার উত্তরটা ঠিক বলে ঘোষণা করলেন, তা আর সে শুনতে পেল না, তা আর সে জানতে পারলে না।

আর তারপর সেই রকম উদ্বেলিত শরীর-মন নিয়েই সে তার বাড়ি চলে গিয়ে পরের দিনের স্কুলের পড়া পড়তে আরম্ভ করে দিলে।

মা জিজ্ঞেস করলে, কী রে, আজ খাবি নে?

দেবব্রতর তখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। বললে, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না।

বলে খানিকটা খেয়েই উঠে পড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য, যার এতো ঘুম পাচ্ছিলো, সে যখন বিছানায় গিয়ে শুলো, তখন আর তার ঘুম এলো না। সারা রাত জেগে-জেগে রাত কাবার করে দিলে। সমস্ত রাত তার মনে পড়তে লাগলো স্যারের কথা। সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের কথা। সেদিন বিকেলবেলা সবাই যখন ক্লাব থেকে বাড়ি চলে যাচ্ছিলো, তখন সেই দেবব্রতও বাড়ির দিকে রওনা দিতে শুরু করেছিল।

হঠাৎ স্যারের সঙ্গে দেখা। জায়গাটা নিরিবিলি। আকাশের পশ্চিম দিকটাতে অন্ধকার আস্তে-আস্তে আরো ঘন হয়ে আসছিল। স্যার বললেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দেবব্রত—

দেবব্রত অবাক। বললে, বলুন স্যার, কী কথা?

আহ্‌মেদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তুমি আমার প্রশ্নের যে-জবাবটা দিলে, সেটা কোথা থেকে জানতে পারলে? কেউ কি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার।

—কে?

দেবব্রত কী বলবে, তা বুঝতে পারছিল না। যাঁর কাছ থেকে কথাটা সে শুনেছিল, তিনি তাঁর নাম বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

আহ্‌মেদ সাহেব আবার বললেন, কই, কে তিনি? তাঁর নাম কী?

দেবব্রত বললে, তিনি তাঁর নাম বলতে বারণ করে দিয়েছেন স্যার। তাঁর নাম আমি আপনাকে বলতে পারবো না।

এর পর আহ্‌মেদ সাহেব আর তাঁর নাম জানতে পীড়াপীড়ি করেননি। দেবব্রত'র কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে তিনি যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলতে লাগলেন। দেবব্রত শুধু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই স্যারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। আর যতক্ষণ স্যারকে দেখা গেল ততক্ষণ সেই দিকে চেয়ে-চেয়ে যখন আর তাঁকে দেখা গেল না, তখন সে আপন মনে অন্যমনস্কভাবে নিজেদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

একদিন যে ছেলে এইরকম মনের জোর দেখিয়েছে, সেই ছেলেই আবার কলকাতায় এসে বন্ধুদের বাড়িতে অশ্বিনী দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ' বইটা আছে শুনে দুপুর রোদে এ পাড়া থেকে সে-পাড়া পর্যন্ত হেঁটে চলে গিয়েছিল। বইটা পড়বার জন্যে তার এত তাড়া ছিল যে, সে কোন্

পায়ে কোন্ রঙের জুতো পরেছে তারও খেয়াল ছিল না। এইজন্যেই বলেছি যে বিধাতা পুরুষ দেবব্রত সরকারকে সৃষ্টি করবার সময়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, নইলে দেবব্রত সরকারের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষকে তিনি কেমন করে সৃষ্টি করলেন?

যে দেবব্রত সরকারের কথা আমি লিখছি, তাকে কিন্তু আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এবং আগে কখনও তার নামও শুনিনি।

কথাটা তুললো সুপ্রভাত।

উপলক্ষটা হলো ঝর্ণা দেবীর 'পদ্মশ্রী' পাওয়া নিয়ে। এ-রকম প্রজাতন্ত্র দিবসে কতো শত-শত পুরুষ মহিলা 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' উপাধি পাচ্ছেন, সেই ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই। অন্য কাউকে নিয়ে সুপ্রভাত তো কখনও এতো আলোচনা করেনি!

সেদিন ঝর্ণা দেবীর সম্বর্ধনা সভায় নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আমি গিয়েছিলাম সেখানে।

সমস্ত সম্বর্ধনা সভায় যা-যা হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই-ই হলো। সেই মঙ্গলাচরণ, সেই বিশিষ্ট লোকদের মুখ থেকে একঘেয়ে আর নীরস গুরুগম্ভীর ভাষণ, আর ফুলের তোড়ার সমারোহ।

নাচ আমি বুঝি না। সবাই যে সব কিছু বোঝবার অধিকারী হবে, এমন কোনও আইনও নেই আর ধরা-বাঁধা নিয়মও নেই। নাচ না বুঝলেও নাচ দেখতে কোনও বাধা-নিষেধও নেই এবং হাততালি দিয়ে নাচ বোঝবার ভান করতেও কোনও আপত্তি নেই।

আর শুধু নাচই বা কেন, সব শিল্প কলা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। চিত্র-শিল্পই কি সকলে বোঝে? তবু তো চিত্র-শিল্পের কতো সমালোচক পত্র-পত্রিকায় সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা লেখে।

আর সাহিত্য?

সাহিত্য বুঝতে তো কোনও বিদ্যা বা বুদ্ধির দরকারই হয় না। যিনি সাহিত্য-কানা মানুষ তিনিও সাহিত্যের বই লেখেন, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কলেজে-কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা আর গৃহ-শিক্ষকতা করে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেন।

কিন্তু এই ঝর্ণা দেবীর সম্বর্ধনা সভায় একটা অদ্ভুত নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম, যা অন্য কোথাও কোনও সম্বর্ধনা সভায় দেখা যায় না।

সে হচ্ছে 'আল্‌তা-মাসি'।

কারো কি 'আল্‌তা-মাসি' নাম হয়?

সুপ্রভাত বললে, হ্যাঁ হয়। এই মহিলার নাম 'আল্‌তা-মাসি'—

জিজ্ঞেস করলাম, ও রকম অদ্ভুত নাম হলো কী করে?

সুপ্রভাত বললে, ওঁর কাজ হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সধবা মেয়ে-বউদের আল্‌তা পরানো। সারা জীবন দিয়ে উনি ওই-ই করে আসছেন—ওঁর আসল নাম যে কী, তা কেউই জানে না।

জিজ্ঞেস করলাম, তাতে ওঁর লাভ?

সুপ্রভাত বললে, ওঁর লাভ কিছু নেই, এমনি একটা শখ ওঁর।

তা সেই ঝর্ণা দেবীর সম্বর্ধনা সভায় 'আল্‌তা-মাসি'কে সেই-ই প্রথম দেখলাম। বেশ লাল পাড় শাড়ি পরনে। ভেতরে সেমিজ। ঝর্ণা দেবী যখন ফুলের মালা পরে স্টেজের ওপর বসে আছেন, তখন আল্‌তা-মাসি তাঁর হাতে একটা বেতের সাজি নিয়ে সামনে এসে বসলেন। তারপর সাজি থেকে একটা শিশি বার করলেন। শিশি থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে কিছুটা আল্‌তা ঢেলে নিয়ে ঝর্ণা দেবীর দু'পায়ের চারিদিকে লাগিয়ে পায়ের মাঝখানে একটা টিপ বসিয়ে দিলেন। তারপর মাথার সিঁথিতেও লম্বা করে সিঁদুর লাগিয়ে দিতেই ঝর্ণা দেবী তাঁর হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে দশ টাকার একটি নোট নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সত্যিই সে এক অভিনব দৃশ্য! সবাই তাই দেখে হাততালি দিতে লাগলো। আর তারপর মঞ্চের ওপর পর্দা নেমে এল।

এর পর ঝর্ণা দেবীর নৃত্য শুরু হবে। তারই জন্যে ভেতরে-ভেতরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। আর শুরু হলো ইণ্টারভ্যাল। আর সমস্ত হল্‌-ঘরের আলো আবার জ্বলে উঠলো।

সুপ্রভাত পাশে এসে বসলো। জিজ্ঞেস করলে, কেমন দেখলে?

বললাম, ভালোই তো দেখলাম। ঝর্ণা দেবীর বয়েস অনেক হয়ে গেছে, তবু শরীরে এখনও তো বয়েসের ছাপ পড়েনি—

সুপ্রভাত বললে, নাচও তো এক রকমের যোগ-ব্যায়াম। তাই বোধহয় যৌবন এখনও ধবে রাখতে পেরেছেন ঝর্ণা দেবী।

জিজ্ঞেস করলাম, ঝর্ণা দেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কী করে? আর আগে এত লোককেই তো 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া হয়েছে, বেছে-বেছে ঝর্ণা দেবীকেই বা তোমরা সম্বর্ধনা দিতে গেলে কেন?

সুপ্রভাত একটু হাসলো। যেন কীরকম রহস্যময় এক হাসি। সেই রকম হাসতে-হাসতেই বললে, এর একটা লম্বা ইতিহাস আছে ভাই।

বললাম, এর আবার ইতিহাস কী থাকতে পারে?

সুপ্রভাত বললে, সব জিনিসেরই যে একটা ইতিহাস থাকে, তা জানো না? আজকে যে ফুলটা ফুটলো, তার পেছনেও তো মাটি কোপানো সার দেওয়া, বীজ পোঁতা আর জল দেওয়ার একটা ইতিহাস লুকিয়ে থাকে—

বলে সুপ্রভাত সেই রকম রহস্যময় হাসি আবার হাসতে লাগলো।

বললাম, এই ঝর্ণা দেবীর জীবনের পেছনেও কি তাহলে একটা ইতিহাস আছে?

সুপ্রভাত বললে, বলছি তো আছে।

—কিন্তু সে ইতিহাসটা কী?

সুপ্রভাত বললে, সে সব পরে একদিন তোমাকে বলবো।

—আর ওই যা'কে 'আল্‌তা-মাসি' বলা হলো, ও-ই বা কে? সে ইতিহাসে ওরই বা কীসের ভূমিকা?

সুপ্রভাত বললে, ওই 'আল্‌তা-মাসি' হলো সেই ইতিহাসের 'বিবেক'। যাত্রাপালা-গানে দেখনি, মাঝে-মাঝে একজন লোক গেরুয়া-রঙের আল্‌খাল্লা আর গেরুয়া-রঙের পাগড়ি পরে গান গাইতে-গাইতে আসরে ঢোকে। সে গানের মধ্যে দিয়ে পালার চরিত্রদের ব্যাখ্যা করে, পালার চরিত্রদের সাবধান করে দেয়, কখনও বা ভবিষ্যদ্বাণী করে, আবার কখনও বা চরম দুঃসময়ে নাটককে চড়া-পর্দায় তুলে দিয়ে গিয়ে একসময়ে অন্তর্ধান করে।

আমি তবু বুঝতে পারলাম না তার কথাগুলো। যেমন রহস্যময় লাগছিল তার হাসি, তেমনি রহস্যময় লাগছিল তার কথাগুলোও।

বললাম, আমি তো তোমার কথাগুলো কিছু বুঝতে পারছি না—

সুপ্রভাত বললে, পুরো কাহিনীটা যখন শুনবে তখন বুঝতে পারবে আমি কেন 'আল্তা-মাসি'কে 'বিবেক' বলছি—

এরপর আবার সমস্ত অডিটোরিয়াম অন্ধকার হয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হলো ঝর্ণা দেবীর 'সর্প-নৃত্য'।

সত্যিই আমার মনে হয় দেবব্রত সরকারের জীবনটা সাপের মতোই জটিল। আর শুধু জটিল নয়, সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ালও। সেই জন্যেই তো গোড়াতেই বলেছি সব নদীই গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব মৃগই কস্তুরী মৃগ নয়, আর সব মানুষই দেবব্রত সরকার নয়।

সে-সময়ে আমিও জন্মাইনি, আর আমার বন্ধু সুপ্রভাতও জন্মায়নি। আর সেই দেশও এখন আর সেই দেশ নেই। আগে এই দেশটা এক আর অবিভক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এই দেশটা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে একে তিন-চার টুকরো করে, এর সর্বনাশ করে চলে গিয়েছিল। তার পঁচিশ বছর পরে আবার সেই চারটে টুকরো পাঁচ টুকরোয় পরিণত হয়েছিল।

আগে ঢাকা থেকে বা চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে চেপে বসলে একেবারে এক টিকিটে কলকাতায় এসে পৌঁছনো যেত। কিন্তু তার পরে তা আর সম্ভব হলো না।

কিন্তু যখন দেশ ভাগ হয়নি তখনই সেই তাদের 'চরিত্র-গঠন শিবিরে' সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের কাছে যা দেবব্রত শিখেছিল তাইতেই তার চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জীবনে যা সে শিখেছিল তাই ভাঙিয়েই সে সারা জীবন কাটাতে পারতো। কিন্তু মুশকিল করে দিলে বিনয়দা। বিনয়দা মানে বিনয় বোস।

একদিন সকালে সবে মাত্র সে ঘুম থেকে উঠেছে, তখন কানাই এসে তাকে ডাকলো। দেবব্রত জানালা দিয়ে তাকে দেখেই বললে, এ কী রে কানাই, তুই? তুই এত সকালে?

কানাই বললে, তুই একটু বাইরে আয়। বিনয়দা এসেছে, তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়—

বিনয়দার আসা মানে ঢাকা থেকে আসা। বিনয়দাই ঢাকায় 'বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্স' নামে একটা পার্টি তৈরী করেছিলো। পার্টির বাইরের কোনও লোকই সে-কথা বিশেষ জানতো না।

তার অনেক আগে কানাই দেবব্রতকে বলেছিল বিনয়দার কথা। তার মুখে বিনয়দার অনেক কথা শুনে-শুনে দেবব্রত বলেছিল, তোর বিনয়দাকে একবার দেখাতে পারিস আমাকে?

কানাই বলেছিল, বিনয়দা তো নিজের পার্টির মেম্বার ছাড়া আর কা'রো সঙ্গে দেখা-টেখা করে না।

—কেন?

কানাই বলেছিল, কে কবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা তো বলা যায় না।

দেবব্রত বলেছিল, কিন্তু নিজের পার্টির লোকরাও তো বিট্রে করতে পারে।

কানাই বলেছিল, না, তা করবে না।

—কেন? কেন করবে না?

—করলে তখন আর সে বেঁচে থাকবে না। বিনয়দা 'বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্সে'র মেম্বার করবার আগে তাকে শ্মশানে মা-কালীর সামনে নিয়ে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে সেই রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়।

—সে প্রতিজ্ঞা যদি ভাঙে, তাহলে?

—প্রতিজ্ঞা ভাঙলে তার আর রক্ষে নেই। তাকে একদিন খুন হতেই হবে অন্য মেম্বারদের হাতে!

সেই কথা শোনার পর থেকেই দেবব্রত কেমন যেন একটা দুর্দম আকর্ষণ বোধ করতো বিনয়দাকে দেখবার জন্যে! দেখতে ইচ্ছে হতো কেমন সে মানুষটা, কী রকম তার চেহারা, কী রকম তার কথাবার্তা!

কানাই-এর কাছে বিনয়দা সম্বন্ধে অনেক কথাই হতো, কিন্তু সেই বিনয়দাকে দেখার সৌভাগ্য তার তখনও হয়নি।

দেবব্রত বলতো, তুই 'বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্স'-এর মেম্বার?

কানাই বলতো, না রে, আমি মেম্বার হইনি—আমাকে বিনয়দা ওদের ক্লাবের মেম্বার করেনি।

—কেন? তোর দোষটা কী?

কানাই বলতো, আমার এতগুলো ভাইবোন, তাই আমাকে মেম্বার করেনি বিনয়দা। বলেছে, তোকে মেম্বার হতে হবে না। দেশের কাজের চেয়ে তোর নিজের বাড়ির কাজের দিকে আগে বেশি নজর দিতে হবে।

দেবব্রত বলতো, কিন্তু আমার তো বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নেই।

—হ্যাঁ, তাই তুই-ই একলা মেম্বার হতে পারিস। তোর মেম্বার হতে কোনও আপত্তি নেই।

এই রকম সব কথা হতো অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু দেবব্রত কোনও দিন সুযোগ পায়নি সেই বিনয়দাকে দেখার। শুধু তার নামই শুনেছে বরাবর।

তাই সেদিন যখন দেবব্রত শুনলো যে বিনয়দা এসেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল। দেখলে কানাই একলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেবব্রত বললে, কই রে, তোর বিনয়দা কই?

কানাই বললে, অতো চেঁচাসনি, কেউ শুনতে পাবে।

দেবব্রত গলা নামিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে, বিনয়দা কোথায়?

কানাই দেবব্রতকে একটা অন্ধকার ঝোপের কাছে নিয়ে গেল। বললে, এখানে কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না। বিনয়দা এসেছে, তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

—কবে? কোথায়?

কানাই বললে, রাত্রির বেলা নদীর ধারে শ্মশানের কাছে।

—শ্মশানের কাছে? কেন? সেখানেও তো লোক থাকে।

কানাই বললে, না, এখানে আর ক'টা লোক রোজ-রোজ মরছে! শ্মশানের আশেপাশে অনেক ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে।

তা তাই-ই হলো। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা 'চরিত্র-গঠন শিবির'-এ গিয়ে ড্রিল করার পর দেবব্রত তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল। তারপর যখন রাত হলো বাবা-মা'র সঙ্গে সেও ঘুমোতে গেল। মা-বাবা দু'জনেই শুতে চলে গেলেন। কিন্তু দেবু বিছানায় ঘুমোতে গিয়েও ঘুমোতে পারলে না। আগে থেকে কথা বলা ছিল কানাই-এর সঙ্গে। সে এসে খুব আলতো করে তার জানালায় একটা টোকা মারবে। সেই শব্দটা শোনবার জন্যেই সেদিন সে কান পেতে রইলো।

যশোরের সরকার বাড়ির এক কালে খুব বোল্‌বোলা ছিল। আর সেই সঙ্গে খুব ইজ্জতও ছিল তাদের বংশের। দু'তিন পুরুষ আগে তাদের অনেক জমিজমা আর বড়-বড় দালান কোঠা ছিল। কিন্তু সেই বংশে বাতি দেওয়ার জন্যে কেবল মুকুন্দ সরকার ছিল আর ছিল তার গৃহিণী। গৃহিণীও ছিল তার বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। যখন দেবব্রতর জন্ম হলো তখন ভারি আনন্দ হয়েছিল মুকুন্দবাবুর। মুকুন্দবাবুর শ্বশুর-শাশুড়ী দেবব্রত'র জন্ম হওয়া দেখে যেতে পারেননি। সেজন্যে যতদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন ততদিন মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতেন। অনেক মন্দিরে গিয়ে তাঁরা পুজো দিতেন, অনেক দেব-দেবীর কাছে মানতও করতেন। আর শুধু যে যশোরের মন্দিরগুলোতেই পুজো দিতেন, তাই-ই নয়। যশোরের বাইরে যেখানেই যে কোনও দেব-দেবীর বিগ্রহ আছে, মন্দির আছে, সেখানেই গিয়ে পুজো দিতেন। বাড়িতে যতো সাধু-সন্ত আসতো, তাদের সকলকেই খাইয়ে-দাইয়ে সেবা করে আশীর্বাদ চাইতেন।

আশীর্বাদ চাইলেই হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু ক'জন সেই আশীর্বাদের ফল জীবদ্দশায় ভোগ করার সৌভাগ্য অর্জন করে?

তাঁদের ভোগের সামগ্রীর অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু পুত্রসন্তানের। কিন্তু সে আশা তাঁদের জীবনে মিটলো না। পুত্র তাঁদের হয়নি, হয়েছিল কন্যা-সন্তান। সেই কন্যা-সন্তানের নাম তিনি রেখেছিলেন—সুমতি।

যেদিন সুমতির জন্ম হলো সেদিন সুমতির মা কেঁদে ফেলেছিলেন।

কেন যে তিনি কেঁদেছিলেন তা বাইরের কেউ বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু বুঝেছিলেন সুমতির বাবা।

তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ছেলে আর মেয়ে কি আলাদা জিনিস গো? দু'জনেই তো সন্তান।

স্ত্রী বলেছিলেন, কিন্তু মেয়ে তো বিয়ের পর পরের বাড়ি চলে যাবে—তখন? তখন তো আমাদের বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাবে। তখন কার জন্যে সংসার করবো? আর তা ছাড়া বয়েস হলে কে আমাদের দেখাশোনাই বা করবে?

কিন্তু তারপর অনেক বছর কেটে গেল, কেটে গেল অনেক কাল। অনেক ধুলো জমলো চলমান সময়ের ওপর। সেই সুমতির একদিন বিয়েও হয়ে গেল। সে বিয়েতে অনেক ঘটাও হলো। যারা সে বিয়ে দেখেছে, তারা এখনও বলতে পারে সে-সব জাঁক-জমকের কথা।

আর শেষ পর্যন্ত নাতির মুখ দেখবার সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। তাঁদের দু'জনের মৃত্যু হবার পরই জন্ম হয়েছিল দেবব্রত সরকারের। বাবা-মা'র মুখেই শুধু শুনেছে দিদিমা আর দাদামশাই-এর গল্প। তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী শুধু হয়েছে সে।

দেবব্রত সরকারের জন্ম হওয়া মানে যশোরের সরকার বংশের ইজ্জৎ ডবল হওয়া। সকলেই সেই সময়ে বুঝে গেল যে এ ছেলে অনেক ভাগ্যবান। সে যে শুধু পৈতৃক ধন-সম্পত্তিরই মালিক হবে তাই-ই নয়, মাতুল বংশের অগাধ ধন-সম্পত্তিরও মালিক হবে একদিন।

সুতরাং পাড়ার স্কুলে খেলার মাঠেও তাকে ঈর্ষা করবার লোকেরও অভাব হলো না। তারা সবাই শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগলো, ভগবান যাকে দেয় তখন তাকে এমনি করেই দেয় গো—

শুধু যে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক বলেই ঈর্ষা, তাই-ই নয়, লেখাপড়াতেও এমন ছেলে যশোরের ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। অন্য সব ছেলেদের বাপ-মায়েরা বলতে আরম্ভ করলে, ছেলে বটে মুকুন্দবাবুর, ছেলের মতো ছেলে।

দেবব্রত সরকারের আগে আরো অনেক ছেলে স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে।

কিন্তু তা বলে দেবু? দেবব্রত সরকার? তার মতো এত ভালো নম্বর পেয়ে আর কেউ তার আগে ফার্স্ট হয়েছে? কোনও শিক্ষক আগে অন্য কোনও ছাত্রকে পড়িয়ে এত আনন্দ পেয়েছে?

ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন মুকুন্দবাবু।

রাস্তায় সুলতান আহ্‌মেদ তাঁকে দেখতে পেয়েই সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, সরকারবাবু, আপনার ছেলে দেবু আমাদের যশোরের মুখ উজ্জ্বল করবে, দেখে নেবেন?

মুকুন্দবাবু বলতেন, ও তো সমস্ত দিনই কেবল বই মুখে দিয়ে থাকে, এটা কি ভালো?

আহ্‌মেদ সাহেব বললেন, তাতে ক্ষতি কী? এ যুগে তো অমন ছেলে দেখা যায় না। আপনি ওতে আপত্তি করবেন না। আমি বলছি ও একদিন অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠবে।

—কিন্তু অতো পড়াশোনা করলে যদি চোখ খারাপ হয়ে যায়?

আহ্‌মেদ সাহেব বলতেন, সে আমি বলে দেব'খন! আর আমি তো ওকে আমার 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র মেম্বার করে নিয়েছি। আর রোজ ডায়েরী লেখার প্র্যাকটিস্ করাচ্ছি ওকে দিয়ে। আমার শিবিরের সব ছেলেদের চেয়ে ও ভালো ফল করছে।

বরাবর এমনি চরিত্রের মানুষই হলো দেবু। এই দেবব্রত সরকার। তাই তো প্রথমেই বলেছি যে সব নদীই যেমন গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই যেমন হিমালয় নয়, সব মৃগই যেমন কস্তুরী মৃগ নয়, তেমনি সব মানুষই দেবব্রত সরকার নয়। দেবব্রত সরকারকে না বুঝলে সুপ্রভাতের এই গল্পও বোঝা যাবে না।

সেই ভোরবেলা কানাই-এর কাছে যখন দেবব্রত শুনলো যে তার বিনয়দা ঢাকা থেকে যশোরে এসেছে, তখন প্রথমে কী বলবে বুঝতে পারলে না। তারপরে জিজ্ঞেস করলে, আজ রাত্তিরে?

কানাই বললে, হ্যাঁ, আজই রাত্তিরে—

—রাত্তিরে ক'টার সময়?

কানাই বললে, এই ধর, রাত একটার সময়।

—রাত একটা? তখন যদি বাবা-মা জানতে পারে?

কানাই বললে, কী করে জানতে পারবে? তুই বাড়ির পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে আসবি, আর তারপরে রাত দুটোর পর আবার ফিরে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বি। মাত্র তো এক ঘণ্টার ব্যাপার। এর মধ্যে অতো ভয় পাওয়ার কী আছে?

কথাটা শুনে দেবব্রত খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলো। বুঝতে পারলে না কী সে বলবে।

কানাই বললে, আমি বিনয়দাকে তোর কথা সব খুলে বলেছি। বলেছি যে তুই বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, তোর কোনও ভাই-বোন নেই। তারপর তোর চরিত্র সম্বন্ধেও বলেছি। তোর লেখাপড়ায় ফার্স্ট হওয়ার কথা বলেছি, আর তারপর সুলতান সাহেবের 'চরিত্রগঠন শিবিরে'র সবচেয়ে ভালো ছেলে হওয়ার কথাও বলে দিয়েছি।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করলে, শুনে তোর বিনয়দা কী বললে?

—বিনয়দা বললে, এই রকম ছেলেদেরই আমি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর জন্যে চাই। এদের দিয়েই আমাদের কাজ হবে।

দেবব্রত আবার জিজ্ঞেস করলে, কী কাজ রে?

—সে সব বিনয়দাই তোকে খুলে বলবে। আমাকে কিছুই বলেনি, আমি যাই, কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে।

তারপর চলে যাবার আগে আবার বললে, তাহ'লে ওই কথাই রইলো, ঠিক রাত একটার সময়ে তোর এই জানালায় আস্তে-আস্তে টোকা দেব, মনে রাখিস।

কানাই চলে যাওয়ার পর দেবব্রত অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, কেন তাকে কানাই-এর বিনয়দা ডেকেছে? তার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে?

দেবব্রতর মনে আছে, সেদিন তার বাবা তাকে দেখে বলেছিলেন, কী হলো, তোমার শরীরটা এত খাবাপ দেখাচ্ছে কেন? রাত্তিরে ঘুম হয়নি নাকি?

দেবব্রত বললে, না।

—তাহলে? তাহলে আবার রাত জেগে বই পড়েছ নাকি?

—না।

বলে দেবব্রত বাবাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তার নিজের ঘরের ভেতরে চলে গেল।

মুকুন্দবাবুর মনের উদ্বেগ একটু বাড়লো। একমাত্র ছেলে তাঁর। তার ভালো-মন্দের ওপর তাঁর নিজের বংশ আর দেবুর দাদামশাইয়ের বংশের সুনাম নির্ভর করছে! দেবু যদি বিগড়ে যায় তো সমাজের লোক সবাই যে ছি-ছি করবে।

মুকুন্দবাবু স্ত্রীকে বলতেন, ওগো, দেবুটার দিকে একবার দেখ তুমি, অতো রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? ও কি সারারাত জেগে পড়ে নাকি?

সুমতি দেবীরও ভাবনা ছিল ছেলেকে নিয়ে। তাঁর নিজের কোনও ভাই ছিল না বলে তাঁর বাবা-মার দু'জনের মনে খুবই কষ্ট ছিল। যখন দেবু জন্মালো, তখন তাঁরা তা দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এত সাধের ছেলে বাবা-মা দেখতে পাননি বলে মনে দুঃখও ছিল খুব।

মুকুন্দবাবুর নিজের পৈতৃক জমি-জমা দেখবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার শ্বশুরমশাইয়ের জমি-জমা দেখবার ভারও পড়লো তাঁর ঘাড়ে। তাঁর অবর্তমানে আবার একদিন এইসব সম্পত্তি দেখাশোনা করবে দেবু। এই অবস্থায় দেবু যাতে মানুষ হয়, সেই চেষ্টাই করতেন মুকুন্দবাবু। তাই সব সময়ে তাকে চোখে-চোখে রাখতেন তিনি। কী খাচ্ছে, কেমন লেখাপড়া করছে, রাত জেগে-জেগে শরীর খারাপ করছে কিনা, সেই সব চিন্তাতেই তিনি ডুবে থাকতেন। পুকুরের টাটকা মাছ, ঘরের গরুর দুধ-ঘি-দই খাইয়ে-খাইয়ে তার স্বাস্থ্য ভালো করার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু কারো স্বাস্থ্য কি কেউ ভালো করতে পারে, যদি সে নিজে চেষ্টা না করে?

একদিন আহ্‌মেদ সাহেবের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন, দেবুকে কেমন দেখছেন আহ্‌মেদ সাহেব? আপনার কথা-টথা শোনে?

সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিলেন, ওরকম ছেলে হয় না সরকারমশাই, অমন ছেলে যশোরে একজনও নেই—জীবনে ও খুব উন্নতি করবে একদিন। আমি খুবই কেয়ার নিচ্ছি।

মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, স্বাস্থ্যটা দিন-দিন ওর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমার খুব ভয় হয়। দিন-দিন ও রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন?

আহ্‌মেদ সাহেব বলেছিলেন, সামনে পরীক্ষা আসছে বলে হয়তো রাত জেগে-জেগে পড়ছে খুব, মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, তা পড়ুক, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিচ্ছে কেন? আমার তো কোনও অভাব নেই। আমার সঙ্গে ও বলতে গেলে কথা বলাই কমিয়ে দিয়েছে। ও অতো কী ভাবে দিন রাত বলুন তো?

একদিকে বাবার উৎকণ্ঠা, আর অন্য দিকে দেবব্রতর আরো অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়া, এই টানা-পোড়েনের মধ্যেই দিন-দিন বাপ আর ছেলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর সেই ব্যবধান আরো বেড়ে গেল, যেদিন রাত একটার সময় 'বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্স'-এর বিনয়দার সঙ্গে দেখা হলো।

সেদিন বিছানায় শুতে যাওয়ার পর আর ঘুমই এলো না। কেবল মনে পড়তে লাগলো কানাই-এর কথা। যদি কানাই তার সাড়া না পেয়ে ফিরে যায়? যদি সে ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে?

না, ঠিক রাত একটার সময় তার বিছানার পাশে জানালায় মৃদু টোকা পড়লো।

দেবু তৈরিই ছিল। জানালার পাল্লা দুটো সামান্য খুলে ইঙ্গিতে বললে, আসছি—

শীতের কনকনে রাত। সে কলকাতার শীত নয়, যশোরের শীত। যশোরে যেমন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম, তেমনি শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একটা সোয়েটারের ওপর আলোয়ান চাপা দিলেও সে শীত কাটে না।

আগে থেকে সমস্তই প্ল্যান করা ছিল। ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে টিপি-টিপি পায়ে বাইরের বারান্দায় এলো সে। তারপর সেখানেও একটা দরজা পেরোতে হয়। সেই দরজাটায় কোনও রকম শব্দ হলেই পাশের ঘরের বাবা-মা টের পাবে। তাতে আবার তালা-চাবি লাগানো থাকে। চাবিটা থাকে আবার পাশের দেওয়ালের একটা 'তাকে'।

সমস্ত কাজটাই করতে হবে নিঃশব্দে। একটু শব্দ হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। তখন মা জেগে উঠেই ধরে ফেলবে ছেলের কাণ্ড।

বারান্দার তালাটাও খোলা হয়ে গেল নিঃশব্দে। কারো কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তারপর দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে বেরোতে হবে উঠোনে। উঠোনের চারদিকে উঁচু দেওয়াল। সেই দেওয়াল যাতে নিঃশব্দে ডিঙোন যায়, তারও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল আগের দিন। একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি এনে রাখা হয়েছিল পাঁচিলের তলায়। তার ওপরে দাঁড়ালে পাঁচিলটা টপকাতে আর কোনও কষ্ট হয় না।

সেই প্ল্যান অনুযায়ী পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যেতে পারলে আর কোনও ভয় থাকে না।

বাইরে তখন কানাই মল্লিক উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা নিয়ে দেবুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। চারদিকে আম-বাগান। তখন আমের সময় নয়। আমের সময়ে আম-বাগানে সারা রাতই লোক-জন চলাচল করে। তারা গাছতলায় পড়ে থাকা আম কুড়োতে আসে।

—কী রে? কই, তোর বিনয়দা?

—চুপ কর। কেউ শুনতে পাবে। আমার পেছনে-পেছনে আয়।

কানাই-এর পেছনে-পেছনে চলতে-চলতে একটা বটগাছের কাছে আসতেই দেখতে পাওয়া গেল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কানাই তার কাছে গিয়ে নিচু গলায় বললে, এই যে বিনয়দা, এনেছি দেবুকে।

বিনয়দাকে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

তবু বিনয়দা জিজ্ঞেস করলে, কানাই বলছিল তুমি নাকি আমাদের বেঙ্গল ভলান্‌টিয়ার্স দলে যোগ দিতে চাও?

দেবু বললে, হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন?

দেবু বললে, আমি, আমার বাবা আর মা।

—এই তিন জন ছাড়া আর কেউ নেই?

—না।

—কিন্তু তুমি জানো তো আমাদের দলের কী কাজ?

—কানাই আমাকে সব বলেছে।

বিনয়দা আবার জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি জানো যে আমাদের দলের কী উদ্দেশ্য?

—হ্যাঁ, ইংরেজদের মেরে তাড়ানো।

বিনয়দা বললে, না, শুধু ইংরেজদের মেরে তাড়ানো নয়। তাদের মেরে তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করাও একটা কাজ আমাদের পার্টির। এ কাজ করতে গেলে প্রথমে নিজের চরিত্রটাকে গড়তে হবে। চরিত্র গড়ার জন্যে সব চেয়ে বড় দরকার সংযম। সংযম না করতে পারলে চরিত্র গঠন হবে না—আসলে চরিত্র অর্জন করবার জন্যেই চরিত্র গঠন করতে হবে।

দেবু চুপ করে রইল। কী বলবে তা বুঝতে পারলে না।

বিনয়দা আবার বলতে লাগলো, তোমার সম্বন্ধে অনেক লোকের কাছে অনেক কথা শুনেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবাব জন্যে এই কানাইকে বলেছিলাম। আমার কথাতেই সে তোমাকে এখন এখানে ডেকে এনেছে।

দেবু বললে, আপনি যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি। আমাকে কী করতে হবে তাই আমাকে বলে দিন।

বিনয়দা বললে, আজকে তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি যে কথাগুলো বললুম, সেই কথাগুলোই তুমি বাড়িতে গিয়ে ভাবো। ভেবে ঠিক করো যে কোনটা তোমার চরিত্রের স্ট্রং পয়েন্ট আর কোনটা তোমার চরিত্রের উইক্ পয়েন্ট। একবার আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলে কিন্তু আর পেছতে পারবে না। তখন কিন্তু তোমার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে—বুঝলে?

দেবু মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ বুঝেছি।

বিনয়দা আবার জিজ্ঞেস করলে, আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি! তুমি পারবে কি না জানি না, তবু কি তুমি চেষ্টা করবে?

—বলুন স্যার, আমি পারতে চেষ্টা করবো।

বিনয়দা বললে, দেখ আগুনের শিখাকে যেমন ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তেমনি যা সত্যি তাকেও চিরকাল কখনও মিথ্যে বলে চালানো যায় না। যায় কি?

দেবু বললে, না।

—কথাটা তুমি কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো?

দেবু বললে, হ্যাঁ আগেও বিশ্বাস করেছি, এখনও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও বরাবর বিশ্বাস করবো।

কথাটা শুনে বিনয়দার মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ বেরলো, বাঃ—

সত্যিই এ-রকম ছেলে বোধহয় বিনয়দা জীবনে বেশি দেখেনি।

বললে, দেখ দেবু, দল বেঁধে দেশ স্বাধীন করা যায়, দল বেঁধে রাজনীতি করা যায়, দল বেঁধে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা যায়, দল বেঁধে থিয়েটার-নাটকও করা যায়—কিন্তু দল বেঁধে মানুষ হওয়া যায় না, চরিত্রবানও হওয়া যায় না। ওটা একলা করার কাজ। ওটা একলা একলা করতে হয়। ওটা যাঁরা কবতে পেবেছেন তাঁরা হতে পেরেছেন সক্রেটিস, তাঁরা হতে পেরেছেন যীশুখ্রীষ্ট, তাঁরা হতে পেরেছেন চৈতন্যদেব, তাঁরা হতে পেরেছেন বুদ্ধ—

দেবু চুপ করে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল।

বিনয়দা তখনও বলে চলেছেন, তাঁরা সবাই-ই একদিন সমাজ-সংসার বাপ-মা সবাইকে ছেড়ে একলা হয়ে গেছেন। প্রথমে তাঁরা কিন্তু সবাই-ই ছিলেন সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে, সংসারের একজন হয়ে, কিন্তু সত্যের জন্যে তাঁরা সবাই-ই পৃথক হয়ে গেছেন, একক হয়ে গেছেন। তাঁদের চলে যাওয়ার পর, তাঁদের অমর হওয়ার পর তাঁদের নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁরা সবাই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থেকে প্রতিষ্ঠান-ভুক্ত হয়েও তাঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠান-বিচ্ছিন্ন—

দেবুর মুখে তখনও কথা নেই। সে বিনয়দার কথাগুলো এক মনে শুনে যাচ্ছিল।

বিনয়দা আবার বললে, তবে কেন আমি আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি? এসেছি এই জন্যে যে এই কানাই আমাকে অনেকবার তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে। কানাই আমাকে বলেছে যে তুমি নাকি ঘরে থেকেও ঘর-ছাড়া, দলে থেকেও দল-ছাডা।

দেবু বললে, কিন্তু সে জন্যে বাবা-মা'র কাছ থেকে আমাকে খুব বকুনি খেতে হয়। জানি না আমি ঠিক করি, না ভুল করি।

বিনয়দা বললে তুমি ঠিক করো কি ভুল করো তা ভাববার দরকার তোমার নেই। তুমি মনেপ্রাণে যেটাকে সত্য বলে জানো সেইটেই করে যাবে, তাতে কে কী বললো না-বললো তা তোমার বিচাব করবার দরকার নেই।

দেবু বললে, আমার বিচার তো ভুলও হতে পারে?

বিনয়দা বললে, নিশ্চয় হতে পারে। সেটার জন্যে পৃথিবীর ভালো ভালো বই পড়বে। সেগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে, তুমি ভুল করছো না ঠিক করছো।

তারপর একটু থেমে বিনয়দা আবার বললে, তুমি স্বামী বিবেকানন্দর নাম শুনেছ?

—হ্যাঁ।

—তাঁর লেখা কোনো বই পড়েছ?

দেবু বললে, তাঁর জীবনী পড়েছি।

বিনয়দা বললে, তাঁর লেখা অনেক চিঠি আছে, সেগুলোও পড়ো। স্বামী বিবেকানন্দ একবার একটা চিঠিতে লিখেছেন কবি ভর্তৃহরির কথা। এই ভর্তৃহবি আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন। পরে তিনি সংসার ছেড়ে শেষ জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটা কবিতায় লিখে গেছেন—কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ তোমাকে বলবে ভণ্ড, কেউ তোমাকে বলবে পণ্ডিত, কেউ আবার তোমাকে বলবে মূর্খ, কেউ তোমাকে বলবে জ্ঞানী, আবার কেউ তোমাকে বলবে নির্বোধ। কিন্তু তুমি কারো কথা শুনবে না। তুমি নিজে যে-পথটাকে সত্য পথ বলে মনে করবে, সেই পথটাই অনুসরণ করবে। কারোর কথা শুনবে না।

তারপর আর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো বিনয়দা, তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্যে কী করতে তৈরি, বলো? কী দিতে পারবে? কী ত্যাগ করতে পারবে, বলো?

দেবু সেদিন প্রশ্নটা শুনে কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না প্রথমে। অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে ভাবতে লাগলো—সত্যিই সে কতোটুকু ত্যাগ করতে পারবে! জীবন?

বললে, আমি আমার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে রাজী।

বিনয়দা বললে, জীবন তো ছোট জিনিস ভাই, জীবনেব চেয়ে আরো অনেক দামী জিনিস আছে তোমার কাছে সেটা দিতে পারবে?

দেবু জিজ্ঞেস করলে, সেটা কী? জীবনের চেয়ে আবো দামী জিনিস কী আছে?

বিনয়দা বললে, ভক্তি—ভক্তি দিতে পারবে?

দেবু একটু ভেবে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, ভক্তি দিতে পারবো—

—কিন্তু বেশ ভালো কবে ভেবে দেখ। ভক্তি দেওয়া সহজ নয়। ভক্তি দিতে গেলে দরকার হলে বাবা-মা-সংসার-সমাজ সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হতে পারে। তা কি পারবে? বেশ ভালো কবে ভাবো—

দেবু বললে, আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে বাবা-মা-সংসার-সমাজ সব কিছু ত্যাগ করতে তৈরি।

—ঠিক আছে। আমি আজকের দিনটাও তোমাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি, বেশ ভালো করে একটা দিন ভাবো, তারপর কাল জবাব দিও—

দেবু বললে, না, আজকেই আমি কথা দিচ্ছি, আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সব কিছু উৎসর্গ করতে রাজি।

বিনয়দা তবু রাজি হলো না। বললে, না, এভাবে রাজি হলে চলবে না, কাল তোমাকে এই সময়ে আমি শ্মশানে নিয়ে যাবো। সেখানে গিয়ে 'শ্মশানেশ্বরী'র পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

কথাগুলো বলে কানাইকে নিয়ে বিনয়দা চলে গেল। যাবার আগে কানাই কাছে এসে বললে, কালকে আবার আমি ওই রাত একটার সময় আসবো, ঠিক তৈরি থাকিস, আমি যাই।

তাবপর দেবু আবার সেই রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরে এলো। তখন রাত বোধহয় তিনটে। আবার সেই পাঁচিল টপ্‌কে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

তারপর যতো রাজ্যের ভাবনা। আর তাও কি একটা ভাবনা? তার কেবল মনে হতে লাগলো মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে সে কী করবে? চাকরি করবে? জমিদারী দেখবে? ডাক্তার হযে রোগী দেখে টাকা উপায় করবে? ইঞ্জিনীয়ার হবে? কিংবা জজ কি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে দেশের লোকদের শাসন করবে? কিংবা উকিল এ্যাডভোকেট হয়ে ন্যায় বিচার চাইবে? কিংবা আই-সি-এস?

আর নয়তো সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে ঢুকে গেরুয়া পরে শিব জ্ঞানে জীব সেবা?

কিংবা গৃহস্থ? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার?

সেও তো সকলেই করে। সেটাও তো এক রকমের পেশা। তার বাবা যা করছেন, তার পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহও তো তাই-ই করেছেন। তার দাদামশাইও তো সেই একই পেশা অবলম্বন করেছিলেন। নইলে সেই বা জন্মালো কেন? পূর্বপুরুষরা যা করে এসেছেন সেও কি তাই-ই করবে? তার বাইরে কি কোন কাজ নেই?

সংসাব ত্যাগ করার প্রশ্ন আসে না। কারণ সেটা পলায়ন। কেন সে পালাবে? কীসের ভয়ে? কা'র ভয়ে!

হঠাৎ বাইবে থেকে দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে সে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। দরজা খুলতেই দেখলে সামনে বাবা দাঁড়িয়ে!

—কী হলো? এত দেরী পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলে যে।

দেবু চুপ।
বাবা আবার বললে, তোমার চেহারাটা এত শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন? আবার রাত জেগে জেগে বই পড়েছ নাকি?
তখনও দেবুর মুখে কোনও কথা নেই।
বাবা বলে যেতে লাগলো, এই তো সেদিন একজামিন হয়ে গেল। এখন একটু বিশ্রাম নাও। না ঘুমোলে তোমার শরীর তো খারাপ হয়ে যাবে—তখন? তখন কী হবে?
এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না দেবু। তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলে।
মাও বললে, তুমি দরজা খুলছো না দেখে, আমাদের তো ভয় হয়ে গিয়েছিল। এবার থেকে তুমি ঘরের দরজা খুলে শোবে।
এ কথারও কোনও জবাব দিলে না দেবু। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগলো। স্কুলে গিয়েও কে কী বলছে, কে কী পড়াচ্ছে তা মাথায় ঢুকলো না।
সমস্তক্ষণ কেবল সেই আগের রাত্রের বিনয়দার কথা মনে পড়তে লাগলো। বিনয়দার বলা কথাগুলো কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগলো। জীবন বড়ো না ভক্তি বড়ো? তুমি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে ভক্তি দিতে পারবে, বাপ-মা-সমাজ-সংসার সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে পারবে?
—পারবো।
না, অতো তাড়াতাড়ি জবাব দেবার দরকার নেই। আরো চব্বিশ ঘণ্টা ভাবো। কাল সারাদিন ভাবো। তারপরে ভালো করে ভেবে আবার কাল রাত একটার সময় আমি আবার আসবো। তখন শ্মশানেশ্বরীর পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তুমি জীবনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে জীবনের চেয়ে যা বড়ো তা উৎসর্গ করবে, ভক্তি দেবে।
কানাই এক ফাঁকে কাছে এলো। তারপর একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, কী রে দেবু, কাল তোর বাবা-মা কিছু জানতে পারেনি তো?
—না।
—ঘুম হয়েছিল তোর?
—না ভাই।
—কেন?
—মাথার মধ্যে কেবল ওই সব কথা তোলপাড় করছিল। ভাবতে ভাবতে কখন ভোর হয়ে গেছে, কখন সকাল হয়ে গেছে, টেরই পাইনি। শেষকালে বাবা দরজায় ধাক্কা দিতে খেয়াল হলো যে বেলা হয়ে গেছে। বাবা খুব বকাবকি করেছে।
কানাই বললে, তাহলে আজ রাত্তির বেলা তোকে ডাকবো তো?
—হ্যাঁ, ডাকিস।
—শেষকালে যদি বাড়ির লোকেরা টের পায়।
দেবু বললে, না, কেউ টের পাবে না।
তারপর আবার জিজ্ঞেস করলে, বিনয়দা আছে তো?
কানাই বললে, হ্যাঁ, থাকবে না মানে? তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো রয়ে গেল। নইলে চারদিকে বিনয়দার কতো কাজ, জানিস? একলা সমস্ত জেলায়-জেলায় ঘুরছে ওই পার্টির জন্যে। তোর মতো আরো অনেক ছেলেকে দলে টেনেছে। বিনয়দার ধ্যানজ্ঞান সমস্ত কিছু পার্টি। দেশকে বিনয়দারা স্বাধীন করবেই।
—কী করে দেশকে স্বাধীন করবে?
—ইংরেজদের মেরে—
—ইংরেজদের কী করে মারবো?

—বন্দুক রিভলবার পিস্তল দিয়ে ইংরেজদের গুলি করে।

দেবু তো শুনে মহা-ভাবনায় পড়লো। সে-কাজ সে কী করে করবে? কে তাকে ও-সব দেবে? জিজ্ঞেস করলে, ও-সব জিনিস আমি কোথা থেকে পাবো? কে আমাকে ও-সব দেবে?

কানাই বললে, সব ওই বিনয়দাই দেবে!

—বিনয়দা ও-সব কোথা থেকে পাবে?

কানাই বললে, সে সব তুই ভাবিসনি, তার ব্যবস্থা বিনয়দার সব জানা।

দেবু বললে, আমার বড়ো ভয় করছে রে।

কানাই বললে, কেন? ভয় কীসের? কাকে ভয়? পুলিশকে?

দেবু বললে, না, পুলিশের ভয় আমার নেই।

—তাহলে?

—ভয় আমার বাবা-মা'কে। তারা জানতে পারলে কী হবে? আমি তো বাবা-মার একই ছেলে, আর তো তাদের কেউ নেই।

কানাই বললে, তাহলে? তাহলে আজকের দিনটা ভাব। ভেবে ঠিক কর, তুই বিনয়দার কথায় রাজি হবি কিনা। আমি বিনয়দাকে গিয়ে বলে আসবো দেবু প্রতিজ্ঞা করতে রাজি হচ্ছে না।

কথাগুলো বলে কানাই চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু দেবু পেছন থেকে ডাকতে লাগলো, ওরে কানাই, শোন্ শোন্, শুনে যা—বলে কানাই-এর দিকে এগিয়ে গেল। কানাই ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দেবু বললে, তুইও আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর না।

কানাই বললে, আমার যে অনেক ভাই-বোন রয়েছে—আমাকে যে বিনয়দা দলে নেবে না। সকলের দায়-দায়িত্ব আমার একলার ঘাড়ে। বাবার বয়েস হয়েছে। আমার যদি কিছু হয় তাদের কে দেখবে?

কথাটা মিথ্যে নয়। দেবুর কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তাই বিনয়দা তাকেই বিশেষ করে বেছে নিয়েছে।

তারপব দেবু আবার নিজের বাড়ির দিকে ফিরলো। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মাথার ওপর ওই সব কথাই ঘুর-ঘুর করতে লাগলো। তাহলে কি হেরে যাবে?

স্কুল থেকে বাড়ি আসার পর কিছু খেয়ে নিয়েই আবার যেতে হবে সুলতান আহ্মেদ সাহেবের 'চরিত্র-গঠন-শিবিরে'। সেখানে ঘণ্টা দুইয়েক ড্রীল কবে আবার বাড়ি আসা।

মুকুন্দবাবুর অনেক কাজ। সম্পত্তি থাকলেই কাজ থাকে। কোথায় কোন জমিটাতে কী চাষ করতে হবে তার আলোচনা করতে হয় হরবিলাসের সঙ্গে। হরবিলাস বিশ্বাস। অনেক কালের পুরোনো লোক। সেই-ই হচ্ছে মুকুন্দবাবুব গোমস্তা। লোকে হরবিলাস বিশ্বাসকে গোমস্তামশাই বলে ডাকে।

গোমস্তামশাই সকালবেলাই আসে মুকুন্দবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে।

হরবিলাস আসতেই মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করেন, কাল পশ্চিমের জমিতে চাষ হলো?

হরবিলাস বলে, সবটা হয়নি, বিঘে চারেক হয়েছে, আজকে আবার বাকিটায় চাষ হবে।

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস কবেন, আজ কি পুবো দিনটাই লাগবে নাকি আবার?

হরবিলাস বলে, আজকে দুপুর এস্তোক পশ্চিমের পুরো মাঠটায় চাষ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ধরবে বিলের ধারটা—

কোথায় কোন জমিটা কখন চাষ করতে হবে, কোন জমিতে কী বুনতে হবে তার সমস্ত আলোচনা করে নেন দু'জনে। এ সব প্রতিদিনের কাজ। আলোচনা শেষ করে হরবিলাস লম্বা-লম্বা পা ফেলে মাঠের দিকে পাড়ি দেয়।

দুপুরবেলা ক্ষেতের মানুষজনদের জন্যে খাবার যায়। সেই খাবার বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বিধু আছে।

বিধু আসে দুপুরবেলা। বিধু সরকার। ভাত-তরকারি নিয়ে যায় গরুর গাড়ি করে।

রান্না-বান্না সব তৈরিই থাকে। মুকুন্দবাবুর স্ত্রী সে-সব তদারকি করে। লোকজনের অভাব নেই। মাইনে করা লোক সবাই। প্রতিদিন যেন ভোজ চলে বাড়িতে। ভোরবেলাই তারা রুটি তৈরি করে রাখে। মাথা পিছু আটটা করে রুটি। আর তার সঙ্গে যা-হোক কিছু একটা তরকারি কি ডাল। সেই খেয়েই তারা ক্ষেতের দিকে দৌড়োয়।

মুকুন্দবাবুর তখন কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। ভেতর বাড়িতে যা কিছু কাজ হয় সে-সব দেখা-শোনার ভার গৃহিণীর ওপর।

দুপুরবেলাও তাই। অতগুলো লোকের ভাত তরকারির ব্যবস্থা করা কি সহজ কথা?

মুকুন্দবাবু তখন চণ্ডীমণ্ডপে জন-মজুরদের নিয়ে ব্যস্ত।

হরবিলাস তখন সেখানে থাকে। জনমজুররা আটখানা করে রুটি আর ডাল খেয়ে মাঠের দিকে দৌড়োয়। কে কোন্ মাঠে জন খাটবে তা ঠিক করে দেয় হরবিলাস। জন-মজুররা চলে যাবার পর হরবিলাসের সঙ্গে কর্তা আলোচনা চালান।

সমস্ত দিনের কাজের আগাম হিসেব ওখানে বসে-বসেই হয়ে যায়। সে আলোচনা শেষ হয়ে গেলেই হরবিলাস ক্ষেতের দিকে চলে যায়।

তখনকার মতো মুকুন্দবাবুর যতো ব্যস্ততা। তারপর তাঁর ছুটি। তখন তিনি ভেতরে যান। মানে ভেতর মহলে।

তখন গৃহিণীরও একটু অবসর।

কর্তা জিজ্ঞেস করেন, দেবু কোথা? দেবু?

গৃহিণী বলেন, দেবু তো ওর ঘরে, পড়ছে—

দেবুর তখন পড়ানোর মাস্টারমশাই আসেন। ঘণ্টা খানেক থাকার পরই মাস্টারমশাই তাঁর বাড়িতে চলে যান।

দেখা হয়ে গেলেই মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করেন, খোকা কেমন পড়ছে মাস্টার?

বরাবর একই উত্তর দেয় বেণীমাধব মাস্টার। বলে, খুব ভালো—

মুকুন্দবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, এবারও ফার্স্ট হবে তো?

বেণীমাধব মাস্টার বলে, আমি তো মনে করি ফার্স্ট হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভালো রাখা চাই।

—ওই তো, ওইটেই তো ও বোঝে না। আমি যতো বলি যে রাত জেগে অতো পড়াশোনা করো না, ততো রাত জেগে পড়ে। আর যতো বলি যে একটু দুধ-দই-টই খাও, তাও আমার কথা শোনে না।

বেণীমাধব মাস্টার বলে, কেন, শোনে না কেন?

—কে জানে? আমার সঙ্গে তো ও কথাও বলে না।

এও এক আশ্চর্য কাণ্ড! জীবনে যে সবচেয়ে আপন জন তার সঙ্গে কথা না বলার কারণটা কী?

সে কারণটা কেউ বোঝে না। বুঝবে কী করে? বোঝবার তো কথা নয়। কারণ মুকুন্দবাবু কিংবা বেণীমাধব মাস্টার—তাঁরা দু'জনেই তো সাধারণ মানুষ। তাঁরা সাধারণ মানদণ্ড দিয়েই সব মানুষকে বিচার করেন। সবাই যে-রকম করে সংসার করেন, সেই রকম আচরণই তাঁরা সকলের কাছ থেকে আশা করেন। একটু ব্যতিক্রম হলেই তাঁরা তাকে অমানুষ বলে রায় দিয়ে দেন।

কিন্তু সব মানুষই কি এক রকমেব?
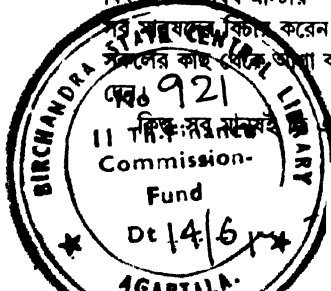
বাইরেটা অবশ্য সকলের একই রকম। সকলেরই দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ। যা সব মানুষের আছে লোকে তাই দেখেই বলে দেয়, ওটা মানুষ! কিন্তু মন?

সৈন্যেরা যখন ইউনিফর্ম পরে মার্চ করে তখন বাইরে থেকে তাদের একই রকম দেখায়। এক রকমের টুপি, এক রকমের জুতো, এক রকমের জামা। বাইরে থেকে তাদের কোনও তফাৎ নেই।

কিন্তু ভেতরে?

মানুষের মনটার মতো দুর্জ্ঞেয় জিনিস সংসারে আর কিছু নেই। সেখানে যদি কেউ দৃষ্টিপাত করতো তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তার জন্যেই মানুষ-চরিত্র নিয়ে এত কাব্য, এত গল্প, এত উপন্যাস, এত নাটক লেখা হয়েছে, লেখা হচ্ছে আর লেখা হবে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিনই তা লেখা হবে, তবুও তার আবেদন কোনোদিন ফুরিয়ে যাবে না। সমুদ্রের জলের তলায় ডুব দিয়ে কেউ হয়তো তার তলও আবিষ্কার করতে পারে, হিমালয়ের চুড়োয় উঠে অনেকে তার উচ্চতাও মাপতে পারে। কিন্তু মানুষের মন?

মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করে কেউ কোনোদিন বলতে পারবে না যে—'আমি এর শেষ কথা দেখিয়ে দিলাম। এর পরে আর নতুন কিছু বলবার নেই।'

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলে গেছেন—"Science is what you know and philosophy is what you don't know."

সেই জন্যেই আইনস্টাইন যা যা বলে গেছেন তা আমরা সবাই বুঝে গেছি, কিন্তু মন সম্বন্ধে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড যা বলে গেছেন তার সম্বন্ধে আমরা সবটুকু বুঝিনি, কারণ সেটা অনুমান, প্রমাণ নয়।

দেবব্রত সরকারও সেই রকম একজন মানুষ যাকে সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবও বোঝেননি, বেণীমাধব মাস্টারও বোঝেননি, মুকুন্দ সরকারও বোঝেননি। এমন কি কানাই মল্লিক বা তাঁর বিনয়দাও বোঝেননি। আর সবচেয়ে যে কাছের লোক সেই তাঁর স্ত্রী বা কন্যাও তাকে বোঝেনি।

লিওনার্ডো দ্যা ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা' ছবিটা কি পৃথিবীর কেউ বুঝেছে?

তাই এ গল্পের গোড়াতেই বলেছি যে দেবব্রত সরকারকে গড়বার সময় বোধহয় তার সৃষ্টিকর্তা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিনও দেবু যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে গেল।

খাওয়ার সময় অন্যদিন তবু একটা-দুটো কথা বলে। মুকুন্দবাবু বা তার মা'র কথার দু'একটা জবাবও, হয়তো সামান্য হলেও দেয়।

কিন্তু সেদিন সে আর কারো কথার জবাবও দিলে না। নিজেও কোনও কথা বললে না। নেহাৎ খেতে হয় বলেই যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নিয়েই হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো।

মুকুন্দবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, দেবুর কি আজ রাগ হয়েছে নাকি? ও যে আজ কোনও কথাই বললে না।

মা বললে, কী জানি, আমি কী করে জানবো?

বাবা বললেন, দেবু যেন দিন দিন আরো বোবা হয়ে যাচ্ছে—

এ-সব এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। একটা মাত্র ছেলে, সেও যদি এ-রকম হয় তাহলে কার জন্যে বেঁচে থাকা? কার জন্যে সংসার করা?

দেবু তখন নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। রাত একটার সময়ে কানাই এসে তাকে ডাকবে। আর তারপর বিনয়দা তাকে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানেশ্বরীর মন্দিরে কী সব প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে! সেই সব ভাবনাই সমস্ত মাথাটার মধ্যে কেমন তোলপাড় করতে লাগলো।

কানাই এসে ডাকবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিলে ভালো হতো।

কিন্তু কোথায় ঘুম?

সেই যশোর জেলায় তখন সবাই ঘুমে অচেতন। একজন মানুষেরও সাড়া-শব্দ নেই। সবাই বেশ সুখে আছে। কারোর যেন কোনও দুঃখ নেই, কারোর যেন কোনও কষ্ট নেই, কেউই যেন অনাহারে নেই, কারোর যেন কোনও রোগ-শোক-তাপ কিছু নেই।

অথচ দেবুরই যেন যতো দায়। চারপাশে মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট, এত শোক-তাপ, এত জ্বালা-যন্ত্রণা, এ সমস্ত কিছুর দায়-ভাগের বোঝা যেন একলা দেবুকেই বইতে হবে।

অথচ দেশের মানুষের সকলের পরবার মতো একটা আস্ত কাপড়ও নেই—এ তার নিজের দেখা দৃশ্য।

অনেকবার বাবাকে এ-সব কথা বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছে। যদি সে কখনও স্বাধীন হয় তখন সে এর প্রতিকার করবে, তখন সে এর প্রতিবিধান করবে। তার আগে আর তার কিছু করবার নেই।

হঠাৎ জানালায় সেই মৃদু শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে দেবু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। গায়ে একটা জামা চড়িয়ে নিলে সে। তারপর ঠিক আগের রাতে যেমন ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি করেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

—বিনয়দা এসেছে?

—হ্যাঁ, ওই যে—

তারপর কানাই তাকে নিয়ে গেল বিনয়দার কাছে।

তারপরে সেখান থেকে শ্মশান।

বিনয়দা তাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কিছু ভেবেছ?

দেবু বললে, হ্যাঁ, ভেবেছি—

—তুমি তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজি?

দেবু বললে, রাজি—

—ভক্তি দিতে পারবে তো?

—হ্যাঁ দেব।

বিনয়দা বললে, ঠিক আছে। এখনই তাহলে তোমাকে সেই কথাটা এখানকার শ্মশানেশ্বরীব মূর্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। চলো—

তিনজনে তখন সেই শ্মশানের দিকে চলতে লাগলো। নির্জন বাস্তা। শুধু রাস্তাটাই নির্জন নয়, সমস্ত গ্রামটাই নির্জন। কারো মুখে কোনও কথা নেই। যেন সবাই একই উদ্দেশ্যে তখন আত্মমগ্ন।

চলতে চলতে দেবুর মনে হলো, সে যেন আর তখন নিজের মধ্যে নেই। তখন সে হারিয়ে গেছে। এই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-পীড়িত, সমস্ত অত্যাচাবিত, সমস্ত অবহেলিত মানুষের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে। সে তখন আর সে নেই, সে তখন অনন্ত হয়ে গিয়েছে, সে তখন হয়ে গিয়েছে অশেষ।

আধ কিলোমিটার দূরেই শ্মশানটা। সেখানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না। আর ঘটনাচক্রে শ্মশানটাও তখন নির্জন।..শেষ শ্মশানযাত্রীদের দলটা তখন সবেমাত্র সব কাজ শেষ করে বিদায় নিয়েছে।

শ্মশানেশ্বরীর মন্দিরটাও তখন নিস্তব্ধ। কেউই তখন সেখানে নেই। প্রদীপটা যারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা তখন আর নেই। কিন্তু প্রদীপটা তখনও জ্বলছে অল্প অল্প। আর একটু পরে সেটা নিভে যাবে।

বিনয়দা তখন পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বার করেছে।

বিনয়দা দেবুর হাত ধরে টেনে কাছে নিয়ে গেল।

বললে, এই ছুরিটা নাও—

দেবু ছুরিটা হাতে নিতেই বিনয়দা বললে, ছুরিটা দিয়ে নিজের বাঁ হাতটা কাটো—

দেবু ঠিক বুঝতে পারলে না কথাগুলো।

বিনয়দা বললে, কাটো—কাটো—

—কোন জায়গাটা কাটবো?

বিনয়দা বললে, যেখানে ইচ্ছে কাটো। এমন করে কাটবে যাতে খুব রক্ত বেরোয়—

দেবু তবু বুঝতে পারলো না।

বিনয়দা বললে, বাঁ হাতের পাতাটাও কাটতে পারো।

দেবু ডান হাত দিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ওপর। বসাতেই খুব যন্ত্রণা হতে লাগলো! রক্ত পড়তে লাগলো ঝর-ঝর করে।

বিনয়দা একটা কঞ্চির কলম আর একটা কাগজ এগিয়ে দিলে।

বললে, এই কলম আব কাগজ নাও। ওই বাঁ হাতের রক্ত দিয়ে এই কাগজটাতে আমি যা বলছি তাই লেখ। লিখে নিচে নিজের নাম লিখবে।

দেবু তাই করার জন্যে তৈবি হলো।

বিনযদা বলতে লাগলো, 'আমি মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের জন্যে বলিদান কবতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দেমাতরম্।'

দেবু সেই অন্ধকারের মধ্যেই কাগজটার ওপর মোটা-মোটা অক্ষবে কথাগুলো লিখতে লাগলো। লিখতে গিয়ে বাঁ হাতের পাতাটা ছুরি দিয়ে আরো বেশি করে কাটতে হলো, যাতে আবো বেশি বক্ত বেবোয।

বিনয়দা আর কানাই—তারা দু'জনেই তখন একদৃষ্টে তার লেখা অক্ষরগুলো দেখতে লাগলো।

বিনয়দা বললে, এবার নিচে নিজের নাম সই করো।

দেবু তাই-ই করলে। মোটা-মোটা অক্ষরে নিজের নামটা লিখলে—শ্রীদেবব্রত সরকার।

লেখা হয়ে গেলে বিনয়দা বললে, এবার শ্মশানেশ্বরীর মূর্তির পায়ে হাত দাও।

দেবু তার কথামতো শ্মশানেশ্বরীর মূর্তির পায়ে হাত দিলে।

বিনয়দা বললে, এই যে-কথাগুলো লিখলে সেই কথাগুলো মায়ের পায়ে হাত রেখে মুখে বলো—

দেবু যা কাগজটাতে লিখেছিল সেইগুলোই উচ্চারণ করতে লাগলো, আমি মায়েব কাছে বলি প্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দেমাতরম্।

বিনয়দা বললে, ঠিক আছে, এইবার বাড়ি যাও। আজকে যে প্রতিজ্ঞা তুমি করলে সে-কথা কাউকেই কোনোদিন বলবে না। এমন কি তোমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন কাউকেই কোনও

কথা বলবে না। যদি সম্ভব হয় তো তুমি ওই কাটার ওপর চুন বা টিংচার-আইওডিন লাগিয়ে দিও। নইলে পরে ঘা হতে পারে।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারপরে কিছু লোক তখন শ্মশানের দিকে 'হরি বোল' দিতে দিতে আসছে। তারা এসে পৌঁছোবার আগেই দেবু কানাই বিনয়দা সবাই মিলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

সেদিনকার সেই ঘটনাটা যে দেবব্রত সরকারের জীবনে কতোখানি বিয়োগান্ত রূপ গ্রহণ করবে তা কি সে নিজেও কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল?

সব মানুষই ছোটবেলা থেকে নিজের জন্যে চলবার মতো রাস্তা ঠিক করে নিয়ে একটা গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সাধারণ বাঙালীদের শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনের আকাঙক্ষাই থাকে, শহরের মধ্যে একটা বাড়ির মালিক হওয়া। তার বেশি তারা কিছু চায়ও না, আর চায় না বলেই তারা তাই কিছু পায়ও না। বাড়ি যদি বা তাদের একটা হয়ও তো সেখানেই থেমে গিয়ে তারা জীবনের ইতি টেনে দেয়। ইতি টেনে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলে।

তারপরে যেটা চায়, সেটা হলো—টাকা।

এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ব্যতিক্রম আছে বৈকি।

ব্যতিক্রম যাঁরা তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও সবাই-ই তাঁদের এক ডাকে চিনবেন।

কিন্তু এ-গল্পের নায়ক দেবব্রত সরকার। দেবব্রত সরকারের নাম কেউ-ই জানে না, কেউ কোনও দিন জানবেও না। তার নাম চিরকাল সকলের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এই চারদিকের কোটি-কোটি লোকের মধ্যে সে একজন বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম হলেও তার নাম চিরকালের বিস্মৃতির জঞ্জালে চাপা পড়ে যাবে।

কেন এমন হলো? সেই 'কেন'র উত্তর পেতে গেলে তার গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো শুনে যেতে হবে।

সুপ্রভাতও তাই বললে।

বললে, আমিও কি দেবব্রত সরকারকে চিনতুম? তার নামই শুনেছি, তাকে কোনওদিন দেখিওনি।

—কার কাছে শুনলে তার কথা?

সুপ্রভাত বললে, আমি আগে থেকে তা তোমাকে বলবো না। তাহলে গল্পের রসটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

—কেন?

সুপ্রভাত বললে, রামায়ণ পড়বার সময় যদি আগে থেকে তোমাকে বলে দেওয়া হয় যে, শেষকালে সীতার 'পাতাল প্রবেশ' হবে, তাহলে কি পুরো রামায়ণটা তুমি শুনবে? তুমি যদি সোজা তীর্থে পৌঁছে গিয়ে তীর্থের দেবতাকে দর্শন করে ফেলো, তাহলে কি তীর্থযাত্রার পুরো আনন্দটা পাবে?

বললাম, ঠিক আছে, তুমি যেমন করে ইচ্ছে বলো—

সুপ্রভাত আবার দেবব্রত সরকারের কথা বলতে লাগলো।

তখন ইংরেজ আমল। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট, দুপুর বারোটার সময়ে যে লোকটা পাল তোলা জাহাজে করে এসে কলকাতার বাবুঘাটে নামলো তার নাম জোব চার্ণক।

এ-ঘটনা সবাই-ই জানে।

কিন্তু সেই ইংরেজরা কী করে এই ইণ্ডিয়াতে এসে আস্তে-আস্তে সমস্ত দেশটাকে ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করে বসলো, তা সবাই বলতে পারবে না। এই জন্যে বলতে পারবে না যে সবাই-ই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের টাকা উপার্জনের ধান্দায়, ব্যস্ত নিজের টাকা সুরক্ষিত রাখবার প্রচেষ্টায়, ব্যস্ত নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থার দুশ্চিন্তায়।

আর যারা দেশ সেবার কাজে ব্যস্ত তাদের যতোটা না দেশের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ততা, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ততা নিজের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায়।

এব নামই তো পলিটিক্স।

এই পলিটিক্সই হয়েছে এ-যুগের এক মহাপাপ। আগে পলিটিক্স ছিল দেশ-সেবা, আর এখন পলিটিক্স হয়ে গেছে স্বার্থ-সেবা। আগেকার আমলের বাপ-মায়েরা ছেলে রাজনীতি করছে শুনলে বলতো—ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

এখনকার ছেলেরা রাজনীতি করলে বাপ-মায়েরা গর্ব করে বলে, আমার ছেলে পার্টি করে—পার্টির হোল্ টাইম ওয়ার্কার।

কিন্তু আমাদের দেবব্রত সরকার তো আজকালকার ছেলে নয়। সে যুগের ছেলে। যে-যুগে ইণ্ডিয়া ছিল এক। ইণ্ডিয়া তখনও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়নি। তখনকার যুগে রাজনীতি করা ছিল গুরুজনদের চোখে অপরাধ। তখন গুরুজনদের বক্তব্য ছিল—কাজ কি বাপু ও-সবের মধ্যে গিয়ে? পূর্বপুরুষরা যা এতকাল ধরে করে এসেছে তাই-ই করে যাও। সংসারে সৎভাবে থেকে সময়মতো একটা সৌভাগ্যবতী মেয়েকে বিয়ে করো। তারপর সন্তান-সন্ততি হলে তাদের মানুষ করে তোল। দেব ঋণ, ঋষি ঋণ, পিতৃ ঋণ শোধ করে একদিন স্বর্গে চলে যাও। তাতেই তোমার পূর্বপুরুষদের পরলোকগত আত্মারা তৃপ্তি লাভ করবেন।

এই ছিল তখনকার যুগের সমস্ত অভিভাবকদের প্রায় সকলেরই কথা। এই কথা তাঁরা ছেলে-মেয়েদের শোনাতেন শেখাতেন এবং নিজেরাও সেই নিয়ম পালন করতেন।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধালো কিছু বেয়াড়া লোক।

সেই বেয়াড়া লোকরাই শুরু করলেন যতো বেয়াড়া কাণ্ড। তারাই বলে বেড়াতে লাগলো যে, আমাদের দেশের লোকরা পরদেশী ইংরেজদের গোলামি করছে। আমরা সবাই গোলাম আর আমাদের বাদশা হলো ইংরেজ। ইংরেজরা এখানে ব্যবসা করতে এসে আমাদের এখান থেকে তুলো, তামাক-পাতা, চামড়া, চাল-ডাল সব নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে আর বিলেতে তৈরি কাপড়, ওষুধ, সিগারেট আমাদের এখানে ডবল দামে বেচছে। এর ফলে এখানকার গরীব লোক আরো গরীব হয়ে যাচ্ছে, আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আরো বড়লোক হচ্ছে। আমাদের তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে তাদের কাপড় তৈরি করা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে, আর তার ফলে তাদের দেশের ম্যান্‌চেস্টারের কলের তৈরি কাপড় কিনতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

এ-সব কথা তখন সব জায়গায় সবাই-ই বলাবলি করতো। কিছু কিছু স্বদেশী মিটিংও হতো এখানে ওখানে।

লেকচার শুনতে-শুনতে দেবব্রতর শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠতো। হঠাৎ এক-একদিন সেই মিটিং-এর ওপর পুলিশের লাঠিও চলতো, সে লাঠির ঘায়ে অনেক লোক জখমও হতো।

বাবা বড়ো ভয় পেতেন ছেলের কথা ভেবে।

বলতেন, ও-সব মিটিং-এ লেকচার শুনতে যেও না যেন, বুঝলে?

দেবু কোনও কথার জবাব দিত না।

বিশেষ করে সেই শ্মশানেশ্বরীর ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বিনয়দার সামনে প্রতিজ্ঞা করবার পর থেকে দেবু যেন আরো কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দবাবু সারাদিন তাঁর জমি-জমা ক্ষেত-খামার নিয়েই থাকতেন। বিশেষ করে চাষ-আবাদের সময়ে। নিজেও তিনি অনেক সময়ে ক্ষেতে গিয়ে জন-মজুরদের কাজকর্ম তদারক করতেন। সব কাজ পরের ওপরে ছেড়ে দিলে চলে না।

অনেক বেলায় বাড়ি এসে খেতে বসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেন, খোকা আজকে পেট ভরে খেয়েছে?

স্ত্রী বলতেন, হ্যাঁ।

মুকুন্দবাবু বলতেন, আজকাল আমি আর তেমন ওর দিকে দেখতে পারছি নে। এবার ছোলা কাটবার সময় এলো, এখন দিন-ভর ক্ষেতেই পড়ে থাকতে হবে দেখছি।

স্ত্রী বলতেন, কেন, হরবিলাস তো রয়েছে।

মুকুন্দবাবু বলতেন, সে তো মাইনে করা লোক, আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে মজুররা যেমন কাজ করবে, তেমন কি আর হরবিলাস থাকলে করবে?

তা সত্যি! কথাতেই তো আছে যে, মনিব গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে সুলতান সাহেব তখন দেবুকে নিয়ে পড়েছেন। কত রকমের বই তিনি দেবুকে পড়তে দেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বক্তৃতা সংকলন পড়তে দিলেন সুলতান সাহেব।

বললেন, এই বইটা পড়ে আমাকে এসে বলবে কী বুঝলে?

দেবু বইটা পড়তে নিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলাই পড়াতে আসেন বেণীমাধববাবু। দেবুর কেবল মনে হচ্ছিল কতক্ষণে মাস্টারমশাই চলে যাবেন। স্বামী বিবেকানন্দের নামই তখন শুনেছে সে। কিন্তু তাঁর কোনও রচনা সে পড়েনি। বেণীমাধববাবু পড়াতে-পড়াতে দেবুকে বললেন, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে নাকি? রাত্তিরে কি ভালো ঘুম হয়নি তোমার?

দেবু বললে, আজ্ঞে না, হয়নি।

বেণীমাধববাবু বললেন, তাহলে আজ তুমি খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে যাও, আমি চলি—

বলে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবু আবার বইটা খুলে পড়তে বসলো। পড়তে-পড়তে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে সে।

একটা জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন—The voice of Asia has been the voice of religion, the voice of Europe is the politics.

তার মানে হলো—এশিয়ার বাণী হলো ধর্মের বাণী, আর ইয়োরোপের বাণী হচ্ছে রাজনীতির।

তারপরেই আবার তিনি লিখছেন—I do not mean to say that political and social improvements are not necessary. But what I mean is this that they are secondary here and religion is primary.

অর্থাৎ তার মানে এই নয় যে রাজনৈতিক আর সামাজিক উন্নতি আমাদের এখানে দরকার নেই। আসলে আমি বলতে চাই যে এখানে রাজনৈতিক আর সামাজিক উন্নতি পরে হলেও চলবে, কিন্তু এখানে আমাদের দেশে অগ্রাধিকার দিতে হবে ধর্মকে।

কথাটা পড়ে দেবু কেমন অবাক হয়ে গেল। তাহলে বিনয়দা যা বলে গেল, তা কি মিথ্যে? তাহলে কা'র কথা সে শুনবে? বিনয়দার কথা, না স্বামী বিবেকানন্দর কথা?

—এ কী? কী বই পড়ছো, দেখি?

বাবার গলা শুনে দেবু চমকে উঠলো। চেয়ে দেখে বাবা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—সামনে তোমার পরীক্ষা, আর তুমি এখন এই সব বই পড়ছো? এ বই তো পরীক্ষার পরে পড়লেও চলবে।

দেবু কী বলবে বুঝে উঠতে পারলে না।

—কে তোমাকে দিয়েছে এ বই?

দেবু বললে, সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব।

সুলতান সাহেবের নাম শুনে বাবা যেন একটু শান্ত হলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, এ-সব বই পড়ে বেশি সময় নষ্ট করো না। আগে পরীক্ষা, তারপর এ-সব বই পড়ো—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে কানাই-এর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, বিনয়দা আছে, না চলে গেছে?

কানাই বললে, চলে গেছে—সেই রাত্তিরেই চলে গেছে।

—কোথায় গেছে?

—সেই যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই চলে গেছে—ঢাকায়।

আশ্চর্য! দেবু তখনও সেই রাত্রের কথা ভুলতে পারেনি। তার মনের মধ্যে তখনও যে-তোলপাড চলছে তা তো কানাই জানতে পারছে না, কেমন করে কানাইকে সে বোঝাবে যে দেবু সেই রাত থেকেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে অন্য মানুষ। যখনই সে শ্মশানেশ্বরীর পায়ে হাত দিয়ে নিজের জীবনকে বলিদানের প্রতিজ্ঞা করেছে, সেই মুহূর্তেই যেন সে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। তার বাবার দেওয়া 'দেবব্রত' নামটাই শুধু তার আছে, কিন্তু সমস্ত মানুষটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।

তারপরে সেই সাংঘাতিক খবরটা হঠাৎ তার কানে এলো। শুধু যে তার কানেই এলো তা নয়। সেদিন পৃথিবীর সব মানুষের কানেই খবরটা গিয়ে পৌঁছুলো।

সেই তারিখটা হচ্ছে ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট।

আর সবাই সে তারিখটা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু দেবু সেটা কখনও ভোলেনি, আর কখনও ভুলবেও না। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল লণ্ডনে, দিল্লীতে, কলকাতায়, সিলোনে, বর্মায় সর্বত্র। সবটাই তো তখন ইণ্ডিয়া, সবটাই তো তখন ভারতবর্ষ, সবটাই তো তখন একই দেশ।

দেবু যথারীতি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে। উঠে তার আগের দিনের কাজকর্মের হিসেবটা ডায়েরীতে লিখেছে। তারপর মা তাকে খাবার খেতে দিয়েছে। খাবারটা খেয়ে নিয়েই বই নিয়ে ক্লাসের পড়াটা পড়তে বসেছে।

ভেতর-বাড়িতে রোজকার মতো সেদিনও জন-মজুরদের কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গেছে। তারা জলখাবার খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেছে। বিধু সরকার হিসেবের খাতা নিয়ে বসে গেছে রোজকার মতো তার নিজের জায়গায়। আর একটু পরেই গোমস্তা হরবিলাস বিশ্বাস এসে বলছে, কর্তামশাই, সব্বোনাশ হয়েছে—সব্বোনাশ হয়েছে—

মুকুন্দবাবু চমকে উঠেছেন। বললেন, কীসের সব্বোনাশ? কা'র সব্বোনাশ? কৈলাস খুড়ো মারা গেছে?

—আজ্ঞে না—

হরবিলাস তখনও হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে-হাঁফাতেই বললে, নারায়ণগঞ্জে পুলিশের বড়ো সাহেব খুন হয়ে গেছে।

—কেন? কে খুন করেছে?

—স্বদেশীরা।

এবার মুকুন্দবাবু হতবাক হয়ে গেলেন। নারায়ণগঞ্জের পলিশের বড়ো সাহেব বড়ো অত্যাচার করতো এ-কথা সবাই-ই জানে। তাকে খুন করেছে স্বদেশীরা?

জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে খবরটা দিলে?

—গ্রামের সবাই-ই তো বলছে, ঢাকা থেকে যারা যশোরে এসেছে তারাই বলেছে।

—কেউ ধরা পড়েছে?

হরবিলাস বললে, তা কেউ জানে না।

মুকুন্দবাবু খবরটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা আর চুপ করে থাকার মতো নয়ও। এই সেদিন বরিশাল জেলায় দেবেন্দ্রবিজয় সেনগুপ্ত নামে একটা ছেলে একটা পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে-লুকিয়ে বোমা তৈরি করছিল। সেই সময়ে কেমন করে হঠাৎ একটা বোমা তার হাতের ওপরেই ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে খুন হয়ে যায়। রক্তে ভেসে যায় ঘরের মেঝে। সে খবরটাও পাড়ার লোকরা এসে মুকুন্দবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল।

পাড়ার নীহার ঘোষালের কাছে খবরটা শুনে সেদিনও মুকুন্দবাবু চমকে উঠেছিলেন। তবু যেন খবরটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি তাঁর।

বলেছিলেন, খবরটা সত্যি?

নীহার বলেছিল, হ্যাঁ কাকা, সত্যি। আমি নিজের কানে সন্তোষদার কাছে শুনে এসেছি।

—কে সন্তোষদা?

—পশুপতি হালদারের জামাই। পশুপতি হালদারের মেয়ের যে ওই বরিশাল জেলার 'ভোলা'তেই বিয়ে হয়েছে। সেই সন্তোষদা শ্বশুরবাড়িতে এসে সব কথা বলে গেছে।

নীহার বললে, ওখানে 'নল্‌চিড়া' বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে একটা পোড়ো বাড়িতে নাকি কয়েকজন ছেলে-ছোকরা মিলে হাত-বোমা তৈরি করছিল। সেই সময়ে 'বলু' বলে একটা ষোল বছরের ছেলের হাতে হাত-বোমাটা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য সব ছেলেরা গা-ঢাকা দিয়ে পালায় আর বলুও সেইখানে মারা যায়—পুলিশ খবর পেয়ে সেই বাড়িতে এসে দেখে একটা ছেলে মরে পড়ে আছে। খবর নিয়ে জানতে পারে বলু হচ্ছে ওখানকার এক বড়লোক জোতদারের ছেলে।

—তারপর?

—তারপর আর কি। তখন নল্‌চিড়ার সব লোকের বাড়িতে বাড়িতে খানা-তল্লাশী চালিয়ে সকলের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। সেই তখন থেকে গাঁয়ের কেউ আর সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না—সন্তোষদা তাই তার বউকে শ্বশুরবাড়িতে এনে রেখে দিয়ে গেছে।

—তারপর?

নীহার বললে, পুলিশের ভয়ে এখন ছেলেদের বাবারা তাদের বাড়ির বাইরে যেতে দিচ্ছে না, বাড়িতে সবাই ছেলেদের নজর-বন্দী করে রাখছে।

মনে আছে সেদিন মুকুন্দবাবু নীহারকে বলেছিলেন, জানো নীহার, এসব কিছুর জন্যে আর কেউ নয়, ওই গান্ধী বেটাই দায়ী। শুনেছি গান্ধী নাকি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছে। আমি বলি তুই যাদের খেয়ে যাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিস, তুই তাদেরই বিরুদ্ধে নেমকহারামী করছিস? এই কি তোর এত লেখাপড়ার ফল রে? যারা তোকে এত লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুললে, তুই সেই তাদেরই বিরুদ্ধে সবাইকে উস্‌কে দিচ্ছিস?

নীহার আর কী বলবে? চুপ করে কথাগুলো শুনে গিয়েছিল।

মুকুন্দবাবু আরো বলেছিলেন, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম নীহার, তুমি আমার কথাগুলো মনে রেখো, ওই গান্ধী বেটাই যতো নষ্টের গোড়া। ওই লোকটাই একদিন এই দেশটার সব্বোনাশ করবে—এই আমি তোমাকে আজ বলে গেলুম---

নীহার আর কিছু কথা বলেনি সেদিন। কিন্তু মুকুন্দবাবুর মুখ দিয়ে তখন খই ফুটছিল। তিনি বলেছিলেন—তোমাদের বয়েস কম, তোমরা এখন অনেকদিন বাঁচবে, কিন্তু আমি তো চলে যাবো। যাবার আগে তোমাকে বলে যাই, ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে কেউ কোনওদিন বাঁচেনি, আর কেউ কোনওদিন বাঁচবেও না। এই যে জার্মানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত বড় লড়াইটা করলো, লাখ-লাখ লোক প্রাণ দিলে, কিন্তু তাতে কী জার্মানী জিততে পারলো? বলো না, তুমি চুপ করে রইলে কেন? আমি কী কিছু অন্যায় কথা বলছি?

একটু থেমে মুকুন্দবাবু আবার বলেছিলেন, ইংরেজদের কামান আছে, বন্দুক আছে, সৈন্য-সামন্ত আছে, সব কিছু আছে। আর তোদের কী আছে শুনি যে তুই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিস। তুই ব্যারিস্টারি পড়ে পাশ করেছিস, তা তুই কোর্টে গিয়ে মামলা-মোকর্দমা করে সংসারধর্ম কর না। তাতে তোরও ভালো হবে, দেশের ছেলেছোকরাদেরও ভালো হবে। তা নয়, একটা লেংটি পরে চরকা কেটে কী হবে? কলা হবে, কচু হবে!

এ-সব কথা বহুদিন আগের। তারপরে কতো কাণ্ড পৃথিবীতে ঘটে গেছে। নদীর কতো জল গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। তারও শেষ নেই। তার হিসেও কেউ রাখেনি।

কিন্তু এতদিন পরে আবার হরবিলাসের কাছে ঢাকার ঘটনাটা শুনে মুকুন্দবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। আবার সেই খুনোখুনির ব্যাপার! বরিশাল জেলার 'ভোলা' গ্রামে যে ছেলেটা বোমা তৈরি করতে গিয়ে মারা গেল, এবার তাদের দলই কি আবার ঢাকায় তাদের কেরামতি দেখালো নাকি!

মুকুন্দবাবু চমকে উঠলেন। এর পেছনে আর কেউ নেই, একমাত্র গান্ধী ছাড়া।

বললেন, জানো হরবিলাস, আমি তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি, ওই আমাদের ব্যারিস্টার গান্ধীটাই হলো যতো নষ্টের মূল। গান্ধীই ছেলেগুলোকে নষ্ট করে ছাড়বে, ছেলেগুলোর মাথা খাবে, আমি নীহারকে তাই-ই বলেছি।

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা খবরটা কার কাছে শুনলে? তোমার কৈলাস খুড়োর কাছে নাকি?

হরবিলাস যা বললে তা খুবই ভয়ংকর ব্যাপার।

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে পলিশের কর্তা নারায়ণগঞ্জে আর একজন পলিশের বড়কর্তাকে দেখতে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল আর একজন পুলিশের কর্তা। হঠাৎ পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে কে একজন রিভলবার থেকে গুলি মারলে বড়ো সাহেবকে লক্ষ্য করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপরই মৃত্যু।

—সে কী? কবে?

—আজ্ঞে, কাল।

মুকুন্দবাবুর মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। তাহলে বাঙালীদের কী হবে?

আর শুধু বাঙালীই নাকি, সারা দেশে তো এই রকমই কাণ্ড চলছে। কোথায় কানপুর, কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় পুনা, সব জায়গাতেই তো কালোরা সাহেবদের মারছে! এই দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে? কী করে থামবে?

মুকুন্দবাবু বললেন, যাক্ গে, সব গোল্লায় যাক, আমি আর ভাবতে পারি নে। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার তো তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমি তো কেবল আমার ছেলেটার কথা ভাবি। তার জন্যেই আমার যতো ভাবনা—যাক্ গে, আজকে কী তাহলে পশ্চিমের মাঠে কাজ শুরু করবে?

হরবিলাসই মকুন্দবাবর ভরসা। হরবিলাস যতোদিন কাজ করতে পারবে ততোদিনই মুকুন্দবাবু মাথা সোজা করে থাকতে পারবেন। তারপর? তারপরের কথা আর তিনি ভাববেন না। তখন দেবু যা পারে করবে আর না পারে তো সব কিছুই গোল্লায় যাবে।

খানিক পরে হরবিলাসও চলে গেল। মুকুন্দবাবুও তৈরি হতে লাগলেন তাঁর দৈনন্দিন কাজের ধান্দায়। রোজই তাঁর কাজের চাপ থাকে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেই তিনি মুক্তি পান।

পরের দিন স্কুলে যেতেই কানাই কাছে এলো।

গলাটা নামিয়ে বললে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে রে দেবু—

—আমার সঙ্গে? কী কথা?

—পরে বলবো। খুব জরুরী কথা!

বলে অন্য দিকে চলে গেল।

দেবুর মনে হলো কী এমন কথা যা সকলের সামনে বলা যায় না!

কিন্তু তারপরে আর কানাই-এর পাত্তা পাওয়া গেল না। কোথায় যে সে গেল তা আর কেউ বলতে পারলে না।

যখন স্কুল বন্ধ হওয়ার সময় হলো তখন কানাই কাছে এলো।

দেবু বললে, কীরে, কোথায় ছিলিস্ তুই?

কানাই বললে, খুব ঝামেলায় পড়েছি রে—

—কীসের ঝামেলা?

—সে পরে বলবো।

দেবু বললে, পরে বললে চলবে না, এখনই বল্ তুই।

তবু কানাই বলতে রাজি হলো না।

তার সেই এক কথা, সে পরে বলবো।

—কেন? পরে বলবি কেন?

কানাই-এর দু'চোখে কেমন একটা ভয়েব ছবি ফুটে উঠলো। বললে, নারে, খুব ঝামেলা রয়েছে। আমার মনটা খুব খারাপ।

—কেন?

কানাই বললে, সে তোকে পরে বলবো।

—আবার পরে কেন?

—এখন এখানে কেউ শুনতে পাবে। তোকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলবো।

দেবুর তখন আর দেরি সইছে না। সারাদিন কানাই আর ক্লাসেই এলো না। সে যে কী নিয়ে এত ব্যস্ত, তাও দেবু বুঝতে পারলে না। কীসের ঝামেলা তার?

তারপর যখন স্কুলের ছুটি হলো, তখন দেবু বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েও বাড়ির দিকে যেতে পারলে না। যখন ছেলেদের ভিড় একটু পাতলা হয়ে এলো তখন দেখলে দূর থেকে কানাই দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

কাছে আসতেই দেবু জিজ্ঞেস করলে, কীরে, তোর ব্যাপারটা কী?

কানাই বললে, বলছি, আগে বল্ তুই কাউকে বলবি না?

দেবু বললে, না, কথা দিচ্ছি কাউকে কিছু বলবো না।

কানাই বললে, ঢাকাতে কী হয়েছে জানিস?

—না।
—ঢাকা পুলিশের আই-জি লোম্যান সাহেব পিস্তলের গুলিতে খুন হয়েছে।
—সে কী? কে খুন করলে?
—বিনয়দা!
—বিনয়দা?
কানাই বললে, কথাটা শোনার পর সারাদেশে হই-চই পড়ে গিয়েছে। তারপর একটু থেমে বললে, কাউকে যেন এ-সম্বন্ধে কিছু বলিসনি!
—কিন্তু কী করে মারলে রে বিনয়দা?
কানাই বললে, পিস্তল দিয়ে। খবরের কাগজে নাকি সব বেরিয়েছে, পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে ঠিক মানুষটাকে মারা কি সোজা?
দেবু জিজ্ঞেস করলে, কখন মারলে? সকালে না বিকেলে?
—আরে সকাল ন'টা পনেরো মিনিটের সময়।
—কী করে বিনয়দা খবর পেলে যে পুলিশের কর্তা ওই সময়ে মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে আসবে?
কানাই বললে, আরে বিনয়দা তো একলা নয়, ওদের দলে তো আরো অনেক ছেলেরা আছে, তারাও তো সবাই তোর মতো ঠাকুরকে ছুঁয়ে দেশের কাজ করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছে—তারাই খবর এনে দিয়েছিল লোম্যান সাহেব আর হাডসন্ সাহেব দু'জনেই ওই দিন ওই সময়ে হাসপাতালে আসবে—
—তারপর?
—তারপর বিনয়দা দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে তক্কে-তক্কে ছিল। যেই লোম্যান হাডসন্ সাহেবের সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাসপাতালের বাগানে এসে ঢুকেছে, তখ্‌খুনি বিনয়দা দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে গুলি ছুঁড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে লোম্যান সাহেবের বুকে দু'টো গুলি লাগতেই একেবারে মাটিতে পড়ে গেল, আর হাডসন্ সাহেবের গায়েও লাগলো তিনটে গুলি।
—লোম্যান সাহেবটা কে?
কানাই বললে, লোম্যান হচ্ছে ঢাকার পুলিশের ইন্‌স্পেকটার জেনারেল, আর হাডসন্ হচ্ছে ঢাকার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট।
—তারপর?
—তারপর শুনলাম আজ সকাল ন'টা পনেরো মিনিটে মারা গেছে। অনেক চেষ্টা করেও নাকি তাকে বাঁচানো গেল না।
দেবু জিজ্ঞেস করলে, আর বিনয়দা?
কানাই বললে, শুনলুম একজন ঠিকেদার সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব ঘটনাটা দেখছিল। সে বিনয়দার পেছন-পেছন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। কিন্তু ফিজিক্যাল-একসারসাইজ করা মানুষ বিনয়দার সঙ্গে বুড়ো পারবে কেন? বিনয়দা এক হ্যাঁচকা টানে লোকটার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে।
তারপর একটু থেমে কানাই আবার বললে, এ-সব কথা যেন কাউকে বলিসনি তুই।
দেবু বললে, আমি তো প্রতিজ্ঞাই করেছি যে জীবনে কখনও কাউকে এ-সব কথা বলবো না।
—না, কাউকে বলিসনি। সে তোর বাবা হোক আর মা-ই হোক, কাউকেই কখনও তুই বলিসনি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত দেখলাম সবই জানে। শুধু যে দেবব্রত সরকারকে চেনে তাই-ই নয়, সে-যুগের দেশের সমস্ত ইতিহাসটাই জানে। কেমন করে কী অবস্থার মধ্যে দেবব্রতর চরিত্রটা গড়ে উঠেছিল, কোন অবস্থার মধ্যে সে জন্মেছিল, কাকে আদর্শ করে সে বড়ো হয়ে উঠেছিল, সমস্তই তার জানা ছিল।

মাঝে-মাঝে দেবব্রত কলকাতায় আসতো তার দূরসম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে। দূরসম্পর্ক হলেও আপন কাকার মতো। কাকা ছিলেন একটা স্কুলের হেডমাস্টার। কাকীমা মারা গেছেন। সংসারে বলতে গেলে তিনি একলাই। গোলকেন্দু সরকারের নাম বললেই সবাই এক ডাকে তাঁকে চিনতে পারবে।

সবাই বলবে, ও, আমাদের হেডমাস্টারমশাই-এর কথা বলছেন? এখান দিয়ে সোজা চলে যান, সোজা গিয়ে প্রথম ডান দিকে গিয়ে চার নম্বর বাড়িটাই হলো হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি। সেই বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়বেন, কড়া নাড়লেই দেখবেন একজন লোক বাইরে আসবে। সে হলো ওঁর চাকর গোষ্ঠ। তাকেই মাস্টারমশাই-এর কথা বলবেন। সে আপনাকে বসতে বলবে।

গরমের ছুটিই হোক আর পুজোর ছুটিই হোক, দেবব্রত স্কুলের ছুটি হলেই সোজা চলে আসতো এই কাকার বাড়ি। এখানে এসে কিছুদিন থাকতো আর ছুটি ফুরোলেই আবার চলে যেত তার নিজের দেশে দৌলতপুরে।

আসবার সময়ে দেবু দৌলতপুরের নলেন-গুড়ের পাটালি বা চাকভাঙা মধু নিয়ে আসতো কাকার জন্যে। সে-সব খাঁটি জিনিস কলকাতায় পাওয়া যেত না। গোষ্ঠ তাই-ই খেতে দিত কাকাকে। কাকার প্রাণ পড়ে থাকতো যশোরে। কিন্তু পেশা ছিল কলকাতায়। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তাঁর স্কুলের ছাত্রদের জন্যে তিনি কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিলেন।

রিটায়ার করবার পর মুকুন্দবাবু চিঠি লিখেছিলেন কাকাকে। লিখেছিলেন, এখন আর কলকাতাতে থেকে কী হবে, তুমি এখানে চলে এসো। আমি একলা এত সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারছি না। তুমি এখানে এলে আমার ঝামেলা একটু কমবে। কলকাতায় সারা জীবন থেকে কী লাভ? এখানকার জল-হাওয়া ভালো। কলকাতার চেয়ে জিনিসপত্র এখানে অনেক সস্তা। সারা জীবনই তো তুমি পরিশ্রম করলে, এবার এখানে এলে তবু একটু বিশ্রাম হবে।

কিন্তু কাকা দেশে যেতে চাননি। বাবার চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, আমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এখনও আমাকে এখানে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। ছেলেদের মানুষ করে তোলা আমার জীবনের ব্রত। যতোদিন প্রাণে এক বিন্দু রক্ত আছে ততোদিন তাদের ভালোর জন্যে তা পাত করতে চাই। জীবনে আমার আর কোনও কামনা-বাসনা নেই।

এই গোলককাকার বাড়িতেই দেবুর সঙ্গে বঙ্কুর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। শুধু বঙ্কু নয়, বঙ্কু ছাড়া আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল তার। কিন্তু বঙ্কুর সঙ্গেই একটু ঘনিষ্ঠতাটা বেশি হয়েছিল তার।

বঙ্কু থাকতো একটু দূরে। বঙ্কুর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেবুর বেশি ভালো লাগতো। বঙ্কু যখন পড়া শেষ করে বাড়ির দিকে যেত, তখন দেবুও তার সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে-হেঁটে গল্প করতে করতে যেত।

প্রথম যখন দেবু কলকাতায় এসেছিল তখন চারদিকে যা দেখতো তাই দেখেই অবাক হয়ে যেত। এখানকার ট্রাম, এখানকার দোতলা বাস, এখানকাব ইলেকট্রিক আলো, এখানকার কলের জল সমস্তই তার বিস্ময় উদ্রেক করতো। তারপর দেখতো এক অদ্ভুত জিনিস। দেখতো কী একটা সাদা রং-এর জিনিসের মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে তাতে টান দিত আর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোত।

দেবু যখন প্রথম দৌলতপুর থেকে কলকাতায় এসেছিল তখন কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কাকা, ওই সাদা-সাদা জিনিসগুলো কী? মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়?

কাকা বলেছিল, ওর নাম সিগারেট, ও-সব বদমাইশ লোকেরা খায়। ওটা যেন কখনও খেও না তুমি!

—কেন, খেলে কী হয়?

—খেলে অসুখ হয।

—ওটা তো সাহেববাও খায়। তাহলে কি সাহেবরাও বদমাইশ?

কাকা বলেছিল, সাহেববা ভালো লোক তা কে বললে তোমায়?

এর পরে যখন আরো বয়েস হয়েছে তখন বুঝেছে যে, ওই সাহেবরা সত্যিই বদমাইশ লোক। সে কথা দৌলতপুরের সুলতান সাহেব বলেছে, কানাইও বলেছে, বিনয়দাও বলেছে। সেই জন্যেই তো বিনযদা ঢাকার পুলিশের সবচেযে বড কর্তা লোম্যান সাহেবকে পিস্তলের গুলিতে মেবে ফেলেছে। সেই কথা ভেবেই তো বিনয়দার 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র ছেলেরা নিজেদের জীবন বলিদান দেবার প্রতিজ্ঞা করেছে।

ওই কাকাব বাড়িতেই বঙ্কুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে দেবু জানতে পেরেছিল যে তাদের বাড়িতে অনেক ভালো-ভালো বই আছে।

দেবু বলেছিল, আমাকে একটা বই পড়তে দিবি?

বঙ্কু বলেছিল, কী বই?

—অশ্বিনীকুমার দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ'।

বঙ্কু অশ্বিনীকুমার দত্তের নামও শোনেনি। বললে, আমি খুঁজে দেখবো, যদি থাকে তো তোকে পড়তে দেব।

তারপর একদিন এসে বললে, বইটা পেয়েছি রে, কিন্তু বাবা বই বাইরে নিয়ে যেতে আপত্তি করেছে। আমাব বাড়িতে গিয়ে তুই পড়ে আসতে পারিস।

সেই সূত্রেই দেবু বঙ্কুদের বাড়ি গিয়েছিল। প্রথম দিনেই বঙ্কু তার দু'পায়ে দু' রং-এর জুতো পরা দেখেই বুঝে গিয়েছিল দেবু কী ধরনেব পাগল ছেলে। পাগল তো সংসারে হাজার-হাজার রকমের আছে। দেবব্রতর মতো পাগল বোধহয় কমই আছে।

ওই বঙ্কুই একদিন সিগারেট খাচ্ছিল। সেদিকে দেবুব নজর পড়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবেছিল, তুই সিগারেট খাস?

বঙ্কু বলেছিল, হ্যাঁ, কারুর সামনে খাই না, লুকিয়ে-লুকিয়ে খাই।

দেবু বলেছিল, তাহলে এটা বুঝিস যে সিগারেট খাওয়াটা অন্যায়, নইলে লুকিয়ে-লুকিয়ে খাস কেন?

বঙ্কু বলেছিল, ন্যায়-অন্যায় বুঝি না, খেতে ভালো লাগে তাই খাই।

দেবু বলেছিল. কিন্তু বদমাইশ লোকেরাই তো সিগারেট খায়।

—কে বলেছে?

—কে আবার বলবে, আমার কাকা বলেছে।

বন্ধু বলেছিল, দূর, বাজে কথা। আমি কতো বড়-বড় লোককে সিগারেট খেতে দেখেছি। আর তাছাড়া সাহেবরাও তো খায়।

দেবু বলেছিল, তা সাহেবরা কি ভালো লোক? সাহেবরা তো সবচেয়ে বদমাইশ!

—কী বলছিস তুই? সাহেবদের কতো টাকা বল্ দিকিনি! ওরা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বড়লোক। নইলে আমাদের দেশের তিরিশ কোটি লোককে এমন করে স্লেভ করে রেখে দিতে পারে?

এর পরে দেবু বন্ধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে।

বন্ধু বললে, সত্যিই তুই একটা আস্ত পাগল! নইলে সেদিন এক পায়ে সাদা জুতো আর এক পায়ে কালো জুতো কেউ পরে?

দেবু বললে, পাগল বলেই তো আমি সিগারেট খাই না। যা সবাই করে আমি তা করি না, কখনও করবোও না। ওই যে চাটগাঁয় মাস্টারদা সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিলে, ওই যে বিনয়দা. বাদলদা, দীনেশদা, লোম্যান সিম্সন সাহেবকে খুন করে মরলো, ওরাও তাহলে পাগল। ওরা কেন প্রাণ দিলে? চাকরি নিয়ে বিয়ে-থা করে সংসার করলেই পারতো। যেমন আর সবাই করে। তাহলে তো ওরাও পাগল। আমি তো পাগলই হতে চাইছি, কিন্তু পাগল হতে পারছি কই?

এ-কথার পর বন্ধু আর কী বলবে, চুপ করে রইল!

দেবু বলেছিল, ঠিক আছে, সবাই সিগারেট খাচ্ছে তাই তুইও সিগারেট খা। সবাই চাকরি-বাকরি করে তুইও কর গিয়ে। সবাই বিয়ে-থা করে সংসার করে, তুইও তাই করিস গিয়ে। আমি ভাই সবাই যা করে তা করতে চাই না।

—তাহলে তুই বড় হয়ে জীবনে কী করবি?

দেবু বলেছিল, আমি? আমার কথা বলছিস?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোর কথাই বলছি।

দেবু বলেছিল, আমি চেষ্টা করবো পাগল হতে।

—পাগল হতে? বলছিস কী?

দেবু বলেছিল, হ্যাঁ, কতো লোক তো কতো কী হয়েছে। কেউ জজ হয়েছে, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, কেউ হাকিম হয়েছে, কেউ ব্যারিস্টার, এ্যাডভোকেট, উকিল হয়েছে, কেউ আই. সি. এস., আই. পি. এস., আই. এ. এস. প্রফেসার, টিচার হয়েছে, কেউ বা মহান্ত, সাধু, স্বামীজী হয়েছে, কেউ বা আবার হিমালয়ে গিয়ে বৈরাগী, বাবাজী, গুরুজী হয়ে আশ্রম খুলেছে, আবার কেউ বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, কবি হয়েছে। একজন সে-সব কিছু না-ই বা হলো। আমি না-হয় পাগলই হলাম। সত্যিকারের পাগল হওয়াও তো শক্ত! দেখিই না চেষ্টা করে আমি পাগল হতে পারি কিনা।

তারপর পৃথিবীতে কতো কাণ্ড হয়ে গেল। ১৯০১ সালে বুয়োর ওয়ার শেষ হওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে। পৃথিবীর সমস্ত লোক হাঁ করে অপেক্ষা করছে, কী হয়, কী হয়! তারা বলতে লাগলো, যদি এই যুদ্ধে জাপান হারে তো সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ড য়ুরোপীয় শক্তিদের কব্জায় চলে যাবে। আর তারাই তখন সমস্ত এশিয়ার প্রভু হয়ে পুজো

পাবে, শ্রদ্ধা পাবে, সম্মান পাবে। আর রাশিয়া যদি হারে তো এশিয়ার দেশগুলো নতুন সঞ্জীবনী শক্তি পেয়ে আবার নতুন করে বেঁচে উঠবে আর সব রকম সর্বনাশ থেকে তারা চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে যাবে।

যে-পত্রিকা এ ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিল তার নাম "দ্য কার্জন গেজেট", আর তার তারিখটা হলো ১৯০৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী।

আর ঠিক ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সালেই সরকারিভাবে সেই জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হলো। আর ঠিক সেই দিনই জাপানী টর্পেডো রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজগুলোর ওপর হামলা করে সেগুলো ডুবিয়ে দিলে আর পোর্ট-আর্থারের মতো অতো বড়ো বন্দরটার ওপরও হামলা করে সেটা গুঁড়ো করে দিলে।

সেদিন এশিয়ার সমস্ত ভূখণ্ডের মানুষ এই খবরে আশা পেলে, ভরসা পেলে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে। তারা আনন্দে নেচে উঠলো। বিশেষ করে ইণ্ডিয়ার মানুষরা। তাহলে তো তাদের হতাশ হওয়ার আর কিছু নেই। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ তারিখে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় লেখা হলো—'সমস্ত ভারতবাসী, বিশেষ করে সমস্ত বাঙালী সমাজ আজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন জাপান এই যুদ্ধে জয়ী হয়, যেন সূর্য আবার আমাদের এই পূবের আকাশেই উদিত হয়।'

আর ঠিক তাই-ই হলো।

সেইদিন থেকেই বলতে গেলে পূবের আকাশে সূর্যোদয় শুরু হলো। আর এক-এক করে উদয় হতে লাগলো হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ সূর্যের। অরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সূর্য সেন, আর তারপর মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোস আর বিনয়-বাদল-দীনেশ আর সকলের শেষে এই গল্পের প্রাণ-পুরুষ দেবব্রত সরকার!

সেই দীর্ঘ তালিকায় সকলের নামই আছে, কিন্তু আমাদের দেবব্রত সরকারের নাম কোথাও নেই। দেবব্রত সরকারের নাম চিরকালের মতো মুছে গেছে। শুধু জানে এক এই সুপ্রভাত।

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। পরের কথা পরে বলাই তো নিয়ম। তাহলে আগে বলছি কেন? তাই তার আগেকার কথাই আগে বলি—

দেবব্রত তখন স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠেছে। কলেজ থেকে পাশও করে ফেলেছে। পাশ করার পরই একদিন বাবা তাকে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এবার কী করবে? কোন্ লাইনে যাবে? ডাক্তারি পড়বে তুমি? আমার মনে হয় তোমার পক্ষে ডাক্তারি পড়াটাই ভালো।

দেবব্রত বললে, না, ডাক্তারি পড়বো না আমি।

বাবা বললেন, না-না, ডাক্তারিই পড়ো তুমি। ওতে অনেক মানুষের উপকার করতে পারবে। আমাদের গ্রামে ভালো ডাক্তার তো নেই। আর তা ছাড়া ওতে তোমার আয়ও হবে অনেক।

দেবব্রত বললে, আমার যদি বেশি টাকা আয় হয় তো তাতে দেশের লোকের কী উপকার হবে?

বাবা বললেন, দেশের লোকের অসুখের সময় কেউ কোনও ডাক্তার পায় না। তাদের তুমি চিকিৎসা করতে পারবে।

দেবব্রত বললে, তাদের জন্যে তো সরকারি হাসপাতাল আছে। অসুখের সময়ে তারা সেখানে যাবে। তারা সেখানে বিনা পয়সায় ওষুধ পাবে, বিনা পয়সায় ডাক্তার পাবে।

বাবা বললেন, তুমি যদি তা-ই ভাবো তাহলে না হয় তুমি ডাক্তারি পাশ করে সরকারি হাসপাতালে চাকরিও নিতে পারো।

বাবার কথা শুনে দেবব্রতর মুখে কেমন একটা ঘৃণা-রাগ-বিতৃষ্ণার চিহ্ন ফুটে উঠলো। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করে নিলে। বললে, আমি খেতে না পেয়ে মরবো তবু ইংরেজদের দেওয়া চাকরি করবো না।

—কেন ইংরেজরাই তো আমাদের দেশের রাজা। তারাই তো আমাদের দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাদের নুন খাচ্ছো আর তাদের চাকরি করতেই যতো দোষ? যার খাচ্ছো তাদেরই তুমি দোষ দিচ্ছ? ইংরেজরা অন্যায়টা কী করলে?

কথাগুলো শুনে দেবব্রতর সমস্ত শরীরটা রাগে-ঘৃণায়-ক্ষোভে রি-রি করে উঠলো। মনের সেই রকম ক্ষুব্ধ অবস্থাতেই উত্তেজিত হয়ে বললে, আপনি ইংরেজদেব অন্যায়ের কথা তুলছেন? আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না ইংরেজরা কী অন্যায় কবছে? ইংরেজরা কি কখনও আমাদের দেশে একটা ভালো কাজ করেছে? ইংরেজরা আমাদের দেশের লোকের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে নিজেরা আরাম করবার ব্যবস্থা করেনি? আমরা কী এমন দোষ করেছি যে, মুখে 'বন্দেমাতরম্' বললেই ইংরেজদের বন্দুকের গুলি খেয়ে মরতে হবে? ইংরেজরা আমাদের দেশের তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে কেন তাদের দেশের ম্যানচেস্টারের কলের তৈরি ধুতি-শাড়ি পরতে বাধ্য করবে? তাতে তাদের দেশের লোকরা বেশি টাকা উপায় করে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু তাব জন্যে আমরা কেন না-খেতে পেয়ে মরবো? আমরা কি মানুষ নই? যে-নুন এক পয়সায় কিনতে পাওয়া যায়, তা কেন দশ পয়সা দিয়ে কিনতে হবে? কেন নুনের ওপর ইংরেজরা ট্যাক্স বসাবে? রেলগাড়িতে যে-কামরায় ইংরেজরা চড়বে সে-কামবায় আমরা কেন উঠতে পারবো না? কালো বলে কি আমরা মানুষ নই? আমরা কি গরু-ভেড়া-ছাগল? গায়ের চামড়া কালো বলে কি আমাদের রক্তের বংও কালো আর সাহেবদের গায়ের চামড়ার রং সাদা বলে কি তাদের রক্তের রংও সাদা?

মুকুন্দ সরকার তাঁর ছেলেকে চিনতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখে এসেছেন সে যেন দেশের অন্য ছেলেদের মতোন নয়, একটু অন্যরকম। বিলিতি কাপড় দেবু ছোটবেলা থেকেই কখনও পরেনি। খদ্দরের কাপড় জামা পরেই কাটিয়ে এসেছে। এখনও তাই আবার কয়েক মাস ধরে সে চরকায় নিজের হাতে সুতোও কেটেছে। শুধু যে কাপড় জামা তা নয়। ঘড়িও বিলেতে তৈরি হয় বলে সে কখনও হাতে ঘড়িও পরেনি।

কিন্তু সামান্য ডাক্তারি পড়া নিয়ে কথা পাড়তে গিয়ে যে সে এমন রেগে যাবে তা মুকুন্দবাবু বুঝতে পারেননি। তবু বললেন, এতই যদি তোমার সাহেব লোকদের ওপর রাগ তা হলে তো তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। তারা তো আর এ-দেশ ছেড়ে যাবে না কখনও—

দেবু বললে, কে বললে যাবে না?

বাবা বললেন, আমি বলছি যাবে না। এবার যদি আবার জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে তো তখন দেখো ইংরেজদের হাতে জার্মানীর কী হাল হয়—তখন দেখবে ইংরেজরা এ-দেশের ওপর আরো জেঁকে বসবে।

দেবু বললে, ইংরেজরা সে-যুদ্ধে জিতুক আর হারুক তাতে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। একদিন-না-একদিন আমরা এদেশ থেকে ইংরেজদের মেরে তাড়াবোই তাড়াবো।

বাবা বললেন, তোমাদের হাতে বন্দুক আছে না পিস্তল আছে শুনি যে তোমরা তাদের মারবে? ওই তো চাটগাঁয় সূর্য সেন না কে একজন ছোকরা চেষ্টা করলো, তাতে কী ফল হলো? গোটাকতক পাগল শুধু মিছিমিছি প্রাণ দিলে পুলিশের বন্দুকের গুলিতে! হাজার-হাজার নিরীহ লোক জেলে গেল!

দেবু বললে, মিছিমিছি প্রাণ দিলে না সত্যি-সত্যি প্রাণ দিলে তার বিচার করবে ইতিহাস। আপনি আমি তার বিচার করবার কে?

—ইতিহাস মানে?

দেবু বললে, সে আপনি বুঝবেন না—

বাবা এবার রেগে গেলেন। বললেন, আমি বুঝবো না আর বুঝবে তোমাদের বুড়ো গান্ধীটা? ও বুড়োটা ব্যারিস্টারি পাশ করেছে বলে একেবারে মস্ত বোঝদার মানুষ হয়ে পড়েছে নাকি! ওই বুড়োটাই তো বলেছিল যে তার কথামতো চললে দশ বছরের মধ্যে সে স্বাধীনতা এনে দেবে। তা সে দিতে পারলে? ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চলে গেল? স্বাধীনতা এলো?

দেবু বললে, তা আপনারা কি তাঁর কথা পুরোপুরি মেনেছিলেন? কেউই কি মেনেছিল?

বাবা বললেন, আমরা তো পাগল নই যে তার কথা মানবো। তার কথা মেনে মিছিমিছি কয়েক হাজার ছেলে ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে বেকার হয়ে গেল। তাদের যে লোকসান হলো সে-লোকসানের ক্ষতিপূরণ কে দেবে? তুমিও তো তখন ইস্কুলের লেখা-পড়া বন্ধ করতে চেয়েছিলে। সেদিন যদি তুমি গান্ধীটার কথা শুনতে তাহলে কী সর্বনাশটা হতো বলো দিকিনি! আমিই তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলুম, তাই তুমি আজকে মানুষ হলে। নইলে অন্য ছেলেদের মতো তুমিও তো গোল্লায় যেতে।

হঠাৎ মা ঘরে ঢুকে পড়লেন। মুকুন্দবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, কী হলো তোমাদের? খোকাব সঙ্গে এত ঝগড়া করছো কেন? কী নিয়ে তক্কো হচ্ছে?

বাবা বললেন, সে তুমি বুঝবে না। ও বলছে ও ডাক্তারি পড়বে না।

মা ছেলেব দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন বে, ডাক্তাবি পড়বি না কেন?

মুকুন্দবাবু বললেন, ডাক্তার না হয়ে ও সূর্য সেন হবে, মাস্টারদা হবে, বিনয়-বাদল-দীনেশ হবে। হয়ে ইংরেজদের খুন করে তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। দেশ স্বাধীন করবে তোমার ছেলে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, এত বাক-বিতণ্ডা সেই দেবব্রত হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। বললে, না, আমি ও-কথা বলিনি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—আমি মিথ্যেবাদী? আমি মিথ্যে কথা বলছি?

—হ্যাঁ, আমি ও-কথা বলিনি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। হঠাৎ নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দিয়ে দিলে। আর কোনও কথার জবাব দিলে না সে।

বাইরে থেকে মা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

—ওরে খোকা, খোকা, শোন, আমার কথা শোন...

তবু ভেতর থেকে দেবুর কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তবু মা দরজার গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকতে লাগলেন, ওরে খোকা, রাগ করিস নে, শোন্, খোকা...

সব সংসারেই ছোটো-খাটো ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয়, মতানৈক্য হয়, মত-বিরোধিতাও হয়। কিন্তু আবার কিছুদিন পরে তা মিটেও যায়। এই-ই নিয়ম। এই নিয়মেই তো এতদিন ধরে সব মানুষের সংসার চলে আসছে। হয়তো এই নিয়মেই আরো কোটি কোটি বছর মানুষের সংসার চলে আসবে।

কিন্তু দেবব্রত তো সাধারণ মানুষ নয়। তাই ক্রমে ক্রমে মকুন্দবাব যে-ভয়টা দেবুর ছেলেবেলা থেকে করে আসছিলেন, তাই-ই সত্যি হলো। দেবব্রত সরকার সত্যিই তার নিজের মতো নিজের ইচ্ছে নিয়ে অনড় অটল হয়ে রইলো। কারোর কোনও উপরোধে বা অনুরোধে সে টললো না। কেউ তাকে টলাতে পারলে না। কেউ টলাতে পারবেও না।

যশোরের সে-সব দিনের কথাও সুপ্রভাত জানে।

'চরিত্র-গঠন শিবির' তখন উঠে যাওয়ারই কথা—কারণ তখন শুধু যে সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব মারা গেছেন তাই-ই নয়, তখন ইণ্ডিয়ার সব শহরেই ওই 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র মতো সব প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। সবাই চাইছে যে ইণ্ডিয়াতে এমন সব ছেলে তৈরি হোক যারা চরিত্রের দিক থেকে আদর্শ হবে, যারা একদিন বড়ো হয়ে আদর্শের জন্যে জীবন দিতে পারবে।

বাড়িতে যিনি রোজ পড়াতে আসতেন সেই বেণীমাধববাবুও তখন চাকরি নিয়ে কোথায় চলে গেছেন। সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের অসমাপ্ত কাজটা তখন দেবব্রত সরকারের কাঁধে এসেছে।

মুকুন্দবাবুরও তখন বয়েস বেড়ে গেছে। তিনি তখন আর আগেকার মতো কাজকর্ম দেখতে পারেন না।

কলকাতা থেকে গোলকেন্দু সরকার প্রায়ই দাদাকে চিঠি লেখেন—এখন দেবু কী করছে? দেবু কি চাকরি-বাকরি কিছু করছে?

মুকুন্দবাবু সে চিঠির উত্তরে লেখেন—আমার কোনও কথাই তো খোকা শুনলো না। ডাক্তারি পড়তে বললাম, তা-ও সে পড়লে না। এখানকার একটা স্কুলে ও পড়ায়, আর তারপর ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়ায়। তাদের কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সাও নেয় না। ওকে নিয়ে আমি যে কী করি তাই দিন-রাত ভাবি।

শুধু বাবা বা মা-ই নয়, দেবব্রতর সংস্পর্শে যারাই এসেছে তারাই সারাজীবন শুধু জ্বলে-পুড়েই মরেছে!

হরবিলাস তখনও আসতো। জিজ্ঞেস করতো, আজ কি বিলের ধারে জমিটাকে চাষ দেওয়াবো কর্তা?

মুকুন্দবাবুর তখন খুব শরীর খারাপ। শেষ জীবনটাতে তাঁর যে এমন অবস্থা হবে, তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তিনি বলতেন, আমাকে আর ওসব কথা জিজ্ঞেস করো না হরবিলাস। তুমি যা পারো নিজেই করো গে—

হরবিলাস অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক। জন-মজুর খাটানোর কাজে সে খুব রপ্ত। সে জানে কোন্ মাসে কোন্ মাঠে কী ফসল বুনতে হবে, কী সার দিতে হবে, কবে জমিতে নিড়েন দিতে হবে, তা হরবিলাসের মতো মুকুন্দবাবুও জানতেন না।

—কী হলো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে?

হরবিলাস বলতো, আপনি কিছু আদেশ না দিলে আমি যাই কী করে?

আচ্ছা, তুমি একবার ছোটবাবুর কাছে যাও না—

ছোটবাবু মানে দেবব্রত। হরবিলাস ছোটবাবর ঘরে গিয়ে দেখে ঘরে কেউ নেই। ছোটবাবুকে না দেখতে পেয়ে হরবিলাস আবার ফিরে এলো। বললে, না, ছোটবাবু তো ঘরে নেই কর্তা।

ঘরে নেই? এত সকালে খোকা আবার কোথায় গেল? তারপর বিছানা থেকে উঠে ভেতর বাড়িতে গেলেন। গৃহিণী দেখতে পেয়ে বললেন, কী হলো? কী চাই?

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, খোকা কোথায় গেল? তুমি জানো কিছু?

গৃহিণী বললেন, সে তো বাড়িতে নেই।

—বাড়িতে নেই? কোথায় গেল?

—সে তো কাল রাত্তির থেকেই নেই—আমাকে বলে গেছে সে।

মুকুন্দবাবুও বললেন, তোমাকে বলে গেলেই হলো? আমি কি কেউ নই? তুমিও তো আমাকে কিছু বলোনি? কী বলে গেছে সে?

গৃহিণী বললেন, মুচিপাড়ায় কার বাড়িতে নাকি কলেরা হয়েছে, তাকেই দেখতে গেছে।

—মুচিপাড়ায়? মুচিপাড়ায় কোনও ভদ্দরলোক যায়? সেখানে ওকে কে যেতে বললে? আর গেলই যদি রাত্তিরে বাড়ি ফিরলো না কেন?

গৃহিণী আর কী-ই বা বলবেন।

মুকুন্দবাবু বললেন, তা তোমাকে না বলে আমাকে বলে গেলে কী হতো? তুমি বাড়ির কর্তা না আমি বাড়ির কর্তা? আমাকে বলে গেলে কী ক্ষতিটা হতো?

মুকুন্দবাবু এরপর আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাগে-অভিমানে-ক্ষোভে গজগজ করতে-করতে আবার নিজের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

হরবিলাস তখনও হুকুমের অপেক্ষায় একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে নজর পড়তেই বললেন, তা তুমি আবার ঠুঁটো জগন্নাথের মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও তুমি কাজ করো গিয়ে।

—আজ্ঞে, আপনি আদেশ না দিলে...

আমি? আমি আদেশ না দিলে তুমি এখানে হাত কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকবে? কিন্তু আমি কে? বলো আমি কে?

হরবিলাস কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁডিয়ে রইলো।

মুকুন্দবাবু গলাটা উঁচু করে বললেন, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? তোমার কান কি কালা হয়ে গেল নাকি? বলো আমি কে?

হরবিলাস বললে, আজ্ঞে, আপনিই তো এ-বাড়ির কর্তা! আপনার আদেশ না পেলে...

—না-না-না, আমি এ-বাড়ির কেউ নই! আমি এককালে এ-বাড়ির কর্তা ছিলুম, কিন্তু এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এখন আমি আর এ-বাড়ির কর্তা নই। তুমি তোমার মা-ঠাকরুণের কাছে যাও, এ-বাড়ির কর্তা এখন মা-ঠাকরুণ! তাঁর হুকুমেই এ-বাড়ির কাজকর্ম চলবে। আমি কেউ নই..যাও তুমি এখান থেকে, চলে যাও—

বলে মুকুন্দবাবু পাশ ফিরে অন্য দিকে মুখ ফিরে শুলেন!

হরবিলাস তখন আর কী করবে বুঝতে পারলে না। অনেকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যখন দেখলে যে কর্তামশাই-এর তরফ থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই তখন ভেতর বাড়িতে গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে ভেতরে গেলেই উঠোন। উঠোনের মধ্যেই কুয়ো। সেই কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে তখন রাধু ঝি জল তুলছিল। তার পশ্চিম দিকে গোয়াল। গোয়ালের সব গরুদের নিয়ে রাখাল তখন চরাতে যাচ্ছে।

হরবিলাস উঠোনে গিয়ে ডাকলে, মা-ঠাকরুণ—

রাধু হরবিলাসকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কাকে ডাকছো বিশ্বাসমশাই—

হরবিলাস বললে, মা-ঠাকরুণকে একবার আমার পেন্নাম দাও তো রাধু—

উত্তর দিকে রান্না-বাড়ি। রান্না-বাড়ির মাথার ওপর একটা কলকে ফুলের গাছ। গাছের ডালে একটা খাঁচা ঝুলছে। খাঁচার পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে আরম্ভ করলো—ও মা-ঠাকরুণ, মা-ঠাকরুণ—

ডাক শুনেই মা-ঠাকরুণ বেরিয়ে এলেন।

বললে, কী খবর হরবিলাস, কী বলছো? আমাকে ডাকছিলে?

হরবিলাস হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গী করে বললে, মা-ঠাকরুণ, আমি কর্তার কাছে কাজের আদেশ চাইতে গিয়েছিলাম, তা তিনি বললেন তিনি বাড়ির কর্তা নন, ছোটবাবুর কাছে যেতে বললেন। কিন্তু ছোটবাবু তো বাড়িতে নেই। তিনি মা-ঠাকরুণের কাছে যেতে বললেন, তাই আমি আপনার কাছে কাজের আদেশ চাইতে এসেছি।

সব শুনে মা-ঠাকরুণ বললেন, না-না, উনিই বাড়ির কর্তা। আমি কেউ নই। তুমি কর্তার কাছেই যাও। উনি রাগ করে ও-কথা বলেছেন।

—না মা-ঠাকরুণ, উনি পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুলেন, আমার কথা শুনতে চাইলেন না।

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন তখন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে।

হরবিলাস কী আর করবে, সে তখন নিজের বুদ্ধিমতো সোজা বিলের ধারের মাঠেই গিয়ে ক্ষেত-চাষীদের কাজকর্ম তদারক করতে লাগলো। বুঝতে পারলে, কর্তামশাই ছেলের ওপর রাগ করেই হরবিলাসের সঙ্গে এমন অসংগত ব্যবহার করলেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে তখনও বাড়ি আসবার নাম করলে না। কোথায় মুচিপাড়ায় কার কলেরা হয়েছে সেইটেই তার বড়ো হলো। অথচ বাড়িতে যে এতগুলো লোক তার জন্যে ভাবছে সেদিকে তার জ্ঞান নেই।

কিন্তু মুকুন্দবাবুরও তো বয়েস হচ্ছে।

আগে তিনি ভাবতেন ছোটবেলায় সকলেই একটু বার-মুখী হয়। তখন সব ছেলেদেরই টান থাকে বাইরের দিকে। বাড়ির দিকে ততো মন দেয় না কেউই। তারপরে একটু বয়েস হলেই তারা আবার ঘরমুখী হয়ে যায়। তিনি ভেবেছিলেন দেবুরও তাই হবে।

কিন্তু না, উল্‌টোটা হলো।

দেবু যেন দিন-দিন ঘর থেকে বাইরের দিকেই মন দিচ্ছে বেশি। কোথায় কার অভাব, কে টাকা-পয়সার অভাবে সংসার চালাতে পারছে না, কার অসুখ-বিসুখ হয়েছে, সেই চিন্তাতেই সে বেশি সময় দেয়।

মুকুন্দবাবু একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারাদিন কোথায় থাকো?

দেবব্রত প্রথমে কোনও জবাব দেয়নি। নিজের ঘরের দিকেই চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু মুকুন্দবাবু অতো সহজে তাকে ছাড়লেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো কথার জবাব দিচ্ছ না যে?

দেবব্রত বললে, অনেক কাজ ছিল—

কিন্তু মুকুন্দবাবু ছেলের ওই সংক্ষিপ্ত জবাবে খুশী হলেন না।

বললেন, দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো। আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

দেবু একটু দাঁড়ালো। বললে, বলছি তো আমার অনেক কাজ ছিল!

মুকুন্দবাবু ছেলের সেই ছোট জবাবে খুশী হলেন না। বললেন, কাজ তো সকলেরই থাকে। আমারও আছে। তাহলে কাজের ছুতোয় কি আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াই? সারাদিন কোথায় তুমি ঘোর?

দেবু সেদিন একটা কড়া জবাব দিয়েছিল। বলেছিল, বাইরেটাও তো ঘর।

মুকুন্দবাবু ছেলের কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, তার মানে? তার মানেটা কী? বাইরেও তোমার ঘর, মানে?

দেবু বললে, আমি বাইরের লোকদের, দেশের লোকদের, সমাজের লোকদের পর মনে করি নে।

এই জবাবটার মানেও বুঝতে পারলেন না মুকুন্দবাবু। তিনি তো সারা জীবনভোর ঘরকে ঘর মনে করেন, আর বাইরেটাকে বাইরে মনে করে আসছেন। এ ছেলে আবার এই নতুন কথাটা কোথা থেকে শিখলে? বললে, তোমার কথাটা বুঝতে পারলুম না। একটু সোজা করে বলো।

দেবু বললে, আমি শক্ত কথা কিছু বলিনি। আমি বলতে চাই শরীরের সমস্ত অঙ্গ যদি সবল না হয় তাহলে শরীরকে সুস্থ থাকা বলা চলে না। আমার হাত দুটো দুর্বল রইল আর পা দুটো সবল রইল, তেমন অবস্থাকে কি শরীর ভালো থাকা বলে? তেমনি আমরা ভদ্রলোকের পাড়ার মানুষরা বড়লোক রইলাম আর মুসলমান বা মুচি পাড়ার লোকরা খেতে -পরতে পেলো না, সেটা দেশের পক্ষে সুস্থতার লক্ষণ নয়। দেশের সকল মানুষের, সব জাত, সব সম্প্রদায়ের অবস্থা ভালো হলেই তবে দেশের পক্ষে ভালো। এইটেই আমি বিশ্বাস করি, এই শিক্ষাই আমি এতকাল পেয়ে এসেছি—

ছেলের কথা শুনে মুকুন্দবাবু স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন আর তাঁর হুঁশ রইল না যে তিনি কোথায় আছেন বা তিনি কে, কার সঙ্গে এতক্ষণ তিনি কথা কইলেন?

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যার শেষ নেই আর সে-সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। তাদের সকলের সমস্যারও শেষ নেই। হয়তো যতো রকমের মানুষ, ততো রকমের সমস্যা। এত সমস্যার সমাধান করবে এমন মহাপুরুষ আজো জন্মাযনি, হয়তো বা কোনও কালে জন্মাবেও না। কিন্তু সেদিন মুকুন্দবাবুর মনে হযেছিল, তাঁর মতো সমস্যা বুঝি পৃথিবীর কোনও মানুষের নেই। সেইদিন থেকেই সংসারে থেকেও তিনি সংসারত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কীসের অভাব? একদিন তিনি ভেবেছিলেন সংসারে টাকা থাকলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাঁর তো পৈতৃক সম্পত্তি অঢেল। এমনকি বেয়াই-এর অগাধ সম্পত্তিও তিনি পেয়ে গেছেন। আর তাঁর ভাবনা কী? এখন এত টাকার মালিক হওয়ার পর তাঁর অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষ পরম নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে! তাতে তাঁর কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। বিশেষ করে যখন তাঁর একটি মাত্র সন্তান। একটি মেয়ে পর্যন্ত নেই যে তার বিয়েতে গোছা-গোছা টাকা বরবাদ হয়ে যাবে।

এই সব কথা ভেবেই তিনি নিশ্চিন্ত হযেছিলেন। তারপর তাঁর একমাত্র ছেলে যখন আবার লেখাপড়ায় রত্ন হলো, প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম হতে লাগলো, স্বাস্থ্যের দিক থেকেও যে পাড়ার গৌরব হয়ে উঠলো, বেণীমাধব মাস্টারও যখন তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উজ্জ্বল আস্থার কথা জানালেন, এমন কি 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবও যখন তাঁর ছেলেকে মানুষ হিসেবে উচ্চ সার্টিফিকেট দিলেন, তখন আর তাঁর নিজের ছেলের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই রইলো না। নিজেকে তিনি ভাগ্যবান পিতা হিসেবে গর্ববোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু যতোই তাঁর ছেলে বড়ো হতে লাগলো, আর নিজের বয়েস যতো বাড়তে লাগলো, ততোই তিনি হতাশাগ্রস্ত হতে লাগলেন, ছেলে যখন ডাক্তার হতে চাইলো না, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলো না, চার্টার্ড এ্যাকাউনটেন্ট হতে চাইলো না, এমন কি ব্যারিস্টার হতেও চাইলো না, তখন তাঁর মনে হলো সব কিছু থেকেও তিনি সর্বহারা।

মাঝে-মাঝে গৃহিণীর সঙ্গে আলোচনা করতেন দেবুকে নিয়ে।

বলতেন, আমার ছেলে যে শেষ জীবনে আমাকে এমন করে কষ্ট দেবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওর জন্যে ভেবে-ভেবে রাত্তিরে আমার ভালো করে ঘুমও হয় না।

গৃহিণী সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, তুমি অতো ভাবো কেন? আমরা তো জীবনে কখনও কারো ক্ষতি করিনি। ভগবান আমাদের কেন কষ্ট দেবেন?

মুকুন্দবাবু বলতেন, এত পুজো, এত মানত, এত সৎ পথে থেকে ভগবান আমাদের কী ভালোটা করলেন? দশটা নয়, বারোটা নয়, একটা মাত্র ছেলে, সেই তার এই দশা। একটা

তরকারি দিয়ে খাওয়া, তাও যদি নুনে পোড়া হয়, তাহলে মনে কী রকম কষ্ট হয় বলো তো? তাহলে কার জন্যে সংসার করা? এই রকমই যদি চলে তো শেষকালে কার ওপর ভরসা করে আমি চলে যাবো?

গৃহিণী স্বামীর এ-সব কথার উত্তর দিতেন না। তিনি জানতেন এসব ব্যাপারে ভেবে কোনও লাভ নেই। তবু তিনি ভাবতেন। তবে পাঁচটা কাজের মধ্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থেকে ছেলের কথা আর মনে উদয় হতো না। আর উদয় হলেও তাকে আমল দিতেন না। নিজের মনেই তিনি ইষ্ট দেবতাকে ডাকতেন। বলতেন, মা, তুমি আমার খোকাকে দেখো, তার যেন ভালো হয়।

তা যে মানুষ একদিন শ্মশানেশ্বরীর মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে দেশের ভালোর জন্যে সে প্রাণ দেবে, তার ভালো কোন দেবতা করবে? তার জীবন তো মানুষের কল্যাণের জন্যে বলি-প্রদত্ত। সে তো প্রতিজ্ঞা করেছে "আমি মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের কল্যাণের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দে মাতরম্।"

এই জন্যেই আগে বলেছি যে তাকে তৈরি করবার সময় বিধাতাপুরুষ বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। নইলে সবাইকে সৃষ্টি করবার সময়ে একই ছাঁচে না গড়ে দেবব্রতকেই বা অন্য ছাঁচে গড়তে গেলেন কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনও দিনই দিতে পারেনি। বিশ্ব-সংসারে এখনও এ-প্রশ্ন আগেকার মতোই অনুত্তরিত রয়ে গেছে।

সত্যিই তো, কোটি-কোটি সংসারী মানুষের মধ্যে কেনই বা একজন মানুষ অনন্য হয়, একজন মানুষ অসাধারণ হয়, একজন মানুষ দল-ছাড়া হয়, একজন মানুষ সংসার-বৈরাগী হয়, একজন মানুষ ব্যতিক্রম হয়ে, অমর হয়ে সব মানবজাতির উদাহরণ হয়ে যায়।

দেবব্রত তো তাও হলো না। সবাই তো তাকে ভুলেও গেল। বিশ্ব-সংসারের মানুষ তো তাদের স্মৃতির জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিতই করে দিল চিরকালের মতো। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।

সেদিনও সবাই পড়তে এসেছিল দেবব্রতর কাছে।

কেদার এসেছিল, ললিত এসেছিল, মিনতি এসেছিল, শম্ভু এসেছিল, হাস্‌নু এসেছিল, কমলা এসেছিল, সাহাবুদ্দীন এসেছিল। যেমন সবাই রোজ আসতো তেমনিই এসেছিল। সেই সময়েই সবাই আসতো, দেবব্রতর কাছ থেকে ক্লাশের পড়া জেনে নিতে আসতো নিয়ম করে।

কিন্তু এসে শুনলো দেবব্রতবাবু বাড়িতে নেই।

—কোথায় গেছে?

—মুচিপাড়ায়।

রাধু ঝি দেবব্রতবাবুদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক, অন্যদিন দেবব্রতবাবু বাড়িতে থাকেন। কারোর জলতেষ্টা পেলে ওই রাধুই কুয়ো থেকে খাবার জল তুলে দেয়।

আবার ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ-কেউ আসবার সময়ে বাগানের আম নিয়ে এসে দেবব্রতবাবুকে উপহার দেয়। বলে, এই আম খাবেন মাস্টারমশাই, আমাদের বাগানের গাছের আম।

শুধু আম বা কাঁঠাল বা শাক-সবজীই নয়, অনেকে আবার পুকুরের মাছও পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

আবার কেউ-কেউ পূজো বা ঈদের সময় মিষ্টিও দিয়ে যায় বাড়িতে। দেবব্রত অনেক সময়ে জানতেও পারে না কে কোন্ জিনিসটা পাঠিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ খেতে বসে জিজ্ঞেস করে মা'কে—এটা কি তুমি রেঁধেছ মা? এ পটলের তরকারিটা? খেতে খুব ভালো হয়েছে তো!

মা বলে, না রে, ওটা মিনতি দিয়ে গেছে! ওদের ক্ষেতের পটল। মিনতি বলে গিয়েছিল, ওর মা রান্না করেছে, তাই তোকে খেতে পাঠিয়েছে।

দেবব্রত রাগ করে, বলে, কেন এ-সব জিনিস তুমি নাও বলো তো মা? আমি তো ও-সব নেওয়া পছন্দ করি না। ওরা কি ধার শোধ করতে চাইছে?

. —ধার শোধ করার কথা বলছিস কেন? কীসের ধার?

দেবব্রত বলে, আমি ওদের পড়িয়ে টাকা নিই না বলে এইভাবে জিনিসপত্র দিয়ে শোধ-বোধ করতে চাইছে। আমি ওদের পড়িয়ে টাকা নিই নে কেন? টাকা নিই নে এই জন্যে যে আমি দেখেছি ওদের মধ্যে প্রতিভা আছে। আমি সাহায্য করলে হয়তো ওদের মধ্যে কেউ-না-কেউ সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে। বিদ্যে দান করে টাকা নিতে নেই, তা জানো না?

মা বলে, তোর মনে এত প্যাঁচ?

দেবব্রত বলে, প্যাঁচ নয় মা। সমস্ত দেশে যা কিছু সর্বনাশ হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে এই টাকার ষড়যন্ত্র। আমি এর বিরুদ্ধে লড়তে চাইছি, আর তোমরা সবাই এই ষড়যন্ত্রে তাদের সাহায্য করছো। তার জন্যেই আমার আপত্তি, নইলে আর কিছু নয়।

মা বলে, তা কেন হবে? ওদের ক্ষেতে নতুন পটল উঠেছে তাই দিয়েছে। ওরা অতো কিছু ভেবে-চিন্তে দেয়নি।

দেবব্রত বলে, না দিলেই ভালো।

আর শুধু মিনতি বা কমলা বা কেদার, শম্ভু, সাহাবুদ্দীন নয়, সকলের সঙ্গেই দেবব্রতর এই একই সম্পর্ক। যারা শিক্ষা দেবে বা যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাদের দু'দলের মধ্যেই একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকলে তবেই দু'পক্ষের ভালো হয়। আর যেখানেই লেনদেনের সম্পর্ক থাকে সেখানে একটা বাণিজ্যের গন্ধ থাকে বলে পরিণামে সর্বনাশ ডেকে আনে।

সেদিনও একে-একে সবাই এসেছিল।

সবাইয়েরই এক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের জবাব পেয়েও যখন কোনও সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল না, তখন তারা আর কী করবে? রোজ রোজ তো এমন হয় না। মানুষের জীবনে এ-রকম হঠাৎ জরুরী কাজ পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সবাই আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়াতে লাগলো। সোম, বুধ আর শুক্রবারই শুধু এই রকম পড়ান দেবব্রতবাবু। সেদিন বুধবার, বুধবার যদি নষ্ট হয়ও তো আসছে শুক্রবার এলেই হয়।

সবাই চলে গেলেও শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল মিনতি।

মিনতি বললে, তোমরা যাও, আমার বাড়ি বেশি দূরে নয়, আমি আরো কিছুক্ষণ মাস্টারমশাই-এর জন্যে অপেক্ষা করি।

সবাই চলে গেল।

সংসারের কাজ করতে মা এদিকে এসেছিলেন। মিনতিকে একলা বসে থাকতে দেখে ভেতরে ঢুকলেন। বললেন, কী মা, তুমি এখনও বসে আছো? আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করবে দেবুর জন্যে?

মিনতি বললে, আমি আরো কিছুক্ষণ দেখি।

মা বললেন, কিন্তু রাধু তোমাকে কিছু বলেনি?

মিনতি বললে, বলেছে, তবু বসে আছি যদি এর মধ্যে তিনি এসে পড়েন।

মা বললেন, সে কাল রাত্তিরে চলে গেছে। যাওয়ার সময়ে বলে গেছে মুচিপাড়ায় কার নাকি কলেরা হয়েছে। কাল বাড়িতে খায়ওনি পর্যন্ত। আজ এখনও সে এলো না। তুমি আর কতোক্ষণ বসে থাকবে মা?

মিনতি বললে, বাড়িতে গিয়েও তো সেই বসেই থাকবো, তার চেয়ে এখানেই না হয় বসে থাকি।

মা বললেন, এত রাত হয়ে গেল, তুমি একলা-একলা বাড়ি ফিরবে কী করে?

মিনতি বললে, বাবাকে বলা আছে, পড়ানোর পর বাবা আমাদের ঝি'কে পাঠিয়ে দেবেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বলতে-বলতে হঠাৎ দেবব্রত আর সাহাবুদ্দীন ঘরে ঢুকলো।

তাদের দেখে মিনতি যেন অবাক হয়ে গেছে, মা'ও তেমনি।

মা দেবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, সারারাত-সারাদিন কোথায় ছিলি?

সাহাবুদ্দীন বললে, মাস্টারজীকে রাস্তায় আসতে দেখে আমি তাঁর সঙ্গে চলে এলুম।

মা বললে, বেশ করেছ বাবা।

দেবব্রত বললে, মা, পরাণকে বাঁচাতে পারলুম না। ক্ষিদের মুখে যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। শুধু পরাণ নয়, আরো কয়েক জন মরবে, আমি দেখে এলুম।

—তা এত দেরি করলি কেন? আর এদিকে তোর বাবাও ভাবছে, আর আমিও ভাবছি।

দেবু বললে, ওদের পাড়া কি এখেনে? এমন একটা লোক কেউ নেই যে তোমাদের খবর দেব। তারপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিসে গিয়ে আবার ব্লিচিং পাউডার আনিয়ে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলাম। চারদিকে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। গরু-ছাগল-মুরগী-ছেলে-মেয়ে সব একঘরে মানুষ হচ্ছে। এদের কলেরা হবে না তো কার হবে।

মা জিজ্ঞেস করলে, আর খাওয়া? কী খেলি?

দেবু বললে, খাবো আবার কী, ওরা মরছে রোগে ভুগে আব আমি তাদের ওই অবস্থায় ফেলে রেখে খাবো? তাদের জীবনটা বড়ো হলো না আমার খাওয়াটা বড়ো?

মা বললে, তাহলে ঘুম?

দেবু বললে, কখন ঘুমোব? সারাদিনটা তো শ্মশানেই কেটে গেল মড়া পোড়াতে গিয়ে!

মা বললে, এই করে করেই তুই নিজের শরীরটা নষ্ট করবি দেখছি। সারারাত-সারাদিন ঘুম নেই, খাওয়া নেই।

দেবু বললে, আমি আজ আর পড়াবো না তোমাদের। তোমাদের খুবই সময় নষ্ট হলো।

মিনতি বললে, তাতে আর কী হয়েছে, আগে তো আপনার শরীর।

দেবু বললে, এখন তোমরা বাড়ি যাবে কী করে?

মিনতি বললে, আমার বাড়ি থেকে বাবা আসবে কিংবা ঝি, কেউ-না-কেউ আসবেই।

দেবু বললে, সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মিনতি বললে, না হয় আমি ততক্ষণ এখানেই বসে অপেক্ষা করবো।

সাহাবুদ্দীন বললে, চলো না, আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

দেবু বললে, আচ্ছা চলো, আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

বলে তখনই যেতে তৈরি হতে যাচ্ছিল। মা বললে, সে কী রে? তুই সারারাত-সারাদিন না ঘুমিয়ে না খেয়ে আছিস, এখনি আবার বেরোবি? তুই যে মারা পড়বি রে—

মিনতি বললে, হ্যাঁ, মাসিমা তো ঠিকই বলেছেন, আমার বাড়ি থেকে তো লোক আসবে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, আপনি কেন কষ্ট করবেন?

সাহাবুদ্দীন বললে, না-না আমি মিনতিকে নিয়ে যেতে পারি। আপনি কষ্ট করবেন না।

কিন্তু দেবব্রত তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। সে তার কর্তব্য করবেই। দেবব্রতকে সারা জীবনে কেউ কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। কেউ তাকে তার নিজের পথ থেকে বিপথে নিয়ে যেতে পারেনি। তার নিজের বাবা-মা'ই তার পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেননি, তা অন্য লোকের আর কথা কী!

মিনতির দিকে চেয়ে বললে, চলো, আমি তোমার বাড়িতে তোমাকে পৌঁছিয়ে দিই—

সাহাবুদ্দীন বললে, আমি তো যাচ্ছি মাস্টারজী, আপনি কেন আর কষ্ট করবেন?

—না, আমিই যাবো, আমার কোনো কষ্ট হয় না এসব কাজে।

বলে চলতে আরম্ভ করলো। আগে-আগে মিনতি আর সাহাবুদ্দীনও চলতে লাগলো।

পেছনে মা দরজাটা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিলেন। চেঁচিয়ে ছেলেকে বললেন, দেরি করিসনি খোকা, তাড়াতাড়ি চলে আসিস।

১৯৪৭ সালের অনেক আগের কথা যারা জানে, তারাই কেবল বলতে পারে সে-সব কী দিনকাল ছিল। মানুষের চোখের সামনে তখন বড়ো বড়ো আদর্শ জ্বল-জ্বল করতো। সবচেয়ে বড়ো আদর্শ সামনে যিনি ছিলেন তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর আশে-পাশে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, গোখেল, তিলক, লাজপত রায়, গান্ধী, সুভাষ বোস, জে. এম্. সেনগুপ্ত। তাঁদের লেখা বই পড়ে যারা সাহস পেতো, আশা পেতো, আনন্দ পেতো, তারা আবার দেশের, গ্রামের, সমাজের ছেলে-মেয়েদের সেই সব জিনিস শেখাতে চাইতো। তারা চাইতো যে দেশের সমস্ত ছেলে-মেয়েরা যেন ওই সব আদর্শ মহাপুরুষদের লেখা বই থেকে ভালো ভালো উপদেশ শিখে নেয়। সেই সব আদর্শ সামনে রেখে তারা জীবন পরিচালনা করতে চেষ্টা করে।

যতক্ষণ তারা দেবব্রতর কাছে থাকতো, ততক্ষণ সেই একই কথা, সেই একই উপদেশ, সেই একই শিক্ষা। দেবব্রত বলতো, তোমরা ডায়েরী লিখছো তো রোজ? ডায়েরী লিখলে তোমাদের সব কাজে নিয়মানুবর্তিতা শিখতে পারবে। যে মানুষ সব কাজ নিয়ম করে করে, সে-ই মানুষের সমাজে মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতির দিকে তোমরা চেয়ে দেখো, দেখবে সেখানেও সব নিয়ম করে চলে। এই দেখ সূর্য, সূর্য ঠিক নিয়ম করে সকালে ওঠে বলেই পৃথিবীটা এখনও চলছে।

ছাত্ররা সবাই মাস্টারমশাই-এর কথা মন দিয়ে শুনতো বটে, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষায় পাশ করা।

দেবব্রত সেটা বুঝতে পারতো। কিন্তু তবু তার মনে হতো যদি তাদের মধ্যে একজনও তার কথাগুলো মন দিয়ে নিজের জীবনে কাজে লাগায় তা'লেও তার পরিশ্রম সার্থক হবে।

দেবব্রত বলতো, দেখ একটা ফুলগাছে যতোগুলো কুঁড়ি হয়, তার সব কুঁড়িগুলোই কি ফুল হয়ে ফোটে? ফোটে না। কেন ফোটে না বলো তো? ফোটে না কেন?

ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ তেমন ঠিক উত্তর দিতে পারতো না।

দেবব্রত এক-এক করে সকলকেই প্রশ্নটা করতো—বলো তো, ললিত, তুমি বলতে পারো কেন সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে না?

—কমলা, তুমি?

কমলাও উত্তর দিতে পারতো না।

—সাহাবুদ্দীন, তুমি?

সাহাবুদ্দীন অনেকক্ষণ ভেবেও কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারতো না।

—আচ্ছা মিনতি, তুমি? তুমি উত্তরটা দিতে পারবে?

প্রশ্নটা স্কুলের লেখাপড়ার বিষয়ভুক্ত নয়, তাই দেবব্রত বললে, যাক্ গে এ প্রশ্ন তো আর তোমাদের স্কুলের পরীক্ষায় আসবে না, তাই এ নিয়ে আর তোমাদের ভেবে সময় নষ্ট করতে হবে না। তোমরা এ প্রশ্নটা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে ভেবো। যদি কোনও উত্তর ভেবে পাও, তো পরে আমাকে জানিও।

বলে আবার স্কুলের নিয়মিত পড়া পড়াতে শুরু করতো। এই-ই ছিল দেবব্রতর ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর রীতি। পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত কিছু পড়ানো, কিছু ভাবানোই ছিল দেবব্রতর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য।

সেদিন রাস্তায় যেতে-যেতে মিনতি হঠাৎ বলে উঠলো, মাস্টারমশাই, আপনার সেদিনকার প্রশ্নটার উত্তর আমি ভেবে বার করেছি।

—পেয়েছ? উত্তর পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—বলো কী উত্তর ভেবে পেয়েছ?

মিনতি বললে, সব কুঁড়ি ফুল হয় না এই জন্যে যে কুঁড়ি হচ্ছে প্রকৃতি-নির্ভর। কুঁড়ি প্রকৃতির শিকার হলেও কিছু-কিছু কুঁড়ি বিকৃতির শিকার হয়ে যায় বলে, সেগুলো ঠিকমতো ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে না।

দেবব্রত মিনতির জবাব শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বললে, বাঃ, তুমি কী করে এর উত্তরটা বলতে পারলে? কেউ তোমাকে বলে দিয়েছে নাকি? তোমার বাবাকে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে নাকি?

মিনতি বললে, না মাস্টারমশাই, আমি নিজেই মাথা খাটিয়ে উত্তরটা বার করেছি।

দেবব্রত সাহাবুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললে, দেখেছ সাহাবুদ্দীন, মিনতি কী চমৎকার উত্তরটা দিলে! মিনতি এবার পরীক্ষাতে ফার্স্ট হবেই।

তারপর দেবব্রত নিজেই আবার বলতে লাগলো, আমরা যেমন সবাই মানুষ, তুমি-আমি-মিনতি, আমরা সবাই-ই তো মানুষ। আমাদের তিনজনেরই দু'টো করে হাত, দু'টো করে পা, দু'টো করে চোখ, কান আছে। মানুষের বিচার কিন্তু এই সব দিয়ে হবে না। দেখতে হবে কার বেশি মনুষ্যত্ব আছে। প্রকৃতির শিকার তো আমরা সবাই-ই। আমাদের মধ্যে আবার কেউ-কেউ বিকৃতিরও শিকার। কিন্তু আমরা কেউই সংস্কৃতির শিকার হতে পারিনি। পৃথিবীতে যারা সংস্কৃতির শিকার হতে পেরেছে, তারাই প্রকৃত অর্থে মানুষ। যারা একটা আদর্শের জন্যে আজীবন লড়াই করেছে, আদর্শের জন্যে দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, তারাই মানুষ। অসংখ্য কুঁড়ির মধ্যে তারাই শুধু ফুল হতে পেরেছে। বাকিরা সব কুঁড়ি। তারা একদিন শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে হারিয়ে যাবে। বুঝলে?

মিনতি চুপ করে কথাগুলো শুনছিল।

সাহাবুদ্দীন বললে, সেই ফুল কারা?

দেবব্রত বললে, ইতিহাস খুঁজলেই তোমরা তাঁদের নাম পাবে। যেমন গ্রীসের মানুষ সোক্রেটিস, চায়নার মানুষ কনফুসিয়াস, ইণ্ডিয়ার মানুষ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, আরো অনেক ফুল আছে আমাদের দেশে। যেমন ধরো পাঞ্জাবের ভগৎ সিং শুকদেব, চন্দ্রশেখর

আজাদ, আর ধরো আমাদের এই বাংলাদেশের বিনয়-বাদল-দীনেশ, যতীন দাশ, সূর্য সেন, মেয়েদের মধ্যে প্রীতি ওয়াদেদার...

কথা বলতে-বলতে দেবব্রত উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, ইতিহাস খুঁজলে তোমরা এমনি অরো অনেক লোকের নাম পাবে। মানুষ একদিন সকলের নামই ভুলে যাবে, কিন্তু ওই সব মানুষ অমর হয়ে থাকবেন।

কথাগুলো চলছিল তখন রাস্তায় যেতে-যেতে।

হঠাৎ দেখা গেল উল্‌টো দিক থেকে হেঁটে আসছেন পার্বতীবাবু। মিনতির বাবা পার্বতীচরণ ঘোষ।

—এই যে, আপনি আসছেন? আমি মিনতিকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম—

হয় পার্বতীবাবু আর নয়তো তাঁদের বাড়ির ঝি, প্রতিদিন মিনতিকে নিতে আসে দেবব্রতদের বাড়ি থেকে।

পার্বতীবাবু বললেন, আজ যে এত তাড়াতাড়ি?

দেবব্রত বললে, আজকে আমি এদের কাউকে পড়াতে পারিনি, তাই নিজেই মিনতিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। অন্য সবাই আগেই চলে গেছে।

পার্বতীবাব বললেন, কেন বাবা, তোমার শরীব খারাপ নাকি?

—আজকে পরাণ মণ্ডল মারা গেল।

—কে পরাণ মণ্ডল?

—মুচিপাড়ার পরাণ মণ্ডল। আমরা ওদের এমন গরীব করে রেখেছি যে ওরা জানেও না যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে কী করা উচিত, কী খাওয়া উচিত। আমরা ওদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করিনি—

—মারা গেল কী করে?

—কলেরাতে।

পার্বতীবাবু বললেন, ওবা যে-রকম নোংরা হয়ে থাকে, ওদের কলেরা হবে না তো কাদের কলেরা হবে বাবাজী? আমরা তো ওই জন্যেই ওদিকে মাড়াই না পর্যন্ত, উচিত শিক্ষাই হয়েছে ওদের।

—ওরা যে নোংরা, ওরা যে লেখাপড়া শেখেনি, তার জন্যে কি ওরাই দায়ী? আমরাও কি সমান দায়ী নই? এই আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলি। গভর্মেন্টও ওদের দেখছে না, আমরাও ওদের দেখছি না, তাহলে কে ওদের দেখবে?

পার্বতীবাবু কম কথার লোক। কথাগুলো শুনে একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ দেবু। আমাদের দৌলতপুরে কি কোনও মানুষ আছে যে এ-সব কথা ভাববে! যারা ভাববার লোক ছিল তারা সবাই-ই বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

—আমি ভাবছিলুম এবার আমিই ওদের ভার নেব। ওদের লেখাপড়া শেখাবো।

পার্বতীবাবু বললেন, তুমি উচিত কথাই বলেছ দেবু। আমি সেদিন মিনতির মা'কে তাই বলছিলুম যে, আমাদের এই দৌলতপুরে দেবুর মতো আর একটা ছেলে থাকলে, দেশের হাওয়া অন্যদিকে ঘুরে যেতো।

মিনতি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে, বাবা, মাস্টারমশাই কাল রাতে ঘুমোননি, খাননি, সেই অবস্থাতেই উনি চলে এসেছেন।

পার্বতীবাবু বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক কথা। তুমি এবার বাড়ি যাও, আমি তো এসে গেছি, যাও বিশ্রাম করো গে যাও—

বলে মিনতিকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সাহাবুদ্দীন তাদের সঙ্গে তার বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

যুগটা তখন সন্ধিকাল। ইণ্ডিয়ায় তখন একদিকে চলছে মহাত্মা গান্ধীর যুগ। অনেকদিন গান্ধীর কথায় দেশের লোক চরকা কেটেছে, খদ্দরের কাপড়-জামা পরলেই দেশে স্বাধীনতা আসবে, সে-কথা তারা বিশ্বাস করেছে। আর অন্যদিকে?

অন্যদিকে তখন ছেলেরা বোমা-বন্দুকের ভরসায় গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়েছে, আর বেছে বেছে ইংরেজ কর্তাদের খুন করে বিদেশী রাজাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ঢাকায় যেমন এফ. জে. লোম্যানকে খুন করা হয়েছে, তেমনি মেদিনীপুরের তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকেও পরপর খুন করা হয়েছে দেশকে স্বাধীন করবার তাগিদে। বাঙালীরা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, গান্ধীর দেখানো রাস্তায় দেশে কিছুতেই স্বাধীনতা আসবে না।

এরই মাঝখানে সুলতান আহ্‌মেদের মতোন লোকরা দেশের ছেলেদের চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা আর ব্রহ্মচর্যের ওপর আস্থা রেখে মানুষ গড়বার কাজে হাত লাগিয়েছে।

ঘটনাচক্রে দৌলতপুরের দেবব্রত এই শেষের দলের প্রভাবে পড়ে জীবনকে নতুন দিকে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করে চলেছে। সে ভেবে দেখেছে মানুষের জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগের মহিমাই বেশি কাম্য। সে আরো ভেবেছে তার একলার উন্নতির চেষ্টার চেয়ে সকলের উন্নতির চেষ্টাই দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। পাড়ার একজন মানুষের বাড়িতে আগুন লাগলে সকলের বাড়িতে আগুন লাগবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পাড়ার সকলে মিলে সেই একজনের বাড়ির আগুন নেভাবার দায়িত্ব নিতে হবে। যা সমষ্টির কল্যাণ করে, তাই-ই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

সেই সময়ে সুভাষ বোসই প্রথম বললেন, আমি বিদেশে গিয়ে দেখে এলুম যে, শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হতে চলেছে।

লোকে জিজ্ঞেস করল, কাদের সঙ্গে কাদের যুদ্ধ বাধবে?

সুভাষ বোস বললেন, যাদের সঙ্গেই যাদের যুদ্ধ হোক, সেই যুদ্ধে ইংরেজরা জড়িয়ে পড়বে। আমাদের ভারতীয়দের উচিত সেই যুদ্ধের সুযোগ নেওয়া—

ওদিকে গান্ধী অহিংসা নীতির প্রবর্তক। তিনি বললেন, কারো বিপদের সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধে আদায় করাটা নৈতিকতার বিরোধী। তাতে আমার আস্থা নেই –

সেই বিবাদে কিছু লোক চলে গেল গান্ধীর দিকে আর কিছু লোক চলে এল সুভাষ বোসদের দলে। সংখ্যার দিক দিয়ে গান্ধীর দিকেই বেশি লোক সম্মতি দিলে। তারা চলে গেল গান্ধীর দিকে। কারণ সকলেই তাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা চায়। তারা শান্তির পক্ষপাতী। তারা বললে, গান্ধীর দলে থাকলে আমাদের কিছু হারাবার ভয় নেই, কোনো ঝুঁকি নেই। আমরা কিছু ত্যাগ না করেই স্বাধীনতা পেতে চাই।

কিন্তু সুভাষ বোসের বক্তব্য এই যে—কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। সব দিলে সব পাওয়া যায়। আমরা যদি সেই যুদ্ধে আমাদের সর্বস্ব পণ করি, আমাদের নিজেদের বিলিয়ে দিই তো আমরা হয়তো মারা যাবো, কিন্তু দেশ তো থাকবে? তখনকার মানুষেরা তো স্বাধীন হবে।

সেই আগামীকালের মানুষদের কথা ভেবেই এখন সেই যুদ্ধে ইংরেজদের বিপদের সুযোগ আমাদের নেওয়া উচিত—

গান্ধীর মত উল্টো। তিনি বললেন, দেশের স্বাধীনতা যদি আমরা চাই তো সেই শুভ কাজ সিদ্ধির জন্যে পথটাও শুভ হওয়া দরকার—

সুভাষ বোস বললেন, আমি সেকথা বিশ্বাস করি না। গীতাতেই আছে, "সর্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমে অগ্নি যথাবৃতা।" আগুন জ্বাললেই চারদিক আলোময় হয়ে যায়। কিন্তু সেই আগুন জ্বালাতে গেলে শুরুতে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। তেমনি সব শুভ কাজের পেছনেই অশুভ লুকিয়ে থাকে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে অশুভ পথের আশ্রয় নেওয়ার মধ্যেও তাই কোনও দোষ নেই। হিংসার পথ দিয়ে যদি স্বাধীনতা আসে তো সে-হিংসাতে দোষ কী?

এখন দেখার কথা, দেশের লোক কার কথা শুনবে? গান্ধীর কথা, না সুভাষ বোসের কথা?

যখন দেশের সব মানুষ এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কে মশগুল তখন দেবব্রতর জীবনেও এক মহা দুর্যোগ নেমে এল।

মুকুন্দবাবু শেষের দিকে অসুস্থই হয়ে পড়েছিলেন। একে ছেলে ঠিক মনের মতো হয়নি, তার ওপব তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁরও পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে।

গৃহিণী কাছে এলেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন, খোকা কোথায়?

গৃহিণী বলতেন, ইস্কুলে গেছে।

তিনি কখনও শুনতেন ছেলে ইস্কুলে গেছে, আবার কখনও শুনতেন ছেলে তার 'চরিত্র-গঠন শিবিব' সামলাতে গেছে। এই সব কাজ নিয়েই যদি সে ব্যস্ত থাকে তাহলে তাঁর ক্ষেত-খামার কে দেখে? একা হরবিলাসের ওপর ভার দিয়ে কী জমিদারী চলে? চলে না। মাঝখান থেকে যেটুকু সময় সে বাড়িতে থাকে, সেটুকু সময়েও সে ওই ছেলেমেয়েদের পড়ানো নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর নয়তো মুচিপাড়ায়, কুমোরপাড়ায় গিয়ে তাদের জ্ঞান দেয়। আরে তোকে জ্ঞান দেয় কে তার ঠিক নেই, তুই আবার ওদের জ্ঞান দিতে যাস! আর এদিকে বাপ যে অসুখে শুয়ে পড়ে আছে, সেদিকে তো তোর খেয়াল নেই। সে মানুষটা কেমন আছে তাও তো তুই একবার জিজ্ঞেস কবতে আসিস নে। অনেক পাপ কবলে তবে মানুষ এমন ছেলের বাপ হয়।

সেদিন হঠাৎ হৈ-চৈ পড়ে গেল দৌলতপুরে।

কৈলাস খুড়ো খবরটা শুনেই দৌড়ে এলো মুকুন্দবাবুর কাছে। বললে, শুনেছ মুকুন্দ, লড়াই বেধে গেছে—

—লড়াই? লড়াই মানে?

কৈলাস খুডো পাড়ার মাতব্বর। বললে, সবাই বলছে পৃথিবীতে লড়াই বেধে গেছে।

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে কার লড়াই?

—শুনছি জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের।

—কেন? কেন লডাই বাধলো?

—তা কি আমি জানি ছাই?

মুকুন্দবাবু সারা জীবনই লড়াই দেখে আসছেন, লড়াই-এর খবরে আগেকার মতো আর তেমন উদ্বেগ হয় না তখন। তখন রোজই একটা না একটা খুন-খাবাপির খবর নিযে পাড়ার লোকেদের মধ্যে উত্তেজনা হতো। তাঁর ছোটবেলায় একবার যুদ্ধ বেধেছিল জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের। তখনকার কথা বেশি মনে নেই। বিশেষ করে যশোরের মতো জেলায়, দৌলতপুবের মতো গ্রামে কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবে। কিন্তু তারই মধ্যে হাতের কাছে ঘটনাগুলো নিয়েই লোকে বেশি মাথা ঘামাতো।

কিন্তু এবাব অন্য বকম। সবাই বলতে লাগলো এবাব কলকাতায় নাকি জাপান বোমা ফেলতে পাবে। গোলকও তাই লিখলো মুকুন্দবাবুকে।

মুকুন্দবাবু তাকে লিখেছিলেন, তুমি কলকাতার বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে এখানে চলে এসো। এখানে বোমা পড়বার কোনও ভয় নেই।

কলকাতা শহর অনেক আন্দোলন দেখেছে। দেখতে কিছু আর তার বাকি নেই তখন। সেই ১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে চৌত্রিশটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বসলেন হাওড়া স্টেশনের সামনের রাস্তায়। তার সামনে দু'হাজার পুরুষ ভলান্টিয়ার, পাঁচশো মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা, ঘোড়ায় চড়া ভলান্টিয়ারের দল মিলিটারি পোশাক পরে বিউগ্‌ল বাজিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। আর ঘন-ঘন ধ্বনি উঠছে—বন্দেমাতরম্‌। দু'পাশের দোতলা-তিনতলা বাড়িগুলোর বারান্দা থেকে মেয়ে-পুরুষ সবাই ফুলের বৃষ্টি করছে। এ-সব দৃশ্য পরে আর কেউই দেখেনি। হয়তো আর কখনও কেউ দেখবেও না।

তারপরে সারা ইণ্ডিয়ায় আরো কতোবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে। কতোবার হরতাল হয়েছে, কতোবার কতো ইংরেজ খুন হয়েছে। সাহেব খুন করার অপরাধে কতোবার কতো লোকের ফাঁসি হয়েছে, তার হিসেব কারো কাছেই নেই। কিন্তু সেই যুদ্ধের সময়ে সব কিছু যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। দেশের যারা নেতা তাদের সবাইকে জেলে পুরে রাখা হলো। কলকাতা শহরে 'এ. আর. পি' 'সিভিক গার্ড' হিসেবে সব বেকার ছেলেরাও কেমন করে রাতারাতি সব চাকরি পেয়ে গেল। তাদের হাতে মাসে-মাসে হাত খরচের মোটা টাকা আসতে লাগলো ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। তারা টাকা হাতে পেয়ে কয়েক বছরের জন্যে বেঁচে গেল। তারা সবাই ভাবতে লাগলো যুদ্ধটা আরো যতোদিন চলে ততোই তাদের পক্ষে মঙ্গল।

তখন একদিন গুজব রটে গেল সুভাষ বোস নাকি জার্মানীর বার্লিন থেকে কথা বলেছেন।

কথাটা কেউ-কেউ বিশ্বাস করলেও বেশির ভাগ লোকই বিশ্বাস করলো না। সুভাষ বোসকে পুলিশের নজরবন্দী করেই রাখা হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে। দিনরাত অসুস্থ অবস্থাতেই সুভাষ বোস বাড়িতে থাকতেন শয্যাশায়ী হয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে কী করে যে তিনি পালিয়ে বার্লিন চলে গেলেন সেইটেই ছিল রহস্যের বিষয়।

ঠিক সেই সময়েই গোলকেন্দু সরকার গোষ্ঠকে নিয়ে এসে হাজির হলো দৌলতপুরে।

মুকুন্দবাবু বললেন, খুব ভালো করেছ কলকাতা ছেড়ে এখানে এসে। শুনছি নাকি কলকাতার ওপর বোমা পড়তে পারে—

গোলকেন্দু বললে, হ্যাঁ, কলকাতাতেও সবাই তাই বলছে। সব লোক কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, ইস্কুল-কলেজ সব এখন বন্ধ।

মুকুন্দবাবু বললেন, এখানে কোনও ভয় নেই। কলকাতার অনেক লোকই ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।

গোলকেন্দু জিজ্ঞেস করলে, দেবুর কী খবর?

মুকুন্দবাবু বললেন, সে আগে যা করছিল এখনও তাই-ই করছে। আমার কথা তো সে শোনে না।

—এখন কোথায় সে? ক্ষেতে গেছে নাকি?

মুকুন্দবাবু বললেন, সে ক্ষেতে-খামারে যাবে? তুমি বলছো কি? সেই যদি জমি-জিরেত দেখবে তাহলে আমার এই দুর্দশা হবে কেন? আমি তো এখন সব সময়ে খালি শুয়েই থাকি, ওই হরবিলাস যা পারে, তাই-ই করে। আমার কেউই নেই গোলক, বুড়ো বয়েসে যে আমার এই দশা হবে তা আগে কখনও কল্পনাই করতে পারিনি।

গোলকেন্দু বললে, এবার ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিন দাদা, বৌদিরও তবু একটা সঙ্গী হবে। আপনাদের দু'জনেরই একটু সাহায্য হবে তাতে! বিয়ে হলে তখন মনটাও একটু ঘর-মুখো হবে।

—দেবু বিয়ে করবে? তবেই হয়েছে!

মুকুন্দবাবুর গলায় হতাশার স্বর বেরিয়ে এলো।

আবার বললেন, জানো গোলক, যখন দেবুর জন্ম হলো তখন সবাই বললে, আর ভয় নেই। এবার সরকারমশাই-এর সম্পত্তি দেখাশোনা করবার একজন লোক হলো। সেই ছেলে দাদামশাই-এর সম্পত্তিও দেখাশোনা করবে, আবার বাপের সম্পত্তিও দেখাশোনা করতে পারবে! কিন্তু এখন তারাই আবার অন্য জিনিস দেখছে।

গোলকেন্দু বললে, কিন্তু আমার কাছে তো দেবু কলকাতায় ছোটবেলা থেকেই যায়, আমি তো সে-রকম কিছু দেখিনি। আমার তো মনে হয়েছে ও একজন আদর্শ ছেলে!

মুকুন্দবাবু বললেন, আমি জানি ও পরোপকারী, ধর্মভীরু। কোনও রকম নেশা-টেশা করে না। কিন্তু বাপ-মা তাদের ছেলের কাছ থেকে কী চায়? তারা তো চায় যে ছেলে তাদের অত কষ্টে গড়ে তোলা সংসারটা দেখুক। বাপ মা'রা তো চায় তাদের বংশধারাটা বজায় থাকুক।

গোলকেন্দু বললে, সত্যিই তো, ওর বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—বিয়ে? বিয়ের নাম শুনলেই ও ক্ষেপে যায়! দুঃখের কথা আর কী-ই বা বলবো! তুমি বলে দেখ না, ও কী বলে? আমি বলে-বলে হার মেনে গেছি।

—ঠিক আছে, আমি সুযোগ বুঝে একদিন ওকে বলবো'খন।

সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করতে লাগলো গোলকেন্দু। কিন্তু সে-সুযোগ কি অত সহজে আসে। দেবুর তো কথা বলবারই সময় নেই, এত তার কাজ!

আর তার কাজও কি একটা? কোথায় কোন পাড়ায় খাবার জল পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় কোন পাড়ায় কার অসুখ করেছে, টাকার অভাবে কার চিকিৎসা হচ্ছে না, কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, সেই সব পরোপকাবের দিকেই তার নজর পড়ে আছে। তাবপব আছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের দাতব্য-কর্ম।

স্কুলের শিক্ষকতার বিনিময়ে যে টাকাটা মাসে-মাসে তার হাতে আসে, সেটাও কোনও দিন তার বাড়িতে আসে না। বাবার তো টাকার অভাব নেই। সুতরাং স্কুলের মাইনের টাকাটা বাড়তি টাকা। সেটা নিজের বাড়িতে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য নয়।

আগে যারা সন্ধ্যাবেলা পড়তে আসতো, তারা বড়ো হয়ে যাওয়ার পর তখন অন্য আর এক দল ছাত্র বেছে নিয়েছে সে। আর সারা ইণ্ডিয়া জুড়ে যুদ্ধের যে দুর্যোগ চলছে তাতে কে কোথায় কোন দিকে ছড়িযে পড়েছে তার ঠিক নেই।

গোলকেন্দু সকালবেলা খবরের কাগজ খুলেই অবাক। যা সবাই ভেবেছিল তাই হয়েছে। তাড়াতাড়ি মুকুন্দবাবুর ঘরে এসে বললে, এই দেখ দাদা, আমি যা ভেবেছিলুম তা-ই হয়েছে। কলকাতার মাথার ওপর বোমা পড়েছে। কলকাতা থেকে সব লোক পালিয়েছে—

মুকুন্দবাবু খবরটা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন, তাহলে কী হবে? এখানেও বোমা পডবে নাকি? বোমা পড়লে আমরা কোথায় যাবো?

গোলকেন্দু বললে, কী আর হবে, দেশের মানুষই মরবে, দেশ তো আর মরতে পারে না, দেশ মরবেও না। দেশ তো থাকবেই, আর দেশ থাকলে আবার নতুন মানুষ জন্মাবে, তারাই চালাবে দেশ, তখন সেই মানুষরাই আবার দেশকে নতুন করে গড়বে!

সেদিন পার্বতীবাবু মুকুন্দবাবুর বাড়িতে এলেন।

তিনি গোলকেন্দুকে দেখে বললেন, আরে তুমি কবে এলে?

গোলকেন্দু বললে, এই তো ক'মাস হলো এসেছি—

—কলকাতার কি খবর?

গোলকেন্দু বললে, কী আর খবর, কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি।

—আর কলকাতার বাড়ি?

—সে বাড়িতে চাবি বন্ধ করে চলে এসেছি। এখন তো শুনছি কলকাতায় বোমা পড়েছে। এই ভয়েই তো কলকাতা থেকে সব লোক পালিয়ে গিয়েছে। আমি গোষ্ঠকে নিয়ে এখানে চলে এসেছি।

পার্বতীবাবু বললেন, আমিও এখন আর দৌলতপুরে থাকি না ভাই। ঢাকায় বদ্‌লি হয়ে গিয়েছি। একটা কাজে এদিকে এসেছিলুম আবার পরশু ফিরে যাবো।

গোলকেন্দু জিজ্ঞেস করলে, বাড়ির খবর কী?

—খবর সবই ভালো। তবে মিনতিকে নিয়েই ভাবনা—

—কেন? মিনতির কী হয়েছে?

—মিনতিরও তো বয়েস হয়েছে।

গোলকেন্দু জিজ্ঞেস করলে, তার বিয়ে দিয়েছ?

—বিয়ে দিলে কি তুমি খবর পেতে না, ভেবেছ? আমার তো ওই একই মেয়ে। তার জন্যেই তো আমার যতো ভাবনা। বি-এ পরীক্ষায় ও ডিস্‌টিংশন পেয়েছে। এবার ভাবছি ওর বিয়েটা দিয়ে দেব, আর আমরা কবে আছি, কবে নেই—

তারপর মুকুন্দবাবুর দিকে চেয়ে পার্বতীবাব বললেন, মুকুন্দবাবু, আপনি তো আমার মেয়েকে দেখেছেন। ও তো বহুদিন দেবুর কাছেই পড়তো। দেবুর সঙ্গে কি আমার মিনতির বিয়ে দেবেন?

মুকুন্দবাবু শুয়ে ছিলেন। বললেন, আমার ছেলের সঙ্গে?

পার্বতীবাবু বললেন, হ্যাঁ, বলতে গেলে দৌলতপুরে আমার আসারও ওই একটাই কারণ। আপনার ছেলে তো একটি রত্ন, আপনার ছেলের সঙ্গে যদি আমার মিনতির বিয়ে হয় তো মিনতিও ধন্য হয়ে যাবে, আমিও ধন্য হয়ে যাবো।

মুকুন্দবাবু বললেন, আপনি বলছেন কী পার্বতীবাবু। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার দেবুর বিয়ে হলে তো আমিই ধন্য হয়ে যাবো। অমন সৌভাগ্য কি আমার হবে?

—সে কী কথা! দেবু কত গুণী, আর আমার মেয়ে তো সাধারণ একটা মেয়ে। দেবুর মতোন তো কলেজে স্কলারশিপ পায়নি।

মুকুন্দবাবু বললেন, আমার দেবু কি বিয়ে করবে?

পার্বতীবাবু কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, তার মানে?

মুকুন্দবাবু বললেন, তার মানে কি আপনি জানেন না? সে কি সংসারের কিছু দেখে? এই যে আমি অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ে আছি, সে কি একবারও আমার কাছে এসে খবর নেয়?

এর জবাবে পার্বতীবাবু আর কী-ই বা বলবেন।

তবু বললেন, আমার মনে হয় দেবুর একটা আদর্শ আছে। ওর মনটা সব সময়েই সেই দিকেই ঝুঁকে থাকে, তাই বাড়ির অন্য কাজের দিকে তেমন মন দিতে পারে না।

—আদর্শ? মুকুন্দবাবু ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, যে আদর্শ বাপ-মা'কে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না, সেটা কোনও আদর্শই নয়।

পার্বতীবাবু বললেন, আমার তো মনে হয়, বিয়ে হয়ে গেলেই দেবু ঘর-সংসারের দিকে পুরো মনটা দেবে।

মুকুন্দবাবু একটা অবিশ্বাসের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বললেন, সেটা হলে তো আমি বেঁচেই যাই। তা যদি হয় তো আমি আর কিছু চাই না।

পার্বতীবাবু বললেন, আমি আমার জীবনে এমন কতো লোককে দেখেছি বিয়ের আগে তারা এক-রকম ছিল, আর বিয়ের পরে একেবারে আমূল বদলে গেল।

মুকুন্দবাবু বললেন, দেবুর যদি তা-ই হয় তো তাতে আমিই সব চেয়ে খুশী হবো। আমি জীবনে তো জ্ঞানতঃ কারো কোনও ক্ষতি করিনি, কারো কোনও অমঙ্গল চিন্তাও করিনি। আমার কেন এমন হলো জানি না।

গোলকেন্দু এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার বললে, ঠিক আছে, কথাটা আমিই পাড়বো দেবুর কাছে। আমার অনুরোধ নিশ্চয়ই এড়াতে পারবে না।

পার্বতীবাবু বললেন, তাই চেষ্টা করে দেখ তুমি গোলক। এ বিয়েটা যদি তুমি করিয়ে দিতে পারো তো, আমি চিরকালের মতো তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো।

গোলকেন্দু বললে, আরে দেবু তো আমার ভাইপো, আমি নিজেও তো তার ভালো চাই। সে বিয়ে করে সংসারী হোক, এটা তো আমিও চাই।

পার্বতীবাবু বললেন, তা হলে আমায় কী দিতে-থুতে হবে, সেটাও আমাকে জানিয়ে দিও তুমি।

গোলকেন্দু বললে, সে-সব কথা পরে হবে, আগে দেবু তো বিয়ে করতেই রাজি হোক—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মুকুন্দবাবু বলে উঠলেন, আমি আগে থেকে বলে রাখছি, দেবু যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয় তো শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর একটা পয়সাও আমি নেব না—আমি কি আমার ছেলেকে বিক্রি কববো বলতে চান?

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত এমন কবে দেবব্রতব জীবনেব সব ব্যাপাবগুলো জানে, তা আমার ধারণা ছিল না।

জিজ্ঞেস কবলাম, শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়েটা কি হলো?

সুপ্রভাত বললে, দেখ ভাই, আমাদের দেশে বিয়ে হতে এক মিনিটও লাগে না। শুধু সমস্যা থাকে দেনা-পাওনা নিয়ে। তার মানে ববপক্ষ কতো পণ চাইবে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে, সেইটেই থাকে সমস্যা। এক্ষেত্রে সেটা তো নেই। আবও একটা সমস্যা থাকে মেয়ে পছন্দ হওয়া নিয়ে। এ-ক্ষেত্রে তো সে-সমস্যাও নেই। কারণ বর-কনে দু'জনেই দু'জনকে দেখেছে, দু'জনেই দু'জনের অত্যন্ত পরিচিত ঘনিষ্ঠ। এ-বিয়েতে সে-সব ঝামেলাও তো নেই। শুধু সমস্যা হলো দেবব্রত বিয়ে করবে কি করবে না, তাই নিয়ে।

সেই সমস্যা সমাধানের ভার পড়লো গোলকেন্দুর ওপর।

কিন্তু দেবব্রতর মতো ব্যস্ত লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় পাওয়াটাই হলো বড়ো কথা।

দেবব্রতর কি একটা কাজ? যুদ্ধ বাধার দিন থেকে দেবব্রতর ব্যস্ততা যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ে গিযেছিল। কোথায় কোন পাড়ায় কাদের কী অভাব-অভিযোগ, কোন পাড়ায় কার অসুখ-বিসুখ করলো, তার ওপর কলকাতায় বোমা পড়েছে। গান্ধীজী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ করে দিযেছেন। সংসারে দেশের মঙ্গলেব জন্যে যে-যা কিছু কাজ করেন, তা সমস্তই যেন

দেবব্রতর কাজ। তার সমস্ত দায়িত্বটাই যেন দেবব্রতর একলার। যখন কলকাতার ওপরে জাপানের বোমা পড়লো তার ক্ষতিটাও যেন একলা দেবব্রতর ক্ষতি।

কৈলাস খুড়ো একদিন রাস্তায় দেখা হওয়াতে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় বোমা পড়লে তোমার কী ক্ষতি দেবু? তোমার মাথায় তো বোমা পড়েনি—

দেবু বলতো, আমার মাথায় নাই বা পড়লো, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মাথাতেই তো পড়েছে। তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই আছে। তাদের ক্ষতি কি আমাদের সকলের ক্ষতি নয়?

এ যুক্তি কেউই বোঝে না। অথচ পাগল বলে যে তাকে উড়িয়ে দেবে, তাও কেউ পারে না।

সব সময়েই সকলের, যাদের কেউ নেই তাদেরও সে আপন-জন, আবার যাদের সবাই আছে তাদেরও সে পর নয়, আপন-জন। আসলে তার পক্ষে কিন্তু কেউ নেই। সে একলা। একেবারে একলা। সংসারী হয়েও সে একলা, একলা হয়েও সে সংসারী।

এ-রকম লোককে বিয়ে করতে রাজী করানো সোজা নয়।

গোলকেন্দু বললে, বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কীসের?

দেবু বললে, বিয়ে করলেই তো আমার দায়িত্ব বাড়বে। বউ, ছেলেমেয়ে তাদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে হবে!

গোলকেন্দু বললে, তা-তো দিতেই হবে, সবাই তো তাই-ই করে।

দেবু বললে, কিন্তু কাকা, আমার তো অতো সময় নেই—

গোলকেন্দুবাবু বললেন, বিয়ে করতে আর সময়ের কী দরকার? আমরা তো সবাই-ই বিয়ে করেছি, তোমার বাবা বিয়ে করেছেন, তোমার ঠাকুর্দা বিয়ে করেছেন, তোমার দাদামশাইও বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে তো সবাই-ই করে এসেছে, আবার পরেও সবাই-ই করবে।

দেবু বললে, কিন্তু সুভাষ বোসের নাম তো আপনি শুনেছেন, যিনি এখন ইণ্ডিয়ার বাইরে পালিয়ে গেছেন, তিনি কি বিয়ে করেছেন? আর স্বামী বিবেকানন্দর নামও তো আপনি..

গোলকেন্দু কথাটা শুনে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, তা তুমি কি সুভাষ বোস, না বিবেকানন্দ? তুমি সাধারণ গেরস্থ লোক। তুমি তাঁদের কথা তুলছো কেন?

দেবু বললে, তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও কতো সাধারণ লোক বিয়ে করেনি, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন...

গোলকেন্দুবাবু বললেন, কিন্তু তুমি তো বাপের এক ছেলে। তুমি কি চাও তোমাদের বংশ লোপ পাক? আর তোমার মায়ের কথাটাও একবার ভাবো। তাঁরও তো বয়েস হচ্ছে, তাঁরও তো শেষ জীবনে একটা সহায়-সম্বল চাই। তাঁর অবর্তমানে এ-সংসারটাব কী দশা হবে, সেটাও একবার কল্পনা করো—

তখনই বাইরে থেকে একটা ডাক এলো—দেবুদা, দেবুদা?

দেবব্রত ডাক শুনেই বাইরে গেল। দেখলে তারই দলের খোকন তাকে ডাকছে। জিজ্ঞেস করলে, কী রে, কী ব্যাপার?

খোকন গলা নিচু করে বললে, অবিনাশ ধরা পড়েছে—

—অবিনাশ? ধরা পড়েছে?

খোকন বললে, হ্যাঁ, রাত দেড়টার সময়ে পুলিশ তার বাড়িতে ঢুকে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে, তার বাড়িতে কাগজপত্র সব কিছু তছনছ করে আরো অনেকের নাম ধাম পেয়ে গেছে। এই খবরটা দিতে এলাম তোমার কাছে। আমি চলি—

বলে খোকন চলে গেল। গোলকেন্দুবাবু তখনও ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েছিলেন। দেব আসতেই জিজ্ঞেস করলে, কী হলো? এত সকালে কে এসেছিল তোমার কাছে?

দেবু বললে, আমাদের ক্লাবের ছেলে। আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি—আপনি কিছু মনে করবেন না কাকা, আমার আসতে একটু দেরি হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত বললে, অতো তাড়াতাড়ি শেষ জানতে চাইছো কেন? এখনও তো কাহিনী শুরুই হলো না, এখুনি শেষ জানতে চাইছো? এখন তো সবে আরম্ভ—

কিন্তু আমার তখন আর তর সইছিল না।

বললাম, ওই ঝর্ণাদেবীর কথাটা তো বলছো না—

সুপ্রভাত বলতে-বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বললে, এক গেলাস জল আনতে বলো তোমার কাজের লোককে—

জলের জন্যে বাড়ির ভেতরে হুকুম দিলাম।

সুপ্রভাত বললে, ওই ঝর্ণাদেবী, 'আল্‌তা মাসি' সবাই-ই আসবে। এখন তো সবে বীজ পোঁতা হলো, আগে গাছটা বড়ো হতে দাও, তবেই তো গাছের ডালে ফল ফলবে—

ততক্ষণে জল এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গে মিষ্টিও এসেছিল।

সুপ্রভাত মিষ্টি মুখে দিয়ে বললে, মুখ তো মিষ্টি করালে, কিন্তু আমি যখন গল্প শেষ কববো, তখন তো গল্পটা তোমার তেতো লাগবে।

আমি বললাম, তেতো? তেতো কেন?

সুপ্রভাত বললে, মানুষের জীবনটাই তো তেতো!

—তেতো কেন? তেতো কেন?

সুপ্রভাত বললে, কেন, তথাগত বুদ্ধদেবের জীবনের শেষটা তেতো নয়? শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষটা তেতো নয়? যীশুখ্রীষ্টের জীবনের শেষটা তেতো নয়? মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোসের জীবনের শেষটা তেতো নয়? যীশুখ্রীষ্টের জন্মের চারশো নিরানব্বই বছর আগের লোক সক্রেটিসের জীবনের শেষটা তেতো নয়?

সুপ্রভাতের কথার যুক্তিতে আমাকে হার মানতে হলো।

বললাম, আমি সে অর্থে তেতো বলিনি। আমি বলেছি অন্য কারণে। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে দেবব্রতর জীবনের কাহিনীটা যেন শেষ হয়। ট্রাজেডি হোক, কমেডি হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু গল্পটা যেন ঠিক মতো জায়গায় শেষ হয়। আজকালকার লেখকরা তো কেউ গল্প শেষ করতে জানে না।

সুপ্রভাতের জল খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে।

বললে, ও-সব আমি জানি না। আমি তো লেখকও নই, পাঠকও নই, আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই-ই তোমাকে বলছি। তাতে গল্প শেষ হোক আর না-হোক, আমার তাতে কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। আমি গল্পটা তোমাকে বলেই শুধু খালাস।

বললাম, ঠিক আছে, এবার বলো তোমার দেবব্রতের জীবনের বাকিটা—শেষ পর্যন্ত দেবব্রত বিয়েটা করলে?

সুপ্রভাত বললে, বাঙালীদের বিয়ে হতে তো দেরি হয় না। একবার যদি দু'পক্ষের বাপ-মা বিয়েতে মত দিয়ে দেয় তো সাধারণতঃ তা নিয়ে আর কোনও গোলমাল হয় না। বড়জোর বর নিজে একবার কনেকে নাম-মাত্র দেখে আসে। খুব বেশি যদি দরকার হয় তো দু'একটা প্রশ্নও করে। জিজ্ঞেস করে লেখাপড়া কতদূর হয়েছে, রান্নাবান্না জানে কি না, এই সব মামুলি প্রশ্ন—

সুপ্রভাত আবার বললে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মেয়ে দেখার প্রশ্নই তো আসে না। কারণ পার্বতীবাবুও তার চেনা, আর মিনতিকেও তো দেবু বরাবর দেখে এসেছে। তাকে পড়িয়েছে, পাশও করিয়েছে। সে জন্যে মিনতির বাবার কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সাও সে নেয়নি। টাকা-পয়সা সে কোনও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেই নেয়নি। তার জন্যে কিছু প্রাপ্তি-যোগই হয়নি তার। কোনও দিন তা সে আশাও করেনি। পৃথিবীতে অনেকের জন্যেই দেবু অনেক কিছু করেছে, কিন্তু বিনিময়ে তার জন্যে কারো কাছে কোনও দিনই কি সে কিছু চেয়েছে?

হয়তো তার এই গুণের জন্যেই পার্বতীবাবু তাঁর মেয়ে মিনতিকে দেবব্রতর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষের আশার তো কখনও শেষ থাকে না।

মুকুন্দবাবু বললেন, আমার ভাই তো অনেকবার দেবুকে আপনার মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গেছে, কিন্তু সে তো তার কোনও কথাই শোনেনি।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আপনি একটা কাজ করুন—

—কী কাজ?

—আপনি নিজে একবার কথাটা দেবুকে বলে দেখুন না—

—কী বলবো?

—বলুন যে আপনার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান।

—পার্বতীবাবু বললেন, কথাটা আপনি বললে ভালো হয় না?

মুকুন্দবাবু বললেন, আমি দেবুর বাবা, কথাটা আমি বললেই হয়তো ভালো হতো, কিন্তু আমার কথা কি ও শুনবে?

—আপনার কথা যে শুনবে না, সে আমার কথা শুনবে? আপনি তার বাবা, আর আমি কে? আমি তো ওর পর।

—আমি তো বললুম আপনাকে যে ও আমার কথা শোনে না।

—তাহলে আপনার স্ত্রীকে দিয়ে বলান!

মুকুন্দবাবু বললেন, তার কথা ও আরো শুনবে না।

এর পরে আর কথা চলে না!

পার্বতীবাবু অনেক আশা করে এসেছিলেন। শেষে কি তাহলে তাঁকে হতাশ হয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে?

অথচ তিনি এখানে আসবার সময়ে মিনতিকে বলে এসেছেন যে দেবব্রতকে তিনি যেমন করে হোক এ-বিয়েতে রাজি করিয়ে আসবেনই। খালি হাতে ফিরে গেলে সে-ই বা কী ভাববে?

শেষকালে মিনতিকে সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তো যাচ্ছি, কিন্তু তোর কোনও আপত্তি নেই তো? ভালো করে ভেবে দেখ।

এ-কথায় প্রথমে মিনতি জবাব দিতে একটু দ্বিধা করেছিল।

পার্বতীবাবু আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী রে, কথার জবাব দে—

অনেক পীড়াপীড়ির পর মিনতি বলেছিল, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। পার্বতীবাবু বলেছিলেন, কিন্তু তোর মনের কী ইচ্ছেটা তাই বল। আমি তাকে রাজী করিয়ে আসার পর যদি তুই রাজী না হোস্ তখন?

পার্বতীবাবুর স্ত্রী বেঁচে থাকলে এ নিয়ে অতো ভাবতে হতো না তাঁকে। মিনতির মা'ই সে কাজের ভারটা নিত। তাতে মিনতির কাছ থেকে কথা আদায় করতে পার্বতীবাবুর কোনও অসুবিধাই হতো না।

আর তা ছাড়া মিনতির বয়েসও হয়েছে। এ-ব্যাপারে তার মতামতেরও একটা মূল্য আছে।

মিনতি কথা বলতে গররাজী দেখে তাঁর মনে একটা সন্দেহও হলো। তবে কি তাঁর মেয়ের দেবুকে বিয়ে করতে অনিচ্ছা আছে?

মেয়েদের মন বোঝা নাকি দেবতাদেরও অসাধ্য! হয়তো তাই-ই হবে। কিন্তু এ-কাজ তিনি ছাড়া আর কে করবেন? করবার মতো আর তাঁর নিকট-আত্মীয়া কে আছে? এমন একজন আত্মীয়াও নেই যা'কে দিয়ে তিনি এই কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

আবার এও হতে পারে যে তাঁর মেয়ে হয়তো মনে-মনে অন্য কাউকে মনে ঠাঁই দিয়েছে। সে-কালের কথা আলাদা। এখন তো আর গৌরীদানের যুগ নেই। দেবব্রতর বাড়িতে ছাত্রীদের সঙ্গে অনেক ছাত্রও পড়তে আসতো। তাদের কারোর সঙ্গে হযতো মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। সব কিছুই হওয়া সম্ভব এ-যুগে।

যদি সেকাল হতো তাহলে তিনি অল্প বয়েসেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কিন্তু মিনতির লেখাপড়ার ঝোঁক দেখে তিনি সেই দিকে যেতে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন বরাবর। তিনি নিজেও একজন নারী-শিক্ষা এবং নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই যতোদূর মিনতিকে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব ততোদিন তাকে পড়িয়েছেন।

কিন্তু বিয়েরও তো একটা বয়েস আছে। বয়োধর্মকে তিনি তো অস্বীকার করতে পারেন না। বয়েস তো একদিন সব মানুষকে তার ইচ্ছাধীন করবেই।

শেষকালে অনেক পীড়াপীড়ির পর মিনতি বলেছিল, আমি আর এ-ব্যাপারে কী বলবো, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন। আপনি তো আমার ভালোই চান, মঙ্গলই চান।

মিনতির মনে ছিল দেবব্রত সরকারের বলা কথাগুলো।

মাস্টারমশাই বহুদিন আগে তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো গাছের সব কুঁড়ি, ফুল হয়ে ওঠে না কেন?

মিনতিরও মনে হয়েছিল কী করে সে নিজের জীবনকে কুঁড়ি থেকে ফুলে পরিণত করতে পারে, করতে পারে একমাত্র মাস্টারমশাই-এর মতো সত্যিকারের সৎ মানুষের সাহচর্যে।

মেয়ের কাছে পূর্ণ সম্মতি নিয়েই পার্বতীবাবু দৌলতপুরে এসেছিলেন মুকুন্দবাবুর কাছে দেবব্রতর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। দৌলতপরে এসে মুকুন্দবাবু আর গোলকেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা বলে প্রথমে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে মুকুন্দবাবুর প্রস্তাবে তিনি নিজেই একদিন দেবব্রতকে একলা পেয়ে কথাটা তুললেন।

প্রথমে কথাটা শুনে দেবব্রত যেন আকাশ থেকে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে, মিনতির সঙ্গে আমার বিয়ে। আপনি বলছেন কী?

পার্বতীবাবু বললেন, কেন, আমি অন্যায়টা কী করেছি বাবা? এটা কি খুব অন্যায় প্রস্তাব আমার তরফ থেকে? আমি তোমাকে এতদিন ধরে চিনি, মিনতিও এতদিন ধরে তোমাকে চেনে। আর তুমিও আমাকে আর মিনতিকে এতদিন ধরে চেনো। সুতরাং এখন তোমার কাছ থেকে একটা মৌখিক সম্মতি ছাড়া আর কিছু চাই না। তাহলেই আমি এট' নিয়ে অগ্রসর হতে পারি।

—আমার বাবা কি আমার কাকা, তাঁদের কাছ থেকেই প্রস্তাবটা এলে ভালো হতো না?

—তাঁদের প্রথমে আমি প্রস্তাবটা দিই, কিন্তু তাঁরা বললেন যে তাঁদের কথা নাকি তুমি শুনবে না, তাই আমাকে নিজেই তোমার কাছে প্রস্তাবটা দিতে বললেন, তাই আমি নিজেই তোমাকে বলছি—

কথাগুলো শুনে দেবব্রত প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি—

পার্বতীবাবু বললেন, একটা কথা কেন, আমি মেয়ের বাপ, তুমি হাজারটা কথা বললেও, আমি শুনতে প্রস্তুত—কী বলবে, বলো—

দেবব্রত বললে, আমি বিয়ে করবো কি না, সেটা আমি মিনতির সঙ্গে একবার কথা বলে নিয়ে তারপর বলবো।

পার্বতীবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, মিনতির সঙ্গে তুমি একবার এই নিয়ে কথা বলতে চাও?

—হ্যাঁ। তার মতামতটা জানতে চাই।

—কীসের ব্যাপারে মতামত?

—আমাদের বিয়ের ব্যাপারে? তাতে সে যদি রাজী হয়, তাহলেই আমি তাকে বিয়ে করবো!

পার্বতীবাবু কথাটা শুনে খুব চিন্তিত হলেন। তাঁর মেয়ে মিনতিকে দেবব্রত ভালো করেই চেনে। তবু তার সঙ্গে আবার ব্যক্তিগত এমন কোন্ কথা বলতে চায় দেবব্রত?

তা বলুক দেবব্রত! তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তাই পার্বতীবাবু বললেন, ঠিক আছে। আমি তাহলে তাই-ই করবো, আমি মিনতিকে একবার তোমার কাছে এখানে নিয়ে আসবো। তখন তুমি তার সঙ্গে দেখা করে যা কিছু বলবার তাই-ই বলো—আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার সারা জীবন একসঙ্গে কাটাতে হবে, কথা বলে নেওয়াই তো ভাল। আমি খুব খুশী হলাম তোমার কথায়। আমি আজই চলে যাচ্ছি, যতো শীঘ্রই পারি মিনতিকে নিয়ে আবার দৌলতপুরে আসবো। তুমি তো হাজারটা কাজে ব্যস্ত থাকো, তারই মধ্যে একটু সময় করে তার সঙ্গে যা বলবার তা বলো।

কথাগুলো বলে পার্বতীবাবু আবার ঢাকায় তাঁর নিজের জায়গায় চলে গেলেন। যাবার আগে মুকুন্দবাবু আর গোলকেন্দুবাবুকে দেবুর সঙ্গে যা কথা হলো তা বলে গেলেন।

সব শুনে মুকুন্দবাবু আর গোলকেন্দুবাবু দু'জনেই খুব খুশী হলেন। দেবু যে শেষ পর্যন্ত সংসারী হতে রাজী হয়েছে, এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে?

সামান্য ঝর্ণাদেবীর 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাওয়ার সূত্রে সুপ্রভাতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে দেবব্রত সরকারের মতো এক সৃষ্টিছাড়া মানুষের পরিচয় পেয়ে যাবো, তা প্রথমে কল্পনা করতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, আর তোমার সেই 'আল্‌তা-মাসি'? তুমি বলেছিলে যে 'আল্‌তা-মাসি' একটা প্রতীক চরিত্র। তার কথা বলছো না কেন?

সুপ্রভাত বললে, আরে দাঁড়াও-দাঁড়াও। অতো তাড়াহুড়ো করলে কি চলে? গল্পে প্রত্যেক চরিত্রের একটা যথাস্থান আছে। সেই জায়গার বদলে যদি অন্য কোথাও তার কথা বলা হয় তো তাতে রসভঙ্গ হবে। রান্নায় নুন কম বা বেশি হলে যেমন তরকারির স্বাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, গল্পের চরিত্রদের বেলাতেও তাই। তারা অনাবশ্যক যেখানে-সেখানে এসে হাজিরও হবে না, আবার হঠাৎ যথাস্থান থেকে অদৃশ্য হয়েও যাবে না, এইটেই নিয়ম। এই নিয়ম যে-লেখক

মানেননি তিনি পস্তিয়েছেন। বেশির ভাগ লেখকই এই জন্যে সাহিত্য-জগৎ থেকে একদিন অদৃশ্য হয়ে গেছেন, কিংবা পাঠক-জগৎ তাঁকে ভুলে গেছে।

সুপ্রভাতের কথা শুনতে আমার ভালো লাগছিল না। যে-লোক কথায়-কথায় জ্ঞান দেয়, তার কথা শুনতে কারই বা ভালো লাগে! আর জ্ঞান যদি দিতেই হয় তো গল্পের মধ্যে এমন জায়গায় জ্ঞান দিতে হবে, যেখানে জ্ঞান দিলে গল্পের গতি রুদ্ধ হবে না, আর গল্পও কোনও রকমে খর্ব হবে না। সে আর্ট ক'জনই বা জানে আর ক'জন পাঠকই বা তা বুঝতে পারে।

যা'হোক, আমার মনের ভাব গোপন রেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তা তারপর?

সুপ্রভাত বললে, তারপর আর কী হবে? তারপর একদিন মিনতির সঙ্গে দেবব্রতর বিয়ে হয়ে গেল।

—আর সেই যে দেবু বলেছিল বিয়ের আগে মিনতির সঙ্গে দেখা করে সে তার মতামত জেনে নেবে?

—সেই মতামত নেবার ব্যাপার যথাসময়েই চুকে গিয়েছিল।

—কী রকম? সেই ঘটনাটা বলো?

সুপ্রভাত বললে, সে কথা এখন থাক। সেটা শেষকালে বলবো। বিয়ে হওয়ার পর কী হলো শোন।

ইণ্ডিয়া তখন যুদ্ধেব আগুনে জ্বলছে। উনিশশো বিয়াল্লিশের 'কুইট-ইণ্ডিয়া'র আন্দোলন চালাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। সে আন্দোলনের ছোঁয়া দৌলতপুরেও এসে লাগলো। একদিন ভগৎ সিং, সুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ দেশকে আজাদী করবার জন্যে নিজেদের পথ ধরেছিল। তারপর গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। তার ছোঁয়াচও এসে লাগলো দৌলতপুরে।

এক-একদিন মাঝরাতে কে যেন এসে ডাকে দেবুকে।

নিচু গলায় বলে, দেবুদা সর্বনাশ হয়েছে—

—কী হলো?

—পুলিশ এসে অবিনাশকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

—তার কী অপরাধ?

—সে রাত্তির বেলায় রেল-লাইন ধরে ইছামতীর দিকে যাচ্ছিল, তার হাতের ঝুলির মধ্যে বোমা পায়, তাই সে পাকড়াও হয়েছে। এখন তো পুলিশ আমাদের সকলের বাড়িতে সার্চ করবে। কী করি এখন?

দেবব্রত কিছুক্ষণ ভাবলে! বললে, তুই গা-ঢাকা দে—

খোকন বললে, কোথায় গা-ঢাকা দেব?

দেবব্রত বললে, তুই কলকাতায় চলে যা, সেখানে গিয়ে হেমন্তদার কাছে চলে যা। তিনি যা করতে বলবেন তাই-ই করবি। হেমন্তদার কাছে গিয়ে আমার নাম করবি—

—কিন্তু তুমি?

দেবব্রত বললে, আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না।

তারপর একটু ভেবে বললে, তোর কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?

—না।

দেবব্রত বললে, না থাকে তো আমি দিচ্ছি টাকা, একটু দাঁড়া—

বলে আবার ঘরের ভেতরে এলো। তারপর আলমারির চাবি খুলে নগদ পাঁচশো টাকা বার করে নিয়ে আবার আলমারিতে চাবি দিয়ে দিলে। তারপর আবার বাইরে এসে খোকনকে টাকাগুলো দিলে। খোকন তখনও অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

দেবব্রত বললে, এতে পাঁচশো টাকা আছে, আর দেরি করিসনি, আজই এই টাকা নিয়ে কলকাতায় হেমন্তদার কাছে যা। হেমন্তদা যা করতে বলবে তাই-ই করবি।

—আর তুমি? তোমাকেও তো পুলিশ এ্যারেস্ট করতে পারে, তখন?

দেবু বললে, আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না। আমি যা ভালো বুঝবো তাই করবো।

কথাগুলো শুনে খোকন বললে, কিন্তু তুমি যে বিয়ে করেছ দেবুদা?

দেবব্রত বললে, আমার বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে? বিয়ে করেছি বলে কি আমি তোদের দল-ছাড়া হয়ে গিয়েছি। তুই যা, ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। আর দেরি করিসনি—

বলতেই খোকন আর দেরি করলে না। অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খোকনকে বিদায় করে দিয়ে দেবব্রত নিজের ঘরে আসতেই আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেই সেখানে মিনতিকে দেখে অবাক।

বললে, কী হলো তুমি? তুমি এই অসময়ে?

মিনতি বললে, তোমার ঘরে আসবো, তারও কি আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

দেবব্রত বললে, তোমার সঙ্গে তো আমার সেই চুক্তিই আছে—

মিনতি বললে, চুক্তি?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ চুক্তিই তো। তুমি কি আমাদের বিয়ের আগে যে-কথা হয়েছিল, তা কি ভুলে গেলে নাকি?

—আমার ঘুম আসছিল না। চুপ করে শুয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ শুনতে পেলুম বাইরে থেকে কে যেন তোমায় গলা নিচু করে ডাকলো। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হলো। তাই তোমার ঘরে এলুম।

—কিন্তু আমার ঘরে আসা তোমার উচিত হয়নি।

মিনতি বললে, বাইরে যে এলো, ও কে?

—ওটাই কি আমার কথার উত্তর হলো? আমি তো তোমাকে বলেছি আমি কার সঙ্গে কী কথা বলছি, কে আমার সঙ্গে দেখা করে কী কথা বলছে, তা তুমি কখনও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে না।

মিনতি বললে, কিন্তু এ-কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আগে অবশ্য আমি তোমার ছাত্রী ছিলুম, কিন্তু এখন আমি তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর মর্যাদাও কি তুমি আমাকে দেবে না?

দেবব্রত বললে, যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি আর সেই সব পুরনো কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই না।

এর পরে মিনতি আর কী বলবে! তার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

দেবব্রত তাই দেখে বললে, মনে করো না তোমার চোখের জল দেখে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবো।

—তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?

—আমি তো তোমার অনুমতি নিয়েই বিয়ে করেছি, তুমিই তো সেদিন এ বিয়েতে অনুমতি দিয়েছিলে! দাওনি?

মিনতির মুখে কোনও উত্তর নেই।

—আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? উত্তর দাও? দাও উত্তর?

মিনতি কী উত্তর দেবে!

বললে, আমি তখন জানতুম না, আমি তখন বুঝতে পারিনি।

দেবব্রত বললে, তুমি যদি না জানতে পেরে থাকো, তুমি যদি না বুঝতে পেরে থাকো, তাহলে সেটার জন্যে কি আমি দায়ী? তার জন্যে কি আমি দোষী?

তবু মিনতির মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরলো না।

—আমার মাথায় এখন অনেক ভাবনা, আমার মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব, এই সময়ে তুমি এলে? আর কি কোনও সময় পেলে না?

মিনতি বললে, কখন তোমার সময় হবে তা তুমি বলে দাও, আমি তখনই তোমার কাছে এসে এ-সব কথা বলবো।

দেবব্রত বললে, দেখছো বাড়িতে বাবার অসুখ, দেখছো দেশের এই টাল-মাটাল অবস্থা, দেখছো পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ মরিয়া হয়ে দেশের ছেলে-ছোকরাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করছে, আর ঠিক এই সময়ে আমরা এই রকম তুচ্ছ মান-অভিমান নিয়ে ঝগড়া করে সময় কাটাচ্ছি!

—আমায় ক্ষমা করো তুমি, আমি সত্যিই অন্যায় করেছি।

দেবব্রত এতক্ষণে যেন একটু নরম হলো।

বললে, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না মিনতি। আমি রাগের মাথায় তোমাকে কী বলে ফেলেছি, এখন তার জন্যে আমি তোমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

মিনতির কান্না তখন একটু থেমেছে।

দেবব্রত মিনতির কাছে গিয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে নিলে।

বললে, যাও মিনতি, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

মিনতি বললে, আমি আজ তোমার ঘরেই শোব—

—তা হয় না মিনতি, তা হয় না—

—কেন তা হয় না?

—সে কথা তো তোমাকে বিয়ের আগেই বলেছি।

—এই-ই কি তোমার শেষ কথা?

দেবব্রত বললে, এ-রকম করে বলছো কেন? বিয়ের আগেই তো আমি তা বলে দিয়েছি—যাও, কেঁদো না, তুমি তোমার ঘরে চলে যাও—বেশি কান্নাকাটি করলে সব জানাজানি হয়ে যাবে!

এর পর এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল সারা পৃথিবী জুড়ে। তার জের শুধু যে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-রাশিয়া বা জার্মানীর ওপরে পড়লো, তা নয়। জার্মানী তখন বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

আর জাপান? জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকির মাথার ওপর ৬ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে এমন এক ধরনের বোমা পড়েছে, যা আগে পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

আর যাঁর ওপরে দেবব্রত সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছিল, যে মহাপুরুষ তার মনের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই সুভাষ বোস? সেই নেতাজী?

হঠাৎ সেই দুঃসংবাদটা দৌলতপুরেও এসে পৌঁছুলো। তারিখটা ছিল ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ সাল। তার ক'দিন পরেই খোকন এসে খবরটা দিয়ে গেল।

খোকন তখন কাঁদছে।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করলে, কীরে, কী হলো বল না? কথা বলছিস না কেন?

খোকন কাঁদতে-কাঁদতেই বললে, দেবুদা, সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কেন কী সর্বনাশ?

খোকন বললে, কলকাতা থেকে খবর এসেছে নেতাজী সুভাষ বোস মারা গেছে!

—সে কী? কে বললে?

খোকন বললে, সবাই বলছে। খবরের কাগজেও নাকি খবরটা বেরিয়েছে—

—কোন খবরের কাগজে?

কলকাতার সব খবরের কাগজেই নাকি খবরটা বেরিয়েছে।

দেবব্রত খবরটা শুনে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, তুই ঠিক জানিস?

খোকন বললে, কলকাতা থেকে এখানে একজন এসেছে—

তখন দৌলতপুরে বেশি খবরের কাগজ আসতো না। এলেও তা দেরি করে আসতো। পরের দিন আসতো। যখন আসতো তখন সে-খবর বাসি হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটা খুব চিন্তার। অথচ এই তো কিছুদিন আগেই গুজব শোনা গিয়েছিল, যে, সুভাষ বোস তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে ইণ্ডিয়ার ভেতরে মণিপুরে পৌঁছে সেখানে ইণ্ডিয়ার ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিয়েছে। তখন আর তো বেশি দেরি নেই।

তখন দেবব্রতদের 'চরিত্র-গঠন শিবিরের' ছেলে-মেয়েদের সে কী আনন্দ। মনে-মনে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছে। ইংরেজ আর বেশিদিন এখানে নেই। দৌলতপুরের তখন সবাই-ই আছে। শুধু সুলতান আহ্‌মেদ নেই আর কানাই মল্লিক নেই। হঠাৎ সেই কানাই-এর কী এক রকম জ্বর হলো, আর ডাক্তার এসে পৌঁছোবার আগেই সে মারা গেল।

আর নেই সেই অবিনাশও। তাকে পুলিশ একেবারে ধরে হাজতে পুরে রেখেছে। তাকে কে ছাড়িয়ে আনবে? পুলিশ কেন তাকে ছেড়ে দেবে?

সেইদিনই 'চরিত্র-গঠন শিবিরে'র সভ্যদের মিটিং ডাকা হলো। সবাই জড়ো হলো সেই ইস্কুলের সামনে। সবাই যার যা বলবার তা বললে। শৈলেন বললে, এর বদ্‌লা নিতে হবে। নেতাজী নেই কিন্তু তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদেরই শেষ করতে হবে—

প্রায় সকলেরই এক কথা। একই সুরে সবাই ওই একই বক্তব্য রাখলেন। সকলের শেষে এল দেবব্রত সরকারের পালা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমরা আজ দেশ স্বাধীন করার যে প্রতিজ্ঞা করলে তার জন্যে প্রধান কাজ আর প্রথম কাজ হলো 'চরিত্র-গঠন'। চরিত্র গঠনই হলো মানুষের প্রথম কর্তব্য। যে মানুষ চরিত্র গঠন করতে পেরেছে, তার দ্বারা সমস্ত প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ করা সম্ভব। যার চরিত্র নেই, সে মানুষ নামেরই অযোগ্য। এসব কথা আমি শিখেছি আমাদের 'চরিত্র গঠন শিবিরে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নেতা সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবের কাছ থেকে। তিনিই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, এই পৃথিবীতে জন্মে যদি আমরা আমাদের স্রষ্টার ঋণ শোধ না করি, তাহলে আমরা মানুষের আকৃতিতে পশু হয়ে থাকবো। পশুতে আর মানুষে তফাৎ কী? তফাৎ শুধু এই যে, পশু শুধু জীবন ধারণই করে থাকে। প্রকৃতি আমাদের আলো দেয়, বাতাস দেয়, উত্তাপ দেয়, জল দেয়, তার জন্যে পশুকে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু যে-মানুষ প্রকৃতির এই অকৃপণ দানের জন্যে ট্যাক্স দেয়, সে-ই কেবল প্রকৃত অর্থে মানুষ। আর যে মানুষ তা দেয় না, সে মানুষ নয় পশু। এসব কথা আমাদের এই শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। এর জন্যে আমরা তাঁর কাছে ঋণী। আজ সেই ঋণ শোধ করবার লগ্ন এসেছে। তোমরা প্রতিজ্ঞা করো সবাই নিজের-নিজের মানবিক কর্তব্য পালন করে সেই ঋণ শোধ করবে। সুভাষ বোস তাঁর জীবনের মানবিক ঋণ শোধ করে গেলেন, এখন তাঁর

বাকি কাজটাও আমাদের শেষ করতে হবে, যদিও আমি বিশ্বাস করি না যে সুভাষ বোস মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর একটা রাজনৈতিক কূটনীতি। এই কূটনীতি আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের কর্তব্য সাধন করে পৃথিবীর দরবারে ফাঁস করে দিতে হবে। এখন আমাদের ভয় পেলে চলবে না। আরো সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। সুভাষ বোসের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। ইংরেজ সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সুভাষ বোসেরা অতো সহজে মরে না। সুভাষ বোসেরা অমর। জয়হিন্দ্—

দেবব্রতর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। আর তারপর যে-যার বাড়ি চলে গেল।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই মুকুন্দবাবুর বাড়িতে মাঝ-রাত্রে হঠাৎ জোরে জোরে ধাক্কা পড়লো।

রাখাল বাড়ির বাইরের দিকে শুতো বরাবর। সেদিনও সে বাড়ির কাজকর্ম শেষ করে রাত্রে নিজের জায়গাটায় গিয়ে যথারীতি শুয়েছে।

হঠাৎ দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে, কে?

বাইরে থেকে উত্তর এলো, দরজা খোলো, দরজা খোলো—

রাখাল ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতেই অবাক। অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবু তারই মধ্যে দেখা গেল পুলিশে-পুলিশে বাড়ির বাইরেটা ছেয়ে গেছে।

সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনারা কে?

পুলিশ সামান্য একজন চাকরের কথার জবাব দেবে এমন বেকুব তারা নয়। তারা দরজা খোলা পেয়ে হুড়-মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের সকলের হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় তারা বাড়ির ভেতরের ঘরে-ঘরে ধাক্কা দিতে লাগলো।

এমনিতে মিনতির রাত্রে ভালো ঘুমই হতো না। অর্ধেক রাতই তার জেগে-জেগে কাটতো। সেদিন বোধহয় তারও একটু তন্দ্রা এসেছিল। অতো রাত্রে তার ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তেই সে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তবে কি দেবব্রত তার ঘরে ধাক্কা দিচ্ছে? তার শরীরে যেন কেমন একটু রোমাঞ্চ হলো প্রথমে।

গলার আওয়াজটা নিচু করে একবার জিজ্ঞেস করলে, কে?

বাইরে থেকে ভারি গলার আওয়াজে কে যেন উত্তর দিলে, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—

তবু সে আবার জিজ্ঞেস করলে, কে?

—আমরা!

মিনতি এবার ভয় পেয়ে গেল। এ গলার আওয়াজ তো চেনা নয়।

কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার মনে করলে না। শুধু হুকুম হতে লাগলো, খুলুন দরজা, দরজা খুলুন—

মিনতি কী করবে বুঝতে পারলে না। মনে হলো যদি ডাকাত হয়! ডাকাত হলে যদি তারা তার ওপরে অত্যাচার চালায়? এমনিতেই একলা-একলা ঘরে শুতে তার বড়ো ভয় করতো। তার ওপর আবার এই উৎপাত! কী করবে সে, কাকে ডাকবে, কিছুই সে বুঝতে পারলে না। ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে তখন কাঁপছে।

তারপর শুধু তার ঘরেই নয়। তার মনে হলো সমস্ত বাড়িময় যেন অনেক লোকের ভিড়ের শব্দ হতে আরম্ভ করেছে। অনেক লোক যেন চারদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

শেষকালে মিনতির ঘরের দরজার পাল্লা দু'টো একবার বিকট শব্দ করে ভেতরে ভেঙে পড়লো। আর যমদূতের মতো কয়েকজন গুণ্ডা যেন হুড়-মুড় করে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বলতে লাগলো, আপনার স্বামী কোথায়? দেবব্রত সরকার?

মিনতি তখন ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে।

তারা তত্ক্ষণে খাটের তলায়, আলমারির পেছনে, আলনার সব কাপড়-চোপড়, উল্‌টে-পাল্‌টে আতি-পাঁতি করে কাকে খোঁজা-খুঁজি করতে আরম্ভ করেছে।

—বলুন আপনার স্বামী কোথায়? দেবব্রত সরকার কোথায় গেল বলুন?

মিনতি বললে, তিনি তো আমার ঘরে শোন না—

তারা বলে উঠলো, আপনার স্বামীই তো দেবব্রত সরকার? আপনি তো দেবব্রত সরকারের স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—তা আপনার স্বামী আপনার ঘরে শোন না, এ কি হতে পারে কখনও? আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমবা আপনাকেও গ্রেফ্‌তার করবো। চলুন আমাদের সঙ্গে—

মিনতির চোখ দু'টো ভয়ে ছল্‌-ছল্‌ করে উঠলো।

—চলুন।

অন্য ঘরেও তখন সার্চ হচ্ছে। মুকুন্দবাবু অসুস্থ মানুষ। তার ওপবে বৃদ্ধ হয়েছেন।

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চান আপনারা? আপনারা কারা?

একজন বলে উঠলো, আমরা পুলিশ।

পুলিশের নাম শুনে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন মুকুন্দবাবু। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ডাকাতের দল। অন্ধকারে তাদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

বললেন, তা আপনারা এ-বাড়িতে কেন? কী অপরাধ করেছি আমরা?

—আমরা দেবব্রত সরকারকে এ্যারেস্ট করতে এসেছি—

—কেন, সে কী করেছে?

—আমরা তাকে ডি. আই. রুলে ধরতে এসেছি।

—কী রুল বললেন?

পুলিশ বললে, ডিফেন্স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-এর রুলে। আমাদের ওপরওয়ালার হুকুমের বলেই আমরা এসেছি।

এর পরে মুকুন্দবাবু আর কী-ই বা বলবেন। তিনি যেন তখন বোবা হয়ে গেছেন। তাঁর বুকটা তখন ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করছে। আগে কখনও তাঁকে এমন করে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। আজ তাঁর ছেলের জন্যে এমন হেনস্থা হতে হচ্ছে তাঁকে।

এমন সময়ে তাঁর চোখের সামনেই এসে হাজির হলো দেবব্রত। তার হাত দু'টো হাত-কড়া বাঁধা।

সে-দৃশ্য তিনি আর দেখতে পারলেন না। তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ধপ্‌ করে মেঝের ওপর টলে পড়লেন।

দেবব্রতও দেখলে তার বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তার সামনেই। কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথাই বেরলো না।

শুধু বললে, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন, নিয়ে চলুন—

পুলিশও আর দাঁড়ালো না। তারাও সঙ্গে-সঙ্গে দেবব্রতকে নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। যেতে-যেতে দেবব্রতর কানে এলো মায়ের করুণ আর্তনাদ। মায়ের গলার কোনও শব্দই সে বুঝতে পারলে না, শুধু বুঝতে পারলে দু'টো শব্দ—ওরে খোকা, খোকা রে—

তারপর সোজা তাকে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় পুরে দেওয়া হলো।

সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে মানুষের যে কেমন অবস্থা হয় তা বোঝা গেল জেলখানায় গিয়ে। শুধু দেবব্রত নয়, দেবব্রতর আগে নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে আরো অনেকে জেল খেটেছেন। কে জেল খাটেনি? দেশবন্ধু জেল খেটেছেন, দেশপ্রিয় জেল খেটেছেন। ভগৎ সিং, সুকদেব, যতীন দাস, গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, আরো হাজার হাজার, আরো লক্ষ-লক্ষ লোক।

অনেকে ঝোঁকের মাথায় জেলে গেছেন। অনেকে আবার আদর্শের অনুপ্রেরণায় জেলে গেছেন। অনেকে জেল থেকে বেরিয়ে আবার এখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আজীবন পেন্‌সন্ ভোগ করছেন।

কিন্তু দেবব্রতর জেল খাটা ঠিক সে-রকম জেল খাটা নয়। দেবব্রতর আদর্শ দেশকে স্বাধীন করা। সেই স্বাধীন করার সংগ্রামটা হিংসা-নির্ভর না অহিংসা-নির্ভর, সে প্রশ্নটা গৌণ। কী ভাবে কেমন করে যে সেটা ঘটে গেল, তা সে ছাড়া আর কেউ জানতো না।

যে একজন জানতো সে হলো কানাই মল্লিক। পাড়ার বন্ধু ছিল। কিন্তু সে ততোদিনে মারা গেছে।

আর একজন যে জানতো সে বিনয়দা।

কিন্তু তিনিও তো তার মাত্র কয়েকদিন পরেই মারা গেছেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। সেদিন যে তিনজন সিম্‌পসনকে মারতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, অনেক মাস কেটে গেছে, অনেক বছর কেটে গেছে। সবাই হয়তো তাঁদের কথা ভুলে গিয়েছে। হয়তো শুধু তাঁদের নামটাই কোনও রকমে তাদের মনে আছে। কিন্তু দেবব্রত তার সেই বিনয়দাকে তখনও ভুলতে পারেনি। তখনও মনে আছে সেই দিনটার কথা, সেই রাতটার কথা, দৌলতপুরের শ্মশানে শ্মশানেশ্বরীর পায় হাত রেখে সেই প্রতিজ্ঞা-পালনের কথাটা।

জেলখানার ভেতরে বসে-বসে দেবব্রত যতোক্ষণ জেগে থাকতো, ততক্ষণ কেবল নিজের অসহায়তার কথা ভাবতো। ভাবতো—কেন সে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারলে না। দেশের আর দেশের মানুষদের জন্যে তো তার সব কিছু ত্যাগ, সব কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হলো!

জেলখানায় কারো সঙ্গেই তাকে মিশতে দেওয়া হতো না। যদিই বা কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো তো তাও অল্পক্ষণের জন্যে। কেউ এলেই দেবব্রত তাকে জিজ্ঞেস করতো—ভাই, তোমরা কিছু খবর পাও?

তারা জিজ্ঞেস করতো, কীসের খবর? আপনার বাবা-মা'র খবর?

দেবব্রত বলতো, না-না, ও-সব খবর নয়—

তাহলে আপনার স্ত্রীর খবর?

দেবব্রত সকলের ওপর খুব বিরক্ত হতো। সে যে বাড়ির খবরাখবরের জন্যে মোটেই চিন্তিত নয়, সে-কথা সে কাকে বোঝাবে?

শুধু জেলখানার ভেতরেই নয়, যতোদিন জেলখানার বাইরে সে ছিল, তখনও দেবব্রত দেখেছিল সবাই নিজেকে নিয়েই কেবল ব্যস্ত, সবাই সব সময়ে নিজের কথাই বড় বেশি করে

ভাবে, নিজের একটা বাড়ি হবে কী করে, কেমন করে নিজে অনেক টাকার মালিক হবে, কেমন করে সকলের চাইতে নিজে অনেক বড়ো হবে, এই সব চিন্তা নিয়েই সবাই বড় বেশি বিব্রত।

এ-সব জিনিস সে যতো বেশি লক্ষ্য করতো, ততোই মনে-মনে সে কষ্ট পেতো, তার জানা-শোনা সবাই কেবল ধুলো-কাদা বাঁচিয়ে চলতো, ধর্ম বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করতো না। দেশ আর দেশের মানুষরা যে ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, তারা যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে কোনও রকমে শ্বাস-প্রশ্বাস টেনে-টেনে বেঁচে আছে, সে-কথা তো কেউই ভাবছে না। তাহলে সুভাষ বোসের কীসের দায় পড়েছিল যে আই-সি-এস চাকরিটা ছেড়ে দিলে? কেন তাহলে দেশের কাজে জেলে গিয়ে ঢুকলো? কেনই বা আবার জেল থেকে পালিয়ে জাপানে চলে গিয়ে নিজের প্রাণটা খোয়ালে? কীসের জন্যে? কেন? এর কারণটা তো সকলেরই জানা। তাহলে দেশের সমস্ত মানুষ এত পরশ্রীকাতর হয়ে গেল কেন? তাহলে দেশের সমস্ত মানুষ কেন এত স্বার্থপর হয়ে গেল? কেন সবাই নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত? এর কারণ কী?

প্রশ্নগুলো দেবব্রত নিজেকেই করতো, আবার প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেই দিতে চেষ্টা করতো। কিন্তু সারা দিন রাত, সারা মাস, সারা বছর ভেবে-ভেবেও কোনও উত্তর সে পেত না।

অনেকেই জেল খাটে। ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময়ে দেশের এমন কোনও লীডার নেই যিনি জেল খাটেননি। পরবর্তীকালে তাঁরা সবাই-ই তাঁদেব ত্যাগের পুরস্কাব পেয়ে গেছেন। কেউ-কেউ মিনিস্টার হয়েছেন, কেউ-কেউ আবার চীফ মিনিস্টারও হয়েছেন, যাঁরা তা হতে পারেন নি, তাঁরা পাচ্ছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পেনসন্।

কিন্তু দেবব্রত সরকার?

সুপ্রভাত বললে, দেবব্রত সরকার ছিল অন্য জাতের মানুষ, অন্য ধাতের। বহুকাল আগে একদিন দৌলতপুরে শ্মশানেশ্বরী দেবীর পায়ে হাত ছুঁইয়ে সে যে-প্রতিজ্ঞা কবেছিল, তা আর সে কোনওদিন ভুলতে পারেনি, তা-ই তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

জেলের ভেতরে থেকেই সে বাইরের জগতের সমস্ত খবর পেয়ে যেত। কখন কবে কা'কে পুলিশ ধরলে, কে কী স্টেটমেণ্ট দিলে, জেলখানার ভেতরে সে-সমস্ত খবরও চলে আসতো।

তখন সে এক বিচিত্র সময় চলছে দেশের। অনেক দিন আগে সুভাষ বোস ত্রিপুরী কংগ্রেসে সকলের ভোটে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন তাঁর জায়গায় পট্টভি সীতারামিয়া প্রেসিডেণ্ট হোন। তা না হওয়াতে গান্ধীজী রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।' কিন্তু ভোটের বিচার গান্ধীজী মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু তবু ষড়যন্ত্র শুরু হলো কী করে সুভাষ বোসকে প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে হঠানো যায়। শেষকালে 'ওয়ার্কিং কমিটি'র সমস্ত মেম্বাররা একসঙ্গে পদত্যাগ করলেন, সুভাষ বোস তখন কাকে নিয়ে কংগ্রেস চালাবেন? তিনি একেবারে একলা হয়ে গেলেন।

এ-সমস্ত কিছুই সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

কিন্তু ইতিহাস তো কাউকেই ক্ষমা করে না। গান্ধীজী বললেন, 'After all Subhas Bose is not an enemy of the Country.'

সুভাষ বোস তখন তাঁর নিজের একটা নতুন দল গড়লেন, নাম দিলেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। ঠিক করলেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'কেই তিনি কংগ্রেসের মতো একটা বড়ো দলে পরিণত করবেন। কিন্তু তা পারলেন না। ওদিকে তখন যুদ্ধ বেধে গেছে। আর তিনি তখন জেলখানায়।

সুভাষ বোস তখন ভাবলেন—এই-ই সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কী করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তিনি? মনস্থির করে নিলেন যে তিনি জেল থেকে যেমন করে হোক পালাবেন। কিন্তু ইংরেজদের জেলখানা থেকে পালানো অতো সোজা?

তখন তিনি এক নতুন প্ল্যান ঠিক করলেন। সে এমন এক প্ল্যান যাতে কেউ কোনও সন্দেহ করতে না পারে।

সে-সব কথা এখন সবাই জানে।

কিন্তু অতো সহজে তো দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না। তাড়াতে হলে ত্যাগ নয়, আঘাত করতে হবে। জেলখানার ভেতর থেকে কি সে-আঘাত করা যাবে? সমস্ত দিন-রাত এই সব চিন্তাই মাথায় ঘুরঘুর করতো। আর যতোটুকু খবর বাইরে থেকে ভেতরে আসতো, সেই সব খবর নিয়েই মনটা কেবল তোলপাড় করতো।

জেলখানার ভেতরে যারা থাকতো তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে অনেকের আত্মীয়-স্বজনরা আসতো।

কিন্তু কেউ কোনও দিন দেবব্রত সরকারের সঙ্গে দেখা করতে আসতো না। আশেপাশে যারা থাকতো তারা জিজ্ঞেস করতো—আচ্ছা দেবুদা, আপনার কাছে কেউ দেখা করতে আসে না কেন? দেবব্রত তার উত্তরে শুধু হাসতো। বলতো, আমার আর কে আছে যে এখানে দেখা করতে আসবে?

—কেন, আপনার বাবা কিংবা মা?

—তাঁদের বয়েস হয়ে গিয়েছে, তাঁরা এতদূরে আসবেন কী করে?

অনেকে বলতো. কিন্তু আপনার স্ত্রী? তিনি তো বুড়ো মানুষ নন। তিনি তো একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন?

দেবব্রত এ-সব কথার উত্তর দিত না। বলতো, আমার স্ত্রীরও তো সংসারের কাজ-কর্ম আছে। সে-সব কে দেখাশোনা করবে?

তারা বলতো, তার জন্যে তো অনেক লোকজন আছে। বাড়িতে লোকজন তো কম নেই। তারাও তো একবার আসতে পারেন?

দেবব্রত বলতো. না এলেই তো ভালো হে—

—কেন, ভালো কেন? আপনার কি তাদের কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

দেবব্রত বলতো, না।

তারা দেবুদা'র উত্তর শুনে হতবাক হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করতো, কেন? দেখতে ইচ্ছে করে না, কেন?

দেবব্রত বলতো, দেখ, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। এ-পৃথিবীর মানুষগুলোকে আমার ভালো লাগে না।

—কেন?

দেবব্রত বলতো, স্বার্থের জন্যে সবাই সবাইকে ব্যবহার করে। বাপ ছেলেকে ভালোবাসে স্বার্থের তাগিদে। মা বাপকে ভালোবাসে, তাও স্বার্থের তাগিদে। সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক কেবল স্বার্থের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আসলে কেউ কাউকে ভালোবেসে কাছে টানে না। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের মাথায় আর কিছুই ঢোকে না।

সবাই অবাক হয়ে যেত দেবুদার কথা শুনে।

দেবুদা বললে, এই যে দেখছো ইংরেজরা আমাদের দেশে রাজত্ব করছে প্রায় দু'শো বছরের ওপর, এরও কিন্তু সেই একই কারণ। প্রয়োজন। মুশকিল হয়েছে কি, আমরা না তাড়ালে তারা যাবে না।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, আর এই যে আমরা ইংরেজদের পেলেই খুন করছি, এও সেই একই কারণে। কারণটা হলো তাদের কোনও রকমে তাড়িয়ে দিতে পারলে আমরা সবাই তাদের খালি সিংহাসনগুলোতে বসবো। তারা এখানে লাটবড়োলাট হয়ে রাজত্ব করছে।

তারা চলে গেলে আমরাই কেউ-কেউ তাদের ফেলে যাওয়া চেয়ারগুলোতে বসবো। আমরা কেউই দেশকে ভালোবাসি না। আমরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না।

—তা এ বন্ধ করবার উপায় কী?

দেবু বলতো, এর একমাত্র উপায় 'চরিত্র-গঠন' করা। আমাদের দৌলতপুরের সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন এই সব কথাই বলতেন। আমাদের নিজেদের চরিত্র-গঠন না করতে পারলে, ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েও কিছু লাভ করতে পারবে না।

কথাগুলো জেলখানায় যারাই শুনতো, তারাই অবাক হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করতো, তাহলে হাজার-হাজার লোক যে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, আব দিচ্ছে, তার কি কোনও দাম নেই?

দেবুদা বলতো, না, ইংরেজবা যতোদিন আছে ততোদিন একটু শান্তি আছে। কিন্তু যেদিন ওরা চলে যাবে, সেদিন থেকেই চেয়াব দখল করার জন্যে আবার মারামারি, লাঠালাঠি, খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে—

—তাহলে ইংবেজদের খুন করে কোনও লাভ হয়নি?

দেবব্রত বললে, না।

—কেন?

—লাভ হয়নি এই জন্যে যে আমাদের সকলেব জীবনেবই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নেওযা', দেওয়া নয়। আমরা সব কিছু পেতে চাই, কেউ কিছু দিতে চাই না। ইংরেজরা চলে গেলে ওই নেওয়ার ইচ্ছেটা আরো বেড়ে যাবে, আমাদের মধ্যে তখন সবাই প্রেসিডেণ্ট হতে চাইবে, সবাই প্রাইম-মিনিস্টার হতে চাইবে, সবাই কেবল মিনিস্টার হতে চাইবে। অথচ ও-সব পোস্ট তো বেশি নেই। তখন লাগবে বন্ধুতে-বন্ধুতে ঝগড়া, ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া, বাপ-ছেলেতে ঝগড়া। দেখবে, তখন কী সব খুনোখুনি কাণ্ড চলবে দেশের ভেতর, আর বাইরেব দেশগুলোও আমাদের দেশটাকে টুকরো-টুকরো করে দেবে। আমাদের মধ্যে তখন কে রাজা হবে, কে মন্ত্রী হবে, তাই নিয়ে দিনরাত ঝগড়া চলতে থাকবে। সে এক ভয়ঙ্কর দিন আসছে আমাদের সামনে।

সুপ্রভাত কথা বলতে বলতে থামলো।

বললাম, কই, সেই ঝর্ণা দেবীর কথা তো বললে না।

সুপ্রভাত বললে, বলছি, বলছি। যথা সময়ে সমস্ত কথাই বলবো।

জেলের ভেতরে যখন এই সব কাণ্ড চলছে, তখন যুদ্ধ শেষ হলো, তখন যারা ইণ্ডিয়ান-আর্মিতে কাজ করতো, তারা ছুটি পেয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মন তখন বিগড়ে গেছে।

সে ১৯৪৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী।

বোম্বাই-এর জাহাজ-ঘাটায় এ্যাড্‌মিরাল গড্‌ফ্রে যখন একদিন তাঁর যুদ্ধ-জাহাজে টহল দিচ্ছেন, তখন পেছন থেকে নেভির লোকরা তাঁকে অপমান করবার জন্যে গালাগালি দিতে লাগলো। বেড়ালের ডাক ডাকতে লাগলো।

ব্যাপার দেখে গড্‌ফ্রে ভয় পেয়ে গেলেন।

এ-রকম ব্যবহার তো বরদাস্ত করা যায় না। এদের প্রশ্রয় দিলে এরা তো একদিন তাঁকে তাঁর চেয়ার থেকে হটিয়ে দেবে।

তিনি সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম্ দিলেন, সকলকে অ্যারেস্ট করো—

তা তাই-ই করা হলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতিবাদে সমস্ত জাহাজের নেভির লোকরা হঠাৎ ধর্মঘট করে বসলো, সে এক ভয়ঙ্কর ধর্মঘট। আমরা কেউ কোনও কাজ করবো না, আমরা কোনও নিয়মকানুন মানবো না। আমরা আজ থেকে বিদ্রোহ শুরু করে দিলাম, দেখি এ্যাড্‌মিরাল গড্‌ফ্রে কী করতে পারে?

বলে সব জাহাজের মাথা থেকে 'ইউনিয়ন জ্যাক' ফ্ল্যাগ টেনে নামিয়ে দিলে আর তার জায়গায় কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ আর মুসলিম লীগের চাঁদ-তারা মার্কা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিলে।

তার জের চললো কলকাতার পোর্টেও। সেখানেও নেভীর লোকরা সবাই বিদ্রোহ করবার জন্যে তৈরি হলো।

এ এক মহা দুর্যোগের দিন ইংরেজদের পক্ষে।

এমন সময় ইংলণ্ডের নতুন প্রাইম মিনিস্টার লর্ড এ্যাটলী ঘোষণা করলেন—আমি এবার ইণ্ডিয়াকে স্বাধীন করে দেব। এই কাজের জন্যে আমি ইণ্ডিয়াতে নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটনকে পাঠাচ্ছি।

ওদিকে মোহম্মদ আলি জিন্না আর বল্লভভাই প্যাটেলও বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য করে কাগজে স্টেটমেণ্ট দিলে ধর্মঘট তুলে নিতে।

তখন বিদ্রোহীদের তরফ থেকে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হলো।

লর্ড এ্যাটলী সাহেবও বুঝলো যে, এর পর আর ইণ্ডিয়াতে থাকা চলবে না ইংরেজদের।

এর ফলে ইণ্ডিয়ার জেলখানায় যতো স্বদেশী লোকেরা বন্দী ছিল, তারা জেল থেকে ছাড়া পেলে।

জেল থেকে বেরিয়ে দেবব্রত বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সেখান থেকে সোজা এসে পৌঁছলো কাকার বাড়িতে।

গোষ্ঠ তখন বাজার করে ফিরছিল। কলকাতার পাড়ায়-পাড়ায় তখন উত্তেজনা। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা। সন্ধ্যের পর থেকে আর কেউ বাইরে বেরোয় না। কেউ বাড়ি ফিরতে দেরি করলে বাড়ির লোক বড়ো ভাবনায় পড়ে। একবার বাড়ি থেকে কেউ বাইরে বেরোলে, আবার নিরাপদে বাড়িতে ফিরতে পারবে কি-' তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

গোষ্ঠই আগে দেখতে পেয়েছে। বললে, এ কি দাদাবাবু, আপনি? এখন কোথা থেকে আসছেন?

দেবব্রত বললে, জেল থেকে—

—এই-ই প্রথম এলেন?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ, এতদিন তো জেলখানাতেই ছিলুম। এর পরে এখান থেকে দৌলতপুরে যাবো।

গোষ্ঠ দৌলতপুরের নাম শুনেই কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা বলতে গিয়েও সে থেমে গেল।

দেবব্রত জিজ্ঞেস করলে, কাকা কোথায় রে?

—বাবু তো দৌলতপুরে :

—সে কী? কেন?

গোষ্ঠ বললে, সে কী, আপনি শোনেন নি কিছু?

—আমি কী শুনবো? আমি তো জেলখানাতেই ছিলুম এতদিন, সেখানে বাইরের কোনও খবর পৌঁছতো না—

গোষ্ঠ আর কিছু না বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেবব্রতকে বললে, আপনি ভেতরে আসুন—

—কাকা যখন নেই তখন আর তোমাদের বাড়িতে ঢুকে কী হবে, আমিও দৌলতপুরে যাই—

গোষ্ঠ বললে, না না, ভেতরে এসে বসুন, এখুনি এলেন, একটু জিরিয়ে নিন। আমি আপনার জলখাবার তৈরি করে দিচ্ছি। চান-টান করুন। এতদিন পরে এলেন, এসেই চলে যাবেন?

দেবব্রত বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। গোষ্ঠও রান্নাঘরে গিয়ে দাদাবাবর জন্যে জলখাবারের যোগাড় করতে লাগলো।

মানুষ যখন প্রথম চলতে শেখে তখন মাঝে মাঝে পড়ে যায়। কিন্তু পড়ে গেল বলে থেমে থাকলে তার চলে না। ভবিষ্যতে যাকে একদিন বড়ো হয়ে অনবরত চলতে হবে, তাকে এখন পড়ার জন্যে ভয় করলে চলবে না। তখন তো তার চলার সময়ে কেউই তাকে সঙ্গ দেবে না—একলা চলার প্রতিজ্ঞা নিয়েও তাকে দুর্গমের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এ-সব কথা ছোটবেলায় সুলতান আহ্‌মেদ সাহেবই তাকে শিখিয়েছিলেন। তখন থেকেই সে জানতো যে তাকে চালাবে সে তার মন নয়, সে তার শরীর নয়, সে তাব নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠার জোরেই একদিন প্রকৃতরূপে মানুষ হয়ে উঠবে সে। তার জন্যে তাকে সমস্ত রকমেব কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

একদিন কলকাতাতে থাকতেই হলো তাকে।

পরের দিনই দেবব্রত গোষ্ঠকে বললে, আমি আজ যাই গোষ্ঠ, আর দেরি করতে পারবো না—

গোষ্ঠও সকাল-সকাল খাবার তৈরি করে দিলে। যোগাড়-যন্ত্র করবার প্রশ্নই আসে না। কারণ সঙ্গে তার মালপত্র, বাক্স-বিছানা কিছুই নেই। যেমন খালি হাতে পুলিশ তাকে ধরে জেলে পুরেছিল, তেমনি নিঃস্ব অবস্থাতেই তাকে তারা জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

—আমায় কিছু টাকা দিতে পারো গোষ্ঠ?

গোষ্ঠ বললে, কতো টাকা চাই, বলুন না—

—এই দশ বারো টাকা যা পারো দাও। পরে দৌলতপুর থেকে টাকাটা তোমায় পাঠিয়ে দেব। ট্রেন ভাড়াটা সঙ্গে নিলেই চলবে।

সেই টাকা নিয়েই দেবব্রত তাড়াতাড়ি রওনা দিলে দৌলতপুরের দিকে। 'শেয়ালদা' স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটতেই যা দেরি। টিকিটটা কেটে সে প্লাটফরমে ঢুকলো, একটা ট্রেন এসে পৌঁছলো ঠিক সেই সময়ে। সেই ট্রেন থেকে নামলো হাজার-হাজার লোক!

এত লোক তো আগে এমন করে নামতো না। দেখে মনে হলো তারা যেন সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসছে। কারো সঙ্গে অথর্ব বুড়ো-বুড়ি, কারো কোলে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে। সকলেরই মুখে-চোখে আতঙ্কের ছাপ, সবাই-ই যেন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত।

সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ দেখা গেল কাকাকে।

—কাকা আপনি?

—তুই?

কাকা যতো অবাক, দেবব্রত ততো অবাক।

—আপনি কোত্থেকে? দৌলতপুর থেকে? আমি তো দৌলতপুরেই যাচ্ছি—

কাকা বললে, তোকে আর দৌলতপুরে যেতে হবে না। আমিও সেখান থেকেই ফিরছি। সেখানে আর কেউ নেই—

—নেই মানে?

কাকা তাকে হাত দিয়ে ধরে বললেন, চল্, আমার বাড়িতে চল্। তোকে সব বলবো।

বলে রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরেই তাতে দেবব্রতকে ওঠালেন।

গাড়িতে আসতে আসতেই দেবব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, দৌলতপুরে গিয়ে কেমন দেখলেন আপনি? সবাই ভালো তো?

কাকা কথাটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, তুমি এতদিন জেলখানায় ছিলে, বলো, কোনও অসুবিধে হয়েছিল নাকি?

—অসুবিধে তো হবেই। আরামের জন্যে তো কেউ জেলে যায় না।

কাকা এ-কথার জবাবে কিছু বললেন না। শুধু বললেন, এদিকে দেশের অবস্থাও তো খুব খারাপ! তুমি কিছু শুনেছ?

—আমি তেমন কিছু শুনিনি। আর আপনি তো জানেন, আমি এমনিতেও কখনও বাজে কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করি না।

—তবু কানে তো কিছু আসতে পারে।

—কানে কিছু এসেছে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনি।

—কী কানে এসেছে তোমার?

—সবাই বলছিল বৃটিশ গভর্মেণ্ট নাকি ঠিক করেছে যে, তারা ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে। তাই তারা কে এক লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে নাকি এখানে ভাইসরয় করে পাঠিয়েছে।

গোলকেন্দুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মনে করো ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

—আমার তো সন্দেহ হয়—

কাকা বললেন, আমারও সন্দেহ হয়! সেই জন্যেই তো তারা সমস্ত দেশে আগুন জ্বেলে দিয়েছে!

—কীসের আগুন?

কাকা বললেন, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের লড়িয়ে দিয়েছে যে।

—তাই নাকি?

কাকা বললেন, সেই জন্যেই তো পার্ক-সার্কাস অঞ্চলে যতো হিন্দু ছিল সবাই শ্যামবাজার, ভবানীপুর, আলিপুরে চলে এসেছে। আর আমাদের এদিকে যতো মুসলমান ছিল, সবাই পার্ক-সার্কাসে চলে গেছে। তাই তো এতদিন সন্ধ্যের পর কারফিউ চলছিল। সেইসব দেখেই তো আমি দৌলতপুরে চলে গিয়েছিলুম।

সেখানে গিয়ে কী দেখলে?

এ-কথার উত্তর দেওয়ার আগেই হঠাৎ দেখা গেল রাস্তা বন্ধ! একদল পুলিশ বন্দুক নিয়ে সব গাড়ি-ঘোড়া-বাস-ট্রাম আটকে দিচ্ছে। ওদিকে যাওয়া নিষেধ। তাদের ট্যাক্সিকেও তারা অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিলে।

কাকা বললেন, হঠাৎ আবার কী হলো? আবাব গণ্ডগোল শুরু হলো নাকি?

অথচ দেবব্রত কয়েক ঘণ্টা আগে ওই পথ দিয়েই এসেছে। তখন অতো পুলিশ-পাহারা দেখেনি। আসলে তারা লাল-পাগড়ি পরা পুলিশ নয়, প্যারা মিলিটারি পুলিশ।

কাকা বললেন, ক'দিন আগে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। তাই গান্ধীজী এখন কলকাতায় এসে রয়েছেন। উনি না এলে আরো খুনোখুনি হতো।

বাড়িতে আসার পর গোষ্ঠ জিজ্ঞেস করলে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?

গোলকেন্দুবাবু বললেন, কাজ হয়ে গেল, তাই ফিরে এলুম।

তখনও কিন্তু তাঁর মনের ভয় যাচ্ছে না। বললেন, হ্যাঁরে, কলকাতার খবর কী? আর খুন-খারাবি হয়েছে এখানে?

গোষ্ঠ বললে, হ্যাঁ, এখানেও খুনোখুনি হয়েছে খুব। সন্ধ্যের পর কেউ আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। আপনি চলে যাওয়ার পর এখানে খুনোখুনি আরো বেড়ে গিয়েছিল—এখন একটু থেমেছে।

দেবব্রত বললে, আমি তাহলে এই সময়ে দৌলতপুরে যাই। ওখানে বাড়িতে কে কেমন আছে দেখি গিয়ে। আমাদের ছেলেরা সব রয়েছে ওখানে। তারা খবরও পাচ্ছে না আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি কিনা, তারাও খুব ভাবছে—

গোলকেন্দুবাবু বললেন, দেশের এই অবস্থায় ওখানে গিয়ে তোমার কী হবে? অবস্থা একটু স্বাভাবিক হোক, তখন যেও।

কিন্তু দেবব্রত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো দৌলতপুরে যাওয়ার জন্যে। সে যাবেই সেখানে কারণ তার ক্লাবের সব ছেলেরা সেখানে কী করছে তার খবর নেওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস থেকেই দেশের হালচাল খারাপ হচ্ছিল। তারপর আরো এক বছর কেটে গেছে। তখন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। কলকাতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুনোখুনি লাঠালাঠি সেই ১৯২৫ থেকেই তা চলে আসছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালেই খুনোখুনিটা আরো বিরাট আকার ধারণ করলো। তারপর এলো ১৯৪৭ সাল।

তখন থেকেই গণ্ডগোলটা আরো বেড়ে গেল। একদিন কাকাকে না বলেই দেবব্রত দৌলতপুরে চলে গিয়েছিল। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না।

একদিন বাড়িতে এসে দেবুকে না পেয়ে গোষ্ঠকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তোর দাদাবাবু কোথায়?

গোষ্ঠ বললে, তা তো জানি না বাবু, তিনি তো খেয়ে-দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গোলকেন্দুবাবুর খুব ভয় হলো। তখন দিনকাল খুব খারাপ, এ-সময়ে কোথায় গেল সে? একদিন কাটলো, দু'দিন কাটলো, তবু দেবুর দেখা নেই। বড়ো ভাবনায় পড়লেন তিনি।

তিনি বুঝতে পারলেন না কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন। কাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন দেবুর কথা। কে বলতে পারবে তার ঠিকানা? তবে কি দেবু সেই দৌলতপুরেই ফিরে গেল?

কিন্তু দেবব্রতর কথা ভাবলে তো চলবে না তাঁর। তাঁরও তো স্কুল আছে, ছাত্ররা আছে। তাদের কথাও তো ভাবতে হবে!

সেদিনও ছাত্ররা বাড়িতে পড়তে এলো। তিনি তাদের নিয়ে পড়াতে বসলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত মনটা পড়ে রইলো সেই দেবুর দিকে।

তবে কি দেবুর কোনও বিপদ-আপদ হলো?

তখনকার কলকাতার যা অবস্থা তাতে সব কিছুই সম্ভব। কারো জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কেউ যে কোনও দিন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে।

শেষকালে চারদিন পরে দেবু এসে হাজির হলো। দেবুর শরীরের অবস্থা দেখে তিনি চমকে উঠলেন। তার মুখে শরীরে আঘাতের চিহ্ন। রক্তের দাগ লেগে আছে তার জামা-কাপড়ে।

তিনি দেবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

দেবু তখন ভালো করে কথাই বলতে পারছে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? তোমার এ-দশা কে করলে? প্রথমে কথার উত্তরও দিতে পারলে না দেবু।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলো দেবু, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কোনও কথারই জবাব দিতে পারে না দেবু।

তিনি গোষ্ঠকে বললেন, পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে।

শেষকালে ডাক্তারবাবু এসে দেখে শুনে পরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে, কেউ কোনও ভারি জিনিস দিয়ে ওকে আঘাত দিয়েছে!

তিনি ওষুধ দিয়ে গেলেন আর একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন।

সেই ওষুধটা খেয়ে দেবু একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর যখন সে চোখ খুললো তখন গোলকেন্দুবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছিল তোমার? কেউ তোমায় কি মেরেছে? আমি কতো করে বললাম কোথাও বেরিও না। দিনকাল বড়ো খারাপ। এখন যতোটা সম্ভব বাড়ির বাইরে বেরোন উচিত নয়। তবু বেরোলে কেন? কী হলো তোমার? এ-রকম হলো কেন তোমার?

তব কোনও জবাব দিলে না দেবু। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে। কাকা ভাবলেন—ঘুমোনই ভালো। আরও ঘুমোক—বলে আর দেরি করলেন না। তাঁরও তো স্কুল আছে, তাঁরও তো ছাত্ররা আছে। সে-দিকটাও তো দেখতে হবে তাঁকে।

সেদিন দেবুর অবস্থা একটু ভালো বলে মনে হলো। কাকা মুখের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন আছো তুমি দেবু?

দেবু কোনও উত্তর দিলে না কাকার প্রশ্নের।

কাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি এ ক'দিন?

দেবু বললে, দৌলতপুরের খবর তো আমায় কিছুই বলেননি আপনি? বললে ক্ষতি কী হতো?

গোলকেন্দুবাবু বললেন, দৌলতপুরের কী কথা?

—আমার বাবা মা সবাই মারা গেছেন, সে-কথা তো আমায় বলেননি!

—তুমি কী দৌলতপুরে গিয়েছিলে নাকি?

দেবু বললে, হ্যাঁ—

—তুমি দুঃখ পাবে বলেই কিছু বলিনি। জানলে তো তুমি তার প্রতিকার করতে পারতে না?

দেবু বললে, কে বললে আমি প্রতিকার করতে পারতুম না? আমি ওখানে থাকলে এত অনাচার, এত অত্যাচার হতে দিতুম না। আমি আমাদের ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে সব মানুষকে বাঁচাতাম। দরকার হলে জীবন দিতুম।

—কিন্তু আমি যাওয়ার আগেই তো সব সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আমি তো দৌলতপুরে গিয়ে সব শুনেই চলে এলাম। আমার তো অতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা নয়। আমি

ওখানে গিয়েছিলুম দু'চারদিন থাকবো বলে। কিন্তু দৌলতপুরে পৌঁছিয়েই দেখলুম যে আমার যাওয়ার আগেই সব সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। তবু আমি ওখানে থাকতুম। কিন্তু ওরাই আমাকে ফিরে আসতে বললে। ওরাই বললে, এখানকার লোক সবাই ক্ষেপে গেছে, এখানে থাকলে আপনাকে আমরা আর বাঁচাতে পারবো না!

দেবু শুনছিল আর কথাও বলছিল। কিন্তু চোখ দিয়ে তার এক ফোঁটা জলও পড়ছিল না।

কাকা জিজ্ঞেস করলেন, আর মিনতির কথা শুনেছ তো?

দেবু বললে, হ্যাঁ—

—কিন্তু কেন এমন হলো বলো তো? মিনতি অতো ভালো মেয়ে, সে কেন অমন করলে? জীবন দিতে পারলে না মিনতি? এর চেয়ে তো জীবন দেওয়াও ভালো ছিল। অথচ সাহাবুদ্দীনও তোমায় কতো শ্রদ্ধা করতো! প্রাণের মায়া কি ইজ্জতের চেয়েও বড়ো হলো? ইজ্জত বড়ো, না জীবন বড়ো?

তারপর একটু থেমে তিনি আবার বললেন, যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর ভাবনা করে লাভ নেই।

দেবু বললে, অথচ আপনি তো জানেন, সুলতান আহ্‌মেদ সাহেব কতো মহৎপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তারপর কতো লোক এই দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে কতো নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিলে। আজ কি তার এই পরিণতি?

—তুমি দৌলতপুরে যাওয়ার আগে যদি এ-সম্বন্ধে আমাকে একবার বলতে, তাহলে আর তোমার এই কষ্ট হতো না!

দেবু চুপ করে রইল। গোলকেন্দুবাবু খানিক পরে বললেন, শেষকালে সাহাবুদ্দীনও কিনা তোমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করলে? এককালে সেও তো তোমার ছাত্র ছিল! ছিল না?

দেবু বললে, আপনি তো জানেন সব!

কাকা বললেন, হ্যাঁ, সবই তো আমি জানি। তুমি তো বিয়ে করতেই চাওনি কখনো, শুধু আমি কেন, সে-কথা দৌলতপুরের সবাই জানে। তুমি তো কেবল মুচিপাড়ায় কিংবা মুসলমানপাড়ায়, কোথায় কে অসুখে পড়েছে, কার কী বিপদ হয়েছে, কে খেতে পাচ্ছে না, তাই নিয়েই থাকতে। বাড়ির ভালো-মন্দর কথা তো কখনও তুমি ভাবোনি। দাদার তো সেইটাই দুঃখ ছিল! দাদা অনেকবার আমার কাছে এই বলে দুঃখ করেছে যে, দেবু আমাদের কাউকে দেখে না।

এবার দেবু কিছু উত্তর দিলে না।

কাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা তোমার সঙ্গে গাঁয়ের কারোর সঙ্গে দেখা হলো না?

দেবু বললে, আমি তো দৌলতপুরে যেতেই পারলুম না—

—কেন?

দেবু বললে, স্টেশনে নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে যেই একটুখানি গেছি, তখনই গুণ্ডারা এসে আমার গাড়িকে থামিয়ে দিলে।

—সে কী?

দেবু বললে, হ্যাঁ, দেখলুম সেই যশোর আর সে-যশোর নেই। এরই মধ্যে সেখানে সব কিছু বদলে গিয়েছে। কারো বাড়িতে আলো জ্বলছে না। আমাকে গাড়ি থেকে তারা ধরে-বেঁধে নামিয়ে দিলে।

—তুমি তোমার নাম-ধাম বলেছিলে?

—হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলুম আমার নাম বললে সবাই চিনতে পারবে। কিন্তু তা হলো না। উল্‌টে আমাকে গালাগালি দিতে লাগলো। অথচ আমি তো কোনও দোষ করিনি।

—তারপর?

তারপরের ঘটনাও বললে দেবু। শেষকালে তার বহুকালের বন্ধু রসুল মিয়ার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়ে গেল।

রসুল দৈবক্রমে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেবুকে চিনতে পেরেছে। বললে, আরে দেবুদা না?

সেদিন রসুল মিয়া সেখানে না থাকলে কী যে হতো তা বলা যায় না। সেই রসুলই তাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই তাদের বাড়িতে গিয়েই দেবব্রত দৌলতপুরের সব খবর জানতে পারলে। একদিন নাকি হঠাৎ একদল গুণ্ডা তাদের বাড়িতে যাদের সামনে পেয়েছে তাদের—বাবা-মা-রাখাল কেউ-ই বাদ পড়েনি।

—আর মিনতি?

—রসুল বললে, সাহাবুদ্দীন এসে নাকি তার একদিন আগেই মিনতিকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। তার হদিস কেউ জানে না।

তারপর রসুলও আর বেশিদিন দেবুকে নিজে না রেখে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও দেবু রেহাই পায়নি। ট্রেনও পুরোপুরি কলকাতা পর্যন্ত আসতে পারেনি। কোনও রকমে দর্শনা স্টেশন পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল। তারপর দু'মাইল হেঁটে এপারে এসেছে। সে যে কতো কষ্ট, কতো অত্যাচার, কতো ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে, চেক্‌পোস্টেও কতো হয়রানি সহ্য করতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। এপারে মুসলমানদের যতো অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, ওপারের হিন্দুদেরও তেমনি অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে।

সব শুনে গোলকেন্দুবাবু বললেন, এর শেষ কোথায় তাই আমি কেবল ভাবছি। আমারও তো তোমার মতো অবস্থা হয়েছিল। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম এই জন্যে যে, নতুন লোক বলে আমি হিন্দু কি মুসলমান তা কেউ চিনতে পারেনি। আমি নিজেও কাউকে আমার পরিচয় দিইনি। যখনই শুনলাম দাদা আর বউদি খুন হয়ে গিয়েছে, তখন আর দাঁড়াইনি সেখানে, আর ট্রেনটা সেদিন ঠিক সময়ে চলেছিল।

কলকাতায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের সেই দিনে প্রায় এক লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে নারকেলডাঙাব একটা মাঠে। তার মধ্যে হিন্দু আছে, খ্রীষ্টান আছে, মুসলমান আছে। গরীব ভিখিরি আছে, পয়সাওয়ালা বড়লোকরাও আছে। যাদের এতদিন দাঙ্গার ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোবার সাহস হয়নি, তারাও জড়ো হয়েছে সেখানে। আর শুধু কি তাই, আশেপাশের চারদিকের বাড়ির ছাদে, বারান্দায় হাজার-হাজার লোক সেই মাঠের দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই আগ্রহ গান্ধীকে দেখতে, গান্ধীর কথা শুনতে। তারা খবরের কাগজে পড়ে জানতে পেরেছে, পাঞ্জাবে দিল্লীতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সব সম্পত্তি ফেলে রেখে প্রাণের দায়ে দিল্লী ছেড়ে পাঞ্জাবের পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, আর ওদিকে পাঞ্জাবের দিক থেকেও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সব সম্পত্তি ছেড়ে দিল্লীতে চলে এসেছে। কতো মানুষ যে তার ফলে প্রাণ হারিয়েছে, তার রেকর্ড কোথাও নেই। সেখানকার খবর যতো কলকাতায় এসে পৌঁছোচ্ছে, এখানে এই কলকাতায়ও ততো লোকের প্রাণ ভয়ে শিউরে উঠছে। পূর্ব পাকিস্তানেও ততো হাঙ্গামা শুরু হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যারা যারা ফিরে দিল্লীতে এসে পৌঁছোচ্ছে, দিল্লীতে কলকাতায় ঢাকাতেও তার নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

এর মধ্যে একটু শুধু আশার আলো দেখিয়েছেন গান্ধীজী। তিনি দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। এসে উঠেছেন সাধারণ একটা বস্তি-পাড়ায় ঃ যেখানে মুসলমানরাও থাকে, আবার হিন্দুরাও থাকে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে।

এক সময় তিনি এসে পৌঁছলেন সেই ভিড়ের মধ্যে। তাঁদের দুঃখের কথা ভেবে তিনি তাঁদের মধ্যে এসেছেন। তাঁর কথা শুনতেই কলকাতার হিন্দু-মুসলমান সবাই একই আসরে এসে জুটেছে।

তারপর যখন সেই দুর্বল মানুষটা এসে মঞ্চের ওপর উঠলেন, তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিড়ের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত রহস্যময়তার স্রোত বয়ে গেল।

—ভাইও ওউর বহিনো—

জমায়েতের সমস্ত লোক উৎকর্ণ হয়ে শুনছে গান্ধীজীর কথা।

—আমাকে চারদিক থেকে লোকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমি নাকি কলকাতার সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। আমি কেউ নই। এই সম্মান আমার নয় আপনাদের। আপনাদের শুভবুদ্ধির জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক শান্তি না স্থায়ী শান্তি তা আমি জানি না। যদি সাময়িক শান্তি হয় তাহলে কিন্তু ভয়ের কথা। একে স্থায়ী করতে গেলে আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমার একলার দ্বারা এ সম্ভব হবে না। আমি তো এর জন্যে আমার সকল চেষ্টা চালিয়ে যাবোই, কিন্তু আপনারাই আমার ভরসা। আপনাদেরও সাহায্য করতে হবে আমাকে। সাম্প্রদায়িকতা একটা ক্যানসারের ক্ষতের মতো। তা নিরাময় করতে হলে চাই চিকিৎসা। অহিংসাই হলো সেই চিকিৎসা। যে-দেশের স্বাধীনতার জন্যে হাজার-হাজার মানুষ বহু বৎসর ধরে অসহ্য কষ্ট স্বীকার করেছে, হাজার-হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, সেই তাদের ত্যাগ মিথ্যে হয়ে যাবে, যদি আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে হিংসা আর কলহে প্রবৃত্ত হই। আমাদের এক হতে হবে, আমাদের সংযমী হতে হবে। তা হতে পারলে তবে দেশের কল্যাণ হবে, আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়া সার্থক হবে—

—তারপর?

যে ছেলেটি গল্প করছিল সে তারক। তারক সরকার গোলকেন্দুবাবুর ছাত্র। সে দক্ষিণ কলকাতায় থাকে, কিন্তু গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে অনেকের সঙ্গে সেও নারকেলডাঙ্গায় গিয়েছিল।

গোলকেন্দুবাবুও শুনছিলেন। বললেন, তারপর কী বললেন গান্ধীজী?

তারক বলতে লাগলো, তারপর তিনি বললেন যে, আমি জানি কলকাতার বাঙালীরা আমার কথা শুনবে। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও কলকাতায় এমন এলাকা আছে, যেখানে হিন্দুরা থাকতে ভয় পাচ্ছে, আবার এমন এলাকাও আছে, যেখানে মুসলমানরা থাকতে ভয় পাচ্ছে। ঈশ্বরের চোখে আমরা সবাই এক। যদি এখনও সে-সব জায়গায় সব ধর্মের সব বিশ্বাসের মানুষ একসঙ্গে বাস না করতে পারে, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা মিথ্যে হয়ে যাবে। তা হলে দেশ একবার ভাগ হয়েছে, তখন আবার আরো অনেক ভাগ হয়ে যাবে—

দেবব্রত বললে, এখন এ-সব কথা বললে কী হবে। তখন গান্ধী এ-সব কথা বলতে পারলেন না, যখন ইংরেজরা দেশ ভাগ করে দিলে? তখন গান্ধী কোথায় ছিলেন? তখন তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে পারলেন না?

গোলকেন্দুবাবু বললে, তুমি চুপ করো দেবু। তুমি সবে অসুখ থেকে উঠেছ, এখন তোমার অতো উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।

দেবু বললে, আমি উত্তেজিত হবো না তো কী হবো? তাহলে বিনয়দা, দীনেশদা, বাদলদা কেন সিমসন্ সাহেবকে খুন করে নিজেরা প্রাণ দিলে? কেন ভগৎ সিং, সুকদেব, যতীনদা, এই স্বাধীনতার জন্যে জীবন ত্যাগ করলে? তারা কি এই রকম স্বাধীনতার জন্যেই প্রাণ দিয়েছিল? সকলের সমস্ত আত্মত্যাগের ফলে কার সুবিধে হলো?

গোলকেন্দুবাবু বললেন, তুমি চুপ করো দেবু, উত্তেজিত হলে তোমারই শরীর খারাপ হবে।

দেবু বললে, আমি উত্তেজিত হবো না তো কে উত্তেজিত হবে? দেশে কি একটা মানুষ আছে? তারা তো ঠাণ্ডা মাথায় সব মেনে নিয়েছে। তারা কি মানুষ? তারা গান্ধীকে খুন করতে পারলে না? জওহরলাল নেহরুকে খুন করতে পারলে না? বল্লভভাই প্যাটেলকে খুন করতে পারলে না? কেন আমার বাবা-মা ক'ার জন্যে খুন হয়ে গেল? তারা কী দোষ করেছিল? কেন সাহাবুদ্দীন মিনতিকে নিয়ে পালিয়ে গেল? এর জন্যে কে দায়ী? লর্ড মাউন্টব্যাটেন না গান্ধী, না নেহরু, না প্যাটেলজী? সমস্ত দেশের সর্বনাশ করে এখন মুখে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছে সব। এই সব লোকেরা যতদিন দেশে থাকবে, ততোদিন দেশের কিছু ভালো হবে না—। ঠিক আছে, আমি এর কী প্রতিকার করবো—

গোলকেন্দুবাবু বললেন, কী প্রতিকার করবে তুমি?

—জানি না আমি কোনও প্রতিকার করতে পাববো কিনা। যদি তা কবতে পারি তখন আপনি তা দেখতে পাবেন।

কিন্তু দেবব্রত বড একলা পড়ে গেল সেইদিন থেকে। তবে তাব একটাই ভরসা ছিল যে একলা লড়াইতে কখনও ফাঁকি থাকে না। দেশেব সমস্ত লোক যেন দেশটাকে নিজের নিজের সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছে। সেই সম্পত্তিটাকে ভাঙিয়ে সবাই যেন নিজেব-নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। বিছানায় যতোদিন দেবব্রত শুয়ে থাকতো ততোদিন কেবল একই ভাবনাগুলো তার মাথাটা কুরে কুরে খেত। কেন সবাই এমন হয়ে গেল? যারা দেশের কর্ণধার হয়ে গেল তারা কি কোনওদিন দেশের মানুষের কথা ভেবেছে? মানুষের কি ভালো করতে চেয়েছে তারা? জেলে যাওয়াটা কি বড়ো ত্যাগ? যে-সব লোকবা এখন দেশের লীডার তারা তো জন্ম থেকেই বড়োলোকের ছেলে। কাকে বলে ত্যাগ তা কি তারা কখনও করেছে? তারা তো সবাই-ই নিজের স্বার্থের কথাই কেবল ভেবেছে। নিজের পৈত্রিক সম্পত্তির ভোগ-দখল করেই জীবন কেটেছে। কেউ বিলেতে গেছে ব্যারিস্টারি পড়ে টাকা উপায় করতে, কেউ বা অনেক পৈত্রিক টাকা থাকার ফলে অন্য কোনও কিছু কাজ করবাব নেই বলে রাজনীতি করে সকলের মাথায় বসবাব মতলবে এখানে এসেছে। কিন্তু একজনও তো মানুষের ভালো করবার মতলবে আসেনি। যে-লোকটা সত্যিকারের দেশভক্ত ছিল, সে তো নেই। সে আজ এখানে থাকলে কি এমন অবস্থা হতো? এমন করে দেশ টুকরো টুকরো হতো?

তারকই তাকে বলে গিয়েছিল, স্বাধীনতা যেদিন প্রথম এলো সেদিন নাকি বাসে-ট্রামে-ট্রেনে কেউই ভাড়াই দেয়নি। কেন? কেন ভাড়া দেয়নি?

তারক বলেছিল, শুধু তাই-ই নয় দাদা, সবাই নাকি রাজভবনে ঢুকে লাটসাহেবের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে লাটসাহেবের শোবার বিছানার ওপরে উঠে জুতো পায়ে দিয়ে দুম-দাম করে নেচেছিল, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ছাতার বাঁট দিয়ে ভাঙচুর করেছিল, লাটসাহেবের আসবাব-পত্র সব কিছু তছ্-নছ্ করেছিল—

—কেন?

দেবব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, কেন এমন করতে গেল তারা?

তাবক বলেছিল, তাদেব আনন্দ হযেছিল তাই করেছিল। আগে তো কেউ লাটসাহেবের বাড়িতে ঢুকতে পেত না। তাই এখন যা ইচ্ছে তাই করবার অধিকার পেয়ে গেল—

—কেউ কিছু বারণ করেনি?

—না।

—দেবব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, যারা বাড়ির দেখা-শোনা করতো এতদিন, তারা তখন কোথায় ছিল?

তারক বলেছিল, তারাও তখন তাদের ডিউটি ছেড়ে ফূর্তি করতে বেরিয়েছিল, তারাও জেনে গিয়েছিল যে তারা স্বাধীন হয়ে গেছে। ডিউটি না করলেও তারা ঠিক তাদের মাইনে পেয়ে যাবে!

কথাগুলো শুনে দেবব্রত আর কোনও কথা বলেনি। চুপ করে শুধু ভেবেছিল।

প্রত্যেক দিনের মতো সেদিনও গোলকেন্দুবাবু ঘরে এসেছিলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলেন, আজ কেমন আছো দেবু?

দেবু বললে, ভালো না—

—কেন? আবার কী হলো?

দেবু বললে, আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

—শুয়ে থাকতে কি কারো ভালো লাগে? কিন্তু কী করবে বলো? শরীর ভালো হয়ে গেলে তখন উঠে বসো, তখন আবার নড়া-চড়া কোর।

দেবু বললে, না, শরীর আমার ভালো আছে, মন ভালো নেই।

—কেন? মনের কী হলো তোমার?

—চারদিকের অবস্থা দেখে শুনে কিছ্ছু ভালো লাগছে না আমার।

—চারদিকেব কী অবস্থা আবার দেখলে তুমি?

দেবু বললে, আপনি তো সবই দেখছেন। এ-সব দেখে আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে না?

—কোন্ অবস্থা?

—এই যে শুনলুম নাকি কেউ বাসে-ট্রেনে-ট্রামে ভাড়া দেয় না, টিকিট কাটে না। কেউই নাকি কারো ডিউটি করে না। সবাই কাজে ফাঁকি দেয়। আরো আরো অনেক রকমের কথা শুনছি, কিছু-কিছু খবরের কাগজেই পড়ছি। এ-রকম করলে এ-দেশের কী হবে? এ-দেশের মানুষদের কী হবে?

—ও, তুমি বুঝি ওই সব কথাই ভাবছো?

দেবু বললে, ভাববো না? আমি তো সারাজীবন ওই সব কথাই ভেবে এসেছি। তখন ভেবেছি ইংরেজরা চলে গেলেই আমরা ভালো হবো, আমরা মানুষ হবো, আমরা ঠিক-মতো কাজ করবো। এ তো দেখছি উল্‌টো হলো।

—কী উল্‌টো হলো?

দেবু বললে, এই যে হিন্দুরা মুসলমানদের খুন করে ফেলছে, মুসলমানরা হিন্দুদের খুন করে ফেলছে। কেউ অফিসে কাজ করছে না, এই যে পাকিস্তান হিন্দুস্তান হলো, তবু তো খুনোখুনি বন্ধ হলো না, সবাই অফিসে গিয়ে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, আর যারা সারাজীবন মন-প্রাণ দিয়ে দেশ সেবা করলে, তাদের ঠেলে-ঠেলে দিয়ে সুবিধেবাদীরা সামনে এগিয়ে সব বড়ো-বড়ো পোস্টগুলোতে জাঁকিয়ে বসলো, সামনের সারিতে গিয়ে বসলো, কে মন্ত্রী হবে তাই নিয়ে ঝগড়া মারামারি করতে শুরু করে দিলে, এ-রকম ব্রিটিশ আমলে ছিল না। এর চেয়ে তো দেখছি ইংরেজ-আমলই ভালো ছিল। তখন অন্ততঃ গুণের কদর ছিল, পরিশ্রমের দাম ছিল, নিষ্ঠার পুরস্কার ছিল। এখন তো আমরা ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এখন তো আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। এখন তো আর বিদেশীরা নেই। এখন তো আরো মন দিয়ে কাজ করা উচিত।

দেবব্রত দিন-রাত শুয়ে-শুয়ে কেবল এই সব কথাই ভাবতো আর কাকা কিছু জিজ্ঞেস করলেই এই সব কথাই কেবল বলতো!

অথচ কোথায় রইলো তার বাবা, কোথায় রইলো তার মা, কোথায় রইলো মিনতি, কোথায় রইলো তার দৌলতপুর! সে-সব কথা কাউকে সে কখনও বলতোও না, তাদের কথা সে ভাবতো কিনা তাও কেউ বুঝতে পারতো না।

গোলকেন্দুবাবু গোষ্ঠকে বলে রেখেছিলেন যে সে যেন দেবুর ওপর একটু নজর রাখে। সে যেন ঘর ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে না পড়ে।

গোষ্ঠ কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এক-একবার বাইরে থেকে দেবুকে দেখে যেত। এমন ভাবে দেখে যেত যাতে দাদাবাবু জানতে না পারে। সে দেখতো দাদাবাবু কখনও খবরের কাগজ পড়ছে, কখনও কোনও বই পড়ছে, বা চুপ করে বসে ওপর দিকে চেয়ে কী ভাবছে! কিংবা কখনও বিড়-বিড় করে কী-সব কথা বলছে!

—কে? কে? কে?

দেবব্রতর মনে হতো কে যেন তার ঘরে ঢুকছে। যখন তার প্রশ্নের জবাব কেউ দিত না, তখন আবার সে চুপ করে শুয়ে থাকতো।

গোলকেন্দুবাবু যখনই ঘরে ঢুকতেন তখনই জিজ্ঞেস করতেন, আজ কেমন আছো?

দেবু বলতো, ভালো—

—যদি ভালো আছো তো সমস্তদিন শুয়ে-বসে থাকো কেন?

দেবু বলতো, কিছু ভালো লাগে না।

—কেন ভালো লাগে না?

দেবু বলতো, ভালো লাগবে কী করে? সমস্ত দেশ যে গোল্লায় গেল, সমস্ত মানুষ যে খারাপ হয়ে গেল। সুভাষ বোস তাহলে কেন প্রাণ দিলেন? বিনয়দা কেন অমন করে মারা গেলেন?

আরো অনেক কথা দেবুর বলবার ইচ্ছে হতো, কিন্তু কান্নার আবেগে তা আর বলতে পারতো না।

গোলকেন্দুবাবু তখন একজন মানসিক-রোগের ডাক্তারকে ডেকে দেবব্রতকে দেখালেন। পরীক্ষা করে তিনি বললেন, রোগী খুব শক্ পেয়েছে। একটু সময় লাগবে সারতে!

তা তাই-ই হলো। সেই ডাক্তারের ওষুধেই কয়েক মাসের মধ্যেই দেবব্রত বিছানায় উঠে বসলো। তারপর একটু-একটু করে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগলো। তারপরে ঘরের বাইরেও বেরোতে লাগলো। তারপরে কাকার ছাত্রদের পড়াতেও লাগলো।

ছাত্ররা দেবব্রতর পড়ানো খুব পছন্দ করতো। তারা তার কাছে পড়ে স্কুলে-কলেজে পরীক্ষায় আরো ভালো ফল করতে লাগলো।

গোলকেন্দুবাবু সব দেখে শুনে একদিন বললেন, দেখলে তো, তোমার কথা অনুযায়ী পৃথিবী চলে না।

দেবু কোন উত্তর দিলে না এ কথার।

আবার বললেন, তুমি চাও আর না চাও, ইতিহাস এগিয়ে চলবেই। পিছিয়ে যেতে যেতেও আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলবে। তোমার কথায় সে চলবে না। কারো কথাতেই সে চলবে না। গান্ধীজী মারা গেছেন, তা বলে কী দেশ থেমে গেছে—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, তুমি জানো না বোধহয় যে তোমার সেই ছাত্র সাহাবুদ্দীন! সাহাবুদ্দীনের কথা তোমার মনে আছে তো? যে মিনতিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল? সে এখন পাকিস্তানের মিনিস্টার হয়েছে। মিনতিকে বিয়েও করেছে সে।

দেবব্রত এ-সব কথার কোনও উত্তর দিলে না।

গোলকেন্দুবাবু বললেন, দেখলে তো ইতিহাস কাকে বলে? ইতিহাস তোমার আমার, তোমার বাবা-মা'র কারোরই পরোয়া করে না। হিটলার মুসোলিনী তাঁরাও তো ইতিহাসের গতিপথ বদলাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া কি ইতিহাস মিটিয়েছে? তুমি ও-সব কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না। তুমি শুধু তোমার কর্তব্য করে যাও, আর অন্য কিছু করবার অধিকার তোমার নেই। তোমার দৌলতপুর আর সে দৌলতপুর নেই, আমার এই কলকাতাও আর সে-কলকাতা নেই। বলো তো তোমাদের সেই শত্রু ইংরেজ কি আর সেই ইংরেজ আছে?

যে-ইংরেজের বংশধর লোম্যান, সিমসন আর পেডিকে খুন করে সবাই মনে করেছিল, ইংরেজরা এবারে নির্বংশ হয়ে যাবে। কিন্তু তা কি হয়েছে? তারা তো এখনও আমেরিকার ধামা ধরে টিকে আছে! এই-ই হচ্ছে ইতিহাস। মানুষ ইতিহাসকে পাল্‌টায় না, ইতিহাসই মানুষকে পাল্‌টায়—এই সত্যিটা মেনে নিজের কাজ করে যাও।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, আর একটা কথা শোন, একটা নতুন স্কুল তৈরি করছে আমাদের গভর্মেন্ট। আমি সেখানে তোমার একটা চাকরির চেষ্টা করছি। তাদের একজন হেডমাস্টার দরকার, আমি তোমার নাম সাজেস্ট করেছি। সে-চাকবিটা যদি হয় তখন যেন তুমি আপত্তি করো না—

তখনও দেবু কোনও উত্তর দিলে না।

কাকা বললেন, আমি এখন চলি, আমার একটা কাজ আছে।

বলে তিনি চলে গেলেন। যারা তখন তার সামনে বসে পড়ছিল, দেবু তাদের বললে, আজকে এই পর্যন্ত থাক, আমার শরীরটা খারাপ, আজ তোমবা যাও, কালকে আবাব তোমরা এই সময়ে এসো। তখন আমি আবার তোমাদের পড়াবো। বলে দেবব্রত ঘব ছেড়ে উঠে গেল। নিজেব ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ কবে দিলে।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কী? মিনতি দেবব্রতকে বিয়ে কবার পর আবার সাহাবুদ্দীনকে বিয়ে করলে? এ কেমন করে হলো?

সুপ্রভাত বললে, সেইজন্যেই তো তোমাকে গল্পটা বলছি হে। তখন পার্বতীবাবু নিজেব মেয়ের সঙ্গে দেবব্রতর বিয়ে দেওয়াব জন্যে কতো ধরাধরি কতো পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তবে সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, আর শেষকালে কিনা সেই মিনতিই দেবব্রতকে ছেড়ে সাহাবুদ্দীনকে বিয়ে করলে! আগে পৃথিবীর ম্যাপে পাকিস্তান বলে কোনও দেশের নাম ছিল না। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেব পর আবার আর একটা নতুন নাম কিনা যুক্ত হলো সেই পৃথিবীর ম্যাপেই। ঠিক তেমনি আগে যে ছিল মিনতির স্বামী, তার নাম মুছে গিয়ে সেখানে লেখা হলো আর একটা নাম। আগে যে ছিল হিন্দুর স্ত্রী সে হঠাৎ হয়ে গেল মুসলমানের স্ত্রী। ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষের মনও বদলে যায়, সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল এই মিনতির জীবনের ঘটনাতে!

আর সে বদলটা যদি মুকুন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী, পার্বতীবাবু আব তাঁর স্ত্রী দেখতে পেতেন তাহলে? তাহলে কি তাঁরা সে ঘটনাটা মন থেকে মেনে নিতে পারতেন?

সেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর যারা জন্মেছে তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, তাদের দেশ স্বাধীন করতে তাদের পূর্বপুরুষদের কতো রক্ত, কতো ঘাম, কতো ইজ্জত খোয়াতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কতো ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাদের।

আর তার সুফল বা কুফল যারা এখন ভোগ কবছে, তারা?

তারা নির্বিকার, নির্বিকল্প, নিঃসঙ্কোচ। স্বাধীন দেশের লোকরাই স্বাধীন দেশের সম্পত্তি চুরি করে। স্বাধীন দেশের লোকরাই বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে ভাড়া ফাঁকি দেয়, স্বাধীন দেশের লোকরাই আয়কর ফাঁকি দিয়ে স্বাধীন দেশের সম্পত্তি লুঠ-পাট করে স্বাধীন দেশের ক্ষতি কবে।

ইংরেজ আমলে আমরা সব অত্যাচার অনাচারের জন্যে বিদেশী ইংরেজদেরই দায়ী করতুম এখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা কাদের দায়ী করবো? এখন তো সেই অত্যাচার অনাচার আরো লক্ষগুণ বেড়েছে। তাহলে এখন আমরা কার বিরুদ্ধে লড়বো?

বললাম, ও-সব কথা এখন থাক, ও-সব তত্ত্বকথা আমি উপন্যাস লেখবার সময়ে গল্পের মধ্যে জুড়ে দেব। তারপর কী হলো তাই বলো। দেবব্রতব সঙ্গে সেই মিনতির পরে কি আর দেখা হয়েছিল?

সুপ্রভাত বললে, হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, কবে? কতো পরে?

সুপ্রভাত বললে, সেও এক অভূতপূর্ণ ঘটনা। মানুষের জীবনে কতো রকমের ঘটনা আর কতো রকমের দুর্ঘটনা যে ঘটে, তা ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়! যে-দেবব্রত ছোটবেলায় সুলতান আহ্‌মেদের মতো মহাপুরুষের শিক্ষায় মানুষ হয়েছিল, বিনয়দা'র মতো মানুষের কাছ থেকে দেশ-সেবার দীক্ষা নিয়েছিল, সে কি কখনও কারো সঙ্গে আপোস-রফা কবে বেঁচে থাকতে পারে?

আজকাল তো সবাই-ই আপোস-রফা কবেই বেঁচে আছে। বড়োর চেয়ে এখন সবাই তো ছোটকেই আদর্শ ক'বে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। একটু আপোস-রফা কবলেই যদি অস্তিত্ব টিকে থাকে তাহলে আর আদর্শের জন্যে বিরোধ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে লাভ কী? প্রত্যেক মানুষের ভেতরে আর একটা মানুষ কানে কলম গুঁজে লুকিয়ে বসে থাকে। সে সবাইকে শয়নে স্বপনে হিসেব কষে লাভলোকসানের ব্যালেন্স-শীটটা দেখিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়। সে বলে—সবাই যা করছে, তুমিও তাই-ই করো। সে বলে—সকলের তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলো। তাতেই তোমার ঐহিক লাভ। পারলৌকিক লাভের কথা ভেবে লাভ নেই। তোমার মৃত্যুর পর কী হবে না হবে তা তোমার ভাববার দরকার নেই। দেশে অনেক লোক আছে সে-সব কথা ভাববার। তুমি শুধু তোমার নিজের কথা, নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা ভাবো। দেশের কথা ভাববার জন্যে তুমি যাদের ভোট দিয়ে মন্ত্রী করেছ তারা ভাবুক। তুমি শুধু তোমাদের নিজেদের কথা নিয়ে মশগুল থাকো।

এই-ই হচ্ছে শতকরা একশোজন মানুষের মানসিকতা।

কিন্তু দেবব্রত সরকার?

তাই শুরুতেই বলে দিয়েছি যে যেমন, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব নদীই গঙ্গা নয়, সব মৃগ কস্তুরী-মৃগ নয়, তেমনি সব মানুষই দেবব্রত সরকার নয়।

ইতিহাস আস্তে আস্তে তার জাবদা-খাতাব পাতাগুলো এক-এক করে উল্‌টিয়ে যায় আর আগেকার যুগের সব-কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদিন পাঠান-মোগল যুগের অবসান হয়ে গেলে ইংরেজরা আসে। তখন পূর্বসূরীদের কথা ভুলে গিয়ে মানুষ দেওয়াল থেকে আগেকার বাদশা-নবাবদের ছবি সরিয়ে ফেলে ইংরেজ বড়লাট-লাটসাহেবদের ছবি টাঙায়। তারপর যখন আবার ইংরেজ বড়লাট-লাটসাহেবেরা চলে যায়, তখন তার জায়গায় জওহরলাল ইন্দিরা-রাজীব গান্ধীর ছবি টাঙায়, তাদেরই ভজনা করে দেশের মানুষরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে।

এই-ই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু সব নিয়মের ব্যতিক্রমের মতো এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে।

তাই কিছু লোক সূর্যকে পুজো করে, কিছু লোক অগ্নিকে পুজো করে, কিছু লোক জলকে পুজো করে। সেই সূর্য অগ্নি আর জলের কোনও বিকল্প নেই, বিকল্প ছিল না, বিকল্প নেইও। বিকল্প কোনও কালে থাকবেও না। যুগ বদলালেও তারা যুগাতীত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবে।

এই ধরনের মানুষ হলো দেবব্রত। দেশ যতোই বদলাক, দেশ যতোই টুকরো-টুকরো হোক, দেশের রাজা বা রাণী যে-ই হোক, দেবব্রত সরকারের আদর্শ তো কখনও বদলায় না। তাদের আদর্শ কখনও বদলাতে নেই।

ততোদিনে অনেক জল হাওড়া পুলের তলা দিয়ে বয়ে গেছে। সেই জলের সঙ্গে অনেক রক্ত অনেক পাপ অনেক অত্যাচারও বয়ে গিয়ে বে-অব-বেঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি যেটা ঘটে গিয়েছে দেবব্রতর জীবনে, সেটা হলো কাকার মৃত্যু।

দেশের মৃত্যুর সঙ্গে অবশ্য গোলকেন্দুবাবুর মৃত্যুর কোনও তুলনাই করা যায় না। তবু আগে ইণ্ডিয়া ভাগ হওয়ার ফলে যে-আঘাত সে পেয়েছিল, তার কাছে কাকার মৃত্যু কিছুই না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো বিচ্ছেদ।

আগেকার বাবা-মা'র সঙ্গে বিচ্ছেদটা চোখের আড়ালে ঘটে গেছে বলে সেটা অতোটা আঘাত তাকে দিতে পারেনি। কিন্তু এবার কাকার মৃত্যুর খবরটা পেয়ে আশে-পাশের বাড়ি থেকে যারা তাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছিল, তারাও দেবব্রতর মুখের ভাব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

পাশের বাড়িতে শৈলেনবাবু থাকতেন, শৈলেন চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে গোলকেন্দবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

আর শুধু কি শৈলেনবাবু? গোলকেন্দুবাবুর অসংখ্য ছাত্র ছিল। তারা তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখেই পরবর্তী জীবনে অনেক বড়ো হয়েছিল। বড়ো হয়েছিল মানে বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছিল।

গোলকেন্দুবাবুকে তখনও শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর রক্তমাখা শরীরটা দেখে বোঝা যায় যে, কেউ তাকে খুন করেছে। আগের রাত্রেই পুলিশ তাকে খবর পাঠিয়েছিল যে, শেষ রাত্রের দিকে রাস্তার ওপরে গোলকেন্দুবাবুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। শেষকালে তাঁরই এক ছাত্র তাঁকে চিনতে পেরে কাছাকাছি পুলিশের থানায় খবর দেয় যে, মৃত ব্যক্তির নাম—গোলকেন্দু সরকার।

খবরটা পেয়েই শেষ-রাত্রেই থানায় গিয়ে সনাক্ত করে কাকাকে।

পুলিশের কর্তা জিজ্ঞেস করলেন, ইনি আপনার কাকা?

দেবব্রত তখনও একদৃষ্টে দেখছে কাকাকে। যে-কাকার সঙ্গে আগের দিনও তার কথা হয়েছে, সেই মানুষটাই তখন নির্জীব নিষ্প্রাণ। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ তাঁকে পেছন থেকে ছোরা দিয়ে আক্রমণ করে তাঁর প্রাণ নিয়েছে।

তারক সরকার বললে, আজকাল রোজ-রোজই এই রকম হচ্ছে, এখন কলকাতার এই অবস্থা!

তারপর কাকাকে নিয়ে আসা হলো তাঁর বাড়িতে। ততক্ষণে সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। কাকার স্কুলেও খবর দেবার সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলেও ছুটি ঘোষণা করা হলো। ছুটির পর তারাও সবাই দল বেঁধে এসে হাজির হলো। হেড্‌মাস্টার মশাইকে ওই অবস্থায় দেখে ছেলেদের চোখ কান্নায় ছল-ছল করে উঠলো।

দেখতে দেখতে আরো অনেক লোক জড়ো হলো। সমস্ত পাড়ার লোক এসে ভিড় করলো বাড়ির সামনে। সকলের চোখেই জল। সকলেই গোলকেন্দুবাবুকে ওই অবস্থায় দেখে দূর থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নিজেদের শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো।

কিন্তু আশ্চর্য, দেবব্রতকে দেখে বোঝা গেল না যে সে কিছু আঘাত পেয়েছে। সে যেন নির্বাক নিঃশব্দ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার চোখের জলও যেন ঝরতে ভুলে গেছে।

শেষকালে দেবব্রত বললে, এবার চলো শ্মশানে যাওয়া যাক্—

সবাই দল বেঁধে তাঁকে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাত্রা করলে।

পাড়ার লোক যারা সে-দৃশ্য দেখেছিল তারা সবাই-ই সেদিন শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলো—একজন মহাপুরুষ চলে গেলেন।

সুপ্রভাত বললে, তারপর থেকে দেবব্রত যেন সম্পূর্ণ একলা হয়ে গেল। শুধু একলা নয়, নিঃসহায়, নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গও হয়ে গেল সে। আগে বাবা-মা চলে গেছেন, শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই চলে গিয়েছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিল তার জন্মভূমি, জন্মভিটে। সে-সব তাকে চোখ দিয়ে দেখতে হয়নি। বাইরের ইতিহাস-ভূগোলের মতো তার নিজের মনের ইতিহাস-ভূগোলও বদলে গিয়েছিল। এবার তার কাকাও চলে গেলেন। তাহলে রইলো কে?

এক গোষ্ঠ ছাড়া তার আর কেউ-ই রইলো না।

দেবব্রত একদিন গোষ্ঠকে ডাকলে। বললে, তোরও যদি থাকতে কষ্ট হয়, তাহলে তুইও চলে যেতে পারিস।

গোষ্ঠ বললে, আমি চলে গেলে আপনাকে দেখবে কে?

দেবব্রত বললে, আমি একলা মানুষ, কোন রকমে চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার জন্যে তুই কেন কষ্ট করতে যাবি?

—আমার কেউ নেই দাদাবাবু, আমি আর কোথায় যাবো?

—তুইও আমার মতো একলা?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, যিনি আমার নিজের বলতে সব কিছু ছিলেন, তিনিই যখন চলে গেলেন তখন আমি আর কোথায় যাবো? এখানেই পড়ে থাকবো।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, আপনি যদি আমায় না রাখতে চান তো আমাকে চলে যেতেই হবে।

—কোথায় যাবি?

—কোথায় আর যাবো? আমি আমার দেশে চলে যাবো।

—তোর দেশ? তোরও আবার দেশ আছে নাকি?

—হ্যাঁ, সকলেরই তো দেশ থাকে।

—কোথায় দেশ? পাকিস্তানে, না ইণ্ডিয়ায়?

—এখানে, এই নদীয়ায়।

—তা সে-দেশে তোর কে-কে আছে?

—সেখানে আমার এক মামাতো ভাই আছে। আর সব মারা গেছে।

—তা তারা তো কই কখনও তোর কাছে আসে না।

গোষ্ঠ বললে, আমিই তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিনি। বাবুর কাছেই আমি ছোটবেলো থেকে আছি কিনা, তাই বাবুর ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। তখন মা'ও বেঁচেছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর বাবুকে দেখবার তো আর কেউ রইল না, তাই আমি আর এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাইনি। এখন আপনি যদি আপনার কাছে রাখেন তো আমি থাকবো, কোথাও যাবো না।

তাই গোলকেন্দুবাবু চলে যাওয়ার পরও গোষ্ঠ আগের মতো এ বাড়িতে রয়ে গেল। আগের মতো এ-বাড়ির সব রকম কাজকর্ম চলতে লাগলো। আগে যেমন ছাত্ররা কাকার কাছে পড়তে আসতো, তেমনি তখন থেকে আসতে লাগলো দেবব্রতর কাছে। দেবব্রতও একটা স্কুলে যেমন কাজ করছিল, তেমনি কাজ করতে লাগলো। স্কুলে কাজের জন্যে মাইনে নিতে আপত্তি না থাকলেও, বাড়িতে ছাত্রদের কাছ থেকে কাকার মতো সেও মাইনে বা টাকাকড়ি কিছুই নিত না।

কাকার মৃত্যুর পর থেকে দেবব্রত স্কুলের মাইনেটা পেয়েই গোষ্ঠর হাতে দিয়ে দিত। বলতো, এই নে, এ-মাসের মাইনেটা নে—

গোষ্ঠ প্রথম-প্রথম আপত্তি করতো। বলতো, সমস্ত মাইনেটা আমাকে দিয়ে দিলেন?

দেবব্রত বলতো, তোকে দেব না তো কাকে দেব? বাড়িতে কি আমার বউ আছে যে তাকে দেব? তুই-ই তো সব খরচ-খবচা করিস। একটু হিসেব করে চলিস, যখন জামা-কাপড় কেনবার দরকার হবে, তখন তোর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেব।

গোষ্ঠ কী আর বলবে। বলতো, আপনার এই শার্টটা তো ছিঁড়ে গেছে, একটা নতুন শার্ট তো আপনার দরকার।

—সে কী? কোথায় ছিঁড়ে গেছে? এ তো প্রায় নতুনই আছে।

দেবব্রত নিজের শার্টটার দিকে চেয়ে-চেয়ে কোথাও কোনও ছেঁড়া দেখতে পেত না। বলতো, না না, এতেই চলে যাবে, মিছিমিছি টাকা নষ্ট করে কী লাভ?

বলে সেই শার্টটা পরেই স্কুলে চলে যেত। আবার পরের দিন স্কুলে যাওয়ার সময় দেখতো, সেই শার্টটার জায়গায় অন্য আর একটা নতুন শার্ট সেখানে রয়েছে।

নতুন শার্ট দেখেই দেবব্রত চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, ওরে গোষ্ঠ, গোষ্ঠ, আবার নতুন শার্ট আমার কোত্থেকে এলো রে?

গোষ্ঠ কাছে এসে বললে, নতুন শার্টটা আমি কিনে এনেছি।

—আর পুরনোটা?

—পুরনোটা দিয়ে আমি বাসনওয়ালীব কাছ থেকে একটা কাঁসাব বাটি কিনেছি।

কী আর করা যাবে। নতুন শার্টটাই গায়ে দিলে দেবব্রত। বললে, এই রকম বাবুয়ানি করলেই দেখছি আমি ফতুর হয়ে যাবো। আমাকে কি বড়লোক পেয়েছিস তুই? জানিস না আমাদের দেশ গরীব, এদেশে বাবুয়ানি করা পাপ?

আর শুধু কি জামা? ধুতিও তাই। সব কিছুতেই সে বিলাসিতার বিরুদ্ধে। যে-দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক গরীব, সে-দেশে এত বিলাসিতা কি ভালো?

স্কুলের অঙ্কের টিচার সুশীলবাবু একদিন তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা দেবব্রতবাবু, আপনি ছেলেদের তো বাড়িতে পড়ান।

—হ্যাঁ, পড়াই।

সুশীলবাবু বললেন, তা পড়ান, ভালোই করেন। কিন্তু তা আমাদের এতো লোকসান কবেন কেন?

—আমি আপনাদের লোকসান করি? তার মানে?

কথাটা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। জীবনে সে কখনও কারো লোকসান করেছে বলে তার মনে পড়লো না। কোনও লোকসান করা দূরে থাকুক, কারো লোকসান করার স্বপ্নও সে কখনও দেখেনি।

বললে, আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন?

সুশীলবাবু বললেন, আপনার জন্যে কোচিং ক্লাশে আমাদের ছাত্র হচ্ছে না। আপনি বিনা-পয়সায় পড়ালে কে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে আমাদের কোচিং ক্লাশে পড়বে বলুন?

দেবব্রত তো হতবাক। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সুশীলবাবু আবার বললেন, আপনি না হয় বিয়ে-থা করেননি, সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি বিনা পয়সাতে পড়াতে পারেন, কিন্তু আমাদের তো বউ-ছেলে-মেয়ে আছে। সংসার চালানো যে আজকাল কতো কষ্টেব, তা তো আপনি জানতে পারলেন না।

—কে বললে, আমি বিয়ে করিনি?

—সে কী? আপনি বিয়ে করেছেন? আপনার স্ত্রী কোথায়?

—দেশ ভাগ হওয়ার পর নাকি সে অন্য একজনের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে! আমি তখন জেলখানায়।

খবরটা যেমন অভিনব তেমন লজ্জাকর।

কিন্তু দেবব্রত সরকারের সে-জন্যে কোনও খেদ নেই।

খবরটা এখানে কেউ-ই জানতো না।

সুশীলবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আপনার স্ত্রীর আর কোনও খবর পাননি?

—আর তার খোঁজ নিয়ে কী হবে? সে সুখে থাকলেই হলো।

যারা এতদিন দেবব্রত সরকারকে পাগল বলে মনে করেছিল, তারা তখন থেকে তাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। তাদের মনে হলো তাহলে মানুষটা হয়তো ভালোই। পোশাক-পরিচ্ছদ আর বাইরের ব্যবহার দিয়ে বিচার করে তারা তাকে নির্বোধ বলে ভাবলেও আসলে মানুষটা পরোপকারী, সংযমী, নির্লোভ আর নিরহঙ্কারী।

ততদিনে দেশের হালচাল তখন আমূল বদলে গিয়েছে। এককালে যে-কলকাতায় রাতের বেলা বেরোন যেত না, তখন তা আবার শান্ত হয়ে এলো।

কিন্তু একটা ব্যাপারে দেবব্রতকে কেউ হারাতে পারলে না, সে যেটা সত্যি বলে মনে করবে তা সে পালন করবেই। সেই সত্যটা রক্ষা করবার জন্যে সে নিজের প্রাণ পর্যন্ত কবুল করতে প্রস্তুত থাকবে। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে সেই বিশ্বাস সেই সত্য থেকে কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হলো? সেই মিনতি? মিনতির কী হলো?

সুপ্রভাত বললে, এবার তুমি তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। তারপরই আরম্ভ হবে দেবব্রত সরকারের জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। তখনই জানা গেল সে কতোটা পরোপকারী, কতোটা সংযমী, কতোটা কঠোর, কতোটা নির্লোভ আর কতোটা নিরহঙ্কারী।

এই সময়েই একদিন স্কুল থেকে ছুটির পর দেবব্রত বাড়িতে এসে মিনতিকে দেখে অবাক হয়ে গেল?

—তুমি? তুমি হঠাৎ?

মিনতি প্রথমে কথাটার কোনও জবাব দিতে পারলে না।

—আব, এ কে?

—এ আমার মেয়ে ঝর্ণা।

দেবব্রত দু'জনের দিকেই চেয়ে দেখতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলে, তোমরা কলকাতায় কবে এলে?

মিনতি বললে, আজই—

—কোথায় উঠেছ?

মিনতি বললে, তোমার এখানেই। কেন, তোমার আপত্তি আছে?

—আমার আপত্তি থাকবে কেন? কতোদিন থাকবে তুমি এখানে?

মিনতি বললে, যতোদিন তুমি থাকতে দেবে!

—তার মানে?

মিনতি বললে, তুমি থাকতে অনুমতি না দিলে কী করে আমি বলবো যে আমি কতোদিন এখানে থাকবো?

—ধরো আমি যদি বলি যে, এখন থেকে বরাবর আমি এখানেই তোমাকে থাকতে দেব, তাহলে?

—বরাবর থাকতে দেবে তুমি?

—হ্যাঁ, বরাবর। কথা দিচ্ছি—

মিনতি বললে, তাহলে আমি তোমার এখানেই বরাবর থাকবো।

—কেন, তুমি এতদিন যেখানে ছিলে সেখান থেকে চলে এলে কেন?

মিনতি বললে, আমার স্বামী মারা গেছেন।

—সে কী? সাহাবুদ্দীন মারা গেছে? কী হয়েছিল তার? সে তো শুনেছিলাম পাকিস্তানের হোম-মিনিস্টার না কী যেন হয়েছিল!

মিনতি বললে, একটা ট্রেন এ্যাক্সিডেণ্টে আমরা সবাই আঘাত পাই, আমার স্বামী তাতে মারা যায়, আমি আর আমার এই মেয়ে শুধু বেঁচে ফিরে এসেছি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি। পৃথিবীতে আর কেউ নেই তো আমার, যার কাছে গিয়ে এখন দাঁড়াই।

কথাগুলো শুনে দেবব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলো।

তার কাছ থেকে কথাব উত্তর না পেয়ে মিনতি বললে, তুমি থাকতে দেবে?

—আমি অন্য কথা ভাবছি।

—কী কথা?

—ভাবছি, আমি তো গরীব। তুমি অতো বড়লোক স্বামীর স্ত্রী হয়ে, আমার মতো গরীবের ঘরে কি থাকতে পারবে?

মিনতি বললে, কিন্তু এ-কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না যে, তুমি এককালে আমাকে বিয়ে করেছিলে।

—সে-সব কথা এখন থাক। তুমি আর তোমার মেয়ে কিছু খেয়েছ?

গোষ্ঠ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, আমি ভাত রান্না করে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে ঘরে আলু ছিল, তাও ভেজে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে ডাল—

গোষ্ঠ তো তার দাদাবাবুকে চেনে। সে আন্দাজ করে নিয়েছিল যে, যারা বাড়িতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই দাদাবাবুর পরিচিত ঘনিষ্ঠ লোক। বিশেষ করে মহিলাটির মাথার সিঁথিতে যখন সিঁদুর রয়েছে। আর তার সঙ্গেও যখন রয়েছে একটা মেয়ে। সব লোকই অচেনা মানুষের চেহারা দেখে অন্ততঃ একটা আন্দাজ করে নিতে পারে যে, কে তার আপন আর কে তার পর। বিশেষ করে গোষ্ঠ। কারণ এ বাড়িতে সে ছোটবেলা থেকেই আছে, আর ছোটবেলা থেকেই তার দাদাবাবুকে দেখে আসছে।

দেবব্রত বললে, যতক্ষণ আমার এই গোষ্ঠ আছে, ততক্ষণ তোমার কোনও সঙ্কোচ করবার দরকার নেই মিনতি। তোমাদের যা-কিছু দরকার হবে তা নিঃসঙ্কোচে এই গোষ্ঠর কাছ থেকে চেয়ে নিও, বুঝলে এ-বাড়িতে গোষ্ঠই সব। দৌলতপুরে যেমন আমাদের রাখাল ছিল, এখানে এও ঠিক তেমনি।

তারপর দেবব্রতকে একটু চিন্তিত দেখে মিনতি বললে, তুমি কোথাও যাচ্ছো নাকি?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ, আমাদের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার আজকে আবার স্কুলে আসেননি। তাই তাঁর জন্যে বড়ো ভাবনা হচ্ছে। তিনি তো কখনও কামাই করেন না, নিশ্চয় কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে। তাই তাঁর বাড়িতে একবার গিয়ে দেখে আসি, কী ব্যাপার! আমি যাবো আর আসবো।

তারপর গোষ্ঠকে বললে, ওরা যদি আসে কেউ তো বসতে বলিস গোষ্ঠ, বুঝলি?

আর তারপর মিনতির দিকে ফিরে বললে, তোমরা রাত্তিরে কী খাবে, গোষ্ঠকে বলে দিও, ও তোমাদের জন্যে তা-ই রান্না করে দেবে।

বলে সে যেমন এসেছিল, তেমনি তখনই বাইরে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন এ-বাড়িতে থেকেই মিনতি বুঝতে পারলে, গোষ্ঠই এ-বাড়ির মালিক। সে-ই বাজার করে, রান্না করে, তার কাছেই থাকে এ-সংসারের চাবিকাঠি। তার নির্দেশেই দেবব্রত সরকার চলে। সে কী কাপড়-জামা পরবে না পরবে, তা পর্যন্ত ঠিক করে দেবে গোষ্ঠ।

প্রথম দিন থেকেই এমনি এক অদ্ভুত সংসারে এসে ঢুকলো মিনতি আর তার মেয়ে ঝর্ণা।

মিনতি বললে, তোমাদের বাড়িতে চায়ের পাট নেই গোষ্ঠ?

গোষ্ঠ বললে, আপনি চা খাবেন বৌদি? তা আগে বললেন না কেন? আমি এখ্খুনি দোকান থেকে চা কিনে নিয়ে আসছি।

বলে গোষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লো। আর তার পরেই বাড়িতে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করে দিলে। বললে, আপনি যদি আগে বলতেন, তাহলে আর আপনার এত কষ্ট হতো না।

শুধু মিনতি নয়, ঝর্ণাও চা খেল। মিনতি জিজ্ঞেস করলে, তোমার দাদাবাবু চা খান না?

গোষ্ঠ বললে, না—

—তুমি?

গোষ্ঠ বললে, আমিও চা খাই না।

মিনতি বললে, আমি আর আমার মেয়েও আগে চা খেতুম না। কিন্তু হঠাৎ চা খেতে খেতে এমন নেশা হয়ে গেছে যে সকালে বিকেলে চা না খেলে মাথা ধরে যায়।

গোষ্ঠ বললে, তা ভালোই তো। দাদাবাবু চা খান না বলে আমিও চা খাই না। আর শুধু চা নয়, দাদাবাবুর কোনও নেশাই নেই। দাদাবাবু পান পর্যন্ত খান না।

—কেন খান না?

গোষ্ঠ বললে, উনি যদি নেশা করেন তো ওঁর ছাত্ররাও যে নেশা করবে, তখন উনি তাদের বারণ করতে পারবেন না।

—তোমার দাদাবাবু কি চান যে, ছাত্ররা চা কি পান না খাক?

গোষ্ঠ বললে, হ্যাঁ, দাদাবাবু বলেন যে, যে-জিনিসটা খেলে শরীরের কোনও উপকার হয় না, তা না-খাওয়াই ভালো।

মিনতি বুঝতে পারলে এ-বাড়ির দাদাবাবুটিও যেমন, গোষ্ঠও ঠিক তেমনি মিলেছে।

প্রথম দিন রাত্রেই গোষ্ঠ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের বিছানা কোন ঘরে করবো বৌদি?

—যে-ঘরে তোমার খুশী। তোমার দাদাবাবু কোন ঘরে শোন?

—ওঁর কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। যে-কোনও ঘরে শুলেই হলো।

—উনি কোন্ ঘরে শোন এখন?

—আপনি ওঁর শোবার ঘর দেখবেন? তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে মিনতিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে একটা ঘরের তালা খুলে দেখালো। বললে, এই-ই দাদাবাবুর ঘর। এখানেই দাদাবাবু রাত্তিরে শোন।

মিনতি আর ঝর্ণাও ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলে। মেঝের ওপর বিছানা পাতা। অতি সাধারণ একটা মাদুর, তার ওপরে একটা সাধারণ চাদর পাতা। আর মাথার দিকে এক ইঞ্চি উঁচু একটা বালিশ। দেয়ালে কার একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ঝুলছে। ঘরের ভেতরে আর কোনও কিছু আসবাবপত্র নেই। একেবারে সাদা-মাটা।

ঝর্ণা বললে, উনি কি খাটে শোন না?

গোষ্ঠ বললে, না—

মিনতিও বললে, কেন?

—দাদাবাবু বলেন, শক্ত মেঝের ওপর শুলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

—ও ছবিটা কার?

—উনি দাদাবাবুর গুরুদেব।

—গুরুদেব? তার মানে? উনি কী দীক্ষা নিয়েছেন নাকি?

গোষ্ঠ জানে না কে দাদাবাবুর গুরুদেব। তার কাছে দাদাবাবু দীক্ষা নিয়েছেন কিনা তাও সে জানে না। এককালে কাকাবাবু ওই ঘরে শুতেন। তখন খাট ছিল ওখানে। তিনি মারা যাওয়ার পর দাদাবাবু খাটটা বাইরে বার করে দিয়েছেন। সেইটের ওপর এক তলার ঘরে বিছানা করে দিয়েছি আমি।

মিনতি আগেও দেখেছিল দেবব্রতকে। বিয়ে হওয়ার পরও দেখেছে। তারপরে যখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলো তখন দেবব্রত জেলখানায়। তারপর চারদিকে যখন মানুষের খুনোখুনি চরমে উঠলো তখন সাহাবুদ্দীন না থাকলে সে বাঁচতো না। সেই সাহাবুদ্দীন তাকে বিয়ে করলে। কারণ বিয়ে না করলে হিন্দু হওয়ার অপরাধে সেও খুন হয়ে যেত। আর তারপর ইতিহাসের কোন অলঙঘ্য নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের একজন মন্ত্রীও হলো। কাকে বলে ঐশ্বর্য, কাকে বলে বিলাসিতা, কাকে বলে সম্মান, তাও সে নিজের চোখেই দেখলে। মন্ত্রীর স্ত্রী হওয়ার ফলে সমাজে তারও খাতির বাড়লো। তখন এই ঝর্ণা জন্মালো।

আর তারপর?

আর কারো কপালে যে দুর্যোগ ঘটে না, মিনতির জীবনে সেই দুর্যোগই ঘনিয়ে এল। তখন কি সে কল্পনাও করতে পেরেছিল যে আবার তাকে সিঁদুর দিতে হবে তার সিঁথিতে। একদিন আবার তাকে এই দেবব্রতর কাছেই ফিরে এসে তার কৃপাপ্রার্থী হতে হবে?

এই দেবব্রতর সংসারের পাশাপাশি সেই সাহাবুদ্দীনের সংসারের তুলনা করলে মিনতির হাসি পেত, সাহাবুদ্দীনের মা মিনতিকে কতো আদর করতো তখন। তখন সবাই বলতো যে মিনতির সৌভাগ্যের জন্যেই নাকি সাহাবুদ্দীন সাহেব পাকিস্তানের মন্ত্রী হতে পেরেছে।

কিন্তু সেই তারাই আবার একদিন তার ওপব বিরূপ হয়ে উঠলো।

সে এক বড় মর্মান্তিক ঘটনা। ট্রেনের সেলুনে চেপে সাহাবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে মিনতি আর ঝর্ণা যাচ্ছে ঢাকার দিকে। মন্ত্রীর সাঙ্গোপাঙ্গ আছে অন্য কামরায়। তখন অনেক রাত। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই-ই ঘুমে অচেতন। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে সবাই জেগে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে কী যে হলো, অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে গেল সবাই।

তারপরের ঘটনা আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো তখন মিনতি দেখলে সে হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছে। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তার মনে পড়লো ঝর্ণার কথা। সে সামনের একজনকে জিজ্ঞেস করলে আমার মেয়ে কোথায়?

পাশের খাটটার দিকে দেখিয়ে নার্সটা বললে, ওই যে—

—ও কেমন আছে?

নার্স বললে—একটু ভালো।

—আর মিনিস্টার সাহেব?

নার্সের মুখের চেহারাটা কেমন করুণ হয়ে উঠলো। মিনিস্টার সাহেবের খবর না দিয়ে নার্স তখন তাকে কী একটা ওষুধ খাইয়ে দিতেই মিনতি আবার অচৈতন্য-অজ্ঞান হয়ে গেল।

আর তারও বহুদিন পরে সে জানতে পারলে যে মিনিস্টার সাহেব আর নেই।

মনে আছে খবরটা শুনেই মিনতি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পরদিন থেকেই মিনতি বুঝতে পেরেছিল যে পরলোকগত স্বামীর সংসারে সে আর তার মেয়ে অবাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা।

তখন থেকেই তাদের দুজনের ওপর লাঞ্ছনার চাবুক পড়তে আরম্ভ করলো।

আগে যারা 'বেগম সাহেবা' 'বেগম সাহেবা' বলে তাকে সম্ভ্রম সম্মান শ্রদ্ধা বর্ষণ করতো, তখন তারাই আবার তাদের ওপর অবহেলা আর অসম্মানের কষাঘাত করতে আরম্ভ করলো। আগে তার শাশুড়ী শ্বশুর দেওররা তাদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু তারপর থেকে তারাই আবার যতটা সম্ভব তাদের এড়িয়ে চলতে লাগলো।

এ ভাবে আর কতোদিন বেঁচে থাকা যায়? তার বাপের বাড়িতেও এমন কেউ ছিল না যে সে তাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে। নিজে যে আলাদা হয়ে জীবনযাপন করবে তারও উপায় নেই। তার সোনার গয়না যা-কিছু ছিল তা সমস্তই শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা কেড়ে নিয়েছিল।

তাহলে সে আর তার মেয়ে কী ভাবে কার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জীবন ধারণ করবে? কী করে দুজনের পেট চালাবে? সে যদি হিন্দুও না হয়, মুসলমানও না হয়, তাহলে সে কোন ধর্ম-মতে বাঁচবে। তাদের দুজনের বেঁচে থাকবার তাগিদে কি তাহলে যে-কোনও ধর্ম-মতের আশ্রয় নিতেই হবে? তাদের মতো মানুষের আশ্রয় কোথায় মিলবে তাহলে? শুধু মানুষ নামে তক্‌মা নিয়ে বাঁচবার অধিকার কি কোথাও কারো নেই। সবাই কি হিন্দু, মুসলমান, কিংবা খ্রীষ্টান হবে? মানুষ হবে না কেউ? মানুষ হতে আপত্তি কী?

হিন্দুর মেয়ে হয়ে একবার সে মসজিদে গিয়ে ধর্ম বদলে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল। এবার কি তাহলে সে মন্দিরে গিয়ে আবার হিন্দু হবে? তেমন মন্দির কোথায় আছে? সে মন্দিরের ঠিকানা কে তাকে জানাবে?

সে-সব যে কী দিন গেছে তখন তার হিসেব করতে গেলেই মিনতির মাথায় ব্যথা করতে আরম্ভ করতো।

ঝর্ণা বলতো, মা তুমি আগে তো মাথায় সিঁদুর দিতে না, এখন দিচ্ছ কেন?

ঝর্ণা তখন ছোট ছিল, তাই আগেকার কথা একটু মনে ছিল তার। একদিন মাঝরাতে ঝর্ণাকে নিয়ে মিনতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই নেই। শ্বশুর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে সে, তারও কিছু ঠিক ছিল না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ঝর্ণা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। বলেছিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো মা তুমি?

মিনতি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, চুপ করো, চুপ করো, আমরা কলকাতায় যাবো—

একদিন মন্ত্রীর বেগম হয়ে যে-মিনতি সব রকম সরকারী সম্মান-সমারোহ-সম্বর্ধনা পেয়েছে, তাকেই যে আবার একদিন এক কাপড়ে কপর্দক-শূন্য হাতে সকলের অলক্ষ্যে রাস্তায় বেরোতে হবে তা কি সে কল্পনা করতে পেরেছিল!

মনে আছে সেদিন ভাগ্য-দেবতার কী নির্দেশ ছিল তা তার জানা ছিল না, কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সে পেয়েছিল যার সঙ্গে জীবনে তার কোনও পরিচয় বা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ তিনি স্বেচ্ছায় তাদের দুজনের কলকাতায় পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, মা, আমি নিমিত্ত মাত্র। যদি তোমাদের কোনও উপকার করতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো!

মিনতি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি তো আমার কোনও পরিচয় জানেন না, তাহলে আপনি কেন আমার এমন উপকার করবেন?

তিনি হেসেছিলেন মিনতির কথা শুনে। বলেছিলেন, পরিচয় আবার জিজ্ঞেস করতে যাবো কেন মা? আমি জানি যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনই বিষময়। কারো বেশি আর কারো বা কম! কোনও বিশেষ বিপদে না পড়লে কি কেউ নিজের শ্বশুর-বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোয়? এ-সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেসই বা কী করতে যাবো? আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবো, আর ক্ষমতা না থাকলে উদ্ধার করতে পারবো না।

তখন পাকিস্তান ইণ্ডিয়ার শত্রু দেশ থেকে পারাপার করা সোজা নয়।

তবু তারই মধ্যে তিনি বোধহয় সে-দেশের সরকারী আমলাদের দয়া আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাই ছাড়-পত্র আদায় করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

তারপর ট্রেনে উঠে বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় আসা।

কিন্তু কলকাতা তো ছোট শহর নয়, বিরাটাকার। শুধু ভবানীপুরের গোলকেন্দু সরকার আর যে স্কুলের তিনি হেডমাস্টার ছিলেন, সেই নামটা মনে ছিল মিনতির। এটুকুই মাত্র তার জানা ছিল যে, দেশ ভাগ হওয়ার পর দেবব্রত সেই কাকার বাড়িতে গিয়েই উঠেছে।

সেইটুকু পরিচয়ের সূত্র ধরে একজন অপরিচিত মানুষ সেদিন মিনতি আর ঝর্ণাকে এই বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মজার কথা এই যে, তিনি এই উপকারের বিনিময়ে কোনও প্রতিদান চাননি।

কিন্তু এই বাড়িতে এসে মিনতি যা দেখলে, তাতে আনন্দের চেয়ে তার আশঙ্কাই হলো বেশি। আগেও মানুষটা অসাধারণ ছিল, এখন এখানে এসে দেখলে সেই মানুষটা এখন আরো অসাধারণ হয়ে গিয়েছে। আবো কোমল, আরো কঠোর, আরো জেদী, আরো তেজী।

ঝর্ণা একটু আড়ালে পেয়ে মা'কে জিজ্ঞেস করেছিল, উনি কে মা?

মিনতি বলেছিল, উনি তোমার বাবা!

ঝর্ণা বিশ্বাস করেনি কথাটা। বলেছিল, কিন্তু তুমিই তো আমাকে বলেছিলে আমার বাবা মারা গিয়েছে।

মিনতি বলেছিল, না, মারা যাননি, ইনিই তোমার বাবা!

কথাটা শুনেও কিন্তু ঝর্ণার বিশ্বাস হয়নি। যদি বাবাই হবেন তাহলে তিনি তাঁকে আদর করেন না কেন? তাকে নিয়ে বেড়াতে যান না কেন? তার জন্যে বাড়িতে আসার সময় দোকান থেকে খেলনা কিনে আনেন না কেন, খাবার কিনে আনেন না কেন?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর ঝর্ণা কোনও দিনই পায়নি। শুধু মনে মনে সে ভেবেছে কেবল, আর সব কিছু লক্ষ্য করে গেছে।

এখানে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বাইরে থেকে একদিন একজন মহিলা বাড়িতে এসে ঢুকলো। বেশ বয়েস হয়েছে মহিলার। দেখতে সুন্দর চেহারা। মাঝবয়েসী হলেও মাথার চুলে একটু একটু পাক ধরেছে।

—কই গো, বউমা কোথায় গেলে?

মহিলার গলা শুনে মিনতি বাইরে বেরিয়ে এলো।

—কে?

মহিলা বলে উঠলো, আমি গো বউমা, আমি। আল্‌তা-মাসি।

—আল্‌তা-মাসি!

—হ্যাঁ গো বউমা, বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ না আমার হাতে কী রয়েছে। এই হচ্ছে আল্‌তার শিশি, আর এই হচ্ছে সিঁদুরের কৌটো।

বলে আল্‌তা-মাসি তার হাতের কাচের শিশিটা আর একটা কাঠের বাক্স দেখালে উঁচু করে।

মিনতির মনের ঘোর তখনও কাটেনি।

আল্‌তা-মাসি আল্‌তার শিশিটা হাতে নিয়ে বসে পড়লো। বললে, বোস বউমা, বোস। বলে একটা ছোট এ্যালুমিনিয়ামের কৌটো বার করে তাতে খানিকটা আল্‌তা ঢাললে।

তারপর বললে, দেখি মা, তোমার পা'টা বাড়িয়ে দাও—

মিনতিও তাই করলে। আল্‌তা-মাসি মিনতির একটা পায়ে পরম যত্ন করে আল্‌তা পরিয়ে দিলে। তারপরে নিজেই বললে, কী চমৎকার পা জোড়া তোমার বউমা, যেন ননীর তৈরি। এবার ডান পা বাড়িয়ে দাও—

মিনতি তখনও বুঝতে পারছে না তার পায়ে আল্‌তা পরিয়ে মহিলার কী লাভ। সে নিঃসঙ্কোচে তার ডান পা'টাও বাড়িয়ে দিলে। তারপরে তাও যখন শেষ হলো, দু'পায়ের ওপর দু'টো টিপ লাগিয়ে দিলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে।

তারপর আল্‌তার শিশির মুখে ছিপি এঁটে দিয়ে সিঁদুরের কৌটোটা খুললে। বললে, এইবার তোমার মাথাটা দেখি—

আল্‌তা-মাসির নির্দেশ মতো মিনতি সামনের দিকে মাথা নিচু করতেই মাসি তার সিঁথিতে আস্তে আস্তে সিঁদুর বুলিয়ে দিলে। কপালের মধ্যিখানেও একটা গোল করে সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে দিলে।

তখন আল্‌তা-মাসি বললে, আশীর্বাদ করি তুমি সোয়ামীর ঘর আলো করে জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থাকো বউমা।

বলে বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে বলেছিল, আবার আসবো মা আমি।

আল্‌তা-মাসি চলে যাওয়ার আগেই গোষ্ঠ রান্না করতে করতে দৌড়ে এল। বললে, এই নাও, তোমার দক্ষিণে নিয়ে যাও।

—দক্ষিণে দেবে? তা দাও—

আল্‌তা-মাসি যাওয়ার পর মিনতি বললে, ও কে গো গোষ্ঠদা?

—ও হলো আল্‌তা-মাসি—

—আল্‌তা-মাসি মানে?

গোষ্ঠ বললে, ও এই সমস্ত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সধবাদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে বেড়ায়।

—তাতে ওর লাভ?

—লাভ কিছুই না।

—তাহলে ওকে তুমি পয়সা দিলে যে?

—পয়সা চায় না, সবাই জোর করে ওকে দক্ষিণে দেয় তাই নেয়।

—কেন এ-রকম করে?

—কেন করে তা কী করে বলবো বউদি।

—কোথায় থাকে?

—আমি জানি না।

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, ওর সংসারে কে-কে আছে?

—শুনেছি ওর নিজের কেউ নেই। ওর স্বামীও নেই।

মিনতি অবাক হয়ে গেল। বললে, ওর স্বামীও নেই? তবে যে ওর মাথায় সিঁদুর রয়েছে, পায়ে আল্‌তা লাগানো।

গোষ্ঠ বললে, লোকে বলে ওর স্বামী নাকি বহুকাল আগে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ওর বিশ্বাস ওর স্বামী আজও বেঁচে আছে। তারপর থেকে ও পাড়ার সব সধবা বউ-ঝিদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে পরিয়ে বেড়ায়।

—তা ওর পেট চলে কী করে?

গোষ্ঠ বললে, ওই যে আমি ওকে একটা টাকা দিলুম, ওই রকম সব বাড়ি থেকেই কিছু-না-কিছু দক্ষিণে পায়। তাইতেই ও কোনও রকমে দু'বেলা ভাতে-ভাত রান্না করে খেয়ে নেয়।

কথাটা শুনে মিনতি অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো। এ আবার কী রকম চরিত্র। তবে কি ও বিশ্বাস করে যে পরের মঙ্গল-কামনা করলে নিজেরও ভালো হয়? হয়তো তাই, কিংবা হয়তো তা নয়।

দু'একদিন পরে ওই আল্‌তা-মাসি আবার একদিন এলো।

মিনতি আল্‌তা পরতে পরতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, আচ্ছা মাসি, মেসোমশাই কোথায়?

আল্‌তা-মাসি বলে উঠলে, কে জানে কোন্ চুলোয়—

মিনতি বললে, এই পরকে আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে তোমার কী লাভ?

—ও মা, বলো কী বউমা, লাভ নেই?

—বলো না, কী লাভ?

আল্‌তা-মাসি বললে, পরের উপকার করলে যে লাভ, এই পরের বাড়ির বউ-ঝিদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়েও তো সেই একই লাভ। এ-জন্মে এইটুকু পুণ্য যদি করতে পাবি, তাহলে পরের জন্মে আবার এই রকম সোয়ামী পাবো। আমার সোয়ামীর মতো সোয়ামী কি সহজে পাওয়া যায় বউমা? অনেক তপস্যা করলে তবে অমন সোয়ামী কেউ পায়।

—তা তোমার সোয়ামীর মতো সোয়ামী তুমি আবার পর জন্মেও চাও?

আল্‌তা-মাসি বলে উঠলো, তা চাইবো না? সোয়ামী-ইস্তিরির সম্পর্ক কি এক জন্মের বউমা? সম্পর্ক তো জন্ম-জন্মান্তরের।

মিনতি বললে, তাহলে তোমাকে একলা ফেলে মেসোমশাই চলে গেল কেন? এটা কি ভালো কাজ হলো?

আল্‌তা-মাসি বললে, আমারই পাপে বউমা, আমারই পাপে—

—তোমার পাপে মানে?

আল্‌তা-মাসি বললে, আমি হয়তো গেল জন্মে কোনও পাপ করেছিলুম। তাই আমাকে ছেড়ে আমার সোয়ামী এমন করে চলে গেছে। তাই তো বউমা এবার এই জন্মে তোমাদের মতো সোয়ামী-সোহাগী বউমাদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে পুণ্য করে বেড়াচ্ছি। যাতে গেল-জন্মের সব পাপ ধুয়ে-মুছে যায়!

আল্‌তা-মাসির বিশ্বাসের কথা শুনে মিনতির মনে যেন খুব ভরসা হলো। ওই সামান্য একজন লেখাপড়া না জানা মেয়েমানুষের মুখ থেকে অমন কথা শুনতে পাবে এটা মিনতি কল্পনাও করতে পারেনি। তার মনে হলো ওই আল্‌তা-মাসির মতো বিশ্বাস যদি সে পেতো!

একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছিল আর মিনতির মনে হচ্ছিল যেন একটা একটা দিন নয়, একটা একটা বছর কেটে যাচ্ছিল, একটা একটা যুগ! যে মানুষটার ওপর নির্ভর করে মিনতি এত কষ্ট করে কলকাতায় এলো সে-মানুষটা যেন দিনের-পর-দিন মাসের-পর-মাস আরো দূরে

চলে যাচ্ছিল। বেশির ভাগ দিন তার দেখাই পাওয়া যেত না। কখন যে সে-মানুষটা ঘুম থেকে ওঠে, কখন যে ঘুমোয় তার সন্ধান রাখা যেন মানুষের পক্ষেও অসাধ্য ছিল।

গোষ্ঠকে মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তোমার দাদাবাবু এত সকালে কোথায় গেছে গো?

গোষ্ঠ বলতো, তা তো তিনি আমায় বলে যাননি। নিশ্চয় কোথাও কোনও জরুরী কাজ আছে তাঁর।

—তা এত কী কাজ থাকে গো তোমার দাদাবাবুর?

—তা আমায় কখনও বলেন না তিনি।

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তা আমরা যে এ-বাড়িতে আছি তা তোমার দাদাবাবুর মনে আছে তো?

গোষ্ঠ বলতো, কী বলছেন আপনি বউদি, আপনাদের কথা তো দাদাবাবু সমস্তক্ষণই বলেন আমাকে—

মিনতি অবাক হয়ে যেত গোষ্ঠদার কথা শুনে। বলতো, সে কী। আমাদের কথা তোমার দাদাবাবু সমস্তক্ষণ বলেন? কী বলেন?

গোষ্ঠ বলতো, বলেন আপনাদের খাওয়াদাওয়ার যেন কোনও কষ্ট না হয়। আপনারা যা-যা খেতে ভালোবাসেন সেই রকম জিনিস বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করে দিতে বলেন।

—সে কী? না না, আমাদের জন্যে বিশেষ রান্না করবার দরকার নেই! তোমার দাদাবাবুর জন্যে যা-যা রান্না হবে, আমরা তাই-ই খাবো। আমাদের জন্যে তোমার দাদাবাবুকে অতো ভাবতে বারণ করে দিও।

গোষ্ঠ বলতো, দাদাবাবুর রান্না আপনারা খেতে পারবেন না বউদি। আপনাদের জিভে তা রুচবে না।

—কেন? খেতে পারবো না কেন?

গোষ্ঠ বলতো, সে-রান্নায় তেল নেই, ঘি নেই, মশলা নেই, লঙ্কা নেই কিছুছু। উনি তো মাছ-মাংস ডিম-পেঁয়াজ-রসুন কিছু খান না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

মিনতি বলতো, তাহলে কি কেবল আমাদের জন্যেই তুমি মাছ রান্না করো?

—হ্যাঁ! মাছ না হলে আপনাদের খেতে কষ্ট হবে, তাই উনি সেই নিয়ম করে দিয়েছেন!

মিনতি খানিকক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে থাকতো। তারপর জিজ্ঞেস করতো, আর তুমি? তুমি কী খাও?

গোষ্ঠ বললো, দাদাবাবু যা খান আমিও তাই খাই। দাদাবাবু বলেন, ওই খাওয়াতেই নাকি শরীর ভালো থাকে।

মিনতি বলতো, না না, শুধু আমাদের জন্যে মাছ রান্নার দরকার নেই। তোমরা যা খাবে আমরাও তাই খাবো। মিছিমিছি কেন শুধু আমাদের জন্যে মাছ রান্না করা!

গোষ্ঠ কিন্তু তা শুনতো না। সে মিনতিদের জন্যে আলাদা করে মাছ রান্না করে দিত।

আসলে গোষ্ঠই ছিল এ-বাড়ির কর্তা, এবং একই সঙ্গে গোষ্ঠই ছিল এ-বাড়ির গিন্নী। দেবব্রত মাইনেটা পেয়েই সেটা গোষ্ঠর হাতে দিয়ে দিত, গোষ্ঠও সেই টাকার মধ্যে সংসার-খরচটা চালাবার চেষ্টা করতো।

দেবব্রত মাঝে মাঝে গোষ্ঠকে জিজ্ঞেস করতো, হ্যাঁ রে, টাকা-কড়ি আছে তো তোর হাতে? না কি টাকার দরকার তোর?

গোষ্ঠ ওই টাকার মধ্যেই সংসার চালিয়ে নিত। বলতো—না, আর টাকার দরকার নেই।

তারই মধ্যে আবার আল্তা-মাসিকেও মাঝে মাঝে আট আনা কি একটা টাকা বখশিশ দিত সে। অনেকবার মাসের শেষের দিকে বলতো, আল্তা-মাসি, আজকে আর কিছু দিতে পারবো না—

আর আল্তা-মাসিও তেমনি। টাকাটা না-পেলেও তার কোনও ব্যাজার নেই। সব সময়েই তার হাসিমুখ। সব সময়েই তার মুখে ওই একই কথা—সোয়ামী-ইস্তিরীর সম্পর্ক কি এক জন্মের মা? সে সম্পর্ক যে জন্ম-জন্মান্তরের—পরের জন্মে তুমি এই রকম সোয়ামীই যেন পাও বউমা, এই আশীর্বাদ করি।

সেদিন মিনতি বললে, গোষ্ঠদা, তুমি একলা কেন রান্নাবান্না করবে, আমি তো বসেই থাকি, আমিও না হয় তোমাকে একটু সাহায্য করি—

গোষ্ঠ বললে, না না বউদি, তা হয় না আপনি নতুন এসেছেন, আপনি অতো কষ্ট করতে যাবেন কেন?

মিনতি বলতো, না না, আমি একটু রান্না করি। রান্না না করতে পারলে আমি রান্না করতে যে ভুলে যাবো—

গোষ্ঠ আপত্তি করতো। বলতো, না, আপনি রান্না করছেন শুনলে দাদাবাবু বকাবকি করবেন।

—কেন, বকাবকি করবেন কেন?

গোষ্ঠ বলতো, না, দাদাবাবু আমাকে বার-বা ` করে বলে দিয়েছেন বউদির যেন কোনও কষ্ট না হয়।

—কেন? রান্না করতে বারণ করে দিয়েছেন কী জন্যে?

গোষ্ঠ বলতো, কী জানি কেন বারণ করেছেন। মনে হয় আপনার কষ্ট হওয়ার কথা ভেবেই বারণ করে দিয়েছেন।

—কেন, কষ্ট হবে কেন?

গোষ্ঠ বলতো, কষ্ট হবে না? আপনারা বড়লোকের বাড়িতে জন্মেছেন, আপনাদের কি নিজের হাতে রান্না করা পোষায়?

—এ-কথা কি তোমার দাদাবাবু তোমাকে বলেছেন?

—না, আমি বলছি।

মিনতি বলতো, না গোষ্ঠদা, না। আমি তোমাদের মতো গরীবের ঘরেই জন্মেছি, সংসারের কাজ করা আমার অভ্যেস আছে।

না, তবু গোষ্ঠ মিনতিকে কোনও কাজ করতে দিত না।

কিন্তু এ-রকম ভাবে কতোদিন মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে? স্বাস্থ্য আছে, মন আছে, সময় আছে। এত অফুরন্ত বিশ্রাম নিয়ে কি কেউ বেঁচে থাকতে পারে?

সেদিন হঠাৎ সদর-দরজার কড়া বাজতেই মিনতি কী করবে বুঝে উঠতে পারলে না।

গোষ্ঠদাও কোন কাজ নিয়ে বাইরে গিয়েছে। ঝর্ণাও ঘরের ভেতরে কী একটা ছবির বই নিয়ে পড়ছিল। সদর দরজার ভেতর থেকে মিনতি জিজ্ঞেস করলে, কে? গোষ্ঠদা?

বাইরে থেকে পুরুষের গলার আওয়াজ এলো, দেবুদা আছেন?

মিনতি বললে, না, তিনি বাড়ি নেই।

তব বাইরে থেকে অনুরোধ এলো, একট দরজাটা খুলবেন? একটা বই দিয়ে যাবো দেবুদাকে।

অগত্যা দরজাটা খুলতেই হলো মিনতিকে। মিনতি দেখলে একজন ভদ্রলোক একটা বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মিনতিকে দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অবাক হয়ে গেছেন। হয়তো এ-বাড়িতে একজন মহিলাকে দেখবেন, এটা যেন তিনি আশা করেননি।

—এই বইটা দেবুদাকে দিয়ে দেবেন। বলবেন সুশীল এসেছিল।

—ঠিক আছে।

বলে ভদ্রলোক মিনতির হাতে বইটা দিয়ে চলে গেলেন।

মিনতিও বইটা নিয়ে আবার দরজায় যথারীতি খিল বন্ধ করে দিলে। মিনতি বইটার দিকে দেখে বুঝলে ওপরে লেখা আছে, ভক্তিযোগ। লেখক অশ্বিনীকুমার দত্ত। তারপর যখন গোষ্ঠ এলো তখন সব ঘটনাটা খুলে বললে। বইটাও দিলে তাকে।

গোষ্ঠ বললে, আমি দাদাবাবুকে দিয়ে দেব'খন।

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, ওই সুশীল কে গো গোষ্ঠদা?

—ও দাদাবাবুর একজন ছাত্র। ওকে দাদাবাবু মাঝে-মাঝে বই পড়তে দেন। শুধু সুশীল নয়, আরো কতো ছাত্র যে দাদাবাবুর আছে। কিন্তু ছাত্রই শুধু নয়, কতো ভক্তও যে ওঁর আছে তার ঠিক নেই।

এর কিছুদিন পরেই আর এক কাণ্ড হলো। মিনতি দেখলে সেদিন সকাল থেকেই গোষ্ঠ নানা-কাজে খুব ব্যস্ত। প্রথমে মিনতি কিছু বুঝতে পারেনি। গোষ্ঠকেও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সকালবেলা দাদাবাবু যেমন রোজ বেরিয়ে যান, তেমনি বেরিয়ে গেছেন।

বিকেল থেকেই বাড়িতে অনেকে আসতে আরম্ভ করতে লাগলো। একজন নয়, দু'জন নয় ক্রমে ক্রমে দশ-বারোজন লোক। সকলের হাতে ফুলের মালা, মিষ্টির বাক্স। গোষ্ঠ তাদের সকলকেই অভ্যর্থনা করে ঘরের ভেতরে বসালো।

মিনতি আর ঝর্ণা দু'জনেই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। এমন তো হয় না কখনোও। হঠাৎ বাড়িতে এত লোকের আমদানি কেন হলো? এর উদ্দেশ্য কী?

গোষ্ঠর তখন খুব ব্যস্ততা চলছে। একবার বাইরের দোকানে যাচ্ছে, আবার বাড়িতে এসে রান্না সামলাচ্ছে। বাইরের ঘরটা তখন লোকজনে ভর্তি হয়ে গেছে। সবাই-ই প্রশ্ন করছে, কী হলো গোষ্ঠ, স্যার কোথায়?

—আপনারা বসুন, দাদাবাবু এখুনি আসছেন।

দূর থেকে মিনতি সমস্ত দেখছিল। ঝর্ণাও দেখছিল। এত লোক কেন তাদের বাড়িতে! এরা কারা!

এক সময়ে আরো চার-পাঁচজন লোক জড়ো হলো।

এরই ফাঁকে মিনতি একবার গোষ্ঠকে ফাঁকা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, আজকে বাড়িতে কী হচ্ছে গো?

—আজকে আমাদের দাদাবাবুর জন্মদিন বউদি।

—তাই নাকি? জন্মদিন? ওঁরা কারা?

—ওঁরা সব দাদাবাবুর ইস্কুলের ছেলে আর মাস্টার মশাইরা।

—তা তোমার দাদাবাবু এ-দিনে কোথায় গেছেন?

—তাঁর কি কোনও ঠিক আছে বউদি? তাঁর সব কথা মনেও থাকে না। তাঁর কি কম কাজ?

—কী এত কাজ তাঁর।

—সে আপনি বুঝবেন না বউদি, তাঁর যে সকলের সব ব্যাপারে মাথা ব্যথা...

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কে একজন তাকে ডাকলে, আর সে সেই দিকেই চলে গেল। তার উত্তরটা পুরো দেওয়া হলো না।

এদিকে সবাই যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তখন দেবব্রত বাড়িতে এসে হাজির। দেবব্রতকে দেখে তখন সবাই উল্লসিত।

দেবব্রত তাদের সকলকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হে, তোমরা হঠাৎ? কী মনে করে?

এক ভদ্রলোক একটা ফুলের মালা দেবব্রতর গলায় পরিয়ে দিলে।

—কী, ব্যাপার কী? এ-সব কী?

তারপর আরো মালা, আরো ফুল। মালার ভারে দেবব্রত তখন তটস্থ। দেবব্রত গলা থেকে মালা নামাতেও পারছে না, মালা পরাবার মতো জায়গাও নেই তখন তার গলাতে।

—আরে, তোমাদের ব্যাপার কী, হঠাৎ আমি কী করে বসলাম যে, তোমরা এত ফুলের মালা দিচ্ছ?

সুশীল বললে, আজকে যে আপনার জন্মদিন তা আপনি ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা তো তা ভুলতে পারি না।

—আমার জন্মদিন? বলে হো-হো করে দেবব্রত হাসতে হাসতে ঘব ফাটিয়ে দিলে।

হাসি থামিয়ে আবার বললে, তোমরা তো আমায় অবাক করে দিলে হে? তোমাদের স্মৃতি-শক্তি তো খুব প্রখর।

সুশীল বললে, তা আজ এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন দেবুদা?

আর বোল না— আমাদের যতীনের বাবার খুব অসুখ। সেইখানে যেতে হয়েছিল।

—যতীন? যতীন কে?

দেবব্রত বললে, যতীন দত্ত, ক্লাশ টেন-এর স্টুডেন্ট, তার বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে, খববটা পেয়েই তাদের বাড়িতে গেলুম। গিয়ে দেখি সব্বাই খুব ভাবনায় পড়েছে। ডাক্তার ডাকবার টাকাও নেই কাছে। তখন আমার এক জানাশোনা ডাক্তাবকে ডেকে আনলুম। তার গাড়িতেই যতীনের বাবাকে হসপিটালে পৌঁছিয়ে দিয়ে সেখানে ভর্তি করিয়ে তবে এখানে আসছি।

সুশীল বললে, এখন কেমন আছেন তিনি?

দেবব্রত বললে, ভালো বলে তো মনে হলো না। কাল সকালে আবার একবার হসপিটালে গিয়ে দেখতে হবে, কেমন আছেন তিনি।

তারপর ডাকলে, ওরে গোষ্ঠ, কোথায় গেলি তুই?

গোষ্ঠ সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, এই তো আমি—

দেবব্রত বললে, তোর কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে? দিতে পারিস?

গোষ্ঠ পঞ্চাশটা টাকা এনে দিতেই দেবব্রত টাকাগুলো পকেটে রেখে দিয়ে বললে, যতীনটা এত হতভাগা যে ঘরে একটা টাকা পর্যন্ত নেই যে ডাক্তাবকে ফী দেবে, এই টাকা দিলে তবে ওদের বাড়ি কাল ভাত রান্না হবে...।

সুশীল বললে, এবার আমাদের বউদিকে আর ঝর্ণাকে একটু ডাকুন দেবুদা।

বউদি? দেবব্রত তখন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সকলের দিকে।

সুশীল, সুব্রত, কেদার সবাই-ই একসঙ্গে বলে উঠলো, আপনি আমাদের কিছুই বলেননি দেবুদা, কিন্তু আমরা সব জেনে গেছি। ডাকুন বউদি আর ঝর্ণাকে। ও গোষ্ঠ, তোমার বউদিকে আর ঝর্ণাকে একবার এ-ঘরে আসতে বলো তো।

গোষ্ঠ ভেতরে গিয়ে মিনতিকে কথাটা বলতেই মিনতি বলে উঠলো, আমি? আমাকে ওঁরা ডাকছেন?

—হ্যাঁ, আপনাকেও ডাকছেন, আর খুকুকেও সবাই ডাকছেন।

মিনতি কথাটা শুনেই কেঁপে উঠেছে।

বললে, আমাকে ওঁরা ডাকছেন? তুমি ঠিক শুনেছ তো গোষ্ঠদা?

—হ্যাঁ বউদি, আমি ঠিক শুনেছি না তো কি বেঠিক শুনেছি? আপনাকে আর খুকুকে দুজনকেই ডেকেছেন। চলুন, অনেক বাত হয়ে গেছে! আর দেরি করবেন না।

সাহাবুদ্দীনের সংসারে যখন মিনতি 'বেগম-মিনতি' হয়ে বাস করতো, তখন তাকে অনেক মিটিং অনেক সভায় যেতে হয়েছে। অনেক জায়গায় গিয়ে সামান্য-কিছু বলতেও হয়েছে অনেক সময়। তখন সে-সব অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার? এবার এখানে তার পরিচিতি কী?

সে কে? সে তো এখানে পত্নী নয়, আশ্রিতা। আশ্রিতা ছাড়া তার আর কী পরিচিতি, আর কী বিশেষণ আছে?

মিনতি বললে, আমি এই ভাবেই যাবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যেমন আছেন ওই ভাবেই চলুন। আর খুকু, তুমিও চলো।

কী আর করা যাবে তখন।

যেমন পোশাকে মিনতি ছিল, সেইভাবেই ঝর্ণাকে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল যেন।

সুশীল, সুব্রত, কেদার তারা সবাই-ই এক-একটা মোটা ফুলের মালা নিয়ে এসে মিনতির হাতে তুলে দিলে, ঝর্ণাকেও দিলে এক-একটা ফুলের তোড়া।

শুধু তাই-ই নয়। ফুলের মালা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই হাত দিয়ে মিনতির পায়ের পাতা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালে। সেই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার পর্ব যেন কিছুতেই শেষ হয় না।

সুশীল বললে, জানেন বউদি, আপনার আসার কথা দেবুদা আমাদের কাছে একবারও বলেনি, পাছে আমরা দেবুদার কাছে মিষ্টি খেতে চাই।

দেবব্রতও বললে, সত্যিই, তোমরা মিনতিকে জানলে কী করে সুশীল?

সুশীল, সুব্রত, কেদার সবাই-ই বললে, আমাদের কাছে আর কতোদিন খবরটা লুকিয়ে রাখবেন দেবুদা?

দেবব্রত বললে, সত্যিই বলো না, তোমরা মিনতির কথা জানতে পারলে কী করে?

সুশীল বললে, আমি একদিন আপনার 'ভক্তিযোগ' বইটা ফেরত দিতে এসেছিলুম, তখন আপনি বাড়ি ছিলেন না।

—তারপর?

—তারপর আর কী! আমরা বউদিকে দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনাকে কিছু বলিনি। ভেবেছিলুম আপনার জন্মদিনে আমরা সারপ্রাইজ দেব।

দেবব্রত বললে, ও তাই বলো।

বলে হাসতে লাগলো দেবুদা।

তখন সবাই-ই সেই হাসিতে যোগ দিয়ে একসঙ্গে হাসতে লাগলো। সবাই বললে, আপনারা দু'জনে একবার একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়ান, একটা ছবি তুলবো --

—ছবি?

দেবব্রতর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে, ছবি কেন তুলবে তোমরা?

সুব্রত বললে, এমন সুযোগ তো আর পরে আসবে না, দাদা আর বউদিকে তো আর ভবিষ্যতে একসঙ্গে পাব না।

দেবব্রত বললে, তোমরা কী করে জানলে যে ইনি তোমদের বউদি?

সুশীল বললে, আমি জানতে পেরেছি দেবুদা।

দেবব্রত আর এ-কথার প্রতিবাদ করলে না। শুধু বললে, তা তোল।

পাশাপাশি দাঁড়ালো দু'জনে। গোষ্ঠ হঠাৎ বলে উঠলো, তাহলে ঝর্ণা বাদ পড়লো কেন। ওকেও ছবিতে নিন দাদাবাবু আর বউদির সঙ্গে।

ঝর্ণাকেও দু'জনের মধ্যিখানে দাঁড়াতে হলো।

সুব্রত বললে, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেল—

দেবব্রত বললে, কী?

—আপনাব বাঁ পাশে বউদি দাঁড়ালে ঠিক হতো।

সুশীল বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুব্রত ঠিক বলেছে। বউদি, আপনি দেবুদা'ব বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

আগে এ-রকম কতো বার ফটো তোলা হয়েছে মিনতি আর সাহাবদ্দীনের। তখন পাকিস্তানের খবরের কাগজেও সে-সব ছবি কতোবার ছাপা হয়েছে। সে-সব এখন এই সময়ে অতীতের পর্যায়ে পড়ে গেছে। সে-সব কথা এখন ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু অতীত বলে কি তা চিরকালের মতো মিথ্যে হয়ে গিয়েছে! মিথ্যে যদি হতো তাহলে ঝর্ণাও তো মিথ্যে হয়ে যেত তার জীবনে। তাহলে তাকে নিয়ে আর লজ্জার মাথা খেয়ে আজ এমন করে এ-বাড়িতে আসতে হতো না।

ফটো তোলা হয়ে গেলে গোষ্ঠ বললে, ফটোটা তৈরি হলে আমাকে একটা দেবেন মাস্টারমশাই।

দেবব্রত রেগে গেল। বললে, কেন, ও-ফটো নিয়ে তুই কী করবি? বাড়িতে আমার বই-পত্র রাখবার জায়গা হয় না, তার ওপর আবার ফটো। ও-সব দরকার নেই সুব্রত, ও তোমাকে দিতে হবে না।

তা পরের কথা পরে হবে! সবাই দল-বল নিয়ে চলে যেতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গোষ্ঠ বললে, এখন আপনারা যেতে পারবেন না, একটু বসুন।

দেবব্রত তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে, কেন, তোর আবার কী কাজ আছে?

এর উত্তর না দিয়ে গোষ্ঠ বাড়ির ভেতরে চলে গেল। আর খানিক পরেই সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল, সে মাটির ডিশ্-এ করে রসগোল্লা নিম্‌কি সিঙাড়া নিয়ে এসে ঘরের মেঝেতে রাখছে। যতোগুলো অতিথি এসেছে, ততোগুলো খাবারের ডিশ্।

সকলের জন্যে খাবারের ডিশ্ আনা হয়ে গেলে সে বলে উঠলো, এবার দয়া করে একটু মুখে দিন আপনারা।

দেবব্রত তার কাণ্ড-কারখানা দেখে ততক্ষণে অবাক। তার খুব রাগ হলো। বললে, এ সব কী করেছিস রে গোষ্ঠ? এ-সব তোকে আবার কে করতে বললে রে?

এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না সে। সে আবার সকলের দিকে চেয়ে বললে, আপনারা একটু মুখে দিন সবাই।

দেবব্রত বললে, তুই হঠাৎ এ-সব করতে গেলি কেন?

—আজ আপনার জন্মদিন, আজকে করবো না তো কবে করবো?

দেবব্রত বললে, জন্মদিন কি শুধু আজই প্রথম হলো? আগে হয়নি? আগেও তো কতোবার এঁরা জন্মদিন করতে এসেছেন, তখন তো কখনও এই সব কাণ্ড করিসনি!

সুব্রতরা সবাই তখন ডিশ্ থেকে খাবার তুলে নিতে আরম্ভ করেছে।

বললে, ওকে অতো বকবেন না দেবুদা, আজ তো সকলেরই আনন্দের দিন। ওর আনন্দ হয়েছে তাই করেছে।

দেবব্রত বললে, তা ও জানে না এই কলকাতায় কতো লোক খেতে পায় না, কতো লোকের থাকবার মতো একটা ঘর নেই, কতো লোকের দু'বেলা অন্নই জোটে না।

—থাক থাক, ওকে অতো বকবেন না।

কিন্তু তার রাগ তখনও কমেনি। বললে, ও কা'র টাকা দিয়ে তোমাদের খাওয়াচ্ছে? ও তো আমারই টাকা! সবাই যদি জানতে পারে যে, আমি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে নিজের জন্মদিনের উৎসব পালন করছি, এই রকম করে টাকা নষ্ট করছি, তাহলে আমি তাদের কী জবাব দেব বলো তো?

গোষ্ঠ বললে, ও টাকা আপনার নাকি, ও তো আমার টাকা।

—তোর টাকা? তোর টাকা মানে?

—আপনি তো মাইনের সব টাকাটা এনে আমার হাতে তুলে দেন। তাতে ওটা আমার টাকা হলো না?

—তা সে-টাকা তো তোকে দিই সংসার খরচের জন্যে!

—সেই সংসার খরচের টাকা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়েই তো আমি ওই টাকা জমিয়েছি। আমি যদি টাকা না জমাতাম তো আজকে এই মিষ্টি খাওয়াতে পারতুম?

—তুই সংসার খরচ থেকে টাকা বাঁচালি বলেই অমনি ওটা তোর টাকা হয়ে গেল? তাহলে আর এবার থেকে মাইনের টাকাটা এনে তোর হাতে তুলে দেব না।

গোষ্ঠ বললে, তা না-দেবেন না-দেবেন। আমার কী? তখন আপনি কোনও দিন খেতেই পাবেন না।

—কেন, খেতে পাবো না কেন?

গোষ্ঠ বললে, আপনি কি সারাদিন বাড়িতে থাকেন যে যখনই টাকার দরকার হবে আর অমনি তখনই আপনার কাছে টাকা চাইবো? ও-সব আমি পারবো না।

দেবব্রত বললে, তা না পারিস তো আমারও দরকার নেই তোকে, আমি অন্য লোক রাখবো।

গোষ্ঠর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তাহলে আমি চলে যাই—

বলে আর দাঁড়ালো না। যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় রাস্তার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেবব্রত তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। বললে, কোথায় যাচ্ছিস তুই?

—আপনি যে বললেন, আপনার আর দরকার নেই আমাকে।

—যদি চলেই যাবি তো আমার টাকাগুলোর হিসেব দিয়ে যা।

—হিসেব? টাকার হিসেব চাইছেন আপনি?

—তা হিসেব চাইবো না? টাকা যখন আমার তখন তার হিসেব চাইবারও আমার অধিকার আছে!

সুশীল বললে, দেবুদা, ওকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে।

—কেন ছেড়ে দেব? হিসেব দেবে না আমার টাকার, আর ওকে ছেড়ে দিলেই হলো?

গোষ্ঠ মাস্টারমশাইদের দিকে চেয়ে বললে, দেখছেন তো আপনারা, আমাকে তাড়িয়েও দেবেন, আবার যেতেও দেবেন না—এ তো এক মহা জ্বালা।

দেবব্রত বললে, তা তুই হিসেব দিয়ে যাবি তো?

গোষ্ঠ এবার দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। বললে, না, হিসেব আমি দেব না! যা করতে পারেন করুন!

—জানিস, টাকা তছরুপের দায়ে তোকে পুলিশে দিতে পারি?

—তাই দিন না পুলিশের হাতে, তাহলে তো বেঁচেই যাই। জেলে থাকলে কারোর কোনও দায়-দায়িত্বও অন্ততঃ নিতে হবে না।

সুশীল বললে, গোষ্ঠ, তুমি আর কথা বাড়িও না, থেকে যাও, দেবুদা যা বলেন, তুমি চুপ করে শুনে যাও।

গোষ্ঠ তখনও তার সিদ্ধান্তে অটল। বললে, না, আমি চলে যাবোই, আজ রাত্তিরেই আমি চলে যাবো।

—চলে যাবি মানে?

—চলে যাবো মানে চলে যাবো!

—না, আমার কাজগুলো সব সেরে দিবি, তবে যেতে দেব তোকে।

—আমার রান্না-বান্না সব শেষ, শুধু থালায় বেড়ে নিয়ে খেতে হবে। তা সেটাও নিজেরা পারবেন না?

দেবব্রত বললে, না, তোকে থালায় ভাত বেড়ে দিতে হবে, আমি খেতে বসবো, আর তার আগে আমার পুজোর জায়গা করে দিতে হবে। জপ-তপ-আহ্নিক শেষ না করে তো আমি খাবো

না, সে-সব কে করবে? আমি করবো? আমি নিজের হাতে কখনও ও-সব কাজ করেছি যে আজ করবো।

—দেখছেন তো বাবুরা, এই মানুষটাকে নিয়ে আমি কী যে করি?

সকলেরই তখন বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাই সবাই বললে, তুমি আর কিছু বোল না গোষ্ঠ, চুপ করে থাকো। দেবুদার কোনও কথায় রাগ কোর না।

গোষ্ঠ বললে, আপনাদের দেবুদা কেবল বলছেন, আমি কেন অতো টাকা নষ্ট করে আপনাদের খাবার খাওয়ালুম! তা আপনারাই বলুন, এতদিন পরে বাড়িতে বউদি এসেছেন, তাতে আমার আনন্দ হওয়া কি অন্যায় হয়েছে? এর আগে আপনারা তো দাদাবাবুর জন্মদিনে কতবার এসেছেন, তখন কি কখনও আপনাদের জলখাবার খাইয়েছি? বউদি আর খুকুমণি বাড়িতে না এলে কি আজকেও আমি আপনাদের খাওয়াতুম? না, খাওয়াতুম না!...তা এতেও যদি অন্যায় হয়ে থাকে তো অন্যায় হোক, আমি ঘাট মানছি, আমি এবার থেকে তাহলে সমস্ত টাকা-পয়সার হিসেব রাখবো, এই আপনাদের সামনেই আমি কথা দিচ্ছি, একটা পাই পয়সারও হিসেব রাখবো।

দেবব্রত তখন তার হাত ছেড়ে দিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, তোমরা দেখলে তো! গোষ্ঠ এই রকমই লোক! ওর সব ভালো, শুধু রেগে গেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না।

এমনি করেই দেবব্রত আর মিনতির সংসার চলছিল। কিন্তু আসলে কি এটা তাদের সংসার? না, এই সংসারটার আসল মালিক দেবব্রতও নয়, মিনতিও নয়। আসল মালিক ছিল গোষ্ঠ! সেই ছিল এই সংসারের আসল চালক। সেদিন গোষ্ঠ যথারীতি রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল।

মিনতি বললে, গোষ্ঠদা একটা কাজ করবে?

—বলুন বউদি, কী কাজ?

—জানি না তুমি শুনে কী বলবে! আমার বলতে বড্ড ভয় করছে।

—আপনি বলুনই না বউদি। ভয় কীসের?

মিনতি বললে, তোমার দাদাবাবু যদি কিছু বলেন, তখন?

—দাদাবাবু আবার কী বলবেন? আপনি তো দেখছেন দাদাবাবু এ-বাড়ির কেউ-ই নন। তিনি কেবল তাঁর ছাত্র আর ইস্কুল নিয়ে থাকেন। তাঁর মাইনেটা আমার হাতে ফেলে দিয়েই তিনি খালাস। বেগুন, আলু, পটল, সরষের তেলের কী দাম তা নিয়ে কি কখনও মাথা ঘামিয়েছেন। না মাথা ঘামাবেন? তাঁর ছাত্ররা মানুষ হলেই তিনি খুশী, আর কোনও দিকে তাঁর নজর নেই।

—এ-রকম কেন হলেন বলো তো তোমার দাদাবাবু?

—কারণটা আমি কী করে জানবো বলুন বউদি?

—তবু তুমি কি আন্দাজ করো? কেন ও-রকম হলেন?

—আমি আন্দাজ কী করে করবো? তবে দেখতাম প্রায়ই উনি আড়ালে কাঁদতেন।

—কাঁদতেন? কী জন্যে কাঁদতেন? কা'র জন্যে কাঁদতেন? বাবা-মা মারা যাওয়ার জন্যে?

গোষ্ঠ বললে, আমিও কিছু কারণ বুঝতে না পেরে শেষকালে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী শরীর খারাপ দাদাবাবু? দাদাবাবু আমাকে দেখলেই কান্না থামিয়ে দিতেন। বলতেন, যা যা, তুই চলে যা এখান থেকে, তুই তোর নিজের কাজ করগে যা।

—তারপর?

—তারপর একদিন পাড়ার এক ডাক্তারবাবুকে আমি বাড়িতে ডেকে আনলুম। ডাক্তারবাবুকে বললুম, আমার দাদাবাবু একলা থাকলে প্রায়ই কাঁদেন। আপনি তাঁকে দেখে কিছু ওষুধপত্তর দিয়ে যান। নিশ্চয়ই তাঁর কোনও অসুখ হয়েছে। নইলে একলা থাকলেই উনি অতো কাঁদেন কেন? তা ডাক্তারবাবু এলেন।

তাঁকে দেখে দাদাবাবু তো অবাক। বললেন, কী হলো ডাক্তারবাবু, আপনি কাকে দেখতে এসেছেন? কার অসুখ হয়েছে এ বাড়িতে?

ডাক্তারবাবু আরো অবাক দাদাবাবুর কথা শুনে। বললেন, কার আবার, গোষ্ঠ বললে আপনার নাকি অসুখ হয়েছে। আপনি নাকি একলা-একলা যন্ত্রণায় কাঁদেন?

—আমি যন্ত্রণায় কাঁদি? গোষ্ঠ বলেছে আপনাকে?

দাদাবাবু তখন আমায় ডেকে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি ডাক্তারবাবুকে বলেছিস যন্ত্রণার চোটে একলা-একলা কাঁদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো দেখেছি, আপনি যন্ত্রণায় কাঁদেন। আর আমাকে দেখেই কান্না থামিয়ে দেন, পাছে আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

—দূর বেটা, তুই যা এখান থেকে। আমাকে কি পাগল পেয়েছিস নাকি যে, আমি আপন মনে কেবল একলা-একলা কাঁদবো? যা তুই এখান থেকে, আর ডাক্তারবাবুকে ওঁর ফী চার টাকা দিয়ে দে।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপাবটা কী বলুন তো দেবব্রতবাবু? গোষ্ঠ নিশ্চয়ই আপনাকে কাঁদতে দেখেছে। নইলে মিছিমিছি আমাকে ডাকবে কেন? ব্যাপারটা কী বুঝিয়ে বলুন তো।

দাদাবাবু বললেন, দেখুন ডাক্তাববাবু, আমি কাঁদি না। আমি কেন মিছিমিছি কাঁদতে যাবো। যাঁরা কাঁদেন তাঁরা অন্য লোক। তাঁদের গোষ্ঠও দেখতে পায় না, কোনও মানুষই দেখতে পায় না। কেবল আমিই দেখতে পাই তাঁদের, আমিই তাঁদের কান্না শুনতে পাই।

ডাক্তারবাবু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কারা কাঁদেন?

দাদাবাবু বললেন, গোষ্ঠ তো লেখাপডা জানে না, একেবারে আকাট মুখ্যু। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনি তো লেখাপড়া করেছেন। বললে আপনি বুঝলেও বুঝতে পারবেন— কাঁদেন কারা জানেন? কাঁদেন ভগবান!

—ভগবান কাঁদেন মানে?

দাদাবাবু বললেন, মানুষের যিনি ভগবান, তিনিই কাঁদেন।

—কেন, মানুষের ভগবান কাঁদেন কেন?

—বারে, কাঁদবেন না? চার টাকা মণ চালের দাম দেড়শো টাকায় উঠলে মানুষ খাবে কী? সোনার দাম বাড়লে মানুষের ক্ষতি নেই, কারণ মানুষ তো সোনার ভাত কিংবা সোনার রুটি খায় না, কিন্তু আলু, তেল, কয়লা, কাঠ, এসব জিনিস তো মানুষ যতো গরীবই হোক, তাকে খেতেই হবে! কিন্তু কেন তার দাম এতো হাজার গুণ বাড়বে? আগে না হয় ইংরেজরা ও সব জিনিস লুঠপাট করে নিজের দেশে নিয়ে যেত, কিন্তু এখন? এখন কে সেই আগেকার মতোন লুঠপাট করে খাচ্ছে? তারা কারা ডাক্তাববাবু?

ডাক্তারবাবু কী আর বলবেন? ওসব কথার উত্তর ব্রিটিশ মেডিকেল ফার্মাকোপিয়ায় লেখা থাকে না।

দাদাবাবু তখনও বলে চলেছিলেন, জানেন ডাক্তারবাবু আমি রাস্তা দিয়ে যাই আর কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে মানুষের লাইন দেখে ভগবানের কান্না শুনতে পাই। আবার সিনেমা-ঘরের সামনে দিয়ে যখন যাই তখনও মানুষের লাইন দেখে ভগবানের কান্না শুনতে পাই! আপনি শুনতে পান না সে-কান্না?

ডাক্তারবাবু বললেন, না তো!

দাদাবাবু সে-উত্তর শুনে মোটেই আশ্চর্য হলেন না।

বললে, শুধু আপনি যে শুনতে পান না তাই নয় ডাক্তারবাবু ইণ্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহেরু পর্যন্ত সে-কান্না শুনতে পান না। বল্লভভাই প্যাটেল শুনতে পান না, মোরারজী দেশাই শুনতে পান না, আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অতুল্য ঘোষ, বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, তাঁরাও ভগবানের কান্না শুনতে পান না। এ-অবস্থায় আমি কী করি, বলুন? এ-কান্না কী করলে থামবে বলুন তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু চুপ করে তাঁর রোগীর কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু কোনও জবাব দিচ্ছিলেন না। কারণ এ-সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর ব্রিটিশ মেডিকেল ফার্মাকোপিয়ায় লেখা নেই।

দাদাবাবু আবার বলতে লাগলেন, আমি কী করি বলুন তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কাজের লোক। একজন পাগল-রোগীর কাছে বেশিক্ষণ বসে থাকলে তাঁর চলবে না। আরো অনেক 'কল্' আছে তাঁর। পাড়ার অনেক রোগী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

গোষ্ঠ ঘরে ঢুকে তাঁর হাতে 'ভিজিট'টা দিতেই তিনি উঠলেন।

তাঁকে চলে যেতে দেখেই দাদাবাবু বলে উঠলেন, আপনি যাচ্ছেন ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

দাদাবাবু বললেন, কিছু ওষুধ দিলেন না? কোনও প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখে দিলেন না?

—কী ওষুধ দেব আপনাকে, বলুন?

দাদাবাবু বললেন, তাহলে আমার কী হবে?

—আপনার কিছুই হয়নি। মিছিমিছি ওই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন!

দাদাবাবু বললেন, তাহলে আপনি বলতে চান ভগবান কাঁদছে না?

—না না, ও-সব বাজে কথা। আপনি একটু ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন, একটু আরাম করে ঘুমোন, আপনার কিছুই হয়নি।

—কিন্তু...

তখন আর বাজে-কথা শোনবার মতো সময় নেই ডাক্তারবাবুর। সময় নেই রোগীর রোগ সারানোর চিকিৎসার জন্যে নয়, সময় নেই টাকা উপায়ের জন্যে। ডাক্তারবাবুর কাছে সময় মানেই টাকা। ডাক্তারবাবুর তাই কেবল মনে হয়-চব্বিশ ঘণ্টায় দিন না হয়ে যদি আটচল্লিশ ঘণ্টায় দিন হতো! যদি বাহাত্তর ঘণ্টায় দিন হতো ..

যতো দিন যাচ্ছে, পৃথিবীর মানচিত্র ততো বদলে যাচ্ছে। মানচিত্রের রংও ততো বদলে যাচ্ছে। আজ যে-দেশটার রং লাল, কাল সে-দেশটার রং নীল হয়ে যাচ্ছে। আর দেশগুলোব রং যতো বদলাচ্ছে মানুষও ততো বদলে যাচ্ছে। দেশের মানুষগুলোর রংও ততো বদলে যাচ্ছে।

দেবব্রত সরকার কিন্তু বদলাচ্ছে না।

তার যে খাওয়া, তার যে ব্যবহার, তার যে চাল-চলন, তার যে আদর্শ, সেখানে কোনও রদবদল হচ্ছে না একবারও।

গোষ্ঠ দাদাবাবুকে খেতে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আর দুটি ভাত দেব দাদাবাবু?

দেবব্রত শুকনো উত্তর দিল—না—

—আর তরকারি নেবেন?

দেবব্রত বললে-না—

গোষ্ঠ তবু পীড়াপীড়ি করে, এ-রকম করে খেলে শরীর তো খারাপ হবেই। এত কম খেলে শরীরটা টিকবে কী করে?

দেবব্রত বললে, শরীর টিকিয়ে রেখে কী হবে রে বোকা। জানিস, এই কলকাতায় দেড় লক্ষ লোক ফুটপাথে জীবন কাটায়, আর ফুটপাথেই মারা যায়। তাদের কথা একবার ভাব।

গোষ্ঠ বলে তা বলে আপনি উপোস করে থাকবেন? আপনি না খেয়ে থাকলে কি তারা বেঁচে উঠবে?

দেবব্রত বললে, দূর পাগল, তুই একটা আস্ত গাধা। এই রকম বুদ্ধি বলেই তোর কিছ্ছু হলো না। তোকে কতো লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলুম, কতো বই কিনে দিলুম তোকে, যাতে চিরকাল আমার বাড়িতে চাকর হয়ে থাকতে না হয়। কিন্তু তুই তো কিছু শিখলি না, কেবল আমার বাড়িতে ভাত রান্না করেই জীবন কাটিয়ে দিলি—

গোষ্ঠ বললে, তা আমি যদি লেখাপড়া শিখে চাকরি করতুম তো আপনাকে কে রান্না করে দিত?

দেবব্রত বললে, সে কী? তুই আমার খাওয়ার কথা ভেবেই লেখাপড়া শিখলি না নাকি?

গোষ্ঠ বললে, তা আপনার কথা ভাববো না?

দেবব্রত বললে, তা কলকাতায় যাদের বাড়িতে গোষ্ঠ নেই তারা কি সবাই উপোস করে আছে নাকি? নাকি তারা সবাই হোটেলে খায়?

—তাদেব কথা আলাদা, কিন্তু আপনি তো তাদের মতো নন্—

দেবব্রত বললে, আমি তাদের মতো নই তো আমি কী?

গোষ্ঠ বললে, তা আমি বলবো না, বললে আপনি রেগে যাবেন।

—কেন, আমি সে-কথা শুনলে রেগে যাবো না, তুই বল্ আমি শুনবো!

গোষ্ঠ বললে, তাদের দেখাশোনা করবার লোক আছে, কিংবা বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, কিন্তু আপনার কে আছে?

দেবব্রত বললে, কেন? আমার বউ নেই? আমার মেয়ে নেই? ওই তো তোর বউদি রয়েছে, ঝর্ণা রযেছে। ঝর্ণা ইস্কুলে যাচ্ছে, লেখাপড়া করছে। তারা আমাকে দেখবে।

গোষ্ঠ বললে, থাক, আপনার সঙ্গে আর বক্-বক্ করতে পারি নে, আমার কাজ আছে, আমি যাই...

বলে গোষ্ঠ চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু দাদাবাবু তাকে ছাড়লেন না।

বললেন, কোথায় পালাচ্ছিস? শুনে যা—

গোষ্ঠ দাঁড়িযে পড়লো। বলুন, কী বলবেন?

—তুই যে বললি আমার বউ নেই, ছেলে-মেয়ে নেই, তা ওরা কারা? ওই যে মিনতি আর ঝর্ণা? ওদের আমি খেতে পরতে দিচ্ছি না? ওদের আমি লেখাপড়া শেখাচ্ছি না?

গোষ্ঠ এর জবাবে কী বলবে তা ভাবতে গিয়ে তার ভয় হলো। ভয় হলো এই ভেবে যে যদি তার ঠিক জবাবটা শুনে দাদাবাবু রাগ করেন?

—কই, জবাব দিচ্ছিস নে যে? চুপ করে রইলি কেন? কথার জবাব দে?

গোষ্ঠ তবুও চুপ করে রইল।

—কথার জবাব দিচ্ছিস নে কেন? দে জবাব?

গোষ্ঠ এবার মরিয়া হয়ে জবাব দিলে, আপনার নিজের যদি বউ থাকে, মেয়ে থাকে তো আপনি কাঁদেন কেন?

—আমি কাঁদি?

গোষ্ঠ বললে, আপনি কাঁদেন না? আপনি ভাবছেন আমি কিছু বুঝিনে? আমি কিছু লক্ষ্য করিনে?

গোষ্ঠর জবাবটা শুনে দেবব্রত সেখানে বসে বসেই কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বললে, ওরে গোষ্ঠ, দেশের যে একটা লোক নেই যে কাঁদে। কান্না কি সাধে আসে আমার? আমার ভগবানও যে কাঁদেন রে!

গোষ্ঠ চুপ করে রইল।

দেবব্রত বললে, তোকে এ-সব বলা বৃথা রে গোষ্ঠ। বৃথা। তোর কোনও দোষ নেই। তোকে আমি লেখাপড়া শেখাইনি, তুই তো বুঝবিই না। কিন্তু জওহরলাল নেহরু তিনি তো লেখাপড়া জানা লোক, বিলেতফেরত। কতো বিদ্যে তাঁর, কতো বুদ্ধি। তারপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল-কালাম আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, হুমাউন কবীর। তারা সবাই লেখাপড়া জানা লোক। মানুষের ভগবান যে কতো কাঁদছে, কতো দুঃখে কাঁদছে, তা তারা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

গোষ্ঠ বললে, কেন, ভগবান কাঁদছে কেন?

দেবব্রত বললে, কাঁদবে না? এত কোটি-কোটি মানুষের সর্বনাশ হয়ে গেল। এত কোটি-কোটি মানুষ বিধবা হলো, এত কোটি-কোটি মানুষ বাবা-মা'কে হারালো। কোটি-কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হলো, এর কষ্টের জন্যে কে দায়ী তুই বল।

গোষ্ঠ তবু কোনও জবাব দিলে না। তার কাছে দাদাবাবুর এই চেহারা চেনা।

দেবব্রতর খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছে। আশে-পাশে তখন কেউ নেই। দোতলার সেই এক চিলতে ঘরটাতে বসেই দেবব্রত রোজ খায়। একতলা থেকে সেই খাবার এনে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয় গোষ্ঠ। যতোক্ষণ দেবব্রত খায়, ততোক্ষণ সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। খাওয়ার তদারক করে।

সেদিনও তাই-ই হয়েছিল। হঠাৎ কী-প্রসঙ্গে কী-প্রসঙ্গ উঠে গেল, আর কথার প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরে গেল।

দেবব্রত বললে, কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস নে কেন? জবাব দে? বল্ না তাদের যে এই সর্বনাশ হলো তার জন্যে কে দায়ী তুই বল?

গোষ্ঠ চুপ করে রইল বরাবরের মতো।

কিন্তু দেবব্রত তাকে রেহাই দিল না।

বলতে লাগলো, তুই জবাব দিতে পারবি নে, তা আমি জানি। কিন্তু আমার কাছে যে সবাই জবাবদিহি চাইছে।

—কে জবাবদিহি চাইছে?

দেবব্রত বললে, ওরে কে জবাবদিহি চাইছে না তাই-ই শুধু জিজ্ঞেস কর তুই। ওই বিনয়দা যে জবাবদিহি চাইছে!

—কে বিনয়দা?

দেবব্রত বললে, বিনয়দাকে চিনিস নে তুই? ওই দেখ, ওই ছবিটার দিকে চেয়ে দেখ। ওই বিনয়দা রোজ আমার কাছে জবাবদিহি চায়! ওই বিনয়দা, দীনেশদা, বাদলদা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে—এই রকমই যদি হবে, তাহলে কেন আমরা ফাঁসির দড়ি গলায় পরলুম?

একটু থেমে দেবব্রত আবার বলতে লাগলো, আর শুধু ওরা? ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রামের মাস্টারদা, সূর্য সেন, ওদিকে ভগৎ সিং, সুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, বিসমিল, সবাই আমাকে দিন-রাত বলে—দাও, দাও জবাবদিহি! তোমরা যদি গদি আঁকড়ে বসতেই চেয়েছিলে, নিজের স্বার্থটাই দেখতে চেয়েছিলে, তাহলে কেন আমরা জীবন দিলুম,

কেন আমরা ফাঁসির দড়িতে ঝললুম, কেন আমাদের জীবন বলি দিলুম? তোমরা প্রাইম মিনিস্টার, ডেপুটি মিনিস্টার, চিফ্ মিনিস্টার হয়ে আরাম করবে বলে?

তারপর বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিচের একতলা থেকে হঠাৎ মিনতির গলার আওয়াজ এলো, ও গোষ্ঠদা, গোষ্ঠদা—

গোষ্ঠ ওপর থেকেই সাড়া দিলে, যাই বউদি—

তারপর দেবব্রতর দিকে চেয়ে বলে উঠলো, ওই বউদি ডাকছেন, ঝর্ণাকে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিতে যাবেন, আমি দরজায় খিল বন্ধ করে আসছি—আমি এখুনি আসবো, আপনি যেন উঠে যাবেন না।

দেবব্রত সরকার তখনও খাচ্ছে। মিনতি তার মেয়েকে নিয়ে ইস্কুলে পৌঁছে দেবে, তারপর আবার বাড়িতে ফিরে আসবে। তারপর আবার বিকেল হওয়ার আগে মেয়েকে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে যাবে। এটা কী বকম নিয়ম এখনকার? কই, দেবব্রত সরকারও তো একদিন দৌলতপুরে স্কুলে যেত, তখন তো কেউ তাকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিতে সঙ্গে যেত না।

শুধু দেবব্রত সরকারই নয়। ততো বড়োলোকই সকলের ছেলেরাই তখন একলা একলা স্কুলে যেত।

শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও একলা-একলা স্কুলে গিয়েছে। কেউ তাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা করতো না।

সে সব তো দৌলতপুরের কথা। কিন্তু তখন তো দেবব্রত কলকাতায় কাকার বাড়িতে এসেছে। কলকাতায় এসেও দেখেছে ছেলেরা মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে একলা-একলা। সঙ্গে পাহারা দেওয়াব জন্যে কেউই থাকতো না।

কিন্তু এখন কেন তা হয় না। কেন স্কুলে ছেলে-মেয়েরা একলা যেতে ভয় পায়? একলা গেলে কাকে ভয়? এখন তো ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তারাই তো তখন ছিল দেশের লোকের বড় শত্রু? এখন শত্রু কারা? তাহলে কি দেশের লোকরাই দেশের লোকের শত্রু? এ-রকম কেন হবে? স্বাধীন দেশের লোকরাই কি স্বাধীন দেশের লোকদের শত্রু?

হঠাৎ গোষ্ঠ আবার এসে গেল।

বললে, দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এলুম। আর কী চাই বলুন?

দেবব্রত বললে, আর কিছু চাইনা রে। আজকে তোর জ্বালায় অনেক খেয়ে ফেলেছি রে, পেট একেবারে ভরে গেছে।

বলে দেবব্রত উঠে পড়লো।

গোষ্ঠ এঁটো বাসনগুলো তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললে, দিন-দিন আপনি খাওয়া এত কমিয়ে দিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি নে। এ তো একেবারে পাখির খাওয়া। এতে আপনার শরীর টিকবে কী করে?

দেবব্রত হাত ধুতে ধুতে বললে, তুই কেবল আমায় বেশি খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাস। আমাকে কি তুই বাঁচতে দিবি না?

বলে একটু থেমে আবার বললে, আর তুই তো খবরের কাগজও পড়বি না, দেশের হালচালেরও খবর রাখবি না। তুই কি জানিস যে আমাদের দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে!

গোষ্ঠ বললে, সে যারা আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু তা বলে আপনি কেন আধপেটা খেতে যাবেন? আপনার কিসের দায়?

দেবব্রত বললে, কী বলছিস তুই? পাগলেরাই শুধু ওই কথা বলে! আমি কি আমাদের দেশের লোক নই? শতকরা ষাট ভাগ লোক যদি আধপেটা খেয়ে থাকে তো সে-অবস্থায় আমার কি ভরপেট খাওয়া উচিত? আমিও তো একজন এ-দেশের লোক বে।

গোষ্ঠর তখন সংসারের অনেক কাজ বাকি। পাগলের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করবার ফুরসৎ তার নেই।

গোষ্ঠ বললে, আমি যাই। আপনার পুরনো কাপড়-জামা সাবান-কাচা করে দিয়েছি, নতুন কাচা পাঞ্জাবি আর ধুতি রেখে দিয়েছি, সেইগুলো পরে নেবেন, ভুলবেন না।

—কই গো, বউদি-মণি কই?

ওই গলা এ-পাড়ার সব বাড়িরই চেনা গলা। ওই গলার শব্দ মানেই আল্‌তা-মাসির বাড়িতে আসা।

—কী গো আল্‌তা-মাসি? দু'দিন আসোনি কেন?

আল্‌তা-মাসি বললে, আমার যজমান দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে গো। এই বুড়ো বয়েসে আর কত দিক সামলাই?

তারপব জিজ্ঞেস করলে, তা বউদি-মণি কোথায়?

গোষ্ঠ বললে, বউদি মেয়ের ইস্কুলে গেছে।

—তা ইস্কুল থেকে আসতে এত দেরি কেন আজ?

—আজকে ঝর্ণা দিদিমণির ইস্কুলে নাচ-গান আছে।

—নাচ-গান? ঝর্ণা আবার নাচে নাকি?

—বউদি যে ঝর্ণাকে নাচের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

—ভালো ভালো, খুব ভালো।'আমি তাহলে একটু ঘুরে আসছি।

গোষ্ঠ বললে, কিন্তু বেশি দেরি কোব না। বউদি এখ্‌খুনি এসে যাবে। ততোক্ষণ একটু চা দেব? মুড়ি দিয়ে চা খাবে?

আল্‌তা-মাসি বললে, তা দাও চা।

গোষ্ঠর চা তৈরি কবা শেষ হওয়ার আগেই বউদি মেযেকে নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হলো।

—যাক্, ভালোই হয়েছে। বলে গোষ্ঠ চায়ের কেটলিতে আরো দু'কাপেব মাপে জল আর চা ফেলে দিলে। মিনতি ঢুকেই আল্‌তা-মাসিকে দেখে বলে, ওমা, তুমি কতোক্ষণ বসে আছো মাসি?

—বেশীক্ষণ নয়, তা বউদি তোমার মেয়ে নাচ-গান শিখছে বুঝি?

মিনতি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পোশাকী শাড়ী বদলে আটপৌরে শাড়ী পরে এল। বললে, আজকে নতুন কোনও খবর আছে মাসি?

আল্‌তা-মাসি রোজই বাড়িতে এসে এ পাড়া ও পাড়া সে পাড়ার বউ-ঝিদের গল্প করে। কবে কোন পাড়ার বউ বিধবা হলো, কোন পাড়ার বউ সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে শ্মশানে গেল, তার কথা বলে।

—তোমার খুব পুণ্য হচ্ছে মাসি। তুমি কতো লোকের আশীর্বাদ পাচ্ছো। দেখবে একদিন আমার মেসোমশাই ঠিক ফিরে আসবে।

—তা যদি হয় তো তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ক বউদি—সে যে আমাকে সারাজীবন কতো জ্বালিয়েছে তার ঠিক নেই। তবু আমি এয়োতি মেয়েদের আল্‌তা পরানো সিঁদুর লাগানো ছাড়িনি।

—কেন এই রকম এয়োতি মেয়েদের আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে বেড়াও তুমি মাসি?

—পরাবো না? তোমার মেসো কি আমায় কম জ্বালিয়েছে ভাবো? একদিন আমি তোমার মেসোকে জব্দ করবো তবে ছাড়বো।

—কী করে জব্দ করবে? মেসোকে পাবে কোথায়?

—পাবো না? তোমার মেসো পালাবে কোথায়? যেখানে পালাবে আমি সেখান থেকে তাকে ধরে টেনে নিয়ে এসে ছাড়বো।

—কী করে টেনে আনবে?

আল্‌তা-মাসি বললে, এই তোমাদের মতোন এয়োস্ত্রী বউ-ঝি'দের আল্‌তা পরিয়ে আর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে!

—কতো দিন মেসো তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে?

—সে কি আমি হিসেব রেখেছি বউদি? এই যে আমাকে একলা ফেলে পালিয়ে যাওয়া, এর আমি শোধ নেব তবে ছাড়বো।

—কী করে শোধ নেবে?

—আমি আর শোধ নেব কী করে, আমার তো আর অন্য কোনও রাস্তা নেই। তাই এই আল্‌তা-সিঁদুর পরানোর রাস্তা ধরেছি।

আল্‌তা মাসির গল্প শুনতে বড়ো ভালো লাগতো মিনতির! এরকম মানুষ আগে কখনও দেখেনি মিনতি। শুধু মিনতি কেন, হয়তো পৃথিবীর কোনও মানুষই দেখেনি।

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, তার কোনও ফটো আছে তোমার কাছে?

—আমার বয়ে গেছে তোমার মেসোর ছবি রাখতে। সে কি একটা মানুষ? মানুষ নয় বউদি, মানুষ নয়।

মিনতি জিজ্ঞেস করতো, কেন?

—মানুষ হলে কি আমাকে ছেড়ে এতদিন দূরে থাকে? আমার ছেলেও নেই, মেয়েও নেই, কিছুই নেই। আমার পেট কী করে চলবে তাও তো মানুষটা একবার ভাবলে না? সে কি মানুষ না জানোয়ার?

—তুমি মেসোকে জানোয়ার বলছো?

—তা বলবো না? মানুষ হলে কেউ কি নিজের বিয়ে করা বউকে এমন অনাথ করে পালিয়ে যায়?

মিনতি জিজ্ঞেস কবতো, তুমি পুলিশে খবর দাওনি?

—খবর দিইনি আবার। যখন দেখলুম মানুষটা ছ'মাস হলো আসছে না, তখন একজন আমাকে পুলিশে খবর দিতে বললে। তা তাই-ই করলুম। পুলিশের থানায় গিয়ে খবর দিলুম। নাম-ধাম কুলুজী সব দিলুম। কিন্তু কোথায় কী? এত বচ্ছর কেটে গেল, এখনও কোনও খবর দিতে পারলে না তারা!

—তারপর?

—তারপর থেকে আমি এই রাস্তা ধরলুম। এই বাড়ি বাড়ি বউ-ঝি'দের আল্‌তা-সিঁদুর পরানো শুরু করলুম।

—তারপর? কিছু ফল পেলে?

—পাগল হয়েছ বউদি! সে মানুষটা কি অতো সোজা? আমাকে না জ্বালিয়ে কি সে ছাড়বে? সে আমার হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে তবে আমাকে রেহাই দেবে!

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণটা কী মাসি? কী দোষ করেছিলে তুমি?

—আমি আর কী দোষ করবো বউদি, আমি চিরকাল মানুষটাকে সেবা করে এসেছি। মদ খেয়ে বাড়িতে এসে কতো গালাগালি দিত আমাকে, তব আমি কিছ্ছু বলিনি—জানো। শেষকালে আমি আর থাকতে পারলুম না। একদিন তাকে লাঠিপেটা করলুম!

—তারপর?

—তারপর আর কী, তারপর মিনসেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। সেই থেকে আজও ফিরে আসে নি সে।

—তারপর?

আল্‌তা-মাসি বললে, তারপর থেকেই আমি এই কাজ কবছি বউমা, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এই এয়োস্তিরী বউ-ঝি আর মায়েদের আল্‌তা আব সিঁদুর পরিয়ে দিন কাটাচ্ছি। দেখি তোমার মেসো এবার না এসে পারে কী করে?

—তাতে কী দুঃখু ঘুচবে? মেসো এলে তো তোমার দুঃখ বাড়বে!

—দুঃখ না ঘুচুক, কিন্তু সোয়ামী বলে কথা! সে যদি ঘরে না থাকে তো এয়োস্তিরী মানুষেব মনে কি সুখ থাকে। বলো বউমা?

মিনতি আর কী বলবে!

—এই যে তুমি, তোমার কথাই ধরো না। তোমার সোয়ামী বাড়িতে আছে, তাই তোমার মনেও সুখ আছে। কিন্তু যদি সোয়ামী বাড়িতে না থাকতো, তাহলে? তাহলে কী হতো ভাবো তো একবার?

মিনতি এ-কথার কোনও জবাব দিলে না। তারপর বললে, আমাব মেসো এতদিন পর্যন্ত একটা কোনও খবরও দেয়নি?

—সে আক্কেল কি আছে মিন্‌সের? মিন্‌সের সে-আক্কেলই যদি থাকতো, তাহলে কি আজ আমার এত হেনস্থা?

ততক্ষণে আল্‌তা পরানো শেষ হয়ে গেছে, সিঁথিতে সিঁদুরও লাগানো হয়ে গেছে। আলতার ঝাঁপিটা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

মিনতি বললে, চা খেয়ে যাও আলতা-মাসি।

আলতা-মাসি বললে, না বউমা, আজ আর বসবার সময় নেই, এ-পাড়ার ভট্টাচায্যি বাড়ির বউ আবার মরো-মরো। দুপুরে শুনে এসেছি তার এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা, ভাগ্যবতী বউ এয়োস্তিরী হয়ে সোয়ামীর পায়ে মাথা রেখে যেতে পারছে, আগের জন্মে নিশ্চয়ই অনেক পূণ্য করেছিল। শ্মশানে যাবার আগে তাকে আবার পায়ে আলতা পরিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে বলে রেখেছিল।

মিনতি কথাটা বুঝতে না পেরে বললে, বলে রেখেছিল মানে?

আল্‌তা মাসি বললে, বহুদিন থেকেই তো ভট্টাচায্যি-বউ অসুখে ভুগছিল। তখন থেকেই আমাকে বলে রেখেছিল, যেন আমি মরার আগে তাকে আল্‌তা-সিঁদুর পরিয়ে দিই।

অন্য দিনের মতো গোষ্ঠ এসে তাকে একটা টাকা দিলে। টাকাটা নিয়ে আলতা-মাসি কপালে ছুঁইয়ে তার ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিলে।

মিনতি এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই এখানকার সব কিছু দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত, এ কী-রকম সংসার! যার সংসার তার সংসার নয় এটা। যেন গোষ্ঠদার সংসার। আর সংসারের মালিক যে-লোকটা সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতোক্ষণই বা ঘরে থাকে! দৌলতপুরেও সে মানুষটাকে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েই সে দেখেছিল। সেখানকার সংসারে থেকেও সে মানুষটা ঠিক

সংসারী ছিল না। কিন্তু তখন তো তার শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলেন। আরো অনেকেই সংসারে ছিল। কিন্তু এখানে?

মিনতির মাঝখানের জীবনটা ছিল একটা দুঃস্বপ্নের মতো। এখন তা ভাবতেও তার যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! সে-সব দিনগুলোর কথা কে-ই বা আর মনে রেখেছে! হঠাৎ মাঝরাতে হৈ-হৈ শব্দ করে একদল লোক বাড়িতে চড়াও হলো একদিন। সঙ্গে সঙ্গে কতো আর্ত-কণ্ঠের চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো।

—গেল, গেল। সব গেল। শ্বশুরের ঘর থেকে একটা আওয়াজ এলো ওরে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে রে—

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোকের প্রচণ্ড উল্লাসের চিৎকারে সকলের সব আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

হঠাৎ মিনতির ঘরের দরজাতেও কারা ধাক্কা দিতে লাগলো। দরজা খোল, দরজা খোল—

মিনতির সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। সে তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজার খিলটা চেপে ধরলো। দূর থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর—

—দরজা খোল, মিনতি দরজা খোল—

দরজায় যতো ধাক্কা লাগে, মিনতি ততো কঠোর হয়ে ওঠে, প্রাণপণে দরজার খিলটা চেপে ধরে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে।

সে এক রাত গেছে বটে, চরম দুঃস্বপ্নের রাত।

হঠাৎ আরো জোরে জোরে ধাক্কা আরম্ভ হলো। কারা ধাক্কা দিচ্ছে! কারা চিৎকার করছে, আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর—

তখন হঠাৎ মনে হলো, তার নাম ধরে যেন কে ডাকছে।

মিনতি, মিনতি, দরজা খোল, দরজা খোল—আমি সাহাবুদ্দীন।

মিনতিও চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি সাহাবুদ্দীন?

—হ্যাঁ, আমি সাহাবুদ্দীন, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। দরজা খোল, নইলে তুমি বাঁচবে না!

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে কাদের কণ্ঠে উল্লাস ফেটে পড়লো, আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর—

তখন ভয়ে ভয়ে, দরজা খুলে দিতেই সাহাবুদ্দীন তাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। সাহাবুদ্দীন যত হাঁফাচ্ছে, মিনতিও ততো হাঁফাচ্ছে, কেউ কাউকে ছাড়ছে না, ছাড়বে না।

—কী হয়েছে সাহাবুদ্দীন?

সাহাবুদ্দীন বললে, আমি শব্দ শুনেই দৌড়ে এসেছি, খুব সাবধান। আমি আছি, কোনও ভয় নেই। দাঙ্গা লেগে গেছে, আমি না থাকলে তোমাকেও ওরা খুন করতো!

—কিসের দাঙ্গা? কারা খুন করতো আমাকে? কী বলছো তুমি?

—হিন্দুদের সব ঘরবাড়ি মুসলমানরা পুড়িয়ে দিয়েছে। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী, তোমার বাবা-মা'কেও মেরে ফেলেছে ওরা। আমি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, চলো আমার সঙ্গে।

সে-সব দিন সে-সব ঘটনা এখনও মিনতির চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। একলা থাকলেই সেই সব প্রেত-প্রেতিনী মিনতির পেছনে তাড়া করে। সেই অতো রাতে সাহাবুদ্দীনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় না পেলে তার কী দশা হতো! সেদিন সমস্ত রাত সাহাবুদ্দীনও ঘুমোয়নি, মিনতিও ঘুমোয়নি। শুধু সেদিনই নয়, তার পরেও কতো দিন ঘুমোয়নি মিনতিরা। তারপর

থেকে যতো দিন কাটে ততোই ভয়, কী হবে তার? কোথায় যাবে সে? কোথায় আশ্রয় পাবে সে! পৃথিবীতে তো তার কেউ নেই। স্বামী থেকেও নেই, বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ী, তারা সবাই তো দাঙ্গার পর নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যা কিছু ছিল, সব তার নিঃশেষে মুছে গেছে। বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সমস্ত বেদখল। তার স্বামীর আশ্রয় নেই, তার শ্বশুর-শাশুড়ী-বাবা-মা'র আশ্রয়ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

সেই দৌলতপুরে সাহাবদ্দীনের বাড়িতেই খবর এলো যে কলকাতা, দিল্লী, পাঞ্জাব, লাহোরেও হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মধ্যেও দাঙ্গা বেধে হাজার হাজার লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ট্রেনে উঠলে ট্রেন থামিয়ে হিন্দুরা মুসলমানদের, মুসলমানরাও হিন্দুদের খুন করছে।

মিনতি সাহাবুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন আমার কী হবে?

—তোমার কিছ্ছু ভয় নেই। আমি নিজের জান দিয়ে তোমাকে বাঁচাবো। তুমি ভয় পেও না।

—কিন্তু আমি যে তোমাদের বাড়িতেই আছি, একথা যদি মুসলমানেরা জানতে পাবে?

সাহাবুদ্দীন বললে, কেউ কিছু জানবে না। আর তুমি তো সিঁথির সিঁদুব মুছেও ফেলেছ। কী কবে লোকে জানবে যে তুমি হিন্দু? আব আমার বাবা-মা তারাও তো কেউ এখানে নেই, কেউ যদি জানতে পারেই তো আমি বলবো তুমি আমার বিবি, তুমি আমাব বউ!

—আমি তোমার বউ?

—হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ও-কথা বলতে দোষ কী? এখানে কেউ তো আর জানতে পারছে না যে, তুমি দেবব্রত সরকারের বিয়ে করা বউ।

—তোমার বাবা-মা দৌলতপুবে একদিন-না-একদিন আসবেনই, তখন? তখন কী বলবে তুমি তাঁদের?

সাহাবুদ্দীন বললে, আমি তাদেরও বলবো যে আমি তোমাকে সাদি করে এনেছি। তাদেবও বলবো যে তুমি আমার বউ। কে তোমাব শাড়ি ব্লাউজ দেখে বুঝতে পারবে যে তুমি হিন্দুব মেয়ে? শুধু কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদূব আব পায়ে আলতা না পরলেই হলো! ওইটেই যা হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান মেয়েদের তফাৎ, আব তো কিছু নয়। সুতরাং তুমি নির্ভয়ে থাকো।

সেই রকম কবেই মিনতি প্রাণ বাঁচাবার জন্যে, মুসলমান হয়েই রইলো সেই বাড়িতে, কেউ কোনও কিছু সন্দেহ করতে পারলে না।

কিছুদিন পরে সাহাবুদ্দীনের মা এলো দৌলতপুরে। তখন পুরোদমে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে দৌলতপুর ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

মা বললে, এ কে রে সাহাবুদ্দীন?

—একে আমি বিয়ে করেছি মা, এ আমাব বউ মিনতি।

—ওমা, তাই নাকি? কবে বিয়ে করলি? এদেব বাড়ি কোথায়?

সাহাবুদ্দীন বললে, এর বাবা-মা-ভাই-বোন সবাইকে হিন্দুরা দাঙ্গার সময় খুন করে ফেলেছিল। এর অবস্থা দেখে একে এখানকার মসজিদে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়িয়ে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছি, তোমাদের কাউকে খবর দিতে পারিনি, সময় ছিল না বলে।

মা বললে, বাঃ, খুব সুন্দর দেখতে বউকে তোর।

সেই থেকে মিনতি রয়ে গেল সাহাবুদ্দীনের বাড়িতে। আর কোনও ভয় রইল না। দৌলতপুরের যতো হিন্দু সবাই সেই দাঙ্গাব সময়ে দৌলতপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল। সুতরাং তার আসল পরিচয় তখন আর কেউই জানতে পারলে না। শুধু জানলো যে, সাহাবুদ্দীনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে যার সঙ্গে, তার বাপ-ভাই-বোন সকলকে দাঙ্গার সময় হিন্দুরা খুন করে ফেলেছে।

সাহাবুদ্দীনকে একদিন মিনতি জিজ্ঞেস করলে, যদি কোন দিন ধরা পড়ি তখন কী হবে? তোমার সঙ্গে তো সত্যি-সত্যি বিয়ে হয়নি।

—চেপে যাও না, এ-রকম না করলে তো তুমি প্রাণে মারা পড়তে!

কথাটা মিথ্যে নয়। কোথায় রইলো তার বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ী, আর কোথায় রইলো সেই মাস্টারমশাই মানুষটা। আসলে যার সঙ্গে তার সত্যিকারের বিয়ে হলো, তার সান্নিধ্য পাওয়া দূরের কথা, তার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়ার অধিকারও সে পেলে না। আব যে লোকটার সঙ্গে তার বিয়ে হলো না, তার সান্নিধ্যই শুধু নয়, তার সঙ্গে একই ঘরের ভেতরে এক বিছানায় শোওয়ার অধিকার পেয়ে বিয়ের অভিনয় করতে হলো।

পৃথিবীর আর কোনও মেয়ের কপালে বিধাতা এমন পরিহাস করেছে কিনা তার পরিচয় বোধহয় কোথাও এমন করে লেখা নেই।

কিন্তু অভিনয় করতে করতেও অনেক সময় অভিনয়টা যদি সত্যি হয়ে যায়, তখন মানুষ কী কববে?

পৃথিবীর মানচিত্রেব বং বদলেব সঙ্গে সঙ্গে মানুষেব মনের মানচিত্রের রংও কি বদলায়? হয়তো বদলায়। নইলে ঝর্ণাই বা জন্মালো কেন? আর তাব মুখের চেহারার সঙ্গে সাহাবুদ্দীনেব মুখের চেহারার অমন মিল হলোই বা কেন?

ঝর্ণাকে দেখে সাহাবুদ্দীনেব আত্মীয়-পবিজনরা সবাই বলতে লাগলো, ঝর্ণাকে দেখতে ঠিক ওর বাবার মতো হয়েছে।

আর ঝর্ণার জন্মের পব থেকেই সাহাবুদ্দীনের জীবনেব চাকা ঘুবে গেল। যে ছিল একদিন দেবব্রত সবকারের অতি প্রিয় ছাত্র সে আজ পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশের ধ্রুবতারা। সাহাবুদ্দীন না হলে কোথাও কোনও কাজই হয় না। সে পশ্চিম-পাকিস্তানের করাচি বা ইসলামাবাদই হোক, আব পূর্ব-পাকিস্তানেব ঢাকাই হোক। স্ত্রী হিসেবে মিনতিকেও সঙ্গে থাকতে হয়। আর শুধু তাই ই নয়, পাকিস্তানেব বাইরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকাও যেতে হয় বিশেষ কাজে, দেবব্রতর জীবনেব সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে তাব কী আব হতো? রান্নাঘরের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে পড়ে থাকতে হতো।

কিন্তু মিনতির ভাগ্য-দেবতা বোধহয় নেপথ্যে হাসছিলেন। তিনি বড়ো নিষ্ঠুর। তাঁর বিধান বড়ো কঠোর। সেখানে কাবো হাত নেই।

তাই হঠাৎ একদিন সেই ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলো।

তারপর সেই যে সে ভেঙে পড়লো তারপব থেকে আজ পর্যন্ত সে আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি। কোনও রকমে জীবনটা বয়ে নিয়ে সে চলেছে, কখনও কারো কাছ থেকে কোনও স্নেহ, কোনও প্রীতি, কোনও আদব ভালোবাসা সে পায়নি। এখানে এই কলকাতায় এসে তার স্বামী দেবব্রত সরকারের কাছ থেকেও কোনও ক্ষমা আজ পর্যন্ত সে পাযনি।

শুধু ঝর্ণাই এখন তাব একমাত্র ভবসা-স্থল। যে কষ্ট সে নিজে পেয়েছে ঝর্ণাকে যেন সে কষ্ট কোনওদিন সইতে না হয়, এই আশা নিয়েই সে এখন বেঁচে আছে। এই আশা নিয়েই সে বেঁচে থাকবে। যখন বেঁচে থেকে দেখবে যে তার ঝর্ণা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তখনই সে তার ভাগ্য-বিধাতার কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়ে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবে! তার আগে নয়।

সেদিন মাঝ-রাত্রে দেবব্রতর শোবার ঘরের দরজায় টোকা পড়লো।

দেবব্রত এমনিতেই সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। আর রাত্রে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে ভোর তিনটে সাড়ে তিনটের সময় ওঠে। তখন তার জপ-তপ-ধ্যান যা কিছু সব চলে। বিশ্বের সমস্ত সমস্যা তাকে পীড়িত কবে। বিশেষ করে ভাগ হয়ে যাওয়া ইণ্ডিয়ার সমস্যা। এখনকার মানুষ কেন এত স্বার্থপর, কেন এত পরশ্রীকাতর, কেন এত বিলাসিতা-প্রিয় তা নিয়ে তাব

মাথা-ব্যথার শেষ নেই। সেই সব ভাবনা নিয়েই সে ঘুমোতে যায়, আর সেই সব ভাবনা নিয়েই সে ঘুম থেকে ওঠে। চারদিকের এত লোভ, এত অর্থ-লোলুপতা, এত অকারণ বিলাসিতা দেখে সে বড় কষ্ট পায়। তাহলে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন করে লাভ কী হলো? কাদের জন্যে এই স্বাধীনতা? ক্ষুদিরাম, গোপীনাথ, যতীন দাস, ভগৎ সিং, সুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, বিসমিল কি এই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল?

প্রথম বারে ঘুম ভাঙেনি। আবার টোকা পড়তেই দেবব্রত ভাবলে হয়তো গোষ্ঠ এসেছে কোনও জরুরী কাজে।

কিন্তু গোষ্ঠ তো এমন অবিবেচক নয়। সে তো জানে তার দাদাবাবু সারাদিন গাধার মতো খাটুনি খেটে এই সময়ে একটু বিশ্রাম নেয়। সারাদিনের মধ্যে মাত্র এইটুকু।

জিজ্ঞেস করলে, কে?

মেয়েলী গলার আওয়াজ পেয়ে দেবব্রত একটু অবাক হলো।

আবার জিজ্ঞেস করলে, কে?

ওধার থেকে মেয়েলী গলার জবাব এলো, আমি—

এবার আর কোনও সন্দেহ নেই। দেবব্রত দরজা খুলে দেখলে, যা ভেবেছে সে ঠিক তাই।

—তুমি?

মিনতি বললে, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

—এই অসময়ে?

মিনতি বললে, কিন্তু এই সময় ছাড়া আর কোন সময়ে আসবো বলো? আর কোনও সময়ে তো তোমাকে একলা পাওয়া যায় না। তুমি তো সব সময়েই ব্যস্ত থাকো।

—চারদিকে এত কাজ যে কথা বলবার সময় পর্যন্ত পাই নে— যা হোক, এখন বলো তোমার কী কথা?

মিনতি বললে, এখানে এই রকম করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হবে?

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালো না লাগে তো ছাদে বসে কথা বলতে পারি—

মিনতি বললে, যদি তোমার ঘরে বসি?

—আমার ঘরে?

মিনতি বললে, ঘরে বসতে তোমার আপত্তি আছে?

—কিন্তু আমার ঘরটা তো শোবার ঘর!

—এখনও তোমার শোবার ঘরে ঢোকবার অধিকার আমার নেই?

দেবব্রত বললে, তোমাকে তো আমি বিয়ের আগেই সে-কথা বলেছি। এখন আবার নতুন করে সে-কথা তুলছো কেন?

—কিন্তু তুমি তো অগ্নি-সাক্ষী করে আমাকে বিয়ে করেছ। আমি যে তোমার স্ত্রী এ-কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না।

—আবার সেই পুরোন কথা তুমি আরম্ভ করলে—

—সে তো জানি। সে-সব কথা আমার মনে আছে। কিন্তু এখন তো তোমার মাতৃভূমি স্বাধীন হয়ে গেছে।

—এই কথা বলতেই কি এত রাত্তিরে তুমি আমার ঘুম ভাঙালে?

—না, না, আরো অন্য অনেক কথাও আছে। আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা তো অস্বীকার করতে পারো না।

—এ-কথার জবাব আমি দেব না, তুমি অন্য কথা বলো।

মিনতি বললে, ভেবেছিলাম, পাকিস্তান থেকে তোমার কাছে এলে তুমি হয়তো আমাকে একটু ভালোবাসবে—

—আমি তোমাকে ভালোবাসছি না? গোষ্ঠকে তাহলে কেন বলবো, যাতে তোমাদের থাকা-খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট না হয়।

মিনতি বললে, সে-সব কষ্ট কিচ্ছু হচ্ছে না আমাদের।

—কোনও কষ্ট যদি হয় তো গোষ্ঠকে সব কথা প্রাণ খুলে বলবে। আমাকে বলাও যা তাকে বলাও তাই। গোষ্ঠ আমার খুব বিশ্বাসী লোক। আমি মানে ইস্কুল থেকে যা মাইনে পাই, সমস্ত টাকাটা প্রত্যেক মাসে তার হাতে তুলে দিই—তা তো তুমি জানো!

—জানি! কিন্তু শুধু কি খাওয়া-পরা-থাকা পেলেই মানুষ খুশী হয়? আর কিছু দরকার হয় না?

—বলো, আর কী দরকার তোমার?

মিনতি কোনও উত্তর দিলে না এ-কথার।

—বলো আর কী দরকার তোমার? ঝর্ণার জামা, ফ্রক, জুতো?

মিনতি বললে, না—

—তাহলে তোমার শাড়ী? ব্লাউজ বা জুতো?

মিনতি আবার বললে, না—

—তোমাদের যা-কিছু দরকার সমস্তই গোষ্ঠকে বললে সে যোগাবে। আমি ওকে বলে রেখেছি।

মিনতি এবারও বললে, না, গোষ্ঠদা কোনও অভাবই রাখেনি আমাদের।

—তাহলে?

মিনতি চুপ করে রইলো।

—ঝর্ণা ইস্কুলে কী রকম পড়াশোনা করছে?

মিনতি বললে, ভালো।

—পরীক্ষা কী রকম দিলে?

মিনতি বললে, ভালোই।

—ওকে ভালো করে পড়িও। ও যেন দেশের নারীজাতের একজন রত্ন হয়ে উঠতে পারে। লোকে যেন বলতে পারে যে ওর নারী-জন্ম সার্থক।

মিনতি বললে, আমি কিন্তু সেকথা বলতে আসিনি। আমি বলছিলুম আমার জীবন কি এই রকম ব্যর্থতার মধ্যেই কাটবে?

—তাহলে বলো, তুমি কী বলতে চাও?

মিনতি বললে, আমি তো তোমার বিবাহিতা স্ত্রী?

—তা তো বটেই। আমি কী তা অস্বীকার করেছি কখনও? এখানকার সবাই-ই তো জানে যে তুমি আমার স্ত্রী! সেদিন তো তুমি নিজের চোখেই দেখলে আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাইরা সবাই এসে আমাদের তিন জনের গ্রুপ ফটো তুললো। আমার স্ত্রীকে যে-সম্মান শ্রদ্ধা জানানো উচিত তা তারা জানালো।

—সে তো জানালো, কিন্তু সেটা তো আমাদের বাইরের পরিচয়। কিন্তু ভেতরে?

—ভেতরে আমরা তাই নই কে বললে?

—সকলের চোখের আড়ালে কি আমরা সত্যিই স্বামী-স্ত্রী?

—তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন তুললে আজকে।

—সেই কঠিন প্রশ্ন তোলবার জন্যেই আজ আমি এই অসময়ে তোমার কাছে এসেছি!

—তুমি ভালোই করেছ প্রশ্নটা তুলে। কারণ এখানকার কেউ তো জানে না যে তুমি শুধু আমার একলার স্ত্রী নও, আর একজনেরও স্ত্রী।

—কার কথা বলছো? সাহাবুদ্দীনের?

—হ্যাঁ, সাহাবুদ্দীনের সঙ্গেও তো তোমার বিয়ে হয়েছিল? বলো কথাটা সত্যি কিনা?

মিনতি বললে, না, সত্যি নয়!

দেবব্রত অবাক হয়ে গেল মিনতির কথা শুনে। বললে, সত্যি নয়? তুমি বলছো কী?

মিনতি বললে, না সত্যি নয়। তাহলে শোন কী হয়েছিল আসলে।

বলে, সেদিন দেশ ভাগের সময়ে কী বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল দৌলতপুরে। দাঙ্গার মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান, এইসব নিয়ে যখন অমানুষিক অত্যাচার-অনাচার চলছে, তখন সাহাবুদ্দীন তাকে কেমন করে প্রাণে বাঁচিয়েছিল, কেমন করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে কী অবস্থার মধ্যে তার মা'র কাছে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মিনতিকে স্ত্রী বলে চালিয়েছিল—তার বিশদ বিবরণ দিল।

দেবব্রত সব কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে। তারপর বললে, সাহাবুদ্দীন তো শেষকালে পাকিস্তানের ফরেন মিনিস্টার হয়েছিল, আর তুমিও তো তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছিলে তো?

—হ্যাঁ, স্বীকার করছি তা আমি করেছিলুম!

—আর সাহাবুদ্দীন যদি দুর্ঘটনায় মারা না যেত তাহলে তো তুমি সারাজীবন তার সঙ্গেই কাটাতে?

মিনতি এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

—বলো, জবাব দাও? সাহাবুদ্দীন মারা না গেলে তো আমার কাছে আসতে না!

—না, আমি স্বীকার করছি তোমার কাছে আসতুম না।

—তাহলে কীসের জন্যে এলে?

—আমার মেয়ে ঝর্ণার পিতৃ-পরিচয়ের জন্যেই আসতে হলো।

—কেন?

মিনতি বললে, তাহলে ঝর্ণা যে আমার অবৈধ সন্তান হয়ে যেত। সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে তো আমার মুসলমান মতেও বিয়ে হয়নি। আমাকে প্রাণে বাঁচাবার জন্যেই সে তার সমাজের কাছে আমাকে তার স্ত্রী বলে চালিয়েছিল। নইলে আমি হিন্দুর মেয়ে হয়ে তার রক্ষিতা বলেই যে গণ্য হতাম। তা সে চায়নি। আমার ভালোর জন্যেই সে আমাকে তার বিবাহিতা মুসলমান স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল সকলের কাছে!

দেবব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বললে, আমি তো তোমার ঝর্ণাকে আমার নিজের মেয়ে বলেই এখানকার সকলকে জানিয়েছি। এর বেশি তুমি আর কী চাও?

মিনতি বললে, আমি এখন চাই তোমার সত্যিকারের স্ত্রী হতে!

—তুমি তো আমার স্ত্রীই। আমি তো মুক্তকণ্ঠে এখানের সবাইকে তাই-ই বলেছি।

মিনতি বললে, অন্য সবাই যাই জানুক, আমি তো সত্যিই তাই নই। নিজের কাছে তো আমি অপরাধী হয়ে রয়েছি। সত্যি কিনা বলো তুমি? আমি কি সত্যিই তোমার সহধর্মিণী?

—ভেতরের কথা যা-ই হোক না কেন, বাইরে তো সবাই জানে যে তুমি আমার সহধর্মিণী!

মিনতি বললে, কিন্তু বাইরে আমি তোমার সহধর্মিণী, আর ভেতরে ভেতরে আমি তোমার আশ্রিতা, এটা তো ভালো কথা নয়! বাইরে-ভেতরে কি এক হওয়া যায় না?

দেবব্রত বললে, না—

—সত্যিই না?

—কেন সত্যিই নয় তা তো আমি আমাদের বিয়ের আগে তোমাকে সব খুলে বলেছিলুম। আমার শর্তও আমি তোমাকে সমস্ত বিশদ করে বলে দিয়েছিলুম। তা সত্ত্বেও তখন তো এ বিয়েতে তুমি রাজি হয়েছিলে। তাহলে এখন কেন তুমি আবার আমার সহধর্মিণী হতে চাইছো?

—আমি যে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না গো—

—কিন্তু তুমি সহ্য করতে না পারলে আমি কী করতে পারি?

মিনতি বললে, কিন্তু এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন তো আর শর্ত মানবার দায় নেই!

—কী বলছো তুমি? দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে?

মিনতি বললে, দেশ স্বাধীন হয়নি? ইংরেজরা চলে যায়নি?

—না দেশ স্বাধীন হয়নি। ইংরেজরা চলে গিয়েছে মানি। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্যে তো আমরা লড়াই করিনি।

মিনতি বলে উঠলো, ও-সব বড়ো বড়ো কথা আমি ভাবিনি কখনও। আমি সামান্য একজন মেয়েমানুষ। আমি আমার নিজের সুখ-সুবিধের কথাই কেবল ভাবি।

—আমিও তো সামান্য লোক। আমি তো শুধু নিজের সুখ সুবিধে নিয়েই ভাবি। কিন্তু তবু কেন আমি ভগবানের কান্না শুনতে পাই?

—ভগবানের কান্না?

দেবব্রত বললে, হ্যাঁ মিনতি, বিশ্বাস করো, সে কান্না আমি কেন শুনতে পাই? জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ যা শুনতে পায় না?

বলতে বলতে দেবব্রত কেমন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার মুখের কথাগুলোও যেন কেমন ভারি হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারের মধ্যে মিনতি সেই চিরকালের চেনা মুখটার দিকে চেয়ে চমকে উঠলো।

বললে, এ কী, তুমি কাঁদছো?

দেবব্রত তাড়াতাড়ি তার ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বলতে লাগলো, কেন যে আমি কাঁদি তা কেউ বুঝতে পারে না, জানো মিনতি, কেউ তা বুঝতে পারে না, সেইটাই তো আমার দুঃখ।

তাবপর একটু থেমে বলতে লাগলো, আমি কী করি তা বলতে পারো মিনতি? দিন-দিন মানুষ সবাই স্বার্থপর হযে উঠছে। আগে আমাদের শত্রু ছিল একটা। সে হলো ইংরেজ। ইংরেজরা চলে যেতেই সবাই সকলের শত্রু হয়ে উঠলো। সকলের একটাই লক্ষ্য—লক্ষ্যটা হলো কী করে একজন আর একজনকে হারিয়ে দিয়ে, একজনকে ঠকিয়ে আরো বেশি টাকা উপায় করবে! ব্যবসাদাররাও হযেছে তেমনি। তাদের লক্ষ্য কী করে তাদের মালে আরো বেশি ভেজাল দিয়ে আরো বেশি লাভ করবে! জিনিসপত্তরের দাম শুনে আমি অ .বা হতাশ হয়ে গিযেছি। ইংরেজ আমলে আমরা তো এর চেয়ে আরো বেশি ভালো ছিলুম। বিদেশী আমলে ১৯৩৮ সালে সোনার ভরি ছিল ৩৮ টাকা। আর এখন? এখন সেই এক ভরি সোনার দাম হয়েছে এক হাজাব টাকা। দিন-দিন তো সোনার দাম বেড়েই চলেছে, এর পরে আরো বাড়বে। তখন?...আরো একটা কথা শুনবে মিনতি? এই আমাদের ইস্কলের ছেলেরা দুপববেলায় টিফিনের সময় মদেব দোকানে গিয়ে মদ খেয়ে টিফিন করে? এটা তুমি কল্পনা করতে পারবে? বলে দেবব্রত আবার কাঁদতে লাগলো। তারপব কান্না থামিয়ে বললে, আজকে আমি সেইজন্যে তিনজন ছাত্রকে ইস্কুল থেকে বার করে দিয়েছি।

মিনতি এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

দেবব্রত আবার বলতে লাগলো, আজকে সেই তিনজন ছাত্রের গার্জেনরা এসেছিল। আমি সেই তিনজন গার্জেনদের বললাম, ওদের আমি কিছুতেই ইস্কুলে রাখবো না। তা তাঁরা কি বললেন জানো? তাঁরা আমাকে শাসিয়ে গেলেন, বললেন, ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে বলে তাঁরা আমার চাকবি খাবেন। জানি না আমার শেষ পর্যন্ত...। কালকেই ইস্কুল কমিটির মিটিং হওয়াব কথা। দেখ মিনতি, আমার হাতে প্রমাণ আছে যে, ছেলেরা সত্যি-সত্যিই মদ খেয়েছিল টিফিনের সময়ে। মদের দোকানের মালিকের কাছে আমি নিজে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে

বলেছেন যে, আমাদের স্কুলের ছেলেরা দুপুরে টিফিনের সময়ে নাকি রোজই সেখানে গিয়ে মদ খায়। এখন বলো, আমি কী করবো? মিনতির মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

দেবব্রত বললে, এখন তুমিই বলো, এর পরেও ভগবান কাঁদবে না? অথচ সে-কান্না দেশের নেতারা কেউ-ই তো শুনতে পায় না।

মিনতি বললে, মিছিমিছি আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে, তোমাকে বিরক্ত করে গেলুম। এবার আমি চলি। বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। সকলের অগোচরে সে সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত বললে, তার পরের দিনই স্কুল কমিটির জরুরী মিটিং ডাকা হলো। খুবই জরুরী মিটিং। দেশের গণ্যমান্য মানুষ সেই কমিটির মেম্বার। আর যে তিনজন ছাত্রকে দেবব্রত সরকার স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিয়েছিলেন, সেই ছাত্রদের গার্জিয়ানরাও পাড়ার প্রতাপশালী মানুষ। একজন কোটিপতি বিজনেসম্যান। ব্যবসা থেকে তাঁর বছরে কোটি-কোটি টাকা আয় হয়। আর একজন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর আপন ভাই। আর তৃতীয় জন হলেন ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের হোম সেক্রেটারির জ্যাঠামশাইয়ের নাতি। তিনজনই সকলের শ্রদ্ধাভাজন মানুষ।

কমিটির মিটিং বসলো বিকেল চারটের সময়। কমিটির সমস্ত মেম্বাররাই হাজির ছিলেন। হেডমাস্টার দেবব্রত সরকার তো হাজির আর হাজির ছিলেন তিনজন ছাত্র আর তিনজন অভিযুক্ত ছাত্রের গণ্যমান্য গার্জিয়ান। সভাপতি দেবব্রত সরকারকে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতে বললেন। দেবব্রত তার নিজের ঘরে চলে গেল।

স্কুলের নাম "নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল"। এককালে ইংরেজ আমলের এক দেশ-ভক্ত মানুষ এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলেরই হেডমাস্টার ছিলেন স্বর্গীয় গোলকেন্দু সরকার। তাঁর স্বর্গবাসের পরে স্কুল-কমিটির নির্দেশেই দেবব্রত সরকারকে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দেবব্রতর আমলেই এই স্কুল থেকে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে একজন-না-একজন একটা-না-একটা স্থান দখল করতো। কোনও কোনও বছরে এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে কেউ-না-কেউ মোটা টাকার স্কলারশিপ পেতো। এর ফলে এই স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি হয়েছিল। ইংরেজ আমলের এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পাশ করে অনেক ছাত্র পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কিন্তু প্রথমে যে কমিটি ছিল, সে-কমিটি কয়েক বছর অন্তর অন্তর বদলে গিয়ে আবার নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ বদলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কমিটির মেম্বাররাও বদলে গেছে।

যিনি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি চেয়েছিলেন যে, ছেলেদের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে যেন তাদের চরিত্র-গঠনের শিক্ষাও দেওয়া হয়।

দেবব্রত যখন হেডমাস্টার হলেন, তখন তিনি সে-দিকটার ওপরে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। আর সেখানেই বাধলো বিরোধ। প্রথমতঃ সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে বিরোধ বাধলো, আর তার পরে স্কুল কমিটির সঙ্গে বিরোধ বাধলো। শিক্ষকদের 'কোচিং-স্কুল' নিয়ে বিরোধ বাধলো, 'টিউটোরিয়াল হোম' খোলা নিয়ে বিরোধ বাধলো।

দেবব্রত নিজের ঘরে বসে এইসব কথাই ভাবছিল। ওদিকে তিন ঘণ্টা ধরে কমিটির মিটিং চললো। শেষকালে সেই মদের দোকানের মালিক ননীলাল সাহাকেও ডাকা হলো। যে-তিনটি ছাত্রকে টিফিনের সময় মদ খাওয়ার অপরাধে রাস্টিকেট করা হয়েছে, সেই তিনটি ছাত্রকে তাঁর সামনে আনা হলো।

জিজ্ঞেস করা হলো—আপনি কি আপনার দোকানে এই তিনটি ছাত্রকে মদ খেতে দেখেছেন?

ননীলালবাবু অনেকক্ষণ দেখেও সনাক্ত করতে পারলেন না। বললেন, আমি আমার ক্যাশ নিয়েই সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকি, খদ্দেরদের দিকে চেয়ে দেখবারও সময় আমার থাকে না।

কমিটির প্রেসিডেন্ট আবার ননীলাল সাহাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখুন এই তিনজনের দিকে।

ননীলালবাবু আবার চেয়ে দেখলেন।

—চিনতে পারছেন?

ননীলালবাবু বললেন, না!

ব্যাস! এখানেই শেষ হয়ে গেল বিচার। যারা কমিটির মেম্বার নয়, তারাও আশেপাশে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছিল। কারণ তাদের কারোর অধিকার নেই ঘরের ভেতরে ঢোকবার। তাই সবাই তাদের হেডমাস্টারকে নিয়েই আলোচনা করছিল।

সুব্রত বললে, জানেন, আমাদের হেডমাস্টারমশাই-এর বউ মিনতি দেবীকে দেখেছেন তো? পাকিস্তানের ফরেন-মিনিস্টার সাহাবুদ্দীন তাকে নিয়ে নাকি পালিয়ে গিয়েছিল একদিন—

—তাই নাকি? তাই নাকি?

—তারপর সাহাবুদ্দীন সাহেব ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পরেই আবার সেই বউ হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে ফিরে এসেছে।

যারা খবরটা জানতো না তারা পরচর্চার জন্যে একটা নতুন খোরাক পেল! সবাই তখন সুব্রতকে ঘিরে ধরেছে। একদিকে একটা ঘরে কমিটির মিটিং চলছে। সেখানে হেডমাস্টারমশাই-এর নির্দেশের বৈধতা নিয়ে বিচার-সভা বসেছে। তিনজন ছাত্রকে যে তিনি বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন, তা আইনানুগ হয়েছে না বেআইনী, তাই নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রমহলে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কমিটি-রুমের ভেতরে এবং বাইরে সর্বত্র তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সেক্রেটারি বললেন, এবার হেডমাস্টারমশাইকে তাহলে ডাকা হোক—। এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি বললেন, ওঁকে ডেকে কী হবে? বহিষ্কারের অর্ডারটা ক্যানসেল করে দিলেই হলো। কারণ ওরা তিনজন যে মদ খেয়েছে, তার তো কোনও প্রমাণ নেই।

সেক্রেটারি বললেন, কিন্তু ওঁকে এখানে ডাকলে ক্ষতি কি? ওঁর হাতে যে কোনও প্রমাণ থাকতে পারে।

এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি বললেন, মদের দোকানের মালিক যখন নিজে বলছেন তিনি ওদের দেখেননি। তাহলেই তো চুকে গেল ল্যাঠা।

সেক্রেটারি বললেন, না, তবু এ-সম্বন্ধে ওঁরও নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকতে পারে, সেটা ওঁকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। তার পরে না-হয় ওঁর অর্ডারটা ক্যানসেল্ করা যাবে।

গার্জিয়ানদের তরফে যিনি প্রতিনিধি, রামরতন সান্যাল তাঁর আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকতে পারছি না—

সবাই জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কেন?

রামরতনবাবু বললেন, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা যিনি করেছিলেন তিনি শুধু ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই এটা করেননি, তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেদের চরিত্র গঠনও হোক। তা কি হয়েছে? এই দেবব্রত সরকার কি সেই ধরনের হেডমাস্টার? এঁর নিজের চরিত্রও কি ঠিক। এঁর চরিত্রও কি অনুকরণযোগ্য? তাহলে, এঁর বিবাহিতা স্ত্রী কেন এঁকে ত্যাগ করে এঁকে ছেড়ে গিয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছিল? বাড়িতে এঁর যে ঝর্ণা নামে মেয়ে আছে সে কি এঁর ঔরসজাত মেয়ে?

কথাগুলো শুনে সবাই হতবাক! সবাই বললে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওঁকে এবার ডাকা যাক, দেখি কী বলেন উনি।

তা তাই-ই করা হলো। দেবব্রত সরকারকে ডাকা হলো।

তিনি এবার এলেন! সেক্রেটারী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা দেবব্রতবাবু আপনি যে তিনটি ছাত্রকে রাস্টিকেট করেছেন, এই স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ এরা তিনজনে স্কুলের টিফিনের সময়ে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত। আপনি কি নিজের চোখে তাদের মদ খেতে দেখেছিলেন?

দেবব্রতবাবু বললেন, না—

—তাহলে বিনা প্রমাণে আপনি তাদের বহিষ্কার করেছেন?

দেবব্রতবাবু বললেন, আমি না দেখলেও আমি এমন লোকের কাছ থেকে এ-ঘটনা শুনেছি, যার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

—কে সে?

—সে আমার বাড়ির কাজের লোক—গোষ্ঠ। তার দেখা মানেই আমার নিজের চোখে দেখা।

—আপনার চাকর? তার কথার ওপর বিশ্বাস করে আপনি তিনটে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিলেন?

দেবব্রতবাবু বললেন, সে আমার বাড়ির চাকর নয়, আমার ছেলে নেই, তবু সে আমার ছেলের চেয়েও আপন! সে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ওই দুপুরবেলা র‍্যাশন আনতে যায়। সে যতোবার র‍্যাশন আনতে গেছে, ততোবার ওই তিনজনকে মদ খেতে দেখেছে।

—তবু বলবো, চাকরের কথায় আপনি তিনজন ছাত্রের জীবন নষ্ট কবলেন!

দেবব্রতবাবু বললেন, আমিও প্রথমে গোষ্ঠর কথায় বিশ্বাস করিনি। শেষকালে একদিন নিজেই টিফিনের সময়ে বাজারের দিকে গেলুম। গিয়ে দেখলুম যে গোষ্ঠব কথাই ঠিক। দূর থেকে দেখলুম ওই তিনজন ছাত্র মদের দোকানে ঢুকছে। তারপর মিনিট কুড়ি পবে বেরিয়ে আসতে দেখলুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে সাবধান করে দিলুম। কিন্তু তাতেও তারা শোধরালো না। শেষকালে অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে পাঠালুম। তাঁদের সব কথা বুঝিয়ে বললুম। তাঁদের কথা শুনে বুঝলুম তাঁরা আমার অভিযোগের ওপর কোনও গুরুত্ব দিলেন না। তার ওপর যখন দেখলুম, তাদের দেখাদেখি অন্য দু'একজন ছাত্রও তাদেব দলে যোগ দিয়েছে, তখন আর আমার অনুশোচনার অন্ত রইলো না। আমি তাদের রাস্টিকেট কবে দেবার নির্দেশ দিলাম।

সেক্রেটারি বললেন, আপনি কি জানেন যে ওই তিনজন ছাত্রের অভিভাবকরা খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক?

—তা হতে পারে। কিন্তু আমি যেটাকে অপরাধ বলে মনে করি সেটা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক করলেও সেটা অপরাধই থেকে যায়। তাতে অপরাধের কোনও রকম তারতম্য হয় না।

এবার রামরতনবাবু নিজের ফাইল থেকে একটা ফটোগ্রাফ বার করে দেবব্রতবাবুর সামনে এগিয়ে দিলেন। বললেন, দেখুন তো এটা কার ছবি? দেবব্রতবাবু ফটোটা দেখেই বললেন, এ তো আমার স্ত্রীর আর আমার মেয়ের ছবি।

—আপনার এই স্ত্রী কি পাকিস্তানের মিনিস্টার সাহাবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন? আর আপনার এই মেয়ে ঝর্ণা কি সেই মুসলমানের ঔরসজাত?

দেবব্রতবাবু কথাটা শুনে এতটুকু বিচলিত হলেন না। মাথা উঁচু করেই বললেন, হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই বলেছেন!

রামরতনবাবু বললেন, তাহলে তো আপনার 'নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের' হেডমাস্টার হওয়ার যোগ্যতা নেই, কারণ আপনার ছাত্রদের চরিত্র গঠনের আগে তো আপনারই চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করা উচিত! আপনাকেই তো এই স্কুল থেকে আগে রাস্টিকেট করা উচিত।

দেবব্রতবাবু বললেন, আপনারা তাহলে তাই-ই করুন। আমি তাহলে কাল থেকে আর এ স্কুলে আসবো না। যদি কোনও দিন ভগবানের কান্না থামে তাহলে আসবো। তার আগে নয়।

—না। আপনাকে আসতে হবে। আমাদের নতুন হেডমাস্টারের হাতে চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করে দিতে হবে।

তারপরে কমিটির মিটিং সেদিনকার মতো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নতুন হেডমাস্টার কে হবেন?

ঠিক হলো সেটা আবার পরের মিটিং-এ ঠিক হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত বললে, তারপর সেদিন গোষ্ঠ আর মিনতি অনেক রাত পর্যন্ত দেবব্রত সরকারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু দেবব্রতর দেখা নেই। তারপরের দিনও দেবব্রতর দেখা নেই। তারপরের দিনও না। স্কুল থেকে বেরিয়ে কোথায় যে চলে গেল আর কেউ তার খোঁজ পেলে না।

কেউ জানতে পারলে না দেবব্রত কোথায় গেল। স্কুলের মধ্যে যিনি সিনিয়ার টিচার সেই সুশীলবাবু 'টিউটোরিয়াল হোম' করে বড়লোক হয়েছিলেন, তিনিই তখন থেকে 'নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে'র হেডমাস্টার হলেন। কোথাও তার চেয়ে বেশি সৎ আর বেশি শিক্ষিত লোক আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

বহুকাল আগে একদিন মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—আমি সেই ভারত গড়তে চাই, যে ভারতে দরিদ্রতম মানুষও মনে করবে যে এটাই তার দেশ, বুঝতে পারবে, এ দেশে তারও একটা ভূমিকা আছে! যে ভারতে অস্পৃশ্যতা বলে কোনও অভিশাপ কখনও থাকবে না আর, থাকবে না মাদকতার বিষ—অর্থাৎ যেখানে মদ নিষিদ্ধ হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সুপ্রভাত বললে, তারপর আর কী? তখন থেকে এখনও এদেশে যারা অস্পৃশ্য তারা আরো অস্পৃশ্য হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, আর যারা মদ খায়, তাদের মদ খাওয়ার প্রবণতা এখন আরো বেড়ে চলেছে। তবে এখন মদকে আর কেউ মদ বলে না। মদকে এখন একটা পোশাকী নাম দিয়ে তার ইজ্জৎ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মদ খাওয়াকে এখন নাম দেওয়া হয়েছে কক্‌টেল পার্টি।

আর সেই কাঁসারী পাড়া রোডের বাড়িটা?

মিনতি দেবী এখন সে বাড়িটা আরো বড়ো করে দিয়েছে। সেটাতে ঝর্ণা সরকারের নাচের স্কুল হয়েছে একটা। তার নাম দেওয়া হয়েছে "নৃত্য-কলা-কেন্দ্র"। কলকাতার নামী-দামী সব বড়-বড় লোকের বাড়ির মেয়েরা ওই কেন্দ্রে নাচ শিখতে আসে। সেখানে মাসের মধ্যে একবার দু'বার মিনতি দেবী কক্‌টেল পার্টিও দেয়। সে কক্‌টেল পার্টিতে আসে মিনিস্টাররা, স্পীকার, এম-এল-এ, এম-পিরা। অর্থাৎ দেশের যারা মুখোজ্জ্বলকারী মানুষ তারা সবাই এসে নিজেদের ধন্য বলে মনে করে।

কিন্তু আল্‌তা-মাসি তখনও আল্‌তার ঝাঁপি আর সিঁদুর কৌটো নিয়ে আসে। এসে ডাকে, কই গো, বউমা কোথা গেলে?

আর বউমা এলেই তার দু'পায়ে আল্‌তা পরাতে পরাতে বলে, তুমি দেখে নিও বউমা, তুমি সতী-লক্ষ্মী মেয়ে। আমি বলে যাচ্ছি—একদিন-না-একদিন দাদাবাবু তোমার কাছে ফিরে আসবেই আসবে। আমার আলতা-সিঁদুর পরানো কখনও মিথ্যে হতে পারে না, আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যে হয়নি—একদিন দাদাবাবু ফিরে আসবেই।

আর সেই দেবব্রত সরকার?

—তারপর থেকে কেউ আর তাকে দেখতে পায়নি। তার ধারণা তার দেশ স্বাধীন হয়নি। ইংরেজরা চলে গেছে বটে, কিন্তু তবু তার দেশ স্বাধীন হয়নি ইন্দিরা গান্ধী গরিবি হঠাবেন বলে কত চেঁচিয়ে ছিলেন, কিন্তু তব গরিবি হটেনি। জওহরলাল নেহরু কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবেন বলে বড়ো গলায় কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন কালোবাজারিকেও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়নি। তাই দেবব্রত সরকারের ভগবান এখনও কাঁদছে—দেবব্রতর কাছে তার দেশ এখনও পরাধীন।

তবে বহুদিন আগে যখন বাড়িটা 'নৃত্য-কলা-কেন্দ্র' করবার জন্যে সারানো হচ্ছিল, তখন দেবব্রত সরকারের ব্যক্তিগত বইপত্র সবকিছু ফেলে দেওয়ার সময়ে একটা বাক্সর ভেতরে কী একটা ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। মিনতি পড়ে দেখেছিল তাতে লেখা রয়েছে—'আমি মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত। আমি আমার জীবন দেশের জন্যে বলিদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো। বন্দেমাতরম্।'

বলে সুপ্রভাত আমার দিকে সে কাগজটা বার করে দেখালে। জিজ্ঞেস করলাম, এটা তোমাকে কে দিলে?

সুপ্রভাত বললে, গোষ্ঠ। এই কাগজটা ওরা বাজে কাগজেব সঙ্গে ফেলেই দিচ্ছিল। কিন্তু ওটা আমি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি। দেবব্রত সরকারকে আজ কেউই আর মনে রাখেনি। তার স্ত্রীও মনে রাখেনি, তার মেয়ে ঝর্ণাও মনে রাখেনি। কিন্তু সেই সাহাবুদ্দীনেব ঔরসজাত মেয়ে ঝর্ণাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া উপলক্ষ্যে যে সম্বর্ধনা জানানো হলো, তাব কারণ ঝর্ণা দেবীকে সম্বর্ধনা জানালে আমরা ও-বাড়ির কক্‌টেল পার্টিতে মদ খাওয়ার নেমন্তন্ন পাবো, ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন পাবো। আর সেইসব পার্টিতে যেসব মন্ত্রী যেসব ভি. আই. পি. আসবে, তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাবো। আর সেই সুযোগ পেয়ে আমরা বড়ো বড়ো কাজের জন্যে গভর্মেণ্টের কাছ থেকে পারমিট পাবো, লাইসেন্স পাবো, কনট্র্যাক্ট পাবো। আব তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসটিজ পাবো, ইজ্জৎ পাবো—কারণ তার চেয়ে বড়ো পাওয়া মানুষেব জীবনে আর কী আছে, আর কী থাকতে পারে?

জিজ্ঞেস করলাম, তা তুমি এত ভেতরের কথা জানলে কী কবে?

সুপ্রভাত বললে, জানলুম গোষ্ঠর কাছ থেকে। আমিই যে গোষ্ঠর সেই মামাতো ভাই।

—শেষ—

সরস্বতীয়া

আমাদের পাড়ার এস, এন, রায়ের কাহিনী আপনাদের বলিনি। সত্যনাথ রায়। জার্ডিন হেণ্ডারসন কোম্পানীর বড়বাবু। সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন। তার ওপর গাড়ি ছিল কোম্পানীর। বাড়ি থেকে অফিসে নিয়ে যাবার জন্যে কোম্পানীর গাড়ি আসতো বাড়িতে। সেই এস, এন, রায় আঠারো বছর একাদিক্রমে চাকরি করবার পর হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলেন একদিন। ভাবলেন কোম্পানীর অফিসে সাড়ে সাতশো টাকার মাইনের চাকরি করে সময় নষ্ট করছেন! এর চেয়ে অনেক বেশি পয়সা আসতো ব্যবসা করলে। সেই এস, এন, রায় চাকরি ছেড়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে শেয়ার মার্কেটে ঢুকলেন। তিন বছরের মধ্যে সমস্ত টাকা নষ্ট করে আবার ঢুকলেন গিয়ে সেই একই অফিসে। একই অফিসে আবার নতুন করে আরম্ভ করলেন চাকরি। মাইনে হলো ষাট টাকা মাসে। এ আমার দেখা!

তারপর আমার ন'মাসিমার গল্পও বলিনি আপনাদের। মেসোমশাই বাড়ি করেছিলেন মারা যাওয়ার আগে। বিধবা হবার পর ন'মাসিমা সেই পঁচিশ হাজার টাকার বাড়িটি চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে ভাবলেন বুঝি খুব লাভ করেছেন। পাঁচ বছরের মধ্যেই সেই চল্লিশ হাজার টাকা ফুঁকে দিয়ে আবার নিজের বাড়িতে এলেন ভাড়াটে হয়ে। নিজের বাড়িরই দু'খানা ঘরের জন্যে ভাড়া দিয়ে গেলেন মাসে পঞ্চাশ টাকা করে সারা জীবন। মরার শেষ দিনটি পর্যন্ত। এও আমার দেখা!

আর শুধু কি এস, এন, রায়, আর আমার ন-মাসিমা! কত লোককে কত রকমভাবে দেখেছি। মঙ্গল যতক্ষণ মকরে থাকে, ততক্ষণ মঙ্গলই ঘটায়, কিন্তু মকর থেকে সঞ্চার করলেই কেমন করে যে সবদিকে অমঙ্গল ঘটতে থাকে, কে জানে। আবার সেই মঙ্গলই যখন ঘুরে বক্রী হয়ে যায়, তখন যে কেমন করে মঙ্গল-অমঙ্গল সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়, তা আমি বলতে পারি না। ওসব রাশি-গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে আমার কারবারও নয়। আমি শুধু সরস্বতীয়ার কথা জানি, সরস্বতীয়ার গল্প বলতে পারি। সরস্বতীয়ার গল্প বললেই এই তাবৎ পৃথিবীর সব মানুষের গল্প বলা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সত্যি, যতবার নিজের চোরাবালিতে নিজে আটকে গিয়ে পালাবার পথ খুঁজেছি, কিন্তু পালাতে পারি নি, ততবারই সরস্বতীয়ার কথা মনে পড়েছে! আবার যতবার পালিয়ে গিয়ে নিজেরই গড়া চোরাবালিতে এসে আটকে গিয়েছি, ততবারই সরস্বতীয়ার কথা মনে পড়েছে। আমাদের পাড়ার এস, এন, রায়কে দেখেও মনে পড়েছে সরস্বতীয়াকে, আবার আমার ন-মাসিমাকে দেখেও মনে পড়েছে সরস্বতীয়াকে। সত্যি এক একবার আজও মনে হয়, হয়তো আমরা—এই সব মানুষরাই বুঝি কদমকুঁয়ার ছেদি প্যাটেল-এর বউ সরস্বতীয়া।

ছেদি প্যাটেলও বলতো—সাহেব, আপনিই বলুন, সরস্বতীয়া আমার বউ কিনা বটে?

আমি বলতাম—হ্যাঁ ছেদি প্যাটেল, সরস্বতীয়া তোমার বউ-ই বটে।

ছেদি প্যাটেল বলতো—আমি সরস্বতীয়ার বাপকে নগদ পাচ কুড়ি টাকা দিয়েছি কিনা বটে?

আমি বলতাম—তা তুমি কী আর মিথ্যে কথা বলতে যাবে ছেদি প্যাটেল?

ছেদি প্যাটেল তখন বলতো—তাহলে সাহেব, সরস্বতীয়া আমার বিছানায় শোবে না কেন বলুন?

এরপরে আমার আর বলবার কিছু থাকতো না। সরস্বতীয়া যখন একলা থাকতো তখন আমাকে বলতো—তুমি কার দলে সাহেব, আমার দলে না উ-ওর দলে?

আমি বলতাম—আমি তোমার দলে সরস্বতীয়া!

কথাটা শুনে সরস্বতীয়াও খিল্‌খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়তো।

সরস্বতীয়া বলতো—আমার মরদ তোমাকে সাহেব বলে, আমিও তোমাকে সাহেব বলে ডাকবো, কি বলো?

বলতাম—আমি তো বাঙালী!

সরস্বতীয়া বলতো—তবে তুমি মরদের মতো ধুতি-কাপড় পরো না কেন?

বলতাম—কাপড় পরে কী শিকার করা যায়? বনে-জঙ্গলে বাঘ-শূয়োরের পেছনে ঘুরে বেড়াই, কাপড় পরলে কি চলে?

সরস্বতীয়া বলতো—আমাদের চানাক্ষেতে হরিণ আছে সাহেব—দেখবে?

বললাম—তোমাকে দেখাতে হবে না—আমার রামসহায় আছে—

সত্যিই আমার লোকের অভাব ছিল না। কদমকুঁয়ার রামসহায় ছিল আমার শিকারের প্রধান সহায়।

রামসহায়ই আমাকে খবর দিয়েছিল, কদমকুঁয়ায় গেলে শিঙেল হরিণ, ব্ল্যাক-বাকের অভাব হবে না। রামসহায় না বললে আমি কদমকুঁয়ায় যেতামই না। আর কদমকুঁয়াতে না গেলে ছেদি প্যাটেলের বউ মুরলীকেও দেখতে পেতাম না, আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ সরস্বতীয়াকেও দেখতে পেতাম না।

সরস্বতীয়া আমার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বলেছিল—তখন যে বড় তুমি হাসছিলে সাহেব?

বললাম—তোমাকে দেখে।

সরস্বতীয়া ভয়ে আমার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ভাল করে দেখতে লাগলো। বছর সতেরো-আঠারো বয়েসের সরস্বতীয়া, নিজের দৃষ্টি দিয়ে নিজের শরীরের মধ্যে কী খুঁজতে লাগলো কে জানে? তার শরীরের কি দেখে যে আমি হেসেছি, তা-ই বোধহয় খুঁজতে লাগলো সরস্বতীয়া। কিন্তু খুঁজে-খুঁজে কিছুই না পেয়ে আমার দিকে তাকালো ভয়ে-ভয়ে।

ভয় সাধারণতঃ পায় না সরস্বতীয়া। ভয় পাবার মেয়েই সে নয়। কদমকুঁয়া থেকে রাজনন্দগাঁর বাপের বাড়ি পর্যন্ত সাত মাইল পথ রাত দুপুরেও চলে যেতে পারে একলা—এত সাহস। বলতাম—যদি কেউ ধরে?

সরস্বতীয়া বলতো—আমাকে ধরে কী নেবে? আমার কী আছে? আমার তো গয়না নেই।

সরস্বতীয়ার কাছ থেকে যে নেবার অনেক কিছুই আছে, সে-কথা সরস্বতীয়াকে বোঝানো দুষ্কর।

সেই প্রথম দিনই অনেকক্ষণ আলাপ করে সরস্বতীয়া যেন ঘরোয়া করে নিয়েছিল আমাকে। কদমকুঁয়ায় জীবনে কখনও আসিনি। কদমকুঁয়ার নামই শুনিনি জীবনে। আর কদমকুঁয়ায় যে হরিণ পাওয়া যায়—তাই-ই কি আমি জানতাম! ছেদি প্যাটেলকে আমি বিলাসপুরে থাকতেই চিনতাম—কিন্তু কদমকুঁয়ায় না এলে সরস্বতীয়াকে তো দেখা হতো না! আর সরস্বতীয়াকে না দেখলে যেন মানুষের জীবনের অনেকখানি দেখাই আমার বাকি থেকে যেতো। মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত, অভিজাত—কত রকম সমাজের কত রকম মেয়েদের দেখেছি। তারা হাসে, খেলে, সংসার ভাঙে। সিনেমায়-উপন্যাসে-নাটকে আর পাঁচজন মেয়ে যেমন করে আচরণ করে, তারাও তেমনি।

কিন্তু সরস্বতীয়া সত্যিই তাদের থেকে আলাদা।

আর আলাদা না হলে কি তা নিয়ে গল্প লিখতে কারো ভালো লাগে?

বুড়ো ডি-কস্টা সাহেবই একদিন আমায় প্রথম কদমকুঁয়ার নামটা বলে।

আমি তখন বিলাসপুরে থাকি। রেলের ঘুষখোর ধরবার চাকরি আমার। দিন-রাত কেবল ঘুরে বেড়াই ঘুষখোরের খোঁজে। হাতে অনেক সময়। সময় কাটাবার একটা উপায় হিসেবে বন্দুক কিনেছিলাম।

আশেপাশে বন-জঙ্গল আছে। পেনড্রা রোডে অমরকন্টকে গেলে সম্বর, চিতা, ব্ল্যাক-বাক মেলে, টিল্ডায় গেলে হরিণ মেলে, এ-সব জানতাম। ডি-কষ্টা সাহেব এককালে শিকার করতো। এখন বুড়ো হয়ে গেছে। বিলাসপুরে বাড়ি-ঘর-দোর করে স্থিতু হয়েছে! এখন চোখের দৃষ্টি আর নেই—এখন শুধু আমাকে শেখায়। আর শিকার করে আসার পর আমার মুখে গল্প শুনে শিকারের ক্ষিদে মেটায়। ডি-কষ্টা সাহেবই প্রথম বলেছিল—গো টু টিল্ডা ম্যান—টিল্ডায় যাও ভাই—যদি হরিণ মারতে চাও—দেয়ার আর লট্স—

এর পরেই রামসহায়। আমার আর্দালীর ভাই রামসহায়। তারও টিল্ডায় বাড়ি। বলেছিল—হুজুর, আপনার কোনও ভাবনা নেই, আমার বাড়িতে থাকবেন আর শিকার করবেন।

তাই ঠিক ছিল। রামসহায়ের বাড়ি যাবো ফোর্টিন আপে। ফোর্টিন আপ টিল্ডা স্টেশনে পৌঁছোয় সন্ধ্যে নাগাদ। সেখান থেকে রামসহায়ের বাড়ি দু'-মাইল পথ। সন্ধ্যে নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে জঙ্গলে ঢুকবো। তারপর যেমন সুবিধে হয় তেমনি করা যাবে।

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে সব উল্টে গেল। বোধহয় তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। টিল্ডা স্টেশনে নেমে সোজা পশ্চিমমুখো গিয়ে লেভেল ক্রসিং-এর গেট। দেখি গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাখা নিয়ে আমাদের বিলাসপুরের ছেদি প্যাটেল। বললাম—ছেদি প্যাটেল, তুমি এখানে?

ছেদি প্যাটেল আমাদের বিলাসপুরের লোক, আগে বিলাসপুরের লেভেল ক্রসিং-এর গেটে চাকরি করতো। বিলাসপুরে অনেক গাড়ি। চুঁচিয়াপাড়ার ছোট্ট গেটটাতে লাল আর সবুজ পাখা নিয়ে অনবরত সে পাহারা দিত। আর পাশেই ছিল তার ঝুপড়ি।

আমাকে অনেকদিন বলেছে—পেলেটিয়ার সাহেবকে বলে আমাকে একটু বদলি করিয়ে দিন না সাহেব—আমার তাহ'লে বড় কিফায়েত্ হয়।

বলেছিলাম—কিসের কিফায়েত্?

—আজ্ঞে সাহেব, টিল্ডার কদমকুঁয়ায় আমার বাড়ি, ওখানে যদি বদলি হতে পারি তো ক্ষেতি-খামারটা দেখতে পারি—বাড়ির খেয়ে সরকারি নোকরি ভি চালাতে পারি।

তারপর আমাকে ঝুপড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলতো—ওই দেখছেন তো সাহেব, ওইটুকু ঘরে জেনানা-আওরাৎ নিয়ে থাকি—ঘরে মন ভরে না—

ছেদি প্যাটেল লোকটা ভালো। পঁচিশ বছর রেলের চাকরিতে একদিন গর-হাজিরা নেই। ঝড়-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্ম সব মাথার ওপর দিয়ে কাটিয়েছে বুড়ো। কত দিন, কত রাত বিলাসপুরে এসেছি, গেছি। বম্বে মেল, নাগপুর প্যাসেঞ্জার, মালগাড়ি। আপ ডাউন যে-ট্রেনেই হোক, স্টেশনে আসবার আগে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছি ছেদি প্যাটেল গেটটি বন্ধ করে সবুজ পাখাটা নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। এ-দৃশ্য শুধু আমি নয়, আমার মত যারাই বিলাসপুরে এসেছে-গেছে, সবাই দেখেছে। সবাই জানতো ছেদি প্যাটেল যখন আছে তখন দুর্ঘটনা ঘটবে না, ঘটতে পারে না। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে—রাত অনেক হয়েছে—মালগাড়িতে আসছি—রেলিংটা ধরে ঝুঁকে দেখলাম—ছেদি প্যাটেলের সবুজ আলো গার্ড সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে অল্প-অল্প দোলাচ্ছে। ডি-কষ্টা সাহেব বলতো—ছেদি প্যাটেল তবিয়ৎ ঠিক হ্যায়?

ডি-কষ্টা সাহেব ইংরাজী জানতো, হিন্দী জানতো, আবার ছত্রিশগড়ী ভাষায় কথা বলতে পারতো!

গার্ডের গাড়িটা পাশ দিয়ে যাবার সময় ছেদি প্যাটেল হাত তুলে সেলাম করতো। ডি-কষ্টাও সেলাম জানাতো, আমিও ছেদিকে সেলাম করতাম।

ছেদি প্যাটেল ছিল বিলাসপুরের সবচেয়ে বুড়ো মানুষ।

বলতাম—কত বছর তোমার চাকরি হলো ছেদি প্যাটেল—
ছেদি প্যাটেল বলতো—এক কুড়ি এক বছর সাহেব—
—আর ক-বছর সার্ভিস আছে তোমার?
ছেদি প্যাটেল বলতো—তা কি জানি সাহেব।
বলতাম—তা তোমার নিজের কি একটা হিসেব নেই?
ছেদি প্যাটেল বলতো—সাহেব, আমরা ছত্রিশগড়ী, আমরা কি লিখিপড়া করেছি? হিসেব আছে কোম্পানীর খাতায়—
বলতাম—কোম্পানী আর নেই ছেদি প্যাটেল, এখন সরকারী রেল হয়ে গেছে, তা জানো?
ছেদি প্যাটেল বলতো—সরকারী হোক, আর যাই হোক আমরা তো এখনও রেল কোম্পানী বলি—
বলতাম—এখন এটা সাউথ ইস্টার্ণ রেল হয়ে গেছে, তা জানো তো!
ছেদি প্যাটেল বলতো—এসব জানি নে সাহেব, আমরা তো এখনও বি-এন-আর বলি—
ছেদি প্যাটেল ছিল ওই রকম। কোথায় যে তার দেশ, কবে কে যে তাকে রেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কতদিন চাকরি করছে, আর কতদিন চাকরি করবে, কিছুই জানতাম না। শুধু জানতাম লোকটাকে। নীল একটা কোর্তা থাকতো গায়ে, রেলের ইউনিফর্ম। তাই পরেই ডিউটি দিত, আবার তাই পরেই শনিচরি হাটে যেত।
দেখা হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করতাম—একি, হাটে কী করতে ছেদি?
ছেদি বলতো—সাহেব, মছলি কিনবো—
বলতাম—ভালো, ভালো—
একমাস ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। ঠিক ছুটির পর আবার জয়েন করতে বিলাসপুরে ফিরে যাচ্ছি, দেখি সবুজ পাখা নিয়ে ছেদি—
আমাকে দেখেই গেট থেকে সেলাম করছে। বললে—এসেছেন বাবুজী?
রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেছে।
—বাল-বাচ্চা ভালো আছে? মাঈজী ভালো আছে?
অজস্র কুশল প্রশ্ন করেছে। বাড়ির খবর নিয়েছে, স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছে। অথচ আমি তেমন করে কখনও আমল দিইনি ছেদি প্যাটেলকে। তেমন করে কখনও জিজ্ঞেস করিনি কে-কে আছে ছেদি প্যাটেলের। অথচ ছুটিও নেয়নি বোধহয় কখনও।
একবার শুধু বলেছিল—আপনি পেলেটিয়ার সাহেবকে বলে আমাকে বদলি করে দিন না সাহেব—
পেলেটিয়ার মানে পি-ডবল্‌-আই। পার্মানেণ্ট ওয়ে ইন্‌সপেক্টর। ট্রলি করে রেল লাইন তদারক করা তার কাজ। তখন পি-ডবল্‌-আই ছিল মূর্তি। ভেঙ্কটরমণ মূর্তি। আমার খুব জানাশোনা। কতদিন ট্রলিতে করে দু'জনে অমরকন্টকের জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে গেছি। শুধু মুখের কথাটা খসালেই কাজ হতো—শুধু বললেই হতো ছেদি প্যাটেলকে টিল্‌ডায় বদলি করে দিন মিস্টার মূর্তি। শুধু একটা কলমের আঁচড়েই কাজ হয়ে যেত। টিল্‌ডার লোক চলে আসতো বিলাসপুরে আর বিলাসপুরের লোক চলে যেত টিল্‌ডায়। এ এমন কিছু শক্ত কাজ নয় মূর্তির পক্ষে!
কিন্তু হয় নি। অর্থাৎ আমিই বলিনি। আর, সব সময়ে কি আমরা অন্য লোকের কথা ভাবি? অন্য লোকের উপকার করবার চেষ্টা করি? কোথাকার কে ছেদি প্যাটেল, বিলাসপুরের লেভেল ক্রসিং-এর গেট-কীপার—তার কথা মনে রাখবো এত সময় আমাদের নেই। সেই ছেদি প্যাটেলকে হঠাৎ টিল্‌ডার গেটে দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম।
ছেদি প্যাটেলও অবাক হয়ে গেছে। বললে—সাহেব, আপনি এখানে?

ছেদি প্যাটেল জানতো আমি ঘুষখোরদের ধরার চাকরি করি। ঘুষ ধরি আর না-ধরি, অন্তত সেই কাজে যে ঘুরে বেড়াই সারাটা মধ্যপ্রদেশ, তা সে জানতো। জিজ্ঞেস করলে—কোম্পানীর কাজে এসেছেন সাহেব?

আমার হাসি পেল। কোম্পানীর মানে সরকারের। সরকারী কাজ বহুদিন করেছি, সরকারের নিমকও খেয়েছি। এখন আর খাই না। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ওপরঅলারা যে কতখানি সরকার-ভক্ত তার পরিচয় হাড়ে হাড়েই বুঝেছি। যাঁরা 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলে কথায় কথায় উপদেশ দেন, তাঁরা যে কতখানি দেশভক্ত, তার নমুনাও দেখেছি। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। বললাম—আমার কথা থাক, তুমি এখানে কবে এলে তাই বলো ছেদি প্যাটেল।

ছেদি প্যাটেল বলে—এখানকার বুধুয়া বিলাসপুরে গেল, আর আমি তার জায়গায় এখানে চলে এলাম!

বললাম—কিন্তু কী করে হলো?

ছেদি প্যাটেল যেন ভয় পেয়ে গেল একটু।

বললে—আপনি কাউকে কিছু বলবেন না তো সাহেব?

বললাম—কিছু বলবো না, তুমি বলো—

ছেদি প্যাটেল বললে—অনেক দরখাস্ত করেছিলাম—সাহেব, কিছু হয়নি। শেষে কেরাণীবাবুকে জলপানি খেতে দিলাম—

—জলপানি!

—হ্যাঁ সাহেব, জলপানি। পেলেটিয়ান সাহেবের কেরাণীবাবুকে এক মাসের তন্‌খা জলপানি খেতে দিলাম, আর সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে গেল অর্ডার—

কত সহজে কত শক্ত জিনিসের সমাধান হয়ে যায় সরকারী অফিসে, তা আমার চেয়ে আর কারো ভালো করে জানা ছিল না। তবুও আবার আর একটা ঘটনা জানা হলো। ছেদি প্যাটেল বললে—টাকা তো নিল কেরাণীবাবু, কিন্তু কাজ করে দিয়েছে। কত জায়গায় কত লোককে টাকা দিয়েও যে কাজ হয়নি সাহেব—

ফোর্টিন আপ হুস্‌ হুস্‌ করে নাগপুরের দিকে চলে গেল। লেভেলক্রসিং এর দু'পাশে ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলো ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। এক জোড়া ইস্পাত এধার থেকে ওধার, একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেন মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল। আউটার সিগন্যালের ওপর মাথার দু'টো আলো টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলতে লাগলো—একটা লাল আর একটা সাদা।

পরে ওই টিল্‌ডা স্টেশনেই কতবার গিয়েছি। দু তিন রাত কাটিয়েওছি। কিন্তু সেই প্রথম ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনটা যেন আজও মনের ভেতর অক্ষয় হয়ে আছে। সেই ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক, সেই সিগন্যালের টিম্‌টিম্‌ আলো, সেই মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা রেল লাইন আর সেই আদিগন্ত ধূ-ধূ করা শূন্যতাময় আবছা অন্ধকার—সে যেন ভোলবার নয়।

সরস্বতীয়া বলতো—ওখানে ভূত আছে—

—কোথায়?

সরস্বতীয়া বলতো—ওই আমার মরদ যেখানে নোকরি করে-

ছেদি প্যাটেলের কাছেও শুনেছি সেই টিলডা স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এর কাছে একদিন কোন একটা প্যাসেঞ্জার নাকি কাটা পড়েছিল। চেনা নয়, কে একজন অচেনা অজানা ভদ্রলোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওই লাইনের ওপর। তারপর ফোর্টিন আপখানা তার ওপর দিয়ে মড়মড় করে মাড়িয়ে চলে গিয়ে খানিকটা দূরে থেমে গিয়েছিল।

সরস্বতীয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার ভয় করেনি?

সরস্বতীয়া বলেছিল—আমি তখন কোথায় সাহেব? আমি তখন রাজনন্দগাঁয় বাপের বাড়িতে—

—তা এখন তো ভয় করে?

সরস্বতীয়া বলতো, ভূত আমার কী করবে সাহেব। আমার কী আছে যে নেবে?

সত্যিই তো, ভূত আর সরস্বতীয়ার কি নিতে পারে! ওই আশেপাশের যত গাঁ, যত গঞ্জ আছে, যত লোক আছে, কেউ সরস্বতীয়ার কিছু ক্ষতি করতে পারে না! কদমকুঁয়ার প্রথম রাতটার কথা আজও মনে আছে। নতুন অপরিচিত জায়গায় শোয়া, নতুন খাটিয়া, নতুন ঘর-দোর—আর দূর জলাজঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছিল। আমার ভালো করে ঘুমই হয়নি। ঘুম না হবারই কথা। আর ঘুমোবার জন্যে আমি সেখানে যাইও নি। সরস্বতীয়ার কথাই মনে পড়েছিল শুয়ে-শুয়ে, ছেদি প্যাটেলের কথাও মনে পড়েছিল। কে জানতো সেই ছেদি প্যাটেল—বিলাসপুরের সেঃ বুড়ো ছেদি প্যাটেলের এমন সুন্দর বউ! এত ক্ষেতি বাড়ি, এত ক্ষেতি খামার, এত চানা ক্ষেত, অড়হর ক্ষেতি ছেড়ে কি বিলাসপুরের ময়লা ঝুপড়িতে কেউ থাকতে পারে! এতদিন যে থেকেছে এইটেই আশ্চর্য। এত যার পয়সা, এত যার বউ-এর রূপ, সে কেন বিলাসপুরের ধূলোকাদায় পচে মরবে!

হঠাৎ যেন কোথায় একটা আর্তনাদ উঠলো।

—মেরে ফেললে, মেবে ফেললে গো—মেরে ফেললে!

মনে হলো রেল-লাইনের ওপর অনেকদিন আগেকার সেই মৃত আত্মা বুঝি সজীব হয়ে এই ছেদি প্যাটেলের ঘরের মধ্যেই আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু এ তো মেয়েমানুষেব গলা! সমস্ত আবহাওয়া যেন অসাড় হয়ে এল সেই চিৎকারে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে বসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ ছেদি প্যাটেলের গলা শুনলাম।

—পাজি, বদমাইস, হারামজাদি, চিল্লাতি হ্যায়—

বন্দুকটা ছিল বিছানার পাশেই। সেটা নিয়ে আস্তে-আস্তে দরজাটা খুলতেই সামনে যা দেখলুম...

কিন্তু সে কথা এখন থাক! আগে ছেদি প্যাটেলের গল্পটা বলি।

রামসহায় তখন আমার বিছানার বাণ্ডিলটা নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। সে আমার আর্দালীর ভাই। সেও বাড়ি গিয়ে রান্নার বন্দোবস্ত করবে। সাহেব এসেছে, সুতরাং আমার জন্যে সে মুরগী বানাবে, পরোটা বানাবে। অনেক দিনের সাধ তার যে আমি তার বাড়িতে গিয়ে উঠি—তার বাড়িতে জুতোর ধূলো দিই।

বললে—চলুন হুজুর, রাত হয়ে আসছে।

ছেদি প্যাটেল বললে—আমার বাড়িতে থাকতে হবে সাহেব। আমি সাহেবের সেবা দেব—

রামসহায়কে বললাম—তোমার বাড়িতে পরে যাওয়া যাবে একদিন। ছেদি প্যাটেল আমাদের বিলাসপুরের লোক, দেখছো না—এতদিন পরে দেখা—

ছেদি প্যাটেল বললে—হ্যাঁ সাহেব, কত বছর পরে দেখা—

বলে সবুজ পাখাটা ততক্ষণে গুটিয়ে ফেলেছে! গেট-এর পাল্লা দুটো খুলে কিনারার দিকে সরিয়ে দিয়েছে। দু-একটা বয়েলগাড়ি এতক্ষণ গেট খোলার জন্যে অপেক্ষা করছিল—তারাও এতক্ষণে লাইন পেরিয়ে ওধারে চলে গেল। ছেদি প্যাটেল বললে—আমার বাড়ি দূরে নয় সাহেব, আমারও ডিউটি খতম—চলুন আমার সঙ্গে—

রামসহায়কে বললাম—তুমি যাও। ভোর রাত্তিরে এসো আবার।

ছেদি প্যাটেল ততক্ষণ আমার মালপত্র রামসহায়ের কাছ থেকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

মেঠো পথে আমরা দু'জনে চলছি তখন। দু-পাশে ক্ষেত।

ছেদি প্যাটেল বললে—এই দেখুন সাহেব, এবার অড়হড় দিয়েছিলাম এই ক্ষেতিতে, আর ওই দিকের ক্ষেতিতে চানা দিয়েছি—

চেয়ে দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলোর সবুজ আভা যেন ফুটে বেরোচ্ছে। অন্ধকারে হাওযায় দুলছে গাছগুলো। কোথায় সেই বিলাসপুরের অন্ধকূপ, আর কোথায় এই টিল্‌ডা।

ছেদি প্যাটেল বললে—সাবধানে আসবেন সাহেব, এদিকটায় জল আছে, জুতো নষ্ট হয়ে যাবে—

একটু পরে বললে—এই হলো কদমকুঁয়া—আমার গাঁ—এখানে চল্লিশ বিঘে ক্ষেতি আছে আমার সাহেব—

চল্লিশ বিঘে? একটু অবাক হলাম বৈকি! রেলের গেটকিপারি করে এত টাকা করেছে ছেদি?

ছেদি প্যাটেল বললে—সবই কোম্পানীর টাকায় সাহেব, কোম্পানী আমার মা-বাপ—

ছেদি প্যাটেলের দিকে চাইলাম। মহাপুরুষ মনে হলো প্যাটেলকে।

ছেদি প্যাটেল বললে—তা বলতে পারেন সাহেব, মছলি খাই নি, কাপড় কিনি নি, রেল কোম্পানীর কুর্তা পরেছি আর টাকা জমিয়েছি—জেনানাটা ছিল ভালো, তাই বেশি খরচ হয় নি, যা দিয়েছি তাই নিয়েছে—

বললাম—তোমার ভাগ্য ভালো ছেদি প্যাটেল—

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই যে জলটা চিক্‌চিক্ করছে,—ওইটে আমার পুকুর সাহেব, পুকুর কাটিয়ে ঘর বানিয়েছি একটা—ধান বেচি, চানা বেচি, অড়হড় বেচি, টাকা সুদে খাটাই—আর গেট-ম্যানগিরি করি—

—বাঃ!

বললাম—বাঃ, তুমি তো রাজার হালে আছো ছেদি প্যাটেল—তোমার আর চাকরি করার দরকার কি। মিছিমিছি নাইট ডিউটি করে করে শরীর নষ্ট, এবার চাকরি ছেড়ে দাও—তোমার ছেলেপুলে ক'টা?

ছেদি প্যাটেল সে-কথার কোনো উত্তর দিল না।

হঠাৎ যেন হৈ-চৈ, গণ্ডগোল, চীৎকার, গালাগালি কানে এল।

ছেদি প্যাটেল কান খাড়া করে শুনতে লাগলো। চীৎকারটা যত কাছে আসছে ততই জোরে হচ্ছে। যেন ঘর ফাটিয়ে ফেলবে। মেয়েমানুষের গলা। ছেদি প্যাটেল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—ওই শুনছেন তো সাহেব—শুনছেন তো—

বললাম—শুনছি তো—ও কারা?

ছেদি প্যাটেল বললে—আবার কারা? আমার দুই ডৌকি—

অবাক হয়ে গেলাম! বললাম—তোমার বউ? কার সঙ্গে ঝগড়া করছে?

ছেদি প্যাটেল কিছু উত্তর দিলে না। ততক্ষণে বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিলাম। ছেদি প্যাটেল এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো—মুরলী—

যেন মন্ত্র।

মন্ত্রের মতো সব এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোথাও একটুকু টুঁ শব্দ নেই। ছেদি প্যাটেল যেন রাগে ফুলছে সাপের মতন। বুড়ো মানুষ, নির্ভেজাল ভালোমানুষ গোছের লোক বলে বরাবর জানতাম ছেদি প্যাটেলকে। কখনও রাগতে দেখিনি মানুষটাকে! সবুজ পাখা নিয়ে চলন্ত গাড়িকে নির্বিঘ্নে চালিয়ে দেওয়াই ছিল ছেদি প্যাটেলের কাজ। তার আমলে কখনো কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে দেখি নি। সেই ছেদি প্যাটেলকে রাগলে কেমন দেখায়, তাই প্রথম দেখলাম যেন। খুট্ করে ভেতর থেকে দরজার হুড়কোটা খুলে গেল।

ছেদি প্যাটেল বললে—আসুন সাহেব—

কালো মতন একটা বউ ঘোমটা দিয়ে একপাশে এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে আমিও ভেতরের উঠোনে পৌঁছে গিয়েছি।

ছেদি প্যাটেল বললে—এই দ্যাখ্ আমার সাহেব এসেছে—নতুন ঘরটায় থাকবে, ঘর পরিষ্কার করে বিছানা বানাতে বল—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখলেন তো সাহেব, নিজের কানে শুনলেন তো সব—যতক্ষণ বাড়িতে থাকবো না, ততক্ষণ কেবল ঝগড়া, মারামারি, গালাগালি—

তারপর জিনিসপত্র গুছোতে-গুছোতে বললে—কেন রে বাবা, দু দণ্ড একটু চুপ করে থাকতে পারিস না তোরা? বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে একেবারে—

বকা-ঝকা আরম্ভ করে দিলে ছেদি প্যাটেল। অথচ অন্য দিক থেকে তখন টুঁ শব্দটি নেই! যেন মানুষই নেই বাড়িতে। খাঁ-খাঁ করছে সবকিছু।

ছেদি বললে—হাঁ করে দেখছিস কি? পা ধোবার জল দে—

মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন এ-সংসারে এসে অপরাধ করে ফেলেছি আমি। যেন না-এলেই ভালো হতো। ছেদি প্যাটেল তখনও গজগজ করছে—দু-দুটো বউ, একটারও একটু মায়া নেই— দু-দুটো বউ যেন লড়াই করতে এসেছে আমার বাড়িতে—দেব সব ক'টাকে একদিন বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে।

বললাম—আমি না হয় রামসহায়ের বাড়িতেই যাই ছেদি প্যাটেল—

ছেদি প্যাটেল বললে—কেন? আমি তো একলা নই, দু-দুটো বউ থাকতে আপনি যাবেন রামসহায়ের বাড়িতে? কেন আমি কি বউদের খেতে দিই না? মাগ্না?

ওপাশে তখনও কোন সাড়াশব্দ নেই। ছেদি প্যাটেল ডাকলে মুরলী—

একটা কালো-মতন বউ আগাগোড়া ঘোমটা দিয়ে এসে হাজির হলো সেখানে। ছেদি প্যাটেল বললে—নতুন ঘরটায় সাহেবের বিছানা করে দে—সাহেব শোবে এখানে—নতুন মশারিটা টাঙিয়ে দে আমার, আর চাদর, বালিশ দে। সব আছে আমার সাহেব, আমি কদমকুঁয়ার প্যাটেল, আর আমার বাড়িতে কিনা আপনার অযত্ন হবে—

বললাম—দরকার কি ছেদি। তোমার বউরা একটু বিশ্রাম করত, আমি এর মধ্যে তো এসে আবার ঝঞ্ঝাট বাড়ালাম কেবল---

ছেদি প্যাটেল বলল—ঝঞ্ঝাট কেন? তাহলে কোন্ সুখে বিয়ে করা?

হেসে ফেললাম। বললাম—বিয়ে করেছ কি ওদের খাটাবার জন্যে?

ছেদি প্যাটেল বললে—তা খাটবে না? শুধু বসে-বসে আমার খাবে কেবল? টাকা লাগে নি বিয়ে করতে?

সত্যি অকাট্য যুক্তি! পয়সা দিয়ে বউ এনেছে ঘরে, খাটিয়ে নেবে বৈকি? না খাটালে দাম উসুল হবে কেন?

ততক্ষণ দেখি এক বালতি জল এসে গেছে। ছেদি প্যাটেল বললে—আপনি হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন—আমি একটু দোকানে যাই—

বললাম—আবার দোকানে যাবে কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে—বাঃ আপনি এলেন, আপনাকে কি যা-তা দিয়ে খেতে দিতে পারি? ছেদি প্যাটেল কথাটা বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ছেদি প্যাটেল চলে যেতেই ভেতর থেকে তখন ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তার আওয়াজ এল। নিজেই বালতিটার কাছে গিয়ে জুতো-মোজা খুলে হাতে-মুখে জল দিলাম। আরাম হলো একটু। একটা ছোট টুল এগিয়ে দিয়েছিল ছেদির বউ। তাইতে বসে মুখ-হাত-পা মুছে নিলাম। ছেদির বাড়িটা ভালো। অনেকগুলো ঘর। চারিদিকে সার-সার ঘরদোর। বেশ গোবর দিয়ে নিকানো-মোছানো। একটা খাঁচায় টিয়াপাখি ঝুলছে। উঠোনের মাচার ওপর চাল-কুমড়ো হয়েছে অনেকগুলো। রান্নাঘরের ভেতর থেকে একটা বউ উঁকি মেরে আমার দিকে দেখছিল। আমার চোখে-চোখ পড়তেই চোখটা সরিয়ে নিলাম। বেশ আছে ছেদি প্যাটেল। বিলাসপুরে এই ছেদিকে দেখে কি ভাবতে পেরেছিলাম—এমন একটি সংসারের কর্তা সে। চারিদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর, একটা পাখি, মাচার ওপর চাল-কুমড়ো! আর ওদিকে সরকারি চাকরি। সেখানেও দায়িত্ব নেই। ট্রেন আসবার সময় শুধু গেটটি বন্ধ করে রাখা, আর পাখাটা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর যখন কাজ না থাকে, তখন গুমটির মধ্যে বসে ঘুমোও। রাস্তার চলতি বয়েলগাড়ি আসতে-আসতে হঠাৎ হয়ত ক্লান্ত হয়ে একবার থামে, তারপর গাড়িটাকে ছায়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গল্প জোড়ে—বিড়ি খায়, তামাক খায়।

এরকম অনেক জায়গায় দেখেছি।

এ শুধু টিল্‌ডায় নয়, শুধু বিলাসপুরে নয়। হাতবাঁধ, নইলা, ভাটপাড়া, বারদুয়ার, অনেক জায়গাতেই স্টেশনের আশেপাশে রাত কাটাতে হয়েছে। কাজ-কর্মে সমস্ত মধ্যপ্রদেশটাই ঘুরে বেড়িয়েছি এমনি করে। দু'বেলা ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুরে, সেই সময় চানার ক্ষেতে শিরশির করে বাতাস বয়ে আসে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। প্ল্যাটফরম ছোট। যখন ট্রেন এল, তখন হৈ-চৈ হট্টগোল, তারপর সব নিঃঝুম। মালগুদাম থেকে হয়ত বড়-বড় বাদামতেলের টিন বোঝাই হচ্ছে মোষের গাড়িতে। ধুলোয় ধুলো চারদিক। মালবাবু মালপিছু চার আনা ক‍ে পকেটে পুরছে আর সিগারেট ফুঁকছে। চালান নিয়ে দর কষাকষি চলছে একদিকে, আর হামালরা মাল ওঠাচ্ছে গাড়িতে। কখনও পেয়ারার টুক্‌রি, কখনও কমলালেবুর ঝোড়া, কখনও বা অড়হড় ডালের দু'মণি বস্তা। তখন নিরিবিলি সমস্ত দিন। তখন স্টেশনমাস্টারবাবু টরেটক্কা নিয়ে 'তার' লিখে নিচ্ছে। এদিকে কনট্রোল ডাকলো। থার্টিন ডাউন আসবার সময় হয়েছে। খবর গেল কেবিনে গেটম্যানকে খবর দিতে হবে। ক্রিং-ক্রিং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে ছেদি প্যাটেল উঠে গেট বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সময়ে হুস্‌হুস্ করে একটা ট্রাক এসে ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াল। ড্রাইভার বললে—এই ছেদি—গেট্ খোল—

গুম্‌টির ভেতর থেকে ছেদি বলে—হুকুম নেই, থার্টিন ডাউন আসছে।

—থার্টিন ডাউন আসবে আধঘণ্টা পরে, দরজা খোল্ বলছি।

ছেদি প্যাটেল বললে—কোম্পানীর নোকর ভাইয়া, হুকু' নেই, হামাবা কেয়া কসুর—লাইন ক্লিয়ার হো গ্যায়া—

লাইন ক্লিয়ার একবার হয়ে গেলে আর ছেদি প্যাটেলের বাবার সাধ্যি নেই গেট খোলে। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। ওই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে হাঁ করে, তারপর গাড়ি চলে গেলে হুকুম আসবে কেবিন থেকে, আর তখনই ছেদি প্যাটেল গেট খুলে দেবে।

হুস্ হুস্ করে যাবে গাড়িগুলো।

টিল্‌ডায় এ-সব ঘটনা আমি দেখিনি, কিন্তু দেখেছি অন্য জায়গায়। ভাটপাড়া, নইলা, হাতবান্ধ, বারদুয়ার সর্বত্র! দেখে মনে কিন্তু ঈর্ষা হয়নি। ছোট চাকরির ছোট দায়িত্ব দেখে করুণাই হয়েছে। ট্রেনে যেতে-যেতে যখন সবুজ পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কোনও গেটম্যানকে, তখন তাচ্ছিল্যই করেছি তাদের।

কিন্তু আজ যেন কেমন ঈর্ষাই হলো।

এদেরও তাহ'লে ঘর-সংসার আছে। এদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এদের বাড়িতেও চাল-কুমড়োর মাচা থাকে, এদেরও চালের বাতায় টিয়াপাখি থাকে, গোয়ালে গোরু থাকে, এরাও বেঁচে থাকে আমাদের মতন বাঁচার আগ্রহে, আর হয়ত এরা আমাদের চেয়ে বেশি ভালো করেই বাঁচে!

হয়ত এরা মিছে কথাকে মিছে বলেই জানে। কিংবা হয়ত সততাকে খাঁটি সততা বলেই বিশ্বাস করে। আমরাও হয়ত একদিন এদের মতই সরল ছিলাম, সৎ ছিলাম, হয়ত এদের মতই পরকে একদিন আপন করে নিতে পারতাম। তারপর লেখাপড়া শিখেছি, ফরসা জামা-কাপড় পরেছি, ভদ্র হয়েছি, সিনেমা-থিয়েটারকে সংস্কৃতি নাম দিয়ে পরকেও ঠকিয়েছি, নিজেরাও ঠকছি। কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছি, কেউ মিনিস্টার হয়েছি, এখন আর ভালোকে সহজে ভালো বলি না, খারাপকে সহজে খারাপ বলি না। তাতে কার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কার স্বার্থ সিদ্ধি হয়, তা ভেবে তবে ভালো-খারাপ বলি।

—সাহেব!

ছেদি প্যাটেল অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিল। একমনে নিজের ভাবনাতেই মেতে ছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দেখি দুটো বউ বেশ আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। খুব ভাব দু'জনে। বাড়িতে ঢোকবার আগে যে দু'জনের অত ঝগড়া চলছিল তা আর ওদের দেখে বোঝবার উপায় নেই।

মুরলী বললে—সাহেব, তোমার ঘর সাফাই হয়ে গেছে। ওঠো—

চেয়ে দেখি পাশের একটা ঘরে আমার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে খাটিয়া পেতে দিয়েছে।

মুরলী বললে—সরস্বতীয়া, সাহেবকে চা করে দে—

ঘরের মধ্যে আর একটা বউ তখনও নতুন পাতা বিছানাটা ঠিকঠাক করছিল! আমি যেতেই বউটা দুড়-দুড় করে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো হয়েছে। দেয়ালের তাকে গোটাকতক বই-পত্র জমানো। পাতলা চটি বই সব। ছেদি প্যাটেল কি আবার বই পড়তেও পারে নাকি! দেখলাম গোটাকতক হিন্দী সিনেমার ছবি ভর্তি বই। ভেতরে অসংখ্য ছবি! এ সব সিনেমা কি এখানেও এসেছে, এই কদমকুঁয়ায়! এখানে শিকার করতে এসেছি হরিণ, আর এই ছত্রিশগড়ীয়ার বাড়ির ভেতরে অন্দরমহলে পর্যন্ত এই সব শহরের গতিবিধি!

বাইরে খুব হাসাহাসি চলছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখছি রান্নাঘরের সামনে বসে দুই বউ খুব হাসছে। মুরলী বলছে,—তুই যা, সাহেবকে চা দিয়ে আয়—

সরস্বতীয়া বলছে,—আমি যাব না, তুই যা—

মুরলী বলছে,—আমি কেন যাবো? আমি কালো—কুচ্ছিৎ, আমি তো বুড়ী।

সরস্বতীয়া বললে,—আর আমি বুঝি ছুঁড়ি?

বলে খিল্-খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়বার যোগাড়।

মুরলী বললে—তাহ'লে চা নিয়ে যাবি কিনা তুই বল্?—

সরস্বতীয়া বললে—আমি যাবো না, তোর কি?

—তোর কি! তবে রে, আচ্ছা ও আসুক, তোকে আবার মার খাওয়াবো।

সরস্বতীয়া বললে—বেশ মার খাবো তো খাবো, বুড়োর হাতের মার খুব মিষ্টি, জানিস্।

মুরলী বললে—যাবি না তো? তাহ'লে আমি যাচ্ছি—

সরস্বতীয়া বললে,—বাবারে বাবা, যাচ্ছি—বলে চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আমার দিকে আসতে লাগলো উঠোন পেরিয়ে।

আমার খুব হাসি পেল। এ দুটো তো বেশ আছে। এই ঝগড়া এই ভাব। এতক্ষণ যে ঝগড়া করছিল এমন, কে তা বলবে এখন দেখি।

দেখলাম গায়ের কাপড়টাকে বেশ আঁটসাঁট করে জড়িয়ে-সরিয়ে নিলে। তারপর একহাতে চায়ের বাটি আর একটা বাটিতে কি যেন খাবার। ঘরের ভেতর আমি তখন না-দেখবার ভান করে অন্যদিকে চেয়ে বসে আছি। সরস্বতীয়া বললে—চা নাও সাহেব—

আমি যেন কিছুই জানি না। হঠাৎ চা দেখে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

একটা এনামেলের বাটিতে গরম চা আর একটা বাটিতে কতকগুলো পিঠে। দেখে মনে হলো চালের গুঁড়োয় তৈরি।

চা দিয়ে সরস্বতীয়াব চলে যাবার কথা। কিন্তু চলে গেল না।

মুখ তুলে বললাম—কিছু বলবে আমাকে?

এবাব ভালো করে দেখলাম ছেদি প্যাটেলের দ্বিতীয় পক্ষের বৌটিকে। বেশ ফরসা গোল গাল গড়ন, এক হাতে কাঁচের চুড়ি। টক্‌টক্ করছে গায়ের রঙ। দরজার পাল্লাটা দু-হাত উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর মিটমিট করে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

আবার বললাম —কিছু বলবে আমাকে?

সরস্বতীয়া যেন একটু দ্বিধা করলো প্রথমে, তারপর আমাব মুখের দিকে চেয়ে বললে—তখন অত হাসছিলে কেন?

হঠাৎ এই অভিযোগে একটু চমকে উঠলাম।

বললাম —কই হাসিনি তো?

সরস্বতীয়া বললে—হাসিনি অম্‌নি বললেই হলো, আমি সব দেখেছি—রান্নাঘরে দিদির সঙ্গে যখন কথা বলছিলুম, তখন কে হাসছিল—আমি?

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—এগুলো কী? এ আমি খেতে পারবো না—

সরস্বতীয়া বললে—না, ওটা খেতেই হবে, চালের পিঠে—আমি বানিয়েছি—

বললাম—তুমি বানাও আর মুরলীই বানাক্, আমি খেতে পারবো না—

সরস্বতীয়া বললে—মুরলী বললে খাবে বুঝি?

বললাম—মুরলী আর তুমি কি আলাদা?

সরস্বতীয়া বললে—তবে তুমি খাচ্ছো না কেন?

তা খেতেই হলো আমাকে শেষ পর্যন্ত। চালের গুঁড়ো করে হাতে-তৈরী পিঠে। মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ। খালি বাটিটা সরস্বতীয়ার হাতে তুলে দিয়ে বললাম—এবার হলো তো?

সরস্বতীয়া তাতেও সন্তুষ্ট হলো না।

বললে—তাহলে হাসছিলে কেন বলো এবার—

বললাম—হাসছিলাম তোমাদের কাণ্ড দেখে—

সরস্বতীয়া বললে—তুমি খুব করে বকে দিও তো আমার মরদকে—আমার সঙ্গে খালি ঝগড়া করে ও—

বললাম—কেন? মুরলী ঝগড়া করে কেন তোমার সঙ্গে?

সরস্বতীয়া বললে—আমি সুন্দরী বলে—

বললাম—তুমি সুন্দরী বুঝি?

এমন সময় হঠাৎ ছেদি প্যাটেলের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে দুড়দুড় করে পালিয়ে গেল সরস্বতীয়া। দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ আরো কি-কি কিনে ঘাড়ে করে ঢুকলো ছেদি প্যাটেল।

ছেদি ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে—সাহেবকে চা দিয়েছিস মুরলী?

স্পষ্ট মনে আছে প্রথম দিনের সেই সরস্বতীয়াকে যেন আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হয়েছিল। এমন তো কখনও দেখিনি আগে। বিশেষ করে ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে এমন মেয়েকে দেখবো, আশা করিনি।

খেতে বসে অনেক গল্প করেছিল ছেদি প্যাটেল।

ছেদি প্যাটেল বলেছিলো—পেলেটিয়ার সাহেবের খবর কি সাহেব?

বললাম—তোমার কথা গিয়ে বলবো তাকে।

তারপর একটু থেমে বললাম—বদলি হবে নাকি ছেদি?

ছেদি প্যাটেল বললে—আর বদলি হতে চাই না সাহেব, বেশ আছি এখন। এবার মকাই দিয়েছিলাম ক্ষেতে—চল্লিশ টাকা আমদানি হয়েছে বেচে, ঘরের খেয়ে কোম্পানীর নোকরি করছি এখন, আর বিলাসপুরে যাবো না সাহেব—

বললাম—এখানে ডিউটি কেমন?

ছেদি প্যাটেল বললে—খুব হাল্‌কা ডিউটি সাহেব—বিলাসপুরে বড্ড কাজের ঝক্কি ছিল, গেট পাহারা দিতে হতো সারাদিন—এখানে ক্ষেতও দেখা হয়, গেটও পাহারা দিই—গাড়ি ঘোড়ার তেজটা কম এখানে—সাহেব লোকরা নেই—সব গেঁইয়া, ধমক দিলে কথা শোনে।

বললাম—তাই বুঝি এখানে এসে দু'টো বিয়ে করেছো?

ছেদি প্যাটেল হেসে উঠলো।

বললে—পয়সা হয়েছে এখন, একটু সুখ করবো না সাহেব?

ছেদি প্যাটেল আবার বললে—আমাদের পেলেটিয়ার সাহেব রিটায়ার করলো, চল্লিশ হাজার টাকা প্রভিডেন ফাণ্ড পেল, তারপর আবার এসেছিল চাকরি খুঁজতে।

বললাম—কোন্ পেলেটিয়ার সাহেব?

ছেদি প্যাটেল বললে—টিল্‌ডার পেলেটিয়ার সাহেব হুজুর। তার চেয়ে আমার অবস্থা ভালো, আমি তো সব গুছিয়ে রেখে গেলাম সাহেব—

চানার ডাল, মোটা লাল আটার রুটি, আলু পেঁয়াজের তরকারী আর মুরগির আণ্ডার ঝোল। বললাম—না-না ছেদি প্যাটেল, অনেক পিঠে খেয়েছি চায়েব সঙ্গে—

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগলো—হরিণ এসে সব চানা খেয়ে যায় সাহেব আমার ক্ষেত থেকে, হরিণগুলোকে সাবাড় করে দিন দিকি—আমি ডিউটিতে থাকি, আর বউ দুটোও মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ দেখলে মোটেই ভয় পায় না সাহেব ওরা—

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। একবাব মুরলী, একবাব সরস্বতীয়া দু'জনেই অনেকগুলো রুটি খাইয়ে দিলো। রামসহায় রাত্রে এসেছিল দেখতে। একটা হ্যারিকেন নিয়ে লাঠি হাতে এসেছিল।

বললে—হুজুর, যাবেন নাকি আজ রাতে?

বললাম—রাতটা থাক—কাল দিনের বেলা এসো, এই বিকেল নাগাদ—

সব মানুষের জীবনে বোধহয় কোথায় একটা ফাঁকি আছে। হয় হিসেবের ফাঁকি, নয়তো অনুভূতির ফাঁকি। সেই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই কখন সব সঞ্চয় যেমন অজ্ঞাতে একদিন জমা হয়, আবার নিঃশেষে একদিন তা খরচও হয়ে যায়। জানতে পারি না, কখন ঐশ্বর্যবান হয়ে গেছি, আবার কখন নিঃস্ব ফতুর হয়ে গেছি। এই যেমন ছেদি প্যাটেল। ভেবেছিল বিলাসপুর থেকে বদলি হয়ে টিল্‌ডায় এসে তার সঞ্চয়-বৃদ্ধি একেবারে উপচে পড়বে, তার সৌভাগ্য বোধহয় অভ্রভেদী হয়ে উঠবে! তার চল্লিশ বিঘে ক্ষেতি-খামার। তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড—এত ঐশ্বর্য, এ যেন সে আস্তে-আস্তে তারিয়ে তারিয়ে চেখে-চেখে ভোগ করবে। কিন্তু তখন কি জানতো যে সরস্বতীয়া তার সমস্ত ঐশ্বর্যের মর্মমূলে এমন করে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত করবে?

কিন্তু সে কথা এখানে বলবার নয়।

সরস্বতীয়া আমার বিছানা-টিছানা ঠিকঠাক করে রেখে দিয়েছিল। আমি গিয়ে শুয়ে-শুয়ে অনেক কথাই ভাবছিলাম। ছেদি প্যাটেলেব বাড়িতে একদিন আমাকে শয্যাগ্রহণ করতে হবে, এ-কথা আমিই কি কোনোদিন ভেবেছিলাম নাকি?

ক্রমে অনেক রাত হয়ে এলো। কদমকুঁয়ার ছেদি প্যাটেলের বাড়িতেও ক্রমে-ক্রমে সব শব্দ থেমে এলো। তারপর মাথার ওপর দিয়ে একটা হরিয়ালের কর্কশ ডাক পূব-পশ্চিমে অনেক দূরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। ছেদি প্যাটেলের চানার ক্ষেত থেকে হয়তো বুনো শূয়োরের ভোঁতা শব্দ কানে এসে লাগলো! কিংবা হয়তো সবই আমার মন-গড়া। আমার শিকারী মন হয়ত মিছিমিছিই সব জায়গায় শিকার খুঁজে বেড়ায়। সামান্য একটা পাখীর শব্দকে নেকড়ের ডাক বলে মনে হয়। ডি-কষ্টা সাহেবের কথাও মনে পড়লো।

সাহেব বলতো—শিকারীদের ঘুমের মধ্যেও কেয়ারফুল থাকতে হবে।

ডি-কষ্টা সাহেবের কথা আলাদা। শিকার আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়! কবে একদিন কি খেয়াল হয়েছিল—খেয়ালের বশে একটা বন্দুক কিনেছিলাম। অবসর পেলে এই বন্দুক নিয়ে বেবোতাম। এখন ওসব ছেড়েই দিয়েছি। এখন সে বন্দুক কোথায় চলে গিয়েছে, কাকে বেচে দিয়েছি তারও নাম ঠিকানা মনে নেই। বিলাসপুর ছাড়বাব সঙ্গে-সঙ্গে শিকারের সে সব কাহিনী মন থেকেও মুছে ফেলেছি। শুধু মনে আছে কদমকুঁয়ার সেই ছেদি প্যাটেলের কথা, ছেদি প্যাটেলের বউ সরস্বতীয়া আর মুরলীর কথা। আর সমস্ত কথা কবে ভুলেই গেছি।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই উঠোন ঝাঁট দেবার শব্দ পেলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখি ছেদি প্যাটেলের প্রথম পক্ষের বউ মুরলী উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। সকালের আলোয় ভালো করে দেখলাম বউটাকে। চেহারাটা ভালো নয় মোটেই। বছর চল্লিশেক বয়স হবে। উঠোন গোবর দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে এরই মধ্যে। ছেদি প্যাটেলের নাইট-ডিউটি ছিলো। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরই সে চলে গেছে গেট পাহারা দিতে। হয়ত এখুনি এসে পড়বে। উঠবো-উঠবো ভাবছি।

হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে সরস্বতীয়ার গলার শব্দ কানে এলো।—মুরলী, সাহেবকে চা দিয়ে আয়!

দেখি রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায় বসে চা বানাচ্ছে সরস্বতীয়া। রাত্রের সে সরস্বতীয়াকে আর চেনাই যায় না। এরই মধ্যে স্নান করা হয়ে গেছে। সিঁদুর দিয়েছে মোটা করে। সবুজ একখানা হাতে-বোনা শাড়িও পরেছে। আবার ডাকলো মুরলীকে—ওরে চা নিয়ে যা সাহেবের—

মুরলী বললে—আমি পারবো না, তুই নিয়ে যা—

সরস্বতীয়া বললে—আমার হাতের চা কাল সাহেবের ভালো লাগেনি—তুই নিয়ে যা!

মুরলী বললে—আজ ভালো লাগবে—

সঙ্গে সঙ্গে আমার দরজায় ঘা পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি দরজার হুড়কোটা খুলে দিলাম। সরস্বতীয়া দেখি মুখ টিপে হাসছে আমার দিকে চেয়ে। বললে—আমার হাতের চা খাবে সাহেব?

বললাম— কেন, তোমার হাতে খেতে দোষ কি?

সরস্বতীয়া হাসি চাপতে না পেরে দৌড়ে চলে গেলো! আর রান্নাঘরের কাছে গিয়ে সে কি হাসি। দু'জনেই হাসছে খুব। হাসি একবার চাপে তো আবার হাসে। হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়বার জোগাড়। দুই বউতে খুব হাসি হেসে নিল একচোট।

তারপর এক বাটি চা নিয়ে আমার ঘরে এল আবার।

বললাম—ও-কথাটা জিজ্ঞেস করছিলে কেন সরস্বতীয়া?

সরস্বতীয়া অবাক হয়ে গেল। বললে—কোন্ কথাটা সাহেব?

বললাম—ওই যে তোমার হাতে চা খাবো কি না?

সরস্বতীয়া আবার হাসলো।

বললে—কাল সন্ধ্যাবেলা যে তুমি সব চা-টা খাওনি সাহেব—

বললাম—কাল খাইনি অন্য কারণে, পিঠে খেয়ে আমার পেট ভরে গিয়েছিল—তা তোমাদের সেজন্যে অত হাসি কিসের?

সরস্বতীয়া আবার সামনের চৌকাঠের ওপর হঠাৎ বসে পড়লো।

বললে—হাসবো না তো কি! আমার মরদ যে বাড়িতে নেই—

বললাম—তোমার মরদ থাকলে বুঝি হাসলে বকে?

সরস্বতীয়া হেসে বললে—বুড়োমানুষ তো, বুড়োরা হাসির কি বুঝবে সাহেব, তুমিই বলো না?

বললাম—বুড়োমানুষ হলেই বা, তোমারই তো স্বামী, স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হয়—স্বামীর কথা শুনতে হয়—স্বামী যা বলে তাই করতে হয়—

সবস্বতীয়া বললে—আমি শুনতে যাব কেন—শুনবে ঐ মুরলী—

অবাক হলাম কথা শুনে। বললাম—মুরলী একলা শুনবে কেন? তোমারও শোনা উচিত—তুমিও তো বউ—

সরস্বতীয়া বললে—আমি বউ না ছাই—

বললাম—সে কি, তুমি বউ নও?

সরস্বতীয়া বললে—আমি বুঝি বউ ওর? মুরলী তো ওর আসল বউ। মুরলীকেই তো আমার মরদ সাদি করেছে ঠিক-ঠিক—

—আর তুমি?

সরস্বতীয়া বললে—আমি তো চুড়ি-পরানো বউ—

চুড়ি-পরানো বউ? কথাটা কেমন বুঝতে পারলাম না।

বললাম—তার মানে?

সরস্বতীয়া হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—মুরলী—

মুরলী বোধহয় তখন সংসারের কাজ করছিলো! সকালবেলা সংসারের অনেক কাজ থাকে। সরস্বতীয়ার মত গল্পবাজ মেয়ে সে নয়।

বললাম—কেন, মুরলীকে আবার ডাকছো কেন? কাজ করছে হয়তো।

সরস্বতীয়া বললে—কাজ না ছাই। কিসের কাজ আবার—চা করা আর ভাত রাঁধা—ও এমন কি কাজ, সবাই করতে পারে।

বললাম—তুমি তো কই কাজ করো না, সকাল থেকে তো দেখছি কেবল খিল্‌খিল্‌ করে হাসছো—মুরলীই তো সব কাজ করে দেখছি।

সরস্বতীয়া ঠোঁট উল্টালো। বললে—ইস্‌, কাজ করি না আমি? আমার বুঝি কাজ নেই। আমি ভোরে উঠে চান করে কাপড় কেচে জল তুলে এনেছি তালাও থেকে—তারপর চা করেছি—

বললাম—চা করা কি একটা কাজ নাকি?

সরস্বতীয়া বললে—চা করা কাজ নয়? কাল ডিউটিতে যাবার আগে মরদ আমায় কি বলে গেছে, জানো?

বললাম—কী বলে গেছে?

সরস্বতীয়া বললে—বলে গেছে, সকালবেলাই তোমার চা করে দিতে। তুমি বুঝি রেলের বড় অফিসার।

বললাম—সেইজন্যেই বুঝি সকালবেলাই চা দেবার এত তাড়া!

সরস্বতীয়া বললে—আমি মুরলীকে বললাম, তোমাকে চা দিতে—ও আমাকে বললে চা দিতে।

বললাম—সেইজন্যেই বুঝি সকালবেলা অত হাসির ধূম?

সরস্বতীয়া বললে—কেন আমি চা দেব? আমি এ বাড়ির কে শুনি?

—সে কি? তুমি এ বাড়ির কেউ না?

সরস্বতীয়া বললে—আমি তো চুড়ি-পরানো ডৌকি—আসল ডৌকি তো না—

—তার মানে?

আবার অবাক হলাম। চুড়ি-পরানো ডৌকি মানে কী!

সরস্বতীয়া চৌকাঠের ওপর বসেই চীৎকার করলে—মুরলী, ও মুরলী—

এবার মুরলী এল। বললে—কী বলছিস বল?

সরস্বতীয়া বললে—'চুড়ি-পরানো ডৌকি' কাকে বলে তাই জিজ্ঞেস করছে সাহেব, তুই বুঝিয়ে দে তো।

মুরলীও হেসে উঠল এবার। বললে—তুমি কেন হাসছিলে সাহেব কাল?

বললাম—কখন?

মুরলী বললে—কাল বিকেলে যখন তুমি এলে।

বললাম—তোমরা দু'জনে সারাদিন ঝগড়াও করো, আবার দু'জনের খুব মিলও দেখলাম—তাই হাসছিলাম—তা তোমরা এত ঝগড়া করো কেন? ছেদি প্যাটেলও বলেছিলো আমাকে...

মুরলী বললে—সে তো সাহেব সরস্বতীয়ারই জন্যে—ওর জন্যেই আমার যত ভোগান্তি—ও যদি আমার কথা শুনতো তাহলে কি আমার কপালে এত দুঃখ থাকতো?

সরস্বতীয়া দাঁড়িয়ে উঠলো। চিৎকার করে বললে—সরস্বতীয়ার দোষ! সরস্বতীয়ার দোষ কিসে? সরস্বতীয়া কি ওই বুড়োর বিয়ে-করা বউ, যে তোর মত মুখ বুঁজে সব সইবে? তুমি ভোগো কেন? তোমাকে কে ভুগতে বলেছে আমার জন্যে?

মুরলী বললে—তুই এই কথা বললি আমাকে? তোর জন্য ভুগি কেন?

সরস্বতীয়া বললে—বলবো না? তুমি কেন আসো আমাকে জ্বালাতে?

মুরলীও রেগে গেল। বললে—তোর কিসের জ্বালা রে? তুই যদি আমার দুঃখ বুঝতিস্ তো আমার ভাবনা?

সরস্বতীয়া বললে—তোমার দুঃখ বুঝতে আমার বয়ে গেছে! তুমি আমার কে শুনি?

মুরলী বললে—কেউ নই? এই কথা তুই বললি আমাকে?

সরস্বতীয়া বললে—কেন বলবো না। একশোবার বলবো, হাজার বার বলবো—তুমি আমার কে যে, তোমার দুঃখ আমি বুঝবো? তুমি আমার দুঃখ কখনও বুঝেছ? বুঝতে চেয়েছ কখনও?

মুরলী বললে—আমি তোর দুঃখ বুঝিনি? তুই বলছিস কি?

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ বুঝেছ, ছাই বুঝেছ, বুঝলে আর এমন করতে না আমায়, এমন করে আমার গলা টিপে মারতে চাইতে না—আমায় তো তোমরা দু'জনে মিলে মেরে ফেলবার মতলব করেছ—আমায় পাগল করে দেবার মতলব করেছ—

বলতে-বলতে সরস্বতীয়া হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলে। শেষে বুঝি নিজের কান্না এড়াবার জন্যেই হঠাৎ আমার ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে বাইরে গিয়ে লুকোলো—

সরস্বতীয়ার এই ব্যবহারে আমি কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম।

মুরলীর দিকে তাকালাম!

মুরলী বললে—দেখলে তো সাহেব? দেখলে তো তুমি নিজের চোখে?

বললাম—কেন? কাঁদলো কেন ও?

মুরলী বললে—কেন কাঁদলে তা ওকেই জিজ্ঞেস করো না সাহেব।

বললাম—তোমাদের দু'জনকে ঘরে এনে ছেদি প্যাটেলের তো খুব সুখ দেখছি—তোমরা যদি মিলেমিশে সংসার না করতে পারো, তো কেমন করে চলবে...সে বেচারা দিনরাত খেটে এত টাকা জমিয়েছে—ক্ষেত-খামার করেছে—সব যে নষ্ট হয়ে যাবে—তা বোঝো না—

সরস্বতীয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। বললে—নষ্ট হবে, বেশ হবে—নষ্ট হোক্, পড়ে যাক্—তাতে আমার কি। বুড়োর টাকা আছে তাতে আমার কি?

বললাম—ও কথা বলতে নেই সরস্বতীয়া—কে তোমাদের খেতে-পরতে দিচ্ছে, কে তোমাদের এতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছে?

সরস্বতীয়া মুরলীর দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—সুখ তো আমার ভারী। সুখের আর সীমা নেই আমাদের—বলুক না মুরলী...বল্ না তুই বুড়ো আমাদের সুখে রেখেছে কিনা বল—

মুরলী বললে—তুই চলে গিয়েছিলি—আবার এলি কেন শুনি?

সরস্বতীয়া বললে—কেন আসবো না, একশোবার আসবো, হাজারবার আসবো, আমার যতবার খুশি আসবো—তুই বলবার কে?

মুরলী আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখছো তো সাহেব, সরস্বতীয়ার কাণ্ড—একে পাগল বলবো না কি বলবো?

সরস্বতীয়া লাফিয়ে উঠলো। বললে—আমি বুঝি পাগল? আমাকে পাগল বলা? আমি যদি পাগল হই, তবে তোমরাই তো আমাকে পাগল করেছ—এই তুমি, তুমি আমাকে পাগল করেছো—আমি কি পাগল ছিলাম? তোমাদের সংসারে এসে পাগল হয়েছি আমি—

বলতে বলতে আবার চলে গেল সরস্বতীয়া আমার ঘর থেকে। এরপর আমিও মুরলীর দিকে চাইলাম, মুরলীও আমার দিকে চাইলো। কেউই কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলাম না।

মুরলী বললে—দেখলে তো সাহেব?

কিছু বলতে পারলাম না। কোনও কথা বেরোল না আমার মুখে।

মুরলী বললে—সেই বুড়ো মানুষ সারাদিন ডিউটি করে আসছে তো, এখন যদি তার কানে তুলি এসব কথা তো মনটা কেমন হয়, বলো তো সাহেব?

এবারও কোনও কথা বলতে পারলাম না। কোনও উত্তর যেন এলো না আমার মুখে। আমার কি-ই বা বলবার ছিলো। দু'দিনের জন্যে কদমকুঁয়ায় এসেছি, আবার চলে যাবো নিজের কাজ সেরে। দরকার কি এদের সংসারের মধ্যে মাথা গলিয়ে। আমি কে? এই ছত্রিশগড়ী পরিবারের অন্দরমহলের সমস্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি! ওদের সমস্যা ওদেরই সমস্যা হয়ে থাক্। আমি কেন তার মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটাই। কী দরকার ওদের মধ্যে থেকে? আমি এখান থেকে চলে যাবো। এদের বিষয় নিয়ে আমার কৌতূহল দেখানো ভালো নয়। ছেদি প্যাটেলকেও এ নিয়ে উপদেশ দিতে যাওয়া বৃথা! সত্যিই তো, আমি ওদের কে?

সকাল হয়েছে। এখনই হয়ত ছেদিলাল এসে পড়বে। তার নাইট-ডিউটি এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে হয়তো। এখনও হয়ত তার রিলিভার আসেনি। এখনও হয়ত রিলিভারের জন্যে অপেক্ষা করছে। টিল্‌ডার গেট ছেড়ে ছেদিলাল বাড়ি চলে আসতে পারে না! রিলিভারকে গেট-এর চাবি, গুমটির চাবি লাল-সবুজ ঝাণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

নিজের বন্দুকটাও ঠিক করে নিলাম। বারো বোরের বন্দুক। ডি-কষ্টা সাহেব নিজে দেখে শুনে কিনে দিয়েছিল। টোটাও কিছু পুরে নিলাম ঝুলিতে। রামসহায় এখুনি এসে পড়বে। দরকার নেই এখানে থেকে। রামসহায়ের বাড়িতেই থাকবো।

ভেতরে হঠাৎ মুরলীর গলা শুনতে পেলাম। মুরলী বলছে—সাহেবের কাছে যা তো সরস্বতীয়া—সাহেব তোর ওপর রাগ করে চা খায় নি—

সত্যিই আমি চা খাইনি। সরস্বতীয়া এলো কাছে। আমার চায়ের কাপের দিকে চেয়ে বললে—তুমি যে চা খেলে না সাহেব?

বললাম—আমি খাবো না এখানে চা—কোন কিছুই খাবো না—

—কেন?

সরস্বতীয়া যেন করুণ হয়ে উঠলো আমার দিকে চেয়ে।

বললাম—তোমরা দু'জনে এত ঝগড়া-ঝাঁটি করো—আমার এখানে থাকতে একদম ভালো লাগে না, আমি চলে যাবো রামসহায়ের বাড়ি—

সরস্বতীয়ার দিকে চেয়ে দেখলাম। সত্যিই সরস্বতীয়ার কচি মুখখানা যেন শুকিয়ে উঠেছে। আস্তে-আস্তে বললে—তুমি থাকো সাহেব, আমি আর ঝগড়া করবো না—

বললাম—না সরস্বতীয়া, দরকার কী তোমাদের মধ্যে থেকে? তোমরা ঝগড়া করো, ঝাঁটি করো, যা ইচ্ছে তাই করো তোমরা, মরদের সেবা করো না করো, আমার দেখবার দরকার কী? আমি তো দু'দিনের জন্যে এসেছি, আবার চলে যাবো কাল-পরশু—আমার এ-সব অশান্তির মধ্যে থেকে লাভ কি?

সরস্বতীয়ার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। মুখখানা আরো গম্ভীর হয়ে গেছে মনে হলো। এতক্ষণ হাসিখুশি যে মুখে ছিল, সেই মুখই যে আবার এ-রকম হতে পারে, তা ভাবা যায় না।

বললাম—তোমরা দু'বউতে ঝগড়া করবে, করো না—আমি থাকলে মিছিমিছি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে—আমি চলে গেলে, আমিও বাঁচি, তোমরাও বাঁচো—এখন দেখছি ছেদিলালের কথায় রাজি হওয়াটাই আমার অন্যায় হয়েছে।

সরস্বতীয়া গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখনও। বললাম—আমার বিছানা বেঁধে দাও বরং, রামসহায় এলেই চলে যাবো এখান থেকে—তোমাদের আর আমার জন্যে চা করতে হবে না, রুটি করতে হবে না—

এবার হঠাৎ সরস্বতীয়া কথা বললে। বললে—আমাকে মাপ করো সাহেব, আমি আর ঝগড়া করবো না।

বললাম—ঝগড়া করবে না বলছো, কিন্তু হয়তো এখুনি আবার ঝগড়া শুরু করে দেবে।

সরস্বতীয়া বললে—না সাহেব, আমি বলছি, আর মুরলীর সঙ্গে ঝগড়া করবো না—তুমি চা-টা খেয়ে নাও—তারপর হঠাৎ আঁচলের তলা থেকে একটা চালের মেঠাই বার করে মুখে দিয়ে কামড়ালো।

বললে—এই দেখ সাহেব, মুরলীর বানানো মেঠাই আমি খেলুম—মানে ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেলো, এবার তুমি চা খেয়ে নাও—

হেসে বললাম—চা আমি খেলাম, কিন্তু তোমার কথা যেন ঠিক থাকে—

সরস্বতীয়ার মুখে দেখি আবার হাসি ফুটে উঠেছে—আবার যেন আগের দিনের মতনটি হয়ে উঠেছে। আবার আগের দিনের মতন হেসে বুঝি এখনি গড়িয়ে পড়বে রান্নাঘরে গিয়ে।

সত্যি আমার চা খাওয়া-না-খাওয়ার ওপর যেন এতক্ষণ তার জীবন-মরণ নির্ভর করছিল, এমনি ভাব। অথচ কত সহজে কত অনায়াসে সরস্বতীয়া আবার আপন হয়ে গেল। সত্যি, কত দেশে-বিদেশে আমাদের কত আপনজন থাকে। আমি তাদের চিনি না—যেদিন চিনতে পারবো, মনে হবে তারা যেন কতকালের চেনা, কত-যুগের পরিচিত! জীবনে আরো কত ঘাটে আমাদের নৌকো ভিড়বে, কত দেনা-পাওনা থাকবে, কে বলতে পারে!

হঠাৎ ছেদি প্যাটেল এসে পড়লো হুড়মুড় করে। হাতে লাঠি, লণ্ঠন। লণ্ঠনটা নেভানো। ডিউটিতে যাবার সময় জ্বেলে নিয়ে গিয়েছিল।

বললে—সাহেবকে চা করে দিয়েছিস, মুরলী--

বলতে-বলতে আমার ঘরে এসে ঢুকলো সোজা। বললে—চা খেয়েছেন হুজুর? ওরা খাবার-টাবার দিয়েছে তো? রাত্রে ঘুম হয়েছিলো ভালো করে?

বললাম—কোনও কষ্ট হয়নি ছেদি, তুমি কিছু ভেবো না—

ছেদি প্যাটেল বললে—সাহেব আপনি জানেন না, ও দু'টো কী মানুষ,—মানুষ নয় হুজুর, কেবল দিনরাত ঝগড়া করতে জানে আর মারামারি, চুলোচুলি করতে জানে। মেহমানের খাতির ওরা জানবে কি করে?

বললাম—না ছেদি, ওরা চা দিয়েছে, খাবার দিয়েছে—

ছেদিলাল বললে—রাতে ঘুমোতে পারিনি মোটে সাহেব, মাথাটা দপ্-দপ্ করছে—

বললাম—কেন, অনেক গাড়ি ছিল বুঝি?

ছেদি প্যাটেল বললে—দু'টো ইস্‌পিশ্যাল আর দু'টো ডাক গাড়ি—একেবারে জান্ খেয়ে দিয়েছে মাস্টারবাবু—

খানিক পরে রামসহায় এসে গেল। যাবার আগে ছেদি প্যাটেল বললে—আজ থেকে আমার নাইট-ডিউটি খতম সাহেব, রাত্রে অনেক গল্প করবো একসঙ্গে—আজকে খাসি কাটবো, দেরি করবেন না বেশি—

শিকার যে আমার শখের জিনিস, তা আগেই বলেছি। নেশাও নয়, পেশাও নয়। কিন্তু কদমকুঁয়ায় শিকার করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিলো, তাতেই আমার খরচ-মেহনত সব উসুল হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, সারা গায়ে কাদা-মাটি মেখে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যে। রামসহায় আগেই এসে ঝুলি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

সরস্বতীয়ার দেখি আর এক রূপ তখন। খোঁপায় ফুল গুঁজেছে। বেল কাঁটা গেঁথেছে। আমি ঘরে আসতেই সরস্বতীয়া ঘরে এল।

বললে—কী শিকার মিললো সাহেব?

বললাম—শিকার কিছু পাইনি আজ।

হঠাৎ সরস্বতীয়া বললে—সাহেবের সাদি হয়েছে?

সাদি! সাদির কথা কেন জিজ্ঞেস করছে!

বললাম—সাদির কথা জিজ্ঞেস করেছো কেন?

সরস্বতীয়া বললে—তবে হরিণ-ছানাটা ছেড়ে দিলে কেন সাহেব?

বুঝলাম, রামসহায় আমার আগে এসে সব কথাই বলে গেছে।

হেসে ফেললাম—রামসহায় বলেছে বুঝি?

বেম্নারির জঙ্গলের মধ্যে জলার ধারে ঝোপের আড়ালে বসেছিলাম আমি আর রামসহায়। পালে-পালে হরিণ আসছে কচি কচি ঘাস খেতে। সে এক দৃশ্য বটে। ঠিক দুপুরবেলা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। তবু যেখানটায় বসেছিলাম, সেখানটায় ঝোপে-জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে ছিল।

রামসহায় বললে—মারুন হুজুর—

চুপ করতে ইঙ্গিত করলাম রামসহায়কে। তখন একটু শব্দ করলেই সবাই পালিয়ে যাবে। আস্তে-আস্তে বন্দুকটা নিয়ে এগোতে যাচ্ছিলাম। মাঝখানে একটা শিঙেল হরিণ ছিল তাকে লক্ষ্য করে বন্দুকটা উঁচিয়েছিলাম, হঠাৎ রামসহায়ের গলার আওয়াজে সবাই দৌড় দিলে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব। সব আয়োজন নষ্ট হলো। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা লক্ষ্য করে মারলে একটা না একটা পড়তো ঠিকই, কিন্তু তাতে আনন্দ পেতাম না। ঠিক যেটাকে লক্ষ্য করেছি, সেটা না পড়লে যেন আনন্দ হয় না!

রামসহায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ছোট্ট দু'মাসের বাচ্চা হরিণ পাঁকের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়-যায়! যতবার পালাতে যায়, ততবার ডুবে যায় পাঁকের ওপর। ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লাম, বাচ্চাটার ওপর। ঠ্যাংটা ধরে কাঁধে তুলে নিলাম। সারা গা কাদা হয়ে গেল।

রামসহায়ের খুব আনন্দ। বলল—ছেদি প্যাটেলের আজ খুব সুখ হবে হুজুর—

বললাম—কেন?

রামসহায় বললে—কচি হরিণের মাংস বুড়ো খুব খাবে—বুড়োর নোলা আছে খুব!

কাঁধের ওপর বাচ্চাটা ছটফট্ করছিল। হঠাৎ পাশেই একটা ঝোপের দিকে কেমন একটা শব্দ হলো—চেয়ে দেখি একটা বড় মাদি হরিণ নির্ভয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

রামসহায় দেখতে পেয়ে বললে—হুজুর—আর একটা—

কিন্তু তখন আর বন্দুক ছোঁড়বার. উপায় নেই! বাচ্চাটা আমার কাঁধে। রামসহায়ের তাড়াহুড়োতে হরিণটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। একটা সরসর করে শব্দ হলো শুধু। বেম্মারির জঙ্গলে ঝোপে একটা শিরশির শব্দ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো। কোথাও কোনও দিকে হরিণের সাড়া শব্দ নেই। এপাশে-ওপাশে চেয়ে দেখলাম শুধু বুনো ঝাউ আর মহুয়ার বন, দূরে কয়েকটা চানা-ক্ষেত। ক্ষেত কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে একটা-দুটো ক্ষেতে বড়-বড় ঘাস জম্মেছে। জলার আশেপাশে শালুক আর নলখাগড়া। থম্‌কে পড়া জল। দুর্গন্ধ। স্রোত নেই, তরঙ্গ নেই। এই একটু আগেই পাল-পাল হরিণ এখানেই জল খেতে এসেছিল, আবার তারা কোথায় চলে গেছে! তাদের চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। বাতাসে তাদের স্পর্শ গন্ধ কিছু নেই। আরো কয়েক মাইল পথ গেলে, তবে কদমকুঁয়া। সারাদিন পরিশ্রম গেছে খুব। মাথার ওপর রোদ্দুর নেমেছে এবার। কাদা-জল-মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছি আমি আর রামসহায়। হঠাৎ পাশে যেন আবার শব্দ হলো।

রামসহায় বললে—সেই বড়ো হরিণটা হুজুর—

চকিতে ফিরে চেয়ে দেখি সত্যিই তাই। কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আমার কাঁধের ওপর বাচ্চাটা রয়েছে—তার দিকেও যেন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই, কিছু নেই। মনে আছে সেদিনের সেই হরিণটার দৃষ্টিতে যেন বড় এক জাদু ছিল।

রামসহায় বললে—বাচ্চাটা আমাকে দিন, হুজুর—আপনি বন্দুক ধরুন, আবার আসবে ও—

রামসহায়ের হাতে বাচ্চাটা দিলাম। সে সেটাকে জাপটে ধরে রইল জোর করে। আমরা চারদিকে চেয়ে-চেয়ে চলতে লাগলাম এবার! জলা-জমি পেরিয়ে এবার ডাঙায় উঠে এসেছি। সারা শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। যখুনি ছায়ায় এসে দাঁড়াই শরীরটা যেন জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ একটা ঝোপের পাশেই আবার শব্দ হলো—খস্-খস্-খস্—

রামসহায় চুপি-চুপি বললে—ওই আবার এসেছে হুজুর—

এত কাছে! এত কাছে তো কোনও হরিণ কোনও শিকারীর কাছে আসে না। মনে হলো, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে কি বলছে।

রামসহায় বললে—দেরি করবেন না—মারুন, মেরে দিন—

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। রামসহায় পাশেই চুপ করে হরিণটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিণটাও আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিলো।

রামসহায় আবার বললে—মারুন, মারুন,—দেরি করবেন না—

মনে আছে, সেদিন সেই হরিণটার দিকে কিছুতেই বন্দুক ছুঁড়তে পারিনি। বারো বোরের বন্দুকটা যেন হঠাৎ বড় ভারি মনে হয়েছিল আমার কাছে। আস্তে-আস্তে বন্দুকটাও নামিয়ে ফেললাম। মনে হলো—হরিণটার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে—আর সঙ্গে-সঙ্গে রামসহায়ের কোল থেকে বাচ্চাটা নিয়ে ছেড়ে দিলাম তার সামনে—

রামসহায় বললে—করলেন কি হুজুর—করলেন কি—

বাচ্চাটা ততক্ষণে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

কেন যে সেদিন বাচ্চা হরিণটাকে অমন করে ছেড়ে দিয়েছিলাম জানি না, কিন্তু অন্তরে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলাম এইটুকুই শুধু মনে আছে। শিকারের নেশা বেশি দিন ছিল না। বিলাসপুর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিকারের নেশাও ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে আজও। ওই সরস্বতীয়ার জন্যেই—

সরস্বতীয়া বললে—তোমার লেড়কার কত বয়স সাহেব?

বললাম—তোমার যখন ছেলে হবে তখন বুঝবে, মা'র কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিতে কেমন লাগে!

সরস্বতীয়া খিল-খিল করে হাসতে লাগল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে।

বললাম—হাসছো যে?

হাসির শব্দ শুনে মুরলীও এসে দাঁড়াল।

বললাম—দেখছো মুরলী, তোমাদের সরস্বতীয়ার হাসি দেখছো—

মুরলী বললে—থাম্-থাম্ পোড়ারমুখী, থাম্, অত হাসি কেন লো? হাসি বেরিয়ে যাবে তোর, আজ ওর দিন-ডিউটি, জানিস্ না—?

মুরলীর কথার মানে আমি বুঝতে পারলুম না! মানে কিছু হয়ত একটা ছিল। কথাটা শুনেই সরস্বতীয়া যেন কেমন ভয়ে আঁতকে উঠলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে হাসি থামিয়ে ভেতরে পালিয়ে গেল। বললাম, দিন-ডিউটির কথা শুনে অমন করে পালিয়ে গেল কেন?

মুরলী বললে—পোড়ারমুখীর মরণ হয়েছে সাহেব, পোড়ারমুখীও মরবে, আমাকেও মেরে ফেলবে, দেখে নিও—

টিল্‌ডা এক অদ্ভুত জায়গা! শুধু টিল্‌ডা নয়। রাজনন্দ্‌গাঁ, হাতবান্ধ, ডোঙ্গরগড—ছত্রিশগড়ের সব জায়গাই অদ্ভুত। লোকে কথায় বলে—ছত্রিশ স্বামীর ঘর করলে তবে ছত্রিশগড়ী মেয়ের জীবন সার্থক হয়—যৌবন ধন্য হয়! প্রথম যখন বিলাসপুরে এসেছিলাম স্টেশনের প্ল্যাটফরমে মেয়ে-কুলি দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হাটে-বাজারে মেয়ে-কুলি। গোলগাল চেহারা, নধর গড়ন। আর পুরুষগুলো ক্ষয়া-ক্ষয়া, রোগা-রোগা, কুৎসিত।

বিলাসপুরের ডাক্তার সিন্‌হা বলেছিলেন—এখানকার জল হাওয়ার গুণ এটা মশাই, এখানে এলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায়—পুরুষদের চেহারা খারাপ হয়ে যায়—

বলেছিলাম—কেন?

'কেন'-র উত্তর ডাক্তার সিন্‌হা দিতে পারেন নি। আমিও 'কেন'র উত্তর পাইনি কোনও দিন! দেখছি দিনের পর দিন মেয়েরা মাথায় মোট বয়ে-বয়ে বেড়িয়েছে, রাত্রে রঙিন শাড়ি পরে মদ খেয়েছে পেট ভবে। কোথা থেকে যে এত যৌবন, এত স্বাস্থ্য পেতো ওরা, কে জানে। রায়পুরে গেছি, মনেন্দ্রগড়ে গেছি, মাল নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি নির্দিষ্ট জায়গায়—একটা মালও খোয়া যায়নি। বাজারে গিয়ে হাটের মধ্যে সাইকেল রেখে দু'ঘণ্টা ধরে বাজার করেছি— কেউ ছোঁয়নি সে সাইকেল। বুঝলাম—ছেদি প্যাটেলের এই যে বোল-বোলা, সব ওর বউদের জন্যে। সকালবেলাই ওর বড় বউ যে কাজ করতে নামে—আর থামে সেই রাত্রে। ছেদি প্যাটেলের *সাতদিন দিন-ডিউটি, আর সাতদিন রাত-ডিউটি। সাতদিন দিনের বেলায় কাজ আর সাতদিন* রাতের বেলায়। রাত্রে ছেদি প্যাটেল বললে—এবার আমিও আপনার সঙ্গে বিলাসপুরে যাবো সাহেব।

বললাম—কেন? বিলাসপুরে তোমার কী কাজ?

ছেদি বললে—বিলাসপুরে চানার দর ভালো উঠেছে শুনেছি—

বললাম—কোথায় বেচো তুমি চানা

ছেদি প্যাটেল বললে—রায়পুরে, রায়পুরের মাড়োয়ারী মহাজন ভালো দর দেয় না—

বললাম—ভালো দর দেয় না কেন?

দর কেন দেয় না, তা ছেদি প্যাটেল খুলে বললে আমাকে!

বললে—আমরা যে লিখিপড়া জানি না সাহেব, মহাজন আমাদের দাদন দেয়, চাষের আগে টাকা দেয়, তারপর ক্ষেতি হলে আপোস হয়ে যায়—

বললাম—তা তুমি টাকা নাও কেন আগাম? তোমার অভাব কি?

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই সরস্বতীয়া। সরস্বতীয়াকে দেখেন নি—

বললাম—ওর জন্যে মাড়োয়ারীর কাছ থেকে আগাম নিয়েছিলে?

ছেদি প্যাটেল বললে—হ্যাঁ সাহেব, টাকা আমার দরকার ছিলো না, কিন্তু দরকার ছিল সরস্বতীয়ার বাবার—

বললাম—সরস্বতীয়ার বাবা কে?

সরস্বতীয়ার বাবার গল্পও বললে ছেদি প্যাটেল। সেই গল্পটা শুনুন।

রাজনন্দ্‌গাঁ এখান থেকে সাত মাইল দূর। সাত মাইল দূরে ছেদি প্যাটেল গিয়েছিল ছট্‌-পরবের মেলা দেখতে। হলুদ-ছোপানো কাপড় পরে ওই সরস্বতীয়ার বাপ জেঠু বাউত এসেছিল শনিচরির মেলায়। সেদিন ভিড়ে ভিড় হয়ে যায় মেলার মাঠ। ওই রাজনন্দ্‌গাঁ, ওই হাতবান্ধ্‌, ওই শিউ-তালাও, বুধনপুর থেকে দলে-দলে লোক আসে। কাঁদি-কাঁদি কলা, কুলোয় করে কড়ি আর ক্ষেতির চাল এনে পূজো দেয়। আড়পা নদীর ধারে গিয়ে পিদিম ভাসিয়ে আসে সার সার। সেই ভোর থেকে শুরু হয় তাদের পূজো—রাত ন'টা, দশটা পর্যন্ত সে-ভিড় কাটে না। রাস্তায় চলতে পারি না—এত ভিড়। বিলাসপুরেও আমি দেখেছি, রায়পুরে দেখেছি, ডোঙ্গরগড়েও দেখেছি। তেলেভাজার দোকান বসে যায় মেলা-তলায়। পাঁপড ভাজার গাদি লেগে যায় দোকানে-দোকানে। ছত্রিশগড়ী মেয়েদের ভিড়ে নড়বার জায়গাও পাওয়া যায় না। গায়ে গা ঠেকে যায়। গায়ে গা ঠেকে গেলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এ ওর গা টেপে, ও ওর গা টেপে। সেদিন তেল, সিঁদুর, হলুদ বেরোয় হাঁড়ি থেকে। কাঠের চিরুণি, আয়না বেরোয়। আঁট তেলে চপ্‌চপে করে খোঁপা বাঁধে। তেল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। এ গাঁয়ের প্যাটেলের সঙ্গে ও গাঁয়ের প্যাটেলের দেখা হয়। খবরাখবর আদান প্রদান হয়।

একজন বলে—তোমাদের শিউতালাও-এর খবর কি গো?

আর একজন বলে—তোমাদের বুধনপুরের খবর কি?

খবরাখবর নেবার বেশি সময় থাকে না। ছত্রিশগড়ের ধুলোয় ঝড় উঠে চোখে-মুখে ঢুকে পড়ে। ভিড়ের ঠেলায় কাছের মানুষ ছিট্‌কে চলে যায় দূরে। হলুদ-মাখা গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে নিজের মেয়ে পরের মেয়ে হয়ে যায়। ওই দিন ঘরের মেয়ে চিরকালের মত পরের বউ হয়ে যায়। সারা জীবনে আর তার পাত্তা পাওয়া যায় না। জোয়ান মেয়ে বাপ মায়ের সঙ্গে মেলায় এসে কোথায় হারিয়ে গিয়ে যে কার ঘরে ওঠে, আর কখনও তার হদিস পাওয়া যায় না। রাজনন্দ্‌গাঁর মেয়ে চলে যায় কদমকুঁয়ায়—কদমকুঁয়ার ছেলে চলে যায় শিউ তালাওতে! ওই দিন পসরা সাজিয়ে বসে শেঠজীরা। সোনা চাঁদির দোকানে গয়না সাজিয়ে বাহার করে। সেখানে

গিয়ে চুড়ি পরিয়ে নতুন বিয়ে হয় ছত্রিশগড়ী ছেলে-মেয়েদের। পাঁচ বউকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে স্বামী—হঠাৎ ভালো লাগলো আর একটা মেয়েকে। তখনই কথাবার্তা হয়ে গেল বাপ-মায়ের সামনে—শেঠজীর দোকানে গিয়ে রূপোর চুড়ি পরিয়ে দিলে দু'হাতে—সঙ্গে-সঙ্গে ছ'টা বউ হয়ে গেল। এক মুহূর্তে। পাঁচটা বউ নিয়ে মেলায় গিয়েছিল একটা মরদ—বাড়ি ফিরলো ছ-টা বউ নিয়ে।

বললাম—তুমি বুঝি চুড়ি পরালে সরস্বতীয়াকে?

ছেদি প্যাটেল বললে—হুজুর, মুরলীকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার চুড়ি পরানোর সাধ ছিল না মোটে—আমি বুড়ো হতে চললাম—আমার কী আর চুড়ি পরানো মানায়—

সেই কথাই বলেছিল জেঠু রাউত! রাজনন্দ্গাঁও-এর জেঠু রাউত।

জেঠু রাউতের ভাগ্যটা সত্যিই ভালো।

ছেদি প্যাটেল বললে—জেঠু রাউতের কপালটা ভালো সাহেব, মেয়েগুলো হয়েছে সব দুধের মতো সাদা ধপ্‌ধপে ফরসা—

সরস্বতীয়াকে দেখে সত্যিই ছত্রিশগড়ী সমাজের বলে মনে হয় না।

বললাম—হঠাৎ অত ফরসা হলো কেন ছেদি? জেঠু রাউত বুঝি খুব ফরসা—

ছেদি প্যাটেল বললে—কে জানে কেন ফরসা হলো অত! ওই মুরলীই তো ধরলো অত করে। বললে—ওকে চুড়ি পরাও, তোমার ফরসা বিটা হবে—

ফরসা ছেলের সাধের কথা শুনে হাসি এলো আমার। ছেদি প্যাটেলও খুব হাসতে লাগলো আমার সঙ্গে। আমিও যত হাসি, ছেদি প্যাটেলও তত হাসে। হাসির কথাই বটে। কালো তেল কুচকুচে ছেদি প্যাটেলের ছেলে দুধের মতো ফরসা হবে, ভাবলে হাসি হওয়াই স্বাভাবিক।

—ছেদি প্যাটেল বললে—ওই আমার মুরলীকে জিজ্ঞেস করুন হুজুর, আমার কোনও দোষ নেই, আমি তো বলেছিলাম—দরকার নেই মুরলী—

বললাম—তা থাক্ গে, তারপর?

ছেদি প্যাটেল বললে—তারপর শেঠজীর দোকানে গেলুম সাহেব। চুড়ি পরালুম, আর সরস্বতীয়াকে নিয়ে এলুম কদমকুঁয়ায় —

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তা ওর বাপ জেঠু রাউত কিছু বললে না? বুড়োর কাছে মেয়েকে দিতে আপত্তি করলে না?

ছেদি প্যাটেল অবাক হয়ে গেল। বললে—আপত্তিটা কেন করবে জেঠু রাউত? জেঠু রাউতের তো ক্ষেতি হয় নাই—ক্ষেতিটা তার কী বলুন?

বললাম—তার ফরসা মেয়েটা তোমার মত বুড়োকে দিয়ে দেবে তা বলে?

ছেদি প্যাটেল হাসলো। বললে—তেমনি পাঁচ কুড়ি টাকা যে দিয়ে দিলাম জেঠুর হাতে নগদ-নগদ?

ছেদি প্যাটেলের কাছেই শুনেছিলাম সে-ইতিবৃত্ত।

শেঠজীর তেজারতী কারবার। ছত্রিশগড়ী মেয়ে-মরদের লেনদেন সব তার হাতে। রাজনন্দ্গাঁয়ের স্টেশন-পটিতে তার গেঁহুর কারবার। গঁহু, চাউল, বাজরা, জোয়ার। বেলগাড়িতে

চালান যায় দূর-দূর দেশে। মুড়ি চালান যায় শালিমারে। আরমেনিয়াম ঘাটে যায় তামাক-পাতার চালান। শেঠ বনোয়ারী বললে সারা ছত্রিশগড়ের লোক চিনতে পারে তাকে। বিলাসপুরের হেড-অফিসে বনোয়ারীর লোক আছে, তার মাসোহারা বন্দোবস্ত আছে। এ মাসে বিশখানা ওয়াগন যাবে আরমেনিয়ান ঘাটে, ওমাসের তিরিশখানা ওয়াগন-পিছু রেল অফিসের বড়বাবু পাবে একশো টাকা, মেজোবাবু পাবে পঞ্চাশ টাকা। আর সবচেয়ে বড় ডি-টি-ও'র বাড়ি সরু চাল, খাঁটি গাওয়া ঘি, ময়দা সব বরাদ্দ আছে। শেঠ বনোয়ারীর ব্যবস্থা ভালো!

সেই বনোয়ারী শেঠ মেলার দিনে সেখানে গিয়ে দোকান পাতে। কখনও রাজনন্দ্‌গাঁয়ে, কখনও শিউ-তালাও-এ, কখনও রামটেক-এ। টাকা ধার দেয় ছত্রিশগড়ীদের গয়না বন্ধক রেখে। প্যাটেলের গয়না বন্ধক দিতে হয় না। হাতের টিপ-ছাপই যথেষ্ট। ক্ষেতের চানা আছে তাদের, ক্ষেতের অড়হর আছে তাদের। টাকা আদায়ের জন্য তাকে ভাবতে হয় না। বনোয়ারীর লোক গিয়ে ফসল ক্রোক করে! টাকা আদায় হয়ে যায়।

বনোয়ারী বললে—তোর কী চাইরে ছেদি প্যাটেল?

ছেদি প্যাটেল, মুরলী, জেঠু রাউত, জেঠু রাউতের মেয়ে সরস্বতীয়া সবাই দোকানে গিয়ে বসলো। রূপোর হাঁসুলী, রূপোর পয়জোর, রূপোর চুড়ি, সবই সার-সার দোকানে সিন্দুকে সাজানো আছে।

বনোয়ারী আবার বললে—কাকে চুড়ি পরাবি রে ছেদি?

ছেদি প্যাটেল বললে—পাঁচ কুড়ি টাকা চাই শেঠজী—টিপছাপ্ দেব—

বনোয়াবী যে সে-ও একবার সরস্বতীয়ার দিকে চাইলো। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করতে চাইলে পাঁচ কুড়ি টাকা দেবার মত গস্ত কী না। ফরসা রঙ মেয়েটার, দুধেব মতো ধব্‌ধবে। বছর ষোলো আন্দাজ বয়েস। পান খেয়েছে, শাড়িতে হলুদ ছুপিয়েছে। চুলে তেল মেখে আঁটখোঁপা বেঁধেছে। ছট্‌ফট্ করছে ছুঁড়িটা। যেন যৌবনের ছট্‌ফটানি ধরেছে।

বনোয়ারী চোখ ফিরিয়ে নিলে। ছত্রিশগড়ী মেয়েমানুষ অনেক দেখেছে। তবু। এ-ছুঁড়িটা যেন সস্তায় গস্ত হচ্ছে বলে মনে হলো তার।

বনোয়ারী বললে—পাঁচকুড়ি টাকা?

জেঠু রাউত বললে—পাঁচকুড়ি টাকার কমে আমি ছাডব না শেঠজী সাহেব—দেখো না আমার মেয়ের দিকে, চোখ মেলে দেখো—

বলে জেঠু রাউত মেয়েকে বললে—দাঁড়া, ঘুবে দাঁড়া—

সরস্বতীয়া ঘুরবে না। তবু এদেরও গোঁ কম নয়। ছেদি প্যাটেল তো আগেই ভালো কবে দেখে নিয়েছে। মেলার ভিড়ের মধ্যে গায়ে গা-ও ঠেকিয়েছে। মুরলীও দেখে শুনে পরখ কবে পছন্দ করে দিয়েছে। দেখে নি শুধু বনোয়ারী। কিন্তু বনোযাবী শেঠই তো টাকা দেবার মালিক। তাকেও তো দেখানো দরকার বটে। জেঠু রাউত বললে—ঘুরে দাঁড়া না সরস্বতীয়া—

সরস্বতীয়া খিল্‌খিল্ করে হাসছিলো এতক্ষণ। এবার রেগে গেলো।

—কী দেখবে আমায়, দেখুক না—বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো।

ছেদি প্যাটেল বললে—তা পাঁচকুড়ি টাকা বাপু তুমি একটু বেশিই নিচ্ছো জেঠু রাউত—পাঁচ কুড়ি টাকাটা কম হলো?

জেঠু রাউত বললে—আমার বউ নাই, এই একটি মেয়ে—বউ থাকলে না হয় আর একটা মেয়ে হতো—আর তো মেয়ে হবে না—মহাজনেব দেনা শোধ করতে হবে তাই বেচছি মেয়েকে, নইলে কী...

মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল।

জেঠু রাউত দর-কষাকষি দেখে তেতে উঠেছে। বললে—দেখা তো সরস্বতীয়া—ভালো করে ঘুবে দাঁড়িয়ে দেখা তো—

বলে জেঠু রাউত মেয়েকে হাত ধরে ঘুরিয়ে পেছনে ফিরিয়ে দিলে।

সরস্বতীয়া ঠোঁট উল্টে বললে—দেখলো তো এতক্ষণ, আবার কত দেখবে—

সরস্বতীয়া পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো।

জেঠু রাউত বললে—দেখো, মেয়ের গড়ন-পেটন দেখো—দেখছো গো প্যাটেল, শেষে বলতে পারবে না জেঠু রাউত মেলার ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি টাকার লোভে ঠকিয়ে দিয়েছে—বেশ ভালো করে চক্ষু জুড়ে দেখে নাও—তুমিও সাক্ষী থাকলে শেঠজী সাহেব।

সত্যিই সেদিন সাক্ষী ছিল সবাই। সবাইকে সাক্ষী রেখে ছেদি প্যাটেল সরস্বতীয়াকে ঘরে নিয়ে এসেছিল।

বনোয়ারী শেঠ গুনে-গুনে টাকা দিয়েছিল। পাঁচকুড়ি টাকা।

ছেদি প্যাটেল বললে, আমি পাঁচকুড়ি টাকা গুনে-গুনে শোধ করেছিলাম সাহেব, জেঠু রাউত সেই টাকা গুনে-গুনে ট্যাঁকে পুরে নিয়েছিলো, তবে ছেড়েছিলো সরস্বতীয়াকে—

বললাম—তারপর?

ফুরফরে মেয়েটা কোথায় কোন্ রাজনন্দ্গাঁ-র গ্রামে চানা ক্ষেতের মধ্যে ঘরে-ঘরে বেড়াতো। হয়তো বর্ষার দিনে তালাওতে জল তুলতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়তো মেঘ দেখে। মেঘের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটতো তার মন। এ-গাঁ থেকে ও-গাঁ। তারপর রেললাইন পেরিয়ে বুধনপুর ছাড়িয়ে টিল্ডার মিশনারী সাহেবদের আস্তানা টপ্‌কে অনেক-অনেক দূরে চলে যেত সরস্বতীয়া। যেখানে বেল্লারীর জঙ্গলের বুনো শূয়োর এসে শহরের ক্ষেত নষ্ট করে যায়, চানার চারা নষ্ট করে দিয়ে যায় হরিণের পাল—সেখানে চলে যেতো এক-একদিন।

জেঠু রাউত চীৎকার করে ডাকতো—সরস্বতীয়া, ও সরস্বতীয়া—

দূরে রেললাইন ধরে একটা মালগাড়ি আসছিলো ঝিক্-ঝিক্ করে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে-ছুটে হয়রান হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তো সরস্বতীয়া। তারপর গার্ডসাহেবের দিকে চেয়ে 'আয়-আয়' করে হাত নেড়ে ডাকতো।

জেঠু রাউত বলতো—সরস্বতীয়ার বিয়েতে পাঁচকুড়ি টাকা নেব।

তখন সরস্বতীয়া ছোট। বিয়ের কিছু বুঝত না। মিশনের বুড়ো পাদরি সাহেব এসে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো।

পাদরি সাহেব বলত—জেঠু রাউত, তোমার মেয়েকে মিশনে দাও। লেখাপড়া শিখবে, মানুষ করে নেবো ওকে আমরা।

জেঠু বলতো, মেয়ে আমার লেখাপড়া শিখে কী করবে পাদরিবাবা?

পাদরি সাহেব বলতো—মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখে জ্ঞান হবে, খ্রীষ্টান হবে, আমাদের লর্ড তার সব পাপ ক্ষমা করবে।

জেঠু রাউত বলতো—পাপ কিসের সাহেব, আমার মেয়ের পাপ কি? ও-ও তো পাপের কাজ কিছু করে নাই।

পাদরি সাহেব ভয় দেখাতো—পাপ করে নাই? তাহ'লে তোমরা মাটির ঘরে কেন বাস করো, কেন তোমাদের রোগ হয়?

জেঠু রাউত বলতো—আমাদের তো রোগ-জারি নাই—

পাদরি সাহেব বলতো—গর্মী রোগ, পারা রোগ—তোমাদের পাপ আছে, তাই রোগ আছে, তোমাদের পাপ দূর করো, তোমাদের রোগও দূর হবে।

পাদরিদের হাতে জেঠু রাউত মেয়েকে ছাড়েনি সেদিন।

শিউ-তালাও-এর মোহন বেয়ারা, সে-ও এসে খোসামোদ করেছিল অনেকদিন। বলেছিল—আমার ডৌকিটা মরে গেলো—জেঠু, এবার তোমার বেটিটাকে দাও—চুড়ি পরাবো।

মোহন বেয়ারাকে মেয়ে দিতে আপত্তি ছিলো না জেঠু রাউতের। শিউ-তালাও-এ তার নিজের ঝুপড়ি আছে! মেহনত করবার মত শরীরের জুত আছে, তেমন ডৌকি একটা পেলে মোহন বেয়ারা মনের মত ঘর বানায়। তারপর ক্ষেতি-খামারে কাজ করে টাকা জমাবে, ডৌকিকে শাড়ি দেবে, গয়না দেবে, সুখে রাখবে। অনেক কথা অনেক আশার কথা শোনালে মোহন বেয়ারা। জেঠু বললে—টাকা কতগুলি দেবে, সেটি বড় কথা আছে!

মোহন বেয়ারা বললে—আমি দু'কুড়ি টাকা দিব নগদ—

—দু'কুড়ি! জেঠু রাউত ঘেন্নায় এক থাবড়া থুতু ফেললে উঠোনে।

বললে—তোমার দু'কুড়িতে হবে না মোহন বেয়ারা—বুধনপুরের শিবু কাহার তিন কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছে, তাই-ই বলে দিইনি—

মোহন বলছিল—তা আমিও তিন কুড়ি টাকা দিচ্ছি, নাও না, সরস্বতীয়াকে মনে ধরেছে বলেই বলছি, নইলে টাকা আমার সস্তা নাকি? আমারও তো মেহনতের টাকা—

জেঠু রাউত বলেছিল—তিন কুড়ি টাকা দেবে তো শিউ-তালাও-এর মুখলোচন কুর্মির কাছে যাও, তার কালোপেঁচি মেয়ে আছে, তাকে পাবে, তাহ'লে আর আমার সরস্বতীয়ার দিকে নজর দিও না।

এ-সব কথা সরস্বতীয়ার মনে আছে। ছেদি প্যাটেলেরও মনে আছে। শিউ-তালাও, কদমকুঁয়ার সমস্ত গাঁয়ের লোকের মনে আছে। সেদিন জেঠু রাউত মোহন বেয়ারার হাতে তুলে দেয়নি মেয়েকে। তিন কুড়ি নগদ টাকার লোভও অতি কষ্টে সম্বরণ করেছিল সে, ইচ্ছে ছিল আরো দর উঠবে। চার কুড়ি দর উঠলে তখন বেচবে মেয়েকে। কিন্তু হাতে একেবারে পাঁচকুড়ি টাকা পেয়ে যাওয়ায় বুড়ো ছেদি প্যাটেলের হাতে সরস্বতীয়াকে তুলে দিলে।

ছেদি প্যাটেল রাজনন্দ্‌গাঁ-র মেলা থেকে চুড়ি পরিয়ে যেদিন প্রথম নতুন ডৌকি নিয়ে এসেছিল, সেদিন সবাই দেখতে এলো।

যারা জানতো না, তারা জিজ্ঞেস করলে—কোথাকার মেয়ে?

মুরলী বললে—রাজনন্দ্‌গাঁ-র জেঠু রাউতের মেয়ে।

ওরা বললে—নাম কী তোমার ডৌকি?

মুরলী বললে—সরস্বতীয়া।

—চুড়ি পরাতে কত টাকা লাগলো গো?

মুরলী বললে—পাঁচকুড়ি টাকা জেঠু রাউত গুনে নিয়েছে গো বনোযারী শেঠের দোকান থেকে। এই দেখো রূপোর চুড়ি পরেছে, হাঁসুলী পরেছে, পায়ের বিছে মল, সব দিয়েছে এই আমার মরদ।

ডৌকি দেখে সবাই খুশি। হাত-পা টিপে-টিপে দেখলো সবাই। চুল টেনে মেপে দেখলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। পাঁচ কুড়ি টাকার চুড়ি পরানো ডৌকি। ছেদি প্যাটেলের ডৌকি। টিল্‌ডা রেলগেটের গেট-ম্যান ছেদি প্যাটেল।

সরস্বতীয়া সেদিন এখানে এসে ভাবতো, রাজনন্দ্‌গাঁর কথা। সেই শিউ-তালাও-এর রেলগাড়ির কথা। ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে রেলগাড়ি যেতো, জোয়ারের ক্ষেতের ধার দিয়ে দিয়ে। খুব জোরে যেতো রেলগাড়িগুলো। ছুটে ছুটে পাল্লা দিয়ে দৌড়িয়েও নাগাল পাওয়া যেতো না। পেছনে বসে থাকতো সাদা-মুখো গার্ড সাহেব। সরস্বতীয়া কখনও তাকে ভেংচি কাটতো, তার দিকে চেয়ে থুতু ছুঁড়তো। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে দেখতো।

এখন ওগুলোও আর দেখতে পাবে না। মুরলী এসে তাকে তালাও-এ নিয়ে গেল। সাজিমাটি দিয়ে গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে দিলে। চুলের উকুন বেছে দিলে। মুরলী বললে— মন কেমন করছে জেঠু রাউতের জন্য? হ্যাঁরে সরস্বতীয়া—বল্ না।

সরস্বতীয়া ঠাণ্ডা তালাও-এর ভেতর গলা ডুবিয়ে দিয়ে রইলো। কিছু বুঝতে পারলো না। জেঠু রাউতের জন্যে মন কেমন করার কথা নয়। জেঠু রাউত পাঁচ কুড়ি টাকা নগদ নিয়ে আবার কত কুড়ি টাকা দিয়ে কাকে চুড়ি পরাবে কে জানে!

গায়ে, হাতে, বুকে পায়ে সর্বত্র সাজিমাটি ঘষে দিতে লাগলো মুরলী। বললে—মরদ এখন ডিউটিতে গেছে, রাতের বেলা বাড়ি থাকবে—জানিস্।

সরস্বতীয়া কিছু কথা বললে না। মুরলী বললে—মরদ আজকে তোর ঘরে শোবে, ভয় পাস্‌নি যেন, বুঝলি তো?

সরস্বতীয়া বললে—আমি তবে তোমার কাছে শুবো দিদি।

মুরলী বললে—ছিয়া-ছিয়া, আমি তো বুড়ী ডৌকি, আমার কাছে মরদ শুবে কেন, তুই নতুন ডৌকি, মরদ তোর ঘরে শুবে আজ—

সরস্বতীয়া বললে—আমার ভয় করবে দিদি।

মুরলী অভয় দিলে। বললে—প্রথম-প্রথম ভয় করবে—তারপর মনে লাগবে। আমি নিজে তোকে মরদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবো, তুই চেঁচাসনে যেন ভয় পেয়ে।

সরস্বতীয়ার প্রথম জীবনের এ-ইতিহাস আমার জানার কথা নয়। আমি সরস্বতীয়ার জীবনে আগে কখনও আসিনি। ছেদি প্যাটেলকেই চিনতাম। ছেদি প্যাটেলের একটা সমস্যার কথা জানতাম। বিলাসপুর থেকে তার টিল্ডায় বদলি হওয়ার সমস্যা। সেই সমস্যার কথাই সে আমাকে বারবার বলেছে। কিন্তু এ-সব কথা শুনেছিলাম রামসহায়ের কাছ থেকে।

সেদিন খুব ক্লান্তই ছিলাম। সারাদিন বিল্লারীর জঙ্গলে জলা-জমিতে হরিণের পেছনে কাঠফাটা রোদের মধ্যে কাটিয়ে শরীর আর বইছিল না। ছেদি যখন উঠোনের খাটিয়ায় বসে বসে তার সুখ-দুঃখের কথা বলছিলো তখন একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

ছেদি প্যাটেল বলেছিল—ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি সাহেব?

বললাম—তোমার বুঝি আজ আর রাতে ডিউটি নেই?

ছেদি প্যাটেল বললে—আজকে তো বেশ আরাম করে ঘুমোব, সাহেব—কিন্তু কাল ভোরে আবার ডিউটি দিতে যাবো।

—তোমার সকাল বেলার ভাত?

ছেদি প্যাটেল বললে—হ্যাঁ হুজুর, তারপর ওই মুরলী ভাত দিয়ে আসবে 'গট-এ গিয়ে, সরস্বতীয়া তো যাবে না।

—কেন, সরস্বতীয়া যাবে না কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে—ওই যে বলছিলাম হুজুর ভাতটা, তা-ও দিয়ে আসতে পারবে না সরস্বতীয়া, অথচ দেখুন সাহেব, বনোয়ারী শেঠের কাছে টিপ-ছাপ্ দিয়ে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়েছি তো জেঠু রাউতকে ওরই জন্যে।

বললাম—একটু কম বয়েস তো, লজ্জা করে, ভয় করে হয়তো।

ছেদি বললে—হুজুর ভয় না ছাই, লজ্জা না ছাই, অপগেরাহ্যি।

বললাম—না-না, এটা তোমার ভুল ধারণা ছেদিলাল। তোমাকে অপগ্রাহ্য করবে কেন? তোমারই তো চুড়ি-পরানো ডৌকি সরস্বতীয়া!

ছেদি প্যাটেল বললে—হুজুর, আপনি হলেন বাঙালী, আপনি ছত্রিশগড়ীদের চুড়ি-পরানো ডৌকির কী জানবেন? আপনাদের ডৌকিরা কত সেবা করে, যত্ন করে! আমি তো পেলেটিয়ার সাহেবের বউকে দেখেছি।

পি-ডব্‌লু-আই সাহেবের পারিবারিক কাহিনী শোনবার ইচ্ছে ছিলো না আমার, সুতরাং আমি সে কথায় কান দিলাম না। কখন মুরলীর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলো, সরস্বতীয়ারও খাওয়া-দাওয়া সারা। কদমকুঁয়ার আকাশে ঘন-ঘন তারা ফুটছে। চিৎ হয়ে খাটিয়ার ওপর শুয়ে-

শুয়ে ছেদি প্যাটেলের গল্প শুনছিলাম। বললাম—এবার তুমি শুতে যাও ছেদি, আমার ঘুম পেয়েছে।

মনে আছে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজের খাটিয়ার ওপর। কাল ছেদি প্যাটেলের দিন-ডিউটি আরম্ভ হবে। ছেদি বাড়িতেই শুয়েছে আজ, তবু টর্চটা বালিশের কাছে রেখে শুয়েছিলাম। শিকারীর টর্চ। বন্দুকটাও মাথার কাছে দাঁড় করানো ছিলো!

রাত্রে হঠাৎ একটা আচম্‌কা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। সামান্য শব্দতেই ঘুম ভাঙে আমার। ঘুম আমার খুব সজাগ। ডি-কষ্টা সাহেবের কাছে শিখেছি। শিকারে গিয়ে অঘোরে ঘুমোতে নেই। ডি-কষ্টা সাহেব বলতো—স্লিপ লাইক্ এ ডগ্ মিস্টার, ডোণ্ট স্লিপ লাইক্ এ স্নেক।

কুকুরের মত নাকি ঘুমোনো উচিত শিকারীর, সাপের মত নয়। সাপ ছ-মাস নাকি না-খেয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারে। আমি অবশ্য এ-কথা জানি না। ডি-কষ্টা সাহেব যখন বলেছে, তখন মিথ্যে হবার কথা নয়।

শব্দটা যেন উঠোনের দিক থেকে আসছে!

কী হলো! ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে চোর পড়লো নাকি!

মনে আছে সেদিন ভয় যে পাইনি তা নয়। খুব ভয়ই পেয়েছিলাম। অন্ধকারের মধ্যে টর্চটা হাতে নিয়েছিলাম—বন্দুকটা ধরলাম আর একটা হাতে, সবই ঠিক জায়গায় আছে।

যেন খুব বকাবকি চলেছে বাইরে। কেউ যেন কাকে মারছে খুব। চ্যাপা কান্নার শব্দ আসছে। মুখে আঁচল চেপে ধরেছে—যাতে চীৎকার না করতে পারে

আর একটা পুরুষের গলা! চোর, না বদমাইস্, না গুণ্ডা! অত্যাচার কবছে কেউ মেয়েদের ওপর! সরস্বতীয়ার ওপর কী? ছেদি প্যাটেল হয়তো কয়েক রাত নাইট ডিউটিব পর অঘোবে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। হয়তো কিছুই টের পায়নি সে!

জেঠু রাউত নাকি তবে। হয়তো পাঁচ কুড়ি টাকার আশা মেটেনি, আরো টাকা চায়, তাই সরস্বতীয়াকে লুকিয়ে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে। আরো এক কুড়ি টাকার চাপ দেবে। কিংবা এসেছে শিউ-তালাও-এর মোহন বেয়ারা। তিন কুড়ি টাকার চড়ি পরাতে চেয়েছিল সরস্বতীয়াকে। টাকার জোরে ছেদি প্যাটেল নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। রাত্রেব অন্ধকাবেব সুযোগে তাই এখানে এসেছে মোহন বেয়ারা। কিংবা বুধনপুরের শিবু কাহার, সেও পায়নি সরস্বতীয়াকে। এ-রকম ঘটনা আগেও দেখেছি। বিলাসপুরে যে-বাড়িতে থাকতাম তার সামনে ছিল ছত্রিশগড়ীদের ঝুপড়ি।

হঠাৎ কতদিন সেখানে রাতদুপুরে হৈ-চৈ হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সে রাত্রে কিছু টের পায়নি। পরের দিন শুনেছি কার বৌটিকে কোথাকার কে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো—ধরা পড়ে গেছে। এ-রকম ঘটনা হামেশাই ঘটে ছত্রিশগড়ে। এ এমন কিছু নতুন নয়। তাই প্রথমটায় চুপ করে রইলাম। মনে হলো কে যেন খিল খুললো সদর দরজার।

হয়ত কাল ভোরে উঠেই শুনবে সরস্বতীয়া পালিয়ে গেছে বুধনপুরের শিবু কাহাবের সঙ্গে। কিংবা মোহন বেয়ারার সঙ্গে। কিংবা আর কারো সঙ্গে। পালিয়ে নিয়ে যাবার লোকের অভাব নেই।

কিন্তু হঠাৎ মুরলীর গলা পেয়ে চমকে উঠলাম। মুরলী চীৎকার করে উঠেছে—মেরে ফেললে গো, সরস্বতীয়াকে মেরে ফেললে।

গলা-ফাটানো চীৎকার। মনে হলো যেন কদমকঁয়ার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল সেই চীৎকারে। এক মুহূর্তে দরজার হুড়কো খুলে বাইরে টর্চের আলোটা ফেলেছি। আর সঙ্গে-সঙ্গে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেলো।

দেখি ছেদি প্যাটেলের হাতে একটা চ্যালাকাঠ, আর তার সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে সরস্বতীয়া। তার পাশেই মুরলী মুখে কাপড় দিয়ে হাঁপাচ্ছে। আমার টর্চের আলো পড়তেই ছেদি প্যাটেল চ্যালাকাঠটা ফেলে দিয়ে পাঁচিলের ও-পাশে লাফিয়ে পড়লো।

বাইরে বেরোলাম আমি। ডাকলাম—ছেদি—

কিছুক্ষণ কারো সাড়া-শব্দ নেই। মুরলী আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে রয়েছে। আর কাঁদছে না তখন। সরস্বতীয়া মাটিতে তখনো লুটোচ্ছিল। কাপড়-চোপড় খোঁপা সামলে উঠে বসলো।

আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন এদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজেই লজ্জিত হলাম। হয়তো এদের অন্দরমহলের একান্ত গোপনীয় ব্যাপারে আমার উপস্থিতি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। নিজের ব্যবহারে নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে এসে নিজের খাটিয়ায় আবার বসলাম।

আবার ডাকলাম—ছেদিলাল।

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যদি কিছুই না হয়ে থাকে, তবে ছেদি প্যাটেলের হাতে চ্যালাকাঠ কেন? কেন সরস্বতীয়া অমন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল? কেন তার কাপড়-চোপড় ঠিক ছিল না? কেন তার খোঁপা খুলে গিয়েছিলো? কেন মুরলী অমন করে আর্তনাদ করে উঠেছিল? এ সমস্তর মানে কী?

ছেদিলাল অনেক পরে আস্তে-আস্তে আমার ঘরে এলো। বড়োর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। বললাম—আলোটা নিয়ে এসো।

ছেদিলাল আলোটা নিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। বললাম—বসো।

ছেদিলাল বসলো। বললাম—সরস্বতীয়াকে মারছিলে তুমি?

ছেদিলাল কোনো উত্তর করলে না। মুখ নিচু করে রইলো। চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে মনে হলো।

বললাম—কেন, মারছিলে কেন সরস্বতীয়াকে?

ছেদিলাল হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো হঠাৎ। বললে—হুজুর, মালিক আমার বাপ-মা। আমার কিছু কসুর নেই সাহেব। আমার কোনও দোষ নেই। আমাকে ক্ষমা করুন হুজুর, আমি পাগল হইনি, বেসামাল হইনি—যা করেছি জেনে ভেবেচিন্তেই করেছি হুজুর—আমার দোষ মাফি হয়।

বললাম—সরস্বতীয়া যে-দোষই করে থাকুক, তা' বলে তুমি মারবে ওকে? মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলবে? তোমার এত বড় সাহস?

ছেদি প্যাটেল আমার বকুনি খেয়ে চুপ হয়ে গেলো।

আবার বললাম—জানো, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা অপরাধ? ডৌকি ব'লে তুমি তাকে মারতে পারো না! আর তুমি কিনা তাকে চ্যালাকাঠ দিয়ে মারছিলে? জানো, টিলডার পুলিশ-সুপারকে ডেকে তোমায় গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারি?

ছেদিলাল এবার আমার পা ধরতে এলো। বললে—হুজুর মা-বাপ, কসুর নেবেন না সাহেব, আর করবো না সাহেব, এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

বললাম—কিন্তু কেন মারছিলে এই রাত্তিরবেলা?

ছেদি প্যাটেল বললে—আপনাকে কী বলবো সাহেব, বলবার আমার মুখ নেই! বলতে আমার লজ্জা লাগছে।

—কেন? কেন লজ্জা তোমার, বলো না? সরস্বতীয়া তোমার কথা শোনে না?

ছেদি প্যাটেল বললে—না হুজুর, তা নয়।

বললাম—তাহ'লে সরস্বতীয়া কী তোমার সংসারে কাজ করতে চায় না?

ছেদি বললো—না সাহেব তা-ও নয়। নতুন ডৌকি, সব কাজ তো মুরলীই করে। ওকে তো কোনও কাজ করতে বলি না আমি, আর ওর তো কাজ করবার দরকারই হয় না কোনো সময়ে।

বললাম—তবে? আর কী করেছে ও? কী জন্যে মারছিলে?

ছেদি প্যাটেল একটু যেন ইতস্তত: করতে লাগলো। নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। তারপর মুখ উঁচু করে বললে—আপনি তো জানেন সাহেব, সরস্বতীয়া আমার ডৌকি কিনা বটে?

বললাম—হ্যাঁ তা-তো জানি, সরস্বতীয়া তোমার চুড়ি পরানো ডৌকি। রামসহায় আমাকে সব কথা বলেছে।

ছেদি বললে—আমি পাঁচকুড়ি টাকা দিয়ে চুড়ি পরিয়েছি কিনা বলুন বটে?

বললাম—তাও রামসহায় বলেছে, রাজনন্দ্‌গাঁর জেঠু রাউতের হাতে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়েছো তুমি বনোয়ারী শেঠের কাছে টাকা ধার করে।

ছেদি প্যাটেল বললে—আপনি তো সবই জানেন সাহেব। হুজুর মা-বাপ আমার, আমি আর কী বলবো, ছটপরবের মেলায় গিয়ে পাঁচকুড়ি টাকা দিয়ে সরস্বতীয়াকে চুড়ি পরিযেছি—রামসহায় জানে, মুরলী জানে, শেঠ বনোয়ারী জানে—আরো অনেকে জানে হুজুর, এতে লুকোছাপা কিছু নেই কিন্তু—

যেন বলতে গিয়ে দ্বিধা করলো ছেদি। বললাম—কিন্তু কী—বলো?

ছেদি প্যাটেল বললে—কিন্তু সরস্বতীয়া একদিনের তরে আমার ঘরে শোবে না কেন হুজুর—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগলো—এই আট মাহিনা সরস্বতীয়া ঘরে এসেছে সাহেব, আট মাহিনায় একদিনও এক মিনিটও আমার কাছে শোয়নি আমার ডৌকি, আমার নিজের ডৌকি। চুড়ি-পরানো ডৌকি মরদের কাছে শোবে না—এমন কথা কখনও শুনেছেন সাহেব?

বললাম—কেন, শোয় না কেন?

ছেদি যেন ভারি সহানুভূতি পেলে আমার কথায়। বললে—তাই বলুন তো হুজুর, ডৌকোর কাছে ডৌকি শোবে না, এ কেমন ধরনের কথা?

বললাম—কিন্তু কেন শোবে না, জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি ওকে?

ছেদি প্যাটেল বললে—আমাকে কী শয়তানী তা বলবে হুজুর? আমার সঙ্গে কথা বলে না, এই আট মাস চুড়ি পরিয়েছি, এই আট মাসের মধ্যে একদিনও কথাই বলে নি—আমাকে দেখতে পারে না ও হুজুর।

বললাম—কেন, শোয় না কেন?

ছেদি বললে, তা কী করে জানবো হুজুর, কেন দেখতে পারে না—মুরলী ওকে কত বুঝিয়েছে, যেদিন প্রথম ঘরে নিয়ে এলুম হুজুর, মুরলী ওকে তালাও থেকে চান করিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দেবার ইন্তেজাম করলে, কিছুতেই এলো না।

কেমন যেন অবাক লাগলো। প্রথম দিন থেকেই সরস্বতীয়া স্বামীর কাছে শোয় না? এ-কেমন কথা?

ছেদি প্যাটেল বলতে লাগলো—আমি প্রথম-প্রথম ভাবতাম হুজুর ছোটো ডৌকি, তাই বোধহয় ভয় পায় কাছে শুতে, শেষে মুরলীয়াও আমার কাছে শুতে চাইলো, আমি মধ্যেখানে আর দু-পাশে ওরা, একপাশে মুরলীয়া আর একপাশে সরস্বতীয়া—কিন্তু সরস্বতীয়া কিছুতেই এলো না হুজুর, মুরলীয়াকে আঁচড়ে-কামড়ে একসা করে দিয়ে ছাড়লে।

বললাম—তারপর?

ছেদি বললে—শেষে কী করবো হুজুর, ভাবলাম পাঁচকড়ি টাকাই আমার লোকসান গেলো—তবু হাল আমি ছাড়লুম না হুজুর।

ছেদি প্যাটেল সত্যিই দুঃখ পেয়েছিল মনে। দুঃখ পাবার কথাই বৈকি। চরম দুঃখ পেয়েছিল সেদিন। নতুন ডৌকি ঘরে এনেছিল ছেদি প্যাটেল। খাসি কেটেছিল একটা। দু-এক ঘর লোক নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল। কদমকুঁয়ার দু-পাঁচজন চেনা-জানা লোক। মুরলী তালাওতে নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে তেল মাখিয়ে সাজি-মাটি ঘষে সরস্বতীয়াকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

সরস্বতীয়া বলেছিল—আমার ভয় করছে দিদি—

টিল্‌ডা-মিশনের মেম-ডাক্তার এসেছিল সেদিন। মেম-ডাক্তার বলেছিল—এটা তোমার কে মুরলীয়া?

মুরলীয়া বলেছিল—এটা আমার মরদের নতুন ডৌকি, আমার মরদ চুড়ি পরিয়েছে একে।

মুরলীয়া সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছে তখন সরস্বতীয়াকে। মেম-ডাক্তার ভালো করে দেখলে সরস্বতীয়ার দিকে। আপাদ-মস্তক দেখলে। ফরসা টক্‌টকে রঙ। বহুদিনের মেম-ডাক্তার। মেম-ডাক্তার ছত্রিশগড়ীদের মধ্যে অনেকদিন কাজ করছে। এদের সভ্য হতে শেখাচ্ছে, মানুষ হতে শেখাচ্ছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে। ওষুধ দিচ্ছে, চিকিৎসা করছে! এমনি মেম-ডাক্তার ছিলো রাজনন্দ্‌গাঁয়েও। পাদরি সাহেব জেঠু রাউতকে বলেছিল একদিন, দাও না সরস্বতীয়াকে। তোমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবো আমরা।

সেদিন জেঠু রাউত ছাড়েনি সরস্বতীয়াকে। ছাড়েনি টাকার লোভে। ইচ্ছে ছিল, সেই টাকা নিয়ে সে আবার কাউকে চুড়ি পরাবে।

সে-সব কথা আর আজ মনে পড়ে না সরস্বতীয়ার। সেই বুড়ো পাদরি সাহেব, সেই রাজনন্দ্‌গাঁ, সেই আয়ি বুড়ি। ছোটবেলাটা যেন ছিল ভালো।

মেম-ডাক্তার বললে—দেখি, এদিকে এসো তো দেখি, এদিকে একবার এসো তো—

সরস্বতীয়াকে ডেকে নিয়ে মেম-ডাক্তার আড়ালে কী যেন বললে।

মুরলীয়া বললে—কী বললে রে তোকে মেম-ডাক্তার?

রাতের অন্ধকারে সরস্বতীয়ার মুখখানা ভালো করে দেখা গেল না। একে একে সবাই চলে গেছে। কেউ মাংস খেয়েছে। কেউ-কেউ মহুয়া খেয়েছে। রামসহায়ও এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে, সে-ই আমাকে এ-সব কাহিনী বলেছে।

বললাম—তারপর তুমি চলে এলে?

রামসহায় বলেছিল—ছেদি প্যাটেল সেদিন খুব মহুয়া খেয়েছিল হুজর। নতুন ডৌকি এসেছে, রাতে একসঙ্গে এক বিছানায় শোবে, মদ খাবে না?

তার পরের কথা রামসহায় জানে না। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিয়েছি।

ছেদি প্যাটেল বিছানায় শুয়েছে। মুরলী সরস্বতীয়াকে বললে—চল, ঘরে চল।

সরস্বতীয়া বললে—আমি যাবো না।

—যাবি না কেন?

—না যাবো না, তোমার খুশী হয়, তুমি শোও গে যাও।

শেষকালে টানাটানি। কিছুতেই শোবে না সরস্বতীয়া।

মুরলীও ছাড়বে না, সরস্বতীয়াও যাবে না।

মুরলী বললে—তোর এত বড় বাড় হয়েছে, তুই কথা শুনবি না।

সরস্বতীয়া বললে—না শুনবো না, তাতে তোমার কী?

—তোর বাপ পাঁচ কুড়ি টাকা নেয়নি! অম্‌নি শুতে বলছি?

সরস্বতীয়া বললে—পাঁচকুড়ি টাকা নিয়েছে আমার বাপ, তাতে আমার কী?

—তোর বাপ আর তুই কি আলাদা?

সরস্বতীয়া বললে—আমার বাপ টাকা নিয়েছে। তার জন্যে আমি ভুগতে যাব কেন শুনি!

—তবে রে, শুনবি নে।

মুরলীর গায়েও জোর ছিল বেশ। এক টানে সরস্বতীয়াকে ভেতরে পুরতে যাচ্ছিল মুরলী। কিন্তু হঠাৎ সরস্বতীয়া আর্তনাদ করে উঠেছে—ওঃ মা গো, আমায় কামড়ে দিলে ছুঁড়ি—খুন করে ফেললে গো।

শুধু সেই প্রথম দিনই নয়। এমনি করে এক সপ্তাহে বার-বার দিন-ডিউটি আসে ছেদি প্যাটেলের আর সরস্বতীয়ার ধুক্‌ধুকানি বাড়ে। ছেদি প্যাটেল রাত ডিউটি থেকে ফিরে সমস্ত দিন ঘুমোয়। বিকেলবেলা উঠে জল খায়, চা খায়, বিড়ি খায়। তারপর ক্ষেতি-খামারে যায়। নিজের টাকায় ক্ষেতি করেছে। চানার ক্ষেতি, ভুট্টার ক্ষেতি, সরষে, তিসি, সব রকম ক্ষেতি আছে ছেদি প্যাটেলের! মহাজন আছে। শেঠ বনোয়ারী আছে। সুদ, লগ্নি, তমসুক, বন্ধকী কারবার আছে।

এত কাজ, এত কারবার সব দেখতে হবে নিজেকে। দেখবার আর লোক নেই ছেদির। তারপর ঘুরে এসে হাজির হয়। বলে—রুটি দে মুরলীয়া।

রুটি দেয় মুরলী। রুটি খেয়ে আখের গুড় খায় ছেদি প্যাটেল। আর ভইসের দুধ খায় সে। সরকারী নোকরীর সুখ আছে, ক্ষেতি-খামারে সুখ আছে, কেন খাবে না? কেন ভোগ করবে না?

রাত্রে শোবার ঘরে গিয়ে ডাকে—মুরলীয়া, সরস্বতীয়াকে ডাক্।

মুরলী বললে—চল্, সরস্বতীয়া শুবি চল্ ঘরে।

সরস্বতীয়া বলে—না আমি যাবো না।

সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই একই টানাটানি গালিগালাজ, একই অভিনয়! সব শুনে বললাম—কিন্তু ও যখন শুতে যেতে চায় না তোমার সঙ্গে, তখন তুমি নাই-ই আর চেষ্টা করলে ছেদিলাল।

ছেদি প্যাটেল বললে—চেষ্টা করি কী সাধে হুজুর! চেষ্টা না করে কী করি বলুন?

বললাম—না হয় আর একটা ডৌকি আনো ঘরে, আর একটা মেয়েকে চুড়ি পরাও!

ছেদিলাল বললে—কিন্তু ও শোবে না কেন, তাই বলুন হুজুর আগে।

বললাম—কিন্তু তোমারই বা অত জেদ কেন বলো তো? তুমি তো বুড়ো হতে চললে, আর দু'দিন বাদে মারা যাবে!

ছেদি প্যাটেল বললে—আজ্ঞে সেই জন্যেই তো জিদ-জবরদস্ত করছি, আমি তো বুড়ো হতে চললুম, আর দু'দিন বাদে মারা যাবো—তখন? কে খাবে এ-সব? কে-রাখবে এ-সব? আমার কী একটা ছেলে আছে?

কথাগুলো বলে ছেদি প্যাটেল কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। আমিও কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

খানিক পরে ছেদি প্যাটেল আবার বলতে লাগলো—বলুন হুজুর, আপনিই বলুন, আমার কী ছেলে আছে? এই যে চল্লিশ বিঘে জমি, চানা-ক্ষেতি, ভুট্টা-ক্ষেতি, এ-সব আমি চলে গেলে কে দেখবে, কে খাবে, কার জন্যে এ-সব করা?

বললাম—তুমি সরস্বতীয়াকে বলেছো এ-সব কথা?

ছেদি প্যাটেল বললে—বলিনি হুজুর, বলেন কী আপনি? আমি সব বলেছি! সরস্বতীয়াকে কত বুঝিয়েছি, বলেছি একটা শুধু ছেলে দে তুই আর কিছু চাই না, আর কোনোদিন আমার কাছে শুতে বলবো না।

বললাম- -তা শুনে কী বললে?

ছেদি প্যাটেল বললে—শুনে বলবে কী, আর কথাই শোনে না মোটে। আমি যদি এদিক দিয়ে যাই, তো ও যাবে ওদিক দিয়ে।

বললাম—মুরলীকে দিয়ে বলো না কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে—মরলীয়াকে দিয়ে বলি নি ভাবছেন, মুরলীয়াও কী ওকে কম বুঝিয়েছে ভাবছেন। কত বুঝিয়েছে, কত করে বলেছে সরস্বতীয়াকে, মুরলীয়া আমার খুব ভালো ডৌকি আজ্ঞে, বলেছে—দ্যাখ্ সরস্বতীয়া, আমরা দু'জন মেয়েমানুষ, আমাদের মরদ বুড়ো মানুষ, একটা যদি ছেলে তোর হয় তখন আর কষ্ট হবে না, একটা ছেলে হলে তখন মরদ কিছু বলবে না, আর তখন তোর যা খুশি করিস—তা ও কী শোনবার মেয়ে?

কিছুই বলবার ছিল না আমার। তবু বললাম—সরস্বতীয়াকে দেখে তো তা মনে হয় না—ও তো তোমার অবুঝ ডৌকি নয় ছেদিলাল!

ছেদি প্যাটেল বললে—অবুঝ কেন হবে সাহেব, বেশি বোঝন্দার! সেই তো হয়েছে গোল, অত বেশি বোঝন্দার না হলেই ভালো হতো! অথচ দেখুন তো মুরলীয়াকে। সংসারের যত কাজ সবই তো একা করে মুরলীয়া, একটা কথা কোনদিন শুনেছেন মুরলীয়ার মুখে কখনও?

বললাম—তুমি এখন যাও ছেদিলাল, অনেক রাত্রি হলো—আমি সরস্বতীয়াকে ডেকে একবার কথা বলছি।

ছেদি প্যাটেলের মুখে এতক্ষণে হাসি বেরোল। বললে—একটু বুঝিয়ে বলবেন সাহেব, মুরলীয়া তো বুঝিয়ে-বুঝিয়ে হয়রান হয়ে গেছে—আপনি একটু বুঝিয়ে বললে শুনবে—বলবেন একটা শুধু ছেলে হলেই আমি আর কিছু চাই না—না হলে এত সম্পত্তি সব বরবাদ হয়ে যাবে।

বললাম—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, যা বলবার আমি বলবো, তুমি যাও—তোমার আবার কাল সকালবেলায় ডিউটি, যাও একটু শোও গে, যাও।

ছেদি প্যাটেল চলে গেলো। সত্যিই রাত অনেক হয়েছে। শিউতালাওয়ের দিকে আকাশটাও ফিকে-ফিকে ঠেকছে। বেন্নারির জঙ্গলের দিকটা তখন মিশকালো কুচকুচে আকাশ। আজকে আর আমার ঘুম আসবে না।

সরস্বতীয়া ঘরে এলো। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম এতক্ষণ সে যেন কাঁদছিলো। বললাম—বসো।

ঠিক ছেদি প্যাটেল যেখানে বসেছিল, সেইখানেই সেই চৌকাঠের ওপরে তেমনি করে বসলো সরস্বতীয়া। বললে—আমাকে ডেকেছো সাহেব?

বললাম—হ্যাঁ।

কিন্তু বলতে গিয়েও যেন কিছু কথা মুখ দিয়ে বেরোল না। কেমন করে কথাটা বলবো! কী করে বলবো! স্ত্রী স্বামীর ঘরে শুতে চায় না, তার জন্যে আমিই বা কী করতে পারি। আর আমার কথা সে শুনবেই বা কেন? আমি এদের কে? কোনো কথা বলছি না দেখে সরস্বতীয়া নিজেই বললে—আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি হুজুর!

বললাম—তাহ'লে তো ভালোই হয়েছে—তুমি শোও না কেন তোমার মরদের সঙ্গে? কেন? শুতে তোমার আপত্তি কী?

সত্যিই রাগ হয়েছিল আমার। বললাম—ছেদিলালের অত সম্পত্তি কে খাবে বলো দিকিনি? তোমরা তো দু'জন রয়েছো, দু'জনেই মেয়েমানুষ, ওই ছেদিলাল একলা রেলের চাকরি করবে, না ক্ষেতি খামার দেখবে—একটা ছেলে থাকলে তো তাকে আর এ-সব ভাবতে হতো না! হয় মুরলীর, নয় তোমার, একটা তো ছেলে থাকা উচিত।

আমার বলার আগেই সরস্বতীয়া বললে—ওর ছেলে হবে না সাহেব!

—হবে না?

সরস্বতীয়া বললে—না, ছেলে মুরলীর হবে না, আর আমি ওর পাশে শুলেও আমার ছেলে হবে না, এই আপনাকে বলে রাখলুম।

বললাম, কেন? কী জন্যে ছেলে হবে না?

সরস্বতীয়া বললে—আমাকে মেম-ডাক্তার বলেছে!

—কোথাকার মেম-ডাক্তার?

সরস্বতীয়া বললে—টিল্‌ডা-মিশনের মেম-ডাক্তার, যেদিন আমি চুড়ি পরে এ-বাড়িতে এলুম, সেই ছট্-পরবের দিনই মেম-ডাক্তার এসেছিল। আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিল—মুরলীয়ার মতো তোরও ছেলে হবে না।

অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কেন, মুরলীর যদি ছেলে নাও হয়, তোমার ছেলে হবে না কেন?

সরস্বতীয়া বললে—মুরলীর যে-জন্যে হয় না, আমারও সে-জন্যে হবে না।

বললাম—কী জন্যে হবে না?

সরস্বতীয়া বললে—ছেদিলালের পারা-রোগ আছে সাহেব!

পারা-রোগ! বললাম—কী করে জানলে তুমি?

সরস্বতীয়া বললে—মেম-ডাক্তার যে আমাকে বলেছে সাহেব! মেম-ডাক্তার আমাকে কেন মিছে কথা বলতে যাবে? আর তাছাড়া—বলে থেমে গেল সরস্বতীয়া।

বললাম—আর তা ছাড়া?

সরস্বতীয়া বলতে লাগলো—আর তা ছাড়া নিজের চোখে যে দেখেছি সাহেব, মুরলীর সে কী কষ্ট, কী কষ্ট যে পায় মুরলী কী বলবো। এক-একদিন যেদিন পেটে ব্যথা ওঠে, বেদনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে মুরলী, তুমি তার কী জানবে সাহেব, তুমি তো আর তখন এখানে থাকো না।

বললাম—ব্যথা তো অন্য কারণেও হতে পারে। হয়ত অন্য কোনও রোগ আছে।

সরস্বতীয়া বললে—তাহ'লে মুরলীর কেন ছেলে হয়, আর মরে যায়? কেন মেম-ডাক্তার ওষুধ দিয়ে ব্যথা সারায়? আমি কি কিছুই বুঝি নে?

আমার যেন বলবার কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। তবু বললাম—কিন্তু এমন করলে কেবল অশান্তি বাড়ে, ছেলেপুলে না হলে সংসার মানায় না, তোমারও তো মা হতে মন চায়।

সরস্বতীয়া বললে—না সাহেব, আমার মন ও-সব চায় না। আমি আর এখানে থাকবো না—

সরস্বতীয়ার কথা শেষ হলো না। তার আগেই ছেদি প্যাটেল ঘরে এসে ঢুকলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো—তুই থাকবি না তো, কোথায় যাবি শুনি?

সরস্বতীয়া বসে ছিল। এবার ছেদি প্যাটেলের কথায় দাঁড়িয়ে উঠে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল—

ছেদি প্যাটেল সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত ধরে ফেলেছে। বললে—বল, হুজুরের সামনে বল তুই কোথায় যাবি, সাহেব সাক্ষী থাক আজ।

সরস্বতীয়া কোন কথা বললে না। প্রাণপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললাম—ওর হাত ছেড়ে দাও ছেদিলাল।

ছেদি প্যাটেল আমার কথায় সরস্বতীয়ার হাত ছেড়ে দিলে।

বললাম, শোনো সরস্বতীয়া, তুমি কোথাও যেও না, আমি ছেদিলালকে বুঝিয়ে তোমাকে যা বলবার বলে যাবো।

সরস্বতীয়া চলে গেলো। ছেদি প্যাটেলকে বললাম, তোমার পারা-রোগ আছে, তা-তো আমাকে বলো নি তুমি?

ছেদি প্যাটেল আবার বসলো সেই পুরোনো জায়গাটায়।

বললে, রোগ আছে আমার আছে, তাতে ওর কী?

বললাম, সেই জন্যেই তো তোমার ছেলে হয় না।

ছেদি প্যাটেল হেসে উঠলো। বললে, কী যে বলেন সাহেব, আপনি আমাকে হাসালেন! এ রোগ কার না আছে। এই কদমকুঁয়ার ঘরে-ঘরে তো এই রোগ। শিবু কাহারের আছে, বিশু রাউতের আছে, ওই রাজনন্দ্‌গাঁর জেঠু রাউতেরও আছে, তাদের ছেলে-মেয়ে হচ্ছে না হুজুর? তাহ'লে সরস্বতীয়া নিজেই বা হলো কী করে?

ছেদি প্যাটেলকে আর এ নিয়ে বেশি কথা বলা বাহুল্য মনে হলো। মানুষের শত্রু কোথায় কোন্ স্তরে কী ভাবে কাজ করছে, ছেদিকে দেখে তাই আমার মনে পড়তে লাগলো। এমন তো হবে ভাবি নি। ছেদি প্যাটেল, কদমকুঁয়া গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোক, তারই এই কথা! ছেদি প্যাটেল আরো বলতে লাগলো—আমার বাবারও তো এ রোগ ছিলো হুজুর, আমার আগে অনেক ভাই হয়ে মারা গেছে, কিন্তু আমি হলুম কী করে? আমি তো বেঁচেছি, আমি তো এখনও বেঁচে আছি—বলে আমার দিকে চাইলে ছেদি প্যাটেল একবার।

বললে—আর যদি আমার কথায় বিশ্বাস না-হয় তো চলুন আমার সঙ্গে কদমকুঁয়ায়, চলুন শিউ-তালাওতে, চলুন রাজনন্দ্‌গাঁতে, চলুন হাত্‌বন্ধে—সকলেরই এ রোগ আছে—তাতে কী হয়েছে? তা ব'লে একটা ছেলেও বাঁচবে না? অন্তত একটা ছেলেও তো বাঁচবে! মুরলীয়ার যদি ছেলে হয়ে না বাঁচে, তো সরস্বতীয়ার বাঁচবে, সরস্বতীয়ার ছেলে বাঁচবে না কেন বলুন?

মনে আছে সে-রাত্রে আমার সারা মন যেন কেমন বিষিয়ে উঠেছিল সমস্ত পরিস্থিতিতে। এ আমি কোথায় এলাম! এখানে আমি কেন এলাম! কেন এখানে আমি আসতে গেলাম!

বিরক্ত হয়ে বললাম, তুমি এখন যাও ছেদিলাল, সকালে তোমার ডিউটি আছে। আমিও চলে যাবো, এখন একটু ঘুমোব, তুমি যাও।

ছেদিলালের বোধহয় যাবার ইচ্ছে ছিল না। বললে, আপনি এই মামলার একটা ফয়সালা করে দিয়ে যান সাহেব। আপনি যা বলবেন তাই শুনবো—এই বলে সে চলে গেলো।

কিন্তু ঘুম কী আসে? ভাবলাম ছেদিলাল চলে যেতেই একটু ঘুমোবার চেষ্টা করবো শেষবারের মতো। রাত অনেক হয়েছে! কদমকুঁয়ার মাটিতে তখন আবার নতুন করে বুঝি ঘাসের চারা গজাচ্ছে, ফুলের কুঁড়ি ফুটছে।

দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে খুট্-খুট্ করে আওয়াজ হলো। উঠে খুলে দিতে গিয়েই দেখি—সরস্বতীয়া!

বললাম—তুমি আবার কী চাও!

সরস্বতীয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কতক্ষণ! যেন কিছু বলবে ও আমাকে। আবার বললাম—কিছু বলবে?

সরস্বতীয়া বললে—আমি আমার মরদের সঙ্গে কোনওদিন শোব না সাহেব, তুমি যেন কোনোদিন শুতে বলো না।

বললাম—আমি শুতে বলবো, কে বলেছে তোমাকে?

সরস্বতীয়া বললে—না আমি বলে রাখছি তোমাকে, তোমার কথা এড়াতে পারবো না! তুমি যেন কোনোদিন শুতে বোলো না আমাকে।

বললাম—ও-ও তো একটা রোগ, রোগ সেরে গেলে তারপর শুতে তোমার আপত্তি কী?

সরস্বতীয়া বললে, ওর ও-রোগ আর সারবে না সাহেব।

অভয় দিয়ে বললাম—কেন সারবে না? আজকাল অনেক ভালো-ভালো ওষুধ বেরিয়েছে, ডাক্তার দেখালেই সারবে।

সরস্বতীয়া বললে—তাহ'লে সাহেব, একটা কথা—

বললাম, বলো তোমার কী কথা।

সরস্বতীয়া বললে, তুমি যেদিন এসে বলে যাবে ওর রোগ সেরে গেছে, সেদিন থেকে আমি ওর সঙ্গে শোব, তার আগে নয়।

বললাম—ঠিক আছে, এবার তুমি যাও, আমি একটু ঘুমোব।

বিধাতার দরবাবে অনেক মানুষ আরজি জানায়, কিন্তু বিধাতা পুরুষ সকলের আরজি শোনেন কিনা, তার খবর কেউ জানে না। কিন্তু যদি শুনতেন তো একটা আরজি তাঁকে জানাতাম। মাত্র একটা আরজি! শুধু বলতাম, ছেদি প্যাটেলকে তুমি একটা ছেলে দাও। আব না দাও তাতে আমার কিছু বলবার নেই—কিন্তু সরস্বতীয়াকে তুমি আর এমন করে কষ্ট দিও না।

কষ্ট? কষ্টের কথা কদমকুঁয়ার কেউ জানে না। জানে শুধু একজন। সে হলো দেওকীনন্দন! দেওকীনন্দন ঝা! শিউকিষণের রামলীলা দলের পালায় সে লছমন সাজতো!

সত্যিই দেওকীনন্দনকে আমি দেখিনি। শুধু সরস্বতীয়ার মুখে তার নাম শুনেছি। সেই সরস্বতীয়ারই আবার অন্য এক রূপ দেখেছিলাম পরে।

সে যেন বর্ষার ঢল্। একেবারে উপচে পড়েছে। ছল্-ছল্-ছলাৎ শব্দ করে গ্রাম জনপদ সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এমন ঢল্। হলুদে ছোপানো শাড়ি, কানে বেলকুঁড়ির গয়না। চোখে আবার সানগ্লাস।

যেন অন্য চেহারা। চেনাই যায় না সরস্বতীয়াকে!

বললাম—সানগ্লাস কার? কে কিনে দিয়েছে তোমাকে?

সরস্বতীয়া সারা সময় ছটফট করে বেড়াচ্ছে। আমার কথা শুনতে পায়নি যেন। কোন্ আনন্দে সে নিজেই যেন উচ্ছল! গুন্‌গুন্ করে বোম্বাই সিনেমার গান গাইছে। আবার বললাম—কে দিয়েছে তোমায় সানগ্লাস?

সরস্বতীয়া বললে—ওই দেওকীনন্দন!

দেওকীনন্দন! নাম শুনেই চিনতে পারার মত বিখ্যাত নয় নামটা।

বললাম—দেওকীনন্দন কে?

সরস্বতীয়া সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—দেওকীনন্দন আমাদের বাড়িতে এসেছিল সাহেব, আমি তাকে খাইয়েছি নিজের হাতে রান্না করে। তোমার এই ঘরে বসে সে খেয়ে গেছে, এই খাটিয়ায় সে শুয়েছে।

বললাম—কে সে? তোমার কে হয় সে?

সরস্বতীয়া বললে—হুজুর, দেওকীনন্দনকে তুমি চিনবে না, সে যে লছমন।

—লছমন?

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ, কদমকুঁয়ায় তিন রাত রামলীলা গাইতে এসেছিল শিউকিষাণের দল। দেওকীনন্দন যে রামলীলা পালাতে লছমন সাজে।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিলাম।

সরস্বতীয়া বললে—আমাকে এই চশমাটা দিয়ে গেছে দেওকীনন্দন।

সরস্বতীয়া চশমাটা চোখে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কালো কাঁচ, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ভেতরে। হয়তো আমার কাছে কিছু তারিফ শুনতে চেয়েছিল সরস্বতীয়া! সরস্বতীয়া আমাকে চমকে দেবার জন্য বললে—জানো সাহেব, দেওকীনন্দন মুম্বাই যাবে।

মুম্বাই? বললাম, মুম্বাই যাবে দেওকীনন্দন?

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ সাহেব, সত্যি যাবে।

বললাম, কেন? রামলীলা করতে?

সরস্বতীয়া বললে—ওখানে ফিলিম্ করবে দেওকীনন্দন—দেওকীনন্দন বলেছে, রামলীলা আর করবে না—ফিলিম্ করবে, ফিলিমে নাম হয়, অনেক টাকা হয়। তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা হুজুর, বোম্বাই কত দূর?

থাক্ গে। এ-সব অনেক পরের কথা, পরেই বলা ভালো।

সেদিন ভোরবেলাই উঠে পড়েছি! রামসহায় ভোরেই এসে উঠিয়ে দিয়েছে! উঠে দেখি মুরলীয়া সরস্বতীয়া দু'জনেই কখন উঠে সংসারের কাজে লেগে গেছে। ছেদি প্যাটেলও তৈরি হচ্ছে ডিউটিতে যাবার জন্যে।

আমারও যাবার সময় হয়েছিল। ছেদি প্যাটেল আমার ঘরে এলো।

বললে—সাহেব, আমি আপনার মালগুলো নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—

বললাম—রামসহায় আসবে, সে-ই নিয়ে যাবে'খন, তোমার দরকার হবে না।

রামসহায় সত্যিই তখনও আসে নি। সারারাতই প্রায় আমার ঘুম হয়নি বলতে গেলে। কেমন যেন ক্লান্তি লাগছিলো। কোথায় যেন কোন অলক্ষ্যে একটা ব্যথা জমে উঠেছিল আমার মনের মধ্যে, তার ক্লান্তিতেও বেশ ভারি লাগছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিলো ছেদি প্যাটেলের সঙ্গেও যেন আর ভাল লাগবে না। ছেদি প্যাটেলকে আগেও দেখেছি, অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু তাকে এমন কুৎসিৎ কখনও মনে হয়নি। হয়তো এমনই হয়। এমনি হওয়াটাই হয়ত স্বাভাবিক।

কিন্তু মনে হলো ছেদি প্যাটেলের অন্দর-মহলের খবর যেন আমার না জানলেই ভালো হতো। বাড়ির ভেতরে মুরলীকে দেখতে পাচ্ছি। কাজকর্ম করছে।

সরস্বতীয়া যে কোথায়, তা টের পাচ্ছি না। হয়তো কোথাও আড়ালে রয়েছে, সামনে আসতে চাইছে না। বিশেষ করে দিনের আলোয়। মুরলীয়াই চা দিয়ে গেল। মুরলীয়াই কয়েকটা চালের পিঠে দিয়ে গেলো একটা রেকাবি করে। কিন্তু খেতে যেন মন উঠছিল না আর।

ছেদি প্যাটেল সবুজ কুর্তাটা পরে নিলে। বললে, চলুন হুজুর—

বললাম—কেন তুমি তোমার এখানে আসতে বলেছিলে ছেদি, আমি তো নিজে থেকে আসতে চাইনি—

ছেদি প্যাটেল বললে, সাহেব আমার মা-বাপ, সাহেব আমার সব গোস্তাকি মাফ করতে হবে হুজুর, আমি আপনার পায়ে পড়ছি হুজুর।

কথা বলতে-বলতে ছেদি প্যাটেল সত্যিই আমার পায়ে পড়তে গেল! বাধা দিলাম। পা টেনে নিয়ে বললাম—থাক, তুমি তোমার ডিউটিতে যাও।

ছেদি বললে—বলুন হুজুর আপনি আমাকে মাফ করেছেন তো?

বললাম—ছেদি, তোমার রোগ আছে তা আগে বলোনি কেন আমাকে?

ছেদি আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বললাম, বিয়ে করে একটা কচি মেয়ের জীবন তুমি বরবাদ করে দিতে চাও নাকি? বিয়ে করেছ বলে ভেবেছ সে তোমার কেনা বাঁদি হয়ে থাকবে? তুমি ভেবেছ কী?

ছেদি প্যাটেলের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরুল। বললে, হুজুর আপনি বলছেন কী! আমি বউ-এর ওপর জুলুম করবো না, তো কার ওপর করবো? সরস্বতীয়া যে আমার চুড়ি-পরানো বউ হুজুর, আমি তো পরের বউ-এর গায়ে হাত দিই নি।

বললাম, কিন্তু তোমার রোগ আছে, তা তুমি জানো না? সারাও না কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে, রোগ কিসের হুজুর, সরস্বতীয়া আপনাকে বলেছে বুঝি? এ-রোগ কার নেই ছত্রিশগড়ে? আমার কী একলার রোগ আছে? বলুক তো সরস্বতীয়া, আমার সামনে বলুক ও।

ছেদি প্যাটেল বেশ রেগে গেছে মনে হলো।

বললাম, পারা-রোগটা তো ভালো নয়, সারিয়ে নাও না কেন?

ছেদি প্যাটেল বললে, কে সারাবে হুজুর? মুরলীর ছেলেটা যখন মরলো তার আগে টিল্‌ডা-মিশনের মেম-ডাক্তারের কাছে গিয়ে কত কান্নাকাটি করলুম, কত হাতে-পায়ে ধরলুম, কিছুই হলো না সাহেব। মাঝখান থেকে খালি আমার তিন কুড়ি টাকাই নষ্ট হয়ে গেল।

বললাম, তুমি তোমার নিজের চিকিৎসা করাও আগে, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো—

ছেদি প্যাটেল বললে, ডাক্তাররা যে টাকা নেয় কেবল, রোগ সারায় না।

বললাম, সে কি? মিশন তো টাকা নেয় না, তারা তো রোগ সারাবার জন্যেই ডাক্তারখানা খুলেছে এখানে—

মনে আছে, সেদিন কদমকুঁয়া থেকে ফেরবার আগে অনেক করে বুঝিয়েছিলাম ছেদি প্যাটেলকে যে সে যদি রোগটা সারিয়ে ফেলে তো তার নিজেরও শান্তি, তার বউদেরও শান্তি।

শাস্তি হলে তবে তাদের ছেলে-পুলে হবে, আর তার অবর্তমানে তার জমিজমা সম্পত্তি দেখবার একটা লোকও হবে! ছেদি প্যাটেল আমার কথা কিছুতেই শোনে নি শেষ পর্যন্ত। বলেছিল, টিল্‌ডা-মিশনের ডাক্তারখানায় আমাকে যেতে বলবেন না হুজুর, অনেক টাকা দিয়েছি, কিছুই কাজ হয়নি।

বলেছিলাম, কাকে টাকা দিয়েছ? ডাক্তারকে?

ছেদি প্যাটেল বলেছিল, ডাক্তারখানার খানসামাকে দিয়েছিলাম হুজর, ডাক্তার নাকি চেয়েছিল।

বলেছিলাম, তুমি এবার বিলাসপুরের ডাক্তারখানায় এসো। ডাক্তার সেনকে আমি বলে রাখবো, দেখো একটা পয়সাও লাগবে না।

রামসহায় শেষ পর্যন্ত যখন আমাকে থার্টিন ডাউনে তুলে দিয়েছিলো তখনও আমি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ছেদি প্যাটেলকে—ঠিক যেও কিন্তু বিলাসপুরে, ডাক্তাব সেনকে আমি বলে রাখবো, একটা পয়সাও লাগবে না তোমার—

তারপরে আমার ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিলো। কদমকুঁয়ার কথা হয়ত ভুলে যেতাম। কিন্তু ভোলা হল না। কেন ভোলা হলো না তাই বলি।

কদমকুঁয়া থেকে ফিরে এসে আবার নিজের কাজে ডুবে গিয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আবার যে শিকারে যাইনি তা নয়। ডি-কস্টা সাহেবের কথামতো গিয়েছিলাম খোদ্‌রিতে, খোংশাড়াতে। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

হঠাৎ রামসহায় একদিন বিলাসপুরে এলো। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস পরে!

বললাম, কী খবর রামসহায?

রামসহায় বললে—হুজুর, সরস্বতীয়া আপনাকে একবার ডেকেছে!

অবাক হযে গেলাম! বললাম, আমাকে? কেন?

রামসহায় বললে, তাদের চানা-ক্ষেতে আবার হবিণ নেমেছে হুজুর, বড় উৎপাত করছে, তাই আপনাকে যেতে বলেছে!

বললাম, আর ছেদি প্যাটেল? সে কেমন আছে?

ছেদি প্যাটেলের কথা কিছু বলতে পাবলে না রামসহায়। শুধু বললে, সেই রকমই চাকরি করে টিল্‌ডার গেট-এ—

শেষ পর্যন্ত একদিন আবার ঝোলা নিয়ে, বিছানাপত্র নিয়ে, বন্দুক নিয়ে রওনা হলুম। ছেদি প্যাটেলের তখন ডিউটি ছিল না! বাড়িতে গিয়ে উঠতেই দেখি মরলীয়া। মুরলীয়া বললে—সাহেব, তুমি এসেছো, আমরা খবর দিয়েছিলাম শিউতালাও-এর রামসহায়কে দিয়ে।

বললাম—ছেদি প্যাটেল কোথায়?

মুরলী বললে—ক্ষেতি দেখতে গেছে।

বললাম—আর সরস্বতীয়া?

মুরলী বললে—ওই তো ঘরে বয়েছে।

উঠোনে ঢুকতেই আমার গলার আওয়াজ পেয়েছে সরস্বতীয়া। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই হেসে আমায় অভ্যর্থনা করলে।

বললে—জানো সাহেব, দেওকীনন্দন এসেছে।

দেওকীনন্দন? বললাম—কে দেওকীনন্দন?

দেখি ঘরের ভেতর একটা ছোকরা বসেছিল। কালো লম্বা প্যান্ট পরা। চোখে সানগ্লাস। আমাকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর আস্তে-আস্তে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

সরস্বতীয়া আমাকে সেই ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসালো। দেখি অনেকগুলো সিনেমার চটি বই খাটিয়ার ওপর ছড়ানো। মনে হলো যেন এতক্ষণ এইসব ছবির বই দেখছিল দু'জনে।

সরস্বতীয়া বললে—এই দেওকীনন্দনকে তুমি চেনো সাহেব?

বললাম—না, কে ও?

সরস্বতীয়া বললে—এখানে রামলীলা পালা করতে এসেছে, লছমন সাজে! সাহেব, এতো ভালো গান গায় যে কী বলবো—ওকে আজকে নেমন্তন্ন করেছিলুম হুজুর, আমাদের এখানে খেলো!

তারপর হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হয়েছে যে দেওকীনন্দন চলে গেছে। বললে—দাঁড়াও সাহেব, একবার আমি দেওকীনন্দনকে বলে আসি—বলে সরস্বতীয়া এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেলো।

ঘরের ভেতর ভালো করে চেয়ে দেখলাম। ঘরটার শ্রী যেন এবার ফিরে গেছে। একটা টিনের আয়না ঝুলছে দেয়ালে। ঘরের ভেতর সিগারেটের গন্ধ পেলাম। আগেও এ-ঘরে এসেছি, কিন্তু তখন এ-রকম চেহারা ছিল না এ-ঘরের! সারা ঘরটা গোবর দিয়ে নিকোনো হয়েছে। একটা সাজানো-গোছানো ভাব। খাটের ওপর বসেছিলাম। রামসহায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। রামসহায় এলে তবে বেরোব। সে তার বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে আসবে। চারিদিকে ধূসর দুপুর। হঠাৎ টিপিটিপি পায়ে ঘরে এলো মুরলীয়া। বললাম—কোথায় গেলো সরস্বতীয়া?

মুরলীয়া বললে—সাহেব, সরস্বতীয়া আজকাল বড় বদলে গেছে, কারো কথা আর শোনে না—দেখো না ওই দেওকীনন্দনের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।

বললাম—কোথায় গেলো?

মুরলীয়া বললে—কী জানি কোন্ চুলোয়। আগে তবু আমার কথা একটু-আধটু শুনতো, এখন মোটেই শোনে না।

বললাম—ওই দেওকীনন্দনটা কে?

মুরলীয়া বললে—ওই তো ছোঁড়া জুটেছে একটা, এখানে কদমকুঁয়ায় রামলীলা গান করতে এসেছিল, আমার মরদ ওর গান শুনে ওকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল, ভগবানের নাম-টাম করে কিনা—তাই ওকে নিয়েই পড়েছে সরস্বতীয়া।

জিজ্ঞেস করলাম—ছেদি প্যাটেল কিছু বলে না?

মুরলীয়া বললে—প্রথম-প্রথম কিছু বলতো না, ভাবতো ভগবানের নাম করে, ভারি ভালো ছেলেটা, নিজে এনে বাড়িতে একদিন খাইয়ে ছিল আর গান শুনেছিল। এই উঠানে বসে অনেক গান গাইলো হুজুর, কিন্তু সরস্বতীয়া ছাড়লে না, বললে—আর একদিন গাইতে হবে।

বললাম—তারপর?

মুরলীয়া বললে—তারপর থেকে রোজ দুপুরবেলা ঘরে আসে, সরস্বতীয়ার সঙ্গে ফুসুর-ফুসুর করে—মরদের রাতে ডিউটি থাকলে ওর সুবিধে হয় ভারি। এই দেখ না সাহেব, আজ ঠিক খবর পেয়েছে যে মরদ ক্ষেতি দেখতে গেছে—আর ঠিক এসেছে, তুমি না এলে আরো কিছুক্ষণ থাকতো।

মুরলীয়া আরো অনেক কথা বলতে লাগলো! বললে, সব নসীব হুজুর, আমিই জোর করে ওকে ঘরে আনলুম, ভাবলুম আমার ছেলে হয় না, সরস্বতীয়ার যদি ছেলে হয়, তবু মরদটা মনে একটু শান্তি পাবে, আদমীটা মনে একটু সুখ পাবে! তার মনে মোটে সুখ নেই সাহেব, এত যে খাটে, রাত জেগে ডিউটি করে, ক্ষেতি খামার করে—বলতে পারেন কার জন্যে করে?

সত্যিই তো কার জন্যে এসব! কার জন্যে এই টাকা-কড়ি, ক্ষেত-খামার।

মুরলী বলতো—দেওকীনন্দন তোর ঘরে কেন আসে রে সরস্বতীয়া?

সরস্বতীয়া বলতো—বেশ করবে আসবে, তার খুশি সে আসবে।

—এবার তাহ'লে মরদকে বলে দেবো!

সরস্বতীয়া বলতো—দে না বলে, আমি কি ভয় করি। আমি কী তোর মতো বিয়ে করা বউ? আমি তো চুড়ি-পরানো বউ! আমার যার সঙ্গে খুশি মিশবো—আমার যা খুশি তাই করবো, তোর কী?

মুরলী বললে—কাল থেকে এখানে আসতে বারণ করে দিবি ওকে।

সরস্বতীয়া বললে—কেন বারণ করবো শুনি! ও তো চলেই যাবে।

—কোথায় চলে যাবে?

সরস্বতীয়া বললে—বোম্বাই, ফিলিম্ করবে! 'নাগিন' ছবি দেখেছিস্, সেই রকম ছবি করবে দেওকীনন্দন, রামলীলা আর করবে না ও, আমাকে বলেছে।

মুরলী বললে- [illegible] যাবে ও?

সরস্বতীয়া বললে—বোম্বাইতে চিঠি লিখে, ফিলিমে চাকরি করবে দেওকীনন্দন, জানিস্?

আমাকে মুরলী বললে, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো সাহেব, মরদের সংসার ভেঙে যাবে একেবারে, সব ভেসে যাবে হুজুর, সরস্বতীয়াই বা কী সুখ পাবে, ভেবেছ।

মনে আছে, সেদিনই ছেদি প্যাটেলের সংসারের ভাঙনের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ছেদি প্যাটেল তো আর পাঁচজন মানুষের মতোই ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। তার বেশি কিছু চায়নি তারা। একটা বাঁধা চাকরি, কিছু জমি-জমা আর একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ, যেমন সবাই চায়। সারা পৃথিবীর লোক তাই চায়। আর কিছু নয়। কতদিন দেখেছি ছেদি প্যাটেল ঘামতে-ঘামতে এসেছে ডিউটি করে, এসে একটা টুলের ওপর বসেছে। মুরলী জল দিয়েছে, গামছা দিয়েছে এগিয়ে। আর সরস্বতীয়া?

সরস্বতীয়া যেন ভিন্ দেশের লোক। এ-বাড়িতে এসে যেন বন্দী হয়ে আ[illegible]। তারই বা কী দোষ! সমস্ত সংসার যেন অনেকখানি আশা নিয়ে তারই মুখের দিকে চেয়ে থাকতো কেবল। যেন সে-ই একমাত্র এ-সংসারকে বাঁচাতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের প[illegible] মাস ছেদি প্যাটেল ডিউটি করছে আর আশা করছে একদিন হয়ত সরস্বতীয়া বুঝবে, একদিন সরস্বতীয়ার সুমতি হবে, তার ঘরে আসবে, রাত্রে তার বিছানায় এসে শোবে। তারপর এ-সংসারে সমস্ত নিরানন্দ একদিন একজনের আবির্ভাবে দূর হয়ে যাবে। এই জমি-জমা এই বাড়ি-ঘর-দোর আবার এক নতুন মানে খুঁজে পাবে। ভগবানের আশীর্বাদ তো সেই জন্যেই চেয়েছিল ছেদি প্যাটেল। ঈশ্বরের নাম-গানের অনুষ্ঠান সেই জন্যেই বসিয়েছিল বাড়িতে। রামজীর কৃপায় সব দুঃখ, সব নিরানন্দ ধুয়ে মুছে যাবে এ সংসার থেকে।

মেম-ডাক্তার দেখতে আসে মুরলীয়াকে। ছেদি প্যাটেল মেম-ডাক্তারকে দূর থেকে দেখলেই বাড়ির বাইরে পালিয়ে যেত।

মুরলীয়া খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে কাতরাতো এক-একদিন।

—ও মাইয়া গো, মাইয়া গো—

কোথায় কোন্ দূরে কোন্ গ্রামে কাদের বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই তার। ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেলো একদিন ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে। এক কাঁদি কলা, একটা

টিনের তোরঙ্গ আর রূপোর হাঁসুলী পরে বউ হয়ে এসেছিল মুরলীয়া এই ছেদি প্যাটেলের পরিবারে। তারপর কত জায়গায় বদলি হলো ছেদি প্যাটেল। চাকরি পেয়ে চলে গেল রামগড়ের গেটম্যান হয়ে। মুরলীয়াও গিয়েছিল সঙ্গে! ধুলোর ঝড় আর লু চলতো বাইরে। আর একলা ঝুপড়ির ভেতর বসে-বসে মুরলীয়া প্রহর গুনতো। ছেদি প্যাটেল তখন মদ খেত! কিন্তু মদ খেলেও ডিউটির কখনও খেলাপ করতো না। ডিউটির কামাই করতো না। ঝাণ্ডি নিয়ে গেট সামলাতে ব্যস্ত। ঘরের বউয়ের দিকে দেখবার তার সময় ছিল না।

মুরলীয়ার সে-সব দিনগুলোর কথা মনে আছে বৈকি।

সব সহ্য করেছে মুরলীয়া। শুধু একটি আশা বুকে নিয়ে, একটি ছেলে হবে তার। বিটা ছেলে!

মেম-ডাক্তারের কাছে গিয়ে কতদিন কেঁদে পায়ে ধরতে গেছে মুরলীয়া। বলেছে—আমাকে একটি ছেলিয়া দাও মেম-ডাক্তার!

মেম ডাক্তার বলেছে—আগে তোর মরদের রোগ সারা, তবে তো ছেলে হবে তোর।

ছেদি প্যাটেলকে সে-কথা বলতেই সে হুমকি দিয়েছে। বলেছে—রাখ্ তোর মেম-ডাক্তারের কথা, আমি মরদ আছি, আমি কিছু বুঝি না! ওষুধে যদি রোগটা সারাতে পারবে তবে তোর ছেলেকে বাঁচাতে পারলো না কেন মেম-ডাক্তার? কেন তিন কুড়ি টাকাটা নিল মিছিমিছি?

মুরলীয়া কিছু জবাব দেয়নি। শুধু কেঁদেছে মনে-মনে। মরদ তো পুরুষ মানুষ। গাঁয়ের প্যাটেল। সব বোঝে সে। বেলে কাজ করে তার মরদ। লাল ঝাণ্ডি দেখিয়ে ডাকগাড়ি থামিয়ে দেয়। কত তার ক্ষমতা, কত তার ইজ্জৎ! সে বুঝবে না তো কে বুঝবে?

ছেদি প্যাটেল বলে—জগাইয়ের ছেলে হলো তবে কী করে, বল? আমাদের পেলেটিযার সাহেবের ছেলে হচ্ছিল না, শেষে আর একটা বিয়ে করলো প্রথম বউ মারা যাবার পর, তার কী করে ছেলে হলো, সত্যি কিনা, চল দেখে আসবি চল?

মেম-ডাক্তার মুরলীকে দেখে যাবার সময় সরস্বতীয়াকে আড়ালে ডাকে। বলে, কী রে, মরদের কাছে শুস্ না কি?

সরস্বতীয়া হাসে! বলে—না মেম-সাহেব, তুমি বলে দিয়েছো, আমি আর শুই?

মেম-ডাক্তার বলে—খুব সাবধান সরস্বতীয়া, তাহ'লে আর তোর ছেলে হবে না, ছেলে হলে সেও মরে যাবে।

সরস্বতীয়া বলে—আমার ছেলিয়া হবে না মেম-সাহেব, আমি শুবোই না মরদের কাছে।

মেম-ডাক্তার আরো ভয় দেখায়! বলে—তোরও তাহ'লে রোগ হবে, রোগে মুরলীয়ার মত তুইও ছটফট করবি আর কাঁদবি।

মেম-ডাক্তার চলে যায়।

মুরলীয়া জিজ্ঞেস করে, মেম-ডাক্তার তোকে কী বললে রে সরস্বতীয়া!

সরস্বতীয়া বললে—মরদের কাছে শুতে বারণ করলে মেম-ডাক্তার।

মুরলীয়া আরো কাঁদে। বলে—তুই মরে যা না সরস্বতীয়া, তুই মরে যা, আমি মরে যাই, সবাই মরে যাক্, দরকার নেই ছেলিয়ার—তুই মর, মর তুই সরস্বতীয়া।

সরস্বতীয়া খিলখিল করে হাসে। বলে—তুমি মরো না, আমি কেন মরতে যাবো শুনি?

মুরলী বলে—মরবি না তো কী করবি শুনি?

সরস্বতীয়া আরো জোরে হেসে উঠে। বলে, আমি বোম্বাই যাবো।

মুরলী বলতো—বেরো হারামজাদী, বেরো তুই আমার সামনে থেকে—বেরো তুই, বেরো-বেরো।

সেদিন ছেদি প্যাটেলকে মুরলীয়া বললে—বিলাসপুরের ডাক্তারখানায় একবার চলো না, সাহেব বলে গিয়েছিল যেতে, বলেছিল টাকা লাগবে না, চলো না একবার।

ছেদি প্যাটেলের দিন-দিন যেন কী হয়েছিল। কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না। সব ঝুট্‌বাজি। বিলাসপুরের ডাক্তারও যা, ও তোর টিল্‌ডামিশনের ডাক্তারও তাই। রোগ সারবে না, শুধু ক-কুড়ি টাকা গুনে দিয়ে আসতে হবে।

মুরলীয়া বলেছিল—সাহেবের চেনা ডাক্তার, ওরা ভালো লোক—চলো না গো একবার।

শেষ পর্যন্ত ছেদি প্যাটেল ট্রেনে উঠেছিল মুরলীয়াকে নিয়ে। প্যাসেঞ্জার টেনে উঠে বিলাসপুরে গিয়ে হাজির। পুরনো জায়গা, অনেক বছর কেটেছে বিলাসপুরে। সোজা ডাক্তারখানায় গিয়ে টিকিট করলে। লোহার চাক্‌তি দিলো হাসপাতালের চাপরাশি। জিজ্ঞেস করলে—কী রোগ?

ছেদি প্যাটেল বললে—পারা-রোগ সরকার।

—কার?

প্রাথমিক ভয় কিছুটা গোপন করে ছেদি প্যাটেল মুরলীয়াকে দেখিয়ে বললে, এর আর আমার।

চাপরাশি বললে—টাকা লাগবে, ডাক্তারের হুকুম আছে, পারা হলে নোকরি চলে যাবে।

ছেদি প্যাটেল আরও ভয় পেয়ে গেল। বললে—নোকরি চলে যাবে?

চাপরাশি বললে—কোম্পানীর চাকরি, টাকা দিলে ডাক্তার-সাব চেপে দিবে।

ছেদি প্যাটেল বললে—কত টাকা?

চাপরাশি বললে—কত টাকা আছে তোর কাছে?

ছেদি প্যাটেল বললে—টাকা তো আনি নি সরকার।

চাপরাশি রেগে গেল। বললে, টাকা নেই তো ডাক্তারখানায় এসেছিস্ কেন? যা, তোর নোকরি চলে যাবে।

তাড়াতাড়ি চাক্‌তি ফেরত দিয়ে ছেদি প্যাটেল আবার টিল্‌ডায় ফিরে চলে এসেছিলো। তারপর মুরলীয়াই কাঁদতে-কাঁদতে আমাকে একদিন এ ইতিহাস বলেছিল। বলেছিল—আমার মরদের তো কোনও দোষ নেই হুজুর, সবাই খালি টাকা চায়, টাকা নিতেই চায় সবাই, টিল্‌ডার মিশনের ডাক্তারও যা, ওই বিলাসপুরের রেল-ডাক্তারও তাই।

আবার সেই টিল্‌ডা, আবার সেই কদমকুঁয়া, আবার সেই রোগ-যন্ত্রণা। আবার সেই কান্নার পুনরাবৃত্তি। ছত্রিশগড়ের মানুষের কান্নায় সমস্ত কদমকুঁয়া যেন ভরে গিয়েছিল সেদিন। বিলাসপুরের ডাক্তারকেই আমি বলে এসেছিলাম, কিন্তু তার আফিসের চাপরাশিকে তো বলে আসা হয় নি। সেদিন হতাশ দু'টি প্রাণী যে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো, তার জন্যে কে দায়ী, তা আমি আজও ঠিক করতে পারি নি। রেলের যে ঘুষ ধরা চাকরি আমার বন্ধ করার জন্যই যে আমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে—সেই আমিই কোন উপকার করতে পারলাম না ছেদি প্যাটেলের, এ-ও কী আমার কম লজ্জা। মুরলীয়ার সামনে আমি যেন লজ্জায় আধমরা হয়ে গেলাম। কোথায় এব প্রতিবিধান আর কিসে এর প্রতিকার হয়, তা যে আমারও জানা নেই।

ছেদি প্যাটেল পরে আমাকে বলেছিল—দেখবেন সাহেব, সব মানুষের একদিন আমার মত দশা হবে, আমি যেমন কাঁদছি, সবাই এমন করে কাঁদবে—কারোর ভালো হবে না।

আমার তো তখন কিছু বলবার ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, পৃথিবীর সব মানুষেরই দশাই যেন ছেদি প্যাটেলের মত। কোথাও কোনওখানে যেন তার সান্ত্বনা নেই। অথচ কী নেই পৃথিবীতে? রোগ আছে, কিন্তু তার ওষুধও তো আছে। দুঃখ আছে, কিন্তু তার প্রতিবিধানও তো আছে। যাদের জন্যে পুলিশ, পাহারা, ডাক্তার, আদালত, কল-কারখানা, সেই মানুষেরা কতটুকু তার উপকার পায়? এই তো আমি! আমিই তো আছি ঘুষের প্রতিবিধান করতে, কিন্তু পেরেছি কী ছেদি প্যাটেলের দুঃখ দূর করতে?

দুপুরবেলায় কদমকুঁয়ার মাঠে ঘুরতে-ঘুরতে সেই কথাই ভাবছিলাম। ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি আসাব পর থেকে। মুরলীয়ার কথাগুলোই ভাবছিলাম। বামসহাযও ছিল আমার সঙ্গে। চানার ক্ষেতগুলোর ভেতরে লুকিয়ে-লুকিয়ে বন্দুক নিয়ে ঘুরছিলাম। শিকারের নেশা। ডি-কষ্টা সাহেব কী যে এক শিকারের নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। কিছুদিনের জন্যে শিকার ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারতাম না। অথচ কিসের দরকার ছিল? কী আনন্দ পেতাম? কার উপকার হতো?

ছেদি প্যাটেল আরো বলেছিলো—আমি তো কারোর মন্দ করি নি সাহেব, তবে আমার এই দশা হলো কেন?

সত্যিই তো, পরের মন্দ না করলেও কেন নিজের মন্দ হয়? মানুষের সব ভালো-মন্দেব যারা জিম্মাদার, তাবা কেন মানুষেব মন্দ করে? কার ভালো হয় তাতে? ডি-কষ্টা সাহেবের কথা আলাদা।

ডি-কষ্টা সাহেব বলতো—এন্‌জয় ইযোর লাইফ ম্যান, আনন্দ করে নাও মিস্টার, পৃথিবীতে ওইটুকুই তোমাব লাভ, আর সব কিছু তো ব্লাফ্।

হঠাৎ রামসহায সতর্ক হয়ে বললে—ওই যে হুজুর হরিণ আসছে।

শিউতালাও-এর দিক থেকে একেবারে দিক-চক্রবাল ঘেঁষে উঁচু জমি থেকে ঢালুতে নেমে আসছে হরিণেব পাল। চানা-ক্ষেতের সবুজ ডাঁটাগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িযে আছে। ঠায় দুপুর। একটা শিশুগাছের আড়ালে নীচু হয়ে বসলাম। আজ আর শুধু হাতে ফিরব না। ছেদি প্যাটেলের আর একটা কথা মনে পড়লো—আমাকে বেঁধে রাখছো কেন সাহেব, আমি তো পাগল হই নি, আমাব শেকলটা খুলে দাও না সাহেব।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে টিপ্ করতেই বুঝি একটা খস্‌খস্ শব্দ হলো, আর চোখেব নিমেষে সব হরিণের পাল কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো। রামসহায় হতাশ চোখে আমাব দিকে চাইলো।

আমিও কেমন যেন ব্যর্থ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলাম। রামসহায় বললে—হুজুব গলতি হো গয়া—আবার আসবে, একটু চুপ কবে বসে থাকুন—

আমাব কিন্তু তখনই অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। সারাদিন মাথাব ওপব দিয়ে তপ্ত রোদ কেটে গেছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছি আমি।

আগুন জ্বলছিল মনে। কিসের বিরক্তি কী জানি। কতকগুলো প্রাণীকে হত্যা কবতে পাবলাম না—এ কি তারই আফ্‌শোষ! বললাম, তুমি যাও রামসহায়, এখন আর হবে না।

বারবার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হয় মন, তখন বোধহয় বিশ্রাম চায় শরীর!

রামসহায় বললে—চা করে আনবো হুজুর? ছেদি প্যাটেলেব বাড়ি কাছে---আমি এখুনি আনছি গিয়ে—

রামসহায় চলে গেলো হতাশ মনে।

কিছুতেই সেদিন আর শিকারে মন বসাতে পারলাম না। বন্দুকটা নিয়ে একাই ফিবছিলাম ছেদি প্যাটেলের বাড়ির দিকে। চানা-ক্ষেত পেবিয়ে শিশুগাছের খানিকটা জঙ্গল। তারপব ছেদি প্যাটেলের এলাকা। মেঠো পথ এঁকেবেঁকে গেছে ছেদি প্যাটেলের বাড়ির দিকে। সেখানেই ছেদি প্যাটেলের তালাও। খুব জল-তেষ্টাও তখন পেয়েছে আমার।

পথ দিয়ে আসতে-আসতে হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, 'সাহেব'। ফিরে দেখি সরস্বতীয়া। বাসন্তী রঙ-এর শাড়ি তার পরনে, একটা মাটির কলসী নিয়ে তালাও থেকে জল তুলতে এসেছে। বিকেলের সূর্য তখনও হেলে পড়ে নি। সরস্বতীয়ার মুখের ওপর চিক্‌চিক্ করছে পড়ন্ত রোদ। আমাকে দেখে হাসছে সরস্বতীয়া মুখ টিপে-টিপে। সরস্বতীয়া আমার খালি হাতের দিকে চেয়ে বললে—ক'টা হরিণ মারলে গো সাহেব?

লজ্জা হয়েছিলো বৈকি একটু। হাসলাম আমিও।

কলসীটা পাড়ের ওপর রেখে তরতর করে আমার দিকে ছুটে এলো সরস্বতীয়া। শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে আলো ঠিকরে উঠে পিছলে যাচ্ছিল বারবার। একেবারে কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো সে কোমরে হাত দিয়ে।

বললাম—জল তুলতে এসেছো বুঝি?

সরস্বতীয়া সেই রকম করে হেসে উঠলো।

বললে—না, তোমার শিকার দেখতে এসেছি সাহেব।

বললাম—শিকার কিছু মেলে নি আজ সরস্বতীয়া।

সরস্বতীয়া বললে—দেওকীনন্দনকে দেখলে তো সাহেব, তখন?

বললাম—দেখলাম তো—

সরস্বতীয়া বললে—কেমন দেখলে বলো?

বললাম—ভালোই!

সবস্বতীয়া বললে—ও বলছিল, তোমাকে একটা খত্ লিখে দিতে।

বললাম—খত্! কাকে? কোথায়?

সবস্বতীয়া বললে—ও তো ইংরাজী লিখিপড়া জানে না, বলছিলো, সাহেব যদি খত্ লিখে দেয় তো, ওর একটা নোক্‌রি হয়ে যায়।

বললাম—কোথায় লিখতে হবে!

সরস্বতীয়া বললে—বোম্বাইয়ে ফিলিম্ কোম্পানীতে। ওকে মানাবে না?

বললাম—আমি তো ওকে ভালো করে দেখিনি।

সরস্বতীয়া বললে—'নাগিন' দেখেছো সাহেব, 'নাগিন'?

বললাম—না, আমি দেখিনি।

কী জানি, আমার কথায় যেন আমার ওপর করুণা হলো সরস্বতীয়ার। এতদিনের সব শ্রদ্ধা ভক্তি যেন এক নিমেষে তুচ্ছ হয়ে গেল।

আবার বললে—সত্যি 'নাগিন' দেখোনি?

কি করে বোঝাবো সবস্বতীয়াকে যে আমি সিনেমা দেখি না, তা ভেবে পেলাম না। বিলাসপুবে সিনেমা আছে বটে, কিন্তু সিনেমার কোনও আকর্ষণই যে আমি বোধ করি না, এই কথা বললে সরস্বতীযা হয়তো বিশ্বাসই করতো না। শুধু বললাম—কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

সরস্বতীয়া বললে—দেওকীনন্দন যে 'নাগিনে'র গান গাইতে পারে। ঠিক সিনেমার যেমন সুর, তেমনি গলা দেওকীনন্দনের—ঠিক একরকম সুর—

বললাম—তবে যে মুরলীয়া বলেছিল, দেওকীনন্দন ভগবানের নামগান করে!

সরস্বতীয়া বললে—সে তো রামলীলার গান সাহেব! আমার মরদের সামনে ভগবানের নাম-গান কবে, কিন্তু আমার কাছে গায় 'নাগিনে'র গান।

আমার চোখের সামনে দেওকীনন্দনের সানগ্লাস-পবা চেহারাটা আবার ভেসে উঠলো। সবস্বতীয়া বললে—আমার মরদ তো বুড়ো মানুষ, তাই ভগবানের নাম-গান ভালো লাগে তাব—আমাব ও-সব ভালো লাগে না সাহেব।

মনে আছে, সেদিন সরস্বতীয়া দেওকীনন্দনের কথা বলতে গিয়ে যেন পঞ্চমখ হয়ে উঠেছিল। বারবার শুধু দেওকীনন্দনের কথা বলছিলো। আগের বারও এসেছি কদমকুঁয়ায়, সেবার কিন্তু সরস্বতীয়া এমন ছিল না। সেবার ছিল সরস্বতীয়ার শুধুই রূপ, এবার যেন চটক। এবার যেন চোখ ঝলসানো ধার! চোখে-মুখে-দেহে-যৌবনে সরস্বতীয়া যেন সত্যিই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। দেখে আমার ভয় হলো।

সরস্বতীয়া বললে—দাঁড়াও সাহেব, গাগরিতে জল ভরে নিয়ে আসি, তোমার চা করে দেবো।

বললাম—কেন, মুরলীও তো চা করে দিতে পারে—

সরস্বতীয়া বললে—না সাহেব, মুরলীয়া আবার এলিয়ে পড়েছে, বোখার হয়েছে তার—

বললাম—কেন, সকালবেলা তো দেখে এলাম বেশ ভালো ছিলো—হঠাৎ কী হলো?

সরস্বতীয়া বললে—আবার কী হবে? তোমাকে তো সব বলেছি সাহেব—

বললাম—মেম-ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে না?

সরস্বতীয়া বললে—ওর আব সারবে না সাহেব, মেম-ডাক্তার বলেছে—

হঠাৎ সরস্বতীয়া করলে কি, আমার হাত চেপে ধরল!

সরস্বতীয়ার দিকে ফিরে চাইতেই দেখি সরস্বতীয়া ইঙ্গিতে আঙ্গুল দিয়ে দূরের দিকে দেখালে। সেই দিকে চেয়ে দেখি আর একদল হরিণ শিউতালাও-এর দিক থেকে চানা-ক্ষেতের দিকে আসছে। একটু দ্বিধা করলাম। তারপরেই বন্দকটা সামলে নিয়ে সামনেব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—

হঠাৎ সরস্বতীয়া বললে—দাঁড়াও সাহেব—তোমাকে শাড়ি দিচ্ছি—

বলেই মাটিব কলসীটা নামিয়ে রেখে একটা শিশুগাছের ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকোল। হঠাৎ সরস্বতীয়ার ব্যাপাব দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় লুকোল সরস্বতীযা? বুঝতে পারছিলাম না, সরস্বতীয়ার কী মতলব!

হঠাৎ ঝোপের দিক থেকে সরস্বতীয়ার বাসন্তী রঙ-এর শাড়িটা মাথার ওপব এসে পডলো। শাড়িটা নিয়ে কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। তখন ঝোপের ভেতব থেকে সবস্বতীয়া বললে—জেনানা সেজে যাও সাহেব, নইলে পালিয়ে যাবে—

এক মুহূর্তে বুঝে নিলাম ব্যাপারখানা। সার্ট-প্যান্টের ওপর সরস্বতীযাব ছাড়া বাসন্তী বঙ-এর শাড়িখানা মেয়েমানুষেব মত সারা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। তারপব আস্তে-আস্তে এগোতে লাগলাম বন্দুকটা আড়াল করে। ডি-কস্টা সাহেব আমাকে বলেছিল বটে, যে মেয়েমানুষ দেখলে হরিণরা পালায় না। পুরুষদেরই যত ভয় করে ওরা। তারপব মেঠো পথটা কোনও বকমে পার হযেই চানা-ক্ষেতে পড়লাম। চানা-ক্ষেতের সবুজ ডাঁটার আডালে বসে পডলাম, মাথায় ঘোমটা টেনে। হরিণের পাল দলে-দলে আসতে লাগলো এগিয়ে। অনেক কাছে এসে পড়েছে। তারপব ক্রমে-ক্রমে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়লো।

শেষে আরো কাছে এলো। সরস্বতীয়ার সামনে লজ্জায় না পড়ি।

বন্দুকটাতে এল-জি পুরে ঠিকঠাক টিপ্ করে ট্রিগার টিপে দিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা শিঙেল হরিণ পড়ে গেলো! বাকিগুলো কোথায় অদৃশ্য হযে গেলো কে জানে! পেছন থেকে হঠাৎ চীৎকার শুনতে পেলাম—সাহেব—সাহেব আমার শাডি দাও—

তখন মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি শিশুগাছের ঝোপের কাছে এসে শাডিটা ছুঁড়ে দিলাম ভেতরে। এক মুহূর্তে সরস্বতীয়া বেরিয়ে এলো। বললে—আমি দেখেছি সাহেব—

ঘটনাটা মনে থাকবার মত। আজ এতদিন পরেও সবস্বতীযার সেদিনকাব ব্যবহারটা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে। আমি ছেদি প্যাটেলের সংসারের শান্তির জন্যে কী-ই বা করতে পেবেছি। না দিতে পেরেছি ছেদি প্যাটেলকে কোনও উপদেশ, না করতে পেরেছি সরস্বতীয়াব কোন

উপকার। কোন কিছুতেই ফল হয়নি। শুধু আতিথ্য স্বীকার করে চির-ঋণী হয়ে আছি। কতদিন জীবনে কত উত্থান-পতনের সঙ্গে সতর্ক হয়ে কাটিয়েছি। ভেবেছি যদি হেরে যাই, সেদিন উপহাস করবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু জিতে গেলে সে আনন্দ কৃপণের মতো কেবল নিজে একলাই তা ভোগ করবো। এমন স্বার্থপরই তো আমরা। ছেদি প্যাটেল যদি হেরে গিয়েই থাকে, তো তার জন্যে যেন কখনও উপহাস না করি! আর সরস্বতীয়াই কী জিততে পেরেছিল জীবনে?

অনেকদিন পরে, যখন আমার বিলাসপুর জীবনের আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, সেদিন আবার দেখা হয়েছিল সরস্বতীয়ার সঙ্গে। দেখে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পাই নি বটে, কিন্তু অবাকও তো হই নি! বলেছিলাম—কেমন আছো?

সরস্বতীয়া সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিল—এবার আমাদের এখানে উঠলে না কেন সাহেব?

বললাম—আমি সব জানি—সব শুনেছি সরস্বতীয়া—

সরস্বতীয়া ম্লান হাসি হেসে বললে—চা করে দেবো সাহেব?

বললাম—আমি রামসহায়ের বাড়িতে চা খেয়ে এসেছি—

সরস্বতীয়া বলেছিল, আমার হাতে খেতে ঘেন্না করে?

বললাম—তোমার হাতে কী খাই নি কখনও?

মনে আছে, কথাটা শুনে সরস্বতীয়া কোনও উত্তর দেয় নি। উত্তর দেবার কিছু ছিলও না। ছেদি প্যাটেলের তখন কোনওদিকেই হুঁস্ থাকবার কথা নয়। ঘরের মধ্যে কী যেন বিড়বিড় করে বকছিল নিজের মনে?

সরস্বতীয়া বলেছিল—আর হরিণ মারবে না সাহেব?

বললাম—আমি এবার বিলাসপুর থেকে চলে যাবো সরস্বতীয়া—বন্দুক বেচে দিয়েছি—

কথাটা শুনে কেমন যেন ওর মুখটা কৌতূহলে ভরে উঠলো।

কিন্তু সেদিন কি আমি জানতাম বিলাসপুর ছেড়ে আমাকে অত শিগ্‌গির কলকাতায় চলে যেতে হবে। হেড অফিস থেকে রিপোর্ট গিয়েছিল আমাকে দিয়ে ঘুষ ধরবার কাজ নাকি ভালোমতো হচ্ছে না। আমি দয়ালু। আমি অল্পেতেই মুষড়ে পড়ি, আমি একটুতেই কাতর হই। মানুষের অপরাধকে আমি যে বড় করে দেখি না—মানুষই আমার কাছে কেমন করে জানি না, কখন যেন বড় হয়ে ওঠে। যে-মানুষ দোষ করে, সে-মানুষ আবার ভালোও বাসে। যে-মানুষ অপরাধ করে, সে-মানুষ আবার ক্ষমাও করে একজনকে। একথা কর্তাদের আমি বোঝাতে পারি নি—তাই আমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল, তাই আমাকে অক্ষম হতে হয়েছিল! কিন্তু সে-কথা এখানে অবান্তর।

ছেদি প্যাটেল সেদিন ফিরে এলো অনেক পরে।

আমাকে দেখেই বললে—সাহেব আপনি!

তখন সরস্বতীয়া মাংস চড়িয়েছে হাঁড়িতে। মাংসের গন্ধে ভুরভুর করছে বাড়ি। ছেদি প্যাটেলের নাইট-ডিউটি, সে খেয়ে ডিউটিতে যাবে! খাওয়া-দাওয়া সেরে নীল কোর্তা পরে নিয়েছে। বললে—এবার সব চানা হরিণে খেয়ে গেলো সাহেব, ভালো দাম পাবো না।

মুরলীয়া ঘরের ভেতর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিল। তার কাতরানি শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। বললাম—এবার আর টাকা লাগবে না ছেদি, আমি নিজে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো, তুমি বিলাসপুরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো—তোমার রোগ আমি নিশ্চয়ই সারিয়ে দেব, দেখো।

ছেদি প্যাটেল বললে—আমার রোগের জন্যে আমি ভাবছি না সাহেব, মুরলীয়ার জন্যেও ভাবছি না।

বললাম, তবে কিসের জন্যে ভাবছো তুমি?

ছেদি প্যাটেল বললে—আমি সরস্বতীয়ার জন্যে ভাবছি হুজুর—আমার পুরো পাঁচ-কুড়ি টাকাটাই জলে গেল।

বললাম—টাকাটাই তোমার কাছে বড় হলো ছেদি?

ছেদি প্যাটেল বললে—আমার রক্ত-জল করা টাকা হুজুর, আমি দিন-রাত জেগে খেটে, রোদ্দুরে-বিষ্টিতে ভিজে টাকা করেছি হুজুর, সব কী জেঠু রাউতকে দেবার জন্যে? আমি কি আর টাকা দেবার লোক পেলাম না? আমার কী লাভ হলো বলুন হুজুর? আমার কী ছেলে হলো? আমি তো ছেলের জন্যেই চুড়ি পরিয়েছিলাম সরস্বতীয়াকে?

কী আর আমার বলবার ছিল! কিছুই উত্তর দিতে পারলাম না আমি।

ছেদি প্যাটেল আবার বলতে লাগলো—সেই টাকা নিয়ে জেঠু রাউত তো চুড়ি পরিয়ে আরেকটা বউ আনলো ঘরে—তারও ছেলে হয়েছে এখন—সে কত সুখে আছে সাহেব।

আমি নিজের ঘরে বসে ছিলাম। ছেদি প্যাটেল খেয়ে-দেয়ে সকাল-সকাল চলে যাবে ডিউটিতে। রাত্রে আমার ট্রেন। রামসহায় এসে মালপত্র বয়ে নিয়ে আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে।

হঠাৎ বাইরে তুমুল গণ্ডগোল উঠলো। মনে হলো, ছেদি প্যাটেলের গলা!

চীৎকার করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখি, ছেদি প্যাটেল বলছে—হারামজাদা, আব জায়গা পাওনি ফস্টি-নস্টি করতে?

দেখি দেওকীনন্দনের গলার জামাটা ধরেছে মুঠো করে।

ধরা পড়ে গিয়ে দেওকীনন্দনের মুখে আর কথা নেই।

ছেদি প্যাটেল চীৎকার করে বলছে—ভেবেছো আমি বাড়ি নেই, আর অম্‌নি এসেছো—বেরো হারামজাদা বেরো, যদি আর কখনও আসবি তো মেবে মাথা ভেঙে দেবো না—আমাকে জানিস না তুই, আমি কদমকুঁয়ার প্যাটেল—আমার আওরতেব ওপব কিনা তোর নজর।

আমি গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম। নইলে সেদিন ছেদি প্যাটেল মেরে ফেলতো ওকে একেবারে। বললাম, ছাড়ো ছেদিলাল, মরে যাবে যে।

ছেদি প্যাটেল বললে—মরাই ভালো সাহেব, ওর মরাই ভালো—আমি খুন করে ছাড়বো বেটাকে, আমার আওরতের ওপর ও কিনা নজর দেয়।

শেষে জোর করে ছাড়িয়ে দিলাম দেওকীনন্দনকে। হয়তো বুঝতে পারেনি যে, ছেদি প্যাটেল তখনও বাড়িতে আছে। একটু আগেই এসে পড়েছিলো। দেওকীনন্দনকে ছাড়িয়ে দিতেই সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেদি প্যাটেল তখনও গজরাচ্ছে! আমি কদমকুঁয়ার প্যাটেল, আমার বাড়িতে এসেছে চালাকি করতে। আমি ওকে খুন করে তালাও-এর মাটিতে পুঁতে ফেলবো!

এরপর আমি বিলাসপুরে চলে এসেছি। তখন আমার বিলাসপুর-জীবনও সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। একদিন হঠাৎ আমার আর্দালী বললে—ছেদি প্যাটেলের খবর শুনেছেন সাহেব?

বললাম—না!

আর্দালী বললে—রামসহায় এসে বলছিল ছেদি প্যাটেলের বউ সরস্বতীয়া নাকি পালিয়ে গেছে—ছেদি প্যাটেল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে হুজুর।

অবাক হয়ে গেলাম! আর কতদিনই বা চাকরি ছিল ছেদি প্যাটেলের। এতদিনের চাকরি কিনা ছেড়ে দিলে ছেদি প্যাটেল!

বললাম—কোথায় পালিয়েছে? খবর পেয়েছে কিছু?

আর্দালী তার বেশি কিছু বলতে পারলে না।

তারপব অনেকবার আমি জব্বলপুরে গিয়েছি অফিসের কাজে। ট্রেনে চেপে গণ্ডিয়ায় ন্যারো গেজ্ লাইনে ট্রেনে চড়বো। দেখি গলায় লাল রুমাল জড়ানো হাওয়াই সার্টপবা এক ছোক্‌ড়া—ঘন-ঘন সিগারেট টানছে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলাম।

বললাম—তোমার নাম দেওকীনন্দন না?

দেওকীনন্দন আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেযে গেল। আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে। আবার বললাম—তুমিই তো দেওকীনন্দন?

দেওকীনন্দন বললে—জী হাঁ!

বলেই জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিলে লাইনের ওপর।

বললাম—সরস্বতীয়া তোমার কাছে আছে?

দেওকীনন্দন প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেল। তারপব যেন ভয় পেয়ে বললে—জী হাঁ।

বললাম—কেন তুমি ওকে নিয়ে ভাগ্‌লে? জানো না ছেদি প্যাটেল সরস্বতীয়াকে নগদ একশো টাকা খরচ করে চুড়ি পরিয়ে ঘরে এনেছিল।

দেওকীনন্দন চুপ করে রইলো। বললাম, জানো না ছেদি প্যাটেল সমস্ত ছত্রিশগড় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তোমাকে পেলে সে ছিঁড়ে খাবে।

দেওকীনন্দন বললে—হুজুর আমার কী দোষ? সরস্বতীয়া তো আমার সঙ্গে ভেগে এল, আমায় বললে ফিলিম্ করবে, আমাব সঙ্গে বোম্বাই যাবে বলে বেরিয়ে এলো—বললে দু'জনে মিলে বোম্বাই গিয়ে ফিলিম্ করবো—'নাগিন' ছবি দেখে ওর ভালো লেগেছিল যে।

বললাম—এখন কোথায় রেখেছো তাকে?

দেওকীনন্দন বললে—ছিন্দোয়াড়াতে।

বললাম—আর তুমি এখানে কী করছো একলা?

দেওকীনন্দন বললে—এই নোকরির চেষ্টায় ঘুরছি হুজুর।

আবার ভালো করে দেওকীনন্দনের চেহারাটা আপাদমস্তক দেখলাম। নোকরি খোঁজবার পোশাকই বটে। ছুঁড়ে ফেলা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটায় তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হলো, এখুনি পুলিশকে ডেকে ধরিয়ে দিই ছোকরাকে।

দেওকীনন্দন বললে—হুজুর, মালিক বে-ফিকির আমার ওপর গোঁসা করছেন—আমি কিছু কসুর করিনি—সরস্বতীয়ার বড় তক্‌লিফ্ ছিলো ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে, মারধোর করতো, ওর জন্যে আমারই এখন তক্‌লিফ্।

—কেন্? তোমার কিসের তক্‌লিফ্?

দেওকীনন্দন বললে—রামলীলার দল ছাড়তে হয়েছে মালিক, এখন বোম্বাইয়ে যেতে টিকিট লাগবে দু'জনের কত টাকা হিসেব করুন হুজুর! তারপর কে ফিলিম্ করতে দেবে সেখানে—আমি ফিলিমের কি-ই বা জানি।

দেওকীনন্দন আমার সঙ্গে কথা বলছিলো আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল যেন। মনে হলো দেওকীনন্দনের ওপর রাগ করাও আমার বৃথা!

ছত্রিশগড়ের সমাজে সে এমন কিছু মহা অপরাধ করেনি। এমনি দিনরাত ঘটছে। তাকে একলা দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার ট্রেন এসে গিয়েছিলো। তাকে ছেড়ে আমিও কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ট্রেনে উঠে বসেছিলাম।

তারপর কোথায় রইল ছেদি প্যাটেল, আর কোথায় রইল মুরলীয়া, আর কোথায়ই বা রইল সরস্বতীয়া! সে-সব খবর রাখবার আর আমার অবসর হয়নি। ছত্রিশগড় ছেড়ে আবার আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। শিকারী জীবনের সঙ্গেও আমার সেই থেকে যবনিকাপাত হয়ে গিয়েছিল। বন্দুকটার একটা খদ্দের খুঁজছিলাম। ডি-কস্টা সাহেবই আমায় পছন্দ করে বন্দুক কিনিয়ে দিয়েছিল—শেষ পর্যন্ত আবার ডি-কস্টা সাহেবকেই ফিরিয়ে দিয়ে এলাম সেটা। তাঁকে বলে এসেছিলাম—শুধু বিক্রি হলে টাকাটা যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু ফিরে আসবার আগেই ঘটনাটা ঘটলো।

নইলে এ-গল্প লেখবার প্রয়োজনই হতো না আজ।

আমার জায়গায় গাঙ্গুলী এলো আমাকে রিলিফ্ করতে। তারই হাতে ফাইলপত্র, কাগজ, স্ট্যাম্প, সমস্ত বুঝিয়ে দিলাম। ভাটপাড়ার সরষের তেলের ভেজালের যে কেসটা চলছিলো, তার কাগজপত্রও দিয়ে দিলাম। অনেক দিনের অনেক দিনরাত্রির সঙ্গী বিলাসপুর আর আশে-পাশের স্টেশনগুলো। বরদুয়ারে মালগুদামের কেস্, পেন্ড্রা রোডের পি-ডব্লিউ-আই-এর কেস্, নইলাতে গ্রেনশপের কেস্। কেস্ কি একটা। নিজের এজেন্টদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। সব জায়গাতেই গাঙ্গুলীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বুঝিয়ে বললাম সবাইকে, যে গাঙ্গুলীই আমার রিলিভার!

রাজনন্দগাঁওতে গিয়ে মালবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম গাঙ্গুলীর। গাঙ্গুলী কাগজপত্র বুঝে নিয়ে আপ ট্রেনে জব্বলপুর চলে গেলো অফিস থেকে কাজকর্ম বুঝে নিতে। আমি প্ল্যাটফর্মে বসেছিলাম ডাউন ট্রেনের জন্যে। কাঁকর-বিছানো প্ল্যাটফর্মের ওপর ওয়েটিং-রুমের ইজি-চেয়ারটা টেনে এনেছি। দু'দিকে আ-দিগন্ত একজোড়া রেললাইন চলে গেছে। তার ওপাশে চানা-ক্ষেত! ধূ-ধূ করছে সবুজের ঢেউ।

হঠাৎ আমার কী মনে হলো যেন! মনে হলো চিরদিনের জন্যে তো সি-পি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কখনও এদিকে আসবো না! এলেও এমন করে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা হবে না আর কখনও। মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মনে হলো—এই তো পরের স্টেশন টিল্‌ডা—টিল্‌ডাতেই তো কত রাত কত দুপুর কাটিয়ে গেছি ছেদি প্যাটেলের বাড়িতে। আর সঙ্গে-সঙ্গে ছেদি প্যাটেলের কথা মনে পড়লো! মুরলীয়ার কথা মনে পড়লো। আর সরস্বতীয়ার কথাও মনে পড়লো। স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাউন মালগাড়ি কিছু আছে মাস্টারমশাই?

স্টেশন মাস্টার বললেন—থ্রি-সেভেনটিন ডাউন আসছে—এখুনি লাইন ক্লিয়ার দেবো।

বললাম—একবার গাড়িটাকে থামাবেন, আমি একবার টিল্‌ডায় যাবো।

স্টেশন মাস্টার রাজি হলেন। বললাম—আর টিল্‌ডাকেও একবার বলে দেবেন, যেন আধ মিনিটের জন্যে থামায় মালগাড়িটা, আমি নামবো ওখানে।

একবার ছেদি প্যাটেলকে কেন জানি না দেখে যাবার ইচ্ছে হলো। এমন কি দরকার হলে একটা রাত থাকবো সেই ঘরটায়। বুড়োকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসবো, আর কিছু নয়। হয়তো মুরলীয়ার অসুখ আরো বেড়েছে। তার সঙ্গেও একবার দেখা করে আসবো। অনেক আতিথ্য স্বীকার করেছি ওদের বাড়িতে, তার জন্যে শেষবারের মতো একবার কৃতজ্ঞতা জানাবোও। মালগাড়িতে চড়ে টিল্‌ডায় নামলাম।

সেই গেট। ছেদি প্যাটেলের গেট। এই লেভেল-ক্রসিং-এর কাছেই ছেদি প্যাটেল সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো। সেই গেট-টা সেই রকমই আছে। পাশের গুমটি ঘরটার মধ্যে অন্য একজন ছোক্‌রা গেট-ম্যান বসে-বসে তখন ডিউটি দিচ্ছে। অনেকগুলো দেহাতী লোকের সঙ্গে বসে চুল্লির সামনে আগুন পোয়াচ্ছে।

কাউকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই! আমার চেনা পথ। আমি একলাই কদমকুঁয়ার ছেদি প্যাটেলের বাড়ি চিনে নিতে পারবো। ওদিকে বেল্লারির জঙ্গল আর ওপাশে শিউ-তালাও। মাঝখানে কদমকুঁয়া। ছেদি প্যাটেলের বাড়িটার কাছে শিশুগাছের ঝোপ্। সেই যে ঝোপের মধ্যে ঢুকে সরস্বতীয়া একদিন তার বাসন্তী রঙের শাড়িটা আমার মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলো।

বাড়ির দরজাটা ভেজানো ছিল। ভেতর থেকে দু'বউয়ের চীৎকার আর কানে আসবে না জানতাম। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, যেন ছেদি প্যাটেলের গলার আওয়াজ পাচ্ছি। একলা ছেদি যেন বকে চলেছে একনাগাড়ে। কাকে বকে চলেছে, মুরলীয়াকে? ডাকলাম—ছেদিলাল!

আমার গলা যেন কেউ শুনতে পেলো না।

ছেদি প্যাটেল তখনও বকে চলেছে। আবার ডাকলাম—ছেদিলাল!

মুরলীয়া হয়তো নিজের অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে শুয়ে-শুয়ে কাতরাচ্ছে। আর ছেদিলাল হয়ত তাই আপন মনেই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছে। এবার আরো জোরে ডাকলাম—ছেদিলাল—দরজা খোলো—

ভেতরে যেন কার পায়েব শব্দ পেলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে দবজার হুডকোটা খট্ কবে খুলে গেল।

অল্প অন্ধকারে মুখখানা দেখেই চমকে উঠলাম—সবস্বতীয়া। সবস্বতীযাও আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। বললে—সাহেব তুমি?

বললাম—তুমি যে এখানে আবার?

সরস্বতীয়া আমার সে কথাব উত্তর না দিযেই বললে—তোমাব বিছানাপত্র কোথায সাহেব?

বললাম—স্টেশনে রেখে এসেছি, বাত্রেব ট্রেনেই যাবো—

—আর তোমাব বন্দুক?

বললাম—শিকাব তো আর কবি না, তা ছাড়া আমি এবার কলকাতায ফিবে যাচ্ছি—কিন্তু তোমার কথা আগে বলো, তুমি ফিবে এলে যে? দেওকীনন্দন কোথায? বোম্বাই যাওনি?

সে-কথাব উত্তব না দিযে সবস্বতীযা আলো দেখিযে বললে—ভেতবে এসো সাহেব—

আমি আমাব চেনা ঘবেব দিকেই যাচ্ছিলাম।

সবস্বতীযা বললে—ওদিকে না সাহেব, এখানে বোসো—

বলে আমায একটা খাটিযা দেখিযে দিলো। ছেদি প্যাটেল তখনও ঘবেব ভেতবে গজ্ গজ্ কবছে। কোন্ ঘব থেকে শব্দ আসছে বুঝতে পাবছি না।

বললাম—মুবলীযা কোথায? কেমন আছে সে?

সবস্বতীযা বান্নাব হাঁড়িটা উনুন থেকে নামালো। বললে—তুমি শোনোনি? সে তো মাবা গেছে সাহেব—বামসহায বলেনি তোমায?

বললাম—কবে মাবা গেল? কী হযেছিল তাব?

সবস্বতীযা বললে—ওই দেখ—ওই যে—

ঘরেব চালেব বাতাব দিকে আঙুল দিযে দেখালো সবস্বতীযা। কিছু দেখতে পেলাম না। সবস্বতীযা বললে—একটা বশি দেখছ না? ওই বশিতে ফাঁস দিয়েছে সে—

চমকে উঠে বললাম—কেন? গলায দড়ি দিযে মবতে গেল কেন?

সবস্বতীযা হাসলো। বললে—দবদ আব সহ্য কবতে পাবেনি। শেষকালে সাহেব, বশিতে ঝুলে মবেছে একদিন—

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। খানিক পবে বললাম—ছেদি প্যাটেল বুঝি বুঝতে পাবেনি আমি এসেছি? ডাকো না তাকে—

সবস্বতীযা বললে—এখন ডাকবো না সাহেব, তখন থেকে খাবো খাবো কবছে কেবল, এখনও বান্না হযনি যে—

বললাম—খুব ক্ষিদে বেড়েছে নাকি আজকাল?

সে কথাব উত্তব না দিযে সবস্বতীযা বললে—চলো, জানালাব বাইবে থেকে দেখবে চলো—বলে আমাকে নিযে গেল ঘবটাব সামনে। খোলা জানলা দিযে ভেতবে চেযে দেখে স্তম্ভিত হযে গেলাম। দেখি আগাগোড়া উলঙ্গ হযে ছেদি প্যাটেল ঘবময ছটফট কবে বেড়াচ্ছে আব আপন মনে কী সব বকবক কবে চলেছে। সবস্বতীযাব মুখেব দিকে তাকালাম।

সবস্বতীযা বললে—মেম ডাক্তাব বলেছে ও অসুখ সাববে না সাহেব।

চুপচাপ এসে খাটিযায় আবাব বসে পড়লাম। কিছুই আমাব বলবাব ছিল না। আমাকে বসিযে রেখে সবস্বতীযা আবাব বান্নাঘবে গিযে ঢুকলো। আমি বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। কাকে আব কি-ই বা বলবো। বলবাব কি মুখই আছে আমাব।

সরস্বতীয়া হঠাৎ আমাব সামনে একটা টুল বেখে গেলো।

বললাম—কিন্তু ঠিক সমযেই তুমি এসে পড়েছিলে সবস্বতীযা—তুমি না এলে ছেদি প্যাটেলকে কে দেখতো এই সমযে—

সরস্বতীয়া রান্নাঘর থেকে বললে—আমারও তো না এসে আর উপায় ছিল না সাহেব—

বললাম—কেন? তোমার তো দেওকীনন্দনের সঙ্গে বেশ কাটছিল।

সরস্বতীয়া কোনও উত্তর দিলে না আমার কথার!

আবার বললাম—একদিন গণ্ডিয়া স্টেশনে দেওকীনন্দনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানো, নোকরি খুঁজতে এসেছিল—

এবারও সবস্বতীয়া কোনো উত্তর দিলে না। হঠাৎ সামনে এসে টুলের ওপর একটা লম্ফ রেখে দিয়ে গেল। তারপর একবাটি চা নিয়ে আমার কাছে এলো। বললে—আমার হাতে চা খাবে সাহেব?

অবাক হলাম কথাটা শুনে। বললাম—কেন? তোমার হাতে কী চা খাই নি আগে? চায়ের আর দরকার নেই, স্টেশন থেকেই চা খেয়ে আসছি—

সরস্বতীয়া জিজ্ঞেস করলে—আর হরিণ মারবে না সাহেব?

বললাম, এবার বিলাসপুর থেকে চলে যাচ্ছি, বন্দুকটাও বেচে দিয়েছি।

লম্ফের আলোয় সরস্বতীয়ার মুখখানা অনেকদিন পরে ভালো করে দেখলাম। কী রোগা হয়ে গেছে। এতক্ষণ অন্ধকারে মুখটা ভালো করে দেখতে পাই নি। সমস্ত মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। মুখখানা দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। কপালে-গালে ও-সব কীসের দাগ? আরো ভালো করে দেখতে লাগলাম! তবে কী সরস্বতীয়া শেষ পর্যন্ত ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে শুয়েছিল? আমার চোখ দু'টো যেন তীক্ষ্ণ প্রখর দৃষ্টি নিয়ে সরস্বতীয়ার আপাদ-মস্তক দেখতে লাগলো।

সরস্বতীয়া হাসলো এবার। বললে—কী দেখছো সাহেব অমন করে?

বললাম—মুখে-হাতে ও-সব কিসের দাগ তোমার? কাছে এসো তো দেখি ভালো করে—

সরস্বতীয়া অবলীলায় আরো কাছে সরে এলো। তার মুখে আবার সেই পুরোনো দিনের হাসি ফিরে এলো।

বললাম—ছেদি প্যাটেল শেষকালে তোমারও সর্বনাশ করেছে?

সরস্বতীয়া হাসতে লাগলো তেমনি করে। বললাম—মেম-ডাক্তার অত করে বলেছিল, শুনলে না কেন? ছি-ছি, কী সর্বনাশ হলো বলো তো?

সরস্বতীয়া তবু হাসতে লাগলো। হাসতে-হাসতে বললে—ছেদি প্যাটেল নয় সাহেব—তা নইলে কি ফিরে আসি—

বড় রহস্যজনক শোনালো সরস্বতীয়ার কথাগুলো। বললাম—ছেদি প্যাটেল নয় তো কে? কে সর্বনাশ করলে তোমার এমন করে?

সরস্বতীয়াকে আবার হাসতে দেখে বললাম—হাসি রাখো, বলো কে?

এতক্ষণে সরস্বতীয়া হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলো। চোখ দু'টো যেন ভারী হয়ে এলো, লক্ষ্য করলাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম—বলো কে?

সরস্বতীয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না। যেন নিজের মনে বলে যেতে লাগলো—আমরা কেউ আর থাকবো না সাহেব, আমরা কেউ বাঁচবো না—

অবাক হয়ে বললাম—কেন?

সরস্বতীয়া বললে—হ্যাঁ সাহেব, মিশনের মেম ডাক্তার আমাকে বলেছে, আমরা ছত্রিশগড়ী, আমাদের জাতটা শেষ হয়ে যাবে সাহেব।

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—আমার ছেলে না হয়েছে ভালোই হয়েছে সাহেব, ছেলে হলে সে-ও বাঁচতো না—তাই আমিও আর এখন ছেলে চাই না।

আমি বললাম—তুমিও কী চাইতে তোমার ছেলে হোক্?

সরস্বতীয়া আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দু'টো ঢেকে ফেললো হঠাৎ। কথার উত্তর দিলে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কে তোমার এই সর্বনাশ করলে? কে সে?

সরস্বতীয়া উত্তর দিতে গিয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

বললে—ওই দেওকীনন্দন সাহেব—ওরও যে...

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, মেম-ডাক্তার তো দেওকীনন্দন সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়নি তাকে!

সরস্বতীয়া তখনও কাঁদছিলো! আমি নিঃশব্দে কখন উঠে চলে এলাম, সরস্বতীয়া তা জানতেও পারলে না।

— o —

উপন্যাস নয়, বড় গল্প নয়, এমন কি ছোট গল্পও নয়! কাহিনী বললেই যেন ঠিক বলা হবে। আসলে ও-গুলোর মধ্যে কোন্‌টা যে কী, কোন্‌টার কী নিয়ম, তাও আমি জানি না! আর নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর অত দরকারই বা কী? আপনারা গল্প শুনতে চান আর আমিও গল্প বলতে আর শুনতে ভালবাসি। এখন এই যখন অবস্থা তখন এটা উপন্যাস না গল্প, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমি আরম্ভ ক'রে দিই।

গোড়াতে বলে রাখা ভাল, এটা আমার শোনা কাহিনী।

তবে সেদিন যারা কোর্টের ভেতরে ছিল তারা অনেকেই আমাকে বলেছে এটা সত্য ঘটনা। আমি আপনাদের হলফ ক'রে বলতে পারি, আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না। সত্য ঘটনার মধ্যে যদি গল্পের রস পাই তবে মিছিমিছি তাতে মিথ্যের মশলা মিশিয়ে কেন গোঁজামিল দিতে যাবো? তাতেও তো বেশ পরিশ্রমের দরকার। বিনা পরিশ্রমে আপনাদের গল্প শোনাতে পারবো, এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে!

আনন্দের কথাটা উঠতেই মনে পড়লো, তার নামও আনন্দ। আনন্দ মিশ্র। আনন্দ মিশ্র গরীব আর্টিস্ট মানুষ। কিন্তু আর্টিস্ট হলেই তো আর কেউ তাকে ডেকে খেতে দেবে না। তাকেও খেটে খেতে হবে। মানে, বড়লোকদের মনোরঞ্জন করতে হবে। আনন্দ মিশ্রও একদিন পবের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে এক মহা বিপদে পড়েছিল। পরের মনোবঞ্জন করতে গিয়ে নিজের মনটাকে বিকিয়ে দিয়ে ফেলেছিল আনন্দ মিশ্র। বলতে গেলে আনন্দ মিশ্র আর্টিস্ট হয়েও এক মহা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে উকীল, এ্যাটর্নী, কোর্ট, সম্পত্তি জাল জুচ্চুরির মধ্যে প'ড়েই একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছিল।

আর শেষকালে যেদিন কোর্টের মধ্যেই আসামীর প্রধান সাক্ষী আসামীকে ছুরি মেরে খুন করলে, সেদিন জিনিসটা আরো জটিল হয়ে উঠেছিল।

পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় ব্যানার হেড লাইন দিয়ে খবর বেরিয়েছিল—

আদালতের ভিতরে আসামীকে নৃশংসভাবে হত্যা
গুলমোহর এস্টেটের মামলায় আসামীপক্ষের
প্রধান সাক্ষী গ্রেফ্‌তার

মামলাটা হচ্ছিল লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টে। যারা কোর্ট-কাছারির সঙ্গে আজীবন জড়িত তারাও এর আগে এমন ঘটনা কখনও দেখেনি, এমন ঘটনার কথা কখনও কানে শোনেনি। ঘটনাটা তাই বহুদিন ধ'রে কান থেকে কানে, মুখ থেকে মুখে-মুখে ফিরতো। মামলাটাও ছিল বিচিত্র ধরনের, লক্ষ্ণৌয়ের উকিল, এ্যাটর্নী, ব্যারিস্টারদের মহলে এ-মামলাটাব কথা বহুদিন ধ'রে ঘোরাফেরা করতো।

আমার বন্ধু শিবনাথ দিনের পর দিন এ-মামলার ব্যাপাব স্বচক্ষে দেখেছে, স্বকর্ণে শুনেছে। আর শিবনাথ যে মিথ্যে কথা বলবে আমার কাছে, তাও বিশ্বাস হয় না। কারণ এ-মামলার আসামী বা ফরিয়াদী কোনও পক্ষের মধ্যেই শিবনাথ জড়িত ছিল না। সে তখন সবে ল-কলেজ পাস ক'রে বেরিয়ে আদালতের পাড়ায় ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা ঘুরপাক খাচ্ছে।

শিবনাথ বলেছিল—গুলমোহর এস্টেটের বার্ষিক ইন্‌কাম ছিল পনেরো লাখ টাকা, ওই অত টাকার এস্টেট নিয়ে যে খুনোখুনি ব্যাপার ঘটে যাবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে—

জিজ্ঞেস করছিলাম—তা এস্টেটটা শেষ পর্যন্ত কার ভাগে পড়লো?

শিবনাথ বলেছিল—ওই নয়না চৌহানের ভাগেই পড়লো—

—নয়না চৌহান?

—হ্যাঁ, যাকে নিয়ে আনন্দ মিশ্রের এত খোয়াব! আনন্দ মিশ্র তো নয়না চৌহানের জন্যেই এত কাণ্ড করলো। আর আনন্দ মিশ্র না থাকলে তো বুলবুল চৌধুরী ধরাও পড়তো না, ধরা পড়ার পর খুনও হতো না কোর্টের মধ্যে—

এ আজ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখন নয়না চৌহানের মতো মেয়েরা এখানকার মেয়েদের মতো রাস্তায় গাড়ি চালিয়েও বেড়াতো না। ক্লাবে কি পার্টিতে গিয়ে কাঁধ-কাটা পেট-কাটা ব্লাউজ প'রে সকলের সামনে গিয়ে হুইস্কির গেলাসেও চুমুক দিত না। অথচ ফূর্তি ক'রে জীবন কাটিয়ে দেবার মতো টাকা কি ছিল না নয়না চৌহানের? গুলমোহর এস্টেটের একমাত্র ওয়ারিশান যে মেয়ে, তার দ্বারা সব কিছু করাই তো সম্ভব। কিন্তু নয়না চৌহান বোধহয় ছিল অন্য জাতের মেয়ে। গুলমোহর এস্টেটের মতো নয়না চৌহানও ছিল যেন জলজ্যান্ত গুলমোহর। যেমন রং, তেমনি বাহার তেমনি আগুনের হল্‌কার মতো রূপ। গল্পের নায়িকারা রূপসীই হয়। সেইটে হওয়াই বরাবরের নিয়ম। কিন্তু নয়না চৌহান যে গুলমোহর ফুলের মতো রূপসী এ কিন্তু আমার গল্পের সুবিধের জন্যে নয়। বোধহয় আনন্দ মিশ্র আর্টিস্ট ছিল বলেই এমন রূপের সন্ধান পেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারেনি। আমরা যাকে রূপসী বলি, আর্টিস্টরা অনেক সময় তার দিকে ফিরেও দেখে না। আর্টিস্টের দেখা অন্য রকম দেখা, অন্য চোখে দেখা। আর্টিস্ট আনন্দ মিশ্র যখন তাকে রূপসী ব'লে তার অসংখ্য স্কেচ ক'রে ফেলেছিল, তখন বলতেই হবে নয়না চৌহান সত্যিকারের রূপসী।

কিন্তু নয়না চৌহানের রূপ তার সর্বনাশের কারণ না হয়ে, সর্বনাশের কারণ তার এস্টেট। তার পনেরো লাখ টাকা আয়ের গুলমোহর এস্টেটের জন্যই এত মামলা, এত ঝামেলা, এত খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে গেল।

মিস্টার পুরোহিত ছিলেন নয়না চৌহানের পক্ষে সলিসিটর।

তিনি প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চাননি।

তিনি আনন্দ মিশ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কে?'

আনন্দ মিশ্র বলেছিল, 'আজ্ঞে আমি একজন আর্টিস্ট—'

'আপনার সঙ্গে নয়না চৌহানের সম্পর্ক কী?'

আনন্দ মিশ্র বলেছিল, 'সম্পর্ক কিছুই নয়, আমি নয়না চৌহানের একজন ওয়েল-উইশার, একজন শুভাকাঙ্ক্ষী—'

'এত লোক থাকতে আপনি নয়না চৌহানের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে গেলেন কেন? ওর রূপ দেখে, না ওর গুলমোহর এস্টেটের সম্পত্তির লোভে?'

আনন্দর মনে প্রথমটায় একটু আঘাত লেগেছিল কথাটা শুনে। কেমন ক'রে বোঝাবে সে যে টাকার লোভ তার নেই। প্রথম যখন ছবি আঁকার লাইনে এসেছিল তখনই তো জানতো সে যে এ-কাজে টাকা নেই। অন্তত ইণ্ডিয়াতে ছবি এঁকে বড়লোক হবার আশা দুরাশা।

একদিন হয়তো তাদের নিজেদের অবস্থা ভাল ছিল। হয়তো সে-টাকায় তাদের এককালে ঘোড়ার গাড়ি, বাড়ি, বাবুয়ানি সবই চলেছিল।

সে সব বহুকাল আগের কথা। তখন সে ছোট। সে সব প্রাচুর্যের কথা শুধু কানেই শুনে এসেছে, দেখেনি কিছু। যখন জ্ঞান হয়েছে তার, তখন দেখেছে লক্ষ্ণৌয়ের একটা মধ্যবিত্ত পাড়ায় একটা পুরানো ভাঙা বাড়ির মধ্যে তাদের দিন কাটে আর সংসার চালাবার সামান্য প্রয়োজনটুকুর

তাড়নায় মাসের পয়লা তারিখের বাড়ি-ভাড়ার আয়টুকুর দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকতে হয়।

সেই অবস্থাতেই এই আর্ট চর্চা, আর সেই আর্ট চর্চার সূত্রেই এই দুর্ঘটনা।

আনন্দ মিশ্র বলেছিল, 'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি মিস্টার পুরোহিত, আপনি বুলবুল চৌধুরীর নামে মামলা করুন—'

'কিন্তু মামলা ক'রে লাভটা কী হবে তাই আগে বলুন—'

আনন্দ মিশ্র বলেছিল, 'লাভ হবে এই যে, নয়না চৌহান তার গুলমোহর এস্টেট ফিরে পাবে।'

'কিন্তু নয়না চৌহান তো মারা গেছে।'

'কে বললে মারা গেছে?'

মিস্টার পুরোহিত বললেন, 'আমি বলছি মারা গেছে। মারা যাবার পর তাকে পোড়ানো হয়ে গেছে কাঠগুদামে, মিস্টার বুলবুল চৌধুরী নিজে তার সৎকার করেছেন। সেখানে অনেক সাক্ষী ছিল, এমন কি যে-ডাক্তার তাকে শেষকালে দেখেছিল তার দেওয়া ডেথ্-সার্টিফিকেট পর্যন্ত আছে। এর পরেও বলবেন নয়না চৌহান মারা যায়নি?'

আনন্দ মিশ্র বলেছিল, 'না আমি বলছি সে মারা যায়নি—যে মারা গেছে সে নয়না চৌহানের মতোই দেখতে—'

'কে সে?'

'আপনি তো জানেন সব! সে হচ্ছে আর-একটা মেয়ে, তার নাম জান্‌কী!'

কিন্তু এত কথা বলার পরেও মিস্টার পুরোহিত মামলা করতে রাজী হয়নি। মিস্টার পুরোহিত চৌহান-ফ্যামিলির পুরোনো সলিসিটর তিনি নয়না চৌহানের বাবা আত্মা চৌহানের পুরোনো বন্ধু! দু'জনে অনেক দিন একসঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন। একসঙ্গে আত্মা চৌহানের সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছেন। খুব বন্ধুত্ব ছিল দু'জনে। আত্মা চৌহান নৈনিতালের বড় জমিদার। তাঁর চা-বাগান ছিল, ফরেস্ট ছিল। আত্মা চৌহান মারা যাবার সময় ওই একমাত্র মেয়ে নয়না চৌহানকে রেখে মারা যান। পৈত্রিক যে সম্পত্তি ছিল তাঁর কিছু ভাগ দেননি, নিজের মেয়েকে। নিজের পরিশ্রমে উপায় করা গুলমোহর এস্টেট উইল ক'রে গিয়েছিলেন মেয়ের নামে। উইলে লেখা ছিল, তার মেয়ে নয়না চৌহান গুলমোহর এস্টেটের ষোল আনা ওয়ারিশান্। তাঁর থাকবার মধ্যে আর তো ছিল না কেউ। ছিল যে, সে তার ভাই। আশীষ চৌহান।

এই আশীষ চৌহানের কাছে চাকরি করতে গিয়েই আনন্দ মিশ্রর প্রথম দেখা হয়েছিল নয়না চৌহানের সঙ্গে।

অদ্ভুত মানুষ এই আশীষ চৌহান।

আশীষ চৌহান তখন বুড়ো হয়ে গেছেন! নৈনিতালের চৌহান এস্টেটের তখন মালিক তিনি। কিন্তু খামখেয়ালী মানুষ ব'লে অতবড় বাড়িতে কারো সঙ্গেই বিশেষ দেখা করতেন না। এস্টেটের যা আয়, তাতেই চলে যেত সংসার। সেকালে রাজার হালেই চলে যেত তাঁদের। তাই খামখেয়ালী করবার সময়ও পেতেন, সুযোগও পেতেন তিনি পুরোমাত্রায়!

আশীষ চৌহান বলতেন, মানুষ নামেই জানোয়ার—

নিজের একগাদা চাকর-বাকর নিয়ে নিজের মহলের মধ্যেই দিন রাত কাটাতেন।

এক-একটা চাকর ছিল এক-একটা কাজের জন্যে। কেউ তাঁকে জামা-পাজামা পরিয়ে দিত, কেউ তাঁর পা টিপে দিত, কেউ বাইরের ফাই-ফরমাস খাটতো। ভৃত্যরাই ছিল তাঁর সব! ভৃত্যরাই ছিল তাঁর আপনার লোক।

কাউকে ডেকে বলতেন, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাক্—

চাকরটা দাঁড়িয়ে থাকতো। কী কাজের জন্যে যে তাকে ডেকেছেন তা তিনিও বলতেন না, সেও জিজ্ঞেস করতো না। সে সামনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো।

খানিক পরে বলতেন, যা এবার—

আবার কখনও সামনে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করতেন, 'কী কাজের জন্যে তোকে ডেকেছি রে?'

চাকরটা বলতো, 'কী জানি হুজুর—'

রেগে যেতেন আশীষ চৌহান!

বলতেন, 'মনে ক'রে দেখ্ না কী জন্যে ডেকেছি তোকে—'

চাকরটা বলতো, 'আজ্ঞে আমি কী ক'রে মনে করবো?'

'তা তুই মনে করবি না তো আমি মনে করবো? আমি তোর মনিব, না তুই আমার মনিব?'

'আজ্ঞে, আপনি আমার মনিব।'

'তবে? তবে কেন বলছিস্ না, কেন আমি তোকে ডেকেছি?'

এ এক মহা সমস্যা কর্তাকে নিয়ে। বাড়ির ঝি-চাকর-খানসামা-বাবুর্চি-দারোয়ান-কচোয়ান সবাই এ নিয়ে মুশকিলে পড়তো। কিন্তু কিছু করবারও ছিল না কারো।

তা এই পাগলা মানুষের কাছেই চাকরি নিয়ে এসেছিল একদিন আনন্দ। আনন্দ প্রথমে ভেবেছিল বুঝি আশীষ চৌহানের ছবি আঁকতে হবে। কিন্তু তা নয়।

আশীষ চৌহান চিৎকার ক'রে ডাকলেন, 'শঙ্করজী—'

বেশি ডাকতে হলো না। একটা বেড়াল পাশের ঘর থেকে ম্যাও-ম্যাও শব্দ করতে করতে এসে হাজির হলো। কাছে আসতেই কোলে তুলে নিলেন তাকে আশীষ চৌহান।

বললেন, 'এর নাম শঙ্কর—এই শঙ্করজীর ছবি আঁকতে পাববে?'

শুনে আনন্দ মিশ্র তো অবাক! শুধু অবাক নয়, বলতে গেলে হতবাক্। কিছুক্ষণের জন্যে সেদিন কথাই বেরোয়নি তার মুখ দিয়ে। কিন্তু চাকরি যখন তাকে করতে হবে তখন আর বাছ-বিচার ক'রে লাভ নেই। মানুষ আঁকতেও যা জানোয়ার আঁকতেও তাই। আশীষ চৌহানের কাছে মানুষের চেয়ে জানোয়ারেরই বেশি কদর।

তিনি বলতেন, 'মানুষ নিমক্‌হারামের জাত—'

তা তাই-ই সই। আশীষ চৌহানের কথার প্রতিবাদ কববার নিয়ম নেই চৌহান এস্টেটে। চৌহান এস্টেটের একমাত্র মালিক তিনি। সুতরাং তাঁর কথা নির্বিবাদে মেনে নিতো আনন্দ মিশ্র।

কোর্টের খন-খারাপিব ঘটনা নিয়ে এ-উপন্যাস আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু যে-ঘটনার পরিণতি খুন-খারাপিতে, তারও একটা শুরু আছে। শিবনাথ আমাকে সেই শুরু থেকেই সবটা বলেছিল। বলেছিল কেমন ক'রে আনন্দ মিশ্র আস্তে আস্তে এই চৌহান ফ্যামিলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। জড়িয়ে পড়েছিল ঠিক প্রথম রাত্রিতেই।

সকালের ট্রেনে আনন্দ মিশ্র আসতে পারেনি, তাই প্রথম দিন তার আসতে দেরী হয়েছিল। যখন চৌহান এস্টেটে পৌঁছেছিল তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। সেদিন আর দেখা হয়নি আশীষ চৌহানের সঙ্গে। কিন্তু বাড়িটা যে কতবড় তার কিছুটা আঁচ পেয়েছিল সে।

বিরাট বাগান। বাগানের মধ্যেই ছোট লেক। বড় বড আকাশছোঁয়া রকমারি গাছ। গাছগুলো যে কত কালের তা আন্দাজ ক'রে বুঝতে হয়। রাত্তির বেলা একটি ঘরে তাকে চাকররাই খেতে

দিয়েছে। ঘরের দেয়ালে কত মানুষের ছবি। বড় বড় সাইজের অয়েল-পেন্টিং। কত পুরুষ, কত মহিলা। একজন মহিলার দিকে চেয়ে চোখ তার আটকে গিয়েছিল। বড় মিষ্টি মুখখানা।

কিন্তু বেশিক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকতে পারেনি আনন্দ মিশ্র। পাছে খানসামা-বাবুর্চি কিছু মনে করে।

আনন্দ মিশ্র চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সাহেব কি রাত্রেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন?'

চাকরটা বলেছিল, 'আমি সাহেবকে জিজ্ঞেস ক'রে বলবো হুজুর—' তারপর আর বেশি কথা হয়নি। নিজের ঘরে গিয়ে ইজেলটা খাটিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ঘুম বোধহয় তখনও ভাল ক'রে আসেনি। হঠাৎ মনে হলো, একখানা ফর্সা মুখ যেন তার জানালার কাচের উপর ভেসে উঠলো। ঠিক যেন সেই অয়েল-পেন্টিং-এর মুখখানার মতো।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আনন্দ মিশ্র। চিৎকার ক'রে উঠেছিল—কৌন? কৌন? কে? কে?

আওয়াজটা পেয়েই মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আনন্দ মিশ্র তাড়াতাড়ি জানালাটা হাত দিয়ে খুলে ফেললে। দেখলে কেউ কোথাও নেই। বাইরে চাঁদের ফুটফুটে জ্যোৎস্না। তাড়াতাড়ি আবার ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তবু কাউকে দেখতে পেলো না। শুধু মুঠো মুঠো জোনাকি বাগানের ঝোপেজঙ্গলে ঝিকমিক ক'রে বেড়াচ্ছে। আর মাথার ওপর সাদা আকাশ। সব নিঃঝুম।

কিন্তু পরের দিন সেই মুখখানাকে আবাব দেখতে পেলে আনন্দ মিশ্র। মুখ ঠিক নয়। মুখের ছায়া। এ যেন খানিকটা অলৌকিক ব্যাপারের মতো। খানিকটা অবিশ্বাস্য। বলতে গেলে নয়না চৌহানের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ছবি আঁকার চাকরি তার। আশীষ চৌহানের কুকুর-বেড়ালের ছবি আঁকতে গিয়ে নয়না চৌহানের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। অর্থাৎ নাকের বদলে যেন নরুন।

আশীষ চৌহান পরদিন বললেন, 'দেখি চশমাটা এনে দাও তো—'

ছবি আঁকতে আঁকতে আনন্দ জানালার কাছে রাখা বুড়োর চশমাটা আনতে গিয়ে হঠাৎ জানালার বাইরে নজর পড়লো। দেখলে, ঠিক সেই মেয়েটা একটা গাছের তলায় দোলনায় দোল খাচ্ছে। ঠিক রাত্রের দেখা মুখখানা।

চোখদুটোকে আরো তীক্ষ্ণ ক'রে দেখলে আনন্দ।

'কই চশমাটা আনতে এত দেরি করছো কেন?'

আর বেশিক্ষণ দেখা হলো না। আবার এসে শঙ্করজীর চেহারাটা আঁকতে লাগলো। কাবলী-বেড়াল শঙ্করজী। বড় বড় গোঁফ। পশমের মতো গায়ের লোম।

আশীষ চৌহানের জন্তু-জানোয়ারের সখ ছিল খুব। বাগানে ময়ূর ছিল। হরিণ ছিল। আর ঘরের মধ্যে ছিল চিড়িয়াখানা। বেড়াল, কুকুর, পায়রা, কাকাতুয়া, গিনিপিগ, খরগোস—কত রকমের পোষা জন্তু। সেইসব পাখী আর জানোয়ার নিয়ে তিনি দিন রাত কাটাতেন! মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ারই ছিল তাঁর প্রিয়।

বুড়োর ঘর থেকে ছুটি পেয়েই সোজা নিচের বাগানে গিয়ে হাজির। কিন্তু সেই মেয়েটা আর সেই দোলনার ওপর নেই, দোলনাটা শুধু দুলছে সামনে পেছনে। আনন্দ মিশ্র আশেপাশে চেয়ে দেখলে।

হঠাৎ যেন কোত্থেকে একটা খিল খিল ক'রে হাসির শব্দ কানে এলো।

কিন্তু এদিক-ওদিক চেয়ে কারো কোনও হদিস পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে ঘরে আসতেই নজরে পড়লো তার ইজেলের ওপর আঁটা কাগজটায় কে যেন বাঁকা-চোরা হাতে কাঠ-কয়লা দিয়ে লিখে রেখেছে—'

'আমাদের বাড়িতে একটা বাঁদব এসেছে—'

আশ্চর্য! আনন্দ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। কে এমন ক'রে এসব লিখে গেল।

হঠাৎ পেছন থেকে আবার সেইরকম হাসির শব্দ আসতেই ঘরের বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে, একটা দশ-বারো বছরের ছোট্ট মেয়ে তাকে দেখেই পালিয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরতেই মেয়েটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠেছে, আমাকে মেরে ফেল্লে—মেরে ফেল্লে।

আর সঙ্গে সঙ্গে এক পাল চাকর-বাকর দৌড়ে এসেছে।

—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া?

একসঙ্গে সবাই যেন আনন্দ মিশ্রর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো।

ছোট মেয়েটা বললে, 'এ আমাকে মেরেছে—'

আনন্দ প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু মনে হলো, কেউ যেন তাকে বিশ্বাস করছে না।

আনন্দ নিজের ঘরে চলে গেল। ইজেল থেকে কাগজখানা নামিয়ে রাখলে।

কিন্তু খানিক পরেই বুড়ো আবার ডেকে পাঠালেন। বুড়োর কাছে চাকররা গিয়ে লাগিয়েছে।

তিনি বলেছেন, 'আর্টিস্টকো বোলাও—'

আনন্দ গিয়ে দাঁড়াতেই বুড়ো বললেন, 'তুমি মেরেছো অল্‌কাকে?'

আনন্দ বললে, 'আমি মারিনি স্যার, মিছিমিছি চিৎকার ক'রে উঠেছে—'

'বেশ করেছো মেরেছো, আরো মারবে।'

খুব যেন খুশী হয়েছেন আশীষ চৌহান। বেশ হাসি-হাসি মুখ।

প্রথম দিন আনন্দ ভেবেছিল বুড়ো বুঝি হাসতে জানে না। রোগা চিমড়ে চেহারা। কেবল খিট খিট করে। কিসের জন্যে যে বুড়োর খিট-খিটুনি তার কোনও কারণ জানা যায় না। বোধহয় লিভারের দোষ। এত বড় প্রপার্টি এত সম্পত্তি তবু মেজাজ এমন কেন তা বহুদিন থেকেও বুঝতে পারেনি আনন্দ মিশ্র।

বুড়ো বললে, 'আমি বহুদিক থেকে খুব খুশি তোমার ওপর আর্টিস্ট, খুব খুশি! মেয়ে-জাত দেখলেই মারবে, বুঝলে? তুমি বিয়ে করেছো?'

আনন্দ বললে, 'না স্যার—'

বুড়ো বললে, 'খুব ভাল করেছো, বিয়েটি কখ্‌খনো করবে না। এই দেখ না, আমি বিয়ে করিনি তো ওই জন্যেই। যদি আয়েস চাও, তো বিয়ে করো না বাপু এই তোমায় ব'লে রাখছি।'

কিন্তু আর-একদিন ছোট মেয়েটা আর-এক কাণ্ড করে বসলো।

সেদিন ঘরে ঢুকে আনন্দ দেখলে তার ইজেলের ওপর আবার কে যেন কি লিখে গেছে।

ঘরে ঢুকেই বোঝা গেল, মেয়েটা ঘরের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু যেন তাকে দেখতে পায়নি এমনি ক'রে গিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলো। তারপর পকেট থেকে একখানা রুমাল বের ক'রে একটা ইঁদুর তৈরি করলো। আর সেই ইঁদুরটাকে নিয়ে হাতের ওপরেই নাচাতে লাগলো।

এবার আর লুকিয়ে থাকতে পারলে না মেয়েটা। ইঁদুরের লোভে একেবারে সামনে এগিয়ে এসেছে।

আনন্দ ইঁদুর নাচাতে নাচাতে বললে, 'তোমার নাম তো অল্‌কা না?'
'আপনি কি ক'রে জানলেন?'
আনন্দ বললে, 'আমি জানি—তুমি ইঁদুরটা নেবে?'
ব'লে অল্‌কার দিকে এগিয়ে দিলে ইঁদুরটা।
'এটা কী ক'রে তৈরি করলেন?'
'তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো'খন!'
অল্‌কা ইঁদুরটাকে নিয়ে খেলতে লাগলো।
'তোমার নাম তো অল্‌কা চৌহান না? আর তোমার দিদির নাম কী?
মেয়েটা অবাক হয়ে গেল।
বললে, 'আপনি কী ক'রে জানলেন আমার দিদি আছে!'
আনন্দ বললে, 'আমি তোমার দিদিকে জানি যে—'
'কী করে জানলেন?'
'তোমার দিদির সঙ্গে যে আমার খুব ভাব আছে, তা জানো না বুঝি?'
'কবে ভাব হলো আপনার সঙ্গে? আমাকে দিদি কিছু বলেনি তো?'
'বাঃ রে, সব কথা তোমার দিদি তোমাকে বলবে কেন?
অল্‌কা আরো অবাক হয়ে গেছে।
বললে, 'আমাকে যে দিদি সব কথা বলে—'
'তা বলুক। আমার সঙ্গে ভাব আছে এ-কথাটা বলবে না—'
'কিন্তু সত্যি বলুন না, কবে আপনার সঙ্গে ভাব হলো?'
আনন্দ হাসতে লাগলো! যেন খুব মজা পেয়েছে।
বললে, 'তোমার দিদি যে আমার ঘরে এসেছিল সেদিন—'
'ওমা, তাই নাকি? কবে?'
আনন্দ বললে, 'এই তো সেদিন রাততির বেলা—'
'আচ্ছা আমি দিদিকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি তো—'
ব'লে ইঁদুরটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়তে দৌড়তে ঘর থেকে চলে গেল।
বাইরে থেকে শোনা গেল অল্প চিৎকার ক'রে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে— দিদি, ও দিদি—'

শিবনাথ গল্প বলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে? এসব যে একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার—

শিবনাথ বললে—সমস্তই কোর্টের প্রোসিডিংস থেকে—

কিন্তু এসব কথাও কি কোর্টে উঠেছিল?

—নিশ্চয়। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস কোর্টে তো সব সাক্ষীরা এভিডেন্স দিয়েছে, ওই অল্‌কাও তো সাক্ষী দিয়ে গেছে। আমি যে রোজ গিয়ে শুনতাম। আমার তো তখন কোনও কেস নেই—মক্কেলও নেই, রোজ গিয়ে মামলা শুনি যে—

তারপর একটু থেমে শিবনাথ বললে—তোমাকে আমি শুধু পয়েন্টগুলো দিচ্ছি। এসব নিয়ে পরে তুমি উপন্যাস লিখতে পারবে ইচ্ছে করলে। এ-মামলার যত সাক্ষী সবাই তো লক্ষ্ণৌতে এসেছিল। এই নয়না চৌহান এসেছিল, আশীষ চৌহান এসেছিল, অল্‌কা চৌহান এসেছিল, বুলবুল চৌধুরীর বউ এসেছিল—

—বুলবুল চৌধুরীর বউ? সে আবার কে?

শিবনাথ বললে—সবই বলবো তোমাকে, অত অধৈর্য হচ্ছো কেন হে! উপন্যাসের মাল-মশলা নিতে এসেছো, আর সমস্ত কিছু না বলে কি তোমাকে ছেড়ে দেবো ভাবছো? তুমি ইচ্ছে করলে এদের পুরো বাঙালী ক'রে দিতে পারো। উপন্যাস লেখবার সময় লক্ষ্ণৌ না ক'রে

কলকাতা ক'রে দিও। আর নয়না চৌহান না ক'রে নয়না চৌধুরী করে দিও—। আমাদের এই কোর্টের মধ্যেই যে কত উপন্যাস আর গল্পের খোরাক তৈরী হচ্ছে তা তো তোমরা বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারো না—

—তা, তারপর?

শিবনাথ বললে—তারপর সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা আনন্দ মিশ্রর ডাক পড়লো নয়না চৌহানের ঘরে।

—নয়না চৌহানের ঘরে মানে?

—মানে, লাইব্রেরী ঘরে। নয়না চৌহানকে তো তুমি দেখনি। দেখলে বুঝতে পারতে সে কী রূপ! দেখলে আমার মতো গদ্যময় লোকেরও আর্টিস্ট হতে ইচ্ছে করতো। তবে আনন্দ মিশ্র তার যে-রূপ দেখেছিল, সে রূপ তো আমি দেখিনি। আমি কোর্টের ভেতর যখন নয়না চৌহানকে দেখলাম তখন তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। তখন নয়না চৌহানের মাথারই ঠিক নেই। তখন তাকে পাগলা গারদে আটকে রেখেছে বুলবুল চৌধুরী। চোখ দিয়ে তার ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। সে সময় নয়না চৌহানকে যে দেখেছে সে-ই মনে মনে তার জন্য কষ্ট পেয়েছে।

—কেন? পাগলা গারদে আট্‌কে রেখেছে কেন?

—সে সব পরে বলবো। আগে গোড়ার কথাগুলো তো শোনো। চৌহান এস্টেটের আত্মারাম চৌহানের একমাত্র মেয়ে নয়না চৌহান, পনেরো লাখ টাকা আয়ের গুলমোহর এস্টেটের মাল্‌কিন সে, তার ডাক পেয়ে আনন্দ মিশ্র সত্যই ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমে।

প্রথমটা তো বিশ্বাসই হয়নি।

আনন্দ জিজ্ঞেস করলে, 'আমাকে?'

'জী হাঁ!'

নয়না চৌহানের আয়া নিজেই ডাকতে এসেছিল। আয়াটার বয়স বেশি নয় একটু গম্ভীর-গম্ভীর চেহারা। বেশি কথা বলতো না। অনেকবার তাকে দেখেছে আনন্দ। মুখে যেন তার কোনও ভাষা নেই। সাদা ধবধবে সালোয়ার পাঞ্জাবী-পরা চেহারা। একটু ফুলো-ফুলো গোলগাল মুখখানা। মেয়েটার মা-বাপ নেই ব'লে বরাবর আয়াটাই দেখাশোনা করতো। নয়নার পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল-বাঁধা, গায়ে সাবান মাখানো সমস্ত কাজেরই ভার ছিল তার ওপর।

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে চড়িয়ে আয়াটার পেছনে-পেছনে গিয়ে হাজির হলো দোতলার লাইব্রেরী ঘরে।

বিরাট একটা ঘর। চারদিকে নানা-রকম ছবি, পাথরের কিউরিও সাজানো, দেয়ালের আলমারিতে বইয়ের সারি। একটা চেয়ারে বসিয়ে আয়াটা পাশের ঘরে চলে গেল। আর তার খানিক পরেই নয়না চৌহান বেরিয়ে এলো লাইব্রেরী-ঘরের ভেতরে।

আনন্দ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে।

বললে, 'আপনি আমায় ডেকেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বসুন। আপনি অল্‌কাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?'

'অল্‌কাকে? আপনার ছোট বোনকে?'

'হ্যাঁ। আপনি নাকি তাকে বলেছেন যে, আমি একদিন সন্ধ্যেবেলা আপনার ঘরে গিয়েছিলাম!'

আনন্দ কী উত্তর দেবে হঠাৎ ভেবে পেল না।

বললে, 'আমি তো ঠিক তা বলিনি—'

'তা বলিনি মানে? আপনি বলেননি যে, আমি আপনার ঘরে গিয়েছিলাম?'

আনন্দ নয়না চৌহানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। শুধু নয়না চৌহানের মুখের ভাষার নয়, তার মুখ-চোখ-নাক কান চুল রং সমস্ত যেন আনন্দ মিশ্রকে বড় বিমূঢ় ক'রে দিলে। এতদিন ধরে ছবি এঁকে এসেছে সে, অনেক মডেল নিয়েও পোর্টেট এঁকেছে—কিন্তু এ যে অন্য রকম। এ যেন অনন্যা। মুখের-চোখের-নাকের কানের এমন প্রোপোরশন যেন আগে আর কোথাও দেখা যায়নি।

'আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে কোনও অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

'কিন্তু আমি কখন আপনার ঘরে গেলাম? আর আপনার ঘরে যাবার উদ্দেশ্যই বা আমার কী থাকতে পারে?'

আনন্দ বললে, 'সে তো সত্যি কথাই। কিন্তু সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমার ঘরে ঠিক আপনার মতোন একটা মুখ যেন উঁকি মারছিল—'

'কী যা-তা বলছেন?'

'সত্যি বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিছে কথা বলবো না, আমি যেদিন প্রথম এ-বাড়ীতে এলাম সে রাত্রেই সবে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ কী-রকম যেন একটা শব্দ হতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল; আর চোখ মেলে দেখি, একটা মুখ আমার জানালার ওপর ঝুঁকে ভেতরের দিকে দেখছে—'

'কী দেখছে?'

'তা জানি না, প্রথমে আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু খাবার ঘরের টেবিলে আপনার যে-রকম একটা পোর্টেট টাঙানো আছে, ঠিক সেইরকম মুখখানা, ঠিক অবিকল আপনাব মতো মুখ, আপনার মতো চোখ, আপনার মতো নাক-কান-চুল সমস্ত—আমিও তাই নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—এ কেমন করে হতে পারে।'

'আপনি ভুল দেখেছেন কিংবা স্বপ্ন দেখেছেন। আপনাব জানালা দিয়ে উঁকি মারবো এ কেমন ক'রে আপনি ভাবতে পারলেন?'

আনন্দ এর পব কি বলবে ভেবে পেল না।

বললে, 'আমায় আপনি দয়া করে ক্ষমা করবেন—আমি ঠাট্টা ক'রে অলকাকে কথাটা বলেছিলাম, এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার—'

নয়না বললে, 'আপনি আমার কাকার কাজ করতে এখানে এসেছেন, কাকার কাজ নিয়েই থাকবেন, আমি চাই না যে, বাইরের কেউ আমাদের বাড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামাবে—'

আনন্দ চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ।

নয়না আবার বলতে লাগলো, 'আর এর পরেও যদি এ-ব্যাপার আর ঘটে, তাহ'লে যাতে আপনার এখানে আর থাকা সম্ভব না হয় তার ব্যবস্থা করবো—এখন যান—'

আনন্দ এর আর কী উত্তর দেবে! নিঃশব্দে একটা নমস্কার ক'রে চলে আসা ছাড়া আর কোনও উপায়ই ছিল না তার!

চলেই আসছিল আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ বাইরে থেকে একটা চিৎকার কানে আসতেই থমকে দাঁড়ালো। নয়না চৌহানের দিকে চেয়ে দেখলে, সে-ও যেন অবাক হয়ে গেছে চিৎকারটা শুনে। যেন ভীষণ বিপদে পড়েছে অলকা।

অল্‌কার গলা না?

আনন্দরও মনে হলো যেন অল্‌কার গলার শব্দ। বাগানের দিক থেকে চিৎকারটা এসেছে। হয়তো প'ড়ে গেছে খেলতে খেলতে। কিম্বা তার চেয়েও ভীষণ কিছু বিপদ ঘটেছে।

পাশের ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ সেই আয়াটা বেরিয়ে এলো।

নয়না বললে, 'চল্‌ তো যাই, অল্‌কা যেন চেঁচিয়ে উঠল—'

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা। সেইদিকেই সবাই ছুটলো। আনন্দও চলতে লাগলো। বাড়ির সদর পোর্টিকো পেরিয়ে বাগানের দিক থেকেই শব্দটা এসেছিল! সেইদিকেই নয়না চলতে লাগলো। আয়াটা পেছন পেছন। আনন্দও সেইদিকে চলতে লাগলো। এই ক'দিনের মধ্যেই আনন্দ যেন অল্‌কাকে ভালবেসে ফেলেছিল। বেশ ছটফটে মেয়েটা। হঠাৎ তার কী-ই বা বিপদ হতে পারে।

কিন্তু বাগানের মধ্যে তখন চাকর-বাকরদের ভিড় জ'মে গিয়েছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। অল্‌কা মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। তার জ্ঞান নেই তখন।

কেউ বলছে—কী হয়েছে দিদিমণি?

কেউ বলছে—ডাক্তার সাহেবকে খবর দিয়ে দাও—

নয়নাও এসে পৌছলো সেখানে। নয়নার আয়াও তখন পৌছে গেছে—! তাদের সঙ্গে আনন্দ মিশ্রও পৌছে গেছে। কেউই কিছু বুঝতে পারছে না, কী ক'রে এমন হলো। গাছ থেকে পড়ে গিয়েছে নাকি? খেলা করতে গিযে প'ড়ে গিয়েছে? বাগানের এই জায়গায় কী করতে এসেছিল সে? এখানে তার কী দরকার ছিল?

কে এত কথার উত্তর দেবে? যার উত্তর দেবার কথা সে তো অজ্ঞান, অচৈতন্য!

নয়না সকলকে বললে—ধরাধরি ক'রে অল্‌কাকে ঘরে নিয়ে যেতে।

চাকররা সবাই মিলে অল্‌কাকে ধরাধরি ক'রে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

সকলে চলে যাবার পরও আনন্দ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তার যেন কেমন সন্দেহ হলো। নিশ্চয় এর পেছনে কিছু রহস্য আছে। এ-বাড়িতে আসা পর্যন্ত কেমন সন্দেহ হচ্ছিল তার। সবই যেন অদ্ভুত এখানে। এ-বাড়ির চাকর-বাকর-ঝি-আয়া-খানসামা-চাপবাশি সবাই যেন কেমন আস্তে আস্তে কথা বলে। সবাই যেন বড কেতাদুরস্ত। সবাই যেন মন খুলে কথা বলে না কাবো সঙ্গে। আর সবার মাথাব উপর বুড়ো কর্তা তো খাঁটি পাগল মানুষ। অথচ টাকারও অভাব নেই এদের, ঐশ্বর্যেরও অভাব নেই। কর্তার ভাইঝি, সে-ও যেন কেমন অদ্ভুত। আনন্দ মিশ্র সেই ঝাপ্‌সা সন্ধ্যের মধ্যে বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কথা ভাবতে লাগলো।

কী হলো তার এখানে এসে? দু'টো টাকা? টাকার জন্যেই কি এই বেড়াল-কুকুবেব ছবি আঁকছে সে! আর কিছু নয়?

হঠাৎ নয়না চৌহানের চেহারাটার কথা মনে পড়লো। অমন চমৎকার চোখ, মুখ, নাক, কান, রং। যদি অমন চেহারাটাকে আঁকবার সুযোগ পেত সে। কিন্তু তাই-ই বা কেমন ক'বে সম্ভব হয়! বড়লোকের মেয়ে, সে-ই বা কেন তার অনুবোধ বাখবে। কীসেব দায় তাব?

বাগানের গাছের মধ্যে দু'একটা বাত-চরা পাখী কিচ্‌-কিচ্‌ শব্দ ক'বে উঠলো। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকেই আবার ফিবে আসছিল সে। হঠাৎ তাব মনে হলো, বাগানের একটা বিবাট গাছের গুঁডির আড়ালে যেন কে ন'ডে উঠলো।

কেমন যেন সন্দেহ হলো তার। সেদিকে গিয়ে ভাল ক'রে একবার দেখতেও ইচ্ছে হলো। ওখানে এ-সময়ে কে আবার দাঁড়িয়ে আছে? চোর নাকি?

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। গাছের আড়াল থেকে মানুষটা বেরোতেই দেখলে, একটা মেয়েমানুষ।

মেয়েমানুষটা নিঃশব্দে আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল গেটের দিকে।

গেটটা ফাঁকাই প'ড়ে থাকে সারাদিন, তারপর গেট পেরিয়ে পাশ ফিরতেই মনে হলো ঠিক যেন নয়না চৌহানের মতো মুখটা।

আশ্চর্য! নয়না চৌহান তো বাড়ির ভেতরেই চলে গেল তার আয়াটার সঙ্গে। তবে এ-মেয়েটা কে? এ-মেয়েটা অমন চোরের মতো নিঃশব্দে পালিয়ে গেল কেন? কোথায় পালিয়ে গেল?

আর ফেরা হলো না। আনন্দ তাড়াতাড়ি গেট পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো।

মেয়েটাও বোধহয় তাকে দেখতে পেয়েছে। বোধহয় আনন্দকে দেখেই ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

আনন্দও পেছন-পেছন ছুটতে লাগলো। মেয়েটাও যেন তাকে এড়াবার জন্যে অন্য পথ ধরলে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু তবু আনন্দের মনে হলো যেন ঠিক নয়না চৌহানই তাকে পেছনে আসতে দেখে পালাচ্ছে। সত্যি-সত্যিই আনন্দ পেছনে আসছে কিনা একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে আবার ছুটছে।

অচেনা রাস্তা। পাহাড়ী বন, নীচু পথ। তবু আনন্দের মনে হলো, কোথায় যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে এর পেছনে! এ-রহস্য তাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। এ না জানতে পারলে রাত্রে যেন আর ঘুমই হবে না তার!

বাঁকা-চোরা উঁচু-নীচু চড়াই-উৎরাই পথে চলতে গিয়ে আনন্দের পায়ে হোঁচট লাগলো অনেকবার।

কিন্তু আনন্দও যত পেছনে ছুটছে, মেয়েটাও যেন তত এগিয়ে চলেছে। মেয়েটার কাছে যেন এখানকার রাস্তাঘাট খুব চেনা! এ-সব রাস্তা যেন তার মুখস্থ।

তারপর অনেকদূর গিয়ে রাস্তার একটা বাঁকের মুখে এসে হঠাৎ যেন মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা গেল না তাকে।

আনন্দ মিশ্র সেখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লো। কোথায় কত দূর এসেছে তাও বুঝতে পারলে না সে। সবই অচেনা এদিকে। দূরে বোধহয় দু'একটা বসতি বাড়ি! হয়তো কোনও ছোটখাটো গ্রাম, সেখানে টিম্-টিম্ ক'রে কয়েকটা আলো জ্বলছে, সেই অন্ধকারে আর এগোতে ভয় করলো। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আনন্দ যেন আকাশের দিকে চেয়ে এই রহস্যের কিনারা করতে চেষ্টা করতে লাগলো।

বললাম—এত খুঁটিনাটি কেন বলছো, ও মেয়েটা কে?

শিবনাথ বললে—তোমরা গল্প-টল্প লেখো ভাই, তাই তোমাদের একটু কবিত্ব ক'রে বলছি, আমি উকীল মানুষ ব'লে কি আর কবিত্ব করবার অধিকার নেই?

বললাম—কবিত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু পয়েন্টগুলো ব'লে যাও—বাকিটা আমি নিজে ক'রে নেবো। কিন্তু ও-মেয়েটা আবার কে? ও-মেয়েটাও কি নয়না চৌহানের মতো দেখতে?

শিবনাথ বললে—হ্যাঁ—

—দুই বোন নাকি? যমজ বোন?

শিবনাথ বললে—না, একই রকম দেখতে। মামলাটা তো ওইজন্যেই হলো। বুলবুল চৌধুরী কি সহজ মানুষ? বেশ আট-ঘাট বেঁধে কাজে নেমেছিল—

—কে বুলবুল চৌধুরী!

শিবনাথ বললে—এই মামলার যে আসামী!

শিবনাথের কাছে যা শুনেছিলাম তাতে বুঝেছিলাম, বুলবুল চৌধুরীও কম বড়লোক নয়। মানে, কাঠগুদামের মস্তবড় এক জমিদারবাড়ির ছেলে। একমাত্র ছেলে। বুলবুল চৌধুরীর বাবা ধর্মেন্দর চৌধুরী সেকালে ভাল শিকারী ছিলেন। সেকালে ধর্মেন্দর চৌধুরী ও-অঞ্চল থেকে প্রথম বিলেত গিয়েছিলেন। নয়না চৌহানের বাবা আত্মা চৌহানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দু'জনে একসঙ্গে পোলো খেলতে যেতেন জয়পুরে। দু'জনে একসঙ্গে শিকারে যেতেন। দ'জনেই বড়লোক! দু'জনেই বেপরোয়া। প্রথম যৌবনে লক্ষ্ণৌয়ে বাঈজীমহলে ধর্মেন্দর চৌধুরী আর আত্মা চৌহানের নবাবীয়ানার কাহিনী মুখে মুখে ফিরতো। কোনো বাঈজীকে ধর্মেন্দর চৌধুরী মহাল কিনে দিয়েছেন, কোনো বাঈজীর গান শুনে আত্মা চৌহান সোনা দিয়ে তার তানপুরাটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন, এ-সব গল্প লক্ষ্ণৌয়ের নবাবরা বেশ আগ্রহ ক'রে রসিয়ে রসিয়ে শুনতো। যখন তুমি উপন্যাস লিখবে তখন পাতার পর পাতা তা নিয়ে লিখতে পারো, সে-সব তোমার পাঠকদের পড়তে ভাল লাগবে, পড়িয়ে শোনাতেও ভাল লাগবে। এখন শুধু পয়েন্টগুলো ব'লে যাচ্ছি।

তা সেই ধর্মেন্দর চৌধুরী বিলেতে গিয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছিল এক মেমসাহেবকে। মেমসাহেব এসে ধর্মেন্দর চৌধুরীর জানলা আলো ক'রে বসলো।

ধর্মেন্দর চৌধুরীর বাঈজীর নেশা কেটে গেল বিয়ে করার পর। সেই মেমসাহেবের পেটে এক ছেলে হলো! সেই ছেলে হলো এই মামলার আসামী বুলবুল চৌধুরী।

আর আত্মা চৌহানের বিয়ে হয়েছিল দেশোয়ালী মেয়ের সঙ্গে, যেমন আর পাঁচজন ভদ্রসন্তানের হয়ে থাকে। জাঁকজমক বাজি পোড়ানো, ভোজ-উৎসব, ডিনার-পার্টি কিছুরই কমতি পড়েনি চৌহান এস্টেটে। লক্ষ্ণৌ-নৈনিতাল আর কাঠগুদামের যত খানদানী রেইস আদমী ছিল সবাই এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে।

সেই আত্মা চৌহানেরও বিয়ের এক বছর পরে এক মেয়ে হলো। সেই মেয়েরই নাম নয়না। নয়না চৌহান।

ধর্মেন্দর চৌধুরী আর আত্মা চৌহান দু'জনেই বিয়ের পর একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আত্মা চৌহান কথা দিয়ে দিলেন, বন্ধুর ছেলে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে নয়না চৌহানের বিয়ে দেবেন। ধর্মেন্দর চৌধুরীও রাজী। শুধু রাজী নয়, মহা খুশি।

কিন্তু মানুষের ভাবনা আর ঈশ্বরের পরিকল্পনা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস! আত্মা চৌহান দেখে যেতেও পারলেন না যে, ধর্মেন্দরের মেমসাহেব-বউ তার ছেলে বুলবুল চৌধুরীকে নিয়ে আবার বিলেত চলে গেল। নিজের ছেলেকে নিয়ে বউ চলে যাবার পর ধর্মেন্দর চৌধুরীও যেন কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। কারো সঙ্গে আর মেলামেশা করতেন না। বাঈজী-মহল আগেই কাণা হয়ে গিয়েছিল। আত্মা চৌহান মারা যাবার পর লক্ষ্ণৌ শহরের নবাবীয়ানাই যেন মুছে গিয়েছিল। কিন্তু উইলটা ক'রে রেখেই গিয়েছিলেন। উইলের মধ্যেই লেখা ছিল যে, ধর্মেন্দরের ছেলে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে নয়নার বিয়ে হলে জামাই তাঁর গুলমোহরের এস্টেট

যৌতুক পাবে। পনের লাখ টাকা আয়ের গুলমোহর এস্টেটটা ধর্মেন্দর ছেলেকে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

তারপর কোথায় গেলেন সেই আত্মা চৌহান আর আত্মা চৌহানের স্ত্রী! আর কোথায়ই বা গেলেন ধর্মেন্দর চৌধুরীর বিলিতি মেমসাহেব বউ! একদিন কোলের ছেলেকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল ইণ্ডিয়া থেকে।

আত্মা চৌহানের একমাত্র ভাই আশীষ চৌহান বরাবরই পাগল-ছাগল মানুষ। না আছে টাকা-পয়সা প্রপার্টির ওপর লোভ, না আছে মেয়েমানুষের ওপর নজর। তিনি তার নিজের এস্টেটের একটা মহলের মধ্যে চিড়িয়াখানা বানিয়ে তার মধ্যেই বাস করতেন। কোথাও কোনও ভাল পাখী কিম্বা কোনও ভাল পোষা জানোয়ারের খবর পেলেই অনেক টাকা দিয়ে কিনে ফেলতেন। আর তাই নিয়েই জীবন কাটাতেন। বাড়ীর মধ্যে ভাইঝি কেমন ক'রে দিন কাটাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না তাঁর।

একটু চিৎকার কানে গেলেই দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিতেন। তাঁর নিজের জানোয়ারদের অসুখ-বিসুখ হলে যতটা ভাবনায় পড়তেন, ভাইঝির বেলায় অতটা ভাববার অবসরও তাঁর হতো না। তাঁর একটা ভাল পিকনিজ-কুকুর ছিল। বড় আদরের কুকুর। সেটা দিন-রাত তাঁর পাশে পাশে ঘুরতো! সেই কুকুরটা হঠাৎ মারা যাবার পরই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। সেই যে কুকুরের শোকে স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করলো, সে আর জোড়া লাগলো না। সেই তখনই ঠিক করলেন, তাঁর যত কুকুর-বেড়াল-পাখি-হরিণ-ময়ূর আছে—সকলের ছবি আঁকিয়ে রেখে দিতে হবে। পিকনিজ-কুকুরটার একটা অয়েল পেন্টিং বুদ্ধি ক'রে তৈরি করিয়ে রাখলে তাঁর এত কষ্ট হতো না আর। তাঁর স্বাস্থ্যও বোধহয় অত ভেঙে পড়তো না। দরকার হলে সেইদিকেই চেয়ে-চেয়েই মনটা শান্তি পেতো।

সেই কথা ভেবেই লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর সলিসিটরকে খবর দিয়েছিলেন একটা আর্টিস্ট পাঠিয়ে দিতে। আর সেই আর্টিস্ট হলো আনন্দ মিশ্র। আনন্দ মিশ্র খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেই দরখাস্ত ক'রে এই চাকরি পেয়েছিল।

বললাম—তারপর?

শিবনাথ বললে—আনন্দ মিশ্র যখন চৌহান এস্টেটের আর্টিস্ট হয়ে এসেছে, তার আগেই কিন্তু বুলবুল চৌধুরী ইণ্ডিয়ায় ফিরে এসেছে—

—আর তার মেমসাহেব-মা?

—মেমসাহেব-মা তখন মারা গেছে সেখানে। ইণ্ডিয়াতে তার বাপের যে এত সম্পত্তি আছে তাও সে বড় হয়ে জানতে পারলো। যতদিন মেমসাহেব বেঁচে ছিল ততদিন ইণ্ডিয়াতে আসতে দেয়নি। মানে এ-সব খবর জানতেও পারেনি! প্রথম যখন ইণ্ডিয়া থেকে চিঠি গেল চৌধুরী-ফ্যামিলির এ্যাটর্নীর কাছ থেকে, তখনই জিনিসটা মাথায় ঢুকলো তার। তখনই জানা গেল, ইণ্ডিয়াতে তার একজন বাপ ছিল। তার বাপের এস্টেট ছিল। শুধু এস্টেটই নয়, নয়না চৌহানের সঙ্গে তার বিয়ের কথাটাও জানা গেল। আরো জানা গেল, নয়না চৌহানের পনেরো লাখ টাকা ইনকামের গুলমোহর এস্টেটের কথা। এ্যাটর্নীর চিঠি পেয়ে বুলবুল চৌধুরী পঁচিশ বছর পরে আবার ইণ্ডিয়ায় ফিরে এলো।

এ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা ক'রে কাঠগুদামের এস্টেটের দলিল-পত্র দেখলে। ধর্মেন্দর চৌধুরীর এস্টেটে তখন চাকর-বাকর কেউ ছিল না আর। ছিল শুধু বাপের আমলের এক বুড়ি আর তার ছোট্ট একটা মেয়ে।

সেখান থেকে সোজা গিয়ে দেখা করলো আশীষ চৌহানের সঙ্গে। এ্যাটর্নীর চিঠি ছিল সঙ্গে। সেই চিঠি দেখিয়ে বুলবুল চৌধুরী একেবারে আপনার লোক হয়ে গেল।

বুড়ো চৌহানজী বললেন, 'তুমি তাহলে এসে গেছো?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি না এসে আর পারলাম না—আর কতদিন বিদেশে প'ড়ে থাকবো—'

বুড়ো বললেন, 'আর কিছুদিন আগে এলে তোমার বাপকে দেখতে পেতে—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'সে আমার কপালে নেই, আমি কী করবো?'

'তোমার বাপের কথা তোমার মনে পড়ে?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'না কাকাবাবু, আমার কিছুই মনে পড়ে না—'

'না মনে থাকারই কথা।'

'কেন? তোমার মনে পড়বে না কেন? তোমার তখন কত বয়েস?'

'আজ্ঞে, বারো কি তেরো, ঠিক মনে পড়ছে না—'

তা বারো-তেরো বছর বয়েসের কথা সব সময়ে মনে না-ও পড়তে পারে। আর তার পরে কত বছর কেটে গেছে। কোথায় সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশ, সে কি এখানে? সে-দেশে একবার গেলে মানুষ কি আর এই ইণ্ডিয়ার কথা মনে রাখে।

'তোমার মায়েরই আসল দোষ বাপু। তোমার বাপ ধর্মেন্দর ছিল আমার দাদার প্রাণের দোস্ত। আমার দাদা আর তোমার বাপ দু'জনে ছিল হরিহর-আত্মা। একদিন দু'জনে দেখা না হলে মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো দু'জনের।'

কোথায় সেই কাঠগুদাম, দাদা সেই সেখানে যেত গাড়ি চালিয়ে। আবার পরের দিন আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতো। এমনি হামেশা। অমন দোস্তালি বড় দেখা যায় না আজকাল। এতবড় চৌধুরী এস্টেট লোকসান হচ্ছিল কেউ না দেখার জন্যে। স্টেটের আয় ক'মে কমে শূন্যায় এসে নেমে যাচ্ছিল। বুলবুল চৌধুরী ফিরে এসে আবার সেই ভাঙা স্টেট জোড়া লাগাতে বসলো। চৌধুরী লজ আবার জম-জমাট হয়ে উঠলো! আবার আলো জ্বলে উঠলো ঘরে ঘরে। ইলেকট্রিশিয়ান এলো, মেকানিক এলো, নতুন ম্যানেজার এলো। চৌধুরী লজ মেরামতো হয়ে আবার ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ ক'রে উঠলো। বুলবুল চৌধুরীর নাম-ডাক আবার তার বাপ ধর্মেন্দর চৌধুরীর মতো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। বুলবুল চৌধুরী নতুন বন্দুকের লাইসেন্স করিয়ে নিল, নতুন গাড়ি কিনলে। কাঠগুদামের রেইস-পাড়ায় আবার সোরগোল উঠলো যে, হ্যাঁ ধর্মেন্দর চৌধুরীর ছেলে বাপের বেটা বটে। সেই কথায় বলে না, বাপকে বেটা, সিপাইকা ঘোড়া।

চৌহানজী বললেন, 'তুমি কাল আসবে এখানে, আমি এ্যাটর্নীর কাছে চিঠি লিখে দেবো। দাদার সলিসিটর মিস্টার পুরোহিত, তিনিই তোমাকে দাদার উইল দেখিয়ে যাবেন, নয়না তো এসব কিছু জানে না, তাকেও সব কথা খুলে বলতে হবে—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'এখন তাকে এ-সব কথা বলবার দরকার নেই কাকাবাবু—'

'কেন?'

'না বলাই ভাল। এতদিন যখন জানতে পারেনি, তখন আরো কিছুদিন চাপা থাক্ না খবরটা—'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তাকে একবার দেখবে না।'

সে তো দেখবোই কাকাবাবু, সারা জীবন ধরেই তো দেখবো। সমস্ত জীবনটাই তো সামনে প'ড়ে আছে আমাদের। আগে প্রপার্টির ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাক্!

চৌহানজী বললেন, 'প্রপার্টির তো কোন হাঙ্গামা নেই, সে তো সমস্ত ঠিকই আছে। ইয়ার্লি পনেরো লাখ টাকার ইন্‌কাম এখনও ইন্‌ট্যাক্ট আছে—'

'কিন্তু নয়না চৌহান যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হয় কাকাবাবু তখন?'

চৌহানজী রেগে গেলেন।

'রাজী হবে না মানে? রাজী হবে না তার মানেটা কী? মানেটা কী শুনি? দাদা নিজে মারা যাবার আগে উইল ক'রে যায়নি? দাদা তো সব কথা খুলে লিখে গেছে। তোমার বাপ বেঁচে থাকলে তাঁর মুখেই সব শুনতে পেতে—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। তখন আর এখন? এখন যদি তাঁর মেয়ে সে-কথা না মানে?'

'তার মানে?'

চৌহানজী যেন আরও বেশি রেগে গেলেন বুলবুল চৌধুরীর কথা শুনে।

বললেন, 'তার মানে, তুমি বিয়ে করতে চাও না আমার ভাইঝিকে। তুমিও কি মেমসাহেব বিয়ে ক'রে ব'সে আছো তোমার বাবার মতো?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'না কাকাবাবু, আমি বিয়ে করতে যাবো কেন? আমি তো আমার মা'র কাছে সব শুনেছি। আপনাকে না জিজ্ঞেস ক'রে আমি কি বিয়ে ক'রে ফেলতে পারি?'

'তবে? তবে এ-কথা বলছো কেন? আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কবে আছি কবে নেই, এখন যদি মারা যাই তো কে ওদের দেখবে।

তা এসব ঘটনা অনেক দিন আগের। মানে আনন্দ মিশ্র যখন চৌহান এস্টেটে ছবি আঁকবার চাকরি নিয়ে এসেছে, তার অনেক আগের ঘটনা। মিস্টার পুরোহিত এসে বৈষয়িক ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়েছেন। বুলবুল চৌধুরী মাঝে মাঝে এখানে আসে, দেখা করে, কথা বলে। চৌহানজীর কাছে গিয়ে বসে। শান্ত সুবোধ বালকটির মতো মন দিয়ে বুড়োর কথা শোনে। নয়না চৌহানের সঙ্গে দু'একটা কথা ব'লে আবার চলে যায়। বিয়েরও প্রায় ঠিক-ঠাক। অর্থাৎ দিন-ক্ষণ সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। এই সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো।

শিবনাথ বললে—এই বিয়েটা না হলে আসলে কিছুই ঘটতো না—

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—সে কী? বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে নয়না চৌহানের বিয়ে হয়ে গেল নাকি?

শিবনাথ বললে—কেন? অবাক হচ্ছো নাকি?

সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। বেশ একটা রোমান্স জ'মে উঠছিল শিবনাথের মুখে-শোনা কাহিনীর মধ্যে! মনে মনে বেশ কল্পনা ক'রে নিয়েছিলাম, আর্টিস্ট আনন্দ মিশ্রের সঙ্গে নয়না চৌহানের একটা রোমান্স হবে, রসিয়ে রসিয়ে সেটা লিখবো, আর মাঝপথেই বিয়েটা হয়ে গেল বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে? তাহ'লে আর আমার পাঠক-পাঠিকারা এ-উপন্যাস পড়বে কেন?

শিবনাথ বললে—তা তুমি রোমান্স যত ইচ্ছে করিয়ে দাও না, আপত্তি কী? কেউ তো তোমায় বাধা দিচ্ছে না—আমি তো শুধু পয়েন্ট ব'লে যাচ্ছি—

—পরস্ত্রীর সঙ্গে কি প্রেম হয় ভাই? সে যে বে-আইনী।

—আরে, আনন্দ মিশ্র তো এ-সব খবর জানতো না। নয়না চৌহানও তো জানতো না। যতক্ষণ জানাজানি না হয় ততক্ষণ আনন্দ মিশ্রর সঙ্গে নয়না চৌহানের প্রেম করিয়ে দাও—

—কী ক'রে প্রেম করাবো?

শিবনাথ বললে—সে ঘটনাও আছে—

বললাম—কী রকম?

শিবনাথ বললে—আরে, সেইদিনই তো প্রেমটা শুরু হলো, যেদিন সেই অল্‌কা বাগানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল আর আনন্দ সেই মেয়েটার পেছন পেছন রাস্তায় বেরিয়ে গ্রামের দিকে গেল!

—কী রকম?

শিবনাথ আবার বলতে লাগলো।

নয়না চৌহান তখন অল্‌কার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। যখন অল্‌কা চোখ খুললো তখন প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। মাথায় বরফ দেওয়া হচ্ছে অল্‌কার।

অল্‌কা আস্তে আস্তে চোখ খুলতেই নয়না নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে, কেমন আছিস? ওখানে অমন ক'রে প'ড়ে গিয়েছিলি কেন?'

অল্‌কার তখনও বোধহয় ভয় কাটেনি। চোখে-মুখে আতঙ্ক লেগে আছে।

বললে, 'আমি ভূত দেখেছিলাম দিদি—'

'বলছিস্ কী তুই?'

'হ্যাঁ দিদি, আমি জানি তুমি তখন ঘরের মধ্যে রয়েছো, কিন্তু তবু যেন ঠিক তোমার মতো একজন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো—'

নয়না বললে, 'দূর তাই কি কখনও হতে পারে?'

হ্যাঁ দিদি, সত্যি বলছি! ঠিক তোমার মতো মুখ, তোমার মতো চোখ, তোমার মতো নাক, কান, সমস্ত। শুধু মনে হলো, তুমি যেন আরো একটু রোগা হয়ে গেছো—তাই দেখেই তো আমার মাথাটা ঘুরে গেল 'আমি ঘুরে প'ড়ে গেলাম—'

নয়না চৌহান কথাটা শুনে কেমন যেন হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বললে না। নয়নার আয়াটা পাশে দাঁড়িয়েছিল। নয়না তাকে বললে, 'গুলাবী, তুই একটু বোস তো এখানে, আমি এখুনি আসছি—'

তারপর অল্‌কার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ অল্‌কা, আমি আসছি এখুনি—'

ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এলো। বারান্দার ঘরে তখন আলো জ্বালা হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার হল-ঘর। তার বাইরে ঢাকা বারান্দা। বারান্দা দিয়ে সোজা চলতে চলতে কেমন একটু সঙ্কোচ হলো। তারপর আবার চলতে লাগলো। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটাতেই থাকে আনন্দ! কাকার আর্টিস্ট।

আর্টিস্টের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েও কেমন আবার দ্বিধা হতে লাগলো। এই কিছুক্ষণ আগেই আর্টিস্টকে অনেক কথা বলেছে নয়না। মনে বড় ক্ষোভ হতে লাগলো। ক্ষমা না চাইলে বড় অন্যায় হয় যেন।

পাশ দিয়ে একটা চাকর যাচ্ছিল। নয়না তাকে ডাকলে।

বললে, 'এই, শোন্ এদিকে—'

চাকরটা কাছে এলো।

নয়না বললে, 'দেখ তো ঘরের ভেতরে গিয়ে, আর্টিস্টবাবু আছে কিনা, বলবি আমি একটু দেখা করতে চাই—'

ঘরের ভেতরে অন্ধকার। হয়তো আর্টিস্ট, অন্ধকারেই নিজের ঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

চাকরটা ভেতরে দেখে এসে বললে, 'না, দিদিমণি, ভেতরে তো কেউ নেই—'

আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনে যেন কার পায়ের শব্দ হলো। মুখ ফেরাতেই দেখলে—আনন্দ। আনন্দও অবাক হয়ে গেছে নয়না চৌহানকে সেই অবস্থায় তার ঘরের সামনে দেখে।

চোখে চোখ পড়তেই আনন্দ জিজ্ঞেস করলে, 'এ কি, আপনি?'

নয়না আনন্দের দিকে চেয়ে বললে, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—'

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলুন?'

'আপনাকে আমি অযথা কড়া কথা বলেছিলাম। কিন্তু আপনি যা বলেছিলেন তাই-ই ঠিক! অল্‌কাও সেই কথা বলছিল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, সেও একজন মেয়েকে দেখে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে জানতো আমি ঘরের মধ্যে রয়েছি, হঠাৎ ঠিক আমার মতো চেহারার আর-একজন মেয়েকে বাগানের মধ্যে দেখে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।'

'তাকে কী রকম দেখতে?'

'ঠিক নাকি আমার মতোন। আমার মতো মুখ, চোখ, নাক, কান, সমস্ত—'

আনন্দও অবাক হয়ে গেল।

বললে, 'কিন্তু সে কী ক'রে হয়? আপনার কি কোনও বোন আছে?'

'না।'

'তাহ'লে? অল্‌কাই কি আপনার একমাত্র বোন?'

'না, অল্‌কা তো আমার আপন বোন নয়, সে আমার দূর-সম্পর্কের মাসতুতো বোন। ওর বাপ-মা কেউ নেই, আমি এ-বাড়িতে একলা থাকি তাই ওকে আমার কাছে রেখে দিয়েছি—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না!'

আনন্দ বললে, 'না, আমি কিছু মনে করিনি—'

নয়না চলে যেতে যেতে বললে, 'আমি এই কথাটা বলতেই এসেছিলাম—'

আনন্দ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমারও একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে, আপনি না এলে আমি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম আজ—'

'কেন?'

'আমিও এই ব্যাপারে একটা কথা শুনে এসেছি—'

'কী কথা?'

'বাগানে যখন আপনারা সবাই অল্‌কাকে নিয়ে চলে এলেন, আমার খুব সন্দেহ হলো। আমি দেখলাম ঠিক যেন আপনার মতো একজন মহিলা গেট পেরিয়ে চলে গেলেন—'

'তারপর?'

তারপর আমি পেছন পেছন গেলাম। কিন্তু খানিক দূরে গিয়ে কোথায় যে তিনি লুকিয়ে পড়লেন তা আর বুঝতে পারলাম না—তারপর এখানে চলে আসছি, আমার কী রকম সন্দেহ হলো, আমি রাস্তায় একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম কোনও মেয়েকে সেদিকে যেতে দেখেছেন কিনা—ভদ্রলোক উল্টো দিক দিয়ে আসছিলেন—'

'তারপর?'

'তারপর তিনি যা বললেন, তা শুনে আরো অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'একজন মেয়ে নাকি লক্ষ্ণৌয়ের পাগলা-গারদ থেকে বেরিয়ে এই নৈনিতালে এসেছে, তাকে খোঁজাখুঁজি করছে বুলবুল চৌধুরীর লোক!'

'বুলবুল চৌধুরীর লোক!'

বুলবুল চৌধুরী কে বুঝতে পারলাম না। সে-মেয়েটার চেহারাও যে কেন আপনার মতো তাও বুঝতে পারলাম না। তাই ভাবলাম কথাটা আপনাকে বলবো, 'আপনি হয়তো কিছু বুঝতে পারবেন—'

নয়না কী যেন খানিকক্ষণ ভাবলো, তারপর মুখ তুলে বললে, 'লোকটা কে?'

'তা জানি না। রাস্তার ভদ্রলোক, তার নাম-ধাম কিছুই জিজ্ঞেস করিনি আমি।'

'কিন্তু আর একটা মেয়ের চেহারা আমার মতো হতে যাবে কেন?'

'তা আমি কেমন ক'রে বলবো বলুন? আমি তো এখানকার নতুন লোক, আমি আগে কখনও এদিকে আসিই নি—। আমার মনে হয় এর পেছনে কোনও রহস্য আছে—'

'কী রহস্য?'

আনন্দ বললে, 'তা আমি জানি না, কিন্তু আমার বড় ভয় করছে।'

'ভয় করছে কেন?'

'কী জানি কেন ভয় করছে! আমার অবশ্য এ-বিষয়ে কিছুই বলা উচিত নয়। আমি আপনাদের পরিবারের বাইরের লোক। আমি দু'দিনের জন্যে এখানে এসেছি, দু'দিন পরে কাজ শেষ হলেই আবার চলে যাবো। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন?'

'কী, বলুন?'

'আপনি একটু সাবধানে থাকবেন!'

নয়না চৌহান চুপ ক'রে রইলো। কিছু উত্তর দিলে না।

আনন্দ বলতে লাগলো, 'আমি জানি আমার ভয়ের কোনও মানে নেই, যুক্তি দিয়েও আমি আপনাকে কিছু বোঝাতে পারবো না, কিন্তু এখানে আসার প্রথম দিন থেকেই আপনাদের বাড়িব সব কিছু দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছি—'

নয়না বললে, 'কিন্তু আমার কে কী ক্ষতি করবে?'

আনন্দ বললে, 'ক্ষতি আপনার কে করবে সে আমি বলতে পারবো না। সে আমার চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন—'

'কিন্তু আমি তো সত্যিই কিছুই বুঝতে পারছি না!'

আনন্দ বললে, 'তবু আমার বলা দরকার বলেই আমি বললাম, আমার যদি কিছু অনধিকার-চর্চা হয়ে থাকে তো আপনি আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন—'

তারপর হঠাৎ কথার মধ্যে থেমে গিয়ে বললে, 'আচ্ছা আমি আসি এখন—

ব'লে আনন্দ মিশ্র তার নিজের ঘরে চলে এলো।

নয়না চৌহানও আর্টিস্ট-এর ব্যবহারে কী রকম যেন বিচলিত বোধ করলে। তারপর আপন মনে সমস্তটা ভাবতে-ভাবতেই নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

সেদিন আবার দেখা।

শিবনাথ বললে—এমনি নতুন একটা রহস্যের জালের মধ্যে দু'জন আস্তে আস্তে কেমন ক'রে জড়িয়ে গেল সেটা তুমি লিখে বোঝাতে পারবে না? এরকম তো হাজার-হাজার উপন্যাসে লেখা হয়েছে। আমি তোমাকে শুধু পয়েন্টস্ দিয়ে যাচ্ছি, তুমি এগুলো বাড়িয়ে নিও নিজের মতো ক'রে—।

বললাম—কিন্তু ও-মেয়েটা কে? একই রকম চেহারা দু'জনের হলো কী ক'রে?

শিবনাথ বললে—সেই কথাটা তো পরদিনই নয়না চৌহান জিজ্ঞেস করলে—

—কাকে?

শিবনাথ বললে—আর্টিস্টকে। আর্টিস্ট কর্তার ঘর থেকে ছবি এঁকে ফিরছিল, হঠাৎ বারান্দার পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলে আনন্দ, 'শুনুন—'

আনন্দ ফিরে দাঁড়ালো। তারপর নয়নার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'অল্‌কা কেমন আছে?'

নয়না বললে, 'ভাল—'

'আমি ক'দিন থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছি না তাই জিজ্ঞেস করলাম আমার কাছে ক'দিন আসেনি—'

'আমি আপনাকে অন্য কারণে ডেকেছিলাম।'

'বলুন।'

'অল্‌কা বলেছিল আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন আমাদের বাড়ি ছেড়ে। কাকার কাজ শেষ হয়ে গেছে?'

আনন্দ হেসে বললে, 'অল্‌কা বলেছে বুঝি আপনাকে? আমি ওকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে বলেছিলাম—'

'তার মানে?'

'অল্‌কা আমাকে ভালবাসে কিনা তাই পরীক্ষা করছিলাম ওই কথা ব'লে—'

'ও, তাই বলুন! আজকে যখন অল্‌কা আমাকে কথাটা বলছিল তখন আমিও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন, আপনি অবাক হয়েছিলেন কেন?'

'ভাবলাম আপনার এর মধ্যেই কাজ হয়ে গেল। কাকার তো আর বেড়াল-কুকুরের অভাব নেই, এত তাড়াতাড়ি আপনি সকলের ছবি শেষ করলেন কী ক'রে?'

আনন্দ বললে, 'দেখুন সত্যিকথা বলতে কি, আমার আর এখানে বেশিদিন থাকতে ভালও লাগছে না। যখন এখানে আপনার কাকার কাজ নিয়ে এসেছিলাম তখন ভেবেছিলাম মানুষের ছবি আঁকতে হবে—'

'কিন্তু আপনি তো মানুষের ছবি এঁকেছেন!'

'কোথায় মানুষের ছবি, শুধু কেবল আপনার কাকার কুকুর-বেড়াল আর পাখীদের ছবি আঁকছি। এঁকে এঁকে আমার আঙুলে কড়া পড়ে গেছে—'

নয়না হঠাৎ বললে, 'আমার ছবি আঁকেননি?'

আনন্দ যে ধরা প'ড়ে যাবে এমন ক'রে বুঝতে পারেনি। প্রথমটায় থতমতো খেয়ে গেল।

তারপর বললে, 'সত্যি আপনি রাগ করছেন নাকি? বিশ্বাস করুন, জন্তু-জানোয়ারের ছবি এঁকে এঁকে সত্যিই আমি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম, একটা ভাল মুখ পাইনি যে আঁকবো, তাই যতটুকু মনে ছিল আপনার চেহারাটা, তাই ভেবে ভেবে ছবিগুলো এঁকেছিলাম, আমি ভাবিনি আপনি জেনে ফেলবেন—'

তারপর নয়নার দিকে চেয়ে বললে, কিন্তু কে আপনাকে খবরটা জানালে বলুন তো? আমি তো কাউকে বলিনি সে-কথা! আমি দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ছবি এঁকেছি, কারোর তো জানবার কথা নয়। অল্‌কাকেও এ-বিষয়ে কিছু বলিনি—'

নয়না হাসতে লাগলো।

বললে, 'যা করেছেন, আমি কাকাকে ব'লে দেবো।'

'না না, দয়া ক'রে বলবেন না, আমি গরীব আর্টিস্ট আপনাদের মতো বড়লোক নই, চাকরি গেলে আমার মুশকিল হবে। তাছাড়া আমি দু'দিনের জন্য এসেছি, দু'দিন পরেই চলে যাবো, তারপর কোথায় থাকবেন আপনি আর কোথায় থাকবো আমি, ওই ছবিগুলো তবু মাঝে মাঝে দেখবো, আর যখন টাকার অভাবে পড়বো তখন—'

নয়না বললে, 'তখন কী করবেন? বেচে দেবেন?'
আনন্দ বললে, 'আপনি কী ক'রে ভাবতে পারলেন আমি এগুলো বেচে দেবো?'
নয়না বললে, 'তাছাড়া আমার ছবি নিয়ে আপনি আর কী করবেন?'
আনন্দ বললে, 'সে আমি কী করবো আজ আপনার মুখের সামনে বলবার সাহস আমার নেই, আপনি যেন সত্যিই আর আপনার কাকাকে ব'লে দেবেন না। কিন্তু সত্যি বলুন তো, কে আপনাকে এ-কথা জানালে? কে সে?
নয়না বললে, 'আমার আয়া, গুলাবী!'
'গুলাবী? কিন্তু সে আমার ঘরে ঢুকে সব দেখেছে নাকি। আশ্চর্য তো!'
নয়না বললে, 'গুলাবী দেখলে কিছু দোষ নেই, সে আমার খুব বিশ্বাসী আয়া—'
হঠাৎ বাইরের দিকে যেন জুতোর আওয়াজ হলো, আনন্দ চেয়ে দেখলে, নয়না চৌহানও চেয়ে দেখলো, দুজনেই দেখলে বুলবুল চৌধুরী বাড়ির ভেতর ঢুকছে।
আনন্দ তাড়াতাড়ি বললে, 'আমি আসি—'
বলেই নিজের ঘরের দিকে চলে এলো সে, আর দাঁড়ালো না সেখানে।
ঘটনাটা সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ঘটলো।
নয়না চৌহান বিকেলবেলা বাগান থেকে ফিরে নিজের ঘরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে ওঠবার মুখেই পাশের দরজার আড়াল থেকে হঠাৎ একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো। মেয়েটাকে দেখেই নয়না চমকে উঠেছে।
'কে? কে তুমি?'
মেয়েটা সামনে এসে একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে বললে, 'চুপ করো ভাই, চেঁচিও না—'
'কিন্তু কে তুমি?'
মেয়েটা বললে, 'বলছি, তুমি চেঁচিও না। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমি এসেছি ভাই। দুটো কথা তোমার সঙ্গে বলেই চলে যাবো।'
'কিন্তু তুমি কে? এখানে কি ক'রে এলে?'
'অনেক কষ্টে এসেছি, সকলের চোখ এড়িয়ে আমি এসেছি। আমাকে তোমার ঘরের মধ্যে নিয়ে চলো, নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবো।'
নয়না বুঝতে পেরেছিল, এই মেয়েটাই সেই। সেই যাকে দেখেছে আর্টিস্ট, যাকে দেখেছে অলকা। সত্যিই নিজের মতোই চেহারাটা, তারা যেন দুটি বোন।
'আমি অনেকদিন ধ'রে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি, আমার নিজের বিপদ চলেছে, তোমারও বিপদ চলেছে।'
'আমার? আমার বিপদ? আমার কী বিপদ?'
'তোমার বিপদ আছে বলেই তো বলছি। নইলে আর কেন আসবো। আমাকে তোমার ঘরের মধ্যে নিয়ে চলো ভাই, নইলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে।'
নয়নার কেমন যেন সন্দেহ হলো। আনন্দও তাকে বলেছিল সাবধানে থাকতে। এ মেয়েটাও বলছে।
তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে, ভেতরে ঢুকে মেয়েটা বললে, 'বিশ্বাস করো ভাই, তোমার ভালর জন্যেই আমি এসেছি, তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি।'
'কী ক'রে চিনলে?'
'সব কথা বলার সময় নেই। তুমি বোধহয় জানো না তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে—'
'আমার বিয়ে?'

নয়না অবাক হয়ে গেল।
বললে, 'কে বললে তোমাকে?'
'আমি সব জানি। বুলবুল চৌধুরীকে চেনো তো। কাঠগুদামের ধর্মেন্দর চৌধুরীর ছেলে বুলবুল চৌধুরী। সে আসলে বুলবুল চৌধুরী নয়—'
'তার মানে?'
'হ্যাঁ, আমি যা জানি সব তোমাকে ব'লে যাই, আমাকে সেই লোকটা পাগলা-গারদে পুরে রেখেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি সেখান থেকে। আমার সর্বনাশ করেছে সে, এবার তোমারও সর্বনাশ করবে!'
কথা বলতে বলতে মেয়েটার চোখদুটো যেন কেমন ঘুরতে লাগলো।
সত্যিই পাগল নাকি মেয়েটা!
বাইরে হঠাৎ দরজায় কে ঘা দিলে।
শুনেই মেয়েটা চম্‌কে উঠলো, বললে, 'এখন কী হবে? এ-ঘরে যদি কেউ আসে?'
'কিন্তু তুমি কে? তোমার নাম কী? তোমার চেহারা ঠিক আমার মতোন কেন?'
'সব বলবো তোমাকে, সব বলতেই তো এসেছি ভাই। বিশ্বাস করো, আমি পাগল ব'লে আমাকে মিছিমিছি আটকে রেখেছে—'
দরজায় আবার ঘা পড়লো।
নয়না চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কে দরজা ঠেলছে?'
'আজ আমি যাই ভাই, আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখো ভাই, আমি ধরা প'ড়ে যাবো। ধরা পড়ে গেলে আমাকে ওরা পাগলা গারদে পুরে ফেলবে—কী হবে তখন?'
এবার আর সন্দেহ রইলো না নয়নার। মেয়েটা নিশ্চয়ই পাগল। তারপর পাশের বারান্দার দরজা খুলে দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে লুকিয়ে থাকো, আমি দরজাটা খুলে দেখি কে—'
মেয়েটাকে বারান্দায় বার ক'রে দিয়ে নয়না অন্য দরজাটা খুলে দিল! গুলাবী!
'কী গুলাবী, দরজা ঠেলছিলি কেন রে?'
গুলাবী বললে, 'চৌধুরী সাহেব এসেছে দিদিমণি, আপনাকে ডাকছেন।'
নয়না বললে, 'তুই ব'লে দে, এখন দেখা করবার সময় নেই আমার।'
'কাকাবাবু ডাকতে ব'লে দিলেন আপনাকে।'
'ডাকুক্‌গে কাকাবাবু, আমি যাবো না, যেতে পারবো না—'
এরপর আর কিছু বলবার সাহস হবার কথা নয়। তবু গুলাবী দাঁড়িয়ে রইলো।
'যা এখান থেকে, যা বলছি!'
গুলাবী চলে গেল।
দরজাটায় খিল দিয়ে পাশের দরজাটা খুলে বারান্দাটার দিকে গেল নয়না। মেয়েটাকে সেখানেই লুকিয়ে থাকতে বলেছিল। কিন্তু অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। এদিক-ওদিক খুঁজলে। পাশ দিয়ে নিচেয় যাবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল নাকি? হয়তো ভয় পেয়ে গেছে।
নয়না সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামলো। তারপর সদর হল পেরিয়ে একেবারে পোর্টিকোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে। কোথাও নেই মেয়েটা। সত্যিই মেয়েটা পাগল নাকি?
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো নয়না সেখানে, বুলবুল চৌধরীর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টিকোর তলায় তখনও। দু'একজন চাকর-বাকর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। একবার তাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো নয়নার। কিন্তু দরকার নেই।
হঠাৎ পেছন থেকে বুলবুল চৌধুরীর গলার শব্দে চমকে উঠেছে নয়না।
বুলবুল চৌধুরী বড় শান্ত-শিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক। নয়নার সঙ্গে যখনি কথা বলে, বেশ সমীহ ক'রে কথা বলে।

'এ কি, তুমি এখানে?'

নয়না চাইলে একবার মুখ তুলে।

'আমি অনেকক্ষণ এসেছি, গুলাবী বলছিল তুমি খুব ব্যস্ত আছো, তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি। তা কাউকে খুঁজছো নাকি?'

নয়না শুধু বললে, 'না তো—'

তবু বুলবুল চৌধুরীর নড়বার নাম নেই। যেন দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলতে চায় নয়নার সঙ্গে।

একটু থেমে বললে, 'কালও এসেছিলাম, জান বোধহয়?'

নয়না বললে, 'কই, শুনিনি তো—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'কাকাবাবু বড় পীড়াপীড়ি করেন আসবার জন্যে, তাই আসা। অথচ আমারও তো অনেক কাজ, না এলে উনি রাগ করবেন।'

তারপর আবার একটু হেসে বললে, 'নতুন একটা ফরেস্ট কিনেছি, শুনেছো বোধহয়?'

নয়না বললো, 'না—'

'সে কি, আমি তো কাকাবাবুকে ব'লে গেছি, সেদিন। দেড় লাখ টাকা দাম নিলে, তা নিক্, আমি ওই ফরেস্ট থেকেই দশগুণ প্রফিট তুলে নেবো—এই নিয়ে তো তিনটে ফরেস্ট কেনা হলো এই ক'মাসে—'

এইরকম আরো অনেক কথা ব'লে চললো বুলবুল চৌধুরী। লাখ ছাড়া কথা বলে না বুলবুল চৌধুরী। বুলবুল চৌধুরী যখন আসে এ-বাড়িতে তখন লাখের কথা শুনিয়ে যায়। শোনবার লোক কেউ নেই, তবু শোনায়। কথা ব'লে যখন বোঝে যে, কেউ তার কথা শুনছে না তখন বলে—আচ্ছা আসি নয়না—

কখনও বলে, 'ছোটবেলার কথা তোমার মনে প'ড়ে নয়না?'

নয়না বলে, 'না—'

বুলবুল চৌধুরী বলে, 'তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু আমার মনে পড়ে—তোমার বাবার কথা মনে পড়ে, আমার বাবার কথাও মনে পড়ে—তুমি তখনকার চেয়ে এখন আরো সুন্দর হয়েছো—'

নয়না অবশ্য বেশিক্ষণ শোনে না! বেশি শুনতে ভাল লাগে না তার।

নয়না হঠাৎ কথার মধ্যিখানেই ব'লে ব'সে, 'আচ্ছা, আমি আসি—'

তখনই যেন বুলবুল চৌধুরীর খেয়াল হয়। উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'নিশ্চয়, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে, তুমি ঘরের ভেতরে যাও—'

আজও বেশিক্ষণ লাখ টাকার গল্প শুনতে ভাল লাগছিল না নয়নার।

নয়না বললে, 'আমি আসি—'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, তুমি কেন মিছিমিছি ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো, যাও যাও ভেতরে যাও তুমি—'

ব'লে বুলবুল চলে যাবার আগেই নয়না চৌহান ভেতর বাড়ির দিকে চলে গেল।

শিবনাথ বললে—তবু এর পরেই নয়না চৌহানের সঙ্গে বুলবুল চৌধুরীর বিয়েটা হয়ে গেল—

বললাম—কিন্তু নয়না আপত্তি করলো না?

শিবনাথ বললে—আপত্তি তো করবেই, আপত্তি করলে কাকার কাছে গিয়ে। কাকাও তেমনি রুখে উঠলো। কাকারও তো একটা দায়িত্ব আছে। বিয়ে যখন করতেই হবে তখন দেরি ক'রে লাভ কী? সেদিন একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল কাকার ঘরে।

এমনিতে কাকার ঘরের ভেতর নয়না কখনও ঢোকে না। অমন মানুষের সঙ্গে কথা ব'লেও সুখ নেই। কিন্তু নয়না সোজা ব'লে বসলো, 'বিয়ের আগে আমি কতগুলো কথা পরিষ্কার ক'রে বুঝে নিতে চাই—'

'কী কথা?'

নয়না বললে, 'তা আপনাকে আমি বলবো কেন?'

'তাহ'লে কাকে বলবে?'

'মিস্টার পুরোহিতের সঙ্গে, আমার এস্টেটের সলিসিটর—'

'বেশ তাই বলো তাহ'লে। আমি মিস্টার পুরোহিতকে আসতে চিঠি লিখে দিচ্ছি?'

মিস্টার পুবোহিত এই চৌহান-ফ্যামিলির পুরোনো সলিসিটর! এককালের আত্মা চৌহানের বন্ধুও বটে। এই নয়নাকে জন্মাতে দেখেছেন তিনি। এই নয়নার গুলমোহর এস্টেটের তদারকিও ক'রে আসছেন এতদিন, ঠিকমতো হিসেব দিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাঙ্কের টাকার হিসেবও রাখছেন। তিনিই বলতে গেলে এ-বাড়ির একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী নইলে আশীষ চৌহানের হাতে থাকলে কবে নষ্ট হয়ে যেত। চিঠি পেয়ে তিনি এলেন। বুলবুল চৌধুরীকেও তিনি ডেকে পাঠালেন। তিনজনে ঘরের ভেতরে কী আলোচনা করতে লাগলেন কেউ জানে না!

আনন্দ এ-সব কিছু জানতো না। রোজ যেমন সময়ে সে কর্তার ঘরে ছবি আঁকতে যায়, সেদিনও গিয়েছে।

দবজা ঠেলতেই ঘরের ভেতর চৌহানজী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এ কি? তুমি' তুমি আর আসবার সময় পেলে না?'

আনন্দ যেন কেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'ঠিক এই সময়েই আসতে হয়? দেখছো নয়নার বিয়ে নিয়ে কন্‌ফিডানশিয়াল কথা বলছি বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে—'

চৌহানজী মিস্টার পুরোহিতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতক্ষণ সময় লাগবে মিস্টার পুরোহিত?'

আনন্দের কানে তখন কোনও কথাই ঢুকছে না। কেন সে এসময়ে এসে পড়লো এখানে? যেন সে চলে যেতে পারলেই বাঁচে।

বললে, 'আমি পরে আসবো'খন—'

বলেই বাইরে চলে এলো।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সিঁড়ি পেরিয়ে নিজের ঘরে আসছিল। অল্‌কা পেছন থেকে ডাক্‌লে—আর্টিস্ট—ও আর্টিস্ট—

অন্য দিন অল্‌কাকে দেখলে আনন্দ আদর করতো, কথা বলতো। সেদিন আর কোন কথা না বলে সোজা নিচেয় নেমে এলো। নিচেয় এসে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো।

অল্‌কা অবাক হয়ে গেল আর্টিস্টের ব্যবহার দেখে। অল্‌কাও ঢুকলো ঘরের ভেতর। কতদিন এমনি ক'রে অল্‌কা আর্টিস্টের ঘরে ঢুকেছে, তারপর দু'জনে মিলে কত গল্প জুড়ে দিয়েছে। সেদিন কিন্তু আর্টিস্ট তাকে দেখতেই পেলে না। অল্‌কা বিছানার কাছে স'রে এলো। আনন্দ তখন বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে রয়েছে।

অল্‌কার মনে হলো, আর্টিস্ট নিশ্চয়ই রাগ করেছে। কাছে গিয়ে ডাকলে, 'আর্টিস্ট'—

আর্টিস্ট তবু উত্তর দিলে না।

অল্‌কা আরও কাছে গিয়ে মুখ নিচু ক'রে বললে, 'আমার ওপর রাগ করেছো বুঝি তুমি, আর্টিস্ট?'

তবু আর্টিস্ট উত্তর দেয় না।

'আমি কী করেছি, বলো না? আমি তোমার কথা দিদিকে তো আর কিচ্ছু বলি না—'

আর্টিস্ট তবু মুখ তোলে না।

অল্‌কা আর্টিস্টের মুখের কাছে মুখ এনে বললে, 'সত্যি বলছি আর্টিস্ট, দিদিকে তোমার কথা আর কিচ্ছু বলবো না, আমি কথা দিচ্ছি—'

হঠাৎ আনন্দ অল্‌কাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে লাগলো। এমন আদর কখনও করেনি সে অল্‌কাকে। অল্‌কাকে দুই হাতে জড়িয়ে একেবারে যেন পিষে ফেলতে লাগলো নিজের বুকের মধ্যে।

অল্‌কাও বলতে লাগলো, 'আমি আর কোনও কথা দিদিকে বলবো না, এই তোমায় কথা দিচ্ছি—আর্টিস্ট, কথা দিচ্ছি—'

শিবনাথ বললে—পয়েন্ট বলতে গিয়ে দেখছি তোমাকে সব কিছুই ব'লে ফেলছি—কিন্তু এবার আর ও সব বলবো না। উপন্যাস লেখবার সময় তুমি তোমার খুশিমতো সব কিছু মিশিয়ে নিও, আমি মোটামুটি গল্পটা বলে খালাস—

মিস্টার পুরোহিত আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের নামজাদা ল-ইয়ার। তিনি বুলবুল চৌধুরীর কাছে সব জিনিসটা খুলে বললেন।

বললেন, 'তোমার সঙ্গে নয়নার বিয়ের তো সব ঠিকই হয়ে আছে সে আমি জানি। আমি নিজেই আত্মা চৌহানের উইল তৈরি করেছি। তোমার বাবা ধর্মেন্দর চৌধুরীর সঙ্গে আত্মা চৌহানের যে ফ্রেণ্ডশিপ্ ছিল তাও আমি জানি। কিন্তু এখন একটা গণ্ডগোল হয়েছে—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'আপনি বলুন কী গণ্ডগোল?'

মিস্টার পুরোহিত বললেন, 'নয়না আমাকে কতকগুলো কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে—'

'কী কথা?'

'একটা মেয়ে হঠাৎ নয়নার সঙ্গে এসে দেখা করেছে। তাকে অনেকটা নাকি নয়নার মতোন দেখতে। কে সে?'

'তারপর বলুন? আমি সব কথার জবাব দোবো।'

'সে মেয়েটা নয়নাকে ব'লে গেছে যে, তুমি নাকি তাকে পাগল ব'লে পাগলা-গারদে পুরে রেখেছো। সে নয়নাকে ব'লে গেছে যে, নয়না যেন তোমাকে বিয়ে না করে, করলে তারও সেই দশা হবে। এই কথার জবাব দাও তুমি—'

বুলবুল চৌধুরী ব'লে উঠলো, 'তাই নাকি? এসব কথা তো আমি শুনিনি—'

মিস্টার পুরোহিত বললেন, 'আপনাকে ব'লে কোনও কাজ হবে না বলেই আমাকে বলেছে—আমি এর জবাব না পেলে নয়নার সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি না। আমি নয়নার শুভাকাঙ্ক্ষী, নয়নার কোনও বিপদ হয় তা আমি চাই না—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'তা আমিও চাই না কাকাবাবু, মনে যদি কারো সন্দেহ উঠে থাকে তো তা পরিষ্কার ক'রে নেওয়াই ভাল—'

মিস্টার পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন, 'ও মেয়েটি কে?'

'কোন্ মেয়েটি?'

'ওই যে যে-মেয়েটি নয়নার সঙ্গে দেখা ক'রে অত কথা ব'লে গেছে।'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'ও আমারই বাড়ির একটা বুড়ি ঝি-এর মেয়ে। ওর মাথা-খারাপ হবার পর আমিই ওকে লক্ষ্ণৌতে একটা পাগলা-গারদে রেখে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে সে সম্প্রতি পালিয়েছে, ওর জন্যে আমার মাসে তিনশো টাকা খরচা হয়, তা জানেন?'

'কিন্তু ওকে ঠিক নয়নার মতো দেখতে কেন?'

'দেখুন, সেটা আমি কী ক'রে বলবো। বুড়িটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই—কারণ আমি ছোটবেলা থেকেই মা'র সঙ্গে বিলেতে ছিলাম, এতদিন পরে এসেছি এখানে, তখনকার কথা আমার বিশেষ কিছুই মনে নেই—'

মিস্টার পুরোহিত এতটুকুতেই ছাড়বার পাত্র নন্।

বললেন, 'কিন্তু তোমার কথা যে অভ্রান্ত, তাব প্রমাণ কী? আমি ল-ইয়ার মানুষ, আমার ক্লায়েন্টকে আমি কী যুক্তিতে বোঝাবো?'

'তার প্রমাণ আমি আপনাকে দেবো! আপনি যদি চান আজই আমার সঙ্গে চলুন—'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে চৌধুরী লজ-এ। ওই জান্‌কীর মা সেখানেই আছে। বুড়ি এখন চোখে ভাল দেখতে পায় না, তার সঙ্গে এ-বিষয়ে আপনি কথা বলবেন—'

শিবনাথ বললে—যেদিন নয়না চৌহান কোর্টে এসেছিল, সেদিন সেই জান্‌কীর মাও এসেছিল উইট্‌নেস্ হয়ে?

উকীল জিজ্ঞেস করলে, 'ওই যে ওপাশে ব'সে আছে যে-মেয়েটি ওকে আপনি চেনেন?'

বুড়ি বললে, 'হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি, ও আমার মেয়ে জান্‌কী—'

'তুমি ঠিক জানো যে, ও আত্মা চৌহানের মেয়ে নয়না চৌহান নয়?'

'না হুজুর ও আমারই মেয়ে।'

'তোমার মেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ হুজুর, ছোটবেলা থেকেই ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল—ওই মেয়েকে নিয়ে আমি বড় মুশকিলে পড়েছিলাম—'

'আসামী কি তোমার মেয়ে জান্‌কীকে জোর ক'রে পাগলা-গারদে পুরে রেখেছে?'

'না হুজুর, জোর ক'রে করবেন কেন? আমার মেয়ের জন্যে চৌধুরী সাহেব নিজের পকেট থেকে মাসে-মাসে তিনশো টাকা খরচ ক'রে আসছেন।'

জান্‌কী এই জেরার সময় সব শুনছিল। কোর্টের মধ্যে সে হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো, 'না না, সব মিছে কথা, আমি জান্‌কী নই, আমি নয়না চৌহান, আমার বাবার নাম আত্মা চৌহান, আমি গুলমোহর এস্টেটের মালিক—'

জানকী চিৎকার ক'রে উঠতে কোর্টের পুলিশ পাহারাদাররা এসে তাকে বাইরে সরিয়ে নিয়ে গেল। আর তারপর সেদিনকার মতো কোর্টে এ্যাডজোর্নড্‌ হয়ে গেল।

বললাম—তারপর?

শিবনাথ বললে—কিন্তু এ তো সমস্ত পরের ঘটনা। এর আগের ঘটনাও তো কিছু তোমাকে বলা দরকার। প্রপার্টি নিয়ে যে কত কেলেঙ্কারী আজও ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া গেল ভাই এই মামলায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে আজ কত জটিল হয়ে উঠেছে এ-মামলা যেন তারই স্যাম্পল।

অথচ আর্টিস্ট আনন্দ মিশ্র না থাকলে বোধহয় এ-মামলার রহস্য চিরদিন ধামা চাপা প'ড়ে থাকতো।

তারপর একটু থেমে শিবনাথ বললে—অবশ্য এর জন্যে আরো একজনের বাহাদরী আছে—সে নয়না চৌহানের আয়া, গুলাবী। সে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নয়না চৌহানের সঙ্গে এক বাড়িতে থেকে এসেছে। সে জানতো নয়না চৌহানের মনের কথাগুলো। সে জানতো আনন্দ মিশ্রর সঙ্গে কেমন ক'রে দিনের পর দিন আস্তে আস্তে নয়নার একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। আনন্দ মিশ্রকেও আমি কোর্টে সাক্ষ্য দিতে দেখেছি। লম্বা ঘি রং-এর পাঞ্জাবী, তাব ওপর একটা জহর-কোট আর চোস্ত এই ছিল তার পোষাক। প্রতিদিন সে কোর্টে এসেছে, আব যখনই জান্‌কী আসতো তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো।

আসামীর সাক্ষীরা বলতো, ও জান্‌কী—

আর প্রসিকিউশনের সাক্ষীরা বলতো, ও নয়না চৌহান—

আমি বললাম—কিন্তু দু'জন দু-বাড়ির মেয়ে, তাদের এক রকমের চেহারা হয়ই বা কী ক'রে?

শিবনাথ বললে—বলছি, সেই কথাই বলছি এবার।

বহুদিন আগে একবার চৌহান-এস্টেট থেকে নয়না চৌহান হারিয়ে যায়, তখন অন্য আয়া ছিল। নৈনিতাল লেকের কাছে গাড়িতে চ'ড়ে বেড়াতে গিয়েছিল নয়না আয়ার সঙ্গে। চেঞ্জাররা এসেছে তখন। বোটে ক'রে বেড়াচ্ছে চেঞ্জারদের দল, হঠাৎ আয়ার নজরে পড়লো নয়না নেই। তার মাথায় তো বজ্রাঘাত!

আত্মা চৌহান তখন বেঁচে। খবরটা শুনে তিনিও চমকে উঠলেন, একমাত্র মেয়ে তাঁর, থানায় গিয়ে পুলিশকে নিজেই খবর দিলেন। শহরে গ্রামে তোলপাড় প'ড়ে গেল। আত্মা চৌহান মেয়ের ছবি দিয়েছিলেন পুলিশকে, সেই ছবি মিলিয়ে মিলিয়ে পরের দিন পুলিশ দুটি মেয়েকে

এনে হাজির করে। একই রকম দেখতে, প্রায় একই বয়সের। একজন একটু রোগা, আর-একজনের একটু স্বাস্থ্য ভাল। দুজনকেই চৌহানজীর এস্টেটে নিয়ে এসে বললে, বলুন, কোন্‌টি আপনার মেয়ে—

সকলেই তো অবাক। এমন তো হয় না।

তারপর যখন শুনলেন ধর্মেন্দর চৌধুরীর বাড়ির এক ঝি-এর মেয়ে তখন সমস্ত জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে গেল। সব মনেও প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি গাড়ি ক'রে পাঠিয়ে দিলেন কাঠগুদামের ধর্মেন্দর চৌধুরীর বাড়িতে!

কোর্টে এই মামলা না উঠলে সেদিনকার এই ঘটনার কথা কারও কানেই যেত না। কিন্তু তবু তো এ প্রসিকিউশনের এভিডেন্স। আসামীপক্ষ এ ঘটনা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলে না। বহুকাল আগের ঘটনা, সুতরাং এ ঘটনার ফেবারে ডকুমেণ্টই বার করতে পারলে না তারা।

কোর্ট জানকীকে জিজ্ঞেস করলে, 'এ ঘটনার কথা তোমার কিছু মনে প'ড়ে?'

জান্‌কী বললে, 'না'।

শেষকালে আনন্দ মিশ্র উঠলো সাক্ষ্য দিতে—

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না শিবনাথের কথা।

জিজ্ঞেস করলাম—আগে গোড়াটা না ব'লে শেষটা বলছো কেন? কোর্টে উঠলো কেন মামলা? আর মামলাটাই বা কীসের? কে ফরিয়াদী, কে আসামী কিছুই তো তুমি বললে না—

শিবনাথ বললে—বলছি, সব তোমায় বলছি। অনেক দিনের মকর্দমা তো, সব ব্যাপারটা ভাল রকম মনেও নেই আমার এখন—আর তোমাদের মতোন তো আমি গল্পও লিখি না, তাই একটু গোলমাল করে ফেলছি—এবার শোনো—

শিবনাথ আবার গল্পের গোড়ায় ফিরে গেল।

সেদিন মিস্টার পুরোহিত নয়না চৌহানকে ডাকলেন।

বললেন, 'আমি সব ভাল ক'রে বুঝে নিয়েছি মা। আমি কাঠগুদামে গিয়ে সেই মেয়েটার মার সঙ্গেও দেখা করেছি—তোমার কোনও ভয় নেই—'

'কিন্তু কাকাবাবু, আপনি তো স্পষ্ট করে বলেছেন সব যে শুধু বাবার ইচ্ছে ছিল বলেই আমি এ-বিয়েতে মতো দিচ্ছি, শুধু বাবার স্মৃতির ওপর শ্রদ্ধার জন্যে আমি ওর স্ত্রী হতে রাজী হচ্ছি—'

'বলেছি মা, সবই তো বলেছি—বিয়ের পর তোমার ছোট বোন অল্‌কাও তোমার কাছে থাকবে—তোমার আয়াও থাকবে—'

'আর আপনি ভাল ক'রে সব খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছেন তো, ভয়ের কিছু নেই?'

'না মা, আমি সেই বুড়িটার সঙ্গেও দেখা করেছি যে তার মেয়েটা পাগল না, বুলবুল চৌধুরী ওই জানকীর জন্যে মাসে মাসে তিনশো টাকা খরচ করে নিজের পকেট থেকে—জানকীর মা'র কাছেও তা শুনলাম—মেয়েটা সত্যিই পাগল। নইলে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে এত কথা বলে। ওটাই তো পাগলের লক্ষণ।'

নয়না বললে, 'আপনি যখন মতো দিচ্ছেন, তখন আর আমার বলবার কী থাকতে পারে—'

মিস্টার পুরোহিত বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি মা, তোমরা সুখী হবে।

মিস্টার পুরোহিতের অনেক কাজ প'ড়ে ছিল লক্ষ্ণৌতে। তিনি সেইদিনই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চলে গেলেন।

আর তার পরদিন থেকেই এ-বাড়ির সবাই জেনে গেল—চৌহান এস্টেটের মেয়ের সঙ্গে বুলবুল চৌধুরীর বিয়ে হবে।

এ-সব বাড়িতে বিয়ে হওয়া মানে এলাহি-কাণ্ড!

আনন্দ মিশ্র ছবি আঁকতে এসেছিল সামান্য কয়েকটা। টাকার জন্যে যখন এসেছিল, তখন তার বেশি কিছু আশা করেনি। তার বেশী কিছু পায়ও নি। কিন্তু মানুষের আশা করতে তো টাকা খরচ হয় না। তাই ক'দিন এ-বাড়িতে থেকেই তার আশাও যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিল। সারাদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজের ছবি আর চাকরি নিয়ে থাকতো। যখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত তখন রাস্তায়-ঘাটে লেকের দিকে বেরিয়ে পড়তো। যেদিকে দু'চোখ যায়। তারপর যখন সন্ধ্যে হয়ে আসতো তখন নিজের ঘরে ঢুকতো!

কিন্তু সেদিন আর পারলে না। নয়নার আয়া গুলাবীকে দেখে ডাকলে তাকে।

বললে, 'দিদিমণিকে একবার ডেকে দেবে গুলাবী?'

গুলাবী এমনিতেই কিন্তু কথা বলে না। কথাটা শুনেই ভেতরমহলে চলে গেল।

আনন্দ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। যাবার আগে নয়না চৌহানের সঙ্গে একবার দেখা করার লোভ যেন পেয়ে বসেছিল তাকে। শুধু দেখা করা। আর কিছু নয়। দেখা ক'রে যে কি বলবে তাও ঠিক করা ছিল না। মনে মনে দ্বিধাও হচ্ছিল তার। এমন ক'রে অকারণে দেখা করার কারণ যখন জিজ্ঞেস করবে নয়না, তখন কী জবাব দেবে সে!

একবার মনে হয়েছিল দরকার নেই। বড়লোকের মেয়ে, কয়েক বার হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা বলেছে বলেই কি তার ওপর তার অধিকার জন্মে গেছে? তার মতোন গরীব আর্টিস্টকে নয়না কিনে নিতে পারে এত টাকার মালিক সে। আর্টিস্ট হয়েছে ব'লে কি সে নয়নার হাতটাও ধরতে চায় নাকি?

হঠাৎ গুলাবী ফিরে এলো।

আনন্দ উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়।

গুলাবী এসে বললে, 'দিদিমণি এখন আসতে পারবে না—'

আনন্দর মাথার ওপর যেন বাজ পড়লো।

যেন বিশ্বাস হলো না।

জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আমার নাম করেছিলে তো?'

'হাঁ জী!'

'তুমি বলেছিলে যে, আমি একবার দেখা করতে চেয়েছি?'

'হাঁ জী, হাঁ—'

হাঁ জী! 'আমার নাম করেছিলে?'

আর সেখানে দাঁড়ালো না আনন্দ! গুলাবীর সামনে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা হলো তার। সোজা সিঁড়ি দিয়ে তর তর ক'রে নেমে নিজের ঘরে চলে এলো। তারপর জামা-কুর্তা বদলে নিলে। তার পরই আবার রোজকার মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো!

বাড়িটার চারদিকে তখন চুনকাম করা হচ্ছে। ওপরের জানলা দিয়েই অনেকখানি অংশ দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল নয়না চৌহান।

অল্‌কা দৌড়তে দৌড়তে কাছে এলো।

বললে, 'দিদি, আর্টিস্ট চলে গেছে।'

'কোথায় চলে গেছে?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, আর আসবে না—'

'কেন? চাকরি ছেড়ে দিলে কেন?'

'কে জানে!'

'কখন্ গেল!'

অল্‌কা বললে, 'আমি জানি না কখন্ গেল! আমাকে গুলাবী এসে বললে—'

নয়না বললে, 'গুলাবীকে ডাক্ তো—'

গুলাবী আসতেই নয়না জিজ্ঞেস করলে, ওই আর্টিস্ট সাহেব চলে গেছে? আমাকে বলিসনি তো তুই?'

গুলাবী কী বলবে যেন বুঝতে পারল না।

'কেন চলে গেল তুই জানিস্ কিছু?'

'না দিদিমণি?'

'কাকা চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?'

'না দিদিমণি, তা জানি না।'

'আমাকে খবরটা আগে জানালি না কেন?'

গুলাবী কিছুই ভাল ক'রে বলতে পারে না। অল্‌কাও যেন কেমন মুষড়ে পড়েছিল। এতদিন ধ'রে একজন মানুষ ছিল, সে আজ নেই, বাড়িটা আবার যেন ফাঁকা হয়ে গেল।

গুলাবী চলে যেতেই অল্‌কা বললে, 'দিদি, আমি আর্টিস্টের ঘরে গিয়েছিলাম—'

'কেন?'

'এমনি গিয়েছিলাম, গিয়ে একটা জিনিস দেখে এলাম।'

'কী জিনিস রে?'

অল্‌কা বললে, 'চলো না, তুমিও দেখতে পাবে—'

'বল্ না কী।'

'তুমি না গেলে বলবো না—আমার সঙ্গে চলো।'

এমন কিছু জিনিস নয়। তখন দুপুর। দিদিকে নিয়ে অল্‌কা একতলায় গেল। আর্টিস্টের ঘরে সমস্ত ফাঁকা। ক'দিন আগেও যে এ-ঘরে একজন মানুষ বাস করতো তার চিহ্ন তখনও রয়েছে।

অল্‌কা বললে, 'ওই আলমারীর ভেতর—'

আলমারীটা খুলে অল্‌কা দেখালে, 'এই দেখ—'

অল্‌কা দেখলে, নয়না চৌহানও দেখলে—একটা রুমালে ছুঁচের কাজ ক'রে আর্টিস্টকে দিয়েছিল নয়না, সেটা সেখানে রয়েছে। তার পাশে একটা শুকনো ফুলের তোড়া। ফুলের তোড়াটা অল্‌কা নিজের হাতে আর্টিস্টকে দিয়েছিল একদিন। আর রয়েছে একটা ছবির বই। ছবির বইটা চেয়ে নিয়েছিল নয়নার কাছ থেকে। নয়নার লাইব্রেরী ঘরে একদিন বইটা দেখে আর্টিস্ট দেখতে চেয়েছিল। জিনিসগুলো সব পাশাপাশি সাজানো। তার আগে নজরে পড়েনি অল্‌কার। একটা চিঠিও রয়েছে একপাশে। তার ওপর অল্‌কার নাম লেখা। নিজের নাম দেখে অল্‌কা চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলো।

আর্টিস্ট লিখেছে—স্নেহের অল্‌কা, তোমাদের যা-কিছু জিনিস আমার কাছে ছিল সব ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমার দিদির জিনিসটা দিদিকে ফিরিয়ে দিও। তোমার দিদিকে বোলো, যাবার আগে তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার দিদি আমার সঙ্গে দেখা করেনি। দেখা করার পেছনে আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু তোমার দিদির দেওয়া রুমালটা আর বইটা দেখা ক'রে ফেরৎ দিতে চেয়েছিলাম তার হাতে! তাও আর সুযোগ পেলাম না। আর তোমার দেওয়া ফুলের তোড়া, ওটা শুকিয়ে গিয়েছে। ওটাও রেখে গেলাম, কারণ সমস্তই যখন রেখে গেলাম তখন শুক্‌নো ফুলের তোড়া নিয়ে কি আমার মন ভরবে? তুমি কিছু মনে ক'রো না—ইতি—

চিঠিটা প'ড়ে অল্‌কা কেমন যেন হয়ে গেল।

বললে, 'চিঠিটা আমি তখন দেখতে পাইনি দিদি, আর্টিস্ট খুব ভাল লোক ছিল, না দিদি?'

নয়না চৌহান তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। তার মুখে তখন কোনও কথা নেই—

অল্‌কা বললে, 'তা আর্টিস্ট তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল তুমি দেখা করলে না কেন দিদি—'

নয়না বারান্দা দিয়ে চলতে লাগলো।

বললে, 'তা তুইও তো ছিলি, তুই কেন দেখা করলি না?'

অল্‌কা বললে, 'বা-রে আমার সঙ্গে তো দেখা করতে চায়নি আর্টিস্ট, তোমার সঙ্গেই সে দেখা করতে চেয়েছিল—'

'এরপর আপনি কোথায় গেলেন?'

আনন্দ বললে, 'এরপর আমি আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে গেলাম। ফিরে গিয়ে আবার ছবি আঁকতে শুরু করলাম।'

'আপনি তারপর আর কোথাও চাকরি ক'রেননি?'

'না, চৌহান-এস্টেটে চাকরি করার পর আমার মনে যে আঘাত পেয়েছি, তারপর আর কোথাও চাকরি ক'রে শান্তি পাবো তা কল্পনা করতে পারিনি।'

'এমন কী আঘাত পেয়েছেন যে, আর কোথাও চাকরি করতে পারেন নি?'

'সে আঘাত আদালতে সকলের সামনে বলবার নয়।'

'আমি দাবি করছি আপনাকে তা প্রকাশ ক'রে বলতেই হবে।'

'আমি বলতে বাধ্য নই!'

আনন্দর উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে কোর্টময় হৈ-চৈ শুরু হলো। আইনের কূটতর্ক শুরু হয়ে গেল ফরিয়াদী আর আসামীর এ্যাড্‌ভোকেটের মধ্যে।

শেষকালে আনন্দকে বলতেই হ'ল প্রকাশ্য আদালতে যে, সে ভালবেসে ফেলেছিল নয়না চৌহানকে। এ-ভালবাসা তার নিঃশব্দ নীরব অপ্রকাশ্য ভালবাসা। তার মতো গরীব আর্টিস্টের পক্ষে গুলমোহর এস্টেটের মালিক নয়না চৌহানকে ভালবাসা যে অপরাধ তা সে ভাল করেই জানতো। আর জানতো বলেই নিঃশব্দে কাউকে না-জানিয়েই একদিন চৌহান-এস্টেট থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিল। আশীষ চৌহানের অনুমতিও নেয়নি। তার প্রাপ্য মাইনেটাও সে নিয়ে আসেনি আসবার সময়। এমন কি কেউ জানতেই পারেনি কবে সে এ'ল চৌহান এস্টেট ছেড়ে।

'তারপর আবার কেন আপনি চৌধুরী-লজে গেলেন?'

'কারণ, খবর পেয়েছিলাম নয়না চৌহান বিয়ের পর কষ্টে আছে!'

'কেমন ক'রে খবর পেলেন? কে খবরটা দিলে আপনাকে?'

'মিসেস চোপরা।'

মিসেস চোপরা এক অদ্ভুত মহিলা। সব দেশেই এক-একজন স্ত্রী থাকে যারা স্বামী বলতে অজ্ঞান। যারা সবাইকে ব'লে বেড়ায় তার স্বামীর মতো স্বামী কারো নেই।

মিস্টার চোপরা গোবেচারা মানষ। পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়ে নিজের চেষ্টায় সম্পত্তিটাকে আরো বাড়িয়েছেন আয়তনে। দশ-বারোটা ছেলে মেয়ের মা মিসেস চোপরা। কিন্তু তবু এতখানি স্ত্রী-সোহাগী স্বামী বড় একটা দেখা যায় না। শহরে এলে দোকানে গিয়ে প্রথম কাজ

স্ত্রীর জন্য কিছু কেনা। হয় শাড়ি, নয় সালোয়ার, নয় ব্লাউজ, নয় তো সোনার হীরের কিম্বা মুক্তোব গয়না। মিসেস চোপরাকে মিস্টার চোপরা যেন সমস্ত কিছু দিয়েও খুশী হতে পারতেন না। আকাশের চাঁদ যদি ধরা যেত সেটাও বোধহয় স্ত্রীকে দিতেন। ভারি মনখোলা প্রাণ-খোলা মানুষ ওই মিসেস চোপরা।

লক্ষ্ণৌয়ে ছবির এক্‌জিবিশন্ হচ্ছিল আনন্দর! আর্টিস্ট মহলে কিছু বন্ধু, কিছু শত্রু সকলেরই থাকে। বন্ধুরাই নিজেরা খরচপত্র ক'রে এক্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সে একজিবিশন্ দেখতে যে এত ভিড় হবে তা আনন্দ কল্পনাও করেনি। সবাই দেখতে আসে। একটার পর একটা ছবি দেখতে দেখতে একটা ছবির সামনে এসে সবাই হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অদ্ভুত একটা পোর্টেট। চারিদিকে সাদা কুয়াশার মতো ঝাপসা ব্যাকগ্রাউণ্ড। ঠিক তারই মধ্যিখানে একটা মুখ। শুধু মুখ নয়, মুখ থেকে পা পর্যন্ত সবটাই আছে। কিন্তু মুখখানা যেন চারিদিকের ফ্রেমের মধ্যে পদ্মফুলের মতো ফুটে রয়েছে।

এ ছবির কত দাম?

সবাই আসে, দেখে ছবিটা। কেনবার ইচ্ছা না থাকলেও দামটা জিজ্ঞেস করে।

মিস্টার চোপরা এসেছিলেন বৈষয়িক কাজে। মিসেস চোপরার জন্যে কয়েকটা পোষাক কিনেছেন, কস্‌মেটিকস্ কিনেছেন, আরো অনেক কিছুই কিনেছেন। হঠাৎ কার কাছে শুনেছেন ছবির একজিবিশনের কথা। তিনিও একদিন এলেন, খোঁজ করলেন আর্টিস্টের। কিন্তু কোথায় আর্টিস্ট? আনন্দর কোনও পাত্তাই নেই।

মিস্টার চোপরা অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন্।

খোঁজ-খবর ক'রে আনন্দ মিশ্রের সন্ধান বার করলেন।

আনন্দ বললে, 'ও ছবি আমি দেবনা—'

মিস্টার চোপরা বললেন, 'আমার স্ত্রী ওর চেয়েও সুন্দরী, আপনি তাহ'লে তার একটি ছবি এঁকে দিন—'

আনন্দ বললে, 'আমি কারো চাকরি কববো না আর—'

'কিন্তু চাকরি তো নয়, আপনি টাকা নেবেন কাজ করবেন, কাজটা শেষ হলেই চলে আসবেন—'

'কত টাকা দেবেন আপনি?'

'যা আপনি চাইবেন!'

সত্যই স্ত্রীর জন্যে টাকা খরচ করতে মিস্টার চোপরার কার্পণ্য ছিল না। একেবারে সেইদিনই আনন্দকে বগলদাবা ক'রে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে।

মিস্টার চোপরার বাড়িটাও বড়। চারিদিকে ঐশ্বর্যের বিলাসের ছাপ। বাগান আছে, বাগানের মালী আছে। ময়ূর আছে, ঘোড়া আছে। আর আছে দশ-বারোটা ছেলে-মেয়ে।

কিন্তু অতগুলো ছেলে-মেয়ের মা হয়েও যেন আদুরী মিসেস চোপরা। আনন্দকে দেখেই বললে, 'ভাল ক'রে আঁকতে পারবেন আমার ছবি?'

আনন্দ বললে, 'পারবো—'

মিসেস চোপরা বললে, 'আপনি যেন ভাববেন না আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি, দশ-বারোটা ছেলে-মেয়ের মা হয়েছি ব'লে ভাববেন না যেন আমি বুড়ি, বেশ ভাল ক'রে আমাকে আঁকতে হবে কিন্তু—'

তারপর আর্টিস্টের দিকে ফিরে আবার বললে, 'পারবেন তো আঁকতে?'

মিসেস চোপরার বয়েস হলেও যেন ছোট খুকী। দিন-রাত সেজে-গুজে থাকে। যখন ছবি আঁকা হচ্ছে তখন তার চুপ ক'রে ব'সে থাকারই কথা। নড়া চড়া উচিত নয়! কিন্তু তখনও কথার যেন খই ফোটে, গা দুলিয়ে পা ছড়িয়ে গল্প শুরু ক'রে।

বলে, 'আপনি তো মিস্টার চোপরাকে দেখেছেন মিস্টার মিশ্র?'

আনন্দ বলে, 'দেখেছি বৈকি!' 'কী রকম মানুষ বলুন তো।'

আনন্দ বলে, 'ভাল বলেই তো মনে হয় আমাব।'

মিসেস চোপরা বলে, 'তাহলে আপনি কিছুই জানেন না।'

আনন্দ যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে।

বলে, 'না না, আমি তো খারাপ বলিনি ওঁকে, উনি তো খুব ভাল লোক।'

'আপনি আর ওর কতটা ভাল দেখতে পেয়েছেন মিস্টার মিশ্র। ও-বকম হাজব্যাণ্ড হয় না।'

আনন্দ বলে, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি!'

'না না, মিস্টার চোপরা যে কত ভাল হাজব্যাণ্ড তা কেউ দেখতেই পায় না। জানেন, আমায় কত ভালবাসেন?'

এই সময়েই আনন্দ বড় মুশকিলে প'ড়ে।

বলে, 'তা হবে—আপনি নিজে যখন বলছেন—'

মিসেস চোপরা বলে, 'না, মিস্টাব মিশ্র, আমার মতো ভাল হাজব্যাণ্ড কাবো নেই তা জানেন—এখানে কত মেয়ের কত হাজব্যাণ্ড তো দেখেছি, এরকম হাজব্যাণ্ড আর আপনি পাবেন না—'

আনন্দ শেষে বাধ্য হয়েই বলে, 'আপনি ·কটু চুপ ক'রে বসুন মিসেস চোপবা, একটু অসুবিধে হচ্ছে আমার।'

তখন শান্ত হয় মিসেস চোপরা, বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা আর কথা বলবো না, কিন্তু দেখবেন আমাব ছবিটা যেন ভাল হয়—'

'সেজন্যে আপনি ভাববেন না।'

ব'লে আনন্দ আবার ছবি আঁকতে শুরু করে।

কিন্তু কথা না ব'লে মিসেস চোপবা বুঝি থাকতে পাবে না। কথা না বলতে পাবলে মিসেস চোপরার ভাত হজম হয় না।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'বে আবার বলে. আমার বয়েসটা একটু কমিয়ে দেবেন মিস্টাব মিশ্র—'

আনন্দ বলে, 'না না, কমিয়ে দিতে হবে কেন, আপনাব বয়েস তো কমই।'

মিসেস চোপরা খুব খুশী।

বলে, 'ঠিক ধরেছেন তো আপনি—আচ্ছা, কত বয়েস বলুন তো আমাব?'

আনন্দ বড মুশকিলে পড়ে আবাব।

বলে, 'খুবই কম—'

'তবু কত বলুন তো! দেখি আপনাব আন্দাজটা কেমন? ভাববেন না দশটা ছেলে-মেযে হয়েছে ব'লে...

এমন সময় মিস্টার চোপরা ঘরে ঢোকেন।

বলেন, 'কি হচ্ছে? কেমন কাজ হচ্ছে মিস্টাব মিশ্র?'

মিসেস চোপবা রেগে যান।

বলেন, 'তুমি আবাব বিরক্ত করতে এলে কেন? জানো এখানে কাজ হচ্ছে, আব এই সময়েই এলে বিরক্ত করতে?'

মিস্টার চোপরাও হাসি খুশী মানুয। তিনিও চেনেন তাঁব স্ত্রীকে। তিনিও হাসেন।

বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি ঘব থেকে —তোমাদেব আর্টের চর্চায আমি বাধা দেবো না—'

ব'লে বেরিয়ে যান।

যাবার আগে আর্টিস্টের দিকে চেয়ে বলেন, 'মিসেস চোপরাও খুব বড় আর্টিস্ট হতে পারতেন, তা জানেন তো মিস্টার মিশ্র—'

আনন্দ যেন অবাক হয়ে গেছে এমনিভাবে প্রশ্ন করে, 'তাই নাকি?'

মিস্টার চোপরা তখনও হাসেন।

হাসতে হাসতে জবাব দেন, 'বিশ্বাস না-হয়, মিসেস চোপরাকেই জিজ্ঞেস করুন না—'

আনন্দ মিসেস চোপরার দিকে চেয়ে বলে, 'তা ছবি আঁকা আপনি ছেড়ে দিলেন কেন?'

মিস্টার চোপরা বলেন, 'এই যে আমি। আমার জন্যে—'

'আপনার জন্যে মানে?'

মিস্টার চোপরা আরো জোরে হেসে ওঠেন।

বলেন, 'ওই যে, অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে হয়ে গেল, তার জন্যে তো আমিই দায়ী—'

মিসেস চোপরা তখন সত্যিই রেগে ওঠে।

বলে, 'ছি ছি, তোমার মুখে দেখছি কিচ্ছু আটকায় না—'

ব'লে চেয়ার থেকে উঠে মিস্টার চোপরাকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে বার করে দেয়।

বলে, 'তুমি যাও এখান থেকে, কেবল ডিস্টার্ব কবতে আসবে—'

তারপর দরজাটায় খিল দিযে আবাব নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতে বলে, 'দেখলেন তো, আমায় কী রকম ভালবাসে আমার হাজব্যাণ্ড। কারোর হাজব্যাণ্ড এরকম নয়, এখানে তো কত হাজব্যাণ্ডই রযেছে---কী যে ভালবাসে আমায়---

শিবনাথ বললে—আসলে মিস্টার বা মিসেস চোপরাব কথা তোমাকে আমি এতখানি বলতাম না। কিন্তু আনন্দ মিশ্রর জীবনে এই মিসেস চোপরার ছবি আঁকার ব্যাপারটা একটা ঘটনা। উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ঘটনা না ঘটলে হয়তো নয়না চৌহানের জীবন অন্যরকম হয়ে যেত। এ ঘটনা না ঘটলে হয়তো এ-মামলাও হতো না। আর এ-মামলা না হলে এ-কাহিনী বাইরের লোক জানতেও পারতো না।

সেই ব্যাপারটা এবার বলি।

মিসেস চোপরা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে কয়েকটা ছবি। আনন্দের স্কেচ্-বইটা বাইরে পড়েছিল। সেটা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ নজরে পড়লো মিসেস চোপরার।

'আরে, মিসেস চৌধুরীর ছবি আপনি কোথায় পেলেন আর্টিস্ট?'

মিসেস চোপরা অবাক হয়ে গেছে ছবিগুলো দেখে। একটা নয়, দুটো নয় অনেকগুলো।

'মিসেস চৌধুরীর ছবি আপনি কবে আঁকলেন? মিসেস চৌধুরীর হাজব্যাণ্ড বুঝি আপনাকে এন্‌গেজ করেছিল?'

আনন্দ অবাক হয়ে গিয়েছে।

বললে, 'আপনি চেনেন নাকি এঁকে?'

'চিনবো না? আপনি তো অবাক কবলেন মিস্টাব মিশ্র? মিসেস্ চৌধুবীকে আমি চিনবো না? এই তো আমার বাড়ির কাছেই থাকে, আমার সঙ্গে খুব আলাপ—আমার বড় দুঃখ হয় মিস্টার মিশ্র, মিসেস চৌধুরীকে দেখে---জানেন।'

আনন্দর মুখে তখন যেন কথা ফুরিয়ে গেছে। তার যেন বিশ্বাস করতে আতঙ্ক হচ্ছে। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোলো না।

'সত্যিই আপনি চেনেন?'

'সত্যি না তো কি মিছে কথা বলছি আপনার সঙ্গে? কাকে না চিনি এখানে? সকলকে চিনি আমি। কার কী রকম হাজব্যাণ্ড তাও জানি। এই যে এত মেয়ে রয়েছে এখানে, আমার মতোন এমন হাজব্যাণ্ড কারো আছে? আমি বাজি রাখতে পারি মিস্টার মিশ্র, একজনেরও নেই—মিসেস চৌধুরীর জন্যে তাই তো আমার দুঃখু হয়।'

আনন্দর যেন তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

বললে, 'সত্যিই বলছেন আপনি চেনেন?'

মিসেস চোপরাও অবাক হয়ে গেল।

বললে, 'কেন, আপনার বিশ্বাসই হচ্ছে না বা কেন? তা যদি বিশ্বাসই না হয় তো আমার সঙ্গে এখুনি চলুন চৌধুরী-লজে, আমি দেখিয়ে দেবো আমি চিনি কি-না—চলুন আমার সঙ্গে, এখুনি আমার ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বলছি—'

আনন্দ বললে, 'না, তার দরকার নেই—'

'আজ না হয় তাহ'লে কাল চলুন। কালই দু'জনে একসঙ্গে যাবো। গিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবো। আমি আপনাকে প্রমাণ ক'রে দেবো আমার হাজব্যাণ্ড ভাল, না মিসেস চৌধুরীর হাজব্যাণ্ড ভাল—'

আনন্দর সমস্ত শরীর আর মনে তখন যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

বললে, 'আপনি যেন তাকে বলবেন না যে, আমি এখানে আছি, এখানে আপনার ছবি আঁকতে এসেছি—'

'কেন? বলবো না কেন? আপনার ভয় কীসের? মিস্টার চৌধুরী কি মিস্টার চোপরার চেয়ে বড়লোক? আমার কি টাকা কম? আমার এ-বাড়ি কি চৌধুরী-লজের চেয়ে ছোট? দেখুন মিস্টার মিশ্র, মিস্টার চৌধুরীকেও আমি দেখেছি, আমার হাজব্যাণ্ড যদি ও-রকম হ'ত তো আমি তাকে খুন ক'রে ফেলতাম—'

আনন্দ আর থাকতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে, 'কেন?'

মিসেস চোপরা বলতে লাগলো, 'সে অনেক কাণ্ড মিস্টার মিশ্র ও-রকম আমি আমার লাইফে দেখিনি—'

'কেন?'

মিসেস চোপরা বললে, 'দু'জনে একসঙ্গে এক বিছানায় শোয় না, তা জানেন? দিনরাত দু'জনে ঝগড়া করে। আর বিয়ে ক'রে যখন এলো দু'জনে, তখন থেকেই তো দেখছি—কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় মিস্টার চৌধুরী কে জানে, ওয়াইফের জন্যে কোনও দরদই নেই। আর আমার হাজব্যাণ্ডকে দেখছেন তো, একদিন যদি ও আমার পাশে না শোয় তো ওর ঘুমই আসবে না—'

তারপর হঠাৎ আনন্দর মুখের দিকে চেয়ে মিসেস চোপরা জিজ্ঞেস করলে, 'কী হলো মিস্টার মিশ্র, আপনার হলো কী? আপনি খুব টায়ার্ড বুঝি?'

আনন্দ বললে, 'আর ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না, মাথাটা কি-রকম করছে—'

মিসেস চোপরা বললে, 'ঠিক আছে, তাহ'লে আজ থাক্, অনেকক্ষণ কাজ হয়েছে, এবার আপনি রেষ্ট নিন্—'

তারপর আর্টিস্টের দিকে চেয়ে বললে, 'আমার ছবিটা খুব ভাল হবে তো মিস্টার মিশ্র? আমার বয়েসটা একটু কমিয়ে দেবেন, বুঝলেন! আসলে আমাকে দেখায় বড়, কিন্তু বয়স আমার কম—'

ততক্ষণে আর্টিস্ট নিজের তুলি, রং সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে। তখন তার একলা থাকতেই ভাল লাগছে।

এ-অঞ্চলটা এমনিতে নিরিবিলি! ছাড়া-ছাড়া বাড়ি। বিরাট বিরাট বাগানের মধ্যে এক-একটা বাড়ি। একটা বাড়ী থেকে আর একটা বাড়ি দেখা যায় না। বড় বড় গাছ। অনাদিকাল থেকে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে একই জমির ওপর। কিন্তু তাদের ছায়ার তলায় মানুষ বদলাচ্ছে!

একটা বাড়ির সামনে এসে একটা গাড়ি দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে নামলো একটি মেয়ে। তার পেছনে আর-একটি ছোট মেয়ে। তার পেছনে গুলাবী।

অনেক দূর থেকে আনন্দ দেখলে চেয়ে চেয়ে। নয়না চৌহান, তার বোন অল্‌কা, আর নয়নার আয়া।

আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে তিনজনেই ঘরের ভেতরে ঢুকলো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ভাল ক'রে দেখা গেল না। তবু অনেকদিন পরে এমন ক'রে এখানে এসে এটুকু দেখা হবে এও তো অপ্রত্যাশিত। সত্যিই এমন ক'রে দেখা হয়তো তার উচিত হচ্ছে না। বিয়ে হয়ে যাবার পর নয়না চৌহানের কথা হয়তো মনে রাখাও অপরাধ। কিন্তু তবু লোভ সামলাতে পারেনি আনন্দ। বিকেলবেলা একবার বেড়াতে বেরিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে কিসের যেন আকর্ষণে এখানেই চলে এলো, আর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পরেই এই দেখা।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে এসে যেন বাঁচলো আনন্দ।

যেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরো কাছে যেতে ইচ্ছে করবে। দু'টো কথাও বলতে ইচ্ছে করবে। আর তাছাড়া চলে আসা ছাড়া উপায়ই বা কী! চারিদিকে বিরাট গাছের জঙ্গল। অন্ধকারে আস্তে আস্তে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেল। মনে হলো, এমনি ক'রে তার জীবনেও যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সেই দিন। অথচ বেশ তো ছিল সে তার ছবির জগতে। কেনই ব' এখানে মিসেস চোপরার ছবি আঁকতে এলো সে। এখানে এসে সে কি দেখতে চেয়েছিল, নয়না চৌহান সুখে আছে কি-না? সুখে থাকবেই বা না কেন? তার নিজের অতবড় এস্টেট, স্বামীরও এতবড় চৌধুরী-লজ। সুখে থাকবার যা-কিছু উপকরণ সমস্তই তো তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। মিসেস চোপরা জানে না বলেই অত কথা বলছে, মিসেস চোপরা নিজের স্বামী ভাবেই উথ্‌লে উঠছে তাই পরের সুখটা দেখতে পায় না। সব স্বামীরাই কি মিস্টার চোপরার মতো দেখিয়ে দেখিয়ে স্ত্রীদের ভালবাসে? ভালবাসার প্রকাশটাও তো বিভিন্ন রকমের।

বাড়িতে ফিরে আসতেই মিসেস চোপরা খবর পেয়েছে।

হাসতে হাসতে ঘরে এলো!

বললে, 'কোথায় গিছলেন মিস্টার মিশ্র? আমি আপনাকে তখন থেকে খুঁজছি—'

'কেন?'

'আমি যে আজ মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার কথা বললাম।'

'আমার কথা বললেন আপনি?'

'কেন বলবো না? হাজারবার বলবো, আমি মিসেস চৌধুরীকে বললাম—আপনি যে আর্টিস্টকে দিয়ে আপনার পোট্রেট করিয়েছেন, আমি সেই আর্টিস্টকে দিয়েই আমার পোট্রেট করাচ্ছি—'

কথাটা শুনে আনন্দর মুখটা যেন নীল হয়ে গেল।

বললে, 'কেন আপনি বলতে গেলেন ও-কথা, উনি হয়তো মনেমনে কষ্ট পাবেন—'

'কেন, কষ্ট পাবেন কেন? ওঁর হাজব্যাণ্ড মিস্টার চৌধুরীকে শোনাবার জন্যেই তো বললাম। আমি ওঁর বাড়িতে কতবার গিয়েছি, উনি তো কই মিসেস চৌধুরীকে একবারও আমার বাড়ীতে আসতে দেননি! ওঁদেরই কেবল টাকা আছে, আর আমাদের টাকা নেই বুঝি? মিস্টার চৌধুরী কি মিস্টার চোপরাব চেয়েও বড়লোক? আমি তো আবার কালকেও যাবো, কালকে আবার ওইসব ব'লে আসবো—'

'কিন্তু আপনি কি মিসেস চৌধুরীকে বলেছেন যে, আমার স্কেচবইতে তাঁর ছবি দেখছেন?'

'হ্যাঁ, আমি ছাড়িনি। আমি সব ব'লে এসেছি।'

কথাটা শুনে আনন্দ মুষড়ে পড়লো আরো।

জিজ্ঞেস করলে, 'সেখানে কে কে ছিল?'

মিসেস চোপরা বললে, 'সেখানে সবাই ছিল। মিসেস চৌধুরীও ছিল, মিস্টার চৌধুরী ছিল, মিসেস চৌধুরীর ছোট বোন অল্‌কা চৌহানও ছিল, মিসেস চৌধুরীর আয়া গুলাবীও ছিল।'

আনন্দ আর কোনও কথা বলতে পারলে না। যেন ক্ষীণ একটা প্রতিবাদের ভাষাও মুখ দিয়ে বার করবার ক্ষমতো রইলো না তার।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

শিবনাথ বললে—আসলে গুলাবীর সাক্ষীতেও প্রমাণ হলো যে, মিসেস চোপরা সত্যিই এসেছিল মিসেস চৌধুরীর কাছে। মানে, মানুষ নিজের ঐশ্বর্য না দেখাতে পারলে তো তৃপ্তি পায় না। বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি কি শুধু নিজের ভোগ করবার জন্যে? লোককে দেখাতে না পারলে ও-সম্পত্তিই তো মিথ্যে! কিন্তু মিসেস চোপরা জানতেও পারলে না কতবড় ক্ষতি ক'রে গেল সেদিন মিসেস চৌধুরীর।

—কেন? ক্ষতি করলে কেন।

শিবনাথ বললে—সেই কথাই তো বলবো এবার তোমাকে।

তা সত্যিই ক্ষতি করবার যেটুকু বাকি ছিল নয়না চৌহানের, সেটুকু সেদিন মিসেস চোপরাই ক'রে গেল।

বুলবুল চৌধুরী। নামটার মধ্যেই যেন কোথায় একটা দুষ্টুমি লুকিয়ে ছিল।

যেদিন প্রথম চৌহান-এস্টেটে এসেছিল আনন্দ, সেদিনই জানতে পেরেছিল কোথায় যেন একটা অন্যায় ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে নয়না চৌহানের জীবনে। সে-অন্যায়টা এমনিতে বাইবে থেকে দেখা যাবার মতো নয়। বেশ অমায়িক মিষ্টি ভদ্র-মুখরোচক চেহারার মানুষ বুলবুল চৌধুরী। তাকে দেখে আনন্দের তেমন কিছু সন্দেহ হয়নি। তাই আনন্দ বুঝতে পারেনি কোন্‌দিক

দিয়ে অন্যায়টা এসে ঢুকবে। কিন্তু যখন সে-অন্যায়ের প্রতিরোধ করবার অধিকার তার নেই তখন স'রে আসা ছাড়া তার কোনও গতিই ছিল না আর।

বুলবুল চৌধুরী এমনই মানুষ যে, তাকে দেখে তার সঙ্গে মিশে তার আসল চেহারার পরিচয় পাওয়া শক্ত।

নয়না চৌহানও তার আসল স্বরূপটা প্রথমে বুঝতে পারেনি, বিয়ের প্রথম রাতে শুধু একটা সন্দেহ হয়েছিল। বুলবুল চৌধুরীর মুখের চেহারায় যেন কেমন অন্যমনস্কতা আল্‌তোভাবে ঝুলছিল।

রাত তখন বারোটা। কাঠগুদামের চৌধুরী-লজে নয়নার সেই-ই প্রথম রাত।

নয়নার মুখের দিকে বারবার চাইছিল বুলবুল চৌধুরী। কেন যে দেখছিল তা বুঝতে পারেনি নয়না প্রথমে। কিন্তু খানিক পরেই মনে হলো মুখের দিকে চাইছে না তার স্বামী। চাইছে তার গলার হারটার দিকে! শেষকালে হঠাৎ হারটার দিকে হাত বাড়াতেই নয়না চৌহান কেমন চম্‌কে উঠেছিল।

'অত চম্‌কে উঠলে কেন?'

নয়না চৌহান বললে, 'না, চম্‌কাইনি তো!'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'ও, আমি ভাবলাম তুমি চম্‌কে উঠলে—তোমার হারটা আমি দেখছিলাম। এটা কি আসল ডায়মণ্ড?'

নযনা চৌহান বললে, 'তা জানি না—'

'জানো না মানে?

'এটা আমার মায়ের গলার হার। বাবা কিনে দিয়েছিলেন—'

'ও, কত দাম এর?'

'তা জানি না।'

প্রথম রাতে এ-প্রশ্ন, এ-প্রসঙ্গে, এ-আলোচনাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু বেশিক্ষণ আর আলোচনা করবার অবকাশ হয়নি।

সেই মাঝ-রাতেই চৌধুরী-লজের বেড্‌রুমের দরজায় কে যেন ঘা দিয়েছিল। সে শব্দেই বুলবুল চৌধুরী বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলেছিল, 'আমি এখুনি একবার আসছি, তুমি শুয়ে থাকো—'

'কোথায় যাচ্ছো?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বুলবুল চৌধুরী বলেছিল, 'তুমি ভেবো না, আমি এখুনি ফিরে আসছি—'

ব'লে সেই যে চলে গিয়েছিল বুলবুল চৌধুরী; তারপর তিনদিন আর তার চেহারাই দেখা যায়নি।

ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল নয়নার! কমবয়েসী না হলে সব মেয়েরেই বিয়ের রাত সম্বন্ধে একটা কল্পনা থাকে। সে-কল্পনা তার সেই রাত্রেই ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত রাত তার ঘুম হয়নি সেদিন। এ নয় যে, বুলবুল চৌধুবী স্বামী হিসেবে তার কাম্য ছিল। কিন্তু অবহেলা? সে যেন প্রথম উপেক্ষা পেলে একজন পুরুষের কাছ থেকে। এ অপমান যার কাছ থেকেই হোক—যেন অমার্জনীয়। ছোটবেলা থেকে বিলাসে ঐশ্বর্যে এতদিন মানুষ হয়ে এসে হঠাৎ যেন প্রথম পরাজয় হলো তার। যেন তাকে পদাঘাত করলে কেউ। এর চেয়ে সত্যিই শারীরিক পদাঘাত পেলে এতখানি বাজতো না তার মনে।

কিন্তু কার কাছে এ অভিযোগ করবে সে?

অল্‌কা ছোট। সে এতখানি বুঝবে না। বোঝবার বয়েস তার হয়নি তখনও। কিন্তু আর কাউকে না পেয়ে লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে গুলাবীকেই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো।

জিজ্ঞেস করতে একটু লজ্জা হচ্ছিল বটে। কিন্তু তবু না জিজ্ঞেস ক'রে পারলে না।

নয়না জিজ্ঞেস করলে, 'ও কোথায় গেছে, তুই জানিস গুলাবী?'

গুলাবী বললে, 'জানি দিদিমণি—'

'কোথায় রে?'

'চৌধুরী-এস্টেটের একটা কুলীর বউ মারা গেছে, সেই খবর পেয়েই গেছে সেখানে চৌধুরী সাহেব!'

কী-রকম অদ্ভুত লাগলো নয়নার। যার যত বিপদই থাক, তা ব'লে ঠিক বিয়ের রাত্রেই চলে যাবে? এ কেমন পরোপকার!

গুলাবী বললে, 'না দিদিমণি, চৌধুরী খুব ইমানদার আদমী—'

'তুই কী ক'রে জানলি?'

'সবাই যে বললে।'

তিনদিন মানুষটা এলো না। তিনদিন বুলবুল চৌধুরীর খোঁজ পেল না কেউ। তবু কারো মনে কোনও সন্দেহ হলো না। যেন চৌধুরী সাহেবের এইটেই রীতি।

আর তাছাড়া কে-ই বা আছে সন্দেহ করবার। কে-ই বা আছে ভাববার। ধর্মেন্দ্রর চৌধুরীর এক ছেলে বুলবুল চৌধুরী। সেই ছেলে এতকাল ইণ্ডিয়ার বাইরে কাটিয়েছে। বাড়ির পুরানো ঝি-চাকর কেউ-ই নেই। যখন বাইরে থেকে বুলবুল চৌধুরী ইণ্ডিয়ায় ফিরে এলো তখন এ-বাড়িই এমন ছিল না। বাড়ির জানালা-দরজা-ইঁট-কাঠ সবই ভেঙে পড়ছিল। বাগানটা বন-জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলে আবার সব মেরামতো করালে। আবার লজ্ তৈরি হ'ল, আবার বাগান তৈরি হলো, সে-বাগানে আবার ফুল ফুটলো। বাড়ির ভেতরের সাজ-পোষাক সব নতুন হয়ে উঠলো।

লোকে দেখে বললে, ধর্মেন্দর চৌধুরীর বাহাদুর ছেলে বটে—।

পুরানো চাকর-ঝিদের মধ্যে কেউই ছিল না! ছিল শুধু একজন বুড়ি। জান্‌কীর মা। জান্‌কীর মার চোখে তখন ছানি পড়েছে। কাজ করবার ক্ষমতো আর তখন ছিল না তার।

জান্‌কীর মা বলতো, ওই চৌধুরী সাহেব ছিল বলেই তো এখনও বেঁচে আছি মা, দুটো খেতে পাচ্ছি—

এককালে বোধহয় রূপসী ছিল জান্‌কীর মা। তখনও হাতের পায়ের চেহারা দেখলে বোঝা যেত হাড়গুলো ছিল মোটা মোটা। গায়ের চামড়া এখন ঢিলে হয়ে এসেছে।

জান্‌কীর মা'র পুরানো কথাও সব মনে আছে। সেই ধর্মেন্দর চৌধুরী আর আত্মা চৌহান সাহেব যখন এ-বাড়িতে গানের আসর বসাতো। লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আসতো! মুজ্‌রো হতো। সারা রাত চলতো তাদের সে-উৎসব। সে-সব দিনের কথা বলতে বলতে বুড়ির ছানি-পড়া চোখ যেন ঠিকরে পড়তে চাইতো।

জান্‌কীর মা বলতো, 'আমার মেয়েও তো ঠিক তোমার মতো তো দেখতে মা—'

অল্‌কা বলতো, 'তোমার মেয়েকে দেখে আমি একবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, তা জানো তুমি?'

বুড়ি বলতো, 'আমার কপাল মা। আমার কপালে না থাকলে কী হবে বলো? আমারও কপাল, আমার মেয়েরও কপাল! জানকীর যদি মাথা ঠিক থাকতো তো তারও আজ বিয়ে হতো মা, তারও আজ সোয়ামী হতো—চৌধুরী সাহেবের মতো রাজপুত্তুরের সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম আমি—'

অল্‌কা জিজ্ঞেস করতো, 'তা তোমার মেয়ে আমার দিদির মতো দেখতে হলো কেমন ক'রে গো?'

প্রশ্নটা শুনে জান্‌কীর মা কেমন যেন একটু থতমতো খেয়ে যেত। উত্তর দিতে পারতো না।

কতদিন আত্মা চৌহান এসেছে এ-বাড়িতে, কত রাত কাটিয়েছে এই বাড়িরই এই ছাদেরই তলায়, তার কি ইয়ত্তা আছে। মেমসাহেব বউ আসবার আগে ধর্মেন্দ্রীর চৌধুরীও যা ছিল, আত্মা চৌহানও ছিল সেই রকম। দু'জনেরই ফূর্তির প্রাণ তখন তাঁদের। দু'জনেই গানবাজনায় ভক্ত। এক-একদিন সন্ধ্যে শুরু হতো পুরীয়াতে, তারপর শুরু হতো মালকোষ। মালকোষের পর দরবারী কানাড়া। দরবারী কানাড়ার কোমল নিখাদের রং-এ তখন দু'জনেরই নেশা জ'মে উঠেছে। তখন চোখ দু'জনেরই লাল, দৃষ্টি দু'জনেরই ঝাপসা। তখন কে আখতারি বাঈ আর বাড়ির ঝি, তার হিসেব রাখা সম্ভব নয়। সেই অবস্থাতেই ভৈরবী কি আশাবরীতে শেষ হতো আসর। সে-সব দিনের কথা জান্‌কীর মা কাউকে বলতেও চায় না, জিজ্ঞেস করলেও তার জবাব সে দেয় না।

জান্‌কীর মা'র লজ্জার কাহিনীও বটে, আনন্দের কাহিনীও বটে। বুড়ো বয়েসে সে-কথা কেউ প্রশ্ন করলে চোখ-মুখ নাক-কান তার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতে চাইতো।

বলতো, 'তা চৌধুরী সাহেব বিলেত থেকে ফেরে যখন, তখনই তো জান্‌কীর একটা হিল্লে হলো—'

অল্‌কা জিজ্ঞেস করতো, 'কেন, হিল্লে হলো বলছো কেন?'

'জান্‌কীর যে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল মা!'

'তা মাথা-খারাপ তার হলোই বা কেন?'

জান্‌কীর মা'র চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল পড়তো জানকীর কথা বলতে গিয়ে।

বলতো, 'আমারই কপাল মা, নইলে আমার মেয়েই বা পাগল হবে কেন?'

অল্‌কা জিজ্ঞেস করতো, 'তারপর সে-মেয়েকে পাগলা গারদে কে পাঠালো?'

'ওই চৌধুরী সাহেব। ওই চৌধুরী এসেই বাঁচালে আমাকে, আমি তো মা নিজে চোখে দেখতে পাই না। আমার নিজের একটা কাণাকড়িও নেই যে, অত খরচ করবো। খরচ কি মা কম? তিনশো টাকা লাগে মাসে! ওই চৌধুরী সাহেব ছিল বলেই তো আমার মেয়ে আজ খেতে-পরতে পারছে—'

'তা পালালো কেন পাগলা গারদ থেকে?'

'ওই বলে কে মা? পাগলের যদি মতি-গতি ঠিক থাকবে তবে আর তাকে পাগল বলবে কেন!'

এমনি করেই তিনদিন কাটলো! চার দিনের দিন বুলবুল চৌধুরী এলো আবার বাড়িতে। সে যেন একেবারে অন্য মানুষ। অন্য চেহারা। অন্য মূর্তি। কোথায় যে এতদিন ছিলেন তা জিজ্ঞেস করার সাহসও কারো নেই। বড় গম্ভীর মুখ।

নয়না জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

বুলবুল চৌধুরী একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলে নিজের মুখে কিন্তু হাসিটা যেন বড় ইঞ্চি-মাপা।

বললে, 'না, মানে...কই, শরীর তো খারাপ নয় আমার—'

'তা'হলে কি কিছু হয়েছে তোমার?'

বুলবুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'তোমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে!'

আরো জোরে হাসবার চেষ্টা করলে বুলবুল চৌধুরী।

বললে, 'হবে আবার কী! প্রপার্টি থাকলেই ঝঞ্ঝাট থাকে—'

নয়না বললে, 'শুনলাম তোমার এস্টেটের কার নাকি অসুখ, তাকেই দেখতে গিয়েছিলে!'

'কে বললে তোমাকে?'

'ওই তো জান্‌কীর মার কাছ থেকে খবরটা পেলাম—'

বুলবুল চৌধুরী যেন খবরটা শুনে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে হলো।

বললে, 'নিজের সুখটাই দেখলে তো চলে না সংসারে—আমার আণ্ডারে যারা কাজ করে তাদের তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই—'

'তা এখন কেমন আছে?'

'ভালই!'

প্রথম-প্রথম এমনি করেই চলতো। বাইরে কোথায় চলে যেত বুলবুল চৌধুরী, আবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসতো। এত কীসের কাজ কে জানে! আর কাজ সকলেরই থাকে। আশীষ চৌহানের মতো পাগল মানুষই শুধু বাড়িতে ব'সে থাকে। নইলে সবাই-ই কাজকর্ম নিয়ে থাকে। কিন্তু কাজ আছে ব'লে কি রাত্রেও মানুষ বাড়ি থাকবে না!

সান্ত্বনা দিল গুলাবী।

বলতো, 'কিছু মনে কোরো না দিদিমণি, নিশ্চয়ই সাহেবের খুব কাজকর্ম পড়েছে—'

নয়না কিছু বলতো না! আয়ার সঙ্গে এতকথা বলা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়।

তবু গায়ে প'ড়ে গুলাবী এসে বোঝাতো নয়নাকে।

বলতো, 'তোমার স্বামী দেবতার মতো দিদিমণি, অমন স্বামী কারো হয় না—'

নয়না রেগে যেত, 'তা তুই অত কথা বলছিস্ কেন? আমি কি তোঁকে জিজ্ঞেস করেছি কিছু?'

গুলাবী এর পর চুপ ক'রে যেত। আর কথা বলতো না।

কিন্তু অল্‌কার সামনে আর নিজেকে সামলাতে পারতো না। ছোট মেয়ে অল্‌কা! দূর সম্পর্কে মাসতুতো বোন। ছোটবেলা থেকে বাপ-মা নেই তার! সেই তখন থেকেই অল্‌কাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিল নয়না। চৌহান-এস্টেটের অতবড় বাড়ির মধ্যে অল্‌কাও না থাকলে নয়না বোধহয় পাগল হয়েই যেত এই জান্‌কীর মতো। সেই অল্‌কাও যেন এই চৌধুরী লজে এসে অন্যরকম হয়ে গেছে। অথচ দিদিকে ছেড়ে তার চলে যাওয়ার উপায়ও নেই। কোথায়ই বা সে যাবে? আর অল্‌কা যদি চলে যায়, তাহ'লে কেমন ক'রে এখানে থাকবে সে? এই নির্বান্ধব পুরীতে?

অল্‌কাই দিদির কাছে শুতো, দিদির কাছে থাকতো সারাক্ষণ, দিদির মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকতো। কিছু বলতো না!

নয়না জিজ্ঞেস করতো, 'কী রে, কিছু বলবি?'

অল্‌কা কিছু বলতে সাহস করতো না প্রথম প্রথম! কিন্তু তার পর যখন আর সহ্য করতে পারতো না তখন বলতো, 'দিদি, আমার ভয় করছে—'

নয়নারও ভয় করতো।

বলতো, 'কেন রে, তোর ভয় করছে কেন?'

'কি জানি দিদি, বড্ড ভয় করে আমার!'

'ভয় কী? আমি তো আছি।'

'না দিদি, তোমার জন্যেই তো ভয় করে আমার।'

'আমার জন্যে? দূর বোকা! আমার কি হয়েছে? আমার তো কিছু হয়নি?'

অল্‌কা বলতো, 'না দিদি তুমি মনে করো না আমি কিছু বুঝি না—আমি সব বুঝতে পারি। তোমার চেহারা তাহ'লে কেন অত খারাপ হয়ে যাচ্ছে? তোমার চোখের কোণে কেন কালি প'ড়ে যাচ্ছে? তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছো কেন?'

নয়না আর থাকতে পারতো না তখন। একেবারে দুই হাতে অল্‌কাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জল ঢাকবার চেষ্টা করতো।

'বলতো কী করবো বল্ অল্‌কা, আমার কপালে কিছু থাকলে আমি কী করবো? আর তুই বা কী করবি?'

'কিন্তু তুমি কিছু বলো না কেন চৌধুরী সাহেবকে?'

'আমি কী বলবো বল্, চৌধুরী সাহেবের কাজ থাকতে নেই? সে কি সব কাজ কর্ম ছেড়ে আমায় নিয়ে দিন-রাত প'ড়ে থাকবে? আমাদের দিন-রাত পাহারা দেবে?

অল্‌কা বলতো, 'তা'হলে একদিনও বাড়ি থাকবে না, এত কী কাজ?'

কোথাও যাবার জায়গা থাকলে হয়তো নয়না সেখানেই চলে যেত! চৌহান-এস্টেটের বা তাদের কে আছে। সেখানে থাকাও যা, এখানে থাকাও তাই।

দু'জনে দিনের পর দিন মাসের পর মাস সেই একই বাড়ির কোঠরে ব'সে মুহূর্ত গুনতো। মাঝে-মাঝে কেবল বাড়ির বাইরে যেত গাড়িটা নিয়ে।

কোথায়ই বা যাবার জায়গা আছে তাদের। আশে-পাশের বাড়ির বউরা আসতো। তাদের মধ্যে মিসেস চোপরাই আসতো একটু ঘন-ঘন। এসে কথা বলে যেত। কিন্তু মিসেস চোপরার সঙ্গেও বেশি কথা বলতে ভাল লাগতো না।

অল্‌কা বলতো, 'ও বউটা যেন কেমন, না দিদি?'

'কেন?'

'তোমাকে তো কেবল ওর গয়না দেখাতে আসে, আমি সব বুঝতে পারি।'

সত্যিই মিসেস চোপরা আসে আর এসেই শুরু করে নিজের ঐশ্বর্যের কাহিনী। কত টাকার গয়না দিয়েছে তার মিস্টার চোপরা, কত টাকার সালোয়ার পাঞ্জাবী দিয়েছে, কত জোড়া জুতো দিয়েছে, কতগুলো গাড়ি দিয়েছে তারই সবিস্তার কাহিনী ব'লে যায় নয়না চৌহানের কাছে। হয়তো কথাগুলো বলতেই আসে! কথাগুলো শোনাতেই ভাল লাগে তার।

মিসেস চোপরা বলে, 'জানেন মিসেস চৌধুরী, কাল কি কাণ্ড হয়েছে—'

'কি কাণ্ড?'

'মিস্টার চোপরা কাল লক্ষ্ণৌ থেকে আমার জন্যে একটা গাড়ি কিনে এনেছে—'

'গাড়ি? গাড়ি মানে?'

নয়না চৌহানও অবাক হয়ে যায়।

মিসেস চোপরা বলে, 'চল্লিশ হাজার টাকার নতুন ফিয়াট এসেছে লক্ষ্ণৌতে—তাই কিনে এনেছে—'

'কেন, গাড়ি তো আপনার ছিল?'

'ওই বলে কে? বলুন তো আজকালকার বাজারে আমার জন্যে এত টাকা খরচ করা উচিত? কিন্তু কিছুতেই শুনবে না আমার কথা! আমি যদি বেশি কিছু বলতে যাই তো বলবে—তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি—'

কথাগুলো ব'লে মিসেস চোপরা হিংসে জাগাতে চায় নয়না চৌহানের মনে।

কিন্তু নয়না চৌহানের মুখে-চোখে তার কোনও আভাষ না পেয়ে আরো উৎসাহ বেড়ে যায় মিসেস চোপরার।

বলে, 'কী ভাল যে বাসে আমাকে আমার হাজব্যাণ্ড, সে আর কি বলবো আপনাকে মিসেস চৌধুরী। আমি যদি একটু রাগ করি আমার রাগ ভাঙাবার জন্যে সারাদিন খোসামোদ করবে, জানেন?'

অল্‌কা বলে, 'মিস্টার চোপরা আজ বাড়ি নেই বুঝি?'

'কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন তুমি?'

'না, আপনি যে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, মিস্টার চোপরা রাগ করবেন না আপনার ওপর?'

এতক্ষণে প্রশ্নের উত্তরটা যেন পেয়ে গেলেন মিসেস চোপরা।

বললেন, 'ঠিক ধরেছো তো তুমি খুকি! বাড়ীতে থাকলে কি আর আমি এখানে আসতে পারতাম? আজ যে মিস্টার চোপরা লক্ষ্ণৌতে গেছেন—'

নয়না একদিন মিসেস চোপরাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, 'আপনি অল্‌কার সামনে এ-সব কথা বলবেন না ও তো ছোট, এ-সব কথা ওর না শোনাই ভাল—'

মিসেস চোপরা বললে, 'তা শুনলেই বা ক্ষতি কী! এখন থেকেই সব শেখা উচিত—আর দু'দিন বাদেই তো ওর বিয়ে হবে—তখন? তখন তো কাজে লাগবে?'

নয়না বললে, 'না না, ওর এখন খুব বয়েস কম—'

কিন্তু মিসেস চোপরা তখন অন্যদিকে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেন।

বলেন, 'মিস্টার চৌধুরী কোথায়?'

'তিনি লক্ষ্ণৌয়ে গেছেন।'

'আজ রাত্তিরে আসবেন না?'

নয়না বললে, 'তা ঠিক বলতে পারি না—'

মিসেস চোপরা বললেন, 'সত্যি, এটা বড় অবাক লাগে আমার মিসেস চৌধুরী। মিস্টার চৌধুরী তো একদিনও রাত্রে বাড়িতে থাকেন না। আপনি কিছু জিজ্ঞেস করেন না কোথায় যান তিনি?'

নয়না বললে, 'তাঁরও তো অনেক কাজ থাকতে পারে—'

'তা কাজ থাকলেই বা। তা ব'লে মিসেসের কাছে মিস্টার থাকবে না, এ কেমন কথা। আমার মিস্টারকে দেখুন তো! একদিন যদি আমার পাশে না শোন তো তাঁর ঘুমই আসবে না। তাঁরও ঘুম আসবে না আমারও ঘুম আসবে না—'

নয়না এসব কথার কোনও জবাব দেয় না! এও যেন এক রকমের অপমান। কিন্তু সমস্ত অপমানই তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয় বুলবুল চৌধুরীর জন্য। তবু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না সে। মিসেস চোপরার আসাটাও বন্ধ করতে পারে না।

মিসেস চোপরা বলেন, 'না না, আপনি এ-সব সহ্য করবেন না মিসেস চৌধুরী। আপনি মিস্টার চৌধুরী এলে বলবেন। পুরুষ মানুষের জাত—জানোয়ারের জাত। পোষ মানাতে জানলে দেখবেন আপনার পা চাটতেও কসুর করবে না। মিস্টার চোপরা কি এই রকম ছিল আগে? আমিই তো চাবুক মেরে এই রকম পোষ মানিয়েছি—'

মিসেস চোপরা যেদিন বাড়িতে আসেন, সেইদিনই হৃদকম্প হয় নয়নার। ভাল ভাল উপদেশ শোনাবার ছল ক'রে নিজের স্বামীর বড়াই ক'রে যান। আর নয়নার না শুনেও কোনও উপায় থাকে না, কান পেতে সমস্ত শুনতে হয়।

সেদিন বুলবুল চৌধুরী এলো। অনেক দিন পরেই এলো। কিন্তু এসেই খোঁজ করতে লাগলো নয়নার।

চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় গেছে মিসেস চৌধুরী?'

চাকররা বললে, 'বেড়াতে গেছে—'

'কারোর বাড়ি গেছে?'

'কারোর বাড়িতে নয়নার বেড়াতে যাওয়ার নিষেধ ছিল বুলবুল চৌধুরীর। কোথাও বেড়াতে যাওয়াও পছন্দ করতো না!'

বুলবুল চৌধুরী বলতো, 'এ-পাড়ার সব লোক খারাপ, কারো বাড়িতে যাবার দরকার নেই।'

নয়না একবার বলেছিল, 'কিন্তু ওঁরা বারবার ক'রে যেতে বলেন আমাকে—'

'তা বলুকগে যাক্, এরা লোক কেউ ভাল নয়। কেবল তোমার কথা ওকে বলবে, আর ওর কথা তোমাকে বলবে—ওরা কেউ কারোর ভাল দেখতে পারে না—'

নয়না একবার সাহস ক'রে বলেছিল, 'মিসেস চোপরা প্রায়ই আসেন কিন্তু—'

'কেন আসেন?'

নয়না বললে, 'কী ক'রে জানবো কেন আসেন? বোধহয় গল্প করতে—'

'কী গল্প করেন?'

'তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন।'

'আমার কথা? আমার কী কথা জিজ্ঞেস করেন?'

নয়না বললে, 'এই তুমি কোথায় যাও, কী করো এইসব। মিস্টার চোপরার সঙ্গে তোমায় তুলনা করে কেবল—'

মিস্টার চোপরার নাম শুনেই চটে উঠলো বুলবুল চৌধুরী।

বললে, 'আমার সঙ্গে মিস্টার চোপরার তুলনা? ওটা তো একটা স্ত্রৈণ! ওরকম হাজব্যাণ্ড করতে চাও তুমি আমাকে?'

'না, তা তো আমি বলিনি।'

'তোমার কথাতে তো তাই-ই মনে হলো! ওটা একটা মেয়েমানুষ, ওই মিস্টার চোপরাটা। বউ-এর ভেড়ুয়া। কেবল বউ-এর পেছন পেছন ঘোরে। অমন মেয়েলি-পুরুষ তুমি পেয়েছো নাকি আমাকে?'

নয়না বললে, 'না, তা বলিনি।'

'তবে ও-কথা বলছো কেন?'

নয়না বললে, 'আমার কিন্তু বড় লজ্জা করে—'

'কিসের লজ্জা?'

'সবাই জানে তুমি বাড়িতে থাকো না, তাই নিয়ে যখন কেউ কিছু বলে তখন আমার লজ্জা করে—'

'তুমি কি চাও যে, আমি মিস্টার চোপরার মতো হবো?'

নয়না বলে, 'তুমি বাড়িতে থাকলে তো এ-সব কথা ওঠে না।'

বুলবুল চৌধুরী রেগে যায়।

বলে, 'কিন্তু আমি কি ওদের মতো বউ-এর ভেড়ুয়া? আমি কি ওদের মতো মেয়েমানুষ?'

এর জবাব দিতে গিয়ে নয়না চৌহানের বুকটা ফেটে যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস করে না। মানুষটাকে দেখলেই ভয় করে নয়নার। বিশ্বাস করতে পারে না, নির্ভর করতে পারে না। লোকটা যখন বাড়িতে থাকে তখন মনে হয় যেন বাড়িতে না থাকলেই ভাল হতো। আবার যখন লোকটা থাকে না তখন না-থাকার জন্য লজ্জা হয়। বুলবুল চৌধুরীর বাড়িতে না-থাকা যেন নয়না চৌহানের লজ্জা।

এ এক অদ্ভুত সমস্যা তার জীবনে। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণাও বটে!

সেদিন বুলবুল চৌধুরী এসে খোঁজ করতেই তাই গুলাবী সামনে এসে দাঁড়ালো।

বুলবুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় গেছে তোমার দিদিমণি?'

'বেড়াতে।'

'কোথায় গেছে বেড়াতে? হাওয়া খেয়ে বেড়াবারই তার সময় হলো এখন? আর আমি যে কাজকর্মের ভিড়ে নাকে-চোখে দেখতে পারছি না—'

'দিদিমণিকে ডেকে আনবো?'

সে এক অদ্ভুত আবহাওয়া। সেদিন চৌধুরী-লজের বৈঠকখানায় আরো কয়েকটা নতুন লোকের মুখ দেখা গেল। তারাও সবাই এসেছে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে। কী তাদের কাজ, কেনই বা তারা এসেছে, কতক্ষণ তারা থাকবে, তাও কেউ জানলো না। চৌধুরী-লজের পার্লারে বসে অনেকক্ষণ তাদের কথাবার্তা চললো। বড় বড় রেইস্ আদ্‌মী সব। ভেতরে কিচেন-এ খবর গেল, খাবার তৈরি হবে পাঁচজন লোকের।

ততক্ষণে গুলাবী গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে দিদিমণিকে।

নয়না চৌহানের বেড়ানোর জায়গা আর কতটুকু। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূরেই একটা পাহাড়। পাহাড়ের তলায় কয়েকটা বড় বড় গাছ। সেইখানটাতেই গাড়িটা গিয়ে দাঁড়ায়। নয়না নামে গাড়ি থেকে, অল্‌কাও নামে, তারপর এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। তারপর একটা পাথরের ওপর কিছুক্ষণ বসে। ব'সে ব'সে গল্প করে, তারপর যখন সন্ধ্যে হয়ে আসে তখন ঠাণ্ডা পড়ে। অল্‌কার গায়ে কোটটা চড়িয়ে দেয় নয়না। নিজের উলের স্কার্ফটা জড়িয়ে নেয় গায়ে। তারপর আরো রাত হয়। তখন কোনও কোনও দিন চাঁদটা ওঠে আকাশের এক কোণে।

নয়না অল্‌কাকে জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ি যাবি?'

অল্‌কা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে?'

নয়না বলে, 'তা এখানে বসে বসেই বা কী করবো?'

অল্‌কা বলে, 'বাড়িতে গেলেই আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করে—'

'কেন? ভয় করে কেন তোর?'

'কি জানি।'

'না আর ভয় করিসনি, আমি তো আছি—'

'কিন্তু আবার যদি আজও মিসেস চোপরা আসে, আবার সেই নিজের কথা বলে?'

নয়না বলে, 'তা বললেই বা, সংসারে কি এক রকম লোক থাকে। পৃথিবী কত বড় তা জানিস! হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ রকমের মানুষ এখানে থাকে। কেউ ভাল, কেউ মন্দ; কেউ বোকা, কেউ জোচ্চোর—ওসব ভাবতে গেলে কী চলে?'

অল্‌কা বলে, 'না দিদি, আমরা নৈনিতালে চলে যাই—সে বরং এর চেয়ে ভাল—'

'সেখানে যে যাবি, সেখানে কে আছে তোর?'

'তা এখানেই বা কে আছে?'

'তবু থাক্ এখানে ক'দিন। সেখানে গিয়েও তুই আমি আর গুলাবী, এখানেও তাই। তফাতটা কোথায়?'

অল্‌কা বলে, 'সেখানে আমার কিন্তু এমন ভয় করতো না—'

'তা এখানেই বা তোর ভয়টা কীসের?'

'তা তো জানি না, শুধু মনে হয় যেন একটা কিছু খারাপ হবে তোমার—'

'আমার? আমার জন্যে ভাবিসনি তুই, আমার যা হবার তাই হবে, আমার কথা ভাবা আমি ছেড়ে দিয়েছি—'

কথা বলতে বলতে নয়নার গলাটা বোধহয় ধ'রে আসে, গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার বলে, 'যেদিন আমার বাবা মারা গেছে, সেইদিনই জানি আমার কপালে সুখ নেই—। নইলে টাকার তো আমার অভাব নেই, রূপও তো আমার আছে—'

অল্‌কা বলে, 'সত্যি, দিদি তোমাকে দেখে আমারও আর বড় হতে ইচ্ছে করে না—'

'কেন রে? তুই বড় হবি, তোরও একদিন বিয়ে হবে—আমি তোকে অনেক ভাল দেখে একটা বিয়ে দিয়ে দেবো।'

অল্‌কা বলে, 'বিয়ের ওপর আমার ঘেন্না হয়ে গেছে, আমাকে যেন তুমি কোনও দিন বিয়ে করতে বলো না।'

নয়না বলে, 'দূর আমার কপাল খারাপ ব'লে কি সকলেরই কপাল খারাপ হবে? কত মেয়েই তো বিয়ে ক'রে সুখে স্বাচ্ছন্দে আছে। মিসেস চোপরাকে দেখিস না, কত সুখী! রোজই গয়না কিনছে, সালোয়ার কিনছে, গাড়ি কিনছে!'

অল্‌কা বাধা দিয়ে বললে, 'মিসেস চোপরার কথা তুমি আর বলো না দিদি, ওকে আমি মোটেই দেখতে পারি না। কেবল নিজের কথা বলে সব সময়—আমরা যেন ওর মতোন বড়লোক নই; কেবল আমাদের সামনে প্রমাণ করতে চায়, ও আমাদের চেয়ে বড়লোক—'

নয়না বলে, 'তা বলুক, কিন্তু মিসেস চোপরা আমাদের চেয়ে সুখী—'

অল্‌কা বলে, 'দরকার নেই আমাদের অমন সুখের—ওর চেয়ে বিয়ে না করা অনেক ভাল!'

নয়না হাসে, বলে, 'এখন তুই ওই কথা বলছিস, শেষকালে তুই-ই একদিন বিয়ের জন্যে ছটফট করবি।'

'কেন? কক্ষনো করবো না, তুমি দেখে নিযো! তুমিই কি বিয়ের জন্যে ছটফট করেছিলে? তবে বিয়েতে কেন মতো দিলে?'

নয়না বললে, 'আমি কি ইচ্ছে ক'রে মতো দিয়েছিলাম রে। বাবা যে মারা যাবার আগে কথা দিয়ে গিয়েছিল। বাবার কথাও রাখবো না? তুই তো জানিস না, আমি বাবাকে কত ভালবাসতাম! ছোটবেলা থেকে তো কেবল বাবাকেই চিনতাম, বাবার কাছে-কাছেই থাকতাম। মারা যাবার সময় আমার কথা ভেবে ভেবেই বাবার বড় কষ্ট হয়েছিল। তাই আমার বিয়ের ব্যবস্থা সমস্ত বাবাই ক'রে গিয়েছিল।'

হঠাৎ গুলাবী আসতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। গুলাবী দৌড়তে দৌড়তে এল। এসেই বললে, 'চৌধুরী সাহেব এসেছে দিদিমণি, আপনাকে খুঁজছে—'

'কেন? আমাকে খুঁজছেন কেন?'

'তা জানি না। সঙ্গে আরো চারজন লোক এসেছেন, তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও হচ্ছে—'

নয়না উঠলো। অল্‌কাও উঠলো। হঠাৎ চার-পাঁচজন লোকই বা এলো কেন? এমন তো কখনও হয়নি আগে। বুলবুল চৌধুরী তার এস্টেট নিয়েই ব্যস্ত, সেখানকার ঝামেলা নিয়েই তাঁর দিনরাত কাটে, এই ধারণাই ছিল নয়না চৌহানের। কিন্তু বাড়িতে যে এত লোক নিয়ে আসবেন, এর আগে কখনও ঘটেনি।

বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়ালো। নয়না গাড়ী থেকে নেমে ভেতরে যাচ্ছিল।

পার্লারের পাশ দিয়ে রাস্তা। বুলবুল চৌধুরী দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়। নয়না দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসতেই বুলবুল চৌধুরী হাতে একটা কাগজ নিয়ে এলো। অল্‌কার দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি একটু ঘর থেকে বাইরে যাও তো অল্‌কা—'

অল্‌কা বাইরে চলে গেল নিঃশব্দে।
বুলবুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলে, 'বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি?'
নয়না বললে, 'হুঁ—'
বুলবুল চৌধুরী বললে, 'খুব ভাল, খুব ভাল। কারোর বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি?'
নয়না বললে, 'না—'
'তা'হলে?'
'এমনি পাহাড়ের দিকে—'
'খুব ভাল, খুব ভাল, অমনি রোজ বেড়াবে। ঝামেলাটা কমে গেলেই আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবো।'
নয়না জিজ্ঞেস করলে, 'কবে তোমার কাজ শেষ হবে?'
'এই শেষ হয়ে এলো ব'লে! আর বেশিদিন নেই, সমস্ত মিটিয়ে এনেছি, তারপর একেবারে ফ্রি! এই দেখ না, ওরা সবাই এসেছেন, সেই কাজেই তো—'
'ওঁরা কারা?'
'আমারই বিজ্‌নেস-পার্টনার্স! এতদিন সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করেছি, এখন এসেছেন বাকি কাজটা সারতে!'
নয়না জিজ্ঞেস করলে, 'বাকি কাজটা কী?'
'সেইটে দেখাতেই তোমার কাছে এসেছি—'
বুলবুল চৌধুরী হাতের কাগজটা নয়নার দিকে এগিয়ে দিলে।
'এটা কী!'
বুলবুল চৌধুরী বললে, 'পড়েই দেখ না—'
নয়না কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলো।
বুলবুল চৌধুরী বললে, 'পড়বার তেমন কিছু নেই, কোনও গণ্ডগোল নেই এতে, তুমি সই না করলে হবে না তাই। একটা সই করে দাও ওতে—'
নয়না সমস্তটা পড়লো।
বললে, 'এ যে গুলমোহর এস্টেটের ব্যাপার—'
'হ্যাঁ, তোমার এস্টেট বলেই তোমার সই দরকার—'
'কিন্তু, এস্টেট মর্টগেজ দেবে কেন?'
'না দিলে টাকাটা পাচ্ছি না ব'লে। ওই পনেরো লাখ টাকার জন্যেই তো সব আটকে যাচ্ছে—'
'কিন্তু আমার এস্টেট, আমি মর্টগেজ্ দেবো কেন?'
বুলবুল চৌধুরী বললে, 'না মর্টগেজ্ দিলে আমি যে মুশকিলে পড়বো!'
'তা এত টাকা হঠাৎ দরকারই বা কীসের? কী এমন হয়েছে তোমার?'
বুলবুল চৌধুরী বললে, 'কিছু না হলে কি আর তোমার কাছে এই কাগজে সই করাতে আসি? তুমিই বলো না, তোমার এস্টেটও যা, আমার এস্টেটও তো তাই। তোমার আমার টাকা কি আলাদা?'
নয়না বললে, 'সে-কথা থাক্, কিন্তু আমার এস্টেট মর্টগেজ্ দিলে তোমার কী লাভ হবে?'
বুলবুল চৌধুরী বললে, 'সে কি! আমার লাভ না-হলে তোমাকে বলি? জানো, চারদিকে আমার কী রকম ঝামেলা চলছে। সাধ ক'রে কি আর বিয়ে করার পরও একদিন বাড়ি থাকতে পারি না! এই ঝামেলাটা মিটে গেলেই একবার থেকে বাড়িতেই থাকবো আরামে, আর দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না আমাকে—'
হঠাৎ বাইরে মিসেস চোপরার গলা শোনা গেল—কই, মিসেস চৌধুরী আছেন নাকি?
বুলবুল চৌধুরী কাগজটা টেনে নিলে নিজের হাতে।

অল্‌কা এতক্ষণ বাইরে নিজের ঘরে ছটফট করছিল। দিদির ঘর থেকে দু'জনের গলার আওয়াজ আসছিল। এমন জোরে জোরে তো কখনও কথা বলে না দিদি! ঝগড়া হচ্ছে নাকি?

মিসেস চোপরা ঘরে আসতেই অল্‌কাও পেছন পেছন এলো। বুলবুল চৌধুরী তখন অন্যরকম।

বললে, 'আসুন মিসেস চোপরা। কেমন আছেন?'

মিসেস চোপরা বললেন, 'আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না মিস্টার চৌধুরী! আপনি নতুন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এলেন, তারপর থেকে তো আপনার দেখাই নেই—নতুন বউকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারেন? আমি তো তাই মিস্টার চোপরাকে বলি। বলি—মিস্টার চৌধুরীকে দেখে এসো তো। কেমন ঝাড়া-ঝাপটা মানুষ, আর তুমি কেবল দিনরাত আমার পেছন-পেছন লেগে প'ড়ে আছো—এটা কি ভাল?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'আমার অনেকগুলো ঝামেলা চলছে তাই আর বাড়িতে আসতেই পারি না ঘন ঘন—'

মিসেস চোপরা বললে, 'মিস্টার চোপরাকে তো তাই আমি বলি, আমার জন্যে তোমার কাজ-কর্ম সব রসাতলে গেল—আমার কথা না ভেবে একটু কাজ-কর্মের কথা ভাবো দিকিনি—তা শুনবেন তিনি কী বলেন?'

কেউ শুনতে চাইলো না। তবু মিসেস চোপরা নিজে থেকেই বললে, 'তিনি বলেন কাজ-কর্ম তো চিরকালই থাকবে, তার জন্যে কি আর জীবনটা মাটি করবো বলতে চাও? তা আমি যদি একটু সামনে গিয়ে দাঁড়াই তো ওঁর কাজ-কর্ম সব নষ্ট হয়ে গেল!'

তারপর একটু থেমে বললে, 'আমার এক-এক সময় মনে হয়, এটাও একটা পাগলামি। নইলে বউ-এর জন্য এত পাগলামি কেউ করে? এই দেখুন না, এই কানের যে দুলটা পরেছি এটা কাল কিনে এনেছেন। কোনও দরকার ছিল না এটার। খামোকা টাকা নষ্ট করবার ফন্দি—'

এসব বহুবার শোনা গল্প। সুতরাং এ সব কথার কেউ জবাবও দেয় না, এ নিয়ে কেউ তর্কও করে না।

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমনিভাবে বললে, 'ওমা একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—'

সবাই চাইলে মিসেস চোপরার দিকে।

'আপনি যে-আর্টিস্টকে দিয়ে আপনার ছবি আঁকিয়েছেন, আমিও সেই আর্টিস্টকে দিয়ে ছবি আঁকাচ্ছি—'

বুলবুল চৌধুরীর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটলো।

'কোন্‌ আর্টিস্ট?'

'আনন্দ মিশ্র। খুব ভাল আর্টিস্ট। আপনার পছন্দ খুব ভাল। মিস্টার চোপরা তো আমার ছবি আঁকার জন্যেই বাড়িতে ডেকে এনেছেন তাকে। আর্টিস্ট আমাকে বলছিল—আপনার ফিগার মিসেস চৌধুরীর চেয়েও ভাল। আমি বললাম—কী যে বলেন আপনি, আর্টিস্ট—'

এতক্ষণে অল্‌কা কথা ব'লে উঠলো। সে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে, 'আর্টিস্ট আপনার বাড়িতেই আছে?'

'হ্যাঁ, তুমিও চেনো বুঝি আর্টিস্টকে?'

কোথা থেকে যে হঠাৎ আর্টিস্টের প্রশ্ন উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত আবহাওয়াটা আমূল বদলে গেল।

বুলবুল চৌধুরীর মুখের চেহারাটা যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না সেখানে।

বললে, 'আমি আসি মিসেস চোপরা, নিচেয় আমার কয়েকজন গেষ্ট এসেছে—'

মিসেস চোপরা বেশি কথার মানুষ। কথা বলতে পারলে বেঁচে যায়। একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে তার ভাল লাগে—যে শোনে, সে তার স্বামী, আর কেউ নয়। কিন্তু সে-কথা প্রতিদিন শোনবার মতো মানুষ কোথায়ই বা সে পাবে?

মিসেস চোপরা চলে যাবার পরই অল্‌কা জিজ্ঞেস করলে, 'দিদি, আর্টিস্টকে একবার দেখে আসবো?'

'কেন?'

'এমনি। অনেকদিন দেখিনি। আমার মন কেমন করছে। যাবো!'

নয়না বললে, 'না—'

'কেন! বারণ করছো কেন!'

'চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছে নয় যে, আমরা তার কাছে যাই, কি সে এখানে আসুক।'

অল্‌কা জিজ্ঞেস করলে, 'কী ক'রে বুঝলে?'

'সে আমি বুঝতে পারি—'

আবার যেন বাইরে কার পায়ের শব্দ হলো। বোধহয় চৌধুরী সাহেব আসছে। কিন্তু না, গুলাবী।

গুলাবী ঘরে এসে নয়নার জামা-কাপড় সব গুছিয়ে রাখলে।

জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার চুল বেঁধে দেবো দিদিমণি?'

নয়না বললে, 'না, থাক। চৌধুরী সাহেব কোথায়?'

গুলাবী বললে, 'নিচেয়, খানা-পিনা তৈরি হয়ে গেছে, সবাই খাচ্ছে—'

'আচ্ছা, তুই যা এখান থেকে—'

গুলাবী চলে যেতেই হঠাৎ বুলবুল চৌধুরী আবার এসে ঘরে ঢুকলো। হাতে সেই কাগজখানা। বললে, 'যে কথাটা তোমায় বলেছিলাম—সইটা ক'রে দাও, ওরা সবাই ওয়েট্ করছে—'

'ওতে, আমি সই করতে পারবো না।'

'কেন? সই করবে না কেন?'

'ও আমার বাবার দেওয়া এস্টেট, ওতে আমি হাত দিতে পারবো না।' 'হাত দিতে পারবো না মানে? এতে কি তোমার লোকসান হবে কিছু সন্দেহ করছো?'

নয়না বললে, 'তা জানি না, আমার বাবার জিনিস, আমাকে তিনি উইল ক'রে দিয়ে গেছেন ওর রাইট্‌স ভোগ করবার জন্যে। মর্টগেজ্ দেওয়ার জন্যেও নয়, বিক্রি করবার জন্যেও নয়—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'প্রপার্টি তা'হলে মানুষে কী জন্যে করে? বিপদের দিনে যাতে উপকারে লাগে, সেইজন্যেই তো? আমার বিপদের দিনেও তুমি আমাকে বাঁচাবে না?'

নয়না চুপ ক'রে রইলো।

তারপর মুখ তুলে বললে, 'আমাকে সই করতে তুমি বোলো না—'

'কিন্তু তাহ'লে কি তুমি চাও আমি বিপদে পড়ি? আর আমার বিপদ আর তোমার বিপদ কি আলাদা? আর বিপদের কথাও তো তোমার ভাবা উচিত—'

নয়না কোনও কথার উত্তর দিলে না।

বুলবুল চৌধুরী গর্জন ক'রে উঠলো।

'কী, কথা বলছো না যে?'

নয়না বললে, 'আমার সলিসিটরকে না জিজ্ঞেস ক'রে আমি সই করবো না—'

'তার মানে?'

বুলবুল চৌধুরী রাগে যেন ফুঁসতে লাগলো।

আবার বললে, 'তার মানে, তোমার সলিসিটরকেই তুমি আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করো? আমি তোমার কেউ নই? সলিসিটরই তোমার সব? আমার বিপদের কথাটা একবারও তুমি ভাববে না? আমার বিপদ কি তোমার বিপদ নয়? তুমি আমাকে এতই পর মনে করো?'

অল্‌কা যে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে-খেয়ালও যেন ছিল না বুলবুল চৌধুরীর। বুলবুল চৌধুরী কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় সমস্ত কিছু জ্ঞান যেন হারিয়ে ফেলেছে।

তখনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে বুলবুল চৌধুরী আবার বললে, 'আমার পার্টনার্সরা সবাই ওয়াট্‌ করছে তোমার সই-এর জন্যে। এখন তুমি যদি সই না করো তাহ'লে আমি তাদের মুখ দেখাবো কি ক'রে?'

নয়না বললে, 'আমি সই করতে চাইছি না সেই কথাটাই গিয়ে ওদের বলো!'

'সেটা কি আমার পক্ষে গৌরবের হবে!'

'সত্যি কথা বললে গৌরবের হবে না কেন?'

'নিজের স্ত্রী বাধ্য নয়, এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু আছে পৃথিবীতে?'

'কিন্তু আমি তো বলছি না আমি সই করবো না, আমি শুধু বলছি, আমি সলিসিটরকে জিজ্ঞেস ক'রে তবে সই করবো।'

বুলবুল চৌধুরী আবার রেগে উঠলো।

'কেবল সলিসিটর আর সলিসিটর! তুমি কি মনে করো আমি তোমায় ঠকাবো? আমি তোমার স্বামী হয়ে তোমাকে বিপদে ফেলবো? তোমার টাকা থাকলে সে তো আমারই টাকা। তোমার স্বামী হয়ে তোমাকে আমি ঠকাতে পারি? এত কি নীচ তুমি মনে করো আমাকে?'

নয়না বললে, 'দেখ, বারবার কেন তুমি আমাকে একই কথা বলছো, কিন্তু আমি সই করবো না—'

'সই করবে না! এই-ই তোমার শেষ-কথা?'

'হ্যাঁ, শেষ কথা!'

'আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো এই তোমার শেষ কথা কিনা—'

ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বুলবুল চৌধুরী। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অল্‌কা দিদির সামনে এলো।

বললে, 'তুমি যা-তা জিনিসে সই করো না দিদি! আমি বলছি তুমি সই করো না। শেষকালে কী হতে কী হবে বলা যায় না—'

নয়না চৌহান তখনও বিমূঢ় হয়ে আছে। তখনও যেন তার ঘোর কাটেনি।

অল্‌কা আবার বললে, 'দিদি, আমি আর্টিস্টের কাছে যাবো? গিয়ে সব বলবো তাকে?'

নয়না বললে, 'না, এখন নয়—'

'কিন্তু চৌধুরী সাহেব যদি খারাপ কিছু করে? যদি জোর জবরদস্তি ক'রে তোমার কাছ থেকে সই করিয়ে নেয়?'

নয়না বললে, 'না, সে কেউ পারবে না—'

'চৌধুরী সাহেব সব পারে দিদি, আমার বড ভয় করে চৌধুরী সাহেবকে।'

নয়না বললে, 'তোর কিছু ভয় নেই, আমিও কেমন মেয়ে তাই একবার দেখিয়ে দেবো?'

'কিন্তু তুমি কি ক'রে দেখাবে! তোমাকে কে সাহায্য করবে? আমাদের কে আছে?'

নয়না বললে, 'কারোর সাহায্য দরকার নেই আমার, আমি একলাই একশো! চৌধুরী সাহেব কি মনে ভেবেছে আমি মেয়েমানুষ ব'লে আমার কোনও ক্ষমতো নেই?'

অল্‌কা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কীসের ক্ষমতো? তোমার কে আছে যে তোমাকে বাঁচাবে?'

নয়না বললে, 'দ্যাখ্‌না আমি কি করি।'

'কী করবে তুমি?'

নয়না বললে, 'যা করবো তুই দেখতেই পাবি। তুই এখন যা—'

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

শিবনাথ বললে—আমি শুধু তোমাকে পয়েন্টস দিয়ে যাচ্ছি, পুরো গল্পটা লেখবার ভার তোমার ওপর। লিখতে গেলে এ-গল্প তোমার মহাভারত হয়ে যাবে। কারণ নৈনিতালে আর কাঠগুদামে গিয়ে থাকতে হবে। ওখানকার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মেশাতে হবে। এ গল্প তো শুধু গল্প নয়, এ হলো একটা সমাজের ছবি। যে-সমাজ বাইরে বড় বড় কথা বলে, যে সমাজ আমাদের মাথার ওপর রাজত্ব করে, যে-সমাজের দিকে আমবা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি—এ সেই সমাজের গল্প। এদের খবরই ইভ্‌স্‌-উইক্‌লিতে বেরোয়, এরাই ইণ্ডিয়ান; এরাই ইণ্ডিয়ার মধ্যবিত্ত সমাজের মাথার মণি। এদের জন্যেই আমরা; যারা কোর্টে মক্কেল চরিয়ে খাই—বেঁচে আছি, দু'পয়সা কামাচ্ছি।

তা এই বুলবুল চৌধুরীই বিয়ের আগে নয়না চৌহানেব চোখে অন্য মানুষ ছিল। আর বিয়ের পর অন্য মানুষ হয়ে গেল রাতারাতি। কোথায় রইলো তার লাখ-লাখ টাকার গল্প, আর কোথায় রইলো তার ভদ্রতা। সমস্ত কিছু যেন এক মুহূর্তে হাওয়া হয়ে উড়ে গেল নয়না চৌহানের চোখের সামনে।

সেদিন নয়না ঘরেই ব'সে ছিল। বিকেল হয়ে গেছে। গুলাবী চুল বেঁধে দিচ্ছিল। চুল বেঁধে দিতে দিতে বললে, 'চৌধুরী সাহেব কিন্তু খুব রেগে গেছে দিদিমণি—'

নয়না বললে, 'তা জানি—'

'চৌধুরী সাহেবকে কেন রাগিয়ে দিচ্ছেন দিদিমণি, সাহেব তো ভাল কথাই বলছে—'

নয়না এবার রেগে গেল।

'তুই চুপ করতো গুলাবী। যা জানিস্ না, তা নিয়ে কথা বলিস্ কেন! চৌধুরী সাহেব আমার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলে তা শুনেছিস্!'

গুলাবী এ-কথার উত্তর দিলে না। নিজের মনেই কাজ করতে লাগলো।

নয়না আবার বললে, 'অন্য বউ হলে এতদিন অমন আদমীর মুখে জুতো মেরে চলে যেত?'

গুলাবী বললে, 'ছিঃ দিদিমণি, নিজের আদমী সম্বন্ধে অমন কথা বলতে নেই—! আমি আপনার ভালর জন্যেই বলছি, বিপদে পড়েছে বলেই সাহেব অমন মেজাজী হয়ে উঠেছে—'

নয়না বললে, 'তা পুরুষমানুষের যদি মেজাজ থাকতে পারে তো মেয়েমানুষের বুঝি মেজাজ থাকতে নেই? মেয়েমানুষের মেজাজ থাকলে বুঝি যত দোষ!'

গুলাবী বললে, 'আমিও তো মেয়েমানুষ দিদিমণি। আমি মেয়েমানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝি বলেই বলছি—'

নয়না বললে, 'তুই আমার কষ্টটা বুঝবি কী ক'রে। তোর কি আমার মতো বিয়ে হয়েছে?'

'বিয়ে হয়নি, কিন্তু বুঝতে তো পাচ্ছি সবই—'

'কতটুকু তুই দেখতে পাচ্ছিস গুলাবী! আমার বুকের মধ্যে কী হচ্ছে তুই কি ক'রে জানতে পারবি? আর কে-ই বা কী ক'রে বুঝতে পারবে?'

হঠাৎ কী যেন একটা ঘরের ভেতর এসে পড়লো জানলা দিয়ে। কে যেন কী ছুঁড়ে দিল ঘরের ভেতর।

'কী পড়লো, দ্যাখ্ তো গুলাবী?'

জানালা দিয়েই জিনিসটা পড়েছিল ভেতরে। একটা কাগজের টুকরো। কাগজটাকে পাকিয়ে গুলি ক'রে কেউ যেন ভেতরে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

গুলাবী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে নয়নার হাতে দিতে গেল।

'কী এটা? এর ভেতরে কী আছে?'

গুলাবী দু'হাত দিয়ে কাগজের গুলিটা খুলে ফেললে। ভেতরে কিছুই নেই। কিন্তু কাগজের ওপর কী যেন লেখা রয়েছে।

গুলাবী বললে, 'কী যেন লেখা রয়েছে কাগজে—'

'কী লেখা আছে?'

'আমি কি পড়তে জানি দিদিমণি। আপনিই প'ড়ে দেখুন না'—নয়না কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলো।

গুলাবী লক্ষ্য করলে, পড়তে পড়তে নয়নার চোখ-মুখ যেন বড় তীক্ষ্ণ হ'য়ে এলো। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে নিজের পাঞ্জাবীর মধ্যে রেখে দিলে। দিয়ে জিজ্ঞেস কবলে, 'হ্যাঁরে, চৌধুরী সাহেব কোথায়?'

'চৌধুরী সাহেব তো বাড়িতেই নেই।'

'আর অল্‌কা?'

'অল্‌কা-দিদিমণিও নিজের ঘরে রয়েছে—'

নয়না বললে, 'তাহ'লে এক কাজ কর্, তাড়াতাড়ি আমায় পাঞ্জাবী-সালোয়ারটা বার ক'রে দে—'

'কেন দিদিমণি? কোথাও বেরোবে?'

'হ্যাঁ!'

'ও চিঠিতে কী লেখা আছে দিদিমণি? কে লিখেছে চিঠি?'

নয়না রেগে গেল।

'কথা বলিস্ কেন?'

বললে, 'তোর অত খবরে কী দরকার শুনি? তুই সব কথাতে—'

গুলাবী আর কথা না বলে সালোয়ার-পাঞ্জাবী বার ক'রে দিলে।

নয়না সেগুলি প'রে তৈরি হয়ে নিলে।

গুলাবী বললে, 'অল্‌কা-দিদিমণিকে ডেকে দেবো দিদিমণি?'

নয়না বললে, 'না—'

'আমি আপনার সঙ্গে যাবো?'

নয়না আবার বললে, 'না—'

'যদি অল্‌কা দিদিমণি কিছু জিজ্ঞেস ক'রে তো কী বলবো?'

'বলবি আমি এখুনি আসছি—'

গুলাবী তবু পেছন-পেছন আসতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে, 'এখন একলা-একলা কোথায় যাচ্ছেন দিদিমণি? এ-সময়ে একলা বাইরে যাওয়া কি ভালো? আমিও সঙ্গে যাই না—'

'না—তোকে আসতে হবে না—'

ব'লে সিঁড়ি দিয়ে তর্-তর্ ক'রে নিচেয় নেমে এলো।

গুলাবী পেছন থেকে বললে, 'গাড়ি তৈরি করতে বলবো?'

নয়না বললে, 'না, তাড়াতাড়ি আছে, আমার দেরি হয়ে যাবে—'

'চৌধুরী-সাহেব এসে পড়লে কী বলবো?'

'কিছু বলতে হবে না, বলবি আমি এখুনি ফিরে আসছি—'

ব'লে গেট্‌ পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো নয়না চৌহান।
এতটুকু দেরি হলে যেন তার মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে—

একদিন কবে একটি প্রীতিময়ী মেয়ে ইণ্ডিয়ার এক বর্ধিত জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিল অত্যন্ত আরাম আর বিলাসের মধ্যে—তার পা-টেপা, চুল-বাঁধা, ঘুম-পাড়ানোর জন্যে ঝি-আয়া-দাস-দাসী সব সময় মজুত থাকতো, সেই মেয়েটিকেই আবার একদিন আত্মরক্ষার জন্যে এমন ক'রে সতর্ক-সাবধান হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাতে হবে তাই-বা কে কল্পনা করতে পেরেছিল। কে ভাবতে পেরেছিল তার পনেরো লাখ টাকা আয়েব প্রপার্টিই একদিন তাব কাল হবে? আত্মা চৌহানের এত যত্নে উপার্জন-করা প্রপার্টিই একদিন তার মেয়ে নয়না চৌহানেব অপঘাতের প্রধান কারণ হয়ে উঠবে।

যার কেউ নেই, তাকে নিজেকেই নিজের ভার নিতে হয়। সংসারে বোধহয় হেবে যাওযাব মতো অপমান আর নেই। আর যদি হেরেই যেতে হয়, তো শেষ পর্যন্ত লড়াই কবেই হাববো। তুমি আমার ক্ষতি কববার চেষ্টা করো, আমি তোমায় বাধা দেবো—তোমাকে আঘাত করবো। নিজের ক্ষতির কথা না-ভেবেই আঘাত করবো। আর ক্ষতি করবার ক্ষমতোই বা তোমাব কতটুকু, যদি আমি আমার নিজের ক্ষতি না করি?

ক'দিন ধবেই নয়না চৌহান ভাবছিল এর থেকে তার মুক্তি কোথায়? কেমন ক'বে সে নিজের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে। কেমন ক'রে এই ষড়যন্ত্র থেকে বেহাই পাবে!

ঠিক যে-জায়গাটার কথা চিঠিতে লেখা ছিল, সেই জাযগাটায এসে দাঁড়ালো নয়না।

অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে এসেছে চারিদিক। ভাল ক'রে রাস্তা দেখা যায় না। এ-রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করেই এসেছে বরাবর।

কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতেই ভয় ভয় করতে লাগলো। কোথাও কেউ নেই। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন অসাড় হ'য়ে পড়ে আছে। একটা ছোট ঝিঁ ঝিঁ পোকাও যেন ডাকতে ভয পাচ্ছে। যেন সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে নয়নার জন্যে। অস্থির হয়ে আছে। স্তম্ভিত হয়ে আছে।

জায়গাটার কাছাকাছি আসতেই চারিদিকে চেয়ে দেখলো নয়না।

কই? কোথায় সে? কতক্ষণ পরে আসবে?

হঠাৎ মনে হলো, একটা মোটা গাছের আড়ালে যেন কাকে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

আর্টিস্ট।

আর্টিস্টের শরীরের একটা অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে, হয়তো কেউ দেখে ফেলবে ব'লে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে।

কাছে গিয়ে ডাকলো, 'আর্টিস্ট—'

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূত দেখলে নয়না। দু-হাত পেছিয়ে এলো।

'তুমি?'

বুলবুল চৌধুরী টপ ক'রে নয়নার হাতটা জোরে ধ'রে ফেলেছে।

'কোথায় আর্টিস্ট? কোথায় সে? কখন আসবে?'

নয়নার সমস্ত মুখ-চোখ-নাক নীল হয়ে এসেছে ভয়ে। এমন ক'রে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে এ-ভাবে এখানে দেখা হয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি সে।

'কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো এখানে, বলো?'

'কারো সঙ্গে নয়।'

'তুমি আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা ক'রতেই এসেছিলে তো?'

নয়না চম্‌কে উঠলো।

'ভয় পেয়ো না, সত্যি কথা বলো।'

'নয়না বললে, না।'

'আবার মিথ্যে কথা। লজ্জা করে না তোমার মিথ্যে কথা ব'লতে?'

নয়না বললে, 'না, আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি এখানে। আমাকে বিশ্বাস করো!'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'তাহ'লে নিজের কানকেও অবিশ্বাস করতে বলো?'

এরপর নয়নার আর কোনও কথা বলবার নেই।

'উত্তর দিচ্ছো না কেন? জবাব দাও? এত অধঃপতন তোমার? এত নিচে নেমেছো তুমি? লুকিয়ে দেখা করতে এসেছো বলেই বুঝি অল্‌কাকেও সঙ্গে আনোনি, গাড়িটাও নিয়ে আসোনি?'

'না, বিশ্বাস করো, আমি আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।'

'তবে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো লুকিয়ে লুকিয়ে?'

নয়না মাথা তুলে দাঁড়ালো।

'না, লুকিয়ে লুকিয়ে আসিনি।'

'লুকিয়ে আসোনি তো আমাকে দেখে চম্‌কে উঠেছিলে কেন?'

নয়না বললে, 'তুমি যে আমার পেছনে পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে আসবে তা কল্পনাও করতে পারিনি বলেই চম্‌কে উঠেছিলাম। কিন্তু এবার আমি সামলে নিয়েছি। ভেবেছো, তোমাকে দেখে আমি ভয় পাচ্ছি, তা মনে কোরো না। তোমাকে যদি আমি ভয়ই পেতাম তো আজ তুমি আমার সামনে এমন কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে না।'

'তার মানে?'

'তার মানে ব'লে আর তোমাকে আমি অপমান করতে চাই না—।'

'কেন?'

'আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি বলেই অপমান করতে চাই না। যে নীচ তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি!'

বুলবুল চৌধুরী হঠাৎ নয়নার হাতটা ধ'রে ফেললে!

বললে, 'তুমি যে দেখছি মানুষের সম্মান রেখে কথা বলতেও ভুলে গেছো!'

নয়না তাড়াতাড়ি নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গর্জে উঠলো—'তা তুমি কি মানুষ? তুমি নিজেকে মানুষ বলেই মনে করো নাকি?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না৷

'তা বাড়াবাড়ি করবে বলেই তো চোরের মতোন লুকিয়ে আমার পেছনে পেছনে এসেছো।'

'না, আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম কার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তুমি এখানে আসছো। কে তোমার মনের মানুষ!'

আর দেরী হলো না। সঙ্গে সঙ্গে নয়না বুলবুল চৌধুরীর গালে এক চড় মেরেছে।

'অভদ্র, ইতোর কোথাকার!'

বুলবুল চৌধুরীও সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ নয়। সঙ্গে সঙ্গে সেও নয়নার হাতটা আবার ধ'রে ফেলেছে।

নয়না হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বুলবুল চৌধুরীর হাতের জোর আরো অনেক বেশি। টানাটানিতে নয়না বোধহয় পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি, ছেড়ে দাও আমাকে—'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'না কে তোমাকে চিঠি লিখেছিল আমাকে আগে বলো।'

'তোমাকে যদি বলবো তাহ'লে কেন এখানে এসেছি?'

'তাহ'লে বলবে না তুমি?'

'না!'

বুলবুল চৌধুরীর ভদ্রতার খোলস তখন খুলে গেছে। হঠাৎ নয়নার পাঞ্জাবীব ভেতরে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নয়না নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করলে। কিন্তু বুলবুল চৌধুরীর হাতের মুঠোর মধ্যে তখন চিঠিটা উঠে এসেছে! নয়না চিঠিটা কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু বুলবুল চৌধুরী তাকে এড়িয়ে সেটা দূরে সরিয়ে ফেলে পড়বার চেষ্টা করছে।

নয়না চিৎকাব করে উঠলো, 'দাও, আমার চিঠি দাও। আমাকে দাও—'

অন্ধকারে চিঠিটা ভাল পড়া গেল না। পকেট থেকে টর্চ বার ক'রে ততক্ষণে দেখে নিয়েছে বুলবুল চৌধুরী। তখন আর সহ্য হলো না। নিচেয় নাম সই রয়েছে জান্‌কীর।

পড়তে পড়তেই বুলবুল চৌধুরীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো—'এত দূর গড়িয়েছে?'

নয়না বললে, 'জেনেই যখন গিয়েছো তখন বলি, তোমার অত্যাচার আমি আর সহ্য কববো না, তুমি আমাকে খুন ক'রে ফেললেও সহ্য করবো না—'

'যতক্ষণ ওই কাগজটায় সই না দেবে ততক্ষণ সহ্য কবতেই হবে!'

'এর পরেও তোমার ওই কথা বলতে সাহস হয়?'

বুলবুল চৌধুরী ব'লে উঠলো, 'আমার সাহসের তুমি আর কতটুকু দেখলে? যদি আরো দেখতে চাও তো তাও দেখাতে পারি—তুমি এখন বাড়ি যাও, এখন আমি দেখবো ও-মেয়েটার এত সাহস কোত্থেকে এলো!'

'ঠিক ক'রে বল তো ও-মেয়েটি কে? কেন ওকে আট্‌কে রেখেছো পাগলা-গারদে?'

'আমি কোনও কথার জবাব দেবো না। তুমি এখান থেকে যাবে কি-না আগে বলো!'

'আমি যাবো না।'

'যাবে না?'

'তুমি কি মনে করো, মাথার ওপর ভগবান ব'লে কেউ নেই? তুমি একটার পর একটা অপরাধ ক'রে যাবে আর তার শাস্তি পাবে না?'

ভগবানের কথাটা শুনেই বুলবুল চৌধুরী হেসে উঠলো।

'ভগবান কি শুধু একলা তোমার সম্পত্তি? আমার ভগবান নেই? ভগবান কি একলা তোমার ভালটাই দেখবে, আমার স্বার্থটা দেখবে না?'

'ভগবানের নাম করতে তোমার লজ্জা করে না?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'দেখ এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে কথা শোনবার সময় আমার নেই, তুমি যাবে কিনা তাই বলো আগে—'

'যদি বলি যাবো না. তো তুমি কী করবে আমার?'

'দেখবে কী করবো?'

'হ্যাঁ, দেখি না—'

বুলবুল চৌধুরী নয়নার ঘাড়টা ধরতেই নয়না আর দাঁড়ালো না। সোজা দৌড়তে দৌড়তে ছুটলো বাড়ির দিকে।

যাবার আগে ব'লে গেল—'আচ্ছা, আমি এর প্রতিশোধ কেমন ক'রে নিতে হয় দেখাচ্ছি—'

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

শিবনাথ বলতে লাগলো—প্রোসিকিউশনের কেস্‌টা এই এভিডেন্সে অনেকটা সুবিধে হয়ে গেল। প্রোসিকিউশন প্রমাণ ক'রে দিল যে, আসামী ফরিয়াদীর উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে। অল্‌কা চৌহানই তার সাক্ষ্য দিলে। মর্টগেজের পেপারের ওপর নয়না চৌহান সই করেনি ব'লে আসামী খুবই অত্যাচার করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কেস্‌ অনেক স্ট্রং হয়ে গেল নয়না চৌহানের পক্ষে। কিন্তু মুশকিল করলে নয়না চৌহান নিজেই।

বললাম—কেন?

—নয়না চৌহানই যে ভাল ক'রে বলতে পারলে না কী ঘটেছিল সেই রাত্তিরে। তার যে তখন কিছুই মনে ছিল না। কী বলতে কী বলে গেল, তাতেই কেস আসামীর ফেভারে চলে গেল।

—কী ক'রে?

শিবনাথ বললে—সেই কথাই তো তোমাকে বলছি। বুলবুল চৌধুরী কি সোজা লোক? সব আট-ঘাট বেঁধে কাজ করেছে সে। যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে। সেই সন্ধ্যেবেলা যখন নয়না চৌহান বাড়ি ফিরে গেল দৌড়তে দৌড়তে তখন বুলবুল চৌধুরী চুপ ক'বে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যেন কেউ দেখতে না পায়। হঠাৎ খানিক পরেই মনে হলো যেন জান্‌কী আসছে। এতদিন যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আজ এতদিন পবে তাকে ধরবার সুযোগ এসেছে। চিঠিটাতে লেখা আছে, ঠিক এই পাহাড়টার তলায় এসে নয়না চৌহানের সঙ্গে দেখা করবে!

বুলবুল চৌধুরী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো গাছটার আড়ালে।

জান্‌কী আসছে, আরো কাছে এলো। কিন্তু হঠাৎ তার কী যেন সন্দেহ হয়েছে। হয়তো বুলবুল চৌধুরীকে দেখতে পেয়েছে। নইলে অমন ক'রে হঠাৎ পালাতে যাবে কেন?

বুলবুল চৌধুরী আর দেরি করলে না। পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো জান্‌কীর ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে জান্‌কী চিৎকার ক'রে উঠেছে।

'এবার।'

জান্‌কীও চিৎকাব ক'রে উঠেছে, 'ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো—'

'আবার এখানে এসেছিস্‌? একবার যখন ধরেছি তোকে তখন আর ছাড়ি? বল্‌ তুই কেন এসেছিস্‌—'

'ছাড়ো বলছি, নইলে আমি সব বলে দেবো!'

'পাগলের কথা কে বিশ্বাস করবে? তুই তো পাগল।'

'আমি যদি পাগল হই তো তুমিও পাগল!'

'তোর মা জানে তুই পাগল কি-না। লোকে তোর কথা বিশ্বাস করবে, না তোর মা'র কথা বিশ্বাস করবে। পুলিশের কাছে গেলে তারা তোকেই ধ'রে পাগলা-গারদে পুরে দেবে। কেন পালিয়ে এসেছিস, বল। কেন আমার সর্বনাশ করতে এসেছিস?'

'আমাকে ছাড়ো তুমি। নইলে আমি সকলকে ব'লে দেবো।'

'তোর কথা কে বিশ্বাস করবে?'

'নয়না চৌহান বিশ্বাস করবে। নয়না চৌহানকে বলবার জন্যেই তো আমি এসেছি। তোমার সর্বনাশ করবার জন্যেই তো এসেছি। আমি না হয় পাগল, কিন্তু নয়না চৌহানের কথা তো পুলিশে বিশ্বাস করবে। তাকে তো আর লোকে পাগল বলবে না—'

'নয়না চৌহানও আর বেশিদিন নয়—'

'তুমি তাকেও পাগল তৈরি করবে?'

'আমার পথে যে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো। আমাকে এখনও চিনিস নি তুই?'

'খুব চিনেছি। চিনেছি বলেই তো আমার এ দুর্দশা!'

'দুর্দশার তো এখনও অনেক বাকি। দুর্দশার হয়েছে কী!'

'কিন্তু মনে ভেবেছো কেউ তোমায় ধরতে পারবে না?'

'কেউ তো এতদিনেও ধরতে পারলে না। তুই তো ধরতে পারতিস, কিন্তু তোর কথা কে বিশ্বাস করবে?'

'কিন্তু আমি ছাড়া কি আর কেউ নেই ভেবেছো? একদিন আসবেই, যেদিন তোমাকে এর জবাবদিহি করতে হবে, যেদিন সবাই জানতে পারবে তুমি বুলবুল চৌধুরী নও...'

সঙ্গে সঙ্গে জান্‌কীর মুখটা চেপে ধরেছে বুলবুল চৌধুরী। দু'হাতের পাতা দিয়ে চেপে ধরতেই জান্‌কীর হাত-দুটো কেমন যেন অবশ হয়ে এলো...যেন চিৎকার করবার, ছাড়িয়ে পালাবার ক্ষমতোটুকুও লোপ পেয়ে গেল।

অল্‌কা দিদির ঘরে এসে দেখে ঘর ফাঁকা। আবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো। এত বড় বাড়িতে একলা থাকতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

সামনে গুলাবী যাচ্ছিল। দিদিমণির জন্যে রান্নার তদারক করতে গিয়েছিল নিচেয়। নয়না চৌহানের দেখা-শোনা করার কাজেই সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। নয়না চৌহানের ঘুম থেকে ওঠার সময় থেকে শুরু করে রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার সময়টুকু পর্যন্ত।

অল্‌কা জিজ্ঞেস করলে, 'দিদি কোথায় গেছে রে গুলাবী?'

'বেড়াতে গেছে।'

'একলা বেড়াতে গেল কেন হঠাৎ? আমাকে তো কিছু ব'লে গেল না?'

গুলাবী বললে, 'আমাকে ব'লে গেছে এখুনি আসবে—'

'কখন গেছে?'

'সন্ধ্যা ছ'টার সময়!'

'এত রাত্রে কোথায় বেড়াচ্ছে?'

'তা তো জানি না। যাবার সময় ব'লে গেছে কেউ জিজ্ঞেস কবলে বলবি এখুনি আসবে—'

অল্‌কা বললে, 'তাহ'লে আমি গিয়ে দেখছি কোথায় গেছে বেড়াতে—'

'কিন্তু এই অন্ধকারে একলা কোথায় যাবে তুমি!'

অল্‌কা বললে, 'কিন্তু আমার যে ভয় করছে, দিদি তো কখনও একলা-একলা বাইরে যায় না? গাড়ি নিয়ে গেছে?'

'না!'

'তাহ'লে এতক্ষণ হয়ে গেল, এখনও আসছে না কেন? তুই কিছু ভাবছিস না?'

'আমি কী ভাববো? আমি তো হুকুমের বাঁদী খুকু-দিদিমণি, আমাকে যা বলবে আমি তাই করবো।'

অল্‌কা বললে, 'তাহ'লে আমার সঙ্গে চল তুই, দেখে আসি দিদি কোথায় গেল?'

'চলো!'

গুলাবীর হুকুম তামিল করাই কাজ। এক কথাতেই সে রাজী হয়ে গেল।'

'তাহ'লে তোমার সোয়েটারটা প'রে এসো খুকু-দিদিমণি, ঠাণ্ডা লাগবে যে।'

'অল্‌কা চলে যেতেই হঠাৎ নয়না চৌহান ছুটতে ছুটতে এসে বাড়িতে ঢুকেছে। চিৎকার করে উঠেছে, গুলাবী—'

গুলাবী এগিয়ে এসে বললে, 'কী দিদিমণি? কী হয়েছে?'

'অল্‌কা কোথায়?'

'ওই তো, নিজের ঘরে রয়েছে!'

'অল্‌কাকে ডাক, তুই তৈরি হয়ে নে। আমরা এখুনি পালাবো এখান থেকে।'

'কোথায় পালাবে?'

'যেখানে দু'চোখ যায় পালাবো। চৌধুরী সাহেব আসবে। চৌধুরী সাহেব আসবার আগেই পালাতে হবে, শিগগির কর—'

'কী বলছো দিদিমণি, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি। অল্‌কা দিদিমণিরও খাওয়া হয়নি—'

কিন্তু তখন আর অত কথা বলবার সময়ই ছিল না নয়না চৌহানের। নয়না চৌহান ছুটতে ছুটতে অল্‌কার ঘবের দিকে গেল। ডাকলে, 'অল্‌কা অল্‌কা—'

অল্‌কা দিদির আওয়াজে ভয় পেয়ে বাইরে এসেই অবাক হয়ে গেল।

'একি দিদি, কি হয়েছে?'

'এক্ষুণি পালাতে হবে এখান থেকে। এক্ষুণি। আর এক মিনিটও দেরি করা চলবে না। চল্‌, গুলাবীকে বলেছি। চল্‌ পালিয়ে যাই—'

'কেন দিদি? কী হলো?'

'সব কথা পরে বলবো, অত কথা বলবার সময় নেই এখন। আয়, চলে আয়—'

'কিন্তু কুর্তা-পাঞ্জাবী-সালোয়ার কিছু নেবে না?'

'সব প'ড়ে থাক, শিগগির চলে আয়, দেরী হলে চৌধুরী সাহেব আর যেতে দেবে না, খুন ক'রে ফেলবে আমাদের—'

'বলছো কি তুমি?'

নয়না চৌহান অল্‌কার হাত ধ'রে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামাতে লাগলো।

গুলাবী হতভম্ব হয়ে গেছে।

বললে, 'চৌধুরী সাহেব যদি এসে আমাদের খোঁজে?'

'সেসব ভাববার সময় নেই এখন!'

নিচেয় চাকর-ঝি সবাই অবাক হয়ে গেছে। তারা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল।

'কোথায় যাচ্ছো বিবিজী?'

সে-কথায় আর কী জবাব দেবে?

আগে-আগে নয়না তার পেছনে অল্‌কা। আর তার পেছনে গুলাবী!

কিন্তু গেট পর্যন্ত যেতে হলো না। বুলবুল চৌধুরী ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'কোথায় যাচ্ছো সবাই?'

নয়না পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো সামনে। অল্‌কাও দাঁড়িয়ে পড়লো। গুলাবীও পেছনে দাঁড়িয়ে।

'চলো, ফিরে চলো।'

নয়না তবু কিছু উত্তর দিলে না।

'এখান থেকে বাইরে গিয়েই কি রেহাই পাবে ভেবেছো?'

নয়না সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে, 'পথ ছাড়ো, রাস্তা দাও।'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'চেঁচামেচি করো না, তাতে তোমাদেরই বিপদ হবে—'

নয়না বললে, 'তুমি রাস্তা ছাড়বে কি না বলো?'

এতক্ষণ যদিই বা বুলবুল চৌধুরী একটু ভদ্রতা রক্ষা ক'রে চলছিল, এবার সেটুকুও আর রইলো না। হঠাৎ যেন তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো।

বললে, 'চলো তুমি ভেতরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে—'

বলতে গেলে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নয়নাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

গুলাবীও পেছনে পেছনে গেল। অল্‌কাও পেছনে পেছনে। যেন সমস্ত বাড়িটা স্তম্ভিত-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নয়নাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলে বুলবুল চৌধুরী।

ভেতর থেকে চিৎকার ক'রে উঠলো নয়না—'খোলো, দরজা খুলে দাও—দরজা খোলো।'

দুম্ দুম্ আওয়াজ ক'রে নয়না ভেতর থেকে দরজায় কিল মারছে—

বাইরে বুলবুল চৌধুরী তাকে লক্ষ্য ক'বে বললে, 'এর শাস্তি তোমায় ভোগ করতেই হবে, আমি দেখাচ্ছি তোমাকে—'

—তাবপব?

শিবনাথ বললে—অল্‌কা চৌহান এই জায়গাটা কোর্টে বলতে উঠে দাঁড়িযে কেঁদে ফেলেছিল। চোখের সামনে তার দিদিকে অত্যাচার কবছে দেখেও সে কিছু করতে পাবলে না। তার মনে হলো, এতদিন যে-ভয়ের কথা তার মনে উদয় হয়েছিল তা বুঝি সত্য হতে শুরু করেছে। ওদিকে ঘরের মধ্যে দিদির চিৎকাব, আর বাইরে বুলবুল চৌধরীর গর্জন, এই আবহাওয়ায় সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। সেখান থেকে স'রে গিয়ে ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখতে লাগলো।

গুলাবী তখনও দাঁডিয়ে আছে।

বুলবুল চৌধুরী তার কাছে স'রে এলো।

গুলাবী বললে, 'এত তাডাহুড়ো করছো কেন?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'আর যে সময় নেই—'

'কেন? সময় নেই কেন?'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'জান্‌কীকে ধ'রে ফেলেছি, সে এসেছিল নয়না চৌহানের সঙ্গে দেখা করতে—'

'কেউ দেখতে পায়নি তো?'

বুলবুল চৌধুরী গলা নিচু করে বললে, 'না—'

গুলাবীর কথাবার্তা আর ব্যবহারে অবাক লেগে গেল অল্কার। এমন ক'রে কেন গুলাবী কথা বলছে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে। যে তার দিদির উপর অত্যাচার করছে, তার সঙ্গে এত ভাল ক'রে কথা বলছে কেন?

'কোথায় সে? কোথায় তাকে রেখে এলে?'

'বাইরে, সেই পাহাড়ের কাছে—'

'তাহ'লে আগে আর এক কাজ করো—'

'কী কাজ!'

'সমস্ত চাকর-ঝি যারা বাড়িতে আছে, তারা আগে ঘুমিয়ে পড়ুক!'

'কেন! কী জন্যে বলছো!'

'সব কাজে তুমি বড় তাড়াহুড়ো করো কেন; ধীরে-সুস্থে মাথা ঠিক রেখে এসব কাজ না করলে পরে যে বিপদ হবে।'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'কিন্তু তুমি যেমনভাবে বলেছিলে তেমনি ভাবেই তো করছি—'

গুলাবী বললে, 'আমি তোমাকে বারবার বলছি, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকতে, তা পারো না কেন!'

বুলবুল চৌধুরী বললে, 'কিন্তু আর যে দেরি সইছে না, ক্রেডিটাররা যে বড় জোর তাগাদা দিচ্ছে—আমি যে তাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি—'

'আবার তুমি চেঁচাচ্ছো! চুপিচুপি কথা বলো না! এইবার একজন ডাক্তার ডাকতে হবে, একটু বেশি রাত না হলে সমস্ত জানাজানি হয়ে যাবে—'

তারপর দু'জনে গলা নিচু ক'রে কী-সব পরামর্শ করতে লাগলো। অল্কা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অত আস্তে কথা শোনা গেল না। তারপর হঠাৎ দুজনে উঠলো। উঠে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে নিচেয় নামতে লাগলো।

অল্কার মনে হলো এই-ই সুযোগ। এই সুযোগে সে দিদির ঘরের শিকলটা খুলে দিয়ে দিদিকে বার ক'রে আনতে পারে।

দিদি তখনও ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করছে—'দরজা খোলো, দরজা খুলে দাও—'

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কেউ সে-কথায় কান দিচ্ছে না। দিদি চেঁচিয়েই যাচ্ছে—

হঠাৎ দিদি চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো, 'অল্কা, অল্কা—আমাকে ঘরের ভেতরে আটকে রেখেছে রে, আমাকে খুন ক'রে ফেলবে এরা—অল্কা, অল্কা—'

বুলবুল চৌধুরী আর গুলাবী নিচেয় বসেছিল, এই কথা শুনেই বোধহয় আবার তারা ওপরে উঠে এলো।

বুলবুল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলো, 'অল্কা কোথায়? সে কি ঘরেই আছে?'

এতক্ষণ যেন তার কথা মনেই ছিল না বুলবুল চৌধুরীর।

গুলাবী বললে, 'দেখি, কোথায় গেল সে—'

ব'লে দু'জনেই আবার মোড়ে ঘুরলো। বারান্দা পেরিয়ে অল্কার ঘরের দিকে গেল।

অল্কার বুকটা এতক্ষণে দুর-দুর করে উঠলো। এবার তাকেই খুঁজতে গেছে দু'জনে। অল্কা আস্তে আস্তে টিপি টিপি পায়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। তারপর একতলায় নেমে অন্ধকারের মধ্যে বাগান পেরিয়ে সদর গেট ছাড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলো অন্ধকারের মধ্যে। তখন আর কোন দিকে খেয়াল নেই। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে তারও যেন দিদির মতো অবস্থা হবে।

দৌড়তে দৌড়তে সোজা গিয়ে হাজির পাশের বাড়িতে। পাশের বাড়িটাও কাছে নয়। বিরাট একটা কম্পাউণ্ড-ঘেরা বাগান। মিসেস চোপরার বাড়ি। আশে-পাশে কাউকে জিজ্ঞেস করবার

মতো লোকও কেউ নেই। ঠাণ্ডায় সবাই দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে ভেতরে শুয়ে পড়েছে। সমস্ত বাড়িটাই প্রায় অন্ধকার। কাকে জিজ্ঞেস করবে—আর্টিস্ট আনন্দ মিশ্র কোন্ ঘরে থাকে? আর এতদিন আর্টিস্ট এখানে আছে কি না তাই-ই বা কে বলবে?

হঠাৎ একটা পাশের দিকের ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে মনে হলো। কেউ নিশ্চয় জেগে আছে ওখানে। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যাবে আর্টিস্ট বাড়িতে আছে কিনা!

জানলার বাইরে থেকে ঘা দিতে লাগলো অল্‌কা।

ভেতর থেকে কে যেন উত্তর দিলে, 'কে?'

আর তারপরেই জানলার পাল্লা দুটো খুলে গেল। খুলে যেতেই আর্টিস্ট মুখ বাড়িয়েছে বাইরের দিকে।

'কে?'

'আমি আর্টিস্ট, আমি। আমি অল্‌কা।'

শিবনাথ বললে—এখান থেকেই কেসটা অন্য দিকে মোড ঘুরলো। এর পর থেকেই চৌধুরী-লজে যে কি ঘটলো কেউ জানে না। অল্‌কাও নেই।

অলকা নিজেই বললে, 'আমি সেদিন রাত্তিরে ও-বাড়ি থেকে পালিযে গিযেছিলাম ব'লে বেঁচে গিয়েছিলাম। নইলে আমাকেও ওরা খুন ক'রে ফেলতো, আমি আর্টিস্টকে নিযে তার পরদিন ভোরবেলাই চলে গেলাম নৈনিতালে আমার কাকার কাছে। আর কোথায়ই বা যাবার জায়গা আছে আমার। আর্টিস্ট আমাকে নিয়ে গিযে কাকার কাছে পৌছিযে দিলে!

কাকা জিজ্ঞেস করলে, 'আবার কেন ফিরে এলি?'

আমি সব বললাম। যা কিছু দেখেছি, সমস্তই খুলে বললাম। কিন্তু অদ্ভুত মানুষ ওই চৌহানজী!

কাকা শুনে বললে, 'দূর পাগলী, এ-রকম ঝগড়া তো সব বাড়িতেই হয। স্বামী-স্ত্রীতে ও-রকম ঝগড়া হয়েই থাকে, ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? ওই জন্যে তো আমি বিয়েই করলাম না সারাজীবন—'

আনন্দ বললে, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয় কিছু বিপদ হয়েছে—মনে হচ্ছে এর পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে—'

'তোমার সব জিনিসের মধ্যে কেবল ষড়যন্ত্র দেখ। সব জিনিস সহজ ক'রে নিতে পারো না?'

'তাহ'লে অল্‌কাকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন না, গুলাবী তো নযনার আয়া ছিল, সে কেন বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে অমন নিচু গলায় কথা বলছিল? সে বুলবুল চৌধুরীকে বাধা দিতে পারলে না?'

কাকা বললে, 'সে মেয়ে মানুষ, সে কী ক'রে বাধা দেবে? তার অত সাহস কী করে হবে? মেয়ে মানুষের কখনও সাহস থাকে। তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?'

দু'জনে মিলে সেদিন কিছুতেই কিছু বোঝানো গেল না আশীষ চৌহানকে।

সমস্ত দিনটা কেমন ক'রে কাটলো, তা আর মনে ছিল না আর্টিস্টের। এখানে না এসে সোজা বুলবুল চৌধুরীর বাড়িতে গেলেই পারতো, গিয়ে জানতে চাইতে পারতো নয়না কোথায়।

কিন্তু অল্‌কার কথা ভেবেই বোধহয় এখানে চলে এসেছিল। নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আবার তার নয়নার বাড়িতেই যাওয়া উচিত। ফিরে গিয়ে সোজা আনন্দ সেই বুলবুল চৌধুরীর বাড়িতেই যাবে। শুধু যাবে নয়, যেমন ক'রে পারে নয়নার সঙ্গে দেখাও করবে।

আর্টিস্ট বললে, 'তুমি এখানে নিশ্চিন্তে থাকো, আমি তোমার দিদিকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবো—'

'কিন্তু ওরা যদি দিদিকে এখানে আসতে না দেয়?'

আর্টিস্ট বললে, 'তার ব্যবস্থাও আমি করবো, আমি পুলিশের হেল্‌প নেবো।'

'কিন্তু দিদিকে এই অবস্থায় একলা ছেড়ে এসে আমার ভয় করছে।'

আর্টিস্ট বললে, 'ভয় কী? আমি তো আছি, আমি তোমার দিদিকে নিয়ে কালই চলে আসবো—'

'কিন্তু তুমি যাবার আগেই যদি কিছু বিপদ ঘটে যায়?'

আর্টিস্ট বললে, 'অত ভয় করলে কি চলে? বুলবুল চৌধুরী যতবড় পাষণ্ডই হোক, তারও তো প্রাণের ভয় আছে। যারা যত বদ্‌মাইস লোক তারা তত ভীরু। যখনই জানতে পারবে তুমি বাড়িতে নেই, বাড়ি থেকে তুমি পালিয়ে গিয়েছো, তখনই তারা ভয় পেয়ে যাবে। তখনই আর কিছু সাহস করবে না। তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি সহ্য ক'রে থাকো—'

অল্‌কা বললে, 'গুলাবী যে এর মধ্যে আছে, আমি তো একবারও সন্দেহ করতে পারিনি—'

দুপুরবেলায় সব বন্দোবস্ত ক'রে আনন্দ বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির। আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম। আশীষ চৌহানের নামে। পাঠিয়েছে বুলবুল চৌধুরী! দু'লাইনের মধ্যে তাতে লেখা আছে—দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, নয়না চৌধুরী হঠাৎ কাল রাত্রে অসুস্থ হয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। পরে চিঠি লিখছি—

ইতি—বুলবুল চৌধুরী।

মিসেস চোপরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেনই বা আর্টিস্ট চলে গিয়েছিল, আবার কেনই বা হঠাৎ ফিরে এলো। যাবার সময় খবর দিয়েও যায়নি আনন্দ। খবর দেবার তখন সময়ই ছিল না তার। সত্যিই অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তখন মিস্টার চোপরা ও মিসেস চোপরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। অথচ অপেক্ষা করবার সময়ও নেই তখন তাদের। অল্‌কা একটা বাড়তি জামাও আনেনি সঙ্গে ক'রে। যেমন ভাবে ছিল সেইভাবেই চলে এসেছিল।

পরদিন সকালবেলা চাকরদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে মিসেস চোপরা, 'আর্টিস্ট কখন্‌ গেল?'

কখন্‌ গেল তাও কেউ জানে না। জানে শুধু এক দারোয়ান। মিস্টার চোপরার বাড়িতে সে বহুদিন চাকরি করছে।

সে বললে, 'হুজুর; আমি তখন গেট বন্ধ ক'রে দিয়েছি, তখন সাহেব আমাকে গেট খুলে দিতে বললে—তখন অনেক রাত—'

এমন ক'রে হঠাৎ চলে যাওয়ায় রহস্যটা কিছুতেই বুঝতে পারেনি সেদিন মিসেস চোপরা। তবে তাদের বাড়িতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল? কোনও কষ্ট? অথচ একদিনও তো মুখ ফুটে কিছু বলেনি আর্টিস্ট। মিসেস চোপরার ছবিটাও তখনও শেষ হয়নি। অমন সাধের ছবিটা কি ওই রকমই প'ড়ে থাকবে নাকি?

কিন্তু হঠাৎ সেদিন সকালবেলা আবার আর্টিস্টকে দেখে অবাক হয়ে গেছে মিসেস চোপরা।

'এ কি! কোথায় ছিলেন আপনি? এ-রকম চেহারা হলো কেন?'

আনন্দর চেহারাটা সত্যিই দুদিনে যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।
'আমি ভাবলাম আমাদের এখানে বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছিল আপনার, তাই চলে গেছেন। মিস্টার চোপরা আর আমি দুজনেই ভেবে-ভেবে অস্থির। তা কোথায় ছিলেন এই দুদিন?'
আনন্দ বললে, 'আমি নৈনিতাল গিয়েছিলাম—'
'হঠাৎ আবার নৈনিতাল যেতে গেলেন কেন? কোনও কাজ ছিল নাকি?'
আনন্দর মুখটা অন্যদিনের চেয়ে আরো গম্ভীর-গম্ভীর।
মিসেস চোপবা জিজ্ঞেস করলে, 'কী হলো বলুন তো আপনার?'
'না, কিছু হয়নি।'
আর্টিস্ট নিজের ঘরে জিনিসপত্রগুলো গুছোচ্ছিল। খানিক পরে বললে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস চোপরা, আমি আপনার ছবি এখন শেষ করতে পারবো না—'
'সে কী? আমি তাহ'লে কী করবো?'
আনন্দ বললে, 'আমার মনটা তেমন ভাল নেই, ছবি আঁকতে মন বসছে না—'
'সত্যি, আপনার কী হ'ল বলুন তো?'
'বিশ্বাস করুন, আমার মন ভাল নেই, আমার মনটা বড় খারাপ লাগছে—'
'কিন্তু এতদিন তো বেশ ছিল, এখন হঠাৎ এমন হলোই বা কেন?' সত্যিই মিসেস চোপরার মনটাও যেন খারাপ হয়ে গেছে কথাটা শুনে। কত সাধ ছিল তার ছবিটা সকলের কাছে দেখিয়ে বাহাদুরী নেবে। সব ব্যর্থ হয়ে গেল।
'সত্যিই বলুন না, কী হয়েছে আপনার? আপনি যদি বলেন আরও টাকা আপনার দরকার তাহ'লে তাও মিস্টার চোপরাকে বলতে পারি—'
আনন্দ বললে, 'না মিসেস চোপরা, তা যদি হতো তাহ'লে আমি তা খুলেই বলতাম—'
'তাহ'লে এখন কী হবে?'
আনন্দ বললে, 'আমি কিছুদিন বাইরে যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে এসে আবার আঁকতে শুরু করবো, আপনি কিছু ভাববেন না—'
হঠাৎ যেন মিসেস চোপরার একটা কথা মনে প'ড়ে গেছে এমনি ভাবে বললে, 'এদিকে একটা বিপদ হয়েছে শুনেছেন?'
'কী বিপদ?'
'সেই যে আপনি যার ছবি এঁকেছিলেন? মনে আছে? সেই মিসেস চৌধুরী? তিনি হঠাৎ মারা গেছেন। আপনি যেদিন হঠাৎ চলে গেলেন সেই রাত্তিরেই—'
আনন্দ মুখ তুলে সোজাসুজি চাইলে মিসেস চোপরার দিকে।
'আপনি দেখেছেন?'
'দেখেছি মানে? সকালবেলা খবব পেয়েই তো আমরা চৌধুরীলজে গেলাম। পাড়া-পড়শীর বিপদে যাবো না? পরেব বিপদে-আপদেই যদি না দেখলাম তো কখন দেখবো? আহা, মিস্টার চৌধুরীকে ভাবতাম বুঝি খুব নিষ্ঠুর মানুষ কিন্তু তা নয়, খুব ভালবাসতো নিজের স্ত্রীকে মনে হলো—'
আনন্দ হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো, 'মিথ্যে কথা—'
'মিথ্যে কথা মানে?'
'মানে নয়না চৌহান মরতে পারে না। ও বুলবুল চৌধুবীর সব ষড়যন্ত্র। ওর সব চালাকি!'
মিসেস চোপবা ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। হঠাৎ আর্টিস্ট এত ক্ষেপে উঠলো কেন?
আনন্দ আবার বলতে লাগলো, 'আপনি জানেন না ও কী-রকম লোক, ওই বুলবুল চৌধুরী!'

মিসেস চোপরা বললে, 'আমি নিজের চোখে মিসেস চৌধুরীকে শ্মশানে নিয়ে যেতে দেখলাম, তাঁকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে এলো সবাই মিলে, আর আপনি বলছেন মিসেস চৌধুরী মারা যায়নি?'

বললে, 'আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু আমি তবু জানি নয়না চৌহান মারা যায়নি—'

তারপর বললে, 'আচ্ছা, আমি আজ আসি মিসেস চোপরা, আমার মনটা ভাল হয়ে গেলেই আবার আসবো—'

ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

শিবনাথ বললে—ডিফেন্সের ল-ইয়ার এইখানটাতেই একটু বেশি জোরে আর্গুমেণ্ট করলে, কারণ নয়না চৌহান যে মারা গেছে সে-সম্বন্ধে কোনও ডকুমেণ্টের অভাব নেই তাদের। একে একে সব সাক্ষীকে ডেকে তারা এভিডেন্স দেওয়ালে যে, তারা সবাই নয়না-চৌহানের ডেড-বডি দেখেছে। মেডিকেল সার্টিফিকেটও তারা প্রোডিউস করলে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, মিসেস চৌধুরী হঠাৎ স্ট্রোক-এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

জান্‌কীর মা'ও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিলে যে, সেদিন রাত্রেই চৌধুরী সাহেবের বউ মারা যায়। চাকর বাকরেরা অনেকেই সাক্ষ্য দিলে। এর পরে ডিফেন্সের ল-ইয়ার কোর্টে জজের সামনেই বলতে লাগলো—এর পরে যদি কেউ প্রমাণ চায় যে মিসেস চৌধুরী মারা যায়নি তাহ'লে তাকে বাতুল বলা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই।

গুলাবী উঠে সাক্ষ্য দিলে যে, মিসেস চৌধুরী হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে চৌধুরী সাহেব ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসেন, এবং তার চার পাঁচ ঘণ্টা পরেই মিসেস চৌধুরী মারা যান। মারা যাবার সময় গুলাবী নিজে তার মনিবের মাথার কাছে ব'সে ছিল।

প্রোসিকিউশন ল-ইয়ার তখন জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু পাগলা-গারদে যাকে এখন রাখা হয়েছে, সে কে?'

গুলাবী বললে, 'সে জান্‌কী।'

'সে যে জান্‌কী তার প্রমাণ কী?'

গুলাবী বললে, 'প্রমাণ তার মা। তার মা-ই সাক্ষ্য দেবে যে, সে তারই মেয়ে—'

জানকীর মা'ও সাক্ষ্য দিতে দাঁড়ালো। সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো কাঠগড়ায় উঠে।

বললে, 'ওরে জান্‌কী, তুই কেন ওখান থেকে পালিয়েছিলি মা, তোর কীসের দুঃখ? চৌধুরী সাহেব কত টাকা খরচ করেছে তোর জন্যে, তা তুই বুঝলি না?'

প্রোসিকিউশন উকীল জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ তো, ও তোমার মেয়ে তো?'

জান্‌কীর মা বললে, 'তা আমার মেয়ে না তো কার মেয়ে বাবা? আমি নিজের মেয়েকে চিনতে পারবো না।'

জান্‌কী হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো, 'না, আমি তোমার মেয়ে নই, আমি নয়না চৌহান। তোমার মেয়ে মারা গেছে—'

কোর্টময় যেন একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো। 'জান্‌কীর স্বাস্থ্যটা খারাপ, কী রকম রোগা রোগা দেখাচ্ছিল, যেন ভেঙে পড়েছে সে—'

বহুদিন আগে যখন ধর্মেন্দর চৌধুরীর বাড়িতে আসতেন আত্মা চৌহান, সেই তখনকার দিনে নামকবা বাঈজীরা আসতেন গান-বাজনা করতে। বেহাগে-ললিতে বিভাসে দরবারী কানাড়ায় দুই বন্ধুর আড্ডা জ'মে উঠতো শেষ রাত পর্যন্ত। যখন সুরের মূর্চ্ছনায় বাতাস মাতাল

হয়ে উঠেছে তখন এক-এক রাত্রে সমস্ত গোলমাল হয়ে যেত। কে বাঈজী, কে আয়া আর কে বাবু—সব একাকার হয়ে যেত সে সময়ে।

জান্‌কীর জন্ম সেই রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে। জান্‌কীর বুড়ি-মা তাই আজো কাঁদে। আজো হাসে সেইসব দিনের কথা মনে ক'রে। সেইসব দিনের কথা মনে করেই বুড়ি আজো আশীর্বাদ করে চৌধুরী সাহেবকে।

বুড়ি বলতো—তুমি বেঁচে থাকো বাবা, তুমি যে আমার কত উপকার করেছো—

কিন্তু কোর্টের এত ব্যাপারেও আনন্দ মোটেও হতাশ হয়নি। জীবনে এর চেয়ে হতাশ হবার অনেক ঘটনা ঘটেছে। অনেকবার অনেক অবস্থার মধ্যে তাকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হয়েছে। কেন হেরে যাবো? কেন আমি হার মানবো পৃথিবীর কাছে? আমি যতক্ষণ ন্যায়ের পথে আছি ততক্ষণ আমি তোমার কাছে ছোটো হবো না। হতে পারো তুমি বুলবুল চৌধুরী, হতে পারে তোমার অনেক টাকা আছে, আমার চেয়েও অনেক টাকা আছে, তুমি হয়তো তোমার টাকা দিয়ে আমাকে কিনে নিতে পারো। কিন্তু আর-এক ব্যাপারে আমি তোমার সমান। কিম্বা হয়তো তোমার চেয়েও বড়। সেখানে আমি সম্রাট, সেখানে আমার ঈশ্বরও যা আমিও তাই।

যেদিন প্রথম নয়না চৌহানের মৃত্যুর খবর পেয়েছিল আনন্দ, সেদিনও বিশ্বাস করেনি। আজ কোর্টে শুনানীর পরও বিশ্বাস করছে না। মিস্টার পুরোহিত প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'নয়না যে মারা গেছে, এ আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারছেন না কেন?'

আনন্দ বলেছিল, 'নয়না চৌহান মরতে পারে না বলেই আমি বিশ্বাস করছি না—'

মিস্টার পুরোহিত বলেছিলেন, 'ও-সব সেন্টিমেন্টের কথা ছেড়ে দিন। আইন সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না—আমরা শুধু ডকুমেন্ট মানি। আপনি কোনও প্রমাণ দিতে পারেন?'

'বলুন, কীসের প্রমাণ আপনি চান?'

মিস্টার পুরোহিত বলেছিলেন, 'আপনি প্রমাণ দেখান যে, যে মারা গেছে সে নয়না চৌহান নয়।'

আনন্দ বলেছিল, 'আমি প্রমাণ দিতে পারি এইটুকু যে, যে-মেয়েটিকে জান্‌কী ব'লে পাগলা গারদে পুরে রাখা হয়েছে সে জান্‌কী নয়—'

'সেটা কী ক'রে প্রমাণ করবেন?'

'তার প্রমাণ সেই জান্‌কীই দেবে। সে নিজেই বলছে সে জান্‌কী নয়, সে নয়না চৌহান।'

'আপনি কি তার সঙ্গে পাগলা গারদে গিয়ে দেখা করেছিলেন নাকি?'

আনন্দ বলেছিল, 'হ্যাঁ—দেখা করবার পরই তো আমি আশীষ চৌহান সাহেবের কাছে যাই। তাঁর চিঠি নিয়েই তো আপনার কাছে এসেছি—'

মিস্টার পুরোহিত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি নয়না চৌহানের ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার কিসের স্বার্থ?'

আনন্দও এ-কথার জবাব দিতে গিয়ে একটু থমকে গিয়েছিল। সত্যিই তো, তার কিসের স্বার্থ! তার সঙ্গে নয়না চৌহানের সম্পর্কই বা কী? নয়না চৌহানের বিয়ে হয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে আনন্দর কোনও কৌতূহল, কোনও প্রশ্ন তো থাকার কথা নয়। থাকা উচিতই নয়। থাকা বে-আইনী।

'আপনারও কি তার প্রপার্টির ওপর লোভ? আপনিও কি গুলমোহর এস্টেটের জন্য এত পরিশ্রম করছেন?'

এ কথার উত্তর দেয়নি আনন্দ। এ-কথার উত্তর দিতে আনন্দর ঘৃণা হয়েছিল?

শুধু বলেছিল, 'দেখুন, আপনার ডিউটি আপনার ক্লায়েন্টের স্বার্থ দেখা, আপনি কেস ক'রে দেখুন, ফলাফল যা হয় সে ভবিতব্যের ব্যাপার—'

'ঠিক আছে, তাই-ই করবো!'

এর পরেই মামলা উঠেছিল কোর্টে।

দিনের পর দিন শুনানী হতো আর আনন্দ মিস্টার পুরোহিতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতো।

জিজ্ঞেস করতো, 'কেমন বুঝছেন মিস্টার পুরোহিত?'

মিস্টার পুরোহিত গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'আমি কোনও আশা দেখতে পাচ্ছি না।'

'কেন আশা দেখতে পাচ্ছেন না?'

'সব এভিডেন্স তো আমাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। জান্‌কীব মা যে নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে গেল, সে তার নিজের পেটের মেয়ে, তাব নাম জান্‌কী—'

এতেও হতাশ হয়নি আনন্দ।

কোর্টের মধ্যে নয়না চৌহানকে গিয়ে বলতো, 'তুমি কিছু ভেবো না নয়না, আমি যেমন ক'রে পারি তোমাকে ছাড়িয়ে আনবোই—'

নয়না চৌহান বলতো, 'কিন্তু আমার কথা যে কেউ বিশ্বাস করছে না—'

আনন্দ বলতো, 'আমি তো বিশ্বাস করি—'

'কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে তো লাভ হবে না কিছু। তুমি ভাল ক'রে সব মনে কবতে চেষ্টা কবো, যেদিন তোমাকে চৌধুবী সাহেব দরজা বন্ধ ক'বে ঘরে আটকে রাখলো, সেদিন কী হয়েছিল—'

নয়না বলতো, 'আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না। আমার যে মাথার মধ্যে সব গণ্ডগোল হয়ে যায়, বেশিক্ষণ ভাবলেই যে মাথাটা ঘুরতে থাকে।'

'সেদিন কত রাতে তোমায় ঘর থেকে বার করলো ওবা?'

'তা তো জানি না।'

'একটু মনে করতে চেষ্টা করো না!'

'কী ক'রে মনে করবো? আমি যে তখন অজ্ঞান হযে পড়েছিলাম। জ্ঞান হবার পর আমি দেখলাম, আমি পাগলা গারদের মধ্যে রযেছি—সবাই আমাকে জান্‌কী বলে ডাকছে। আমি যত বলি আমি জানকী নই, নয়না, ততই সবাই অবিশ্বাস করে—। সবাই বললে আমি নাকি পাগলা-গারদ থেকে পালিযে গিয়েছিলাম, অনেকদিন পবে আবার আমাকে খুঁজে পেয়েছে—'

সত্যিই সে একদিন গিয়েছে নয়না চৌহানের। সেসব দিনের কথা যখন কোর্টের এভিডেন্স দিতে গিযে আনন্দ বলেছিল, কেউ বিশ্বাস করেনি।

কোর্টের জজ-সাহেব থেকে শুরু ক'বে উকীল-মহুরী-এ্যাডভোকেট কেউই বিশ্বাস করেনি আনন্দর কথা। মনে মনে অবিশ্বাসের হাসি হেসেছে, সন্দেহ করেছে।

সবাই বলেছে—ছোকরার এত আগ্রহ কেন নয়না চৌহান সম্বন্ধে। নিশ্চয় কিছু মতোলব আছে। জান্‌কীকে নয়না চৌহান ব'লে প্রমাণ করতে পাবলে, আনন্দরই লাভ ষোল আনা। বুলবুল চৌধুরীর জেল হয়ে গেলে আনন্দই নয়না চৌহানের গুলমোহর এস্টেটটা হাত করবে!

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর? তারপর কী হলো বলো? বুলবুল চৌধুরীর পানিশমেণ্ট হলো? কন্‌ভিকশন হলো?

শিবনাথ বললে, 'আমি তো শুধু পয়েন্টসগুলো ব'লে যাচ্ছি, খুঁটিনাটি ব্যাপার সব তোমার, ওগুলো তুমি বাড়িয়ে কমিয়ে নিও। মামলাটা যে বড় কম্‌প্লিকেটেড—কারণ লক্ষ্ণৌতে এই মামলা নিয়ে কয়েকমাস খুব হৈ-চৈ চলেছিল।

আমি বললাম—কিন্তু শেষকালে কী হলো? বুলবুল চৌধুরীর কন্‌ভিকশন হলো?

শিবনাথ বললে—না—

—কেন?

—কারণ কিছুই প্রমাণ করা গেল না। বুলবুল চৌধুরী পাকা লোক। সে যা কিছু করে সমস্ত আট-ঘাট বেঁধে করে। তার কোনও ব্যাপারে কোনও খুঁত পাওয়া গেল না। সে যে স্ত্রীর মৃত্যুতে কতখানি শোক পেয়েছিল, কাঠগুদামের পাড়ার লোকেরা সাক্ষীতে তারই প্রমাণ দিয়ে গেল! মিসেস চোপরা এসে নিজে সাক্ষ্য দিয়ে গেল স্ত্রীর মৃত্যুর দিন কী-রকম মুষড়ে পড়েছিল।

প্রোসিকিউশন জেরা করতে লাগলো তাকে।

'আপনি মিসেস চৌধুবী মারা যাওয়ার খবর কখন পেলেন?'

'পরের দিন সকাল বেলা। খবর পেয়েই তো আমি দেখতে গেলাম।'

'গিয়ে কী দেখলেন?'

'দেখলাম মিসেস চৌধুরী খাটের উপর শুয়ে রয়েছে। দেখে মনে হলো তিনি যেন ঘুমোচ্ছেন। মিস্টার চৌধুরী পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল!'

'আপনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস্ করলেন না।'

মিসেস চোপরা বললে, 'আমি মিসেস চৌধুরীর আয়া গুলাবীকে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছিল মিসেস চৌধুরীর?'

'গুলাবী কী বললে?'

গুলাবী বললে 'দিদিমণি হঠাৎ হার্টফেল করেছেন। ডাক্তার সাহেবকে ডাকা হয়েছিল, তিনি কিছুই করতে পারলেন না—'

শুধু মিসেস চোপরাই নয়, যে-ডাক্তার শেষ সময়ে নয়না চৌহানকে দেখেছিলেন, তিনিও বললেন সেই একই কথা। তিনিও বললেন—'তিনি মিস্টার চৌধুরীর কাছ থেকে কল্ পেয়েই মিসেস চৌধুরীকে দেখতে এসেছিলেন। এসে দেখলেন তাঁর আসার আগেই পেসেন্ট কোলাপ্স করেছে—'

প্রোসিকিউশন জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কী করলেন তখন?'

ডাক্তার বললেন, 'তখন আর আমার করার কিছুই ছিল না, আমি ওষুধও দিলাম না, কিছু না, শুধু ডেথ্-সার্টিফিকেট দিয়ে গেলাম—'

'আপনার কী কিছু সন্দেহ হয়েছিল?'

'কীসের সন্দেহ?'

'রোগীকে কি খুন করা হয়েছিল, না স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল রোগীর?'

ডাক্তার বললেন, 'সে-সন্দেহ হলে আমি তো ডেথ্ সার্টিফিকেট দিতাম না—'

ডাক্তারের সাক্ষ্য দেবার পর ডাকা হলো গুলাবীকে।

প্রোসিকিউশন জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি বলতে পারেন কীসে মিসেস চৌধরীর মৃত্যু হয়েছিল?'

'হার্ট ফেল ক'রে।'

'মিস্টার চৌধুরী কি কোনও রকম কষ্ট দিয়েছিলেন মিসেস চৌধুরীকে? কোনও অত্যাচার করেছিলেন? আপনি তো সব সময়েই মিসেস চৌধুরীর আশে-পাশে থাকতেন?'

গুলাবী বললে, 'আমি বরাবর মিসেস চৌধুরীর কাছে থাকতাম। বিয়ের আগেও থাকতাম, পরেও থাকতাম। আমি কখনও মিস্টার চৌধুরীকে কোনও কড়া কথা বলতে শুনিনি—'

'মিস্টার চৌধুরী মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন?'

গুলাবী বললে, 'বড় ভালবাসতেন মিস্টার চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে। একদিন তাঁকে না দেখলে থাকতে পারতেন না—'

'আর মিসেস চৌধুরী? তিনি কি অসুখী হয়েছিলেন বিয়ে ক'রে?

গুলাবী বললে, 'না। মিসেস চৌধুরী আমাকে অনেকবার বলেছেন, তাঁর মতোন স্বামী হয় না। অমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা—'

সাক্ষ্য দিতে দিতে গুলাবী অনেকবার কেঁদে ফেলেছিল।

সত্যিই ভালবাসতো গুলাবী তার মনিবকে। যারা প্রতিদিন কোর্টে গিয়ে শুনানী শুনেছে তারা জানতো এ মামলা মিথ্যে সন্দেহের মামলা। জোর ক'রে বুলবুল চৌধুরীকে জড়ানো হয়েছে এ-মামলায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে যে নয়নার প্রপার্টি গুলমোহর এস্টেট ভোগ করছে এটা কারোর সহ্য হচ্ছে না বলেই এ মামলা করা হয়েছে।

কিন্তু শেষ দিনে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো।

যেদিন জজ সাহেব জাজমেণ্ট দিলেন সেইদিন একটা অবাক কাণ্ড ঘটলো কোর্টের মধ্যে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী কাণ্ড?

শিবনাথ বললে—'আমি তোমাকে গোড়াতেই সে কথা বলেছি—'

—কোন্ কথা?

শিবনাথ বললে—জজসাহেব তাঁর রায় দিলেন—আমি সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আসামী বুলবুল চৌধুরীকে অন্যায়ভাবে এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। আসামী একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি শুধু শিক্ষিত নন, তিনি কাঠগুদামের একজন ভদ্রবংশজাত অভিজাত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আসামীর এবং ফরিয়াদীর সমস্ত এভিডেন্স থেকে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, আসামী নির্দোষ। আমি আসামীকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছি—

কথাটা বোধহয় তখন শেষ হয়নি। কোর্টময় একটা গুঞ্জন-শব্দ উঠতে শুরু ক'রেছে।

আসামীর কাঠগড়ায় বুলবুল চৌধুরী দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেছিল।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো।

কোর্টের ভেতরই সবাই বসেছিল। গুলাবী হঠাৎ এককোণ থেকে উঠে সোজা আসামীর কাঠগড়ার সামনে দৌড়ে গিয়ে একটা ছোরা বার ক'রে বুলবুল চৌধুরীর বুকে বসিয়ে দিয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বুলবুল চৌধুরী অবশ হ'য়ে পড়ে গেল সেইখানেই তবু গুলাবী ছাড়লো না, আবার মারতে লাগলো। বুকে, পিঠে, মাথায়, ঘাড়ে, মুখে সর্বত্র।

ততক্ষণে পুলিশ কন্স্টেবল দারোগা সবাই তাকে ধ'রে ফেলেছে। কিন্তু গুলাবীর তখন যেন সত্যিই খুন চেপে গিয়েছে। সে বোধহয় আরো মারতে পারলে খুশী হতো। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তার হাত-দুটো ধ'রে তাকে বন্দী ক'রে ফেলেছে পুলিশ-কন্স্টেবলের দল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম—তারপর?

শিবনাথ বললে—এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেনি কখনও, এর পরেও আর কখনও ঘটেনি। দিনের পর দিন গুলাবী সাক্ষ্য দিয়ে গেছে, দিনের পর দিন বুলবুল চৌধুরীকে সাপোর্ট ক'রে গেছে। একমাত্র গুলাবীর সাক্ষ্যতেই জজসাহেব বুলবুল চৌধুরীকে মুক্তি দিয়েছে। হঠাৎ মুক্তি দেওয়ার দিন এমন ক'রে আসামীকে খুন করবে সেই গুলাবী, তা কেউই ভাবতে পারেনি। কোর্টশুদ্ধু লোক চমকে উঠেছিল সেদিন সেই ঘটনা দেখে। কোর্টের বাইরেও সেইদিন পাড়ায় পাড়ায় সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। তার পরদিন খবরের কাগজে খবরটা যখন বেরুলো প্রথম, সেদিন আরো ছড়িয়ে পড়লো। তারপর যেদিন গুলাবীর শুনানী আরম্ভ হলো সেদিন কোর্টের ভেতরে মানুষ ঢোকবার আর জায়গা নেই। পুলিশ পাহারাওয়ালা দিয়ে ভিড় কণ্ট্রোল করতে হলো।

শিবনাথ আবার বলতে লাগলো।

বললে—জিনিসটা এমনই রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল যে, আমিও সকাল সকাল কোর্টে গিয়ে হাজির হলাম ভাই। ডিফেন্স আর প্রোসিকিউশন সবাই তখন ঘটনার মোড় ফেরায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কেন যে গুলাবী অমন কাণ্ড করতে গেল তাও কারো মাথায় এলো না। আমাদের ল-ইয়ার-মহলে এই নিয়ে খুবই তোলপাড় চলছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু হঠাৎ গুলাবী কেন খুন করতে গেল বুলবুল চৌধুরীকে? সম্পত্তির ভাগ নিয়ে দুজনে কি ঝগড়া বেঁধেছিল?

শিবনাথ বললে—না তা নয়—

—তাহলে?

—সেই কথাই তো বলছি। আমি শুধু পয়েন্টগুলো তোমাকে ব'লে যাচ্ছি, তুমি গল্প লেখার সময় ওটা বাড়িয়ে নিও—মানুষের ভেতরে যে কত রকমের পশু লুকিয়ে থাকে, তারই কাহিনী এটা। গুলাবী সেদিন যদি বুলবুল চৌধুরীকে খুন না করতো তাহ'লে বাইরের পৃথিবীর লোক কিছুই জানতে পারতো না। জানতে পারতো না নয়না চৌহান কে, জানকীই বা কে, বুলবুল চৌধুরীই বা কে, আর গুলাবী নিজেই বা কে?

সেদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় গুলাবী যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিল তা যারা শুনেছে, তা আর তারা জীবনে ভুলবে না। আমিও ভুলবো না ভাই। গুলাবী মেয়েটা আজ আর নেই। বুলবুল চৌধুরীও নেই। আছে শুধু আনন্দ মিশ্র আর নয়না চৌহান। শেষে দু'জনে আছে বটে কিন্তু কোথায় আছে তা আমি জানি না। ওই ঘটনার পর নৈনিতাল থেকেও চলে গেছে। তার গুলমোহর এস্টেট বেচে দিয়েছে! বেচে দিয়ে সেই টাকা দিয়ে হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়ে নিশ্চিন্তে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। তাদের কথা হয়তো কারো মনে নেই। আজ মনে আছে শুধু বুলবুল চৌধুরী ও গুলাবীর কথা। অথচ গুলাবীর নামও গুলাবী নয়, বুলবুল চৌধুরীর নামও বুলবুল চৌধুরী নয়—

আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—সে কী?

শিবনাথ বল্‌লে—এ-মামলায় সেইটেই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

—'কী রকম?'

এরপর শিবনাথ গুলাবীর সমস্ত জবানবন্দীটা ব'লে গেল।

কোর্টঘর তখন নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় গুলাবীকে এনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। গুলাবী মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

জজসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি দোষী না নির্দোষ?'

গুলাবী স্পষ্ট গলায় বললে, 'আমি দোষী।'

তারপর জজসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'আমার আরো কিছু বলবার আছে হুজুর, আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমার যা কিছু বক্তব্য আছে সমস্ত ব'লে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। ফাঁসির আগে আমি পৃথিবীর সব লোককে জানিয়ে যেতে চাই যে, আমি যাকে খুন করেছি সে কতবড় হীন-চরিত্রের লোক। ধর্মাবতার, আপনি আমার অপরাধের জন্যে আমাকে চরম শাস্তি দিলেও আমি দুঃখিত হবো না। কারণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—আমি আসামীকে ধর্মাবতারের সামনেই খুন করেছি, এবং তার সাক্ষী ধর্মাবতার নিজেই। কিন্তু যেদিন শুনলাম ধর্মাবতার আসামীকে মুক্তি দিলেন সেদিন আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আসামীর শাস্তির ব্যাপারটা আমি নিজে হাতেই তুলে নিলাম। আমি আইনের অপব্যবহার করেছি, আইনের অমর্যাদা করেছি, তার জন্যেও ধর্মাবতার আমাকে যা-কিছু শাস্তি দেবেন সমস্তই আমি মাথা পেতে নেবো! কারণ আমার অপরাধের জন্য আমি দুঃখিত তো নই-ই, লজ্জিতও নই, অনুতপ্তও নই। বরং আসামীকে আমি খুন করতে পেরেছি ব'লে আমি গর্বিত—'

ব'লে গুলাবী আবার জজসাহেবের দিকে মুখ তুলে চাইলে।

জজসাহেব অনুমতি দিলেন।

বললেন, 'বলো।'

গুলাবী বলতে লাগলো।

'আমার নাম গুলাবী নয়। আসামী বুলবুল চৌধুরীর নামও বুলবুল চৌধুরী নয়। আমার আসল নাম মেহের, মেহের জোসেফ। আর বুলবুল চৌধুরীর আসল নাম শশী প্যাটেল। লণ্ডনে আমাদের দু'জনের আলাপ। আমি প্যাটেলকে ভালবেসেছিলাম লণ্ডনেই। শেষে প্যাটেলের সঙ্গে আমার বিয়েও হয়েছিল। আমার বাবা ছিল মুসলমান। আর মা ছিল ইষ্ট-এণ্ডের গরীব একজন মেয়ে। আমার বাবা খালাসীগিরি করতো। আমার জন্মের আগেই আমার বাবা আমার মাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম প্যাটেল বুঝি বড়লোক। ভেবেছিলাম প্যাটেলকে বিয়ে ক'রে আমি আমার বাবার দেশে চলে আসতে পারবো, চলে এসে সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করবো। কিন্তু পরে বুঝলাম প্যাটেলও আমার মতো কপর্দকহীন, কোনও রকমে লুকিয়ে লণ্ডনে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

'কিন্তু যখন বিয়ে ক'রে ফেলেছি তখন আর কোনও উপায় ছিল না। আর তা ছাড়া আমি প্যাটেলকে সত্যিই ভালবাসতাম। প্যাটেলকে ডিভোর্স করবার কথা কখনো কল্পনা করতে পারতাম না। সেই প্যাটেলই একদিন হঠাৎ আমায় এসে বললে এই বুলবুল চৌধুরীর কথা। বুলবুল চৌধুরী ছিল প্যাটেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। বুলবুল চৌধুরীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। তার মা ইণ্ডিয়ার ধর্মেন্দর চৌধুরীর স্ত্রী, স্বামীকে ছেড়ে সে নিজের ছেলে বুলবুল চৌধুরীকে নিয়ে লণ্ডনে চলে আসে।

দিনের পর দিন প্যাটেল বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে মিশে তার সমস্ত গোপন কথা জেনে নিয়েছিল। বুলবুল চৌধুরীর বাবার নাম কী, কোথায় তাঁদের জমিদারী, সে জমিদারীর আয় কত, তার কে কে আছে, সমস্ত প্যাটেলের জানা হয়ে গিয়েছিল।

'সেই বুলবুল চৌধুরী লণ্ডনেই মারা যায়। মরবার দিন হঠাৎ প্যাটেল আমাকে তার প্ল্যানের কথা বলে। প্যাটেল বলে যে সে ইণ্ডিয়ায় ফিরে গিয়ে বুলবুল চৌধুরী নাম নিয়ে তার বাবার প্রপার্টি দখল করবে। তারপর বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে নয়না চৌহানের বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে আছে সে কথাও বলে। আর নয়না চৌহানের যে গুলমোহর এস্টেট আছে তার আয়ও পনের লক্ষ টাকা বছরে—তাও হাত ক'রে নেবে আস্তে আস্তে।'

'আমি প্রথমে রাজি হইনি। ধরা প'ড়ে যাবার ভয়েই রাজী হইনি। কিন্তু অত টাকার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি বলেই শেষ পর্যন্ত আমার স্বামীর কথায় রাজী হই। ঠিক হলো আমি আয়া হিসাবে কাজ নেবো নয়না চৌহানেব বাড়িতে আর প্যাটেল বুলবুল চৌধুরীর ছদ্মবেশে চৌধুরী-লজে গিয়ে উঠবে। তারপর আমি এক জাহাজে চলে এলুম ইণ্ডিয়াতে। প্যাটেল এলো পরের জাহাজে। সবাই জানলো আমার নাম গুলাবী আর প্যাটেলের নাম বুলবুল চৌধুরী।'

'সবই ঠিক মতো চলতো। কিন্তু ধ'রে ফেললে দু'দিন পরেই একটা মেয়ে। তার নাম জান্‌কী। ধর্মেন্দর চৌধুরীর বাড়ির একটা ঝি-এর মেয়ে জান্‌কী। জান্‌কী বুলবুল চৌধুবীকে খুব ভাল ক'রে চিনতো। একবার মাছ ধরতে গিয়ে বুলবুল চৌধুরীর পিঠে একটা বঁড়শী ফুটে যায়। তার দাগ ছিল বুলবুল চৌধুরীর পিঠে। সে-দাগটা নেই দেখে জান্‌কী একদিন চিৎকার ক'রে উঠলো—'তুমি অন্য লোক, তুমি বুলবুল চৌধুরী নও—'

'আর সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেল তার মুখ চাপা দিয়ে তাকে একটা পাগলা গারদে রেখে দিয়ে এলো। তাব মাকেও বললে, তার মেয়ে পাগল হয়ে গেছে। তার চিকিৎসা দরকার। বুড়ি মা তার চোখে দেখতে পায় না! মা কিছু বুঝতেও পারলে না। আসলে জান্‌কী নয়না চৌহানের বাবা আত্মা চৌহানের অবৈধ সন্তান। তাই তার চেহারার সঙ্গে অত আশ্চর্য মিল ছিল নয়না চৌহানের।'

'সে-যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেল প্যাটেল। তাই নয়না চৌহানের সঙ্গে প্যাটেলের বিয়েটা অত নির্বিঘ্নে সমাধা হলো। কিন্তু মুস্কিল বাধলো অন্য জায়গায়। যে-প্রপার্টির লোভে প্যাটেল ইণ্ডিয়াতে বুলবুল চৌধুরী সেজে এসেছিল, সেখানে এসে দেখলে যে-প্রপার্টিব আযের চেয়ে দেনা বেশি। বহু তার পাওনাদার। প্যাটেল আসতেই পাওনাদাররা ছেঁকে ধরলে তাকে। দেনা শোধ করতে হবে। কিন্তু অত টাকা তখন কোথায়? তখন একমাত্র ভরসা নয়না চৌহানের গুলমোহর এস্টেট। প্যাটেল দিনরাত চেষ্টা করতে লাগলো যাতে নয়না চৌহানের সম্পত্তি হাত করতে পারে। কিন্তু নয়না চৌহানও তখন কিছুতেই সই দেবে না। তখন প্যাটেল জোর জবরদস্তি করতে লাগলো নয়নার ওপর।'

'ওদিকে তখন জান্‌কীও পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন থেকেই তাকে খোঁজবার চেষ্টা হচ্ছিল। কারণ প্যাটেল যে বুলবুল চৌধুরী নয়, অন্য কেউ, তার প্রমাণ একমাত্র জান্‌কী।'

'সেই জান্‌কীকে একদিন হাতে নাতে ধ'রে ফেলল প্যাটেল। জান্‌কীর শরীর তখন খুব দুর্বল। সেদিন টানাটানিতে জান্‌কী অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ডাক্তার ডাকা হলো তাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু সেই রাত্রেই মারা গেল জান্‌কী। আমি সেখানে ছিলাম। প্যাটেলকে তখনই আমি পরামর্শ দিলাম সকলকে খবর দিতে যে নয়না চৌহান মারা গেছে। আর নয়না চৌহানকে নিয়ে গিয়ে পুরে দেওয়া হলো পাগলা-গারদে। তাদের বলা হলো যে, জান্‌কীকে আবার খুঁজে পাওয়া গেছে।'

বলতে বলতে গুলাবী থামলো এবার।

এক নাগাড়ে কথা ব'লে বোধহয় তার গলা শুকিয়ে এসেছিল। বললে, 'এক গ্লাস জল খাবো হুজুর, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—'

জল খেয়ে গুলাবী আবার বলতে লাগলো, 'এই পর্যন্ত বেশ চলছিল হুজুর। আমরা যে-প্ল্যান ক'রে দু'জনে ইণ্ডিয়াতে এসেছিলাম সমস্তই ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল। এবার আমরা নয়না চৌহানের গুলমোহর এস্টেট দখল ক'রে বসলাম। প্যাটেল তখন প্রচুর টাকার মালিক। সেই টাকাই হলো আমার আর প্যাটেলের কাল। টাকা পেয়েই প্যাটেল একেবারে বদলে গেল। বড় বড় হোটেলে গিয়ে আমরা

উঠি, দু'হাতে টাকা ওড়াই। আমাদের সমস্ত অভাব তখন মিটে গেছে। আমরা বড়লোক। তখন প্যাটেল টাকা পেয়ে আমাকে ভুলে গেল। আমার কথাও আর যেন মনে পড়লো না তার। সে তখন আমাকে ছেড়ে অন্য মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি ক'রে বেড়াতে লাগলো। আমি যেন কেউ না। আমি যেন তখন তার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি ব'লে আমি বুঝতে পারলাম।'

'কিন্তু একদিন ওই আর্টিস্ট আনন্দ মিশ্রই এই মামলা শুরু করলো নয়নার কাকাকে দিয়ে। নয়নার কাকা আশীষ চৌহান ভদ্রলোক সাদাসিধে ভাল মানুষ। কিন্তু আনন্দের পীড়াপীড়িতে তিনিও চিঠি লিখে দিলেন তাঁর উকীলকে।'

'মামলা শুরু হতেই প্যাটেল একটু ভয় পেয়ে গেল। তখন আবার আমার কথা মনে পড়লো তার। প্যাটেল বুঝতে পারলে এ-বিপদ থেকে একমাত্র আমিই তাঁকে বাঁচাতে পারি। আমাকে খোসামোদ করতে লাগলো, তোষামোদ করতে লাগলো। আমাকে অনেক টাকার সোনার গহনা কিনে দিলে। আমার মনও ভিজে গেল। আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে সব অপরাধ থেকে মুক্ত করে দিলাম। প্যাটেল বুঝতে পারলে, সে এবার ছাড়া পাবেই। রায় বেরোবার আগের দিন হোটেলের ভেতরে মস্তবড় একটা পার্টি দিলে। অনেক মেয়ে এলো অনেক ছেলে এলো। প্যাটেলের সব নতুন বন্ধু-বান্ধব। আবার প্যাটেল যেন অন্য মূর্তি ধরলো। সে ভুলে গেল যে, আমার সাক্ষ্যতেই তার মুক্তি আসছে। আমিই একমাত্র তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। রাত্রিবেলা যখন সবাই মদ খেয়ে নেশার ঘোরে মাতলামী করছে, তখন হঠাৎ নজরে পড়লো প্যাটেল নেই। আমি প্যাটেলকে খোঁজার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরছি। কোথায় গেল সে! অন্য কারোর খেয়াল নেই। কিন্তু আমি তার কথা ভুলিনি। প্যাটেল ভেবেছিল আমিও বোধহয় তার মতো নেশা ক'রে সমস্ত ভুলে থাকবো! কিন্তু আমি যে ভালবাসতাম প্যাটেলকে। আমি কি তাকে ভুলতে পারি? খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নিজের ঘরে গিয়ে দেখি প্যাটেল সেখানে। শুধু প্যাটেল নয়, সঙ্গে আর একটা মেয়ে। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধ'রে প্যাটেল আমারই বিছানার ওপর শুয়ে আছে! আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমার মনে হলো সেখানে সেই অবস্থাতেই তাকে খুন ক'রে ফেলি। আমাকে প্যাটেল দেখতে পায়নি। আমি আলমারি থেকে প্যাটেলের ছুরিটা বার ক'রে খুন করতে গেলাম তাকে। কিন্তু তখনই প্যাটেল আমাকে দেখে ফেলেছে। আমি ছুরিটা শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। প্যাটেল আমাকে দেখে হয়তো লজ্জায় পড়েছিল! আমাকে নানা কথা বোঝাবার চেষ্টা কবতে লাগলো। নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমিও আর কিছু বললাম না। আমি এমন ভাব দেখালাম যেন তাকে ক্ষমা করেছি আমি। প্যাটেল আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে তখন খুব আদর করতে লাগলো।'

গুলাবী আবার থামলো।

বললে, 'আমাকে আর-একটু জল দিতে বলুন হুজুর, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—'

জল খেয়ে আবার বলতে লাগলো গুলাবী—'তারপর যেদিন ধর্মাবতার প্যাটেলকে মুক্তি দিলেন সেদিন আর থাকতে পারলাম না, আমি সেই ছুরিটা সঙ্গে করেই এনেছিলাম, আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দেবার আগেই তার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দিলাম। একবার দু'বার তিনবার বসিয়ে দিলাম। যাতে আর বেঁচে উঠতে না পারে।'

তারপর একটু থেমে আবার বললে, 'আমি জানি হুজুর আমি অপরাধ করেছি! যদি ভালবাসা আমার অপরাধ হয় তাহ'লে আমি অপরাধী। বিশ্বাসঘাতককে খুন করা যদি অপরাধ হয় তা'হলে আমি অপরাধী। আমার অন্যায় হয়েছিল প্যাটেলের মতো স্কাউণ্ড্রেলকে ভালবাসা।

আজ আর আমার কোনও বাসনা-কামনা নেই! যাবার আগে শুধু একটি কথা ব'লে নিই। 'দিনের পর দিন মাসের পর মাস আমি নয়না চৌহানকে দেখেছি। আমি জানি নয়না চৌহান প্যাটেলকে ভালবাসতে পারেনি। সে ভালবেসেছে আর্টিস্ট আনন্দ মিশ্রকে। আমি নিজে যে-

ভালবাসা নিজের জীবনে পাইনি, আমি চাই নয়না সেই ভালবাসা পাক। আমি আজ ধর্মাবতারের সামনে দাঁড়িয়ে হলফ্ করে ব'লে যাচ্ছি, নয়না চৌহান সতী। প্যাটেলকে আমি একদিনের জন্যে স্পর্শ করতে দিইনি নয়না চৌহানকে। আমি নিজে মেয়েমানুষ হয়ে আর-একজন মেয়েমানুষের চরম সর্বনাশ করতে দিতে পারিনি। আমি সুখী হবো, যদি জানতে পারি—নয়না চৌহান আর আনন্দ মিশ্র সুখী হয়েছে। আমার নিবেদন এখানেই শেষ করছি। ধর্মাবতার যে আমার কথা এতক্ষণ ধৈর্য ধ'রে শুনেছেন তাতেই আমি কৃতার্থ। আমার আর কোনও কামনা নেই।'

গুলাবীর জবানবন্দী শেষ হয়ে গেল। কোর্টও সেদিনকার মতো বন্ধ হলো। কোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম।

বললাম—তারপর?

শিবনাথ বললো,—গল্প লেখক হয়ে এর পরেও তুমি বলছো তারপর? এরপর কি আর তারপর থাকে?

শিবনাথ কথাটা ব'লে থামলো বটে, কিন্তু আমার মনে হলো এ যেন সত্যি ঘটনা নয়। এতক্ষণ ধ'রে যেন কোনও ইংরিজী ক্রাইম নভেল পড়লাম। যেন কোনো ক্রাইম্-নভেলে এই রকম ঘটনা পড়েছি। সেইটেই সত্যি-ঘটনা ব'লে শিবনাথ আমার কাছে বেমালুম চালিয়ে দিলে।

জিজ্ঞেস করলাম—'সত্যিই কি এটা সত্যি ঘটনা? না আমাকে গল্প-লেখক পেয়ে ইংরিজী নভেলের গল্প শুনিয়ে দিলে?'

কিন্তু শিবনাথের তখন আর উত্তর দেবার সময় নেই। তার তখন একজন মক্কেল এসে গেছে। তার সঙ্গে কথা বলতেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

— o —

রাজরাণী হও

বিয়ের সময় মা আশীর্বাদ করেছিল, তুমি রাজরাণী হও মা। স্বামী, পুত্র, শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে সুখে ঘর-করনা করো।

আশ্চর্য, মায়ের সেই আশীর্বাদ যে এমন করে মিথ্যে হয়ে যাবে, তা কে জানতো!

তাহ'লে গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। বাইরের লোকের কাছ থেকে যে কত রকমের গল্প পাওয়া যায়, তা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই।

এবার বারাণসীতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ঘুরে বেড়ানো। তারপরে একে-একে যখন পরিচিতরা টের পেয়ে গেল যে আমি এসেছি, তখন সবাই এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

বারাণসী আমার পুরনো জায়গা। প্রায় প্রতি বছরই পূজোর পরে আমি সেখানে যাই। নানা সূত্রে আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। বলতে গেলে তাঁরা সবাই-ই সাহিত্য-রসিক। তাই সাহিত্য-রসিক মাত্রই আমার বন্ধু-স্থানীয়।

এঁদের মধ্যে একজনের নাম ডঃ নিরঞ্জন শর্মা। ডক্টরেট পেলেই সবাই সাহিত্য-রসিক হয় না, কিন্তু ডঃ শর্মার কথা আলাদা। তিনি দু'টো বিষয়ে এম-এ, এবং উপরন্তু ডক্টরেট। ডক্টরেট তো সংসারে গাদা-গাদা। ওটার আজকাল আর কোনও চমক নেই। কিন্তু শর্মাজীর কথা সত্যিই আলাদা। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে আসতেন এবং আমিও মনের মত লোক পেয়ে প্রাণ ভরে সাহিত্য-আলোচনা করতাম।

তিনি নিজে 'নাগরী প্রচারিণী' সভার সম্পাদক। এবং তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে যে মেয়েদের স্কুল আছে তার শিক্ষিকা।

ডঃ শর্মা বলেছিলেন, আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে একজন মহিলা আছেন, তাঁকে নিয়ে যদি কখনও গল্প লেখেন তো সেটা লোকের খুব ভালো লাগবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

শর্মাজী বলেছিলেন, মহিলাটি একজন খুনী। খুনের দায়ে তার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল।

আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন?

শর্মাজী বলেছিলেন, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড দাদা। আপনি যদি তাকে নিয়ে কখনও গল্প লেখেন তো আমি খুব খুশী হবো। আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সব শুনেছি। মহিলাটি ভালো লেখা-পড়া জানে না। কিন্তু খুব সচ্চরিত্র।

—খুনী মেয়ে কী করে সচ্চরিত্র হয়?

শর্মাজী বললেন, হয়। নইলে মা কেন তাকে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় দেবেন। মহিলাটি সব কথাই খুলে বলেছে মা'কে। তাঁর মুখ থেকেই আমাব স্ত্রী সব শুনেছে। আশ্রমের সব কাজের

ভার এখন সেই মহিলাটির ওপর। অত বড় বিশ্বাসী মেয়ে আশ্রমে আর কেউ নেই। তাই মা নিজে তার হাতে ভাঁড়ারের চাবি তুলে দিয়েছেন।

—নাম কী মহিলাটির?

শর্মাজী বললেন, অনিলা। নামেও অনিলা, কাজেও সত্যি-সত্যিই অনিলা। চৌদ্দ বছবেব জেল হয়েছিল। যার মানে 'ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ্'। সেটা কমে আট বছরে দাঁড়িয়েছিল। আট বছর জেল খাটা কি সোজা কথা?

আট বছর পরে। আটও হতে পারে আবার সাড়ে সাতও হতে পারে। ও সব সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব ছিল না তার। জেনানা ফাটকে কোথা দিয়ে বছরের পর বছর কেটে গেছে, তার হিসেব রাখা সম্ভবও নয়।

সব মিলিয়ে চোদ্দ বছরের মেয়াদ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-ভোগের কথা। কিন্তু বোধহয় তার ওপর দয়া হয়েছিল কর্তাদের। তার সম্বন্ধে রিপোর্টও ভালো ছিল। কখনও কাউকে গালাগালি দেওয়া দূরের কথা, একটু কড়া কথাও বলেনি সে। তাই যখন সে শুনলো যে, তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয়নি।

একজন মেয়ে ওয়ার্ডার তাকে এসে প্রথম খবরটা দিলে।

বললে, দিদি শুনছেন, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে!

জিজ্ঞেস করলে, তার মানে? আমার তো এখানে চোদ্দ বছর থাকার কথা! ছেড়ে দেবে কেন হঠাৎ?

সুশীলা বললে, জানি না, এই তো বড় দিদিমণির কাছে শুনলাম।

—ঠিক শুনেছিস তো?

সত্যি-সত্যিই কথাটা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি।

এমন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। আগেও খুনের অপরাধে অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওযা হয়েছে। তার মধ্যে ক্বচিৎ কয়েকজনকে সাড়ে সাত বছর পবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক আসামীর নামে নাকি আলাদা-আলাদা ফাইল থাকে। সেই ফাইলে আসামীদের সব কিছুর রেকর্ড লেখা থাকে। কে কেমন ব্যবহার করছে, কে কতবার কর্তাদের হেনস্থা করেছে। কথায়-কথায় নালিশ তো সকলের লেগেই আছে। অথচ এতদিন তো তাদের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা ছিল। নেহাৎ হাকিমেব দয়ায় ফাঁসি না হয়ে হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! যাদের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা, তাদের ফাঁসি না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। এর জন্যে তো তাদের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত! কিন্তু তা নয়, পান থেকে চুন খসলেই তাদের যত রাগ। ভাত একটু ঠাণ্ডা হলে কিম্বা তরকারীতে একটু নুন বেশী হলেই তারা একেবারে লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

কিন্তু অদ্ভুত এই আসামী অনিলা বিশ্বাস। জেনানা-ফাটকের ইতিহাসে নাকি এমন ভদ্র নিরীহ আসামী আগে আর কখনও আসেনি।

বলতে গেলে জেলখানার মধ্যে সুশীলাই অনিলাকে একটু বেশী খাতিব করতো। সুশীলা জে[illegible] [illegible] কাজ করছে বে[illegible]। [illegible] চেহাবা। কালো কুচকুচে গায়ের রং। প্রথম দিনেই চুপি-চুপি অনিলাকে বলে গিয়েছিল, পান-দোক্তা খাওয়াব নেশা আছে নাকি আপনার?

অনিলা বলেছিল, না।

সুশীলা বলেছিল, নেশা থাকলে বলবেন। লজ্জা করবেন না। আমার নাম সুশীলা। আমি এখানকার সবাইকে নেশার খোরাক জোগাড় করে দিই। আমাকে জেলখানার কর্তা থেকে গেটের দারোয়ান পুলিশ পর্যন্ত খাতির করে।

অনেক পীড়াপীড়ির পরও অনিলা রাজি হয়নি। বলেছিল, না আমার কোন কিছুরই দরকার নেই।

তারপর কথাটা অনেকবার বলেছে সুশীলা। যেন শ্রীমতী অনিলা বিশ্বাসকে ও কোনও রকমে খুশী করতে পারলেই সে সুখী হবে।

শেষকালে অনিলা বলেছিল, কেন আমাকে ওসব লোভ দেখাচ্ছ ভাই, আমার কোনও কিছুরই দরকার নেই। তোমরা আমাকে খেতে না দিলেও আমি কিছু বলবো না। আমি কিছুই চাই না তোমাদের কাছে। আমার ফাঁসি হয়ে গেলে আমি আরো খুশী হতাম!

সুশীলা তার বাপের জন্মে এমন আসামী আগে আর দেখেনি।

একদিন অনিলার কাছে বসে খুব ভাব জমিয়েছিল। তারপর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা দিদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

অনিলা বলেছিল, কী বলবে বলো না!

সুশীলা জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা দিদি, আপনি কি সত্যিই খুন করেছিলেন?

অনিলা প্রথমে কিছু বলেনি, শুধু চুপ করে কথাটা শুনেছিল।

—আপনি বলুন না দিদি, আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে!

—যা বলবার আমি তো হাকিমের কাছে সব বলেছি।

সুশীলা বলেছিল, কিন্তু আমি তো কোর্টে ছিলুম না। এখানকার খাতায় দেখলুম লেখা আছে, আপনি খুনের আসামী। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার তা বিশ্বাস হয় না। খুনের আসামী তো আমি আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু আপনার চেহারা দেখে বিশ্বাসই হয় না যে, আপনি কাউকে খুন করতে পাবেন: বলুন না দিদি সত্যিই আপনি খুন করতে পারলেন?

অনিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, মানুষ সব করতে পারে!

—কিন্তু তা বলে আপনি? আপনার মত এত ভালো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি যে!

—বাইরে থেকে দেখে মানুষকে কি চেনা যায়?

সুশীলা বলেছিল, হ্যাঁ চেনা যায়। আমি এখানকার সব মানুষকে চিনতে পারি। আর আমি এতদিন এখানে চাকরি করছি, মানুষ দেখে-দেখে আমার চুল পেকে গেল, আমি মানুষ চিনবো না?

অনিলা এ-কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

সুশীলা আরও জিজ্ঞেস করেছিল, সংসারে আপনার আর কে আছে দিদি?

অনিলা বলেছিল, আমার ছেলে।

—কত বয়েস আপনার ছেলের?

—এত কথা আমায় কেন জিজ্ঞেস করছো সুশীলা। এত কথা জেনে তোমার কী লাভ হবে?

—আমার বড় ভাল লাগে জানতে। যেদিন আপনি প্রথম জেলখানায় ঢুকলেন, সেইদিন থেকেই আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখেন না, আপনি এখানে আসার পর থেকেই আমি সব কাজ ফেলে আপনার কাছে বেশীক্ষণ কাটাই। আর আপনার কাছে বেশীক্ষণ কাটাই বলে অন্য মেয়েরা কত কথা শোনায় আমাকে।

অনিলা বলেছিলো, সত্যিই, তুমি আমার কাছে বসে থেকো না। তোমার কত কাজ চারদিকে. ওরা তো কথা শোনাবেই।

—আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কী ভাবেন এত সময়?

সত্যি, অনিলার কি কম ভাবনা! সে-সব কথা তো পরকে বলা যাবে না। বললে তারা বুঝবেও না। সমস্তক্ষণ একলা-একলা খোকার মুখখানা ভেবে-ভেবেও যেন কূল-কিনারা পেত না। চোদ্দ বছর। চোদ্দ বছর এইখানে কাটাতে হবে তাকে। চোদ্দ বছব কি অনিলা বাঁচবে? আব যদি বাঁচেও, বাড়ি ফিরে গিযে কি দেখবে? সেই বাতাবীলেবু গাছটা তখন হয়তো আর দেখতে পাবে না সে। কত বড়-বড় বাতাবী লেবু হতো. সেই লেবুগাছতলায় খেলা করতো খোকা। চোদ্দ বছর পরে হয়তো বাড়ি গিযে খোকাকে দেখতেই পাবে না সে!

হঠাৎ সুশীলা এসে বলতো, দিদি, আপনার ভাত নিয়ে এসেছি, খেয়ে নিন।

প্রথম প্রথম অনিলা ভাবত তার সমস্ত জীবনটা বুঝি এই জেলখানার মধ্যেই কেটে যাবে। কোথা দিয়ে সূর্য উঠবে, কোথা দিয়ে সন্ধ্যে হবে, কিছুই সে দেখতে পাবে না। তার নিজের জীবনের সূর্যোদয় যেমন সে দেখতে পায়নি, তেমনি তার জীবনের সূর্যাস্তটাও সে দেখতে পাবে না। এইখানে এই কয়েদখানার মধ্যেই তার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটবে।

কিন্তু কোত্থেকে কে যে তার কাছে এই সুশীলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে তাকে বেছে-বেছে ভালো জিনিসগুলো রান্নাঘর থেকে এনে দিত। বলতো, আজকে আপনার জন্যে একটা সন্দেশ এনেছি দিদি।

সন্দেশ! সন্দেশ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিলা। বরাবর ধান মেশানো চালের মোটা অসেদ্ধ ভাত আর তরি-তরকারির ঘ্যাঁট। এই তার দু'বেলার খাদ্য! এর মধ্যে সন্দেশ কোথা থেকে এল!

—সন্দেশ কোথা থেকে পেলে? কে পয়সা দিলে?

সুশীলা বলতো, বাজার থেকে বাইরের জিনিস এখানে আনবার কায়দা আছে! ভেতরে সবই পাওয়া যায় পয়সা ফেললে! পান-দোক্তা দরকার হলে তাও পাওয়া যায়! যাদের আফিমের নেশা, তারা লোক দিয়ে আফিমও আনিয়ে নেয়। আফিম থেকে শুরু করে বিড়ি-সিগারেট-মাছ-মাংস-সন্দেশ-রসগোল্লা সবই আনিয়ে নেয়!

অনিলা অবাক হয়ে বলেছিল, এর জন্যে টাকা-পয়সারও দরকার হয় তো। সেসব টাকা-পয়সা কোথা থেকে আসে?

—টাকা-পয়সাও বাইরে থেকে আসে! স্বদেশী বাবুদের আমলে পিস্তল-রিভলবারও আসত। সবই টাকার খেলা!

অনিলার মনে পড়ে যেত তার শ্বশুরের কথা। শ্বশুরও বলতো, সবই টাকার খেলা টাকা দিয়ে যেমন ধান-চাল-কাপড়-নুন-তেল-মশলা কেনা যায়, তেমনি পাপই বলো আর পুণ্যই বলো, টাকা দিয়ে সংসারে সবই কেনা যায়!

শ্বশুরের সামনে অনিলা ঘোমটা মাথায় দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতো।

শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস বড় হিসেবী মানুষ ছিল। দিন-রাত টাকার হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। সোনার গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দিত। অনেকে বন্ধকী গয়না আর ছাড়াতেও পারতো না। সুদ দেওয়ার ক্ষমতাও থাকতো না অনেকের! তখন সেগুলো নিজের সম্পত্তি হয়ে যেত শ্বশুরের। সেই টাকাগুলো শ্বশুরমশাই ব্যাঙ্কে রাখতো না, রাখতো পেতলের ঘড়ায়। পেতলের ঘড়াগুলো মেঝেতে গর্ত করে তাতে পুঁতে রেখে ওপরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো। আর সামান্য কিছু টাকা ক্যাশ বাক্সতে রেখে কাজ চালাতো!

এক-একদিন হঠাৎ বৌমাকে দেখে অবাক হয়ে যেত শ্বশুরমশাই। একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠতো। টাকাগুলো তখনও ছড়ানো রয়েছে সামনে। শ্বশুরমশাই মাঝে-মাঝে টাকাগুলো বাক্স থেকে বার করে গুণতো। সে সময় অন্য কেউ তার ঘরে আসুক তা সে চাইতো না।

হঠাৎ ঠিক সেই সময়ে মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে উঠে বলতো, কে?

—আমি বাবা, আমি!

টাকা-পয়সাগুলো ধুতির কোঁচা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিত শ্বশুরমশাই। তারপর মুখটা উঁচু করে বলতো, তা তুমি এ সময়ে কেন? জানো তো এ সময়ে আমি কাজে ব্যস্ত থাকি।

—আপনার আফিম্ আর দুধ এনেছি বাবা!

—তা এর জন্যে এ ঘরে আসবার কি দরকার ছিল? আমাকে ডাকলেই তো আমি বাড়ির ভেতরে যেতে পারতুম!

তা তখন আর কিছু করবার নেই। বউমা ততক্ষণে যা দেখবার সব দেখে ফেলেছে।

শ্বশুর বলতো, দাও—

আফিমের গুলিটা বউমার হাত থেকে নিয়ে শ্বশুর মুখে ছুঁড়ে দিত। তারপর দুধের বাটিটা নিয়ে দুধটা চুমুক দিয়ে খালি বাটিটা বউমার হাতে দিয়ে বলতো— এবার থেকে বউমা, তোমাকে আর কষ্ট করে আমার ঘরে আসতে হবে না, আমাকে একবার ডাকলেই আমি বাড়ির ভেতরে গিয়ে দুধ খেয়ে আসবো। বুঝলে?

আসলে বউমা শ্বশুরের টাকা-কড়ি, গয়না-টয়নার পাহাড় দেখে ফেলবে, এটা শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসের ভালো লাগতো না।

সেদিন থেকেই হেমন্ত বিশ্বাস সাবধান হয়ে গেল। বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন বিছানাটা উঠিয়ে পেতলের ঘড়ার ভেতর থেকে টাকা-গয়না সব বার করতো। তারপর একটা কাগজের টুকরোয় সব লিখে রাখত। তা থেকে আবার বেশী রাত পর্যন্ত জেগে পাকা খাতাটায় লিখে রাখতে হতো। সেই পাকা খাতাটা আবার যেখানে-সেখানে রাখলে চলবে না। বাইরে রাখলে কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।

সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়তো অনিলার।

সুশীলা মাঝে-মাঝে এসে পাশে বসতো।

বলতো, কী এতো ভাবছেন দিদি?

অনিলা বলতো, ভাবনার কি শেষ আছে ভাই। আব না ভেবেই বা করবো কী? আর তো কোনও কাজ নেই আমার!

সুশীলা বলতো, অত ভাবা ছেড়ে দিন তো আপনি। এখানে কত লোক এল গেল, কত লোকের ফাঁসি হয়ে গেল দেখলুম, কেউ তো আপনার মত এত ভাবে না। দেখবেন কোথা দিয়ে যে চোদ্দ বছর কেটে যাবে, শেষকালে টেরও পাবেন না। এখানে এসে কত লোকের শরীর ভালো হয়ে গেছে, তাও দেখেছি আমি।

চোদ্দ বছর।

চোদ্দ বছর যে কী করে তার কাটবে, তাই ভেবেই অনিলা প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় পাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়। 'জেল' কথাটা কানে শোনা ছিল অনিলার। লোকে খুন করে ফাঁসি-কাঠে ঝোলে, তাও লোকের মুখে শুনেছিল সে! কিন্তু সেই তাকেই যে একদিন জেলখানাতে আসতে হবে, তা সে-কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল!

· জীবন জিনিসটা যে কী, তা ছোটবেলায় অনিলা বুঝতে পারেনি। বাপ মারা গিয়েছিল কবে তা মনে নেই। লোকে বলতো তার বাবা নাকি খুব ভালো মানুষ ছিল। কিন্তু সে তো শোনা কথা! বাবাকে অনিলা দেখেনি, কিন্তু মাকে দেখেছে। অনেক কষ্টে মা তাকে মানুষ করেছিল। বলতে গেলে মা নয়, মাসির কাছেই সে মানুষ হয়েছিল।

মাসি মা'কে সান্ত্বনা দিত। বলতো, কিছু ভাবিসনি তুই আমি তো বেঁচে আছি। আমি ঠিক তোর মেয়ের একটা হিল্লে করে দেব। মেয়ের জন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

মা'র অম্বলের অসুখ ছিল। যখন অম্বল হতো তখন মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতো। কবিরাজ বলে দিয়েছিল রোগটার নাম 'অম্লশূল'।

'অম্লশূল' রোগে নাকি বড় কষ্ট! কিন্তু নিজের বিধবা বোন বলে মাসিমা মা'কে যতদূর সাধ্য যত্ন করতো। মা'র জন্যে বিশেষ-বিশেষ রান্না করে দিত। মা বলতো, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না দিদি, আর বেশী দিন তোমাকে কষ্ট দেব না—

মাসি বলতো, তুই থাম তো, বেশী বক্-বক্ করিসনি। আমি যখন আছি তোর ভাবনাটা কিসের?

মেসোমশাই মানুষটাও ভালো ছিল খুব। মাসির সঙ্গে যখন মেসোমশাই-এর বিয়ে হয়, তখন তার ভালো অবস্থা ছিল না। অনিলার বাবার মতোই অবস্থা ছিল তার।

কিন্তু পুরুষের ভাগ্য কখন খোলে তা কি বলা যায়?

মেসোমশাই-এর অবস্থাও একদিন ভালো হয়ে গেল। বড়লোক হয়ে গেলেও কিন্তু শালীর ভালো-মন্দের দিকটা দেখতে ভোলেনি। মা কেবল মাসিকে বলতো, আমার অনিলার একটা ব্যবস্থা করে দিও দিদি, ও মেয়েটাই যে আমার গলায় কাঁটা হয়ে ফুটছে।

শেষকালে অনেক বলার পর তবে একটা পাত্র জুটলো।

পাত্র ভালোই। পাত্রের বাপ হেমন্ত বিশ্বাস মহাজন মানুষ। কুসুমগঞ্জের বাদা অঞ্চলে প্রায় নিজস্ব দেড় হাজার বিঘে ক্ষেত-জমি আছে। তাতে ভাগে চাষ-বাস করায় হেমন্ত বিশ্বাস। তাতে নিজেদের খাবার রেখেও মোটা টাকা আমদানী হয়। কুসুমগঞ্জের লোকেরা হেমন্ত বিশ্বাসকে খুব ভক্তি করে। তারই ছেলে হল পাত্র। নাম বসন্ত।

বসন্তকে একদিন দেখে পছন্দ করে এলো মেসোমশাই।

এসে বললে, সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম, বুঝলে গো?

মাসিমা বললে, দিতে-থুতে হবে কী রকম?

মেসোমশাই বললে, হেমন্ত বিশ্বাস মশাই-এর কি কম টাকা? সে-কি টাকার ভিখিরী?

মাসিমা জিজ্ঞেস করলে, আর পাত্তোর?

—পাত্তোরকে দেখলে সক্কলের চোখ কপালে উঠবে! এমন চেহারা।

তা এও বোধহয় কপাল! নইলে বিধবার একমাত্র মেয়ে, অনিলার কপালে এমন পাত্র জুটবে, এটা কে কল্পনা করেছিল?

পাত্র বসন্ত যেমন দেখতে, তেমনি শিক্ষিত। সে মেয়ে দেখতেও চাইলে না।

বললে, বাবা যখন পাত্রী পছন্দ করেছে তখন আর তা দেখবার কী আছে।

কলকাতায় থেকে সে বি-এ পাশ করেছে। বুদ্ধি-বিবেচনা ভালো।

বসন্ত বলেছিল, বিয়ে আমি করছি, কিন্তু কোনও যৌতুক নিতে পারব না।

হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, তাহ'লে বিয়ের খরচা কি আমি নিজের ঘর থেকে দেব বলতে চাস। দশটা গাঁয়ের লোক এসে পাত পেড়ে খাবে, তার জন্যে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা খরচ হবে। সে খরচাটা খামোকা আমি কেন করতে যাবো?

বসন্ত বলেছিল, বিয়েতে পণ নেওয়া পাপ বলে আমি মনে করি।

হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে তোমার এই বুদ্ধি হয়েছে? এমন হবে জানলে আমি তোমাকে লেখা-পড়া শেখাতাম না। আমার এত টাকা-কড়ি, সোনার গয়না, সেই মহাজনী কারবার, আমি মরে গেলে এসব তো তোমাকেই দেখতে হবে একদিন। তোমার মতি-গতি দেখে তো মনে হচ্ছে না, এসব তুমি রাখতে পারবে!

বসন্ত বাবার কথায় প্রথম প্রথম চুপ করে থাকতো। কিছু বলতো না। কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলতো, বেশী টাকা থাকা কি ভালো?

হেমন্ত বিশ্বাস ছেলের কথা শুনে চমকে উঠতো! বলতো, তার মানে? তুমি বলছো কী? বেশী টাকা থাকা ভালো নয়?

বসন্ত বলতো, না।

—কী বললে?

যেন ভুল শুনেছেন কথাটা? যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না ছেলের মুখের জবাবটা। আবার জিজ্ঞেস করলে, কী বললে তুমি? আবার ভালো করে বলো?

বসন্ত বললে, আমি বলছি বেশি টাকা থাকা ভাল নয়।

হেমন্ত বিশ্বাস তবু যেন কথাটা বিশ্বাস কবতে পারলো না। বললে, বেশি টাকা থাকা ভাল নয় কেন? বেশি টাকা থাকাটা কি দোষের? যত বেশি টাকা থাকবে ততোই তো সুখ। টাকার অভাব তো কখনও বুঝলে না, তাই ও-কথা বলছো। যাদের টাকা নেই, তাদের অবস্থাটা একবার গিয়ে দেখে এসো। দেখে এসো গিয়ে কী অবস্থায় তারা দিন কাটাচ্ছে, কী দুরবস্থার মধ্যে তারা আছে! শীতের দিনে গায়ে দেবার মত একটা জামা নেই, এক সের চাল কেনবার মত পয়সা নেই। অনেক সময়ে পুকুরের কলমীশাক সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খাচ্ছে। তুমি ওসব দেখনি, কিন্তু আমি দেখেছি। তুমি অভাব কাকে বলে তা জানো না বলেই এই কথা বলছো। আমি তোমাকে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা দিয়ে আরামে রেখেছি বলেই তুমি বলতে পারলে 'বেশি টাকা থাকা ভাল নয়'।

বসন্ত বললে, আমি তো বলিনি যে 'টাকা থাকা ভালো নয়'। আমি শুধু বলেছি যে 'বেশি টাকা থাকা ভালো নয়'।

—তা 'বেশি' বলতে তুমি কী বোঝ? কত টাকা হলে বেশি টাকা হবে? পনেরো হাজার? বিশ হাজার, চল্লিশ হাজার না একলাখ?

বসন্ত বললে, আমি সে-সব জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, দরকারের বেশি টাকা থাকা অন্যায়!

—দরকাব? দরকারের মাপকাঠি কী? একটা ভারি অসুখ হলে চিকিৎসার খরচটুকুও থাকবে না, এইটেই তুমি বলতে চাও?

বসন্ত বললে, না, তাতো আমি বলিনি। গ্রামের সবাই গরীব থাকবে, খেতে পাবে না, পেটের দায়ে আপনাব কাছে জমি বন্ধক রাখবে আর দরকারের সময় জমি ছাড়িয়ে নিতে পারবে না, আর অন্যদিকে আমরা মজা করে খাবো-দাবো, এটা ভালো নয়।

রাগে হেমন্ত বিশ্বাসের আগা-পাশতলা জ্বলতে লাগলো। বললে, তুমি তো আগে এ-রকম ছিলে না। এ-রকম হলে কবে থেকে? এখন দেখছি তোমাকে কলকাতায় পাঠানোই আমার আহাম্মকি হয়েছে। এসব কথা কি কলেজের প্রফেসরেরা তোমাকে শিখিয়েছে নাকি?

বসন্ত বললে, না, আমি এ-সব আমাদের ইকনমিক্সের বইতে পড়েছি। কার্ল মার্কসের বই পড়ে শিখেছি।

—কার্ল মার্কস? না, কী বললে তুমি?

বসন্ত বললে, কার্ল মার্কস!

—কার্ল মার্কস? সে আবার কে? কী বই লিখেছে?

বসন্ত বললে, সে আপনি বুঝবেন না। তিনি একজন মহাপুরুষ, তিনি মানুষের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বই লিখে গেছেন। অনেক লোক তাঁকে দেবতা বলে মানেন।

—দেবতা? অনেক দেবতার নাম শুনেছি। শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, কিন্তু কার্ল মার্কস বলে কোনও দেবতার নাম তো শুনিনি। কীসের দেবতা? কে তাকে পূজা করে? কারা তারা?

বসন্ত বললে, পৃথিবীব অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকই পূজো করে।

—পাঁজিতে তার নাম আছে?

বসন্ত বললে, না পাঁজিতে নেই, কিন্তু তাঁকে নিয়ে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বই লেখা হয়েছে।

হেমন্ত বিশ্বাস বুঝলো জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

বললে, যাক্‌গে যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার তো পাশ করে গেছ। এবার ও-সব কথা ভুলে যাও। কাল থেকে তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে। আমার বয়েস হচ্ছে, আমিও আর বেশি দিন এত সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারবো না। তোমাকেই নিজে এ-সব কাজ করতে হবে। আমি চাই এখন থেকে তুমি সব বুঝেসুঝে নাও।

হেমন্ত বিশ্বাস মুখে কথাগুলো বললে বটে, কিন্তু মনে-মনে বুঝলো, এ-ছেলেকে শোধরানো এখন শক্ত। তবু শক্ত হলেও চেষ্টা করতে হবে।

তাই পরের দিন থেকে বসন্তকে নিয়ে কাগজ-পত্র সব দেখাতে লাগলো। বললে, এই দেখ, এইগুলো হচ্ছে তমসুক। এইগুলো হচ্ছে জমা-খরচের হিসেব। কার কাছে কত টাকা পাই, কাকে কত টাকা দিয়েছি, কত বকেয়া পাওনা আছে, এতে তারই হিসেব লেখা আছে। এগুলো একদিনে বুঝতে পারবে না, বুঝতে সময় লাগবে। কিন্তু চেষ্টা করলে কী-ই না হয়? আমিই কি ছাই আগে বুঝতুম? চেষ্টা করে করে নিজেই বুঝে নিয়েছি। আর দেখ, এইগুলো হচ্ছে ম্যাপ, সেটেলমেণ্টের ম্যাপ। আমার কত জমি আছে তারই হিসেব।

প্রথম-প্রথম বসন্ত বাবার কাছে বসে কাগজ-পত্র দেখে বুঝতে শিখলো। হেমন্ত বিশ্বাসও মন প্রাণ দিয়ে ছেলেকে বোঝাতে লাগলো।

কিন্তু শুধু বোঝালে চলবে না। তাকে সংসারী করতে হলে প্রথম কাজ, তার একটা বিয়ে দিতে হবে। সেইদিন থেকেই পাত্রীর খোঁজে লেগে গেল হেমন্ত বিশ্বাস।

বাংলাদেশে কখনও বিয়ের পাত্রীর অভাব হয়নি, এখনও হলো না।

একে তো হেমন্তর বাড়িতে টাকার পাহাড়, তার ওপর পরিবার নেই। একটি মাত্র ছেলে—তা সেও আবার বি-এ পাশ। সেই পাত্রের সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে অভাবের মুখ কখনও দেখতে পাবে না।

কুসুমগঞ্জে মেয়ের অভাব নেই। অনেক লোকের অনেক অরক্ষণীয়া কন্যা আছে। তারা খবরটা পেলেই ঝুলোঝুলি আরম্ভ করে দেবে।

কিন্তু হেমন্ত এত সহজ লোক নয় যে, খবরটা রাতারাতি রটিয়ে দেবে আর একপাল মেয়ের বাপ এসে তার দরজায় ধর্ণা দেবে।

একজন খাতক এসে একবার খবর দিয়েছিল যে, দশ ক্রোশ দূরে দিনহাটাতে একটা বাপ-মরা মেয়ে আছে, সে দেখতে অপরূপ সুন্দরী। মেয়েটির মা আছে, কিন্তু বাপ নেই। তা না থাক। বাপ না থাকাই ভালো। বাপ থাকলে কথায়-কথায় বেয়াই-এর কাছে এসে টাকাটা-সিকেটা চাইবে। মেয়ের ভাইবোন কেউ নেই, সেটাও ভালো। কথায়-কথায় তারাও জামাইবাবুর বাড়িতে এসে খেয়ে-থেকে যাবে, উৎপাত করবে। খরচের চূড়ান্ত হবে তখন। অথচ কুটুম মানুষদের কিছু বলাও যাবে না।

থাকবার মধ্যে আছে এক অম্বুলে রুগী মা। তা সেও বেশিদিন বাঁচবে না। থাকে ভগ্নিপতির বাড়ি। মানে তাদের গলগ্রহ।

হয়তো কিছু বরপণ দিতে পারবে না। তা বরপণ দিতে না পারলো তো বয়েই গেল। বরপণ না নিলে বরং হেমন্তর গুণ-গানই করবে লোকে।

বলবে, হেমন্ত বিশ্বাস মহাজনী কারবার করলে কী হবে, কঞ্জুষ নয়। ছেলের বিয়ে দিয়ে একটা আধলাও নেয়নি।

তাতে দুর্নামের বরং কিছুটা লাঘব হবে।

হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, মেয়ের গোত্র কি?

গোত্র-বংশ সবই পছন্দসই। সবই মিলে গেল। একদিন নিজে গিয়ে পাত্রীকে চর্মচক্ষে দেখেও এল হেমন্ত বিশ্বাস। সেই দেখার সঙ্গে-সঙ্গে একজোড়া সোনার বালা দিয়ে একেবারে আশীর্বাদও করলো। বললে, পাত্রকে দেখার ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন।

পাত্রীর মেসোমশাই যেন তখন হাতে সোনার চাঁদ পেয়েছে। বললে, দেখাদেখির আর কী আছে। দেখা আর আশীর্বাদ একসঙ্গেই করে আসবো আমি। তা সেই ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে গেল সেদিন। পাঁজি দেখে দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল।

অনিলার মনে আছে, সে-দিনটা একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। চিরকালের মত মাকে ছেড়ে পরের বাড়িতে চলে যেতে হবে, আর সেই বাড়িটাকেই নিজের বাড়ি বলে ভাবতে হবে, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

অনিলার ভয় হয়েছিল। মা বলেছিল, ভয় হচ্ছে কেন রে?

অনিলা বলেছিল, কোথায় পরের বাড়ি চলে যাবো, সেখানে কে আমাকে দেখবে, কে আমাকে যত্ন করবে কি করবে না। তুমি কোথায় থাকবে, আর আমি কতদূরে থাকবো।

মা বলেছিল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে বিয়ে একদিন করতে হবে মা, আর মেয়েমানুষের বিয়ে হলে তো পরের বাড়ি যেতেই হয়। এ সকলের বেলাতেই হয় মা, আমারও তাই হয়েছে, তোমার মাসিমারও তাই হয়েছে। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই মা, ভয় কী? একবার বিয়ে হয়ে যাক, তখন দেখবে আমার বাড়িতে আর তুমি আসতেই চাইবে না।

অনিলা বলেছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে যে আমি তোমাকে দেখতে পাবো না মা!

মা বলেছিল, আমাকে না-ই বা দেখতে পেলে। তুমি তোমার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করবে। রাজরাণী হবে। আমি আর মা কতদিন বাঁচবো? মা কি কারোর চিরকাল বেঁচে থাকে? তখন দেখবে আমাকে তুমি একেবারে ভুলে যাবে। আমার কথা মনেই পড়বে না তোমাব! এরই নাম তো সংসার মা!

আশ্চর্য, বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল অনিলা! এখন ভাবলে হাসি পায়।

পাড়ার লোকেরা বর দেখে প্রশংসায় একেবাবে পঞ্চমুখ।

সবাই বললে, অনেক তপস্যা করলে এমন বর পাওয়া যায় গো। ছুঁড়ির কপালটা ভালো।

সত্যিই বসন্তকে দেখতে ভালো। অনেক তপস্যা করলে অমন স্বামী মেয়েমানুষের কপালে জোটে বটে। আর শুধু তো চেহারা নয়, তার ওপর লেখাপড়া জানা বর! আর সকলের ওপর বাপের টাকা। টাকার খবরটা কেমন করে জানি না সারা গ্রামে রটে গিয়েছিল। লোকের মুখে-মুখে সবাই জেনে গিয়েছিল যে, বাপের দেড় হাজার বিঘের মতো জমি-জমা আছে। তা ছাড়া আছে টাকার পাহাড়।

তা কথাটা যে মিথ্যে নয়, তা বৌভাতের দিনেই বোঝা গেল। যারা নেমন্তন্ন খেতে এলো তারা বসন্তর বউ দেখে অবাক। একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনার গয়নায় মোড়া।

বসন্ত নাকি আপত্তি করেছিল প্রথমে।

কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস শোনেনি! বলেছিল, তুমি থামো, আমার বাড়ির এই প্রথম আর এই-ই শেষ বিয়ে, বউকে না সাজালে লোকে বলবে কী? বলবে হেমন্ত বিশ্বাস গরীব মানুষ, তার টাকা নেই।

বসন্ত বলেছিল, টাকা না-থাকাটা কি লজ্জার?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, লজ্জার নয়? বলছো কী তুমি? যার টাকা নেই, তাকে কি লোকে ভালো চোখে দেখে? তাকে কি শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে?

—শ্রদ্ধা আর সম্মান বড়, না ভালোবাসা বড়ো?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শুকনো ভালোবাসায় কি পেট ভরে? এই যে তোমার বৌভাতে আজ দশখানা গ্রামের লোক আমার বাড়িতে পাত পেড়ে খাবে, এতে তারা খুশী হবে না বলে মনে করো? সবাই খেয়ে আমাকে ধন্য-ধন্য করবে, তা জানো?

—আমি তা মনে করি না। সবাই পেট পুরে খাবে, কিন্তু মনে-মনে সবাই আপনাকে হিংসে করবে।

—হিংসে করবে? হিংসে করবে কেন?

—আপনার টাকা আছে বলে হিংসে করবে। তারা পেট পুরে খেয়ে বলবে, বিশ্বাসমশাই আমাদের খাইয়ে তার ঐশ্বর্য দেখাচ্ছে। এতে তারা আপনাকে অভিশাপ দেবে।

—তাহ'লে কি বলতে চাও আমি আমার রক্ত-জল-করা টাকাগুলো পরকে বিলিয়ে দিই? তুমি কি তাই-ই চাও?

—আমি কি বলেছি, আপনি টাকাগুলো পরকে বিলিয়ে দেন?

—প্রকারান্তরে তাই-তো তুমি বলছো।

বসন্ত বললে, না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি আপনার ঐশ্বর্য এত ঘটা করে পরকে দেখাবেন না। দেখালে যাদের নেই, তাদের মনে কষ্ট হবে!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, ছেলে-মেয়ের বিয়েতেই তো লোকে ঘটা করে। এই সব ব্যাপারে যদি ঘটাই না করি, তো কবে ঘটা করবো? আমার যে টাকা আছে, তা কবে কি করে লোককে দেখাবো তা হলে?

বাড়িতে একটা গৃহিনী নেই, মা-পিসী-মাসী-দিদি-দিদিমা-ঠাকুমা নেই যে ব্যবস্থা করবে। বিয়ের ব্যাপারে যা-কিছু করণীয় সবই করছে পাড়ার মেয়েরা। তারাই বউ-বরণ, ফুলশয্যা, গায়ে-হলুদের ব্যাপারট্যাপার সব কিছুতেই সাহায্য করেছিল।

বসন্ত যখন নতুন বউ নিয়ে কুসুমগঞ্জের বাড়িতে এল তখন পাড়ার ন'কাকিমা, বড়-পিসিমারাই বউকে বরণ করে ঘরে তুললো। অচেনা জায়গা, অচেনা মুখ, অচেনা পরিবেশ। কান্না পেতে লাগলো অনিলার। কার সঙ্গে সে তার মনের কথা বলবে তাও সে ভেবে পেলো না!

নতুন বউ-এর মুখ দেখে সবাই বাহবা দিয়ে উঠলো।

কে একজন বুড়ি মতন মহিলা এসে অনিলার বেনারসী ঘোমটা তুলে বললে, ওরে, এ যে সগ্যের অপ্সরাকে বিয়ে করে এনেছিস রে বসন্ত, তুই কত ভাগ্যি করেছিলি রে। তোর বউ-ভাগ্যি তো ভালো।

সবারই মুখে ওই একই কথা! বললে, যুগ্যি ছেলের যুগ্যি বউ!

কথাগুলো সকলের কানেই গেল। হেমন্ত বিশ্বাস একদিনের জন্য তার প্রাত্যহিক কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিল। জামা-কাপড় পরে শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসের সেদিন অন্য চেহারা। অন্যদিন হেমন্ত বিশ্বাস গায়ে শুধু একটা ফতুয়া পরেই থাকে। আর পরনে থাকে একটা মোটা আটহাতি ধুতি। ওইতেই দিন কেটে যায়। হেমন্ত বিশ্বাসের তাতে খরচও বাঁচে আর আরামও হয়।

তা সেদিন কাল-রাত্রি। অনিলাকে একলা রাত কাটাতে হলো না। আশে-পাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা এসেই তাকে সঙ্গ দিলে! কত রকমের গল্প-গুজব-হাসি-ঠাট্টাতে কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেল বোঝা গেল না। কে একজন পাড়ার বুড়ি দিদিমার বয়েসী মেয়েমানুষ বললে, আজ নাত-বউ এর পাশে আমি শোব, আজকে আর নাতির সঙ্গে তোমাকে শুতে নেই।

দিদিমার কথায় অন্য মেয়েরা সবাই হেসে উঠলো।

তার পরদিনই ফুলশয্যা বা বৌভাত। সমস্ত বাড়িখানা একেবারে লোকে-লোকারণ্য। গ্রামের মহাজনের একমাত্র ছেলের বিয়ে। সেদিন আর কারো বাড়িতে রান্না হলো না। দশখানা গ্রামের লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে নেমন্তন্ন খেতে।

অনিলার আজও মনে আছে সে-দিনটার কথা!

সকাল থেকে নানা-রকম রান্নার গন্ধতে বাড়িটা ভুর ভুর করছে। হেমন্ত বিশ্বাস কৃপণ মানুষ হলে কি হবে। ছেলের বিয়েতে একেবারে মুক্তহস্ত। তোমরা দেখে যাও আমি ছেলের বিয়েতে

কত খরচ করেছি। একটা কানা-কড়িও আমি নিইনি পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে। তোমরা আমাকে কৃপণ-সুদখোর মানুষ বলো, তা আমি জানি। কিন্তু এবার দেখে যাও, আমি কত খরচও করতে পারি। লুচি করেছি, আবার পোলাও-ও করেছি। দু'রকম মাছ। পোনা মাছ আর বাগদা চিংড়ি। যারা নিরামিষ খাবে তাদের জন্যে আলু-পটলের দোর্মার সঙ্গে ছানার ডালনাও করেছি। আর মিষ্টি? মিষ্টিই কি কিছু কম করেছি তা বলে! রসগোল্লা, পানতুয়া, দরবেশ, ছানার জিলিপি, আবার-খাবো সন্দেশ, রাবড়ি, দই, পাঁপড়ভাজা। কোন কিছুরই খামতি নেই। খরচ করতে বসেছি যখন—তখন আর হাত-টান করিনি কোনও ব্যাপারেই। আর পাত্রীর বাড়ির ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখে তোমরা নিন্দে করো না। আমি তো কুটুমের পয়সা দেখে সম্বন্ধ করিনি। আমি শুধু দেখেছি মেয়ের রূপ আর দেখেছি মেয়ের গুণ।

—ও মুকুন্দ, তুমি হাত গুটিয়ে বসে কেন? খাও, হাত চালাও।

মুকুন্দ বলে, খাচ্ছি তো খুড়োমশাই, কিন্তু এত আয়োজন করেছেন যে আর পেটে ধরছে না।

হেমন্ত প্রত্যেকের কাছে গিয়ে-গিয়ে ওই একই কথা বলছেন—কী রকম বউ দেখলে বলো হরিহর। এমন বউ আগে কারো ঘরে এসেছে?

হরিহর গ্রামের মিস্ত্রি মানুষ। খেতে পেয়ে একেবারে বর্তে গেছে।

পেটে আর তার ধরে না, তবু গোগ্রাসে গিলছে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, রাজপুত্তুরের বউ কি আর ঘুঁটেকুড়ুনীর মতো হবে দাদামশাই? যুগ্যি জায়গায় যুগ্যি কনেই এয়েচে।

অনিলা যে ঘরে বউ হয়ে সোনার গয়নায় মুড়ে বসেছিল তার পাশের ছাদেই লোকেরা খেতে বসেছিল। সব কথাই টুকরো-টুকবো ভাবে তার কানে আসছিল।

মাসিমা-মেসোমশাই মা সবাই এসেছিল। যাবার আগে সবাই এসে দাঁড়ালো। বললে, যাই রে বুড়ি, তোর কপাল ভালো যে এমন রাজ-বাড়িতে পড়েছিস। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমরা আসি মা। স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর করো, রাজরাণী হও, এই আশীর্বাদ করি মা। আর দু'দিন পরেই বেয়াই মশাইকে বলে তোমাকে নিয়ে যাবো। একদিন একটু কষ্ট-সষ্ট করে থাকো মা।

অনিলা আর কী বলবে। তার চোখ দু'টো তখন কান্নায় ছলছল করছে।

মা চিবুকে হাত দিয়ে বললে, ছি, কাঁদে না মা, কাঁদতে নেই। অনেক ভাগ্য করলে এমন ঘর-বর পাওয়া যায়, তবু তোমার কান্না আসছে, ছিঃ—

অনিলা বলতে গেল, মা তোমার শরীরের দিকে একটু যত্ন নিও—কিন্তু বলতে গিয়েও কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোল না। চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল। গলাটা বুঁজে এল। সবাই চলে গেল।

সুশীলা সেদিন সব দেখে অবাক। বললে, এ কি দিদি, কিছুই খাননি যে আপনি? সবই পড়ে রয়েছে যে।

অনিলা বললে, আর খাবো না সুশীলা, আমার ক্ষিধে নেই।

—তা আপনারই বা দোষ কী? কত বড় ঘরের বউ আপনি আমি কি তা জানি না, আমি সবই শুনেছি। জেলখানার এসব খাবার আপনার মুখে রুচবে কেন?

বলে এঁটো থালাটা ভাত সুদ্ধ তুলে নিয়ে যায়। সুশীলার অনেক কাজ। জেনানা-ফাটকে আরো অনেক কয়েদী আছে, তাদেরও দেখতে হয় তাকে। কাজে গাফিলতি হলে তাকেও গাল-মন্দ খেতে হয়। তাই বেশিক্ষণ বসতে পারে না অনিলার কাছে।

তবু সময় পেলেই দৌড়ে আসে। এসে বলে, একটু হাঁ করুন তো দিদি, হাঁ করুন—অনিলা বুঝতে পারে না। বলে, কেন হাঁ করতে যাবো কেন? হাতে কি তোমার?

সুশীলা তবু জোর করে। বলে, হাঁ করুন না একটু, একটা জিনিস খাওয়াবো আপনাকে।

—জিনিসটা কী তা-ই বলো না?

সুশীলা তবু ডান হাতটা মুঠো করে থাকে। বলে, আগে হাঁ করুন, তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন। ভয় নেই, আমি বিষ খাওয়াবো না, আপনি হাঁ করুন— শেষ পর্যন্ত অনিলা হাঁ করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সুশীলা ডান হাতের মুঠোর জিনিসটা পুরে দিলে অনিলার মুখে।

অনিলা জিনিসটা খেয়ে বুঝতে পারে, পান। পানের খিলি একটা।

পান চিবোতে-চিবোতে অনিলা বলে, পান কোথায় পেলে তুমি?

সুশীলা বললে, শুধু পান কেন, জেলখানায় আপনি যা চাইবেন তাই-ই জোগাড় করে দিতে পারি আপনাকে। এখানে কোনও জিনিসের অভাব নেই। এ শুধু নামেই জেলখানা। শুধু বাইরে বেরোন যায় না, এইটেই একটা অসুবিধে।

কেন যে সুশীলা এই আট বছর ধরে তাকে এত খাতির-যত্ন করে এসেছে, তা অনিলা বুঝতে পারেনি। মনে আছে, কোর্টে যখন প্রথম সে জজসাহেবের রায় শুনেছিল তখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থাই হয়েছিল তার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! সারাটা জীবন জেলখানায় কাটাতে হবে, এ যে কল্পনাও করতে পারেনি সে।

কিন্তু না, পরে শুনেছিল সারা জীবন মানে চোদ্দটা বছর। তা চোদ্দটা বছরও কি কিছু কম? তখন সে যে বুড়ি হয়ে যাবে। তখন আর জীবনের বাকিটা কী থাকবে। প্রথমেই মনে পড়ল সুমন্তর কথা।

কত কষ্ট করে সুমন্তকে মানুষ করেছে সে। সব ছেলেদের মানুষ করা কষ্টের। টাকার কষ্টটা বড় কথা নয়। হেমন্ত বিশ্বাস যার শ্বশুর তার টাকার কষ্ট হবার কথা নয়। কুসুমগঞ্জের মানুষেরা সবাই জানতো, বিশ্বাস-বাড়িতে টাকার অভাব নেই। দারিদ্র্যের জন্যে কেউ মানুষ হতে পারবে না, বিশ্বাস বাড়িতে এ-ঘটনা ঘটা অসম্ভব।

বরং উল্টোটাই সত্যি। শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস মশায় খুব ভালোবাসতো অনিলাকে। বলতো, বউমা, তুমি একটু বসন্তকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সংসারী করে তুলতে পারো না?

সত্যিই বসন্ত ছিল অন্য ধাতুর মানুষ। বৌভাতের দিনেই সেকথা বুঝতে পেরেছিল অনিলা। সেই গয়না পরা নিয়েই শুরু হয়েছিল। প্রথমে বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি। ছেলে বাবার মহাজনী ব্যবসাই পছন্দ করতো না। ওই মহাজনী কারবারের ওপরেই বসন্তের ছিল যত রাগ।

হেমন্ত বিশ্বাস সেটা জানতো। তাই ছেলের জন্যে এমন একটি বউ খুঁজতে আরম্ভ করেছিল, যে সুন্দরী। যৌতুকের দরকার নেই, দেনাপাওনার দরকার নেই, বংশগৌরব থাকুক বা না থাকুক, তা জানবারও দরকার নেই। শুধু কনে রূপসী হলেই চলবে।

হেমন্ত বিশ্বাস অনেক পাত্রী দেখেছিল। ঘটকও লাগিয়েছিল অনেকগুলো। পাত্রী শুধু সুন্দর হওয়া চাই। তাও আবার যেমন-তেমন সুন্দরী নয়। ডাকসাইটে সেরা সুন্দরী। যেন বউ দেখে লোকে বলে, হ্যাঁ বিশ্বাস মশাই বউ করেছে বটে, যেন ডানা-কাটা পরী।

এখন অবশ্য অনিলার আর সে-রূপ নেই। জেলখানার লপ্‌সি খেয়ে-খেয়ে সে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে।

তবু সুশীলা বলতো, এমন রূপ কোথা থেকে পেলেন দিদি?

অনিলা মনে-মনে হাসতো। হ্যাঁ, এমন রূপ না পেলেই হয়তো তার জীবনে অন্তত আর কিছু না হোক শান্তি আসতো। তার মা বিয়ের পর থেকে সারা জীবন বিধবা হয়ে কাটিয়েছে। মা'রও রূপ ছিল, কিন্তু অনিলার তুলনায় তা কিছুই নয়। হয়ত তার বাবাও ছিল রূপবান পুরুষ। বাবাকে জন্মে ইস্তক দেখেনি। কিন্তু মাকে দেখেছে। মা-ও হয়তো তার বয়েসে রূপসী ছিল। তবে অম্বলের রোগে মা শেষের দিকে একেবারে কালচে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ছিল মাসির বাড়ির গলগ্রহ। ভাবনায়-চিন্তায় মার রোগ শেষের দিকে আরো বেড়ে গিয়েছিল। মেয়ের বিয়ে যখন পাকা হলো তখন মার মুখে প্রথম হাসি বেরোল। মা গিয়ে মঙ্গল চণ্ডীতলায় পুজো দিয়ে এল।

বললে, এতদিন পরে মা তবু মুখ তুলে চাইলে।

হ্যাঁ, মুখ তুলে চাইলোই বটে। এমনই মুখ তুলে চাইলো যে, একদিন খুনের আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো।

কিন্তু ভাগ্যিস মা তখন বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়তো মা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হতো, কিংবা দম আটকে মারা যেত!

অনেক দিন জেলখানার ভেতর যখন রাত্রে ঘুম আসতো না তখন মাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো মা, আমি যা কিছু করেছি আমার সুমন্তর কথা ভেবে করেছি। তুমি কি চাও মা, যে আমার সুমন্ত পথের ভিখিরি হোক, পথে পথে পেটের দায়ে সে ভিক্ষে করে বেড়াক?

সকালবেলা সুশীলা যথারীতি আসতো। অনিলার চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে যেত। বলতো, কী হলো দিদি, আপনার কি রাতে ঘুম হয়নি?

অনিলা বলতো, না, তুমি কিছু ভেবো না, আমার ঘুম হয়েছে।

—না দিদি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, নিশ্চয়ই আপনাব ঘুম হয়নি, চলুন আজকেই আপনাকে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে নিযে যাবো ডাক্তাববাবুকে খুব ভালো ওষুধ দিতে বলবো।

অনিলা মাথা নাড়তো—ও কিছু না, তুমি ভুল দেখছো।

সুশীলা তবু ছাড়তো না। জোর করে অনিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেত। জেলখানার হাসপাতাল, নামেই শুধু হাসপাতাল। যেমন সেখানকার ডাক্তার, তেমনি সেখানকার ওষুধ। সে ডাক্তার মন দিয়ে কারোর চিকিৎসাও করে না, আর সেই জল-মেশানো ওষুধে কারো রোগও সারে না।

অনিলা ঘবের ভেতরে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে সে-ওষুধ না খেয়ে নর্দমায় ঢেলে দিত। সুশীলা সে-সব জানতেও পারতো না!

অনিলা মনে মনে ভাবতো, কোথায় কত দূরে কোন্ কুসুমগঞ্জে পড়ে রইল তার নিজের ছেলে সুমন্ত। আর কোথায় জেলখানার ভেতরে কোন এক অচেনা মানুষ তাকে নিজস্ব করে নিয়েছে। এরই নাম বোধহয় ভালোবাসা! ভালোবাসার দেবতা সত্যিই অন্ধ।

সুশীলা বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা, আপনি সত্যি বলুন তো দিদি, আপনি কি সত্যিই খুন করেছিলেন? আমার তো বিশ্বাসই হয় না, আপনি কাউকে সত্যি-সত্যি খুন করতে পারেন?

অনিলা হাসতো সুশীলার কথা শুনে। বলতো, জজসাহেব যখন আমাকে খুনী বলে রায় দিয়ে দিয়েছেন, তখন আর আমাকে ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন:

সুশীলা বলতো, বা রে, জজসাহেব বুঝি ভুল রায় দিতে পারেন না? জজসাহেবও তো মানুষ। তারও তো ভুল হতে পারে। তা আপনি আপিল করেছিলেন?

অনিলা বলতো, না! আপিল করে কি হবে? সরকারী উকিল আপিল করবে বলেছিল, আমি রাজী হইনি! আর আপিল করেই বা কী হবে? কপালে যা আছে তাই-ই হবে। মানুষ কি নিজের ইচ্ছায় কিছু করে? ভগবানই সব করায়, আর লোকে বলে তাবা নিজেরাই সব কিছু করে।

আমার কপালে বোধহয় এই শাস্তিই ছিল সবই ভগবানের ইচ্ছে। তুমিও কেউ নও, আর আমিও কেউ নই। নইলে আমিই বা বিধবা হবো কেন হঠাৎ?

সুশীলা আরো কৌতূহলী হয়ে উঠতো। জিজ্ঞেস করতো, সত্যি দিদি, তুমি বিধবা হলে কী করে? কী অসুখ হয়েছিল তোমার স্বামীর?

—তিনিও খুন হয়েছিলেন।

—কে খুন করেছিল?

অনিলা এক-কথায় কথাটার জবাব দিত—টাকা।

সত্যি টাকাই মানুষকে বাঁচায়, আবার সেই টাকাই মানুষকে খুন করে।

এ পৃথিবী বড় বিচিত্র জায়গা। কবে কত হাজার বছর আগে মানুষই একদিন টাকাকে আবিষ্কার করেছিল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। আবার সেই টাকাই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্যে মানুষকে খুন করছে। হেমন্ত বিশ্বাস জানতো শুধু টাকা। আর তাঁর ছেলে সেই টাকাব মূল্য বুঝতো না।

ফুলশয্যার দিন যখন সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল, বসন্ত ঘরের দরজাটায় খিল দিয়ে একপাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অনিলার তখন এক অস্বস্তিকর অবস্থা। লজ্জায় একপাশে জড়ো-সড়ো হয়ে সে-ও দাঁড়িয়েছিল। কে আগে কথা বলবে, তাই নিয়েই যেন প্রতীক্ষা।

কিন্তু সারা রাত তো প্রতীক্ষা করা চলে না। এক সময়ে যেমন দিন শেষ হয়ে রাত্রি আসে, তেমনি প্রতীক্ষার শেষে আবার কথাও হয়।

প্রথমে কথা বললে বসন্তই। বললে, দেখ, তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছে সে বাবার কথাতেই। বাবাই তোমাকে পছন্দ করেছে, বাবাই আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছে। আমি বউ পছন্দ করবার জন্যে তোমাকে একবার দেখতেও যাইনি। তা তো জানো?

অনিলা চুপ করে রইল।

বসন্ত খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললে, কই, জবাব দিচ্ছ না যে?

অনিলা তবু সে-কথার কোনও জবাব দিলে না।

বসন্ত বললে, আমি জানি তুমি নতুন বউ, এত তাড়াতাড়ি নতুন স্বামীর কথার জবাব দিতে নেই—তবু জিজ্ঞেস করছি। তুমি শুধু বলো 'হ্যাঁ' কি 'না'—

অনিলা কোনক্রমে জবাব দিলে, হ্যাঁ।

বসন্ত বললে, হ্যাঁ, জেনে রাখো, আমি তোমাকে বিয়ে করিনি, বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে, তার উদ্দেশ্য আমাকে সংসারী করা। আর আমিও বিনা প্রতিবাদে তোমাকে বিয়ে করেছি।

এ-কথার জবাব দেবার দরকার ছিল না, তাই অনিলাও কিছু জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

বসন্ত আবার বলতে লাগলো, কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগে থেকে বলে রাখা ভালো যে, যদিও আমি এ-বাড়ির ছেলে তবু বাবার আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের আকাশ-পাতাল তফাত। বাবা মনে করে টাকার জন্যেই মানুষ, আর আমি মনে করি মানুষের জন্যেই টাকা। আমাদের এ ঝগড়া চিরদিন চলবে, কোনও দিনই এ মিটবে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি,

এই বাড়িতে দেনাদাররা একটা পয়সার জন্যে চোখের জলে ভেসেছে, তবু বাবার মন গলে না। কত লোক বাসন-কোসন-থালা-ঘড়া-বাটি-গাড়ু বেচে বাবাকে সুদের টাকা শোধ করে দিয়ে গেছে। সুদের একটা পয়সা রেহাই দেবার জন্যে বাবার হাতে-পায়ে ধরে তারা কান্নাকাটি করেছে, তবু বাবা তাঁর একটা পয়সা সুদও ছাড়েনি। এই যে-বাড়িটা তোমার শ্বশুরবাড়ি, এর প্রত্যেকটা ইঁটে গরীব প্রজাদের গরম রক্ত লেগে আছে, এটা মনে করে রেখে দিও। তোমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে-হাওয়া তুমি এখন টানছো আর ছাড়ছো, সে-হাওয়াটা পর্যন্ত বিষাক্ত, এ-কথাটা মনে রেখে দিও। আর মজাটা এই যে, আমি সেই রক্ত-চোষা টাকা দিয়ে লেখাপড়া শিখেছি, বি-এ পাশ করেছি বা মানুষ হয়েছি—

বলে বোধহয় দম নেবার জন্যে বসন্ত একটু থামলো।

তারপর বললে, আমার যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে, এবার তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো।

অনিলা তবু কিছু বললে না। বসন্ত বললে—কই, তবু কিছু বলছো না যে? কিছু একটা বলো, একটা কিছু জবাব দাও?

অনিলা বললে, আমি কী বলবো?

বসন্ত বললে, কিছু যদি না বলবে তো শুয়ে পড়ো। সারাদিন তোমারও তো খুব খাটুনি গিয়েছে।

অনিলা তবু কি করবে বুঝতে পারছিল না। সারা গায়ে তখনও এক-গাদা গয়না রয়েছে। বসন্ত বললে, শোবার আগে ওই গয়নাগুলো আগে খোল। ওই গয়নাগুলো পরা নিয়ে আগে বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো আর ওগুলো কাউকে দেখাবার দরকার নেই। যাদের দেখাবার জন্যে ও-গুলো পরা তারা চলে গেছে। এখন খুলে ফেল।

অনিলা আস্তে-আস্তে একটা-একটা করে গয়না খুলতে লাগল। বসন্ত ঘরের আলমারির পাল্লা দুটো চাবি দিয়ে খুলে দিলে। বললে, এর ভেতরে ওই কঙ্কালগুলো রাখো।

কঙ্কাল! কথাটা অনিলার এখনও মনে আছে। ওগুলো নাকি মানুষের কঙ্কাল! অনিলাকে একটু দ্বিধা করতে দেখে বসন্ত বললে, ওই প্রত্যেকটা গয়না অন্য লোকেদের। ওগুলো অভাবের সময় তারা বাবার কাছে বাঁধা রেখেছিল, কিন্তু আর ছাড়িয়ে নেবার সুযোগ পায়নি। ওদের সঙ্গে তাদের অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে। তুমি যদি ওগুলো কখনও পরো, তা হলে সে অভিশাপ আর সেই দীর্ঘশ্বাস তোমার গায়েও লাগবে। যা বলছি, তুমি বুঝতে পারছো?

অনিলা মাথা নাড়ল। বললে, হ্যাঁ।

অনিলা নিঃশব্দে সব গয়নাগুলো বসন্তর হাতে দিলে। তারপর বসন্ত সেগুলো কোথায় রাখলে আবছা আলোয় তা আর দেখা গেল না।

তারপর আলমারিটা তালা বন্ধ করে দিয়ে বসন্ত বললে—এবার শুয়ে পড়ো, সারাদিন তোমার খাটুনি গেছে।

অনিলা আর কিছু না বলে বিছানার এককোণে গিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে শুয়ে পড়লো।

সুশীলা সেদিন আবার এল। বললে, কাল রাত্তিরে কিছু শব্দ শুনেছিলেন দিদি? খুব হৈ-চৈ শব্দ?

—কীসের শব্দ?

সুশীলা বললে, কাল একজন গুণ্ডা খুনীর ফাঁসি হয়ে গেল। সে খুব কান্নাকাটি করেছে। সবাই টের পেয়েছিল। আপনি টের পাননি?

অনিলা বললে, পেয়েছিলাম, কিন্তু কেন কীসের হৈ-চৈ হচ্ছে তা বুঝতে পারিনি। কী করেছিল সে? কেন ফাঁসি হলো তার?

—সে নিজের বউকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল।

—বিষ?

সুশীলা বললে, হ্যাঁ, বিষ!

—কেন, তার বউ কী করেছিল?

সুশীলা বললে, তার বউটা বুঝি কোন্ পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলি দিদি সে বেশ করেছে খুন করেছে। বউটা যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি হয়েছে। হবে না? কী বলুন দিদি, তোর এত কুট্‌কুটানি যে তুই নিজের সোয়ামীকে ছেড়ে, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে পরের সঙ্গে পালালি?

সুশীলা আরো কত কী বলে গেল, কিন্তু অনিলা কোনও মন্তব্য করলে না।

কথাটা শোনবার পর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অনেক পুরনো কথা মনে পড়তে লাগলো তার। জীবনটা যে কেমন করে কোথা দিয়ে তার কেটে গেল তাই-ই সে কেবল ভাবতো। সব মানুষের জীবনই কী এমনি? সকলের জীবনেই কি এত অশান্তি? তারও তো ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো! যদি ফাঁসি হতো তাহ'লে সেও কি অমনি করে ফাঁসির আগে ভয়ে কান্নাকাটি করতো? প্রাণের ভয়ে হৈ-চৈ করতো? কে জানে—হয়তো করতো? কিংবা হয়তো করতো না।

আসলে জজসাহেবের মনে বোধহয় তাকে দেখে একটু দয়া হয়েছিল। কী দেখে দয়া হয়েছিল। তার রূপ দেখে না তার বৈধব্য দেখে! বিধবা হওয়া কি লোকের কাছে করুণার পাত্রী হওয়া?

বিয়ের পর একবার বাপের বাড়ি যেতে হয়। মাসিমা তাকে খুব আদর করেছিল সেদিন। মা-ও অসুস্থ শরীর নিয়ে মেয়েকে দেখে খুব খুশী হয়েছিল। মাসি জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, তোর অত গয়না দেখে এলুম, সেগুলো কোথায়? সেগুলো পরে আসিসনি যে? সে-সব কোথায় গেল?

অনিলা কী আর বলবে। চুপ করে রইল।

শুধু বললে, উনি গয়না পরা মোটেই পছন্দ করেন না।

—ওমা, সে কি? মেয়েমানুষ গয়না পরবে না?

অনিলা বললে, উনি বলেন একদিনের জন্য বাপের বাড়ি যাচ্ছো, অত গয়না পরার কী দরকার?

মা আড়ালে ডেকে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে জামাই তোকে আদর করে?

অনিলা সে-কথার জবাব দেয়নি। মা বললেন, বল না. বল আমাকে। আমার জেনেও সুখ। জামাই আদর করে তো?

তবু কিছু জবাব দেয়নি অনিলা।

মা আবার বলেছিল, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না রে। যাবার আগে আমি জেনে যেতুম যে তুই সুখী হয়েছিস! তুই ছাড়া তো আমার কেউ নেই, কিছ নেই। জামাই তোকে ভালোবেসেছে জানতে পারলে আমি মরলেও সুখে মরবো। মা'র সামনে লজ্জা করতে নেই, বল মা আমাকে, বল তুই।

অনিলা মুখটা নিচু করে বললে, হ্যাঁ—

মা বললে, যাক্, বাঁচলুম মা, তোর কথা শুনে বাঁচলুম। এখন আমার মরতেও আর কোনও আপত্তি নেই। তুই ছিলি আমার গলার কাঁটা। তোর যখন একটা গতি হয়েছে তখন ভগবান আমার সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন, আর আমার কোনও সাধ অপূর্ণ নেই।

তা ভালোই হয়েছে এখন মা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাকে দেখে যেতে হতো যে তার মেয়ে এখন খুনের দায়ে জেল খাটছে। আর শুধু মা-ই বা কেন, মাসি আর মেসোমশাইও নেই যে তার বদনামে তাদের মুখ পুড়বে। তারা চলে যাবার আগে সবাই-ই জেনে গেছে যে, অনিলা ভালো পাত্রের হাতে পড়েছে।

মনে আছে, একদিন বসন্ত আর হেমন্ত বিশ্বাসের মধ্যে খুব ঝগড়া বেঁধে গেল। অনিলা ভেতর বাড়িতে ছিল। দু'জনের কথাবার্তা কানে এল তার। শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বউমা'র সব গয়নাগুলো তো তোমার কাছেই আছে!

বসন্ত বললে, আমার কাছে আপনার কোনও গয়না নেই!

—সে কি? কী বলছো তুমি? ফুলশয্যার দিন তো সব গয়নাই বউমার গায়ে পরানো হয়েছিল, তারপর কোথায় গেল?

—সে আপনার বউমাই জানে। সে-গয়নার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনার বউমাকেই জিজ্ঞেস করুন।

—ঠিক আছে আমি বউমাকে জিজ্ঞেস করছি—বলে হেমন্ত বিশ্বাস ডাকতে লাগলো, বউমা, বউমা এদিকে একবার এসো তো বউমা—

তখন মাত্র চারদিন হলো বিয়ে হয়েছে অনিলার। আর আগের দিন রাত্রে মাত্র ফুলশয্যা হয়েছে। শ্বশুরের সামনে যেতে লজ্জা করছিল অনিলার। তবু লজ্জার মাথা খেয়ে অনিলা মাথার ওপর লম্বা ঘোমটা তুলে দিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে শ্বশুরের সামনে।

অনিলা যেতেই হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউমা, কাল যে গয়নাগুলো তোমাকে পরতে দিয়েছিলুম, সেগুলো কোথায় গেল?

অনিলা মহা মুশকিলে পড়লো। কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। একদিকে শ্বশুর দাঁড়িয়ে আর একদিকে স্বামী বসন্ত। যদি বলে যে গয়নাগুলো সে স্বামীকে দিয়েছে, তাহ'লে শ্বশুর স্বামীকেই চেপে ধরবে।

শ্বশুর জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি শুতে যাবার আগে গয়নাগুলো খুলে কোথাও রেখেছিলে, না গয়নাগুলো পরেই শুতে গিয়েছিলে?

অনিলা থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতেই বললে, আমার তো মনে পড়ছে না ঠিক—

শ্বশুর বললে, সে কি, এই তো কালকের রাতের ঘটনা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? এত ভুলো মন কেন তোমার? কিন্তু এত ভুলো মন হলে তো চলবে না বউমা। একটু মনে করে দেখো সেগুলো কোথায় রেখেছ। ও-সব গয়নার তো হিসেব রাখতে হবে আমাকে।

অনিলা এ-কথার জবাবে কিছুই বললে না। ঘোমটার আড়ালে শুধু মুখ ঢেকে কাঠের পুতুলের মত সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

হেমন্ত বিশ্বাস তাকে লক্ষ্য করে আবার বলতে লাগলো, এ বাড়িতে তোমার শাশুড়ি নেই। তার মানে তুমিই এ-বাড়ির গিন্নী হলে। এ-বাড়ির সব কিছুর হিসেব এখন থেকে তোমাকেই রাখতে হবে। শুধু গয়নাই নয়, চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা সব কিছুর হিসেব। আমি পুরুষমানুষ, আমি আমার মহাজনী ব্যবসা নিয়ে সারা দিন-রাত ব্যস্ত থাকবো। বাড়ির ভেতরে অন্দর মহলে কী ঘটছে, তা দেখবার-শোনবার সময় হবে না আমার। আর বসন্ত, তোমার স্বামী, ওর দ্বারা কিছ্ছু হবে না। ওর ওপরে আমার কোনও ভরসাই নেই। ও শুধু লেখা-পড়া নিয়েই থেকেছে এতদিন। কোথা দিয়ে কেমন করে সংসার চলছে, কোথা থেকে টাকা আসছে, ও তার কিছুই খবর রাখে না। ও শুধু জানে বই আর বই। তোমাকে আমি গরীব ঘর থেকে তোমার রূপ দেখে এনেছি। তোমার কাজ ওই বসন্তকে তুমি সংসারী করে তুলবে, যাতে সংসারে ওর মন বসে সেই চেষ্টা করবে। তাই বলছি এত ভুলো মন হলে তোমার তো চলবে না বউমা। সব গয়নাগুলো কোথায় রাখলে মনে করতে চেষ্টা করো, আমি জানতে চাই।

অনিলা তেমনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বসন্তও পাশে দাঁড়িয়েছিল। হেমন্ত বিশ্বাস তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? বউমা যখন তোর ঘরে ঢুকলো তখন তুইও তো সেখানে ছিলি, তুইও দেখিসনি বউমা গয়নাগুলো গায়ে পরে শুলো না খুলে শুলো? গয়না পরে যদি শুতো, তাহ'লে তো সকালবেলায়ও সেগুলো গায়ে পরা থাকতো। কিন্তু সেগুলো যখন গায়ে নেই তখন নিশ্চয়ই খুলে শুয়েছে। খুলে কোথায় রাখলো দেখিসনি তুই?

বসন্ত বললে, না, আমি দেখিনি।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তাহ'লে কি গয়নাগুলো উড়ে গেল ঘর থেকে? গয়নাগুলোর কি পাখা আছে যে ঘর থেকে উড়ে যাবে? না কি ঘরের ভেতরে চোর লুকিয়ে ছিল, সে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, তা উড়েই যাক আর চোরে চুরি করে নিয়েই যাক, ও গয়নাগুলো আমার চাই। এই তোকে আমি বলে রাখলুম। ও তোর শ্বশুরবাড়ির দেওয়া গয়না নয়। ও আমার বন্ধকী গয়না। দেনাদারদের গয়না। আমি তো ওই গয়না দিয়ে বউমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম পাছে লোকে নিন্দে করে তাই। কিন্তু তাই বলে কি হারিয়ে যাবে? টাকা কি অতো শস্তা? টাকা উপায় করতে গায়ের রক্ত জল হয় না?

হেমন্ত বিশ্বাস বোধহয় আরো অনেক কিছু বলতো। কিন্তু বাইরে থেকে কে একজন ডাকতে এলো। কোনও দেনাদার হয়তো দেখা করতে এসেছে। তাকে বললে, বল্ বসতে, আমি যাচ্ছি।

লোকটা চলে গেল।

হেমন্ত বিশ্বাস যেতে যেতেও বললে, তোমাদের দু'জনকেই বলছি, ও গয়না আমার চাই। যেমন করে হোক ও-গয়না আমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। আমার সব সম্পত্তি একদিন তোমরাই পাবে। আমি শ্মশানে নিয়ে যাবো না   নব, আমি মরবার পর তখন তোমরা আমার টাকা উড়িয়েই দাও আর বেচেই দাও, কি দান করে দাও আমি তখন তা দেখতে আসছি না। কিন্তু এখন আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া চাই—

বলে হেমন্ত বিশ্বাস আর দাঁড়ালো না, সোজা আবার বাইরের দিকে চলে গেল। তার সকাল থেকে অনেক কাজ। তার কাছে অনেক লোক অনেক আর্জি নিয়ে আসে।

হেমন্ত বিশ্বাস বৈঠকখানায় যেতেই দেখলে একজন লোক বসে-বসে কাঁদছে।

হেমন্ত বিশ্বাস ঘরে যেতেই লোকটা তার পা জড়িয়ে ধরলো। হেমন্ত বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, কী রে, কাঁদছিস কেন রে ইসমাইল?

ইসমাইল বললে, হুজুর, আমার ছেলেটা মরো-মরো, কিছু টাকা দেন দয়া করে। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, টাকা নিতে এসেছিস তাই বল, তা কাঁদছিস কেন? ডাক্তার দেখালেই তো তোর ছেলে বেঁচে যাবে। তোর আগেকার টাকা এখনও শোধ হলো না, তার ওপর আবার টাকা? আগেকার টাকাগুলো আগে শোধ কর্!

ইসমাইল শেখ বললে, তা যদি শোধ করতে পারতুম, তাহ'লে কি আর আমার এত দুঃখু হুজুর!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—টাকার বুঝি আমার গাছ আছে ইসমাইল। কাল আমার ছেলের বৌভাত গেছে, কতগুলো টাকা আমার বেবাক নষ্ট হয়ে গেল বল দিকি! এই অবস্থায় আমি যদি তোদের টাকাগুলো না পাই, তাহ'লে আমার চলে কী করে তাই বল?

ইসমাইল শেখ তখন কাপড়ের খুঁট খুলে একটা রূপোর হাঁসুলি বার করে এগিয়ে দিতেই হেমন্ত বিশ্বাস হাঁসুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

রেগে গিয়ে বললে, তুই রূপোর জিনিস দিচ্ছিস আমাকে? আমি রূপো বন্ধক রাখি? সোনা দিতে পারলি নে?

ইসমাইল শেখ বললে—আজ্ঞে এ-ছাড়া আমার আর কিছুই নেই যে।

—তাহ'লে তোর বলদ-জোড়া বাঁধা রাখ। কিংবা বলদ-জোড়া বেচে দে আমাকে।

—আজ্ঞে বলদ-জোড়া আছে বলেই তো চাষ-বাস করছি। বলদ-জোড়া বেচলে আমি খাবো কি?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা আগে খাওয়া না আগে মহাজনের দেনা শোধ করা? কোনটা বড়?

ইসমাইল কেঁদে-কেঁদে বললে, আজ্ঞে সব তো বুঝি, কিন্তু আপনি হলেন গাঁয়ের মাথা, আপনি যদি ক্ষ্যামা-ঘেন্না না করেন, তাহ'লে আমাদের মত গরীব লোকেরা বাঁচে কী করে?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তোদের তো আমি বলেই দিয়েছি, আমি গরীবদের মহাজন নই, আমি বড়লোকের মহাজন।

—তাহ'লে আমরা গরীবরা যাবো কোথায় বলুন? আমরা কি তাহলে মরে যাবো?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তোরা মর না। তোরা মরলে তো পৃথিবী একটু হাল্‌কা হয়। তোরা মরেও একটু উপকার করতে পারবি নি?

ইসমাইল শেখ একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, তাহ'লে কী করবো আপনি বলুন হুজুর।

—যা বললুম ওই বললুম। ওই-ই আমার শেষ কথা!

ইসমাইল শেখ চোখের জল মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে-আস্তে বাইরের রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

বসন্ত নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় পরে কোথায় বাইরে যাচ্ছিল, অনিলা এসে পাশে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছো?

—একটা কাজ আছে আমার।

—কিন্তু বাবার সেই গয়নাগুলো কোথায়?

—কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? কাল রাত্তিরে তো দেখলে আমি কোথায় রাখলুম!

অনিলা বললে, সে কথাটা বাবার সামনে বলতে পারলে না!

—সে কথা তো বাবা তোমাকেই জিজ্ঞেস করলে। তখন তুমিই বা সেকথা বললে না কেন?

—তোমার কথার ওপরে আমি কথা বলবো? আমার ভয় হলো হয়তো তুমি তাতে রেগে যাবে।

—তোমার সঙ্গে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার আলাপ, তাতেই আমাকে এত ভয়? আমাকে কি সত্যিই তুমি ভয় পাও?

অনিলা বললে, তোমার বাবা আমাকে গরীবের ঘর থেকে এনেছেন, আমি এ-বাড়িতে এসে রাজরাণী হয়েছি। কবে একদিন এই রাজত্ব চলে যাবে, তা তো বলা যায় না। তাই শুধু ভয় হয়—

—তুমি তো দেখলুম কাল রাতে খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমোলে! ওটা কি ভয়ের লক্ষণ?

অনিলা লজ্জায় পড়লো। বললে, আমায় ক্ষমা করো তুমি। ক-দিন খুব পরিশ্রম হোল তো!

—পরিশ্রম? পরিশ্রমটা তোমার আবার কী হলো। তুমি তো গয়না পরে বেনারসী জড়িয়ে সেজে-গুজে কাটিয়েছ! তোমার আবার পরিশ্রমটা কী?

অনিলা একটু থেমে রইল। প্রথমে কিছু জবাব দিতে পারলে না। তারপর মাথা নিচু করে বললে, মেয়েমানুষ হলে তুমি বুঝতে পারতে বিয়েতে মেয়েদের পরিশ্রম হয় কি-না!

বসন্ত বললে—মেয়েমানুষ না হয়েও বোঝা যায়।!

অনিলা বললে, তাহ'লে তুমি বললে না কেন যে, গয়নাগুলো তুমিই রেখে দিয়েছ?

বসন্ত বললে—গয়নার জন্যে দেখছি তোমারই বেশি মাথাব্যথা!

অনিলা বললে—মাথাব্যথা হওয়াই তো স্বাভাবিক। নইলে বাবার কাছে জবাবদিহি করতে তো হবে সেই আমাকেই। কারণ বাবা তো আমাকেই তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন।

বসন্ত বললে—আসলে তা নয়, আসলে আমাকে সংসারী করবার জন্যেই তোমাকে আনা হয়েছে। সেই জন্যেই তুমি আমাকে বলছো!

অনিলা বললে—কেউ কি কাউকে জোর করে সংসারী করতে পারে?

বসন্ত বললে—তুমি আমাকে তোমার রূপ দেখিয়ে সেই চেষ্টা করো না!

অনিলা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তার চেয়ে গয়নাগুলো দিয়ে দাও, আমি বাবাকে দিয়ে দিই। বাবার কাছে দেওয়াই ভালো।

বসন্ত বোধহয় ব্যস্ত ছিল খুব। পকেট থেকে চাবি বার করে অনিলার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, এই নাও, গয়নাগুলো আলমারির ভেতরে রেখে দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে বাবাকে দিতে পারো।

তারপর একটু থেমে বললে, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, ওগুলো আমারও নয়, তোমারও নয়, এমন কি বাবারও নয়। ওগুলো আমাদেরই গ্রামের গরীব লোকদের রক্ত-জল-করা পয়সায় কেনা। ওগুলো গায়ে পরে তুমি স্বর্গে যাবে না।

বলে বাইরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু অনিলা বললে, একটু দাঁড়াও—

বসন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কী?

অনিলা বললে, এগুলো নিয়ে তবে যাও—

বলে আলমারি খুলে সব গয়নাগুলো স্বামীর হাতে দিলে।

বসন্ত বললে—এগুলো নিয়ে আমি কি করবো?

অনিলা বললে—যাঁর জিনিস তাঁকে দিও।

—এগুলো কার জিনিস?

অনিলা বললে—ওই যে তুমি বললে, যাদের জিনিস তাদের। গ্রামের যে-গরীব লোকদের রক্ত-জল-করা পয়সায় কেনা, তাদের।

বসন্ত গয়নাগুলো হাতে করে নিয়ে খানিকক্ষণ স্থানুর মতো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললে, তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু জানো না, এগুলো বাবার বুকের এক-একখানা পাঁজরা। এই একটা পাঁজরার যদি হিসেব না মেলে তাহ'লে বাবা মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে।

অনিলা বললে, তার মানে?

—তার মানে এগুলো হারিয়ে গেলে বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। এগুলো তোমাকে পরানো হয়েছিল একরাত্তিরের জন্যে। আর তুমি ছিলে একদিনের রাণী। এগুলো বাবাকে ফিরিয়ে দিলে আবার এগুলো বাবার সিন্দুকে গিয়ে জমবে!

—তা সিন্দুকে গিয়ে জমলে ক্ষতি কী?

বসন্ত বললে—ক্ষতি বাবার কিছুই নেই, ক্ষতি সেইসব লোকদের যাদের রক্ত দিয়ে কেনা ওই জিনিসগুলো। তুমি জানো কিনা জানি না, এই কুসুমগঞ্জে বেশির ভাগ লোকই গরীব। এদের যথা-সর্বস্ব ওই গয়নাগুলোই। দরকারে-অদরকারে ওগুলো কেমন এক কায়দায় একদিন বাবার কাছেই পিছ্‌লে চলে আসে, তারপরে আর তারা আসল মালিকের কাছে ফিরে যায় না।

অনিলা বললে, তবু এগুলো যখন এখন বাবার সম্পত্তি, তখন বাবার কাছেই এগুলো চলে যাওয়া উচিত।

বসন্ত বললে, আইনতঃ তাই-ই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেআইনী কাজকেও আইনী বলে চালানো হয়। সেটা আমি মনে করি ভালো নয়।

বসন্ত এর পর আর দাঁড়ালো না। বললে, আমি এখন চলি।

বলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চলে গেল।

বারবাড়ি থেকে হেমন্ত বিশ্বাস কাজের পর এসে ডাকলো, বউমা—

অনিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালো শ্বশুরের সামনে। হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, কী বউমা, খুঁজে পেলে?

অনিলা বললে—হ্যাঁ বাবা, পেয়েছি।

—কোথায় ছিল?

গয়নাগুলো হাতে পেয়ে হেমন্ত বিশ্বাসের মুখে যেন হাসি ফিরে এল। বললে, জানো বউমা, এর অনেক দাম। এইগুলো আছে বলেই এখনও আমার বুকে বল আছে। নইলে কবে মরে যেতুম। তা এগুলো কোথায় রেখেছিলে তুমি?

অনিলা বললে, আমি রাখিনি—

—তাহ'লে বসন্ত রেখেছিল বুঝি? ও এক অদ্ভুত ছেলে হয়েছে। আমার টাকাপয়সার দিকে মোটে নজর নেই। তুমিই বলো, টাকা-পয়সা কি ফ্যালনা জিনিস? এই টাকা-পয়সা আছে বলেই তো এখনও

আমার সংসার চলছে। তুমি তো গরীবের মেয়ে, গরীব হওয়ার দুঃখ-কষ্ট তুমি যেমন বুঝবে, বসন্ত তেমন বুঝবে না। তাই তো তোমাকে বউ করে এনেছি। তুমি একটু বসন্তকে বুঝিয়ে বলবে, বুঝলে? বলবে টাকা-পয়সার এত হ্যালা-ফ্যালা ভালো নয়। টাকা আছে বলেই সংসার চলছে, নইলে কবে সব কিছু উল্‌টে-পাল্‌টে যেত। বসন্ত কিচ্ছু বোঝে না। বরাবর কলকাতায় গিয়ে থেকেছে তো, আর আমিও ওকে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠিয়েছি। কাকে বলে টাকার অভাব তা ও জানে না। তাই ওকে আমি বলেছি, টাকাকে তুই এত হ্যালা-ফ্যালা করিস এটা ভালো নয়, তাহলে টাকাও একদিন তোকে হ্যালা-ফ্যালা করবে। টাকা হলো গিয়ে লক্ষ্মী। টাকাকে অত অবহেলা করলে লক্ষ্মীকেও অবহেলা করা হয়। কী বলো বউমা, আমি ঠিক কথা বলিনি? অনিলা নতুন বউ। সে আর কী বলবে? সে শুধু শ্বশুরের কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিল।

বিয়ের কিছুদিন বাদেই অনিলা বুঝতে পেরেছিল যে তার স্বামী অন্য ধাতের মানুষ। হেমন্ত বিশ্বাস ছেলের সম্বন্ধে যা বলেছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি এল বসন্ত। অনিলা জিজ্ঞেস করলে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

বসন্ত বললে—একটা কাজ ছিল।

অনিলা সে জবাবে খুশী হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল, কী এত কাজ থাকে তোমার রোজ? কোথায় যাও তুমি?

বসন্ত বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না।

অনিলা বলেছিল, তুমি যদি বুঝিয়ে বলো তো কেন বুঝবো না?

বসন্ত বলেছিল—তোমাকে বোঝাবার মত এখন সময় নেই আমার।

অনিলা বলেছিল, আজ সময় না থাক কিন্তু অন্য কোনও দিন বুঝিয়ে বলো। তোমার তো বাড়ি ফিরতে রোজই রাত হয়।

বসন্ত বলেছিল—আমার এমনি রোজই রাত হবে। পুরুষমানুষের কাজ থাকেই, তা বলে তোমার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি?

অনিলা বলেছিল—না, বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন তাই বলছি।

বসন্ত বলেছিল—বাবার কথায় কান দিও না। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিও।

অনিলা বলেছিল—তুমি সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকো, তুমি বাবার কথা না শুনলেও পারো। কিন্তু আমাকে তো সারাদিন বাড়ি থাকতে হয়, আমি না শুনে কী করে থাকি বলো?

বসন্ত বলেছিল—তুমি চুপ করে থাকবে।

অনিলা বলেছিল—বাবার কথায় চুপ করে থাকা যায়?

বসন্ত বলেছিল—না চুপ করে থাকতে পারো তো বলবে তুমি জানো না।

অনিলা বলেছিল, নিজের স্বামীর ব্যাপার স্ত্রী হয়ে জানি না বললে, তিনি কী ভাববেন বলো তো। আমাকে তো বলেই দিয়েছেন তোমাকে সংসারী করবার জন্যেই আমাকে এ-বাড়িতে আনা!

বসন্ত বলেছিল, আমি বুঝি ছেলেমানুষ যে আমাকে তুমি সংসারী করবে? সংসার কাকে বলে আমি কি তা জানি না?

বসন্ত আবার বললে, আমি সংসার না করেও সংসারের সব বুঝি। বাবার কাছে যার নাম সংসাব, আমার কাছে তা, অত্যাচার।

—অত্যাচার? অত্যাচার মানে?

বসন্ত বলেছিল—বাবা চায় গাঁয়ের লোকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করতে। আমি জীবনে তা করতে পারবো না। ওকেই যদি সংসার করা বলে তাহ'লে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে সে-রকম সংসারী করতে পারবে না।

অনিলা বলেছিল, তা যদি না পারবে তো আমাকে কেন বিয়ে করে এ-বাড়িতে আনলে?

বসন্ত বলেছিল—গরীবদের অত্যাচার না করেও সংসার করা যায়।

অনিল বলেছিল—তাহ'লে সেই রকম সংসারই তুমি করো না দেখি।

বসন্ত বলেছিল—তাহ'লে বলো এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোথাও, অন্য কোনও বাড়িতে চলে যাবে?

—আর বাবা?

—বাবা তাঁর টাকা-পয়সা জমি-জমা নিয়ে এ-বাড়িতে থাকুন!

অনিলা বলেছিল. তাহ'লে এই বয়সে কে তাঁকে দেখবে? কে তাঁকে ঠিক সময়ে ভাত রান্না করে দেবে?

বসন্ত বলেছিল—বাবার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তাঁর অনেক টাকা-কড়ি আছে, তিনি একটা মাইনে-করা লোক দিয়ে সব কবিযে নেবেন।

—আর বাবার টাকা?

—বাবার টাকার কথা বাবাই ভালো বুঝবেন।

অনিলা বলেছিল, কিন্তু তুমি তো চাকরিও করো না, ব্যবসাও করো না, তোমার চলবে কী করে?

—ভাবছো তোমাকে ঠিকমত খাওয়াতে-পরাতে পারবো কিনা?

অনিলা বলেছিল, তুমি কি চাকরি করবে?

—সে আমি কি করবো না-করবো আমি বুঝবো। তুমি আমার সঙ্গে এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি কিনা তাই বলো আগে।

অনিলা বলেছিল—তোমার সঙ্গে আমাব যখন বিয়ে হয়েছে, তখন তুমি যেখানে যেতে বলবে আমি সেখানেই যাবো।

বসন্ত বলেছিল—ঠিক আছে, আমি তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই করবো। মোট কথা আমার এ বাড়িতে থাকতে ঘেন্না করে!

অনিলা জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বলো তো? এ বাড়ি কি দোষ করলো?

বসন্ত বলেছিল—সে তুমি মেয়েমানুষ, বুঝবে না। তুমি তো বাইরে বেরোও না। বাইরে বেরোলে বুঝতে পারবে বাবাকে কেউ দেখতে পারে কি না।

—দেখতে পারে না মানে?

বসন্ত বলেছিল—তুমি জানো না, বাবাকে আশপাশের গ্রামের সব লোকই সুদখোর বলে গালাগালি দেয়। এই আমাদের যে বাড়ি দেখছো. এর সমস্ত কিছু সুদের টাকায় তৈরি। এর প্রত্যেকটা ইঁটে গরীব লোকদের রক্ত লেগে আছে।

—তা সুদ নেওয়া কি দোষের?

বসন্ত বলেছিল—সুদ নেওয়া দোষের নয় তো কি সম্মানের?

—শুনেছি ব্যাঙ্কও তো সুদ নেয়।

বসন্ত বলেছিল তুমি ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাবার তুলনা করছো? ব্যাঙ্ক যে সুদ নেয়, বাবা নেয় তার হাজার গুণ! এ সুদ নেওয়া নয়, রক্ত চোষা। জমি-জমা, গয়না বাঁধা রেখে তারা অভাবের সময় টাকা নেয় বাবার কাছ থেকে। কিন্তু কোনও দিনই তারা সেই জমি-জমা গয়না ফেরত নিতে পারে না। এত চড়া সুদ বাবার ব্যবসায়। বাবার জন্যে যে কত লোক ধনে-প্রাণে ফতুর হয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। তারা যদি কোনও দিন পারে তো বাবার মাথাটা কেটে ফেলতে পারে, এত তাদের রাগ বাবার ওপর।

কথা বেশি দূর এগোয়নি। তার মধ্যেই বসন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড় ক্লান্ত থাকতো সে। মাঝে-মাঝে কয়েকদিন বাড়িতেই আসতো না। আবার হয়তো একদিন হুট্ করে হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির হতো।

অনিলা যথারীতি জিজ্ঞেস করতো, এতদিন কোথায় ছিলে?

বসন্ত অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিতো। বলতো, একটা কাজের চেষ্টা করছি কলকাতায়।

অনিলা মনে করতো বসন্ত এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও আস্তানার ব্যবস্থা কবতে ব্যস্ত।

ছেলে বাড়ি এলে হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করতো, এতদিন কোথায় ছিলি বাড়ি ছেড়ে?

বসন্ত বলতো, একটা কাজের চেষ্টা করছি।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—কী কাজ?

বসন্ত বলতো—যে-কোনও একটা কাজ। বিয়ে কবেছি কাজেব চেষ্টা তো কবতে হবে।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—তার মানে? তুমি কী রোজগার করে বউকে খাওয়াবে মতলব করছো?

বসন্ত জবাব দিত না। হেমন্ত বিশ্বাস বলতো, ওসব বদ মতলব ছাড়ো। তোমাকে কোনও কাজের চেষ্টা করতে হবে না। আমি যে কাজ করছি, সেই কাজই বরং তুমি করো, এখন থেকে সে-কাজ শিখে নাও। আমার বয়েস হচ্ছে, একদিন তোমাকেই এ-কাববার করতে হবে। এখন থেকে এসব দেখে শুনে নাও তুমি।

বসন্ত বলতো, আমি কলকাতায় কাজের চেষ্টা করছি।

যেন আকাশ থেকে পড়তো হেমন্ত বিশ্বাস। বলতো, কলকাতায়? কাজের চেষ্টা করছো? তাহ'লে বউমা? বউমাও কি কলকাতায় থাকবে? তাহ'লে এখানকার আমার এত জমি-জমা-ক্ষেত-খামার, সম্পত্তি, এসব? এসব কাকে দিয়ে যাবো?

বসন্ত বলতো—তা আমি জানি না।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—তাহ'লে এতদিন আমি এত সম্পত্তি কার জন্যে করেছি? আমার নিজের জন্যে? আমার একলার জন্যে ক'টা টাকার দরকার হয়? তোমরা যাতে পুরুষানুক্রমে এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারো সেই জন্যেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম কবেছি! তা সেই তুমিই যদি এখানে না থাকো, তো আমি এতদিন কার জন্যে খাটলুম?

কিন্তু এসব কথা বেশিক্ষণ বলার সুযোগ থাকতো না হেমন্ত বিশ্বাসের। কথা শেষ না হবার আগেই কেউ না কেউ এসে যেত, আর কথার মাঝখানে বাধা পড়তো। কাজ শেষ করে যখন সে আবার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে আসতো তখন দেখতো বসন্ত নেই।

জিজ্ঞেস করতো, বসন্ত কোথায় গেল বউমা?

অনিলা বলতো, তিনি তো নেই, এখুনি বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরে আসবে?

অনিলা বলতো—তা তো বলে যায়নি বাবা!

এমনি করেই দিন কাটতো অনিলাব। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটা এইরকম ছিল। যখন নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল সে তখন কত হিংসে করেছিল বাপের বাড়ির দেশের লোকেরা।

মাও বলেছিল, অনেক ভাগ্যি করলে অমন সোয়ামী-শ্বশুর পায় মা।

মাসিমা-মেসোমশাইও বলেছিল, অনিলার শ্বশুর-স্বামী ভাগ্যটা ভালো। একটা পয়সা লাগলো না অনিলার বিয়েতে, এমন তো দেখা যায় না।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই অনিলা দেখলো যে এ এক অদ্ভুত বাড়ি। শ্বশুরের অগাধ টাকা, স্বামীও শিক্ষিত, বিদ্বান, রূপবান। কিন্তু বাপ-ছেলের মিল নেই মনের। স্বামী যে মাঝে-মাঝে কোথায় চলে যায় কে জানে। শুধু যাবার সময় বলে যায় তার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।

এই রকম অবস্থাতেই একদিন সুমন্ত এল।

সুমন্ত! জেলখানার ভেতর তার কথা মনে পড়লেই অনিলার চোখ দু'টো জলে ভিজে আসতো। ছোটবেলায় ওই সুমন্ত কত দুষ্টু ছিল। হেমন্ত বিশ্বাস নাতির মুখ দেখলে একটা সোনার গিনি দিয়ে। যেন নিশ্চিন্ত হলো মনে-মনে। যখন হেমন্ত বিশ্বাস নিজের ঘরে বসে কাজ করতে বসতো, তখন অনিলার কাছ থেকে তাকে নিয়ে যেত। বলতো, দাও বউমা, ওকেআমার কাছে দাও। ও আমার কাছে থাকলে দুষ্টুমি করবে না। বড় লক্ষ্মী ছেলে আমার সুমন্ত।

হেমন্ত বিশ্বাস নাতির অন্নপ্রাশনে খুব ঘটা করলে। এলাহি ব্যবস্থা হলো বাড়িতে। অনিলার বিয়েতে যেমন ঘটা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি। লোকে আশীর্বাদ করে গেল প্রাণ ভরে। যার যা সাধ্য তাই দিয়ে আশীর্বাদ করলে। কেউ দিলে রূপোর টাকা, কেউ দিলে খেল্না, কেউ দিলে রেকাবিতে করে মিষ্টি। গ্রামের সাধারণ সব লোক, কারোরই তেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই। কিন্তু মহাজন বলে কথা। মহাজনের কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা। আশীর্বাদী না দিলে মহাজন অখুশী হবে। বলবে, কই ঘোষের পো, তুমি আমার নাতির অন্নপ্রাশনে কিছু উপুড়-হস্ত করোনি, এক পেট খেয়ে গিয়ে এখন কান্নাকাটি করে হাতে-পায়ে ধরতে এসেছ?

লোকে বলতো, সোন্দর হবে না? বাপ-মা যেমন সোন্দর, ছেলেও তো তেমনি হবে গো।

মা দেখতে পায়নি তার নাতিকে। ওই একটি দুঃখ ছিল অনিলার। মা'র নিজের জীবনে কোনও সাধই পূর্ণ হয়নি। অনিলার ছেলে দেখবার বড় সাধ ছিল মার কিন্তু কপালে যার সুখ লেখা নেই, তার সুখ কোথা থেকে হবে!

বাড়িতে রান্নাবান্নার জন্যে হেমন্ত বিশ্বাস গোড়া থেকেই লোক রেখেছিল। এবার নাতিকে দেখবার জন্যে আর একটা লোক রাখলো।

হেমন্ত বিশ্বাস যখন তার কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকতো, তখন বাড়ির ভেতর সুমন্তর কান্না শুনলেই সব কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে আসতো। বলতো, সুমন্ত কাঁদে কেন বউমা? ওকে কাঁদাচ্ছে কেন ভোলার মা?

ভোলার মা ভাল লোক, সুমন্তকে থামাতে হিমসিম খেয়ে যেত।

সেখানে যারা বসে থাকতো তারা সুমন্তকে দেখে খোসামোদ করে বলতো, কর্তা এই নাতি আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে।

কথাগুলো শুনে খুব খুশি হতো হেমন্ত বিশ্বাস। এমনও হয়েছে যে, নাতিকে প্রশংসা করায় কয়েকটা পয়সা সুদ মকুব করে দিয়েছে।

কথায় বলে টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি, হেমন্ত বিশ্বাসেরও তাই হয়েছিল।—ছেলের চেয়ে নাতি মিষ্টি। সেই নাতিকে নিয়েই দিন কাটতো তার। শুধু রাতটা ছাড়া সব সময়েই দাদুর কাছে থাকতো সে। অত ব্যস্ত মানুষ, তার কাজে ক্ষতি হলেও নাতিকে সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই। হাটে যাবে, সঙ্গে হাত ধরে নিয়ে যাবে নাতিকে। বলবে, দাদু, তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো, না তোমার বাবাকে?

নাতি বললে, তোমাকে।

হেমন্ত বিশ্বাস সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, এই শোন, নাতি কী বলছে শোন, ও ওর বাবার চাইতে নাকি আমাকে বেশি ভালোবাসে!

লোকে বলতো, দেখতেও ঠিক আপনার মতো হয়েছে কর্তাবাবু।

অনেকে বলতো, ওকেও কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন কর্তাবাব, কুসুমগঞ্জে থাকলে ও আমাদের মতো গোমুখ্যু হবে।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো, পাগল হয়েছো তোমরা, আমার খুব শিক্ষে হয়ে গিয়েছে বাপু, ওকে আর কলকাতায় পাঠাবো না। পাঠালেই বাপের মতোন লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে যাবে। ওকে আমি ছোটবেলা থেকে আমার গদীতে বসাবো। ও হিসেব শিখুক, টাকা-আনা-পাই হিসেব করতে শিখলেই আমার কাজ চলে যাবে!

কিন্তু একেবারেই লেখাপড়া না শিখলে চলে না। তাই হেমন্ত বিশ্বাস নিজেই হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে গৌর মাষ্টারের হাতে তুলে দিয়ে বললে, একে অঙ্কটা ভালো করে শিখিয়ে দিও মাষ্টার, যাতে বড় হয়ে হিসেবটা ভালো কষতে পারে। তার বেশী আমার দরকার নেই।

বড় আদরের নাতি সুমন্ত দাদুর কাছে মানুষ হতে লাগলো। হেমন্ত বিশ্বাস তাকে পাশে নিয়ে কাজ-কর্ম করে। নাতি জিজ্ঞেস করে, এগুলো কী দাদু?

হেমন্ত বিশ্বাস বলে, ওগুলো টাকা।

সুমন্ত তবু বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে. এগুলো দিয়ে কী হয় দাদু?

হেমন্ত বিশ্বাস বলে—এগুলো দিয়ে সব হয়। এ দিয়ে সব কিছু কেনা যায়।

—কী কেনা যায়?

হেমন্ত বিশ্বাস বলে—চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, কাপড় কেনা যায়, সোনা-রূপো-গয়না-বাড়ি-ঘর সব কিছু করা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস হলো এই টাকা!

নাতি বায়না ধরে। বলে, আমাকে একটা টাকা দাও না দাদু!

হেমন্ত বিশ্বাস বলে—খবরদার, ওতে হাত দিতে নেই। হারিয়ে যাবে! তখন আর কিছু কিনতে পারা যাবে না।

তাড়াতাড়ি ছড়ানো টাকাগুলো সামলায় হেমন্ত বিশ্বাস। ছোট ছেলেকে বিশ্বাস নেই।

তবু নাতি, বায়না ধবে বলে, আমাকে একটা টাকা দাও দাদু।

হেমন্ত বিশ্বাস বলে—তুমি টাকা নিয়ে কী করবে?

সুমন্ত বলে—আমি একটা পিস্তল কিনবো!

পিস্তল! কথাটা শুনে সবাই ছেলেমানুষের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায়। এইটুকুন ছেলের এত বুদ্ধি! খেলনা কিনবে না, খাবার কিনবে না, নারকোল নাড়ু কিনবে না, কিনবে কিনা পিস্তল!

সবাই জিজ্ঞেস করে, ও পিস্তলের নাম জানলে কী করে কর্তা?

হেমন্ত বিশ্বাস নিজেও অবাক। বললে, হ্যাঁরে সুমন্ত, তুই পিস্তলের কথা জানলি কী করে রে? পিস্তল দিয়ে তুই কী করবি?

সুমন্ত বললে—আমি গুণ্ডাদের খুন করবো। পিস্তল দিযে মানুষ খুন করা যায়।

হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করে, কে বললে তোকে পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা যায়?

সুমন্ত বললে—বাবা।

হেমন্ত বিশ্বাসের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! বসন্ত! বসন্ত পিস্তলের কথা বলেছে? সেই বা এসব কথা ছেলেকে বললে কেন?

এর পরে আর এ প্রসঙ্গ উঠলো না। টাকাকড়ি, দলিল-পত্র সব সিন্দুকের মধ্যে রেখে নাতিব হাত ধরে হেমন্ত বিশ্বাস বাড়ির ভেতরে এল। ডাকলে, বউমা'

অনিলা রান্নাঘরে তখন রান্নায় ব্যস্ত ছিল। শ্বশুরের ডাক শুনে বাইরে এল।

বউমা কাছে আসতেই হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, বসন্ত কোথায় বউমা?

—তিনি তো বাড়ি নেই, তিনি কলকাতায় গেছেন!

—অত ঘন-ঘন সে কলকাতায় যায় কেন? সেখানে ওর অত কী কাজ থাকে তা তোমাকে বলে না?

অনিলা চুপ করে রইল। তারপর বললে, আমি জানি না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তুমি যদি নাই জানবে, তাহলে তোমাকে বউ করে এনেছি কেন এ বাড়িতে? তোমার রূপ দেখেই তো তোমাকে বসন্তর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলুম, যাতে ও সংসারী হয়। যাতে ও তোমার বশ হয়। আমি তো তোমাদের কাছ থেকে একটা পয়সাও নিইনি। আমি নিজেই আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছি। কেউ বলতে পারবে না, আমি সুদখোর বলে ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়েছি!

এ-সব কথা হেমন্ত বিশ্বাসের এই প্রথম নয়। এ-সব কথা আগেও অনেকবার শুনতে হয়েছে অনিলাকে। সময়ে অসময়ে অনিলাকে শ্বশুরের কাছ থেকে এ-সব কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে কী করবে? বসন্ত যদি তার কথা না শোনে তো সে কী করতে পারে? কতবার তো সে-কথা সে বসন্তকে শুনিয়েছে। কিন্তু নিজের বাবা যাকে বশ করতে পারলে না, তাকে বশ করবে অনিলা?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বসন্তর কাছে পিস্তল আছে?

অনিলা অবাক হয়ে গেল শ্বশুরের কথা শুনে! পিস্তল! পিস্তলের কথা জানলে কী করে শ্বশুর। কিন্তু বললে, তা আমি কী করে জানবো!

—আর তোমার ছেলেই বা পিস্তলের কথা জানলে কী করে?

অনিলা অবাক হয়ে বললে, সুমন্ত? সে পিস্তলের কথা বলেছে?

—হ্যাঁ, তাই-তো বললে। আমার কাছে বসে কেবল টাকা চায়। টাকার ওপর তার খুব লোভ। টাকা দেখলেই কেবল চাইবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকা নিয়ে কী করবি? তা কী বলে জানো? বলে পিস্তল কিনবে! আমি তো শুনে অবাক। শুধু আমি নই, আমার গদীতে যত লোক ছিল তারা সবাই অবাক। তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'পিস্তল দিয়ে কী করবি?' জবাবে বললে, 'মানুষ খুন করবো।' শুনছো কথা? সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে বসন্ত কোথায়? তাকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতুম, পিস্তলের কথা সে ছেলেকে বললে কেন? আর পিস্তলের কথাই বা ওঠে কেন?

ভাগ্য ভালো যে বসন্ত সেদিন বাড়িতে এল না। তার পরদিনও এল না। তার পরদিনও না।

তারপর হঠাৎ একদিন বসন্ত বাড়ি এসে হাজির।

মাথার চুল উস্‌কো-খুশকো। চেহারা দেখেই বোঝা গেল ক'দিন ধরে খাওয়া হয়নি। এসেই বললে, কিছু খেতে দাও আগে।

অনিলা তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিলে। বসন্ত বললে, না খেয়ে আর কিছু কথা বলবো না।

গোগ্রাসে সব ভাত খেয়ে নিলে বসন্ত। তারপর যেন একটু স্থির হলো।

অনিলা জিজ্ঞেস করলে, এতদিন কোথায় ছিলে? এ-রকম চেহারা কেন তোমার? চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিলে?

বসন্ত বললে—খোকা কেমন আছে?

—ভালো। সে তো বাবার কাছেই থাকে সারাদিন। নাতিকে নিয়েই তিনি মশগুল। তোমার পকেটে সেদিন পিস্তল দেখেছিল সুমন্ত, সে-কথা সে বাবাকে বলে দিয়েছে।

বসন্ত চম্‌কে উঠলো। বললে, পিস্তল? পিস্তলের কথা সুমন্ত জানলে কি করে?

অনিলা বললে, বা-রে, সেবার তুমি যখন বাড়ি এসেছিলে তখন সুমন্ত তোমার জামার পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল বার করেছিলো না? মনে নেই তোমার?

বসন্ত বললে, এই বয়েসেই বড় দুষ্টু হয়েছে আদর পেয়ে-পেয়ে। সব জিনিসে হাত দেয় কেন সে?

অনিলা বললে, তা তুমিই বা পকেটে পিস্তল রাখো কেন? পিস্তল দিয়ে তুমি কী করো?

বসন্ত বললে—আমি যাই করি না কেন, তাতে তোমারই বা কী আর সুমন্তরই বা কী?

অনিলা বললে—সব কথায় তুমি অমন রেগে যাও কেন? আমি কিছু অন্যায় কথা বলেছি?

বসন্ত বললে—অন্যায় তো বলেছোই। আমি তো তোমাদের কোনও কথায় মাথা ঘামাই না। তুমি কী করছো, না করছো তা-তো আমি কখ্খনো জিজ্ঞেস করতে যাই না!

অনিলা বললে—তুমি আজকাল অত খিট্খিটে হয়ে গেলে কেন, আগে তো এমন ছিলে না! তোমার শরীর খারাপ নাকি?

এতক্ষণ কী করে খবরটা হেমন্ত বিশ্বাসের কানে গেছে যে, বসন্ত বাড়ি এসেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির ভেতরে চলে এসেছে সে। বললে এই যে, কখন এলে?

বসন্ত বললে, এই একটু আগে।

—কই, আমি তো সদর-ঘরেই বসেছিলুম, তোমাকে তো দেখতে পেলুম না।

বসন্ত বললে—আমি খিড়কী-পুকুরের দিক দিয়ে এসেছি, পাকা রাস্তা দিয়ে আসিনি।

সুমন্ত বাবাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী। এসেই একেবারে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। বললে, বাবা তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?

বসন্ত বললে, চুপ করো, আমি তোমার দাদুর সঙ্গে কথা বলছি।

সুমন্ত বললে, জানো বাবা, দাদুর অনেক টাকা আছে, সব টাকা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখে!

বসন্ত বললে, বলছি, তুমি চুপ করো এখন।

কিন্তু সুমন্ত থামলো না। বলতে লাগলো, জানো বাবা, টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। দাদু বলেছে চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, কাপড় কেনা যায়, সোনা-রূপো-গয়না, বাড়ি-ঘর সব কিছু কেনা যায়। পৃথিবীর সব চেয়ে দামী জিনিস নাকি এই টাকা। হ্যাঁ বাবা, এই টাকা দিয়ে পিস্তল কেনা যায়?

যেন বোমা পড়লো সকলের মাথার ওপর।

হেমন্ত বিশ্বাস প্রথমেই নিস্তব্ধতা ভাঙলো, বললে, তোমার নাকি পিস্তল আছে? তোমার পকেটে নাকি পিস্তল থাকে?

বসন্ত বললে—তোমাকে কে বললে?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—যে-ই বলুক, আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও। তোমার কাছে পিস্তল থাকে কিনা, তাই বলো!

বসন্ত বললে—শুধু পিস্তল কেন, দরকার হলে বন্দুকও রাখতে হয় কাছে। তাতে কী হয়েছে?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ে তোমার কি এই সব শিক্ষা হয়েছে?

বসন্ত বললে—কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করে বি-এ পাশ করেছি আমি।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা তো জানি, কিন্তু কলেজের বাইরে? সেখানে তো শুনেছি আজকাল অনেক পার্টি-ফার্টি আছে, তুমি কি সব পার্টিতে মেশো নাকি?

বসন্ত বললে—কলকাতায় লক্ষ-লক্ষ লোক আছে, কারোর না কারুর সঙ্গে তো মিশতেই হবে। চুপ-চাপ হোটেলে তো আর বসে থাকা যায় না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কিন্তু পিস্তল-পার্টি ছাড়া কি আর কোনও মেশবার লোক নেই? রামকৃষ্ণ-মিশন কি গৌড়ীয় মঠও তো আছে কলকাতায়। থিয়েটারের ক্লাবও তো আছে কলকাতায়। তাছাড়া আরো কত কী আছে সেখানে—তাদের সঙ্গে মিশতে পারো না?

বসন্ত বললে—যারা লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত ভদ্র ছেলে তাদের সঙ্গেই আমার বরাবর মেলামেশা ছিল।

—যারা পিস্তলবাজি করে তারা কি শিক্ষিত-ভদ্র ছেলে? আর কোনও শিক্ষিত ভদ্র ছেলেদের খুঁজে পেলে না?

বসন্ত বললে, যারা দেশের মানুষের কথা ভাবে, তাদের সঙ্গেই আমি মিশেছি।

—এখন কি তাদের সঙ্গে মিশতেই কলকাতায় যাও?

বসন্ত একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, এই কুসুমগঞ্জে কি মেশবার মত কোন লোক আছে? কার সঙ্গে এখানে মিশবো বলো?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কেন, আমার ব্যবসায় তো আমাকে একটু সাহায্যও করতে পারো।

বসন্ত বললে—তোমার ব্যবসা আমার পছন্দ হয় না।

—কেন?

বসন্ত বললে—সে তো আমি অনেকবার বলেছি। অন্য লোকের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজের পেট ভরানোটা তো ভালো কাজ নয়।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—কিন্তু আমি না থাকলে কে তাদের বিপদের দিনে দেখতো?

বসন্ত বললে—যে দেশে তুমি নেই, সে-দেশের লোকেরা কি বেঁচে নেই?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—আমি কি একলাই মহাজনী কারবার করি? পৃথিবীর অন্য দেশে কি আর কোনও মহাজন নেই?

বসন্ত বললে, এই সব তর্ক আমি তোমার সঙ্গে এখন করতে চাই না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, মানে তুমি মনে করো মহাজনী কারবার করা পাপ?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ পাপই তো! ব্যাঙ্কও মহাজনী কারবার করে, তারাও সুদ নিয়ে টাকা খাটায়, কিন্তু তোমার মত গরীবদের রক্ত চুষে খায় না। এমন করে চাষীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বসায় না। তোমার মতো তাদের গলাও তারা কাটে না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—কলকাতায় গিয়ে তুমি এইসব কথা শিখে এসেছ? এই সব শেখবার জন্যে আমি তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলুম?

বসন্ত বলেছিল, কলকাতায় না গিয়েও এসব কথা শেখা যায়। এ শিখতে গেলে কলকাতায় যেতে হয় না কাউকে। আমি ছোটবেলা থেকে তোমার কাছ থেকে নিজের চোখে দেখেছি। তোমার কাছে এসে টাকা ধার নিয়ে কত লোক শেষকালে ধার শোধ করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তা-ও আমার নিজের চোখে দেখা। বরং কলকাতায় না গিয়ে এখানে থাকলে আরো বেশি দেখতে পেতুম।

হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, তা আমি আমার হক্কের সুদ ফেরত চাইব না? তুমি কি বলতে চাও আমি আমার দেনাদারদের সব সুদ মকুব করে দেব? টাকা উপায় করতে বুঝি আমাকে কষ্ট করতে হয়নি, আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়নি? আমার কি টাকার গাছ আছে?

এ-কথার হয়তো শেষ হত না, কিংবা এ-তর্ক হয়ত আরো অনেকক্ষণ ধরে চলতো, কিন্তু ওদিকে আবার আর একজন কে বাইরে থেকে ডাকলে—বিশ্বাসমশাই বাড়ি আছেন?

হেমন্ত বিশ্বাস আর দাঁড়ালো না। হয়তো কোন দেন্‌দার সুদ দিতে এসেছে। কিংবা হয়তো টাকা ধার নিতে এসেছে।

অনিলা বললে, এ কি, তুমি না খেয়েই উঠে পড়লে যে?

বসন্ত বললে, আমার আর ক্ষিধে নেই।

বলে উঠে দাঁড়াতেই অনিলা বললে, এই রকম না খেয়ে-খেয়েই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ততক্ষণে কুয়োর কাছে গিয়ে বসন্ত এঁটো হাত ধুয়ে ফেলেছে।

অনিলা জিজ্ঞেস করলে, কলকাতায় কিছু কাজের বন্দোবস্ত করতে পারলে?

বসন্ত বললে, চেষ্টা তো করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও কিছু বন্দোবস্ত করতে পারিনি। করতে পারলেই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো!

অনিলা বললে—কেন, এখানে এই কুসুমগঞ্জে তো আমার কোনও কষ্ট হয় না। আর শুনেছি তো কলকাতায় অনেক কষ্ট!

—কীসের কষ্ট?

—সেখানে বাড়ি ভাড়াই তোমার অনেক পড়ে যাবে! এখানে বাবা আছেন, তাই কিছু বুঝতে পারছি না। তাছাড়া সেখানে ভোলার মা'র মত লোক কোথায় পাবে।

বসন্ত বললে, জীবনে একটু কষ্ট করা ভালো। পৃথিবীতে কত মানুষ কত কষ্ট করে সংসার চালায়, তা যদি তুমি জানতে! অনেকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তা শুধু কলকাতাই বা কেন, এখানে এই কুসুমগঞ্জে গরীব লোক নেই ভেবেছ? তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো তাই বুঝতে পারো না। একটু মুচিপাড়া কি গোয়ালাপাড়ার দিকে গেলেই টের পাওয়া যায়। থালা-বাসন বিক্রি করে তারা চাল কিনে খাচ্ছে এখন।

অনিলা বললে, সে তো দেখতে পাই রোজ। বাবার কাছে এসে বাড়ির বাসন-কোসন বিক্রি করে যায় রোজ। কিন্তু তার জন্যে কি বাবা দায়ী?

বসন্ত বললে, বাবা দায়ী নয় তো কে দায়ী? তুমি কি মনে কর তারা কখনও আর ওই সব বাসন-কোসন বাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে! ওই যে আমাদের বাগানটা। যে-বাগানের আম-কাঁঠাল আমি-তুমি খাই, ওটা আগে কাদের ছিল জানো? গয়লাপাড়ার ঘোষেদের। ওদের অবস্থা যখন খারাপ হলো তখন বাবার কাছে বাগানটা বন্ধক রেখেছিল! কিন্তু তারপর কি আর ও-বাগান ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে? বাবা ওই গাছ বেচে বছরে কত টাকা পায় তা জানো?

—না। কত টাকা?

—সাত হাজার টাকা! বাবা কোন পরিশ্রম না করে ওই একটা বাগান থেকে বছরে সাত হাজার টাকা আয় করে। এই রকম পাঁচটা বাগান আছে বাবার। এক-একটা বাগান কিনেছিল গড়ে পঞ্চাশ টাকা দামে।

অনিলা কথাগুলো শুনছিল। বসন্ত থামতেই বললে, তা ও-সব তো বাবা আমাদের জন্যেই করে যাচ্ছেন। একদিন তো আমরাই ও-সব কিছুর মালিক হবো। ও-সব তো আর বাবার সঙ্গে যাবে না।

বসন্ত বললে, তুমি ও-সব বুঝবে না। পাপের পয়সা যে পায় তারও পাপ হয়!

অনিলা বললে—পাপ বলছো কেন? ও ব্যবসা তো অনেকেই করে।

বসন্ত বললে—যারা অন্যায় করে, তার জন্যে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত!

অনিলা বললে—সে শাস্তি যদি পেতেই হয় তো, ভগবান নিজেই তাকে সে-শাস্তি দেবেন। কত লোকই তো আছে, যারা পাপ করেও জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দেয়।

বসন্ত বললে, ভগবান নিজের হাতে তো শাস্তি দেন না। ভগবান শাস্তি দেবার জন্যে কিছু লোক পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে। তারাই পাপীকে শাস্তি দেয়।

তারপর একটু থেমে বললে, আর পাপ করেও জীবনটা সুখে কাটিয়ে দেবার কথা বলছো? সুখ কাকে বলে তার মানেটা আগে বলে দাও। খাওয়া-পরার সুখটাই কি সুখ? তাহ'লে বাবা রোজ রাত্তিরে আর বিকেলে আফিম খায় কেন?

অনিলা সত্যিই শ্বশুরকে নিজের হাতে রোজ আফিমের গুলি দিয়ে আসতো। আফিমের সঙ্গে দুধও গরম করে দিত। আফিমের গুলিটা মুখে দিয়েই হেমন্ত বিশ্বাস গরম দুধটা চুমুক দিয়ে খেত।

বসন্ত বললে, পাপ শুধু বাবার একলার নয় অনিলা, তুমি জানো না বাবার ওই টাকায় আমি লেখাপড়া শিখেছি, বি-এ পাশ করেছি, তুমি নিজেও সেই পাপের টাকায় এ-বাড়ির বউ হয়ে সুখ ভোগ করছো, এতে তোমারও পাপ হচ্ছে, আমারও পাপ হচ্ছে। তখন অনিলা এ-সব কথা ভালো করে বুঝতো না। অথচ বসন্ত বার-বার করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতো।

অনিলা বলতো, তুমি যদি এতই বোঝো তাহ'লে কেন আমাকে বিয়ে করলে?

বসন্ত বললে, বিয়ে করেছি তো কি হয়েছে, আমরা তো এ-বাড়িতে বেশিদিন থাকবো না। বেশিদিন পাপের ছোঁয়াচ তোমার গায়ে লাগতে দেব না। যতদিন নিজের একটা স্বাধীন উপার্জন না হয়, ততদিন একটু সহ্য করো।

সত্যিই, বসন্ত নিজে কিছু করবার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, তা বুঝতে পারতো অনিলা। তাই কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো—ঠাকুর, ওঁর একটা কিছু করে দাও তুমি তাহলে ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি।

সুশীলা যখন বললে তার খালাস হবার হুকুম হয়েছে, তখন প্রথমে তার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয়নি। চোদ্দ বছর তাকে একটানা জেল খাটতে হবে এইটেই তার ধারণা ছিল। চোদ্দটা বছর কি কম? চোদ্দ বছর মানেই তো সারা জীবন!

প্রথম দিকে খুবই কষ্ট হতো সুমন্তর জন্যে! হেমন্ত বিশ্বাসের ছেলে বসন্ত বিশ্বাস, আর বসন্ত বিশ্বাসের ছেলে সুমন্ত বিশ্বাস। নাতির নামটা হেমন্ত বিশ্বাসই রেখেছিল। হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, জানো বউমা, অনেক টাকা খরচ করেছিলাম বসন্তকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার জন্যে! বসন্তটা মানুষ হলো না, এখন দেখি সুমন্ত যদি মানুষ হয়।

একদিন অনেক রাত্রে বসন্ত হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির। কোথা দিয়ে কেমন ভাবে সে বাড়িতে ঢুকলো তা অনিলা বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে, তুমি?

বসন্ত বললে—কেন, আসতে নেই?

অনিলা বললে—না, তা বলছি না। কিন্তু এই অসময়ে তো তুমি আসো না। এত রাত্তিরে কী করে তুমি বাড়ি ঢুকলে? কে দরজা খুলে দিলে?

বসন্ত বললে—কেউ দরজা খুলে দেয় নি, আমি উঠোনের পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকেছি। কেউ জানতে পারেনি। আমার ভীষণ দরকার তোমার সঙ্গে। কিছু টাকা চাই। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো?

—টাকা?

বসন্ত বললে, হ্যাঁ টাকা, শ'দুয়েক টাকা হলেই এখনকার মত চলে যাবে আমার।

ততক্ষণে অনিলা ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়েছে। সুমন্তর তখন বয়েস কম। সে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল অনিলার পাশে। কিন্তু আলো জ্বলে উঠতেও তার ঘুম ভাঙলো না।

বসন্ত বললে—আলোটা নিবিয়ে দাও, খোকা জেগে উঠবে।

অনিলা আলোটা নিভিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি টাকা চাইতেই এসেছো?

বসন্ত বললে—হ্যাঁ, টাকাটা নিয়েই আবার চলে যাবো।

—কোথায় যাবে?

—সে কথা জেনে তোমার কী লাভ?

অনিলা বললে, তুমি জানো না যে আমার কাছে টাকা থাকে না? টাকা কি বাবা আমার হাতে কখনও দেন? বিয়ের সময় যে-সব গয়না পরতে দিয়েছিলেন সেগুলো পর্যন্ত তিনি কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। সে সব কথা তুমি তো জানো।

বসন্ত বললে—তাহলে আর কী হবে! আমি তাহ'লে যাই!

—তুমি চলে যাবে?

—হ্যাঁ!

অনিলা বললে, তুমি যদি বাড়িতেই না থাকবে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন আমাকে? এমন বিয়ে কি না করলে চলতো না?

বসন্ত বললে, আমি কী করবো বলো? সব কিছুর জন্যেই তো আমার বাবা দায়ী।

অনিলা বললে—তোমার বাবার দোষের জন্য আমি ভুগবো কেন সেটা বলতে পারো? আমি তোমার কাছে কী এমন দোষ করেছি যে, সারা জীবন আমাকে এমনি করে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

বসন্ত বললে—তোমার তো খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট নেই এখানে!

অনিলা বললে, খাওয়া-পরার কষ্টের জন্যেই কি লোকে বিয়ে করে?

বসন্ত বললে—তোমার বাপের বাড়িতে তো তোমার খাওয়া-পরার কষ্টও ছিল! সে কষ্টটাই কি কিছু কম?

অনিলা রেগে উঠলো। বললে, দেখ বাজে বাজে কথা বোল না। আমার রূপ দেখে তোমার বাবা আমাকে এ-বাড়িতে বউ করে এনেছেন, তুমি যাতে সংসারী হও সেইটেই তাঁর ইচ্ছে ছিল। কেন তুমি এই রকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, কেন তুমি সংসারী হবে না? কেবল বাইরে-বাইরে পড়ে থাকো কেন? কী তোমার কাজ এত বাইরে?

বসন্ত বললে, সে-সব কথার কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে নাকি এখন?

অনিলা বললে, হ্যাঁ, দিতে হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি এতদিন, অনেকদিন সব মুখ বুঁজে সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আর সহ্য করবো না। এখন তোমাকে বলতেই হবে তুমি কী নিয়ে ব্যস্ত থাকো, কলকাতায় তোমার কী এত কাজ?

বসন্ত বললে—অত চেঁচিও না, অত চেঁচালে আমি কিন্তু এখানে যাও আসতুম তাও আর আসবো না।

অনিলা বললে, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

বসন্ত বললে—শুধু তোমাকে নয়, বাবাকেও ভয় দেখিয়েছি এতদিন। আমাকে তোমরা কেউ-ই এতদিন চিনতে পারলে না। আমার পকেটে রিভলবার আছে তা জানো তো?

অনিলা বললে, কেন, আমাকে তুমি খুন করবে নাকি? ভেবেছো আমি ছোট্ট খুকি যে, রিভলবারের কথা শুনে আমি ভয় পাবো?

বসন্ত আর দাঁড়াতে চাইলে না। যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই চলে যাচ্ছিল।

অনিলা সামনে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললে, কোথায় যাচ্ছো?

বসন্ত বললে—যেখানেই যাই না, তোমার কী?

অনিলা বললে, আমি তাহলে চেঁচাবো। তাতে বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। তিনি সব জানতে পারবেন।

বসন্ত বললে—ছাড়ো, পথ ছাড়ো আগে, তারপর যত পারো চেঁচিও—আমি বারণ করতে আসবো না।

অনিলা বললে, না, আমি কিছুতেই তোমাকে চলে যেতে দেব না। দেখি তুমি কী করে চলে যাও।

বসন্ত বললে, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।

—কে তারা? কারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে?

বসন্ত বললে—তারা আমাদের দলের লোক।

—কীসের দল?

বসন্ত বললে—সে তুমি বুঝবে না।

অনিলা বললে, আমি যদি কিছুই না বুঝি তাহলে তোমার বউ হয়েছিলুম কেন? আমাকে বুঝিয়ে দিলেই আমি বুঝবো!

—তুমি একটু আস্তে আস্তে কথা বলো। বাবার ঘুম ভেঙে গেলে তখন খুব মুশকিল হবে।

অনিলা বললে, বাবা আফিম খেয়ে শুয়েছেন। অত সহজে তাঁর ঘুম ভাঙবে না। তুমি বলো, আমি শুনি। কোথায় যাও তুমি, কী করো, আজকে সব আমাকে বলতে হবে। কেন তোমার পকেটে রিভলবার থাকে? তোমার কীসের দল? দলের কী কাজ? আর এত টাকারই বা কীসের দরকার তোমার? আর এত টাকারই যদি তোমার দরকার তো বাবার কাছে তা চাইলেই পারো। বাবার তো টাকার অভাব নেই।

বসন্ত বললে, বাবার টাকা আমি নেব না বলেই তো তোমার কাছে টাকা চাইছি।

অনিলা বললে, আমার টাকাও তো বাবারই টাকা। আমার কি আলাদা কোন আয় আছে?

বসন্ত বললে— তোমার সংসার খরচের টাকা থেকেও যদি কিছু দিতে।

অনিলা বললে, সংসার খরচের জন্যে কি বাবা আমাকে কিছু টাকা আলাদা দেন? তুমি কি জানো না যে বাবার কাছে টাকাই হচ্ছে সর্বস্ব। কিছু কেনবার দরকার হলে বাবা সেটা কিনে দেন। তেল নুন থেকে আরম্ভ করে আমার শাড়ি খোকার জামা সবই বাবা নিজের হাতে কিনে দেন। টাকা কি কখনও বাবা কাউকে দেন?

বসন্ত বললে, তা তোমার নিজের গয়না-টয়না কিছু নেই?

অনিলা অন্ধকারের মধ্যেই একটা করুণ হাসি হাসলো। বললে, তুমি সব জেনেও না-জানার ভান করছো? এই দেখ—বলে ঘরের আলোটা আবার জ্বালালো। বললে, এই দেখ, আমাব গলা দেখ, আমার দু'টো হাত দেখ, কিছু গয়না দেখতে পাচ্ছো? কোনও গয়না আমাব নিজের বলে আছে? লোকে জানে মস্ত বড় ঘরের বউ আমি। কিন্তু তোমাকেও কী বলে দি-- হবে, কেন সধবা মানুষ হয়েও আমার গলায়, আমার হাতে কোন গয়না নেই। এই এয়োতীর চিহ্ন একজোড়া শাঁখা ছাড়া হাত দু'টোও আমার খালি। কেন খালি তুমি জানো না? ইচ্ছে হলেও সুমন্তকে আমি একটা খেলনা কিনে দিতে পারি না কেন, তা তুমি জানো না? কিংবা হয়তো সব কিছু জেনেও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

বসন্ত বললে, আমি অনেক আশা করে এসেছিলুম। যখন টাকা পেলুম না তখন আর এখানে থেকে মিছিমিছি কী করবো, আমি চলি—

—না যেও না, দাঁড়াও!

বসন্ত ফিরে দাঁড়ালো। অনিলা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী যে একটা দেখে থমকে দাঁড়ালো। বললে, একি, তোমার জামার পেছনে রক্তের দাগ কেন?

বলে বসন্তর জামায় হাত দিতেই তার নিজের হাতের আঙুলগুলো লাল হয়ে গেল। বললে, এ কি, এত রক্ত কোথা থেকে এল? তুমি কী কোথাও পড়ে গিয়েছিলে?

বসন্ত তাড়াতাড়ি জামাটা টেনে ধবেছে। টেনে ধরতেই এক থাবড়া রক্ত অনিলার গায়ে এসে লাগলো। সেই রক্তের ছিটে লেগে তার শাড়িটাও দাগী হয়ে গেল। রক্ত দেখে তার হাতটাও শিথিল হয়ে এল। আর সেই ফাঁকে বসন্তও এক লাফে যেখান দিয়ে যেমন করে এসেছিল, তেমনি করে

পালিয়ে গেল। পালিয়ে যেতে গিয়ে গরুর গোয়ালের টিনের চালের ওপর একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দের মত শব্দ হলো। তাতে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরে খান্ খান্ হয়ে গেল।

—কে?—কে?—কে?

ওদিক থেকে হেমন্ত বিশ্বাসের গলার আওয়াজ এসে পড়লো।

—বউমা, বউমা, ওটা কীসের শব্দ হলো যেন?

অনিলা পাথরের মতন চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

হেমন্ত বিশ্বাসের সন্দেহ-শক্তি বড় প্রবল। অনেক সোনা-দানা-রূপো-টাকা-আনা-পাই গচ্ছিত আছে তার বাড়িতে। আফিম খেলেও একটু শব্দতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের ঘোরেই শব্দটা কানে গিয়েছিল তার। বাড়ির সব ঘরগুলো হাতড়াতে-হাতড়াতে একেবারে অনিলার ঘরের সামনে এসে হাজির হলো।

—বউমা, ঝপাং করে কীসের একটা শব্দ হলো না?

অনিলা কোনও জবাব দিলে না সে-কথার।

হেমন্ত বিশ্বাস আরো কাছে এগিয়ে এলো।

—কী হলো বউমা, তুমি এ-রকম এখানে এত রাত্তিরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? শব্দটা কীসের?

তারপর হঠাৎ বউমার শাড়িটার ওপর নজর পড়লো।

বললে, একি তোমার শাড়িতে এত রক্ত লাগলো কীসের? কী হয়েছিল? পড়ে গিয়েছিলে?

অনিলা নিজেকে সামলে নিলে।

বললে, হ্যাঁ।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কী করে পড়ে গেলে? কুয়োতলায় যেতে গিয়ে পা পিছলে গিয়েছিলো বুঝি?

অনিলা আবার বললে, হ্যাঁ।

—তাহ'লে মলম লাগাচ্ছো না কেন?

অনিলা কিছু জবাব দিলে না।

হেমন্ত বিশ্বাস আবার জিজ্ঞেস করলে, সে হারামজাদা কোথায়? সেই বসন্ত হারামজাদা? সে বাড়ি নেই বুঝি?

অনিলা বললে, না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কোথায় যায় বলতো সে হারামজাদা? ভেবেছিলুম, বিয়ের পর একটু সেয়ানা হবে। তোমাকেও তো বলেছিলুম তাকে একটু সংসারী করে তুলতে। তাও তুমি পারলে না?

তারপর একটু হেসে হেমন্ত বিশ্বাস আবার বলতে লাগলো—সবই আমার কপাল, জানো বউমা, আমারই কপাল! একটা মাত্তোর ছেলে, সেটাও মানুষ হলো না। এবার যখন বাড়ি আসবে, আমাকে খবর দিও তো! আমি হারামজাদাকে কড়কে দেব। বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে। এখনও মতি-গতি বদলালো না, এ তো ভালো কথা নয়। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম, কী বলবো তোমাকে। আমার তো মনে হলো বাড়িতে ডাকাত পড়লো বুঝি!

তারপর যখন বুঝলো যে ডাকাত পড়েনি, তখন যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো হেমন্ত বিশ্বাস। বললে, খুব সাবধানে থাকবে বউমা, বুঝলে, দিনকাল বড় খারাপ! খুব সাবধানে থাকবে। লোকে বলছিল কলকাতায় নাকি নকশালরা খুব খুন-খারাপি শুরু করেছে। এত বয়েস হলো কখনও এমন কথা তো শুনিনি—ওরা কী করছে জানো? ধরে-ধরে সব বড়লোকদের নাকি খুন করছে! বুঝলে বউমা, বড়লোকরা কী এমন দোষ করেছে? টাকা উপায় করে বলেই কী তাদের খুন করতে হবে? টাকা উপায় করা কী দোষের? তুমিই বলো বউমা?

অনিলা কোনও কথা বললে না।

হেমন্ত বিশ্বাস আবার বলতে লাগলো—তুমি যে কিছু বলছো না বউমা?

অনিলার মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—আমি কি বলবো?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না-না, তা বলছি না! সত্যিই তো, তুমি মেয়েমানুষ, তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো, তুমি কী করে খবর রাখবে? কিন্তু আমাকে তো বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। শুনলাম নক্‌শালরা নাকি কলকাতায় তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। তারা বড়লোক দেখলেই নাকি তাকে খুন করছে, জানো? কেন রে বাবা বড়লোকরা তোদের কী দোষ করলো? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'টো বেশি টাকা উপায় করেছে বলে? তা ক্ষমতা থাকে তো তোরাও টাকা উপায় কর না! কে তোদের মানা করছে?

হেমন্ত বিশ্বাস মনে-মনে খুব দুঃখ পেত। একটা মাত্র ছেলে ওই ছেলের জন্ম দিয়েই গৃহিনী চলে গেছেন, ভালোই হয়েছে। নইলে ছেলের ব্যবহার দেখে তিনিও মনে কষ্ট পেতেন। ভগবান যা করেন তা বোধহয় মঙ্গলের জন্যেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেদিনও যথারীতি হেমন্ত বিশ্বাস ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নদীতে গিয়ে স্নান সেরে বাড়ি এসেছে। যতক্ষণ স্নান করেছে ততক্ষণ গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেছে। তারপর একটা পাথর বাটিতে করে দু'টি মুড়ি খেয়ে জলযোগ করেছে। তারপর যথারীতি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম মানে তার নিজস্ব বন্ধকী কারবার করেছে। তারপর বেলা একটা নাগাদ ভেতর বাড়িতে এসে ডেকেছে—বউমা।

বউমা মানে অনিলা। অনিলা ওই সময় শ্বশুরের ডাক শুনলেই বুঝতে পারতো যে শ্বশুরের ভাত বেড়ে দিতে হবে। বুঝতে পারতো শ্বশুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। হেমন্ত বিশ্বাসকে ভাত বেড়ে দিত অনিলা।

খাওয়ার সময় শ্বশুরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন কী চাই তাও বুঝে নিতে হবে। বার-বার জিজ্ঞেস করতে হবে আর দু'টি ভাত চাই কিনা। শুধু ভাত নয়, ডাল, ভাজা, কী আর কিছুরও দরকার হতে পারে। সবই তদারক করতে হবে বউমাকে।

তারপর খেয়ে উঠে হেমন্ত বিশ্বাস কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে যে-ঘরটায় তার সিন্দুক থাকে। সেই সিন্দুকটাই তার প্রাণের প্রাণ! তার ভেতরেই হেমন্ত বিশ্বাসের প্রাণ-পাখীটা রাখা আছে। আর সেই সিন্দুকের চাবিটা তার ট্যাকের ঘুনসীতে লটকানো থাকে।

সেদিনও তাই করেছে হেমন্ত বিশ্বাস। ঘুম থেকে উঠে সেদিনও ডেকেছে— বউমা। বউমা জানে ও-ডাকটা আফিমের ডাক। ওই সময়ে আফিম খাবার দরকার হয় হেমন্ত বিশ্বাসের। নিজস্ব আফিমের কৌটো আছে একটা। তাতে আফিমের গুলি পাকিয়ে রাখা আছে ঠিক মাপের মতো করে। একটু উনিশ-বিশ হবার উপায় নেই। তারপর আফিমের ড্যালাটা অনিলা হেমন্ত বিশ্বাসের হাতে দেবে, আফিমের ড্যালাটা মুখে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই দুধ চাই। ক্ষীর করা দুধ। গাঢ় দুধে ভর্তি বাটিটা নেবার জন্যে হাত বাড়াবে হেমন্ত বিশ্বাস। আফিম খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দুধ চাই—এইটেই নিয়ম।

তা অনিলা সেদিনও তার অন্য হাতে মজুত রেখে দিয়েছিল অন্য দিনের মত। দুধটা খেয়ে হেমন্ত বিশ্বাস বিকেল বেলা আবার চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসবে। তখন আসবে দেনাদারেরা, আসবে পাওনাদারেরা! তখন সকলের সঙ্গে লেন-দেন, হিসেব-নিকেশ হবে।

তারপর যখন রাত গভীর হবে, অর্থাৎ রাত সাড়ে ন'টা কি দশটা বাজবে, তখন ভেতর-বাড়িতে এসে ডাকবে—বউমা!

অর্থাৎ তখন খাবার দিতে হবে শ্বশুরকে। অনিলা তৈরিই থাকে। সেই সময়ে আবার সেই একই রকম। সেই একই রকম ভাবে অনিলা শ্বশুরের খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর তারপর খাবার খেয়ে যখন নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে বসবে, তখন অনিলা আফিমের ড্যালাটা নিয়ে তার হাতে তুলে দেবে। আর এক হাতে থাকবে গরম দুধের বাটি।

সেদিনও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

আফিম আর দুধ খেয়ে হেমন্ত বিশ্বাস বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। শোবার আগে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল! কিন্তু যখন শেষ রাত, তখন হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছিল।

—কে? কে?

হেমন্ত বিশ্বাসের মনে হয়েছিল বোধহয় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

আবার জিজ্ঞেস করলে, কে? কে? কারা দরজা ঠেলছে?

কিন্তু অত ভাববার সময় নেই তখন হেমন্ত বিশ্বাসের। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতেই চোখে পড়লো সামনেই দু'চারজন পলিশ দাঁড়িয়ে আছে। হেমন্ত জিজ্ঞেস করলে, কী ব্যাপার দারোগাবাবু?

দারোগাবাবু গম্ভীর গলায় বললে, আপনার ছেলের নাম বসন্ত বিশ্বাস?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

দারোগাবাবু বললে, আপনার ছেলে মারা গেছে।

—মারা গেছে?

অনিলার মাথায় যেন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হলো।

হেমন্ত বিশ্বাস আবার জিজ্ঞেস করলে, কী করে বসন্ত মারা গেল?

—পুলিশের গুলিতে!

হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে পুলিশের গুলিতে? কেন, কী করেছিল সে?

মানুষের জীবনে কখন যে কেমন করে হঠাৎ একদিন বিপদ ঘনিয়ে আসে, আর এসে একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়, তা কেউ বলতে পারে না। যে-ছেলের ওপর হেমন্ত বিশ্বাসের এত ভরসা ছিল, সেই ছেলেই যে একদিন অপঘাতে মারা যাবে তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল?

সত্যিই, তারপর জানা গেল কলকাতায় যাবার পর থেকেই বসন্ত এমন একটা দলে পড়ে গিয়েছিল যাদের পুলিশি ভাষায় বলা হতো নক্‌শাল। শেষবারের মতো আর তাকে দেখেনি অনিলা। যা কিছু করবার শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসই করেছিল ঝাড়গ্রামে গিয়ে। কোন এক জঙ্গলের মধ্যে তাদের দলের সঙ্গে পুলিশের দলের গুলি চালাচালি হয়েছিল। আর তাতেই একটা আচমকা গুলি খেয়ে বসন্ত প্রাণ দিয়েছিল।

আট বছর! এই আট বছরে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছিল অনিলার জীবনে। বসন্তর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যদি এ কাহিনী শেষ হয়ে যেতো, তো তাহ'লে অনিলার শেষ জীবনটা এমন করে জেলখানায় কাটতো না।

বোধহয় আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিল অনিলা। নইলে সে বিধবাই বা হবে কেন, আর তার ছেলেই বা অমন হবে কেন? আর শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসই বা শেষ জীবনে অমন কাণ্ড করবে কেন?

সুমন্তর যত বয়েস বাড়তে লাগলো ততই যেন সে কেমন বদলে যেতে লাগলো। মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করতো। অনিলা জিজ্ঞেস করতো— কোথায় থাকিস তুই সারাদিন?

সুমন্ত বলতো, সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে তোমার কাছে?

অনিলা বলতো, তা সারাদিন আমি ভাত নিয়ে বসে রইলুম, তুই খেলি না, আমার ভাবনা হয় না?

সুমন্ত বলতো, আমার কী নিজের কাজ থাকতে নেই তা বলে? তুমি নিজে খেয়ে নিলেই পারতে!

অনিলা বলতো, তুই যদি মা হতিস, তাহ'লে বুঝতিস ছেলেব জন্যে মায়ের ভাবনা হয় কি না!

কথা কাটাকাটির আওয়াজ কানে যেতেই হেমন্ত বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে ভেতর বাড়িতে আসতো। বলতো, কী হয়েছে বউমা? এত চেঁচামেচি কিসের?

অনিলা বলতো, এই দেখুন না বাবা, আপনার নাতির কাণ্ড। সারাদিন কোথায় কী রাজকার্য নিয়ে আছে, আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাই ছেলে একেবারে রেগে চিৎকার করছে। এদিকে আমার যে সারাদিন খাওয়া হলো না, তা একবাব ভাবছে না।

হেমন্ত বিশ্বাস নাতিব দিকে ফিরে বললে, কোথায় গিয়েছিলি রে?

সুমন্ত বললে, আমার নিজের কাজে।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, নিজের কাজ মানে? তোর আবার নিজেব কাজ কি? লেখা-পড়া তো সিকেয় উঠেছে। তিনবার ফেল করে ক্লাশেও উঠতে পারলি না। তা লেখা-পডা না হলো না হলো! তোর বাবা তো লেখা পডা শিখে আমার মাথা একেবারে কিনে নিয়েছিল। তা লেখা-পড়া সকলের হয় না, কিন্তু ভাতটা সময় করে খেয়ে নিয়ে গেলে তো গেরস্থের উপকার হয়। সেটাও কী তোর দ্বারা হবে না?

সুমন্ত বললে, আমার খাওয়া হোক আর না হোক, মা খেয়ে নিতে পারে না?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তুই দেখছি তোর বাবার ধাঁচ পেয়েছিস! ওরে হারামজাদা, এই যে তুই জামা-কাপড় পরে আছিস, এই যে-বাড়িতে তুই আছিস, এসব কোত্থেকে হলো তার খবর রাখিস তুই? আমি যদি মুখের রক্ত উঠিয়ে টাকা উপায় না করতুম তো তুই এইরকম করে দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারতিস?

সুমন্ত এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

হেমন্ত বিশ্বাস কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, কিরে আমার কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে? এমনি আড্ডা দিয়ে বেডাতে পারতিস?

এবার আর সুমন্ত সেখানে দাঁড়ালো না। হেমন্ত বিশ্বাসের কথার জবাব না দিয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস টপ করে সুমন্তর একখানা হাত ধরে ফেললে।

বললে, যাচ্ছিস কোথায়? কথার জবাব না দিয়ে যাচ্ছিস কোথায়? আমার কথাগুলো কি কানে যাচ্ছে না তোর?

সুমন্ত বললে, আমি কি বলবো?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কেন, আমি বুড়োমানুষ বলে কী আমার কথার কোনও দাম নেই? তা আমি কী একটা মানুষ নই?

সুমন্ত বললে, তুমি আমার হাত ছাড়ো!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, হাত ছাড়বো না। তুই কি করতে পারিস? আমার কথার জবাব না দিয়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না। আমি অনেক সহ্য করেছি। এখন থেকে আর সহ্য করবো না।

অনিলা শ্বশুরের সামনে এসে বললে বাবা, আপনি যান, আপনি নিজের কাজে যান, মিছিমিছি রাগ করলে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—মিছিমিছি মানে? আমি বসন্তর বেলায় কিছু বলিনি। ভেবেছি বিয়ে হলে একদিন আপনি-আপনিই শুনবে। তার ফল তো দেখেছি। এখন সুমন্তর বেলায় আর তা হতে দিতে চাই না।

অনিলা বললে, কিন্তু আপনার শরীর খারাপ হবে যে!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শরীর আমার এমনিতেই ভেবে-ভেবে খারাপ হয়ে আছে। এরপর আবার কী খারাপ হবে?

তারপর সুমন্তর দিকে চেয়ে বললে, কিরে জবাব দিবি না আমার কথার?

সুমন্ত বললে, না।

—আবার মুখের ওপর 'না' বলা? বলেই হেমন্ত বিশ্বাস নাতির গালের ওঁপর ঠাস করে একটা চড় মারলে।

বললে, আমার মুখের ওপর 'না' বলছে। এ তো বড় বেয়াড়া ছেলে হয়েছে তোমার বউমা! যা দেখতে পারি না, তাই-ই হয়েছে। সবই আমার কপাল বউমা, সবই আমার কপাল।

সুমন্ত তখন হেমন্ত বিশ্বাসের চড় খেয়ে কাঁদছে! দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে কাঁদছে। হেমন্ত বিশ্বাস বলে উঠলো, থাম-থাম বলছি। নিজে অন্যায় করে আবার কাঁদছে! কাঁদতে লজ্জা করে না? এত বড় ধাড়ি ছেলে হলো, ঠাকুর্দার মুখের ওপর কথা! মুখ তোল্ তুই—দেখি।

সুমন্তর হাত দু'টো টেনে মুখটা দেখলে হেমন্ত বিশ্বাস।

বললে, আর কখনও মুখের ওপর কথা বলবি?

সুমন্ত চোখ দু'টো বুঁজিয়ে রইল।

—কিরে, কথা বলছিস নে যে! এ ঠিক বাপের ধারা পেয়েছে, ওর বাপও ঠিক এমনি ছিল। একগুঁয়ের একশেষ!

এতক্ষণে ছেলের কান্না দেখে অনিলা এসে আবার সামনে দাঁড়ালো।

বললে, বাবা, ওকে ছেড়ে দিন, ও আর করবে না। আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। কত লোক বসে আছে চণ্ডীমণ্ডপে।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, থাকুক বসে। নিজের ছেলেও আমার কথা শোনেনি। তা সে বেটা জাহান্নামে গেছে, আমার হাড় জুড়িয়েছে। একটা মাত্তোর নাতি, সেও কিনা বাপের মতোন বখে গেল। তাহ'লে কার জন্যে এত সম্পত্তি করছি! নাতিটাও কি মনের মতো হতে নেই! আমি ভগবানের কাছে কত পাপ করেছিলুম, যে আমাকে আজকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

তারপর বললে, যাক্ গে, যা আছে কপালে তাই-ই হবে—

বলতে-বলতে হেমন্ত বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলে গেল।

সুমন্ত তখন দাঁড়িয়ে। অনিলা ছেলের কাছে গিয়ে বললে—কেন অমন করিস বল তো? দাদুর সঙ্গে কী ওই রকম করে কথা বলতে আছে? তোর জন্যেই তো ওই বুড়ো মানুষটা খেটে-খেটে এত সম্পত্তি করেছেন। উনি তো আর টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। একদিন তো সব তোরই হবে! তুই নিজের ভালোটা একবার বুঝতে শিখলি না? এই বাড়ি, এই জমি-জমা, ক্ষেত-খামার তো সব একদিন তোরই হবে, ওঁনাকে চটাতে আছে?

সুমন্ত বললে, আমি এ-সম্পত্তি চাই না।

অনিলা অবাক হয়ে গেল ছেলের কথা শুনে। ছেলে বলে কী? নিজের ভালোটাও নিজে বোঝে না!

অনিলা বললে, সম্পত্তি চাস না মানে?

সুমন্ত বললে, এসব দাদুর পাপের টাকা।

অনিলা চমকে উঠলো ছেলের কথা শুনে। ঠিক এই ধরনের কথা নিজের স্বামীর মুখেও বারবার শুনে এসেছিল সে। এসব কথা সুমন্তকে কে শেখালে? তার মনের ভেতরে একটা পরিচিত আতঙ্ক আবাব সাপের মতো ফণা তুললো।

বললে, এসব কথা তোকে কে শেখালে!

সুমন্ত বললে, আমাকে শেখাতে হবে কেন? একথা তো সবাই জানে, সবাই বলাবলি করে একথা, আমাকে পাড়ার সবাই বলে সুদখোরের নাতি।'

অনিলা বললে, লোকের কথায় তুই কান দিস নে বাবা। আমার কথা যদি একটু ভাবিস। মাথার ওপরে তোর বাবাও নেই, তুই যদি আবার তোর বাবার মতো করিস তাহ'লে আমি কী করবো বল? আমি কোথায় দাঁড়াবো? কে আমায় দেখবে? আমি কার ভরসায় বেঁচে থাকবো? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে পৃথিবীতে বল্? নিজের বাপের বাড়ি বলতে লোকের একটা যাবার জায়গা থাকে, আমার তা-ও নেই। তুই-ই আমার বল্-ভরসা বলতে যা কিছু। এখন তুই-ই যদি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিস, তাহ'লে আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচবো বলতে পারিস? তোর কথা ভে'ব-ভেবে আমি সারাদিন কিছু মুখে দিতে পারিনি, আমার সারাদিন উপোস করে কাটছে, তা জানিস?

সুমন্ত বললে, তা তুমি যখন দেখলে আমার বাড়ি ফিবতে দেরি হচ্ছে, তখন তুমি নিজে খেয়ে নিলেই পারতে!

অনিলা বললে, তুই পেটের ছেলে হয়ে আজ আমাকে এই কথা বললি? তুই খাসনি, আর আমি তোর মা হয়ে খাবো?

বলে ছেলের সামনেই ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলো।

সুমন্ত আর দাঁড়ালো না। নিজের ঘরের দিকে চলতে চলতে বলল, যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না, তাই-ই হয়েছে। তুমি কী ভে'বছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে তোমার ওই মড়া-কান্না দেখলেই আমার চলবে? আমার অন্য আর কোনও কাজ-কর্ম নেই?

—ওরে খোকা, শোন্, খোকা শোন্—

সুমন্তও বোধহয় ঠিক তার বাপের ধারা পেয়েছিল। সে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা দড়াম্ করে শব্দ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

এই-ই ছিল অনিলার সাংসারিক জীবন। বড়লোক শ্বশুর-বাড়িতে বউ হয়ে যখন সে গিয়েছিল, তখন পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক তাকে কত হিংসে করেছিল। সবাই বলেছিল—অনিলা আগের জন্মে অনেক পুণ্য করেছিল, তাই এমন রাজরাণী হতে পারলো!

রাজরাণী! হ্যাঁ, রাজরাণীই বটে! রাজরাণী হয়েছিল বলেই আজ তাকে এমন করে জেল খাটতে হচ্ছে।

সুশীলা সেদিন একটা মাছভাজা নিয়ে লুকিয়ে এনে দিলে।

বললে, আপনি এই মাছভাজাটা খান দিদি!

অনিলা অবাক হয়ে গেল! বললে, তুমি আবাব আমার জন্যে মাছভাজা আনতে গেলে কেন সুশীলা! আমি কী মাছভাজা খাই!

সুশীলা বললে, অনেক বলে-কয়ে তবে ওটা এনেছি আপনার জন্যে, আপনি আর ক'টা দিন পরেই তো চলে যাচ্ছেন, তখন বাড়িতে গিয়ে অনেক ভালো-ভালো খাবার খাবেন।

অনিলা বললে, কিন্তু আমি যে বিধবা সুশীলা, আমায় কি মাছ খেতে আছে?

সুশীলা প্রথমটায় একটু লজ্জায় পড়লো। তারপর বললে, তাহ'লে কালকে আমি আপনাব জন্যে রসগোল্লা এনে দেব!

অনিলা বললে, রসগোল্লায় আমার দরকার নেই, কিন্তু তোমাদের এখানে জেলের ভেতরে রসগোল্লাও পাওয়া যায় নাকি?

সুশীলা বললে, সব পাওয়া যায়, শুধু মুখ ফুটে বলুন না কী চাই আপনার? এখানে যাদের মদের নেশা, তাদের জন্যে মদও আসে।

—পয়সা কে দেয়?

—পয়সা বাড়ির লোক, যারা কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে আসে তারাই লুকিয়ে দিয়ে যায়। আপনার বাড়িতে কে আছে বলুন, আমি এখুনি সেই বাড়ির লোকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলুন না, বাড়িতে কে-কে আছে?

অনিলা কী করে জানবে এখন বাড়িতে কে আছে। সুমন্তর যখন ষোল বছর বয়েস তখন সে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। আর সেই যে এসেছে, তারপর থেকে আর কেউই কখনও তার সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে আসেনি। এই আট বছরের মধ্যে সুমন্ত একবার খবর নিতেও আসেনি যে মা কেমন আছে, কিংবা বেঁচে আছে কিনা?

অথচ সুমন্তর জন্যে অনিলা কি-ই না করেছে। ছেলের জন্য সমস্ত মায়েরাই এমন করে। কিন্তু সব মায়েবা কী অনিলার মত জেল খাটে?

মনে আছে, যেদিন বসন্ত বিশ্বাসের মৃতদেহটা বাড়িতে আনা হয়েছিল, তখন বাড়ির সামনে গ্রামসুদ্ধ লোকের ভিড় হয়েছিল। তখন ওই সুমন্ত ছোট। বাইরে তখন মানুষের ভিড়ে পা রাখবার জায়গা ছিল না। আর অনিলা তখন নিজের ঘবের বিছানার ওপব সুমন্তকে বুকেব মধ্যে গুঁজে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।

ভোলার মা এসে ডাকছিল—বউদি, কর্তাবাবু তোমাকে একবার ডেকেছে—

তব কোন উত্তর দেয়নি অনিলা। শেষকালে হেমন্ত বিশ্বাস একেবারে নিজে এসে ডেকেছিল—বউমা, এসো-এসো, একবার শেষ দেখা দেখে যাও—তখন যেমন আমার কথা কানে নেয়নি, এখন যা হবার তাই-ই হয়েছে।

অনেক ডাকাডাকির পর অনিলা সুমন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সে তো শেষ দেখা নয়, যেন শেষ দর্শন। কিন্তু মনে আছে যেন কিছুই দেখতে পায়নি সে। চোখের জলে সবই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। শুধু যেন একটা রক্তপিণ্ড দাউ-দাউ করে জ্বলছিল তার চোখের সামনে আর তারপর জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ আর একদিন এমনি হলো।

সে-দুর্ঘটনার পর তখন অনেক দিন কেটে গেছে। বোধহয় হেমন্ত বিশ্বাসও নিজের সম্পত্তির গরমে পুরোনো কথা সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। আবার একদিন সদর দরজায় খটখট শব্দ।

—কে? কে কড়া নাড়ছে?

বাইরে থেকে শব্দ হলো, আমরা সদর থানা থেকে আসছি।

সদর থানা থেকে লোক আসা মানে যে-কী, তা হেমন্ত বিশ্বাস ভালো করেই জানতো। তাই ধড়মড়িয়ে উঠে সদর দরজা খুলে দিয়েছে।

দ্যাখে সামনেই পুলিশ আর পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে টর্চ ছিল বলে তাদের আসল চেহারা দেখা গেল। তাদের দেখেই বুকটা ধড়াস করে একবার কেঁপে উঠলো হেমন্ত বিশ্বাসের।

তবু সঙ্কোচে বললে, কী চাই?

—আপনার নাম কি হেমন্ত বিশ্বাস?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ হুজুর।

—আপনি এ-গ্রামের মহাজন?

হেমন্ত বিশ্বাস আবার বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—সুমন্ত বিশ্বাস আপনার কে হয়?

—আমার নাতি।

দারোগাবাবু বললে, আমরা আপনার বাড়ি সার্চ কববো।

হেমন্ত বিশ্বাস ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না।

আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে সদর থানার দারোগাবাবু বলে' আপনার নাতিকে ডাকাতি করবার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে এখন আমাদের হাজতে আছে। আপনার ছেলে বসন্ত বিশ্বাস কি নক্‌শাল ছিল?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ।

দারোগাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলে, সেই বসন্ত বিশ্বাস কী পুলিশের সঙ্গে গুলি চালাচালিতে মারা যায়?

—হ্যাঁ।

—সুমন্ত বিশ্বাস কি তারই ছেলে?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ।

দারোগাবাবু বললে, তাহ'লে আপনার বাড়ি তল্লাসী করবো।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, করুন, তল্লাসী করুন।

মনে আছে, পুলিশ এসে সমস্ত বাড়ি একেবারে তল্লাসী করে তছনছ করে গিয়েছিল সেদিন। অনিলারও সেদিন বুকটা ভয়ে দুর-দুর করে কেঁপে উঠেছিল। ঠিক এই রকম কাণ্ডই ঘটেছিল কয়েক বছর আগে যখন তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল পুলিশ। পুলিশ তো কোনোদিন সুসংবাদ নিয়ে আসে না।

হেমন্ত বিশ্বাস পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুমন্ত বেঁচে আছে তো?

পুলিশ বলেছিল, হ্যাঁ বেঁচে আছে, তবে ডাকাতির অপরাধে সে এখন আমাদের হেফাজতে আছে।

হেমন্ত বিশ্বাস বিশ্বাসই করতে চায়নি যে সুমন্ত কোনও দিন ডাকাতি করতে পারে। বললে, কিন্তু সে আমার নাতি, আমার তো টাকার অভাব নেই সে কেন ডাকাতি করতে যাবে? কোথায় ডাকাতি করেছিল সে?

দারোগা বললে, আমরা তা জানি না। আমাদের ওপর হুকুম এসেছে ওপর থেকে। বোধহয় নক্‌শালপন্থীদের দলে ছিল আপনার নাতি। তারপর বসন্ত বিশ্বাসও তো পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মারা যায়?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কিন্তু সে তো বারো বছর আগের ঘটনা।

অনিলা সেদিন হঠাৎ এই বিপর্যয়ে যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার বিছানা, আলমারি, তোরঙ্গ, তার সবকিছু ওলোট-পালোট করে ফেলেছিল। আর শুধু শোবার ঘরই নয়, সমস্ত বাড়িটা তোলপাড় করে দিয়েছিল পুলিশ।

শেষকালে হেমন্ত বিশ্বাসের ঘর। যে-ঘরে শ্বশুরের সিন্দুক থাকে।

পুলিশ বললে, সিন্দুকের তালাটা খুলুন।

হেমন্ত বিশ্বাস সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখা গেল অনেক গয়না, অনেক টাকা, অনেক তমসুক, অনেক খাতা-পত্র। গয়নার পাহাড় দেখে পুলিশের চোখগুলো চক-চক করে উঠলো।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলো, এ-সব এত গয়না কীসের?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, এসব একটাও আমার নয়, সমস্ত গাঁয়ের লোকেদের। আমি বন্ধকী কারবার করি, তারা এগুলো আমার কাছে বন্ধক রেখে গেছে। তার বদলে তাদের টাকা দিয়েছি। গরীব লোকদের টাকা দিয়ে আমি তাদের উপকার করেছি। টাকা ফেরত দিলেই আমি আবার এ গয়নাগুলো ফেরত দিয়ে দেব।

দারোগা বললে, তাহ'লে আপনি তো একজন মহাজন, সুদখোর এই জন্যেই আপনার ছেলে-নাতি এইরকম হয়েছে।

হেমন্ত বিশ্বাসের কানে কথাটা বড় খারাপ লাগলো। বললে, তা মহাজন হওয়াটা কি খারাপ? আমি মহাজনি করি বলেই তবু এখানকার গরীব-গুর্বো লোকেরা খেয়ে-দেয়ে একটু বেঁচে আছে!

পুলিশ এরপর আর কিছু বললো না। কিছু না পেয়ে খালি হাতেই চলে গেল। কিন্তু অনিলার মনের ভাবনা তবু ঘুচলো না। কোথায় রইলো সুমন্ত! কেন সে ডাকাতির দলের সঙ্গে মিশলো! কেমন আছে, কেমন আছে সে? কবে তাকে পুলিশ ছেড়ে দেবে।

সবাই চলে যাবার পর হেমন্ত বিশ্বাস কাছে এল।

বললে, বউমা আমি তোমাকে বলিনি যে ছেলেকে এত আদর দেওয়া ভালো নয়! এখন হলো তো? তোমার আদর পেয়ে-পেয়েই সুমন্ত এমনি হলো। বড্ড আদর দিয়ে দিয়েই তুমি ছেলের এই সর্বনাশ করলে! এখন ঠ্যালা বোঝ! আমার আর কী? আমি চলে গেলে তখন একলা তোমাকেই এই সব সহ্য করতে হবে। আমার এই জমি-জমা-ক্ষেত-খামার আমার এই টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি সব খোয়াবে, তখন তোমাকেই পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। তখন বুঝবে আমি যা বলতুম সব ঠিক বলতুম।

যা হোক শেষকালে একদিন সুমন্ত এল। আসতেই হেমন্ত বিশ্বাস দৌড়ে নাতির কাছে এসেছে। বললে, কী রে, কী হয়েছিল?

সুমন্ত বললে, কিছুই হয়নি!

—কিছুই হয়নি মানে? তাহ'লে পুলিশ এসে কী মিছে কথা বলে গেল ভেবেছিস? তারা যে বললে, ডাকাতের দলে ছিলি তুই?

সুমন্ত বললে, সব বাজে কথা!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বাজে কথা হলে পুলিশ তোর মাকে আর আমাকে সেদিন বাড়ি এসে অপমান করলে কেন?

সুমন্ত বললে, পুলিশ কী করে গেল তা আমি কি জানি? আমি কেন ডাকাতি করতে যাবো?

—তুই যদি ডাকাতি না করতে যাবি, তাহ'লে কোথায় গিয়েছিলি তাই বল্!

সুমন্ত বললে, আমি কোথায় গিয়েছিলুম তার জবাবদিহি আমি তোমাকে দিতে যাবো কেন?

বলে আর দাঁড়ালো না, সোজা ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল!

অনিলাও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার তার নিজের কাজে মন দেবার জন্যে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস তাকে যেতে দিলে না।

বললে, শোন বউমা, যেও না—

অনিলা থমকে দাঁড়ালো।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, দেখ বউমা, তোমার আদর পেয়ে পেয়েই সুমন্ত এত আস্কারা পেয়েছে। তুমি বসন্তকেও শাসন করতে পারোনি বলে তার ওই দুর্দশা হয়েছিল, এখন সুমন্তও তোমার কাছ থেকে লাই পেয়ে-পেয়ে বাপের পথ ধরেছে। গুরুজনদের যারা শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জানে না, তাদের এই দুর্দশাই হয়। যা হোক, আমি এখন আবার তোমাকে বলে রাখছি। আমি তোমাকে এখন থেকে সাবধান করে রাখছি। আমাকে এত অগ্রাহ্যি করার শাস্তি তোমাদের আমি দেবোই—বলে রাগে গর্-গর্ করতে করতে হেমন্ত বিশ্বাস নিজের কাজে চলে গেল।

সেদিন হঠাৎ জেলার সাহেব অনিলাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালো।

সুশীলা খুব খুশী। বললে, আমি বলেছিলাম দিদি যে এবার আপনাকে ছেড়ে দেবার হুকুম হবে!

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, জেলখানা থেকে চলে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না যেন দিদি!

অনিলা বললে, জানি না বাড়িতে গিয়ে কি দেখবো। কতদিন পরে নিজের বাড়ি যাচ্ছি। তুমি বুঝতে পারবে না সুশীলা, আমার ছেলের জন্যে মন কেমন করছে! তোমার যদি ছেলে থাকতো, তাহলে তুমিও বুঝতে পারতে!

সুশীলা বললে, কিন্তু আপনার ছেলে তো একবারও আপনাকে এখানে দেখতে এল না দিদি—

অনিলা বললে, তাই তো ভাবছি, অসুখ-বিসুখও তো হতে পারে! আমার মনে এখন কেবল ছেলের চিন্তাই হচ্ছে। সে কি করে দিন কাটাচ্ছে, কী খাচ্ছে! কেউ তো এখন আর তাকে দেখবার নেই!

জেলারের সামনে সুশীলাই নিয়ে গেল অনিলাকে।

জেলার সাহেব লোক ভালো। সামনের চেয়ারে বসতে বললে।

বললে—দেখ, ওপর থেকে হুকুম হয়েছে তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে। তোমার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল, কিন্তু তোমার রেকর্ড ভালো বলে তোমাকে আট বছরের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি খুশি তো?

অনিলা মুখে কিছু বললে না, শুধু একটু ম্লান হাসি হেসে তার সম্মতি জানালো।

জেলার সাহেব তার দিকে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললে, এই টাকা নাও, তোমার গাড়িভাড়ার জন্যে। আর এইখানটায় তোমার নামটা সই করে দাও। তুমি নাম-সই করতে পারো তো?

অনিলা বললে, হ্যাঁ—

জেলার সাহেব নিজের কলমটা এগিয়ে দিলে। অনিলা সেটা দিয়ে নিজের নামটা যথাস্থানে সই করে দিলে।

তারপরেই ছুটি। নিজের আগেকার পরা থান ধুতিটা পরে জেলের পোষাক বদলে ফেললে। সুশীলা কোথা থেকে একটা সাবান আর একটু সরষের তেল এনে দিলে।

বললে, এ চেহারা নিয়ে বাড়ি যাবেন না দিদি, মাথায় তেল দিয়ে সাবান মেখে চান করে নিন, তারপরে যান—

অনিলা তাই-ই করলে। তারপর সুশীলা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। অনিলা তখন নিজের ভাবনাতেই অস্থির। তবু বললে, আমি আর মুখে কী বলবো সুশীলা, তুমি এই ক'বছর আমার জন্যে অনেক করেছ, যা করেছ সমস্ত আমার মনে থাকবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো বাড়ি গিয়ে যেন সব ভাল আছে দেখতে পাই—সুশীলা বললে, ভালোই দেখতে পাবেন দিদি। আপনি যেমন ভালো, আপনার কপালও তেমনি ভালো। আপনার কোনও খারাপ হতে পারে না!

হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে বসেছিল অনিলা। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার ভেতরে আরো অনেক লোক। ভীড় খুব। তারা কেউ জানতেও পারছে না যে তাদের মধ্যে একজন খুনী আসামীও চলেছে। গায়ে সাবান দিয়েছে। আসামীর কোন চিহ্ন তার গায়ে লেখা নেই।

ঝক্-ঝক্ শব্দ করতে করতে ট্রেনটা চলেছে। শব্দের তালে-তালে অনিলার পুরোনো কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

হেমন্ত বিশ্বাস সাবধান করে দিয়েছিল যে সে বউমা আর নাতিকে একদিন শিক্ষা দেবে! তাই-ই দিলে হেমন্ত বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত।

কথাটা হঠাৎ একদিন অনিলার কানে গেল। কথাটা ভোলার মা কোথা থেকে শুনে এসেছিল কে জানে। সে এসে হঠাৎ একদিন চুপি-চুপি বললে, শুনেছ মা, কর্তাবাবু নাকি আবার বিয়ে করবে?

কথাটা শুনে অনিলা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে, কোথা থেকে শুনলে তুমি?

ভোলার মা বললে, কোথা থেকে আবার শুনবো, গাঁয়ের সবাই বলাবলি করছে। দিনক্ষণও নাকি ঠিক হয়ে গেছে—

অনিলা বললে, কই, আমি তো শুনিনি কিছু—

সত্যিই প্রথম দিকে অনিলা এ-ব্যাপারে কোনও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই আরো অনেক লোক তাকে এসে ঘটনাটা বলে গেল। বিশেষ করে পাড়ার কিছু মেয়েছেলে।

একজন বুড়ি এসে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউমা, তোমার শ্বশুর নাকি আবার বিয়ে করছে?

অনিলা বললে, কই, আমি তো কিছু শুনিনি দিদিমা—

কথাটা না শুনলেও সেটা যে সত্যিই তা কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল।

হেমন্ত বিশ্বাসকে যেমন রোজ আফিমের ড্যালা আর দুধ দিতে যেতে হয়, তেমনি সেদিনও গিয়েছিল অনিলা।

হেমন্ত বিশ্বাস রোজকার মত আফিমের ড্যালাটা অনিলার হাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর গরম দুধের বাটিটাতে চুমুক দিয়ে খালি বাটিটা অনিলার হাতে দিতেই অনিলা সেখান থেকে রোজকার মত চলে আসছিল। কিন্তু তার আগেই হেমন্ত বিশ্বাস বলে উঠলো—বউমা, যেও না, শোনো—

অনিলা দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে, আমাকে কিছু বলবেন বাবা?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ, বউমা, তোমাকে একটা কথা বলবো, মন দিয়ে শোন—

অনিলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, আসছে বুধবার দিন তোমার একজন নতুন শাশুড়ি আনছি বাড়িতে। তুমি কিছু শুনেছ?

অনিলা স্পষ্ট মিথ্যে কথাই বললে—না।

—কেউ কিচ্ছু বলেনি তোমাকে! গাঁয়ের সবাই জানে, আর তোমার কানে কিনা কেউই তুললে না? আশ্চর্য তো? হ্যাঁ, আমি আবার একবার বিয়ে করছি। ভয় পেও না। খুব ভালো মানুষ, স্বভাব-চরিত্র-বংশ সমস্ত কিছুর খবরই আমি নিয়েছি। কোথাও কোন খুঁত নেই। বাপের পয়সা-কড়ি তেমন নেই। তা না থাক, আমার তো পয়সা-কড়ি আছে। শ্বশুরবাড়ির টাকা নিয়ে কী আমি ধুয়ে খাবো? আমার যা টাকা-কড়ি আছে তাই-ই কে খায় তার ঠিক নেই, পরের যৌতুকের টাকায় আমার দরকার কী?

অনিলা শ্বশুরের কথার ওপর কোনও মন্তব্য করলে না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কই তুমি কিছু বলছো না যে বউমা!

অনিলা বললে, আমি আব কী বলবো বাবা?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তবু তুমি তো কিছু বলবে!

অনিলা বললে, আমার আর কী বলবার থাকতে পারে! আপনি নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, তোমাকে বলছি এই জন্যে শেষকালে তুমি আবার না বলতে পারো যে, তোমাকে না বলেই বিয়ে করেছি!

অনিলা এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না। অনিলা ভেবেছিল শ্বশুরের যা বলবার তা বুঝি বলা শেষ হয়ে গেছে, তাই সে চলে আসছিল। কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস আবার তাকে ডাকলে।

বললে, যেও না বউমা, আবো কথা আছে, শোন—

অনিলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না যে, এই বয়েসে আমি আবার নতুন করে বিয়ে করছি কেন?

অনিলা সেই একই উত্তর দিলে, আমি আর কি বলবো? আপনি যা ভালো বুঝেছেন তাই-ই করছেন!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, তা নয়, তুমিই বলো না আমি কী বিয়ে কবে কিছু অন্যায় করছি? আমার এই কারবার, আমার এত টাকা-কড়ি আমার এই এত বিরাট সম্পত্তি, এসব কার হাতে দিযে যাবো, তুমিই বলো? আমি কার জন্যে এত খেটে মরছি? আমার কী ছেলে আছে একটা?

যে ছেলেটা ছিল তাকে সংসারী করবার জন্যেই তো তোমাকে বউ করে ঘরে এনেছিলুম, তা তুমি তো তা করতে পারলে না। তারপর একটা যে নাতি ছিল, ভেবেছিলুম তার হাতে সবকিছু তুলে দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম নেব, আমি একটু নিশ্চিন্ত হবো, কিন্তু তা তো হলো না। নাতিটাও একটা অপোগণ্ড হয়ে জন্মালো। এখন তাহ'লে আমার নতুন করে বিয়ে করা ছাড়া আর গতি কী?

হেমন্ত বিশ্বাস অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপাতে লাগলো।

অনিলা যখন দেখলে শ্বশুর আর কিছু বললে না তখন আস্তে-আস্তে দুধের খালি বাটিটা নিয়ে বাইরে চলে এল।

বুধবার। অনিলা গুণে দেখলে বুধবার আসতে আর মাত্র পাঁচটা দিন বাকি! পাঁচদিনের মধ্যেই হেমন্ত বিশ্বাস বিয়ে করতে যাবে! বাড়িতে তখন বরযাত্রীদের ভিড় লেগে যাবে!

সত্যিই তাই হলো। হেমন্ত বিশ্বাস বিয়ে করতে যাবে, বুধবার, বৃহস্পতিবার নতুন বউ নিয়ে এ-বাড়িতে আসবে। তারপর শুক্রবার হবে বউভাত। সেইদিন থেকেই অনিলা দেখলে বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। বেশ ঘটা করে বিয়ে হবে। গ্রামের মিঠু মোদক দই-মিষ্টির অর্ডার নিয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস তাকে আগাম দু'শো টাকা দিয়ে দিলে। বাড়ির সামনের উঠোনে সামিয়ানা খাটানো হবে। সেখানে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা খেতে বসবে।

সবই অনিলার কানে গেল।

গ্রামের ছোট-বড় সব সমাজের লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হলো। কোনও কিছু আয়োজনের ত্রুটি নেই। গাদা গাদা বাঁশ এসে জড়ো হলো উঠোনের ওপর। মাছের বরাত গেল জেলে পাড়ায়। পাকা রুই মাছ দিতে হবে। যেন গ্রামের লোক খেয়ে বাহবা দিতে পারে হেমন্ত বিশ্বাসকে। বসন্ত বিশ্বাসের বিয়েতে যে-রকম মাছ দিয়েছিল, সে-রকম নয়। মোট তিন মণ মাছ হলেই চলে যাবে।

তারপর আছে মাংস। পাঁঠার মাংস। তাছাড়া দই, রসগোল্লা, পানতুয়াও করতে হবে। মিঠু মোদকের পুরনো খদ্দের হেমন্ত বিশ্বাস। বসন্তর বিয়েতে সে-ই মিষ্টি বানিয়েছিল। লোকে সে-সময় সে-মিষ্টির খুব তারিফ করেছিল। মিঠু বললে, সন্দেশ করবেন না কর্তামশাই?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বলছো কী তুমি মিঠু? সন্দেশ না হলে বিয়ে হয়? ভালো কাঁচাগোল্লা করতে হবে তোমাকে মিঠু। এমন কাঁচাগোল্লা করবে যেন লোক চেয়ে-চেয়ে খায়। বসন্তর বিয়ের সময় তোমার কাঁচাগোল্লা ভালো হয়নি। এবার কিন্তু ভালো কাঁচাগোল্লা করে দিতে হবে তোমাকে।

মিঠু বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, ছানার দাম কিন্তু আগের চেয়ে চড়া!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা চড়া দামই হোক আর যা-ই হোক, কাঁচাগোল্লা না হলে তো বউভাত হয় না। লোকে বলবে কি? আমার কী টাকার অভাব বলতে চাও?

মিঠু আর কিছু বললে না। আগাম দু'শো টাকার বায়না নিয়ে সে চলে গেল।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শুক্কুরবার সব দই-মিষ্টি আমার বাড়িতে সকালবেলা হাজির করে দেবে, তখন সব টাকা নগদ হাতে পেয়ে যাবে। বুঝলে? তুমি তো জানো আমার কাছে ধারের কোন কারবার নেই।

হেমন্ত বিশ্বাস সোমবার থেকে পাড়ায়-পাড়ায় নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন সেরে এল। বললে, যাওয়া চাই কিন্তু মল্লিকমশাই, কোনও ওজর-আপত্তি শুনবো না।

বামুন পাড়ার মহেন্দ্র চক্রবর্তী মশাই শুধু বললেন, বেশ তো ছিলে হেমন্ত, আবার কেন বিয়েতে জড়িয়ে পড়ছো, এ বিয়েটা কী না করলেই চলছিল না?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, আপনি তো সবই জানেন চক্কোত্তিমশাই, আমার যদি একটা উপযুক্ত ছেলে থাকতো তো তাহ'লে কী আর এই ঝঞ্ঝাট করতাম?

—কেন, তোমার নাতি? সুমন্ত? বরং তার বিয়েটা দিয়ে দাও না!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তার কথা আর বলবেন না চক্কোত্তিমশাই, সে একটা অপোগণ্ডের একশেষ, সে রাত্তিরে রোজ বাড়িতেই আসে না।

—তা তারই না হয় একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে দিলেই ছেলেরা জব্দ!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তাহ'লে কী আর ভাবনা ছিল চক্কোত্তিমশাই? আমি তো বসন্তর বিয়ে দিয়েছিলাম সেইজন্যে, ভেবেছিলাম বিয়ে দিলে ছেলে ঘরমুখো হবে। কিন্তু তারপর যা হলো, তা তো আপনারা সবই জানেন। সেই জন্যেই তো আবার এই ঝামেলা করছি। নইলে কি বিয়ে করতে আমার এত সাধ?

সোমবারটা কাটলো। মঙ্গলবার সারাদিনই নিজের বিয়ের ব্যাপারে মেতে রইল হেমন্ত বিশ্বাস। বিকেলবেলার দিকে হেমন্ত বিশ্বাস যখন বাড়ি ফিরে এল তখন আফিম খাবার সময় পার হয়ে গেছে। আফিম এমনই এক বস্তু যা বরাবর সময় মেনে চলে। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। সময়ের একটু উনিশ-বিশ হলেই মানুষের মেজাজ বিগড়ে দেয়। মঙ্গলবার হেমন্ত বিশ্বাসেরও তাই হয়েছিল।

বাড়িতে এসেই দরজা থেকে ডাকলে, বউমা—

বউমা আফিম নিয়ে তৈরিই ছিল। আর সঙ্গে গরুর দুধ।

অনিলা শ্বশুরের কাছে আফিমের কৌটোটা নিয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস তা থেকে একটি ড্যালা বার করে মুখে পুরে দুধের জন্যে হাত বাড়ালো।

অনিলা দুধের বাটিটা হেমন্ত বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে দিলে। এক চুমুকে দুধটা খেয়ে ফেলে অনিলার দিকে বাটিটা বাড়িয়ে ধরলে।

এ নিয়মটা বরাবরের। হেমন্ত বিশ্বাস এই বিকেলবেলা একবার আফিম খাবে, আর একবার রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে।

দুধটা খাওয়ার পর বললে, বউমা, যেও না শোন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

অনিলা বললে, বলুন কী কাজ?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, গায়ে হলুদের তত্ত্বের ব্যাপারে তোমাকে একটু খাটতে হবে, তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। জিনিসপত্র সব আমার কেনা-কাটা হয়ে গেছে। যারা গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যাবে তারা কাল সকাল দশটার মধ্যেই এসে যাবে, তাদের জন্যে জল-খাবারের ব্যবস্থাটা তোমাকেই করতে হবে। আমার তো আর কেউ নেই। কুড়ি জন লোক খাবে। মিঠু মোদক কাল ভোরবেলা আমার বাড়িতে কচুরী-সিঙাড়া-রসগোল্লা পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে একটু আগে থেকে বলে রাখলাম, যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয়—বুঝলে?

অনিলা বললে, হ্যাঁ—

হেমন্ত বিশ্বাস যেন একটু কৈফিয়তের সুরেই বললে, তোমাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি বউমা, কিন্তু কী করবো বলো, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ যে নেই। তোমার কষ্ট একটু কমবে। তখন আর তোমাকে একলা এত খাটুনি খাটতে হবে না। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—

তারপর আর সেখানে দাঁড়ায়নি অনিলা। সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছিল। কাল শ্বশুরের বিয়ে। খানিকক্ষণ নিজের বিছানাটায় বসে নিজের মনেই একটু ভাবলো। কাল বুধবার। পরশু বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যের মধ্যেই তার নতুন শাশুড়ি বাড়িতে এসে যাবে। গ্রামের লোকজন, মেয়ে-পুরুষ নতুন শাশুড়িকে দেখতে আসবে! তারপর দিন শুক্রবার। শুক্রবার নতুন শাশুড়ির বউভাত লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে বাড়িটা সেদিন। ভাবতে-ভাবতে অনিলার চোখ দু'টো কান্নায় ঝাপসা হয়ে এল। এ-বাড়ির বউ সে, তার মাথার ওপর আর একজন আসবে। তার ওপর কর্তৃত্ব করবে। শ্বশুরের যত জমি-জমা-ক্ষেত-খামার, টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে যাবে সেই শাশুড়ি। তারপর হয়ত একদিন নতুন শাশুড়ির সন্তানও হবে। তারা

একদিন এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তখন সুমন্তকে হয়ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন?

তখন যে তার কী অবস্থা হবে তা ভাবতেই অনিলা শিউরে উঠলো। সে আর অপেক্ষা করলে না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর একেবারে সোজা চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে। সেই ভাঁড়ার ঘরেই হেমন্ত বিশ্বাসের ক্ষেত-খামারের ছোটখাটো জিনিসপত্র থাকে। ধানের বীজ, পাটের বীজ। পোকা মারবার বিষ, ফলিডল। কোদাল, ঝুড়ি, গাঁইতি, ফেলে-দেওয়া বিদেকাঠি, আর তারই পাশে পাটের গোছা। চাষীরা যে-সব ধান-পাট-সরষে-কলাই-মুগ-ছোলা হেমন্ত বিশ্বাসের কাছে বন্ধক রেখে যেত, সেই সব জমানো থাকতো তারই পাশে। ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে ইঁদুর-আরশোলার বাসা। সে-সব অনিলাকেই পরিষ্কার করতে হতো মাঝে মাঝে। সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই অনিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো—ঠাকুর, তুমি আমার অপরাধ নিও না, আমি বড় আতুর, আমায় তুমি ক্ষমা করো—

মঙ্গলবার। মঙ্গলবার রাত্রিতেই ঘটনাটা ঘটলো।

চারদিকের গ্রামের কেউ টের পায়নি আগে। হঠাৎ কান্নার শব্দে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে লোকজন দৌড়ে এসেছে বিশ্বাসবাড়িতে। কী হয়েছে? কী হয়েছে ওদের বাড়িতে?

সবাই এসে দেখলে হেমন্ত বিশ্বাসমশাই নিজের বিছানার ওপর শুয়ে ছটফট করছে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কী হলো বউমা? তোমার শ্বশুর এমন ছটফট করছেন কেন?

অনিলা বললে, কী জানি, আমি তো ওঁকে দুধ খাইয়ে নিজের ঘরে শুতে গিয়েছি, হঠাৎ ওঁর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়ে এসে দেখি এই অবস্থা—

কেউ বলতে পারলে না কী করে এমন সর্বনাশ হঠাৎ হলো। ডাক্তার এল, কবিরাজ এল, কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলে না। কোনও ওষুধ দেবার আগেই বিয়ের আগের দিনই অত টাকার সম্পত্তি, অত ক্ষেত, অত খামার, অত টাকা-পয়সা-গয়না-গাঁটি সব ফেলে রেখে হেমন্ত বিশ্বাস সজ্ঞানে অত সখের অত সাধের সংসার ছেড়ে চলে গেল।

ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে করে নদী পার হতে হয়। চারিদিকে কত লোকজনের ভিড়, কত লোকের কত চীৎকার, গোলমাল। অনিলা স্টীমারের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

স্টীমার থেকে তিন ক্রোশ হেঁটে তবে গ্রামে পৌঁছতে হয়। কিন্তু একটা সাইকেল রিক্‌শা ভাড়া করে অনিলা আবার সেই আট বছর আগেকার ফেলে-আসা কুসুমগঞ্জে গিয়ে পৌঁছল।

রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অনিলা ঠিক বাড়িটার সামনে এসে বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

'—ওরে খোকা, খোকা, ওরে—'

প্রথমে কেউ সাড়া দিলে না।

অনিলা আবার ডাকলে—'খোকা ওরে খোকা—'

এতক্ষণে ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন জবাব দিলে—কে?

অনিলা বললে, সুমন্ত আছে? আমি তার মা, আমি তার মা এসেছি, দরজাটা খুলে দাও—

দরজাটা খুলতেই অনিলা দেখলে একজন বউ, তার মাথায় সিঁদুর।

এ মেয়েটি আবার কে তার বাড়িতে?

অনিলা বললে, তুমি কে?

বউটিও বললে, আপনি কে?

অনিলা বললে, আমি সুমন্তর মা। এত বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। জেল থেকেই সোজা চলে এসেছি এখানে। সুমন্ত কোথায়।

মেয়েটি যেন একটু বিরক্তিকর সুরে বললে, বাড়িতে নেই, কলকাতায় গেছেন।

অনিলা জিজ্ঞেস করলে, তা হলে তুমি? তুমি তার কে হও?

মেয়েটি বললে, আমি তার স্ত্রী।

অনিলা বললে, ও, তুমি আমার খোকার বউ? খোকা বুঝি বিয়ে করেছে? তাহ'লে তুমি তো আমার বউমা। আমি জেলখানায় ছিলুম বলে কিছুই খবর পাইনি বউমা। আমি তোমার শাশুড়ি হই বউমা! ভালোই হলো, আমি বড্ড ক্লান্ত হয়েছি। আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। অনেক দূর থেকে এসেছি। সেই সকাল ন'টার সময় বেরিয়েছি, এখনও পর্যন্ত মুখে এক ফোঁটা জলও দিইনি। দাঁড়াও, আগে বাড়ির ভেতরে ঢুকি, তারপর একটু জল খাবো—

বলে বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতে যাচ্ছিল।

কিন্তু মেয়েটি রাস্তা আটকে দাঁড়ালো। বললে, ভেতরে ঢুকবেন না, যা বলবার ওইখানে দাঁড়িয়েই বলুন -

অনিলা থমকে দাঁড়ালো। বললে, বলছো কী বউমা, আমি যে তোমার শাশুড়ি হই। আমাকে তুমি চিনতে না পারো, কিন্তু তোমার স্বামীকে যে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমাব ছেলে ফিরলে দেখবে ছেলে আমাকে কত ভালোবাসে—

মেয়েটি বললে, তা জানি না, তিনি এখন বাড়ি নেই, আমি যাকে-তাকে অচেনা মানুষকে বাড়ি ঢুকতে দিতে পারি না—তিনি বললে তখন আপনি বাড়ি ঢুকবেন, তার আগে আমি আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারবো না।

অনিলা বললে, তুমি বলছো কী বউমা, আমি উটকো লোক কেউ নই, আমি এ বাড়ির বউ, তোমার স্বামী আমার পেটের ছেলে—

মেয়েটি বললে, ওসব শুনে আমার কোনও লাভ নেই—

অনিলা বললে, কিন্তু তুমি না শুনলে চলবে কেন বউমা? তোমাকে যে শু তেই হবে আমার কথা। তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি তো তা বলে চলে যেতে পারিনা— তুমি আমাকে অপমান করলেও আমি আমার ছেলেকে ছেড়ে দিতে পারবো না—তুমি তো পরের বাড়ি থেকে এসেছ, তাই হয়ত তুমি সব জানো না—

মেয়েটি বললে, না, আমি সব শুনেছি। আপনি আমার দাদা-শ্বশুরকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলেন, তাই আপনার যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছিল। অনিলার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো।

বললে, তুমি আজ আমাকে এই কথা বললে বউমা? তোমাদের সুখের কথা ভেবেই তো করেছিলুম। সেদিন যদি তাঁকে খুন না করতুম তা হলে কী আজ তুমি এই সংসার করতে পারতে? এত সম্পত্তির মালিক হতে পারতে? এত আরামে এই বাড়িতে বাস করতে পারতে?

মেয়েটি বললে, সে-সব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, আমি খুনীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারি না—বলে অনিলার মুখের সামনেই মেয়েটি দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে।

অনিলা আর্তনাদ করে উঠলো—বউমা শোনো, শোনো, একবারটি দরজা খোলো—কিন্তু ততক্ষণে পাড়ার আরো কিছু লোক শব্দ শুনে জড়ো হয়েছে দৃশ্যটা দেখতে। অনিলা তখন সেখানে সেই দরজার সামনে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে মূর্ছা গেছে। তার তখন আর হুঁশ নেই!

যে ভদ্রলোক আমাকে গল্পটা বলছিলেন, তিনি এবার থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি যদি কখনও কাশীতে মা আনন্দময়ীর আশ্রমে যান তো দেখতে পাবেন সেই অনিলা দেবী এখনও বেঁচে আছেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন তিনি জীবনে, ভেবেছিলেন, শ্বশুরের মৃত্যুর পর জেল থেকে বেরিয়ে যে-কটা দিন বাঁচেন, তাতে শান্তিতে পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করবেন। কিন্তু তা বোধহয় বিধাতার বাসনা নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু অনিলা দেবী শ্বশুরকে খুন করলেন কী করে?

ভদ্রলোক বললেন, সেটা আদালতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যখন আদালতে মোকদ্দমাটা উঠেছিল। বুধবার ছিল হেমন্ত বিশ্বাসের বিয়ের তারিখ। আর অনিলা মঙ্গলবার রাত্রেই আফিম খাবার পর শ্বশুরকে যে দুধ খেতে দিয়েছিল, সেই দুধের সঙ্গে 'ফলিডল' মিশিয়ে দিয়েছিল।

নট্‌নী

জয়পুর থেকে প্রায় মাইল চল্লিশের মধ্যে কিষেণগড়। কিষেণগড় নানা কারণে বিখ্যাত। ওখানেই রূপনগর নামে একটা গড় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ওই রূপনগরের কাহিনী নিয়েই তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাস লিখেছিলেন।

সে-সব অন্য প্রসঙ্গ।

অন্য প্রসঙ্গ হলেও এ-গল্পে একটা কথা বলা দরকার। কারণ কিষেণগড়ের ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর সঙ্গে দেখা না হলে এই নট্‌নীদের ব্যাপারটা জানতে পারতাম না।

ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর কিষেণগড়ের বাড়িটা রাজস্থানের সব বাঙালী যাত্রীর একটা চিরস্থায়ী আস্তানা। নিজে ডাক্তার, কিন্তু বাঙলার লোক দেখলে একটা রাতের জন্যে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে, থাকতে হবে, ঘুমাতে হবে।

আজকালকার এই পরশ্রীকাতরতার যুগে, পরস্পরকে ছোট করবার যুগে, ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসু একজন ব্যতিক্রম।

একদিন আমিও ওই পথের যাত্রী হয়েছি। অবসর কিম্বা সুযোগ পেলেই রাজস্থানে বেড়াতে যাবার লোভ আমার দুর্বার।

তাই প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখন আজমীর হয়ে আর এদিকে ফিরিনি। সোজা আবু-পাহাড় হয়ে একেবারে ওখা-পোর্ট আর দ্বারকার দিকে সোজা চলে গিয়েছি।

কিন্তু উনিশশো বাষট্টি সালে যখন গেলাম, তখন জয়পুরেই থাকবো বলে আস্তানা নিয়েছিলাম।

প্রভাত গুহ রায় আমার স্নেহভাজন বন্ধু-প্রতিম। সে জয়পুরের বাসিন্দা। বহু বছর থেকেই সে চিঠি লিখতো—একবার জয়পুরে আসুন। আমি আপনার জন্যে বাড়ি ঠিক করে রাখবো।

সেবার যখন আজমীরে গিয়েছিলাম,তখনও বলেছিল। তারপর বছরের পর বছর চিঠি লিখে চলেছে সে। কিন্তু যাওয়া কি অত সহজ! ঘর ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে কে বেরিয়ে পড়তে পারে বাইরে?

রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে—

'জড়ায়ে আছে বাধা
ছাড়ায়ে যেতে চাই।
ছাড়িতে গেলে বুকে বাজে!'

অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই আবার বলেছেন—

'দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

এই দোটানা নিয়েই তো মানুষের জীবন। এই টানা-পোড়েনের মাকু চালাচ্ছে কোন্ এক অদৃশ্য দেবতা, তারই আকর্ষণ বিকর্ষণে আমরা চলি আর নিজের ক্ষমতার দম্ভে পৃথিবী পদভারে কাঁপিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখাই।

কিন্তু বুঝতে পারি না যে, সেই অদৃশ্য দেবতা আমাদেরই অগোচরে আমাদের দিয়েই নিজের গোপন ইচ্ছাটি কেবল পূর্ণ করে নেয়! আমরা তা দেখতেও পাই না, জানতেও পারি না।

আজমীরের 'বেঙ্গলী সুইটস্'-এর দোকানটা অনেকেই দেখেছেন। সেই দোকানের মিষ্টি অনেকেই খেয়েছেন। সঙ্গে ভাতের হোটেলও আছে।

দোকানের মালিক সদানন্দ ব্যানার্জীকেও নিশ্চয় অনেকে দেখেছেন। সদানন্দ ব্যানার্জীর সঙ্গে কথাও হয়তো বলেছেন অনেকে।

সেই তিনিই সেবার বলেছিলেন—আপনি কিষেণগড়ে যাবেন না?

বললাম—কেন, কিষেণগড়ে কী আছে?

সদানন্দ ব্যানার্জী বলেছিলেন—কেন, কিষেণগড়ে ডাক্তার সত্য বোস আছে—

তা তখন হাতে সময় ছিল না বলে আর কিষেণগড়ের দিকে ফিরে আসিনি। সোজা চলে গিয়েছি মাউন্ট আবুর দিকে।

কিন্তু এবার অন্য প্রোগ্রাম করেছিলাম। জয়পুরে পূজোটা কাটিয়ে তারপর কিষেণগড় হয়ে চিতোর আর উদয়পুরের দিকে যাওয়ার কথা। মাঝখানে পড়ে কিষেণগড়!

আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। যখন গিয়ে পৌঁছুলাম তখন দেখি একেবারে রাজসূয় ব্যাপার। খাট-বিছানা খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম মজুত।

ডাক্তার বললেন—এখানে থেকে যেতে হবে ক'দিন—

তথাস্তু!

তা ছাড়া এতখানি খাতির পেলে ভালো লাগারই কথা। জীবনে ভালোবাসার চেয়ে দামি জিনিস তো দুটি নেই। ওটা অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে পাওয়া যায়।

থেকে গেলাম কিষেণগড়ে। ক'দিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি করলাম। ডাক্তারবাবু কিষেণগড়ের সবেধন-নীলমণি। কুড়ি মাইল—পঁচিশ মাইল দূর দূর গ্রাম থেকে তাঁর কল্ আসে। সঙ্গে আমি থাকি। রাজস্থানের গ্রামের ভেতরটা দেখা হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ বললেন—ওই দেখুন, ওই নট্‌নীদের গ্রাম ---

—নট্‌নী!

কথাটা কেমন নতুন ঠেকলো। নট্‌নী মানে?

ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন। নট্‌নীদের পেশাই হচ্ছে নাচগান। ওদের পয়সা দিলে নাকি আমার-আপনার বাড়িতে নেচে-গেয়ে যাবে। কারো বাড়িতে বিয়ে-সাদি হলে ওরা আসে। নেচে-গেয়ে যায়। খানা খায়। তারপর চাষ-বাস আছে। তারপর যারা তা-ও পাবে না, অর্থাৎ যারা তেমন দেখতে ভাল নয়, তাদের আবার অন্য বৃত্তি আছে।

—কী বৃত্তি?

ডাক্তারবাবু বললেন—শরীর বেচার ব্যবসা।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম!

বললাম—কিন্তু এখানে ওদের খদ্দের কোথায়? এখানে কে ওদের খোরাক জোগাবে?

ডাক্তারবাবু বললেন—ওদের খোরাক জোগাবার লোকের অভাব হয় না কোথাও, সে গ্রামই বলুন আর শহরে বলুন। মানুষের ওল্‌ডেস্ট প্রোফেশান ওইটেই--

তা বটে! রাজস্থানের ছোট ছোট গ্রামের মতই নট্‌নীদের গ্রাম। কোনও তফাত নেই। গ্রামের বাইরে চারদিকে ক্ষেত আর মাঠ। ক্ষেত ভর্তি গম আর জোয়ার। হলদে সবুজ মাঠ। দূরে ধূ-ধূ করছে পাহাড়। আর তারই মধ্যে মধ্যে গ্রাম।

বললাম— ওদেরও তো অসুখ হয়, ওখান থেকেও তো আপনার কল্ আসে--

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন আসবে না, আসে। ওরা বেশ ভালো টাকাই দেয়। ওদের অবস্থাও বেশ ভালো।

—পুরুষমানুষেরা কী করে?

—তারা ঢোলক বাজায়, নট্‌নীদের তদারকি করে। সেখানে নট্‌নীদের মুজরো আসে, ওরা সেখানে ওদের সঙ্গে যায়! গান গায়। তা ছাড়া নানারকম বদমাইস লোক তো আছে। রাজস্থান তো বলতে গেলে ডাকাতদের দেশ। এখানে ডাকাতি অনেকের পেশা। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের যেতে হয়। তা সত্ত্বেও কত খুন-খারাবী হয়ে গেছে, তার ঠিক আছে—

গাড়ি চালাতে চালাতে ডাক্তারবাবু গল্প বলছেন।

একটু থেমে বললেন—এবার যেদিন ও-গ্রামে কল্ আসবে, আপনাকে নিয়ে যাবো, অনেক প্লট পাবেন—

বললাম—প্লটের জন্য নয়, নতুন ধরনের মানুষ দেখতেই আমার ভালো লাগে—

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন, তা যদি বলেন, আমার ডাক্তারখানাতেই তো ওরা আসে—

—কই, আমি তো দেখিনি।

ডাক্তারবাবু বললেন—এবার এলে আমি আপনাকে দেখাবো —

তারপর আবার বললেন—ওই নট্‌নীদের আপনি রাজস্থানের সব জায়গায় দেখতে পাবেন—জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, মেবার, চিতোরগড়। কিন্তু উদয়পুরে কোনো নট্‌নী নেই—

—কেন?

আমি অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

ডাক্তারবাবু বললেন—সে একটা বড় ট্র্যাজিক গল্প আছে। আপনি আগে উদয়পুর থেকে ফিরে আসুন, আপনাকে বলবো—

আমি বললাম—আপনি বলুন না, আমার বড় শুনতে ইচ্ছে করছে—

—না, আগে আপনি ঘুরে আসুন তারপর বলবো—

এরপর উদয়পুর চলে গিয়েছিলাম চিতোরগড় হয়ে। উদয়সাগর দেখতে গিয়ে গাইডরা এসে ছেঁকে ধরলো।

একটু সুবিধে-সুযোগ পেলেই নানা রকম কথা তাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। কোথায় নাথদ্বার, কোথায় বৃন্দাবন-প্রাসাদ। এক-একটা করে সব জেনে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের এখানে নট্‌নী নেই—

গাইড বললে—না হুজুর, উদয়পুরে নট্‌নী নেই—

—কেন, নেই কেন?

—তা জানি না হুজুর। আর সব জায়গায় আছে, আমাদের উদয়পুরে নেই।

শুধু একজনকে নয়, সব গাইডকেই ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে আলাপ করে চা খাইয়ে গল্প করলাম। যদি গল্পের মধ্যে কোনও হদিস পাই। গাইডদের ডেকে এনে নিজের খরচে হোটেলে খাইয়ে-দাইয়েও কোনো সুলুক সন্ধান পেলাম না। সবাইয়েরই ওই এক কথা। উদয়পুরে কেন নট্‌নী নেই, তা কেউ জানে না।

শেষকালে একদিন সবকিছু জেনে এসে আবার ফিরে এলাম কিষেণগড়ে।

ডাক্তারবাবু তখন রোজকার মত ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারি করছেন। ওপাশে কম্পাউণ্ডার নিতাইবাবু ওষুধ তৈরী করছেন এক মনে।

আর ঠিক ডাক্তারবাবুর সামনে একজন ওই-দেশী মহিলা বসে আছেন।
মহিলাকে দেখে আমি সোজা ভেতরের অন্দরমহলের দিকে যাচ্ছিলাম।
ডাক্তারবাবু কাজ করতে করতেই ডাকলেন।
বললেন—বসুন বিমলবাবু, এখানেই বসুন—
অগত্যা সঙ্কোচ ত্যাগ করে পাশের একটা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসলাম।
ততক্ষণে ডাক্তারবাবু মেয়েটিকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।
ডাক্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—মদ খাওয়া একটু কমিয়ে দিতে হবে তোমাকে, বুঝলে?
মেয়েটি হাসলো। রাজস্থানী পোশাক-পরা চেহারা। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। হাসলে আবার গালে টোল্ পড়ে। বাঁ-দিকের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। বয়সের তেজ যেন ঘাগ্‌রা ওড়নার ফাঁক দিয়ে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।
মেয়েটি বললে—না ডাগ্‌তারবাবু, আমি সরাব কমিয়ে দিয়েছি—
ডাক্তারবাবু আবার বললেন—আর রাতে ভালো করে ঘুমোতে হবে—ঘুম কম হচ্ছে—
—না ডাক্তারবাবু আমি তো ঘুমোই। পেট ভরে ঘুমোই। ভোর চারটেয় নিদ্ যাই, আর বেলা বারোটায় উঠি। পুরো আট ঘণ্টা নিদ যাই—
ডাক্তারবাবু বললেন—না, ওরকম ঘুম নয়, রাত দশটায় বিছানায় যেতে হবে, আর ভোর ছ'টায় উঠবে। তোমার শরীরে একদম খুন্ নেই। এই দাওযাই দিচ্ছি, এই দাওয়াই খেলে দরদ-টরদ সব চলে যাবে!
—আর কাশি?
কাশিও চলে যাবে। আমার কথা শুনে চলবে সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনও ভাবনা নেই।
মেয়েটি এবার উঠলো। ওষুধ নিলে কম্পাউণ্ডারের কাছে থেকে। টাকা দিলে গুনে গুনে। তারপর চলে যাবার সময় ওড়নাটা ভালো করে মাথায় ঢেকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে বিদায় নিলে।
রাস্তার বাইরে একটা বয়েল-গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে একটা বুড়ি মতন কে বসেছিল ভেতরে। মেয়েটা লাফাতে লাফাতে গিয়ে তার ওপর উঠে বসলো। ডাক্তারবাবু এবার আমার দিকে ফিরে বললেন—কিছু বুঝলেন?
বললাম—না—
—সে কী, আপনাকে বোঝাবার জন্যেই তো এখানে বসতে বললাম। এই-ই হলো নট্‌নী!
আমি আর একবার নট্‌নীকে ভালো করে দেখবার জন্য রাস্তার দিকে চাইলাম। কিন্তু তখন নট্‌নীকে নিয়ে বয়েল-গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।
ডাক্তারবাবু বললেন আমার পেসেন্ট ওরা। এই কিষেণগড়ে অনেক নট্‌নী আছে। সেবার তো ওদের গ্রাম দেখিয়েছিলাম আপনাকে। তবে এরা শহরের নট্‌নী। তাই এদের অবস্থা একটু ভালো। এদের পেছনে বড় বড় রেইস্ আদমী আছে। তারাই এদের খোরাক জোগায়—
একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—উদয়পুরে গিয়ে কী দেখলেন?
বললাম—টুরিস্ট গাইডে যা যা লেখা আছে তাই-ই দেখলাম—
—আর নট্‌নী?
বললাম—না। অনেক চেষ্টা করেছি দেখতে। অনেক গাইডকে হোটেলে এনে খাইয়েছি, কিন্তু কেউ বলতে পারল না—
ডাক্তারবাবু বললেন—তবে শুনুন—
গল্প আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু এমন সময় কয়েকজন রোগী এসে পড়লো। আর বলা হলো না।
বললেন—রাত্রে খাওয়া-দাওয়া পর।

কিষেণগড় জায়গাটা পুরোনো। সুগার মিল আছে। সিনেমা হাউস আছে। একটা বিজনেস সেণ্টার। জয়পুর আর আজমীরের মধ্যে যাতায়াত করবার পথে একটা বড় শহর। সারারাত লরীগুলো মাল নিয়ে যাতায়াত করে।

একেবারে বাজারের ওপর ডাক্তার সত্যপ্রসন্ন বসুর বাড়ি। উত্তর দিকে আবার একটা বিরাট কটন্ মিলের ফ্যাক্টরি কন্‌স্ট্রাক্‌শন চলছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—এ রাজস্থান আর সেই আগেকার রাজস্থান নেই। তাড়াতাড়ি সব বদলে যাচ্ছে। আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন মাংসের সের ছিল দু'আনা এক আনা। এখন দু'টাকা কিলো।

পুরানো দিনের গল্প চলছিল ডাক্তারখানার বাইরে ইজিচেয়ারে বসে। সামনে দিয়ে এক-একটা লরী যাচ্ছে আর গুম্ গুম্ করে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

তারপর আছে সামনেই রেলওয়ে স্টেশন। কিষেণগড় স্টেশনের প্লাটফরমের ওপরে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিলে হয়তো ডাক্তারবাবুর বাড়িটাও দেখা যায়।

কিন্তু তখন রাত হয়ে গেছে অনেক। তাই শব্দের আর গোলমালের তীক্ষ্ণতা কম। সামনের স্টোভ সারানোর দোকানের মালিক ঝাঁপ বন্ধ করে বিড়ি টানতে টানতে শেষবারের মত নিজের বাড়ি চলে গেল। একটা টাঙ্গাওয়ালা সোয়ারী পায়নি বলে অনেকক্ষণ বাস-স্ট্যাণ্ডেই ঘোরাঘুরি করে শেষকালে ক্লান্ত হয়ে আস্তাবলের দিকে গাড়িখানাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো।

ডাক্তারবাবু গল্প বলতে লাগলেন ডাক্তাখানার সামনে বসে।

আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো উদয়পুর, উদয়সাগর, বৃন্দাবন প্যালেস, স্বরূপ সিং আর এক নট্‌নী।

নাথদোয়ারের মঙ্গল সিং-এর মেয়ে রঙনা।

ডাক্তারবাবু বললেন— সকালবেলা ওই যে মেয়েটাকে দেখালাম, ওর নামও রঙনা—কিন্তু ওরা জানে না—

—এই যে গল্প আপনাকে বলছি। অনেক রেইস্ বাবু আছে ওদের। অনেক মালটিমিলিওনার বাবু। তারা ওদের নিয়ে এখন ফুর্তি করে, ওদের পেছনে টাকা খরচ করে। যার ভাগ্য ভালো তারা বাবুদের কাছ থেকে গাড়ি পায়, বাড়ি পায়। কেউ কেউ বাইরে বেড়াতে যায়। কেউ বা লণ্ডনে, কেউ আমেরিকায়। দুনিয়ার সারা দেশে ওরা যেতে রাজী। কিন্তু উদয়পুরে ওরা যাবে না। যদি উদয়পুরে প্যালেস-হোটেলের এয়ারকন্‌ডিশন্ ঘরেও নিয়ে যাবার লোভ ওদের কেউ দেখায় তবু ওরা উদয়পুরে যাবে না। এমনি ওদের সংস্কার!

তারপর একটু থেমে বললেন—আপনি উদয়পুর থেকেই তো এলেন। কিন্তু সেখানেও দেখে এলেন এ-গল্পটা কেউ জানে না। জানবে কী করে? ওরা কি নট্‌নী দেখেছে আমার মত? তারা কি আমার মত ওদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছে? ওদের বাড়িতে গিয়ে শুয়েছে অনেকেই, ওদের বাড়িতে গিয়ে খেয়েছেও অনেকে। কিন্তু আমার মত চোখ দিয়ে কেউ তো ওদের দেখেনি—

তা সত্যি। ডাক্তারবাবুর চোখ ছিল।

যখন এক-একটা কাহিনী বলতেন, রাজস্থানের এক-একটা ইতিহাস বলতেন, তখন মনে হতো উনি বাঙালী নন, খাস রাজস্থানী।

—ইণ্ডিয়ায় অন্য স্টেটের সঙ্গে এই রাজস্থানের কোনও তুলনা করবেন না আপনি। এই রাজস্থান এখনও একটা মিউজিয়াম হয়ে আছে। হয়তো ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আর এরকম থাকবে না। কিন্তু তবু যেটুকু জানি আপনাদের বলে যাই। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ একে নিয়ে লেখেন। এর মানুষেরা অন্য জাতের থেকে আলাদা। এর মাটিটা পর্যন্ত অন্য রকম। এর খনিতে যা পাওয়া যায়, তা অন্য স্টেটের মাটিতে পাওয়া যায় না—

বলতে বলতে আসল গল্পের খেই হারিয়ে ফেললেন ডাক্তারবাবু।

আমি বললাম—তারপর রঙনার কী হলো?

—রঙনা?

মনে পড়ে গেল যেন এতক্ষণে।

বললেন—হাঁ, রঙনার কথাই বলি। নাথদোয়ারের মঙ্গল সিং-এর মেয়ে। মঙ্গল সিং-ও নাচতো, গাইতো। নাথদোয়ারের মন্দিরে শিবচতুর্দশীর রাত্রে নাচতেই হয়। ওটাই নিয়ম। শিব-চতুর্দশীর রাত্রে উদয়পুরে যত নট্‌নী আছে সকলকে নাচতে হবে। ওরা ছোটবেলা থেকেই নাচতে শেখে। নাচই ওদের নেশা, নাচই পেশা।

আর নাচ কি এক-রকমের?

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন দেখেছি ওসব। এই কিষেণগড়ে প্রথমে সুগার-মিলে ডাক্তারের চাকরি নিয়ে আসি। ডাক্তার মানুষ বলে আমাকে বেশ খাতির করতো সবাই। নট্‌নীরাও খাতির করতো। শিবপূজোর প্রসাদ পাঠিয়ে দিত বাড়িতে। ওদের বাড়িতে যা-কিছু উৎসব হলে যাওয়া আমার চাই-ই চাই। নইলে ওরা রাগ করতো।

আর সে কি নাচ, আপনাকে কি বলবো। রাজপুতের লাঠি দেখেছেন তো। ওই লাঠি একজন উঁচু করে ধরতো, আর তারই ডগার ওপর একজন নট্‌নী ব্যালেন্স রেখে নাচতো। ঘুরে ঘুরে নাচ।

আমি গল্প শুনছিলাম।

বললাম—পড়ে যেত না?

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি কখনো পড়ে যেতে দেখিনি। তবে শুনেছি নাকি দু একবার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমার ডাক্তারখানায় তাকে নিয়ে এসেছে। তারপর হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মলম লাগিয়ে তাদের সারিয়ে তুলিয়েছি। ওরা আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ওরাই আমাকে এই গল্পটা বলেছে—রঙনার গল্পটা এই ওদের সকলের মুখে মুখে—

রাণা স্বরূপ সিং-এর আমল তখন। এই রাজস্থানের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে স্বরূপ সিং-এর নামও যেমন, প্রতিপত্তিও তেমনি।

রঙনার তখন বেশ বয়েস হয়েছে। পাড়ার অন্য মেয়েরা তাকে দেখে হিংসে করে।

বলে-বে-সরম--

বে-সরম বললো তো বললো। তাতে রঙনার বয়েই গেল। তোমার তো আমি খাইও না, পড়িও না। তুমি আমার মত নাচো, তোমারও খাতির হবে, তোমারও পয়সা হবে। ইণ্ডিয়ার সব জায়গা থেকে তখন তীর্থযাত্রীরা আসে নাথদোয়ারে পূজো দিতে। তখন এখনকার মত ট্রেনও ছিল না, প্লেন তো দূরের কথা। সেই তীর্থযাত্রীরা এসে পাণ্ডাদের বাড়িতে উঠতো, মন্দিরে পূজো দিত। কিন্তু রঙনাকে নজরে পড়ে গেলেই জিজ্ঞেস করতো—ও কে? কাদের মেয়ে?

পাণ্ডারা বলতো ও রঙনা, নট্‌নীর মেয়ে নট্‌নী —

—নট্‌নী কী?

পাণ্ডারা বলতো যারা নাচা গানা করে, তাদেরই নটনী বলে হুজুর!

—কী রকম নাচা-গানা করে?

—খুব ভালো হুজুর।

—ওর নাচ দেখাতে পারেন?

—খুব পারি হুজুর। নাচা-গানাই তো ওর পেশা।

—তাহলে লাগান একদিন, নাচ দেখি।

তা তার ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হয় না। হয়তো সিন্ধ থেকে বড় শেঠজী এসেছে। অনেক টাকার মালিক। সঙ্গে টাকার পাহাড় এনেছে। টাকা খরচ করবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কত টাকা নেবে নাও, কিন্তু সবচেয়ে যা ভালো নাচ আছে তাই দেখাতে হবে।

হুজুর ওরা লাঠির ওপর নাচতে পারে, দড়ির ওপরও নাচতে পারে।

—দড়ির ওপর কী-রকম নাচ?

—দু'টো লম্বা লাঠির ওপর মাথায়-মাথায় দড়ি বাঁধা, তার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে হেঁটে যাবে।

—তা তাই-ই দেখবো। লাগাও নাচ।

নাথদোয়ারের নট্‌নীপাড়া থেকে দলবল এসে হাজির হয় পাণ্ডাদের বাড়ির সামনের উঠোনে। ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌ করে ঢোল বাজাতে শুরু হয়, আর শুরু হয় নাচ। রঙনা নতুন নট্‌নী। আর সব নট্‌নীকে সে নেচে কুপোকাৎ করে দেয়। জোয়ান মেয়ে। যেমন গড়ন তার, তেমনি তেজ। অন্য নট্‌নীরা তার সঙ্গে পারবে কেন?

শেঠজী বলে—কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ—

আসর খতম হলে নট্‌নীরা এসে শেঠজীর সামনে মাথা নিচু করে সেলাম করে। মাথার বেণীটা ঝুলে পড়ে সামনের দিকে।

শেঠজী এক মুঠো মোহর সামনে এগিয়ে দেয়।

বলে—তোমার নাম কী নট্‌নী?

পাশ থেকে রঙনার বাপ বলে—রঙনা—

রঙনা! বেশ নামটা। শেঠজী মনে মনে উচ্চারণ করে। তারপর রঙনার গড়নটার দিকে চেয়ে দেখে। বোধহয় ভেতরে ভেতরে লোভ হয়। তারপর যখন অনেক পরে সবাই চলে যায়, পাণ্ডাজীকে আড়ালে ডেকে বলে—পাণ্ডাজী। নট্‌নীর বাড়ি কোথায়?

পাণ্ডাজী বলে—হুজুর, ওদের মহল্লা আছে নাথাদোয়ারে, সেই মল্লায় থাকে—

—এখানে ডাকলে আসবে না?

পাণ্ডা বলে—কেন আসবে না হুজুর, ওদের তো ও-ই পেশা। হুজুর যতবার ডাকবেন ততবার আসবে। দলবল নিয়ে এসে গেয়ে যাবে, নেচে যাবে।

শেঠজী বলে—না, সে-রকম নয়। দলবল নিয়ে নয়। একলা লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে বললে আসবে?

পাণ্ডা বুঝতে পারে।

বুঝতে পেরে চমকে ওঠে।

বলে—না হুজুর, ওরা বড় জাদরেল জাত। রাজপুতদের সঙ্গে ওই নট্‌নীদের মেলে না। ওরা যেমন নাচতে গাইতে পারে তেমনি আবার ছোরা চালাতে পারে। নট্‌নীদের দিকে কেউ নজর দিলে ওরা তার জান্ নিতে কসুর করবে না—

শেঠজী সিন্ধী মানুষ। অগাধ টাকার মালিক। টাকা আছে বটে কিন্তু তা বলে প্রাণের ভয় কিছু কম নেই। ঠাকুর-দেবতা দেখে পূজোটুজো সেরে দেশের ছেলে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে দেশে ফিরে যায়।

এই রকম করে নট্‌নীদের খবর দেশ থেকে বিদেশে জড়িয়ে পড়ে। সিন্ধ থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে ত্রৈলঙ্গ দেশেও খবরটা চালাচালি করে।

সব জায়গার লোক বলে—নট্‌নী দেখেছিস? নট্‌নী?

কেউ কেউ বলে—না।

—যা, তাহলে রাজস্থানে যা, গিয়ে দেখে আয়। আর নট্‌নীর সেরা নট্‌নী নাথদোরের রঙনা।

তারপর থেকে যেই বর্ষাকালটা কাটলো আর দলে দলে তীর্থযাত্রী আসতে লাগলো উদয়পুরের নাথদোয়ারে। শেঠদের কল্যাণে নাথদোয়ারের ঠাকুরের গায়ে সোনার গহনা উঠলো। নাথদোয়ারের সেবাইতদের সিন্দুকে মোহরের পাহাড় জমে উঠলো। বড় বড় সোনার ঘডার ভেতর সোনার মোহর জমে উপছে পড়তে লাগলো।

আসলে কিন্তু ঠাকুব দেবতা সব বাজে কথা। আসল টান হলো ওই নট্‌নীর। রঙনার জন্যেই নাথদোয়ারে এত লোক আসে। রঙনার জন্যেই এত ভিড় হয় নাথদোয়ারে।

রঙনাই যেন নাথদোয়ারের ঠাকুর!

কিন্তু খবরদার, খুব সাবধান। ওদিকে নজর দিয়ো না তোমরা। নট্‌নীরা বড় সর্বনেশে মানুষ। ওরা গান গাইতে নাচতেও যেমন, আবার তোমাকে খুন করে ফেলতেও তেমনি।

মহেশ্বরপ্রসাদ এককালে গরিব ছিল। মহেশ্বরপ্রসাদের মার যখন বয়েস কম ছিল তখন তাব নাচের সঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোল বাজিয়েছে। মা নেচেছে আর বাপ ঢোল বাজিয়েছে। আর যখনই অবসর পেয়েছে তখনই নট্‌নীপাড়ার মেয়েদের নাচ শিখিয়েছে। নট্‌নীদের নাচ বড় জবর নাচ। যে-সে শিখতে পারে না। মেয়ে যখন জন্মাল তখন বুড়োরা এসে তার মুখ দেখে না, পা দেখে। হাত দিয়ে পায়ের গডন পরীক্ষা করে। ছোটবেলা থেকে সেই পায়ের যত্ন হয়। ওদের জুতো পরিয়ে দেয়। চামারদের কাছ থেকে পায়ের মাপ দিয়ে সে জুতো তারা করিয়ে আনে। তারপর আছে মালিশ। কী-সব একরকম। গাছ-গাছড়া আছে, তারই রস গরম করে পায়ে মালিশ করা হয় রোজ।

বললাম—কী গাছের রস?

ডাক্তারবাবু বললেন—সে-গাছের নাম ওরা কাউকে বলে না। ওবা ওদের নিজেদের বিদ্যে কাউকেই শেখায় না।

—তা তারপব?

—তারপর যখন দু'বছর বয়েস হবে মেয়ের, তখন খুব ঘটা করে উৎসব হবে। মানে আমাদের যেমন লেখাপড়াব হাতে-খড়ি হয়, ওদেরও তেমনি। আমাদের মধ্যে যেমন বামুনদের পৈতে হয়, ঠিক সেই রকম আর-কি! তারপর মহেশ্বপ্রসাদ সেই মেয়েকে নিয়ে পডবে।

মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলে বোল্ তুলবে—

তা ধিন্ ধিন্ তাক্—
তাক্ ধিন্ ধিন্ তা
ত্রেকেটে তাক্ ত্রেকেটে তাক্
ধিন তাক্ ধিন্ তাক্
ধিনী ত্রেকেটে তাক্...

ঢোল বাজায় মহেশ্বরপ্রসাদ আর জোরে মুখে মুখে বোল্ বলে। দরকার হলে নেচেও দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু নট্‌নী সেই তালে তালে নাচে।

দু'বছরের মেয়ে রঙনা সেই তখন থেকেই ওস্তাদ। একবার একটা বোল্ তুলে দিলে আর ভোলে না।

মহেশ্বরপ্রসাদ নিজেই রঙনার কেরামতি দেখে অবাক হয়ে যায়।

বলে—কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ—

সেই মেয়ে বড় হলো। বড় যত্নে বড় হলো রঙনা। মহেশ্বরপ্রসাদ নট্‌নীপাড়ায় নামকরা বাজিয়ে। গান শিখিয়ে, নাচ শিখিয়ে বুড়ো হয়ে গেছে তখন। পাড়ার দশজন ভয়ভক্তি করে। মানে।

বলে—গুরুজীর নসীবটা ভালো। মেয়ে গুরুজীর সুখ আনবে—

তা সুখই হলো শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরপ্রসাদের। নাথদোয়ারে সবাই রঙনার নাম করে। নাথদোয়ার ছাড়িয়ে উদয়পুরেও নাম ছড়িয়ে গেল। শেষকালে উদয়পুর থেকে যোধপব, বিকানীর, জয়পুর, কিষেণগড়, সব জায়গাতেই রঙনার নাম।

—কে রঙনা?

—ওরে, রঙনা সেই গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদের মেয়ে।

মেয়ের সঙ্গে বাপের নামও ছড়িয়ে গেল রাজস্থানে। রাজস্থান থেকে বাংলা মুলুকে। বাংলা মুলুক থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ দাক্ষিণাত্য। আর যেখানেই তীর্থ করতে যাও, রাজস্থানের পুষ্কর দেখতে যেতেই হবে। আর পুষ্কব দেখলে নাথদোয়ার আর কতদূর। নাথদোয়ারে গিয়ে শিবের প্রসাদ পেতেই হবে। শিব তো সকলেরই দেবতা। নামেরই যা ফারাক। কেউ ডাকে ভোলা মহেশ্বর বলে। কেউ ডাকে ত্রিলোকনাথ বলে। আবার কেউ ডাকে একলিঙ্গশ্বব বলে। আসলে সবই এক, একই সব।

ডাক্তারবাবু বললেন- একদিন স্বরূপ সিং-এর কাছে খবরটা গেল।

স্বরূপ সিং হলো উদয়পুরেশ্বর। শিব যেমন ভুবনেশ্বর, স্বরূপ সিং তেমনি উদয়পুরেশ্বর। বড় খেয়ালী রাজা।

তখন বৃন্দাবন-প্রসাদ তৈরী হয়ে গেছে। চারদিকে উদয়-সাগর। উদয়-সাগরের জল একবার যদি খাও তো তোমার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত উদয়সাগর ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়েও আছে, জড়িয়েও আছে। বড় বড় পাহাড়ের ওপর উদয়পুরের কেল্লা, সেখানে উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। তখন উদয়-সাগরের হাওয়া তোমার দেহ-মন জুড়িয়ে দেবে।

সেই উদয়-সাগরের ভেতরে বৃন্দাবন-প্রসাদ। বড় যত্ন করে সে প্রাসাদ সাজিয়েছেন বিরূপ সিং। সেইখানে বসে স্বরূপ সিং। সেইখানে বসে স্বরূপ সিং বড় বড় ওস্তাদের গান শোনেন। জলের স্রোতের ওপর গানের সুর ভেসে গিয়ে দূরের পাহাড়ের গায় আছাড় [illegible]।

গান শুনতে শুনতে স্বরূপ সিং বলেন—কেয়া বাৎ—কেয়া বাৎ—

শুধু স্বরূপ সিং একলা নয়। সঙ্গে মন্ত্রী থাকে, মো সায়েব থাকে, পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ সবাই তালে তাল দেয়। তারাও সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে—কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ—

রাণা স্বরূপ সিং যদি গান শুনে ভাল বলে তো আশেপাশের পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী পরিষদ সবাইকে তা ভালো বলতে হবে। রাণার যদি কোনও দিন গান শুনতে ভালো না লাগে তো কারোই শুনতে ভালো লাগবে না!

রাণা স্বরূপ সিং যদি বলেন—আজ দিনটা ভালো নয় জগমন্ত সিং—

জগমন্ত্ সিং খাস মন্ত্রী। তিনিও বলবেন—না মহারাণা, আজকে দিনটা ভালো নয়—

একবার বাইরে থেকে এক ভাট এসেছিল! নাম—ভাট তিলকচাঁদ। ভাট আগে অনেক এসেছে উদয়পুরে। রাণার নিজস্ব মাইনে-করা ভাটও আছে। [illegible]ন্তু অনেকে বললে—এ ভাটটা নাকি ভালো গান করে—

রাণা বললেন—জগমন্ত্ সিং যদি বলে এ ভালো ভাট, তাহলে আসুক, গান গাক্—

জগমন্ত্ সিং আসতেই স্বরূপ সিং জিজ্ঞেস করলেন—নতুন ভাট কেমন গান গায় জগমন্ত্ সিং?

জগমন্ত্ সিং বললে—খুব ভালো মহারাণা, বড় ভালো গান গাইছে আজকাল— রাণা বললেন—তাহলে আনো তাকে—

যে লোক ভাটকে আনতে গেল সে বললে—এখন আমার সময় নেই, আগে যোধপুরের রাণাকে গান শুনিয়ে আসবো, তারপর উদয়পুরের রাণাকে গান শোনাবো।

যে লোক ডাকতে গিয়েছিল সে বললে কেন? যোধপুরের রাণা কি উদয়পুরের রাণার চেয়ে বড় যে তার কাছে আগে যাবে?

ভাট বললে—আজ্ঞে হুজুর, যোধপুরের রাণার কাছে যে আগে বায়না নিয়েছি—

খবরটা স্বরূপ সিং-এর কাছে পৌঁছুতেই একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। কী, এত বড় সাহস ভাটের। ডাকো ভাটকে এখানে। উদয়পুরের চেয়ে যোধপুর বড় হলো?

তখুনি জগমন্ত্ সিং-এর কাছে তলব গেল।

মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং স্বরূপ সিং-এর মেজাজ চিনতো। বুঝতে পারলে ভাটের এবার সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। ভাটের যোধপুর যাওয়া ঘুচে গেল চিরকালের মত।

স্বরূপ সিং-এর কাছে আসতেই জগমন্ত্ সিং-এর ওপর হুকুম হলো—ডাকো ভাটকে এখানে। এনে বাঘের মুখে ফেলে দাও—

তা তাই-ই হলো।

কেউ জানলো না কেন ভাট তিলকচাঁদ যোদপুরে যেতে পারলে না। কেউ বুঝতে পারলে না ভাট তিলকচাঁদের গান আর কেউ শুনতে পায় না কেন?

ভাট তিলকচাঁদের নাম রাজস্থানের ইতিহাস থেকে মুছে দিলেন মহাবাণা স্বরূপ সিং।

মহারাণা স্বরূপ সিং এমনি মানুষ।

যারা নাথদোয়ারে থাকে তারা মহারাণার এসব কাহিনী শুনেছে। শুনেছে উদয়পুরের মহারাণা খাম-খেয়ালী লোক। শুনেছে মহারাণা যার ওপর সদয় হবেন, তাকে হয়তো একেবারে জায়গীর দিয়ে দেবে। কিন্তু যার ওপর রাগ হবে, তার চরম সর্বনাশ করে তবে তাকে ছাড়বেন।

নট্‌নীরা অনেকবার গেছে স্বরূপ সিং-এর দরবারে। স্বরূপ সিং বড় দিলদার লোক। বড় দরদী লোক। বড় জহুরী। গুণীর গুণের কদর আছে স্বরূপ সিং-এর কাছে। নট্‌নীরা গিয়ে নাচে গায় আর মোটা ইনাম নিয়ে আসে।

আহেরিয়ার দিন দরবারে মজলিস বসে।

স্বরূপ সিং-এর দরবারে আহেরিয়ার দিন শুধ নট্‌নীরা আসে না। আসে শেঠজীরা। উদয়পুরের বড় বড় শেঠজী সব। লাখ লাখ টাকার কারবার তাদের। তারা এদেশ থেকে ওদেশে মাল চালান দেয়। মালের মহাজনও বটে তারা। ওদিকে বাংলাদেশ ওদিকে দাক্ষিণাত্য, আবার ওদিকে মহারাষ্ট্র গুজরাট। তাদের কারবারের জাল গোটানো সারা হিন্দুস্থানে। মাল চালানি আমদানি রপ্তানি চলে। তারাও বহু টাকার মালিক। তাদেরও হাজার-হাজার লোক আছে খেদমদ্ করবার জন্যে।

কিন্তু স্বরূপ সিং-এর সামনে এসে সবাই জুজু।

সেই পাহাড়ের নিচু থেকে ওপরে প্যালেসে ওঠবাব সময় পায়ের জুতো-জোড়া হাতে তুলে নেয়. স্বরূপ সিংএর সামনে জুতো পরাই নিষিদ্ধ। জুতো যদি কেউ পরতে চায় তো নিচেয় পরুক, ওই যেখানে তালাও আছে, যেখানে চাষীরা ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, যেখানে বাজারে আনাজ-তরকারি বিক্রি হয়, ওখানে জুতো পরে মশ-মশ করে হাঁটুক। কিন্তু এখানে নয়। এই পাহাড়ের তলা থেকে, যেখান থেকে এই প্যালেসটা উঠেছে, ওইখান থেকে জুতো খুলে হাতে করে এসো। এসে আমার সামনে নিচু হয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াও। তারপর আমি বসতে বললে বসবে, কথা বলতে বললে কথা বলবে।

তারপর তুমি বসবে আর আমি হাসলে হাসবে, আমি গম্ভীর হলে গম্ভীর হবে।

কিন্তু রাগ?

রাগের কথা শুনবে?

সে রাগের ঘটনাও জানে। স্বরূপ সিং একদিন সন্ধেবেলা শিবপূজো সেরে সিঁড়ি দিয়ে দরবারের দিকে আসছেন। হঠাৎ কানে গেল গানা-বাজনার শব্দ!

কোথায় গানা-বাজা হচ্ছে?

ডাকলেন জগমন্তকে। কে গান গাইছে জগমন্ত্ সিং।

মুশকিলে পড়লো জগমন্ত্ সিং। কান পেতে শুনতে লাগলো। তাই তো! কার এত বুকের পাটা। স্বরূপ সিং-এর অনুমতি না নিয়ে গানা-বাজনা করে কী করে লোকে! এ তো কানুন নয়। এ তো বে-কানুন!

জগমন্ত্ সিং খবর আনতে পাঠালে শহরের মহল্লা থেকে।

বাজারের সামনে শেঠজীদের মহল্লা। শেঠজীরা চারদিক থেকে টাকা আমদানি করে আনে। কেউ কারবার করে দিল্লির বাজারে, কেউ করে কলকাতার বড়বাজারে। চারদিকের কারবারের টাকা এসে জমা হয় উদয়পুরের শেঠজীদের পাড়ায়। শেঠজীরা টাকা এনে মাটির তলায় পুঁতে রাখে। খরচ করতে হলে লুকিয়ে লুকিয়ে খরচ করতে হয়। জানতে পারলেই বিপদ। একবার যদি স্বরূপ সিং-এর কানে ওঠে ওমুক শেঠজীর টাকা হয়েছে তো আর রক্ষে নেই। তখন জগমন্ত্ সিং-এর ওপর হুকুম হবে মাথট্ আদায়ের। একটা কোনও ছুতো-নাতায় টাকা দিতে হবে দরবারে। মহারাণার মেয়ের সাদি হোক আর নাতির অন্নপ্রাশনেই হোক, হাজার হাজার টাকা ঢেলে এনে দিতে হবে রাণার পায়ের ওপর।

সেদিন শেঠজীদের পাড়ায় গড় মজলিস বসেছিল।

মজলিস বলতে এমন কিছু নয়। নাচগান-বাজনা। নট্‌নীর দল এসেছে নাথদোয়ার থেকে। তাদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদের সঙ্গে নট্‌নীর দল এসে নাচ-গানা বাজা করছে। আর শেঠজীর আত্মীয়-কুটুমরা এসে জুটেছে আসরে।

ওদিকে রান্না-খাওয়ার আয়োজন হচ্ছে ভেতরে।

উপলক্ষটা সামান্য। একটা কারবার নতুন করে ফাঁদতে যাচ্ছে শেঠজী। তারই মূহুরৎ-উৎসব। আসলে অনেক টাকা জমে গেছে ভাঁড়ারে। সেগুলো খরচ করার দরকার।

এক-একজন করে নট্‌নীরা নাচছে, আর তাদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদ তদারকি করছে। ভুল হলেই ধমক খেতে হবে গুরুজীর কাছে। হঠাৎ কানাকানি ফিস্-ফিস্ শুরু হয়ে গেল। শেঠজীদের মধ্যে যেন গুনগুন করে কথাবার্তা চলছে। দু'একজন গান শুনতে শুনতে বাইরে উঠে গেল। এমন তো হয় না।

মহেশ্বরপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে গেল। মহেশ্বরপ্রসাদ নিজে তালিম দিয়ে নাচ শিখিয়েছে নট্‌নীদের। তাদের নাচ দেখতে দেখতে কেউ আসর ছেড়ে উঠে গেলে তার বড় খারাপ লাগে। নিজেরই অপমান মনে হয়।

মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলচিকে আরো জোরে বাজাতে বললে।

তারপর রঙনার দিকে চেয়ে দেখলো। রঙনা তখন নিজের খেয়ালেই নাচছে। একবার বুকটা চিৎ করে দিচ্ছে, একবার ঘুরে ঘুরে কাত হয়ে সকলকে সেলাম করছে। তারপর সেই রকম কাত হয়ে একটা পা বাড়িয়ে দিলে উল্টোদিকে।

এই জায়গাটায় বরাবর আসরের সমঝদার গুণী লোকেরা 'তওবা', 'তওবা' বলে তারিফ করে। এই জায়গাটাতেই শেঠজীরা সাধারণত ইনাম দেয়।

রঙনাও নাচতে নাচতে একটু অবাক হয়ে গেল। এত মন দিয়ে নাচছে সে অথচ কই, কেউ তা তারিফ করছে না অন্য দিনের মত।

গুরুজীর দিকে একবার চাইলে রঙনা।

মহেশ্বরপ্রসাদ বুঝলো ব্যাপারটা।

রঙনাকে তাতিয়ে দেবার জন্যে তারিফ করে উঠলো—বহোত্ আচ্ছা নট্নী—বহোত্ আচ্ছা—

তারিফ করলে বটে মহেশ্বরপ্রসাদ, কিন্তু তেমন যেন মনের জোর পেলে না।

হঠাৎ আসরের দিকে নজর পড়তেই দেখলে শেঠজীরা কেউ নেই।

কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে শুধু বসে আছে।

মহেশ্বরপ্রসাদ উঠলো।

কিন্তু রঙনা তখনও নাচছে। তার কোনও দিকে খেয়াল নেই। গুরুজী তাকে শিখিয়েছে—যখন নাচবে সে, তখন কোনদিক নজর দেয় না যেন। তার চোখের সামনে তখন আর কেউ নেই, কিছু নেই। গুরুজীর মুখটাই তখন শুধু মনে পড়ছে তার। আর মনে পড়ছে নাথদোয়ারের ঠাকুব একলিঙ্গনাথের কথা। মনে মনে প্রণাম করছে সে ঠাকুরকে, গুরুজীকে। হে একলিঙ্গনাথ, হে গুরুজী, আমাকে সাহস দাও, তাকত্-দাও, ভক্তি দাও—

শেঠজীর বাড়ির ভেতরে তুমুল কাণ্ড চলেছে।

মহেশ্বরপ্রসাদকে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে হুজুর? নট্নীর কী কসুর হলো?

কেউ মহেশ্বরপ্রসাদকে কথার জবাবই দেয় না।

—কী হলো হুজুর?

শেঠজীরা তখন এদিক থেকে ওদিক ছোটাছুটি করছে। বাড়িময় হৈ চৈ চলেছে। মহেশ্বরপ্রসাদ তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ কে যেন আসরের মধ্যে এসে চিৎকার করে উঠলো— নিকাল্ যাও সব, নিকাল্ যাও—

রঙনা তখনও নাচছে।

মহেশ্বরপ্রসাদ এক ধমক দিয়ে উঠলো —হুঁশিয়ার—

লোকটা বললে—আর দেরি করো না গুরুজী, এক্খুনি ভাগো এখান থেকে—

—কেন? কী কসুর হলো?

—তোমার কসুর কিছু হয়নি। কসুর হয়েছে আমাদের।

—কী কসুর?

কসুর যে কী তা বলতে গেলে অনেক সময় লাগে। অত সময় কোথায়। সে সময়ও কেউ দিলে না। কথাটা বলেই লোকটা অন্য ধান্ধায় দৌড়ালো।

মহেশ্বরপ্রসাদের মনে আছে সেদিনকার সেই কাণ্ড। সেই তখনই সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল দলবল নিয়ে। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। যখন মহেশ্বরপ্রসাদ নট্নীদের দল নিয়ে মহল্লা পেরিয়ে অনেক দূরে পালিয়ে গেছে তখন শেঠজীর বাড়ীটা গুঁড়িয়ে একেবারে ধুলো হয়ে গেছে।

সত্যিই স্বরূপ সিং-এর সেদিন বড় রাগ হয়েছিল।

জগমন্ত্ সিং খবরটা নিয়ে এসেই সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছে মহারাণা স্বরূপ সিংকে। স্বরূপ সিং দরবারে এসে বসলেন।

জগমন্ত্ সিংও পেছনে পেছনে এলো। স্বরূপ সিং জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? কোন্ শেঠজীর কোঠিতে গানা-বাজনা হচ্ছে?

জগমন্ত্ সিং বললে—বাজার-মহল্লাতে শেঠ ঝুমুটমল আছে, তারই কোঠিতে।

—কে শেঠ ঝুমুটমল?

—হুজুর, ওই যে যে-শেঠ গুজরাটে বাদাম-দানার কারবার করে, সেই শেঠ—

—তা হঠাৎ নাচা-গানা-বাজা লাগিয়েছে কেন?

জগমন্ত্ সিং বললে--হুজুর, কাফি নাফা হয়েছে, অনেক টাকা কামিয়েছে, তাই কিছু নাচা-গানা বাজাতে ওড়াচ্ছে—

—তা গান-বাজনা যে করছে তার জন্য রাজ-দরবার থেকে পাঞ্জা নিয়েছে?

—না হুজুর!

—তবে ওকে ফাঁসাও।

হুকুম হয়ে গেল মহারাণা স্বরূপ সিং-এর। ফাঁসাও বললেই ফাঁসাও। এ আর আপীল নেই, মাফি নেই। একে শেঠ ঝুমুটমল বিদেশে গেছে, তার ওপর বিদেশে গিয়ে বাদামদানার কারবার করেছে। বাদাম-দানার কারবার করে কাফি নাফা হয়েছে। তারপর সেই নাফার টাকা নিজের খুশিমত গানা-বাজায় ওড়াচ্ছে। তারপর সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছে এই যে, সে গান বাজনা করবার পাঞ্জা পর্যন্ত নেয়নি দরবার থেকে।

হুকুম মিলে গেছে।

সুতরাং আর কারো তোয়াক্কা নেই।

সেই রাজ-হাভেলির ওপরে পাহাড়র চূড়ো থেকেই কামান দাগা হলো। এমন করে টিপ করা হলো, যাতে কামানের গোলা গিয়ে পড়ে ঠিক শেঠ-ঝুমুটমলের কোঠির ওপর।

আর পড়লোও তাই।

আর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শেঠ ঝুমুটমলের কোঠিতে আগুন ধরে গেল। আশেপাশের বাড়িরও ক্ষতি হলো। একটু আগেই গান-বাজনা আনন্দ উৎসবের হিড়িক পড়েছিল, সেখান থেকেই আবার কান্নার রোল উঠলো। উদয়পুরের শেঠবাজার-মহল্লায় আগুন ধবে গেল এক দণ্ডে। বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে পালালো মহল্লার লোকজন।

আর স্বরূপ সিং তাঁর উঁচু পাহাড়ের ওপরের ঘর থেকে বসে বসে মজা দেখতে লাগলেন।

বুঝুক মজাটা। দরবার থেকে পাঞ্জা না নিয়ে গান-বাজনা করে পরকে টাকা দেখানোর মজাটা বুঝুক শেঠ ঝুমুটমল। স্বরূপ সিং যে এখনও মরেনি, স্বরূপ সিং যে এখনও বেঁচে আছে, এ-খবরটা মাঝে মাঝে সকলকে জানানো দরকার। নইলে রাণাকে মানবে কেন উদয়পুরের লোক?

জগমন্ত্ সিংও খুশি। হাঁ, জব্দ বটে শেঠ ঝুমুটমল! ঝুমুটমলের নয়া কোঠি হয়েছিল, নয়া বিবি হয়েছিল। ঝমটমল টাকাও কামাচ্ছিল খুব, নাথদোয়ারের থেকে নট্নীদের গুরুজী মহেশ্বরপ্রসাদকে এনে গান-বাজা-নাচা লাগিয়েছিল।

কিন্তু জগমন্ত্ সিং জানতেও পারলে না তাব আগেই খবরটা পৌছে গিয়েছিল ঝুমুটমলের বাড়িতে। খবর পেযেই লোকজন সরে গিযেছিল।

মহেশ্বরপ্রসাদ যখন বাজার-মহল্লা পেরিয়ে বড় তলাওটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই কামানের গোলাটা এসে পড়লো শেঠজীর কোঠির মাথায়। আর চারদিকে ধোঁয়ার পাহাড় উঠলো। উঠে উদয়পুরের আসমান ঢেকে দিল।

ঝুমুটমলও জেনানাদের সঙ্গে করে নিয়ে তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দূরে সরে পড়েছে। যারা জানতে পারেনি তারই পাথর চাপা পড়ে মরেছে শুধু। তাদের কান্নায় আর চিৎকারে তখনও কান পাতা যায় না।

যে মরেছে সে তো বেঁচেছে।

কিন্তু যারা তখনও মরেনি, আধমরা হযে রয়েছে তাদেরই যত যন্ত্রণা।

কিন্তু যারা একেবারে রক্ষা পেয়ে গেছে, তারা তখনও দূরে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে। তারা যে রক্ষে পেয়ে গেছে এই-ই একলিঙ্গনাথের অপার দয়া। জয় বাবা একলিঙ্গনাথ কী জয় হো, বাবা একলিঙ্গনাথ কী জয় হো!

ডাক্তারবাবু গল্প বলতে বলতে এবার থামলেন।

বললাম—তারপর?

কিষেণগড়ের ডাক্তারখানার সামনে বসে গল্প হচ্ছিল রাত অনেক হয়ে গিয়েছে তখন। একটা কুকুর সামনের ফুটপাথে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ কেঁউ-কেঁউ করে একবার আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তারবাবু বললেন—দেখুন, দেখুন কুকুরটার শীত করছে তাই কাঁদছে—

আমিও দেখলাম, কুকুরটা আবার ল্যাজ গুটিয়ে শরীরটাকে আরো বেশি কুন্ডুলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। রাস্তার ঘেয়ো কুকুর। কোথাও আশ্রয় নেই বলেই রাস্তার ধূলোর ওপর খোলা আকাশের তলায় ঘুমোবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তারবাবু বললেন— তখনকার দিনে রাজস্থানের যত প্রজা, স্বরূপ সিং-এর চোখে তারা সবাই-ই ঘেয়ো কুকুর। তাদের বাড়ি-ঘর-ছেলেমেয়ে কিছুই যেন থাকতে নেই। তারা যেন মানুষ নয়। স্বরূপ সিং-এর চোখে রাজস্থানের প্রজা মানেই জানোয়ার। তারা মরলেই বা কী, আর বাঁচলেই বা কী। তখনকার সমাজে ওই-রকমই ছিল নিয়ম। কত শো বছব আগেব গল্প আপনাকে বলছি। তখন রাণা মানে ভগবান। দেবাদিদেব একলিঙ্গনাথের ওপরেই তার ঠাঁই।

কিন্তু ওই যে কথায় আছে—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। এও ঠিক তাই। মহারাণা স্বরূপ সিং তবু দেবাদিদেব একলিঙ্গনাথের ওপব। কিন্তু ওপরে যদি কেউ থাকে তো সে হলো ওই মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং।

বাজার-মহল্লায় যদি কোতোয়ালের অত্যাচার হয় তো তার আপীল আর্জি যাবে খুব বড়-জোর জগমন্ত্ সিং পর্যন্ত। স্বরূপ সিং পর্যন্ত পৌছবেই না। স্বরূপ সিং টেরই পাবে না উদয়পুরের কোন্ মহল্লায় কোন্ শেঠজীর ওপর কী অত্যাচার হলো। সারা রাজস্থান চালায় জগমন্ত্ সিং। কিন্তু আসলে স্বরূপ সিং-এর ব-কলমায়।

এমনিতে স্বরূপ সিং-এর হুকুম তামিল করতে জগমন্ত্ সিং-এর পেছপা হবার কথা নয়। স্বরূপ সিং-এর কানের কাছে এসে জগমন্ত্ সিং যেমন শোনায়, স্বরূপ সিং তেমনিই শোনে।

জগমন্ত্ সিং যদি বলে—এবার ক্ষেতে মকাই ফলেছে বেশ, চাষীরা খুব নাফা কবেছে—

স্বরূপ সিং বলে—তাহলে খাজনা বাড়িয়ে দাও—

খাজনা বাড়লেই স্বরূপ সিং-এর লাভ। মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং-এরও লাভ।

আসলে স্বরূপ সিং-এর চেয়ে জগমন্ত সিং এর লাভটা বেশি।

কিন্তু স্বরূপ সিং-এর খেয়ালের আবার তুলনা নেই। অত্যাচার করতেও যেমনি, দান করতেও তেমনি।

ভাট তিলকচাঁদ খুব গান গায় ভালো। ভাটের মখে স্বরূপ সিং-এর পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহদের গুণপণা শুনে স্বরূপ সিং মহা খুশি।

বললে—পঞ্চাশ মোহর একে দিয়ে দাও জগমন্ত্ সিং—

স্বরূপ সিং যখন যা দিতে বলবে তা দিতে হবেই। স্বরূপ সিং-এর সামনে তাই-ই দিতে হলো। ইনাম পেয়ে খুব খুশি ভাট তিলকচাঁদ। স্বরূপ সিং-কে মাথা নিচু কবে বার-বার কুর্নিশ করলে।

কিন্তু বাইরে আসতেই জগমন্ত্ সিং ধরেছে।

—শোনো ভাট তিলকচাঁদ।

তিলকচাঁদ থমকে দাঁড়ালো। দেখলে জগমন্ত সিং পেছনে দাঁড়িয়ে।

তিলকচাঁদ একটু অবাক হয়ে গেল।

কই, কোনো তো কসুর হয়নি ভাট তিলকচাঁদের। রাণা-দরবারে যেমন-যেমন আদব-কায়দা মানতে হয় সবই তো ঠিক মেনেছে সে। আর এ আদব-কায়দা শুধু উদয়পুরেই নয়। যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর, সব জায়গাতেই একই কানুন।

জগমন্ত্ সিং-এর মুখটা কিন্তু গম্ভীর-গম্ভীর।

দেখেই একটু সন্দেহ হয়েছিল। বললে নমস্তে মন্ত্রীজী!

জগমন্ত্ সিং বললে—খুব তো দাঁও মেরে নিলে স্বরূপ সিংজীকে সোজা মানুষ পেয়ে। তা আমার হিস্যা কোথায়?

—হুজুর আপনার হিস্যা? ইস্‌কে মত্‌লোব?

জগমন্ত্ সিং বললে—তোমার পাওনা থেকে আমার অংশ না দিয়েই চলে যাচ্ছো।

ভয় পেয়ে গেল তিলকচাঁদ। এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি।

তাড়াতাড়ি মোহর ক'টা বার করলো পুঁটলি থেকে! জগমন্ত্ সিং সব ক'টা মোহর নিজের হাতে নিয়ে তা থেকে পাঁচটা ভাট-তিলকচাঁদের হাতে দিয়ে বাকি পঁয়তাল্লিশটা নিজের ট্যাকে গুঁজে রেখে বললে নাও, আমার হিস্যা নিলাম, এখন তুমি বিদেয় হও—

এরকম ঘটনা নতুন নয়। উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিং-এর কাছ থেকে যারা ইনাম পেয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

তা সেদিন বাজার মহল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে মহেশ্বরপ্রসাদ সেইজন্যেই অবাক হয়নি। কিন্তু শেঠ ঝুমুটমলজী যে রাণার কাছ থেকে মঞ্জুরি না-নিয়েই নাচা-গানা-বাজা করবে তা কেমন করে জানবে মহেশ্বরপ্রসাদ। জানলে আগে থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে যেত।

রঙনা বললে—গুরুজী এখন কী হবে?

শুধু তো রঙনা নয়। নট্‌নীর দলে অনেক মেয়ে আছে। তাদের সবাইকে নিয়ে নাচতে এসেছিল মহেশ্বরপ্রসাদ।

শেঠ ঝুমুটমলের বাড়ী গেছে, সম্পত্তি গেছে, কিছু লোক মারাও গেছে। মহল্লার শেঠজীরা নিজের নিজের জান নিয়েই ব্যস্ত। তখন আর নট্‌নীদের ভালো-মন্দ দেখবার সময় নেই কারো।

মহেশ্বরপ্রসাদ সেই অত রাত্রে আবার উট-ভাড়া করে নাথদোয়ারে ফিরে গিয়েছিল দলবল নিয়ে। ইমান-ইজ্জত কিছুই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে কিছু হয়রানি আর লোকসান নসীবে ছিল।

তারপর আর বহুদিন মহেশ্বরপ্রসাদ আর এদিকে আসেনি।

কিন্তু কি করে যেন স্বরূপ সিং-এর কাছে রঙনার কথাটা তুলেছিল। স্বরূপ সিং-এর কাছে কথা তোলবার লোকের অভাব হয় না।

—কী নাম কহা? রঙনা?

জী সরকার। অপূর্ব নাচে, অদ্ভুত গায়। তার নাচ দেখতে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে আদমীরা আসে। শুধু রঙনার নাচ দেখার জন্যে টাকা খরচ করে।

স্বরূপ সিং বলেছিল ঠিক আছে, রঙনাকো ইহা লাও—

হুকুমটা হয়ে গেল জগমন্ত্ সিং-এর ওপর।

এসব খবর মহেশ্বরপ্রসাদ জানতো না। নাথদোয়ারের মাঠে মন্দিরে-পাহাড়ে তখন নট্নীরা গুরুজীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদয়পুরে যাবে না তারা। বড় তক্লিফ পেয়েছে সেবারে। নট্নীদের নাচ যদি দেখতে চাও এই নাথদোয়ারে এসো। এখানে এসে আমাদের দেখো। মজুরো করো। আমরা তোমাকে নাচ দেখাবো, গান শোনাবো। আর নাচ দেখে যদি তোমার ভালো লাগে তো খুশি হয়ে আমাদের ইনাম দিয়ো। আমরা খুশি হয়ে তা মাথায় তুলে নেবো।

স্বরূপ সিং-এর হুকুমনামা, কিন্তু পাঠিয়েছে জগমন্ত্ সিং। আর সে হুকুমনামা নিয়ে এসেছে দরবারের পেয়াদা।

মহেশ্বরপ্রসাদ পড়তে জানে না।

জিজ্ঞেস করলে— আমাকে কী করতে হবে?

পেয়াদা বললে— মহারাণা স্বরূপ সিং রঙনার নাম শুনেছে, রঙনার নাচা্-গানার সুখ্যাতি শুনেছে, তাই মহারাণা নিজে রঙনার নাচ দেখবে!

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে— কিন্তু উদয়পুরের বাজার-মহল্লার শেঠজী ঝুমুটমলের কোঠিতে নাচতে গিয়ে আমার খুব তক্লিফ গিয়েছে। আবার নতুন কি তক্লিফ হবে বুঝতে পারছি না।

পেয়াদা বললে— মহারাজা স্বরূপ সিং খুদ্ নিজে ডেকেছে, তক্লিফ আবার কী হবে? স্বরূপ সিং খুশি হলে ইনাম দেবে, ইজ্জত দেবে।

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল— কী ইজ্জত দেবে?

—রঙনা যে-ইজ্জত চাইবে, সেই ইজ্জতই দেবে। যে-ইনাম চাইবে, সেই ইনামই দেবে।

—আর যদি খুশি করতে না পারে?

পেয়াদা বললে-কেন খুশি হবে না গুরুজী, রাজস্থানের সব লোক খুশি হচ্ছে আর মহারাণা স্বরূপ সিং খুশি হবে না? মহারাণা স্বরূপ সিং তো জহুরী লোক। সেবার ভাট তিলকচাঁদ দরবারে গাইতে এলো, মহারাণা তার গান শুনে খুশি হয়ে তাকে পঞ্চাশ মোহর ইনাম দিলে।

—পঞ্চাশ মোহর তো দিলে, কিন্তু মন্ত্রী জগমন্ত্ সিং তা থেকে হিস্যা নিলে।

পেয়াদা বললে—তা মন্ত্রীজী নেবে কেন? মহারাণা স্বরূপ সিং নিজের হাতে রঙনাকে ইনাম দেবে।

কথা হচ্ছিল মহেশ্বরপ্রসাদের ঘরের দাওয়ায় বসে। হঠাৎ রঙনা ঢুকলো।

বললে—গুরুজী কথা দাও, আমি যাবো।

মহেশ্বরপ্রসাদ অবাক হয়ে গেল।

বললে—সে কীরে? কথা দেবো? তুই যাবি? সেবার যে বাজার-মহল্লায় গিয়ে অত তক্লিফ হলো। তুই বললি আর উদয়পুরে যাবি না?

রঙনা বললে—সেবার শেঠজীর কোঠিতে গিয়েছিলাম গুরুজী, এবার তো রাণার দরবারে।

পেয়াদা হুকুম জারি করে দিয়ে চলে গেল। তার কাম হাসিল হলেই হলো।

পেয়াদা চলে যাবার পর মহেশ্বরপ্রসাদ মেয়ের দিকে চাইলো।

বললে—কী রে, সত্যিই তুই যাবি?

রঙনা বললে—হ্যাঁ গুরুজী, আমি সত্যই যাবো।

—কিন্তু শেষকালে যদি বিপদ হয়?

রঙনা বললে—কী বিপদ হবে? আমি যাবার আগে সেজা করে যাবো। তুমি আমার সেজার ইন্তেজাম করো—

মহেশ্বরপ্রসাদ অবাক হয়ে গেল মেয়ের কথা শুনে। কতদিন ধরে মহেশ্বরপ্রসাদ মেয়েকে বলেছে সেজা করতে।

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম।

বললাম—সেজা কী ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন—ওরা বিয়েকে 'সেজা' বলে। আমার মনে হয় 'শয্যা' কথাটা থেকেই 'সেজা' এসেছে অর্থাৎ বিছানা। কিন্তু ওদের বিয়েটা আমাদের বিয়ের মত নয়। সে অন্যরকম।

আমি বেশ অবাকই হলাম।

বললাম—কী রকম?

—ওরা তরোয়ালকে বিয়ে করে বিমলবাবু। মানে বিয়ে হয় তরোয়ালের সঙ্গে।

—তরোয়াল? বলছেন কী?

ডাক্তারবাবু বললেন-হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বিয়ের সময় বর বিয়ে করতে আসে না। আসে তরোয়াল। সেই তরোয়ালের সঙ্গেই বিয়ের যা-কিছু উৎসব অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঢাক-ঢোল-জগঝম্প বাজে। লাড্ডু-প্যাঁড়া-পুরি-ভাজি-গুল্‌জামুন এই সব খাওয়া-দাওয়া হয়। বড় লোকের বাড়িতে ঘটাটা বেশি হয়, গরীব লোকের বাড়ি একটু কম। তা বিয়েই হোক আর সেজাই হোক, মঞ্জুরী নিতে হবে রাণার দরবার থেকে। দরবার মঞ্জুরী না দিলে আর ঘটা-টটা কিছু হবে না।

তা ঘটা-টটা হবার দরকার নেই। সে পরে হলেও চলবে। আগে তো রঙনার সেজা হয়ে যাক।

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে—তবে তাই-ই হোক।

হোক মানে একদিন তরোয়াল এলো রঙনার কাছে।

বরের বাড়ি দূরে নয় বেশি। পাশের মহল্লাতেই দুখহরণ থাকে, তারই ছেলে হলো বর। সেই বর তরোয়াল পাঠিয়ে দিল একদিন। সঙ্গে লোকজন, ঘোড়া, উট—জাঁকজমক যা আসবার তাও এলো।

যারা জানতো না, তারা বললে—ঠাকুর-মহল্লার চমন—

—চমন? কোন্ চমন? কার লেড়কা?

—দুখহরণের লেড়কা চমন।

চমন দুখহরণেব লেড়কা বটে, কিন্তু কিছু করে না সে। করে না মানে কাজের চেয়ে তার বাঁশি বাজাবার দিকেই ঝোঁক বেশী। যখন সবাই নাচে সে বাঁশিটা নিয়ে পোঁ-পোঁ করে।

বঙনা বলতো—তোর কিছু হবে না, তুই বাঁশি বাজানো ছেড়ে দে—

চমন বলতো—আমার বাঁশি বাজানো না হোক, তোর নাচ তো হবে! তুই নাচবি আর আমি তারিফ করবো।

রঙনা বলতো—তারিফ করবার জন্য তোর মত বেকাম লোকের দরকার নেই। বড় বড় শেঠজীরা আমার তাবিফ করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়—

অর্থাৎ চমন বুঝতে পেরেছিল রঙনার কাছে বেকাম লোকের তারিফের কোন দাম নেই। কিন্তু কোন কাজটা করবে সে? কোনও কাজই যে তার করতে ভাল লাগে না। মন দিয়ে চেষ্টা করলেও যে বাঁশিটা তার হবে না তা সে বুঝতে পেরেছিল।

তা সবাই কি সব পারে?

আর সবাইকে যে সব কাজ করতে হবে আর পারতে হবে সেই া কে বললে? সেইটেই বা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? কিছু না করতে পারাটাও তো একটা ।

তাই যখন নট্‌নীদের নাচ-গান চলতো, মুজরো নিয়ে মহেশ্বরপ্রসাদ কো যেত, তখন শুধু সঙ্গে যেতে চাইতো চমন!

রঙনা বলতো-- না গুরুজী, ওকে নিয়ো না, ও কোনও কর্মের নয়, ও কে হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আমি বোল্ ভুলে যাই--

রঙনা কিছুতেই নেবে না, আর মহেশ্বরপ্রসাদ ততই বলবে--ও থাক না সঙ্গে। সঙ্গে থা ল ক্ষতিটা কি?

—বা রে, আমি যে বোল্ ভুলে যাই—

মহেশ্বরপ্রসাদ বললে—ঠিক আছে, ও তোর মুখের দিকে চাইবে না। হলো তো?

তারপর চমনের দিকে চেয়ে বললে—খবরদার,কারো মুখের দিকে যেন চাস নি!

চমন জিজ্ঞেস করতো—তা হলে কোন্ দিকে চাইবো?

রঙনা বলতো—কেন কারো দিকে চাইতে হবে না, চোখ বুঁজে থাকলেই হয়।

মহেশ্বরপ্রসাদ বলতো—না না, তার চেয়ে তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকিস, আমার কোনও বোল্ ভুল হবে না--

কিন্তু তা কি হয়? তা কি সম্ভব? হঠাৎ এক-একবাব চেয়ে ফেলতো রঙনার মুখের দিকে। আর তখনই ধমক খেতো রঙনার কাছ থেকে।

রঙনা বলতো—ওই দেখ গুরুজী, চমন আমার দিকে আবার চাইছে-

কিন্তু সে চমনই হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো একদিন—সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। সারা নাথদোয়ারে তোলপাড় পড়ে গেল।

একদিন দৌড়তে দৌড়তে দুখহরণ মহেশ্বরপ্রসাদের কাছে এসে হাজির।

—কী ব্যাপার? না আমার ছেলেটা সর্বনাশ করে ফেলেছে।

—কী সর্বনাশ গো দুখহরণ? কী সর্বনাশ?

—চমন নিজের দুটো চোখ অন্ধ করে ফেলেছে। ঝর-ঝব কবে রক্ত পড়ছে দু'চোখ দিয়ে।

—ডাক্তারকে দেখিয়েছো?

ডাক্তার মানে সেকালের ডাক্তার। সেকালের রাজস্থানের ডাক্তার।

তাড়াতাড়ি মহেশ্বরপ্রসাদ দৌড়ে গেল ঠাকুর মহল্লায়। বঙনাও দৌড়ে গেল। তখন মহল্লার ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই জুটেছে দুখহরণের বাড়ীতে। ডাক্তার তখন চমনের চোখে কী-সব গাছের পাতা বেঁটে দিয়ে চলে গেছে। চমন যন্ত্রণায় ছটফট করছে!

তারপর সেই চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেল। চোখ দুটো চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল চমনের।

লোক জিজ্ঞেস করলে—কেন রে, চোখ দুটো কীসে নষ্ট হলো তোর?

চমন বলল—আমি নিজেই চোখ দুটো নষ্ট করে ফেললাম—

—কেন, তোর চোখ কী দোষ করলো?

চমন বললে—চোখ তাকালেই কেবল রঙনাকে দেখতে চায—

মহেশ্বরপ্রসাদের তখন খেয়াল হলো। তখনই হঠাৎ মালুম হলো যে রঙনার 'সেজা' দিতে হবে। এতদিন ঢোল বাজিয়ে আর নটী নাচিযে তার দিন কেটেছে শুধু। মেয়ের দিকে মন দেবার আর ফুরসুত হয়নি।

তাড়াতাড়ি সেজার বন্দোবস্ত করতে লাগলো মহেশ্বরপ্রসাদ। এ-গাঁয়ে ও-গাঁযে নিজেই খোঁজ-খবর চালাতে লাগলো। রঙনা কিছুই জানতে পারেনি। কোথা থেকে কে তরোয়াল

পাঠাবে, কী-রকম পাত্র, তারই হিস্লেব-নিকেশ করতে লাগল লুকিয়ে লুকিয়ে। রঙনাকে তরোয়াল পাঠাবার মত পাত্রের অভাব নেই। সবাই রঙনাকেই সেজা করতে চায়। হঠাৎ এক পাত্র মিললো। মহেশ্বরপ্রসাদ ভারী খুশি।

মেয়েকে বলতেই মেয়ে ক্ষেপে উঠলো—কেন তুমি ওখানে আমার সেজার ব্যবস্থা করতে গেলে গুরুজী?

—কেন, অন্যায়টা কী করলাম আমি?

রঙনা বললে—না, আমি ওখানে সেজা করবো না—

—তা কেন করবিনে তা তো বলবি?

রঙনা বললে—করবো না, আমার খুশি—

—তাহলে কাকে সেজা কববি?

—রঙনা বললে—চমনকে—

—চমন? সে তো কানা। দু'চোখ কানা, তাকে সেজা করবি?

—হ্যাঁ।

—খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখ মা। সে অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। তোকেও দেখতে পাবে না, তোর নাচকেও দেখতে পাবে না। তোকেই শেষ পর্যন্ত তাকে সামলাতে হবে। সারা জীবন সামলাতে হবে। তা পারবি? বেশ ভালো কবে ভেবে দ্যাখ—

রঙনা অনড়-অটল।

বললে-পারবো গুরুজী। যে আমার জন্যে নিজের চোখ দুটো নষ্ট করতে পারে, আমি নিজেই তার চোখ হয়ে উঠবো। আমার নিজের এক জোড়া চোখ যতদিন আছে, ততদিন চমনের চোখের অভাব হবে না—

মহেশ্ববপ্রসাদ আর কিছু বললে না! মেয়ের যখন একবার চমনকে সেজা করবার মতি হয়েছে তো সে আর নড়বে না।

গেল মহেশ্বরপ্রসাদ দুখহরণের বাড়ি।

দুখহরণও ঢোল বাজায় মহেশ্বরপ্রসাদের দলে। দুখহরণকেও মহেশ্বরপ্রসাদ নিজে তালিম দিয়ে তৈরী করেছে। দুখহরণেব ছেলে চমনকে জন্মাতে দেখেছে মহেশ্বরপ্রসাদ।

কথাটা শুনে দুখহবণের সমস্ত দুঃখ ঘুচে গেল যেন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বললে—গুরুজী, সবই একলিঙ্গনাথের মর্জি।

আর চমন? চমনকে বলতে সে বললে—গুরুজী, রঙনাকে বোলো এবার তার দিকে চাইলে সে যেন আর রাগ না করে। এবার যেন সে বোল না ভুলে যায়!

তা জাঁক-জমক যা হবার তা হলো।

তরোয়াল পাঠালো চমন আর তার সঙ্গে চাঁপা ফুলের মালা, আর মিষ্টি খাবার।

রঙনা সেই ফলের মালা তরোয়ালের গলায় পরিযে দিলে। তারপর সেই ফুল-পরা তরোয়াল বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো। নটীদের নাচ হলো, গান হলো। রঙনা নাচলো, দুখহরণ ঢোল বাজালো। নট্‌নী-মহল্লার সবাই এলো 'সেজার' উৎসবে। শুধু এলো না চমন। কারণ তাকে আসতে নেই। সে আসবে পরে।

যেদিন চমন আসবে, সেদিন আরো বড উৎসব হবে। আরো নাচ-গান হবে, আরো লাড্ডু, আবো মিঠাই, আবো গুলজামুন খাবে সবাই। তার আগে মহারাণা স্বরূপ সিং -এর দরবার থেকে ইনাম নিয়ে আসুক, ইজ্জৎ নিয়ে আসুক।

ডাক্তারবাবু থামলেন।

বললেন—কত রাত হলো? আপনার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

বললাম—তারপরে বলুন কী হলো?

কিষেণগড়ের রাস্তা তখন নিঝুম। যে কুকুরটা এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, সেটা আবার কেঁউ কেঁউ করে ডেকে উঠলো। একখানা ট্রেন শান্টিং করছিল স্টেশনের প্লাটফর্মে, সেটা হঠাৎ হুইশল বাজিয়ে রাতের অন্ধকার চিরে খান খান করে ফেলে দিলে।

ডাক্তারবাবু বললেন—আপনার ঘুম পেলে বলবেন—

বললাম—সে কী, দেখছেন আমি উঠছি না পর্যন্ত, এক নিশ্বাসে শুনছি আপনার গল্প—

ডাক্তারবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, তার আদব-কায়দা-কানুনই আলাদা। বিশেষ করে অত বছর আগের ঘটনা। আপনি যদি কখনও গল্প লেখেন এই নিয়ে তো আমি আপনাকে নানা ভাবে সাহায্য করতে পারবো। এসব ছাপানো বইতে পাবেন না। এখানে এই কিষেণগড় ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের লাইব্রেরীতে অনেক পুরনো সব তুলোট কাগজে লেখা পুঁথি আছে। আমি আপনাকে সব দেখাতে পারি।

বললাম—সে সব পরে হবে, যদি কখনও উপন্যাস লিখি তো দেখবো। এখন বলুন তারপর কী হলো?

ডাক্তাবাবু বললেন—তারপর মহেশ্বরপ্রসাদ দলবল নিয়ে এলো উদয়পুরের স্বরূপ সিং-এর দরবারে! জগমন্ত্ সিং-এর কথা তো আগেই বলেছি। যেমন করে ভাট তিঁলকচাঁদের সাদর-অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, তেমনি করেই মহেশ্বরপ্রসাদের দলকে অভ্যর্থনা করা হলো। যারা জুতো পরে এসেছে তাদের জুতো খুলতে বলা হলো পাহাড়ের তলাতেই। খালি পায়ে উঠতে হবে ওপরে।

সবাই তাই-ই করলো। জুতো খুলে উঠলো উপরে।

আসলে স্বরূপ সিং তো শুধু মহারাণা নয়, মহাদেবতা। ঈশ্বরের সমান! একলিঙ্গনাথ। সুতরাং তার কাছে যাচ্ছো যখন তখন নিরাভরণ হয়ে যেতে হবে। দেবদর্শন করতে হলে যা করতে হয়।

কিন্তু ওপরে গিয়েও দেবদর্শন পাওয়া গেল না।

মহারাণার হুকুম সেদিন তিনি দরবারে নাচ দেখবেন না। দেখবেন বৃন্দাবন-প্যালেসে।

বৃন্দাবন-প্যালেস হলো একেবারে উদয়-সাগরের ভেতরে। বিরাট প্রাসাদ। কিন্তু স্বরূপ সিং-এর প্রাসাদ থেকে আধ-মাইলটাক পথ নৌকো করে পেরোতে হয়। নৌকো ছাড়া অন্য কোনও যাবার রাস্তা নেই। বৃন্দাবন-প্যালেসে চারদিক অথৈ-অগাধ জল। জলে জল চারিদিকে। সেই জলের ওপর মহারাণা স্বরূপ সিং মাঝে-মাঝে জল-বিহারে বেরোন। সঙ্গে থাকে পাত্র মিত্র-পারিষদবর্গ। যারা স্বরূপ সিং-এর কাছ থেকে কিছু প্রসাদপ্রার্থী, তার সঙ্গে সঙ্গে জল-বিহার করবার সুযোগ খোঁজে। সঙ্গে থাকতে থাকতে যদি একবার হাসি মুখের সুযোগ নিয়ে কিছু পেয়ে যায় তারই প্রত্যাশায় থাকে।

তারপর যখন জল-বিহার শেষ হয়ে যায়, তখন আবার পরের দিনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

আর সেও দেখবার মত প্যালেস বটে! আপনি তো দেখে এলেন? শুনেছি এখন নাকি মহারাণা প্যালেসটা হোটেল করে দিচ্ছে। আমেরিকান টুরিস্ট যারা আসবে তারা ওখানে দিনে তিনশো টাকা চার্জ দিয়ে থাকবে।

বললাম, হ্যাঁ, এখনও রাজমিস্ত্রি খাটছে। সবগুলো ঘর আমাদের দেখতে দিলে না।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি সবই দেখেছি। আর তা ছাড়া আপনি না-দেখতে পেলেও আপনার ক্ষতি হবে না, ও-সম্বন্ধে আপনাকে আমি অনেক বই সাপ্লাই করতে পারবো। তাতে অনেক ছবি-টবি আছে। রাণারা যে কত সৌখিন ছিলেন, কত ঐশ্বর্য, কত জাঁকজমক ছিল তাঁদের তাও জানতে পারবেন। ওই স্বরূপ সিং-এর আমল থেকে তা কেবল বেড়েই চলেছিল।

তা যাকগে সেসব কথা।

সেই বৃন্দাবন-প্যালেসের চবুতরায় নাচের আসর বসলো সেদিন। গণ্য-মান্য গুণীজনদের আসরে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

মহারাণার মঞ্জুরি পাবার পব নাচ আরম্ভ হলো। প্রথমে অন্য নট্‌নীরা নাচলো এক এক করে।

মহেশ্বরপ্রসাদ এক এক করে সকলের নাচের খেলা দেখালে। দুখহরণ ঢোল বাজাতে লাগলো তার সঙ্গে। দলের সবাই এসেছে। শুধু আসেনি এক চমন। সে রঙনাকে সেজা করেছে। তবোয়াল পাঠিয়েছে। সুতরাং এখন সে আসতে পারে না। সে পরে আবার আসবে দলের সঙ্গে। কিন্তু রঙনা যখন নাচতে উঠলো তখন নাথদোযাবের ঠাকুরমহল্লায় চমন দুটো বোবা-চোখ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

বলছে—কিছু ভয় নেই রঙনা, নাচো।

রঙনা বলছে—কিন্তু তুমি যে দেখছো আমার দিকে—আমি যদি বোল্ ভুলে যাই—

চমন বলছে—আমি তো দেখতে পাই না রঙনা—

রঙনা বলছে—আচ্ছা, এই নাও, তুমি আমার চোখ দুটো নাও—

চমন বলছে—কিন্তু আমাকে চোখ দিয়ে দিলে তুমি দেখবে কী করে?

রঙনা বলছে— আমি তো পা দিয়ে নাচবো, আমার পা-দুটো থাকলেই হলো—

হঠাৎ রঙনার খেয়াল হলো কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথায়, চমন তো তার দিকে চেয়ে নেই! কোথায় গেল চমন? কে তবে এতক্ষণ কথা বলছিল তার সঙ্গে?

চারদিকে লোক বসে আছে গোল হয়ে। মহারাণা স্বরূপ সিং। স্বরূপ সিং-এর পাশে জগমন্ত্ সিং। জগমন্ত্ সিং-এর পাশে আরো সব বড় বড় শেঠজী। কাউকেই চেনে না রঙনা। সবাই তার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু তুমি কোথায় চমন? তুমি তো আমার দিকে চেয়ে দেখছো না।

চমন কোথা থেকে যেন বলে উঠলো—আমি কী করে দেখবো, আমার কী চোখ আছে?

—আছে আছে—তোমার চোখ আছে চমন!

রঙনা চিৎকার করে উঠলো—অমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তোমার চোখ আছে চমন—

—কিন্তু তারপর? তুমি যখন চলে যাবে?

—আমি কোথায় আর চলে যাবো? আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো?

—আমাকে তুমি এত ভালোবাসো রঙনা!

—কিন্তু তোমার মত যদি ভালোবাসতে পারতাম। তোমার জন্যে আমি যদি আমার কিছু দিতে পারতাম! তুমি কি চাও বলো।

—কিছু চাই না আমি। আমি সব পেয়েছি!

—কিন্তু তবু কিছু চাও! কিছু নিবেদন না করে যে নিতে নেই—

—তুমি আমাকে তোমার সব দিয়েছ রঙনা। আমি তোমাকে পেয়েছি আর পাওয়ার কিছু বাকি নেই যে আমার!

—তাহলে, বেশ, এবার তুমি আমার সম্মান নাও। যত সম্মান,যত খাতির, যত প্রীতি, যত তারিফ স্বরূপ সিং আমায় দিচ্ছে , এ সবই তোমার!

-রঙনা, তুমি কত ভালো।

রঙনা তখন বেহুঁশ হয়ে নাচছে। তার ঘাগরার জরির-চুমকি বসানো ফুল-লতা-পাতাও নাচছে। মহারাণা স্বরূপ সিং-এর চোখের পাতা নড়ছে না। জগমন্ত্ সিং-এর চোখের পাতা নড়ছে না, পাত্র-মিত্র-পরিষদ কারো চোখের পাতা নড়ছে না। উদয়-সাগরে যত জল আছে তাদের মাথাতেও যেন আর ঢেউ নেই। সব ঢেউ যেন রঙনার নাচ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রঙনার দিকে।

—এ সবই তোমার চমন। এই খাতির, এই তারিফ, এসব তোমাকে দিলাম!

—কিন্তু তোমার সম্মান তো আমারই সম্মান রঙনা। তুমি আমি কি আলাদা?

রঙনা বললে, এসো তুমি আর আমি আজ একাকার হয়ে যাই—

আরো জোরে নাচ চালাতে লাগলো বঙনা। আরো তারিফ, আরো খাতির, আরো হাততালি। সমস্ত বৃন্দাবন-প্যালেসটা তখন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে রঙনার পায়ের আঘাতে। চঞ্চল হয়ে উঠছে রক্ত, ভেঙে পড়ছে আভিজাত্য।

ওই উদয়-সাগরের স্থির নিশ্চল জল পেরিয়ে ওপারের বড় কেল্লাটার কোঠরে কোঠরে আরো কয়েক শো জোড়া চোখ এদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। নাচ আমরা অনেক দেখেছি মহারাণা। কিন্তু ঢোলকের দুলকি তালে তালে নেচে মনকে বিকল করে দেওয়া এমন নাচ দেখে আগে আর কখনও এমন করে আত্মহারা হইনি।

একটার পর একটা নাচ হচ্ছে। যেন নাচের ঢেউ, নাচের মালা। মালার মত এ-নাচের ছন্দের ফুল জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। এ-নাচ যে দেখে তার কাজ ভুল হয়ে যায়, কর্তব্য ভুল হয়ে যায়, জীবন-মৃত্যু -হাসি-কান্না-সংসার পৃথিবীর সবকিছু ভুলে আত্মনিবেদন করে পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছে করে।

—তুমি চেয়ে থাকো চমন। তুমি যত চেয়ে থাকবে তত আমি জোর পাবো মনে।

—এই তো চেয়ে আছি রঙনা।

—তুমি দেখতে পাচ্ছো?

—বারে রে,তুমি আমায় চোখ দিয়েছো, আমি দেখতে পাবো না? তুমি বলছো কী?

—যতক্ষণ আমি নাচবো ততক্ষণ তুমি চেয়ে থাকবে। তুমি চেয়ে না থাকলে আমি নাচ কাকে দেখাবো?

ইনাম এলো নাচের শেষে।

মহারাণা স্বরূপ সিং-এর পূর্বপুরুষের সগর্ব-সঞ্চিত ঐশ্বর্য। তিলে তিলে জমে ওঠা সম্পত্তি। তারই একটা কণা।

মহারাণা নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন রঙনার গলায়।

—পরো চমন, পরো। এ তো তোমারই।

—আমাকে কি মণিহার মানাবে রঙনা। তার চেয়ে তুমিই পরো।

রঙনা হাসলো-বা রে, তুমি আমি কি আলাদা নাকি? তুমি যে কী!

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—মহারাণাকে খুশি করবার জন্য আরো নাচতে পারে রঙনা—।

স্বরূপ সিং বললেন—অনেক পরেশানি হবে, থাক —

মহেশ্বরপ্রসাদ নিবেদন করলে না হুজুর, রঙনা আপনার গোলাম, পরেশানি হবে না, আরো যদি হুকুম হয় হুজুরের, তো রঙনা আরো নাচতে পারে—

একজন শেঠজী পাশে বসে এতক্ষণ নাচ দেখছিল। শেঠজী বলে—দড়ির ওপরে নাচতে পারে নট্‌নী—

—রসি?

—হ্যাঁ, দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নাচবে। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত।

—তো তাই নাচো। ওই নাচই হোক—

চমনের মুখে চোখে যেন আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

বললে—না না, তুমি নেচো না রঙনা, নেচো না—

রঙনা হাসলো।

মহেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস্ কেন মা?

রঙনা বললে, না গুরুজী, এমনি—

—ভয় পাচ্ছে বুঝি তোর?

রঙনা বললে—ভয় পাবে কেন গুরুজী? তুমি তো আছো?

—হ্যাঁ, আমি তো আছিই, ভয় কী তোর?

সব ব্যবস্থাই হলো তখন। প্রথমে বেশি দূর নয়, এই অলিন্দের খিলেন থেকে ওই অলিন্দ পর্যন্ত। মাটি থেকে সাত হাত উঁচু।

রঙনা ওপরে উঠছে। মহেশ্বরপ্রসাদ ঢোলের পিঠে চাঁটি দিয়ে বোল্ তুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে নট্‌নীর দল গান গেয়ে উঠলো তালে তালে।

রঙনা তখন দড়ির ওপর নাচছে।

—খুব হুঁশিয়ার রঙনা। খুব হুঁশিয়ার!

—তুমি অত ভাবছো কেন? এ কি নতুন?

—নতুন নয়, কিন্তু আমার তো বরাবরই ভয় করে!

রঙনা বললে—তোমার কোন ভয় নেই, আমার কিছু হবে না, দেখো। এই দেখ, আমি কেমন নাচছি। গুরুজীর ঢোলের তালে তালে আমি বোল্ তুলছি। এই দেখ, আমার হাত কাঁপছে না, আমার পা কাঁপছে না, আমার বুক কাঁপছে না—

যখন নিচেয় নামলো রঙনা, তখনও চমন তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

—কী দেখছো অমন করে?

—আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, কেমন ভয় পেয়েছিলাম আমি? তুমি যদি পড়ে যেতে!

—তাই কখনও পড়ি? তুমি পাহারা দিয়ে রয়েছো, পড়বো কী করে! আমি তো কোনওদিকে দেখিনি, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েছিলাম সারাক্ষণ!

সামনে স্বরূপ সিং-এর মুখ তখন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চারদিকে তারিফ, চারদিকে খাতির। যত তারিফ পায় রঙনা তত খুশি হয় মহেশ্বরপ্রসাদ। এ তারিফ তো শুধু তার একলার পায়। এ তারিফ তাদের সকলের। গুরুজী তাদের নাচ শিখিয়েছে, গান শিখিয়েছে। তাই রঙনার সম্মানে সমস্ত সম্মান।

উদয়পুরের মহারাণারা আগেও নট্‌নীদের নাচ তারিফ করেছে, আগেও কত ইনাম দিয়েছে, ইজ্জৎ দিয়েছে। এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু স্বরূপ সিং আলাদা প্রকৃতির মানুষ। জগমন্ত্ সিং যা বলে তাই-ই শোনে। তাই সেদিন ডাক পড়েনি রঙনার। আর তা ছাড়া কড়ার করে নিয়েছে মশেশ্বরপ্রসাদ যে, ইনাম যা তারা পাবে তার হিস্যা দিতে হবে না জগমন্ত্ সিংকে। এই কড়ার মানলে তবে আমরা যাবো, নইলে যাবো না।

—রাজী তো?

—হ্যাঁ রাজী।

—কিন্তু কথার যেন খিলাপ না হয়, দেখো বাবা!

পেয়াদা সেই কথাই দিয়ে দিয়েছিল এখানে আসবার আগে।

জগমন্ত্ সিংকে চুপি চুপি বললে মহেশ্বরপ্রসাদ—হুজুর, এবার তো নাচ খতম—

জগমন্ত্ সিং বললে—আগে মহারাণা বলুক খতম, তবে তো খতম হবে! তুমি কী রকম বে-আক্কেল লোক হে—

আর বেশি কিছু কথা বললে না মহেশ্বরপ্রসাদ!

আসর তখন জমজমাট। শেঠজীরা কেউ উঠতে চায় না। মহারাণা স্বরূপ সিং না উঠলে কে আর উঠবে। কার সাধ্যি ওঠবার? হঠাৎ স্বরূপ সিং বললেন—আরো উঁচু দড়ির ওপর উঠতে পারবে ওই নট্‌নী?

—হ্যাঁ হুজুর, খুব পারবে!

—কত উঁচু দড়ির ওপর নাচতে পারবে?

—যত উঁচুতে নাচতে হুকুম হবে!

—তা হলে এক কাজ করো—

বলে আর এক মতলব মাথা থেকে বার করলেন স্বরূপ সিং। ওই যে ওই বড় হাভলিটা দেখছো কেল্লার ওপর?

—হ্যাঁ দেখছি হুজুর!

—ওই কেল্লার মাথায় যদি দড়ি বাঁধে একটা দিকে, আর এদিকে এই হাভেলির মাথায়। তার ওপর নাচতে পারবে তোমার নট্‌নী?

বিচিত্র সব খেয়াল। রাণা-মহারাণাদের খেয়ালের যেন আর অন্ত নেই। পোষা বাঘের পিঠে বাঁদর বসিয়ে, তার সঙ্গে হাতীর লড়াই লাগিয়ে দিয়েই আনন্দ। দশ-তলা বাড়ির ওপর থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিচের মাটিতে লাফিয়ে পড়াতেও আর একরকমের আনন্দ। উদ্ভট আনন্দের উপকরণ না জোগালেও আবার জগমন্ত্ সিং-এর চাকরি থাকে না। মোট কথা স্বরূপ সিংকে খুশিতে রাখতে হবে যে কোনও উপায়ে। সহজে খুশি হবার লোক নয় মহারাণারা। আর সেই তখন লড়াই-ফড়াইও নেই যে তাই নিয়েই মেতে থাকবেন!

কী করা যায়?

জগমন্ত্ সিং মহেশ্বরপ্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—পারবে তোমার নট্‌নী?

মহেশ্বরপ্রসাদ আবার রঙনাকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, পারবি তুই?

রঙনা ভালো করে বিপদের ঝুঁকির কথাটা ভেবে নিলে।

বললে—তুমি আশীর্বাদ করলে পারবো না কেন গুরুজী?

মহেশ্বরপ্রসাদ জগমন্ত্ সিংকে জিজ্ঞেস করলে —কী ইনাম পাবো?

জগমন্ত সিং আবার স্বরূপ সিংকে জিজ্ঞেস করলে—ওদের ওস্তাদজী জিজ্ঞেস করছে যদি পারে তো মহারাণা কী ইনাম দেবেন।

স্বরূপ সিং বললেন—তামাম উদয়পুরের আধা দিয়ে দেবো—

তামাম উদয়পুরকা আধা!

কথাটা নিয়ে গুন্‌গুন্ করে সবাই আলোচনা করতে লাগলো।

উদয়পুরের অর্ধেক! মহারাণার যা খেয়াল, তাতে তো তাও অসম্ভব নয়। জগমন্ত্ সিং মহারাণার মুখের দিকে একবার চাইলে। মহারাণাকে বহুদিন ধরেই চেনে জগমন্ত্ সিং! যাকে যা দেবে বলে মহারাণা তা কড়ায় ক্রান্তিতে দেয়।

—মহারাণা!

চুপি চুপি মহারাণার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো জগমন্ত্ সিং।

মহারাণা, আপনি বলছেন কী! সাঁচমুচ আধা উদয়পুর দিয়ে দেবেন নাকি?

স্বরূপ সিং বললেন—আরে, তাই কখনও পারবে নট্‌নী?

—কিন্তু যদি পারে, তখন?

মহারাণা বললেন—যদি পারে তো তখন দেখা যাবে। এখন মজাটা দেখ না—

ততক্ষণে মহেশ্বরপ্রসাদ ডিম্ ডিম্ করে ঢোলবাজনা শুরু দিয়েছে। নট্‌নী গুরুজীর সামনে এসে প্রণাম করলে। তারপর?

তারপর কাকে উদ্দেশ করে প্রণাম করলে কে জানে! খানিকক্ষণ চুপ করে চোখ দুটো বন্ধ করে রইলো। তুমি নেই এখানে। তবু তুমি আছো চমন! তোমার কথাই আমি সারাক্ষণ ভেবেছি, তা জানো। তুমি নাথদোয়ারে বসে বসে আমাকে আশীর্বাদ করো। জানো, তোমাকে আমি একদিন কত বকেছি। কত অনুযোগ করেছি তুমি আমার দিকে চেয়ে থাকো বলে। আজ তোমার চেয়ে-থাকা চোখ দুটোর কথাই স্মরণ করছি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদ পেলে আমি আর কাউকেই ভয় করি না। কিন্তু কই, তুমি তো সাড়া দিচ্ছো না চমন। আমি তবে কোন্ ভরসায় দড়ির ওপর উঠবো বলো। কে আমাকে পাহারা দেবে! কে আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষে করবে? কই, তুমি সাড়া দিচ্ছো না যে! তোমার সাড়া না পেলে যে আমি উঠতে পারছি না ওই দড়ির ওপর চমন, তুমিই যে আমার সর্বস্ব।

ডাক্তারবাবু থামলেন।

বললাম—তারপর?

—তারপর, জীবনে যা কখনও হয়নি মহেশ্বরপ্রসাদের, তাই-ই হলো। এখানে ভাটেরা এখনও সেইসব গান গায়। ভাট তিলকচাঁদের লেখা সেইসব গান। রঙনা-চমনের গান। আপনি আর কিছুদিন থাকলে একদিন আপনাকে ভাটের গান শুনিয়ে দিতাম। আমাদের বাংলাদেশে যেমন মৈমনসিং-গীতিকাতে মহুয়া-মলয়ের গান আছে, এদের এখানেও সেই রকম রঙনা-চমনের গান আছে। কোনও বইতে লেখা নেই। ভাটেদের মুখে-মুখে চলে শুধু সে-সব গান। আমি শুনেছি। এর পরের বারে যখন আসবেন, তখন শুনিয়ে দেবো!

বললাম—সে যা হোক, তারপর কী হলো। রঙনা নাচতে পারলো?

ডাক্তারবাবু বললেন—শুধু তো নাচা নয়, নেচে ওপার থেকে নাচতে নাচতে সেই দড়িব ওপর দিয়ে এপারে আসতে হবে—

কিষেণগড়ের রাস্তায় তখন শীতকালের মাঝ রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কুকুরটা বাব দুই কেঁউ কেঁউ করে চেঁচিয়ে, তারপর কুণ্ডলীটা আরো পাকিয়ে নিয়ে শোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এবার আর পারলো না। ওপারের চায়ের দোকানটা তখন সবেমাত্র খুলেছে। সেখানে ভোরবেলা থেকে বাসের যাত্রীরা এসে চা খাবে। জয়পুর থেকে যারা প্রথম বাসে আজমীর যাবে, তাদের চা যোগাবে ওই চা-ওয়ালা। তাই ভোর থাকতে উনুনে আগুন দিতে হয় তাকে।

কুকুরটা সেইখানে গিয়ে শুলো, একটু আগুন পোয়াবার আশায়।

কিন্তু দোকানীটা তাড়া করেছে—এই, ভাগ ভাগ—

ডাক্তারবাবু বললেন—কত রাত হলো? আজ তো আপনার আর ঘুম হলো না—

বললাম—তা না হোক, রোজই তো ঘুমোই, একটা রাত না হয় না-ই ঘুমোলাম। তবু তো একটা গল্প শুনতে পেলাম—

ডাক্তারবাবু বললেন—লিখবেন নাকি গল্পটা? যদি লেখেন তো আরো একবার রাজস্থানে এসে ঘুরে যাবেন। তাড়াহুড়ো করে যেন পুজো-সংখ্যার কোনও কাগজে লিখে দেবেন না। ওতে কেবল কোনও রকমে পাতা ভর্তি হয়। ভাটদের কাছ থেকে ছড়াগুলো খাতায় লিখে নেবেন। অনেক ভালো-ভালো ছড়া আছে ওদের—

সে নেবো, আপনি ভাববেন না। কিন্তু তারপর কী হলো বলুন।

ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন—সেও ঠিক এই রকম শীতকাল। নট্‌নী সকলের শেষে একলিঙ্গনাথের উদ্দেশ্যেও প্রণাম করে নিয়ে দড়ির ওপর উঠলো। ওঠাটা কি সহজ? সেই কেল্লার সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে একেবারে চূড়োয় উঠলো। যেখানে উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিং-এর নিশেন ওড়ে, মানে উদয়পুরের স্টেট-ফ্ল্যাগ। সেইখানে নিয়ে গেল রঙনাকে জগমন্ত্‌ সিং-এর লোক।

রঙনা নিচের দিকে চেয়ে দেখলে সব জায়গায় শুধু জল—আর জল কেবল। নিচেয় বৃন্দাবন-প্যালেস আর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় সেই মহারাণার দরবার, কোথায় সেই মহারাণা স্বরূপ সিং, জগমন্ত্‌ সিং, আর কোথায় বা গুরুজী আর তার দলের লোকেরা? শুধু ঢোলকের দুল্‌কি তালটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

—কেন তুমি ওখানে উঠলে রঙনা।

—তুমি কিছু ভেবো না? মহারাণা যে আধখানা উদয়পুর দান করে দেবে!

—তুমি মহারাণাকে চেনো না? মহারাণার কথায় তুমি বিশ্বাস করেছো?

—না না চমন, মহারাণা কি কথার খেলাপ করতে পারে? তাহলে কেন আমি এত ঝুঁকি নিচ্ছি। আমরা তখন খুব আরামে থাকবো চমন। তোমায় কিছু কাজ করতে হবে না। আমি নাচবো আর তুমি বাঁশি বাজাবে!

—কী যে বলো! আমি নাকি আবার বাঁশি বাজাতে পারি!

—খুব পারবে চমন, খুব পারবে! তখন আরো ভালো বাঁশি কিনে দেবো তোমায়।

মহেশ্বরপ্রসাদ তখন প্রাণপণে বোল্‌ তুলছে। দুখহরণ ঢোলকে তাল দিচ্ছে। ডিম্‌-ডিম্‌ করে হাওয়ায় ছন্দ তুলছে উদয়-সাগরের জলের ঢেউতে। ঢেউগুলোও তালে তালে এসে বোল তুলছে বৃন্দাবন-প্যালেসের পাথরের ভিতের ওপর।

স্বরূপ সিং ওপরের দিকে চেয়েছিলেন। সবাই উদ্‌গ্রীব আগ্রহে চেয়েছিল ওপরেব দিকে। রঙনা আস্তে আস্তে দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে আসছে।

এসে পড়লো। আর বেশি দূর নেই।

এইবার? এইবার তো অর্ধেক উদয়পুর দিয়ে দিতে হবে নট্‌নীকে।

মহেশ্বর আরো জোরে জোরে বোল দিতে লাগলো।

দুখহরণকে বললে—জোরসে বাজাও—জোরসে—দুখহরণ আরো জোর বাজাতে লাগলো ঢোলক। উদয়-সাগরের ঢেউগুলো আরো দুলে দুলে আছাড় খেতে লাগলো বৃন্দাবন প্যালেসের পাথরের ভিতের ওপর।

জগমন্ত্‌ আর দেরি করলে না। মুখটা তার কাল হয়ে উঠেছে আতঙ্কে। এখনই যদি নট্‌নীটা দড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছয় তো তখন কী হবে?

মহারাণার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে জগমন্ত্‌ সিং। সে-মুখে কোনও আতঙ্ক নেই, কোনও উদ্বেগ নেই। যেন উল্লাসের উজ্জ্বলতা সমস্ত মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই যে এতবড়

উদয়পুর, এর অর্ধেক যে দান করে দিতে হবে একজন নগণ্য নট্‌নীকে, তার জন্য কোনও দুশ্চিন্তার ছায়াও নেই তার মুখে।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য হবার মত ঘটনাই বটে!! এক অখ্যাত নগণ্য নট্‌নী যে এতবড় একটা দুঃসাহসের কাজে অনায়াসে সাফল্য লাভ করলো, তার জন্যে আশ্চর্য হয়নি জগমন্ত্‌ সিং। আশ্চর্য হয়েছে স্বরূপ সিং-এর অপাত্রে দানের প্রতিশ্রুতি দেখে। অপাত্রই তো বটে। নট্‌নীটা যে অপাত্র তাতে আর জগমন্ত্‌ সিং-এর কোনও সন্দেহ ছিল না।

আর উদয়পুরের অর্ধেক চলে গেলে জগমন্ত্‌ সিং-এর ক্ষমতাও অর্ধেক চলে গেল! অর্ধেক ক্ষমতা মানে অর্ধেক জীবন। ক্ষমতাই তো জীবন। এই এত প্রতিপত্তির শীর্ষে বসে যে ক্ষমতার বড়াই আজ করছে জগমন্ত্‌ সিং, তা আর তখন থাকবে না। অর্ধেক উদয়পুরের লোক জগমন্ত্‌ সিংকে আর সেলাম করবে না, অর্ধেক লোক ভেট্‌ পাঠাবে না। অর্ধেক লোকই যদি তাকে অগ্রাহ্য করে তাহলে তার আর অস্তিত্ব রইলো কোথায়?

হাতের পাশে তরোয়ালটা ছিল, সেটা জোরে টিপে ধরলে। তখনও নট্‌নী আসছে। এসে পড়লো। আর দেরি নেই। আর খানিকক্ষণ পরেই একেবারে হাজির হবে সামনে। এসে দড়ি থেকে নেমে পড়বে আসরের ওপর।

দুখহরণ আরো জোরে ঢোলক বাজিয়ে দিলে।

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। সকলে অবাক হয়ে দেখলে। ব্যাপারটা যেন এক নিমেষে ঘটে গেল। প্রথমে চোখকে বিশ্বাস করা গেল না। সবাই চম্‌কে 'হাঁ' 'হাঁ' করে উঠেছে। কী হলো? কী হলো?

কী যে হলো তা সবাই চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছে তবু বিশ্বাস করতে পারলে না।

বললাম—তারপর?

ডাক্তারবাবু বললেন—কত রাত হলো বলুন তো। তিনটে বেজে গেছে বোধহয়। আজমীরের ট্রেনটা আসছে দেখছি।

বললাম—ওসব কথা থাক, আমার ঘুম পাচ্ছে না। আপনি বলুন, তারপর কী হলো?

ডাক্তাবাবু বলতে লাগলেন—একটা জাত যখন ক্ষেপে যায়, তখন বুঝতে হবে কোথাও সত্যিই একটা অন্যায় ঘটেছে। রাজস্থানের একটা গৌরব, একটা ঐতিহ্য ছিল এককালে। সে ঐতিহ্য বীরত্বের, ত্যাগের। সেই ঐতিহ্যের জন্যেই ইণ্ডিয়ার ইতিহাসে রাজস্থানের অত সুনাম। রাণাপ্রতাপের নাম কে না জানে বলুন?

কিন্তু আবার তারই পাশে আছে মানসিংহ। রাজস্থানের যেসব রাণা স্বার্থের জন্যে মোগল-বাদশাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারা আবার এখানকার কলঙ্ক। তারা রাজস্থানের লোক হলেও রাজস্থানীরা তাদের কথা স্মরণ করে না! এই নট্‌নীরা, যাদের আজকে আমার ডিসপেনসারিতে দেখলেন, ওরা রাণা প্রতাপের নাম করে। রাজস্থানের বীরদের ওরা এখনও পুজো করে। ভাট তিলক-চাঁদের ছড়া গান করে। কিন্তু রাণা মানসিংহের কথা ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা চুপ করে থাকবে।

আমি বললাম—তারপর কী হলো বলুন? ইতিহাসের কথা পরে শুনবো—

ডাক্তারবাবু বললেন—ইতিহাসও তো গল্প। আপনারা যা লেখেন তাও তো ইতিহাস। দু'শো বছরে পরে যখন কেউ এই সময়কার ইতিহাস জানতে চাইবে তখন আপনাদের ওই গল্প-উপন্যাসগুলোই তো পড়বে। তখন বিচার হবে দু'শো বছর আগের মানুষ কী ভাবতো, কী কল্পনা করতো, কী স্বপ্ন দেখতো। আজ যদি স্বরূপ সিং-এর আমলের কোনও উপন্যাস-গল্প পাওয়া যেত তো জানতে পারা যেত কেন সেদিন জগমন্ত্ সিং স্বরূপ সিং-এর মন্ত্রী হয়ে এতবড় বেইমানী করলে।

বললাম-কী ট্রেচারী করলে জগমন্ত্ সিং?

—সেই কথাই তো বলছি। কিন্তু তার আগে চমনের কথা বলে নিই। নাথদোয়ারের একটা মহল্লায় তখন চমন চুপ করে বসেছিল। নট্‌নীর দল সবাই চলে গেছে উদয়পুরে। মহল্লা ফাঁকা। একটা লোক নেই যে তার সঙ্গে কথা বলে চমন।

তবু নিজের মনেই একবার ডাকলে—রঙনা—

—এই তো আমি! তুমি আমার দিকে চাও—

—আমি যে অন্ধ! চাইবো কি করে?

—বাইরের চোখ দুটোই কি বড়? আমি যে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার দিকেই চেয়ে আছো—তুমি দেখতে না পেলে আমি এত উঁচুতে উঠে উদয়-সাগর পার হতে পারছি? তুমিই তো আমায় সাহস দিয়েছো চমন।

—কিন্তু আমার যে ভয় করে!

—ভয় আর কোরো না। আমি থাকতে তোমায় ভয় কীসের? আমি যে তোমার জন্যে ইনাম নিয়ে যাচ্ছি উদয়পুর থেকে। আমি ইনাম নিয়েই যাবো তোমার কাছে। বেশি দেরি করবো না।

ভাট তিলকচাঁদ তার ছড়ায় এই জায়গাটা বেশ করুণ করে লিখে গেছে।

নট্‌নীরা যখন ভাট তিলকচাঁদের ছড়াগুলো গায়, তখন যারা আসরে বসে থাকে, তাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে।

—আমার যে বড় একলা লাগছে।

—একটু একলা একলা লাগা ভালো। আমারও বড় একলা একলা লাগছে।

—তুমি দূরে থাকলে আমার সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—আমারও তো ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

—এবার সেজা হয়ে গেলে তুমি যেখানে যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—তুমি সঙ্গে না এলে আমি আর কোথাও থাকতে পারবো না।

—জানো, তুমি যখন আগে আমার দিকে চেয়ে থাকতে, আমার খুব ভালো লাগতো।

—তাহলে তুমি আমাকে চেয়ে থাকতে বারণ করতে কেন? আমাকে বকতে কেন?

—তোমাকে পরীক্ষা করতাম।

—আমি কিন্তু ভাবতাম, তুমি আমায় মোটে পছন্দ করো না—

—এবার তো বুঝেছো?

—খুব বুঝেছি। বুঝেছি বলেই তো তোমার জন্যে এত ছটফট করি। তোমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারি না।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমন যেন সব দেখতে পেলে। ভয়ে আঁতকে-উঠলো। কই? তুমি কোথায় গেলে? কোথায় তুমি? তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না রঙনা। আমার চোখ কি খারাপ হয়ে গেল? আমি কি আবার অন্ধ হয়ে গেলাম? সব যে অন্ধকার। কোথায় গেলে তুমি? রঙনা—রঙনা—রঙনা—

ঠাকুর-মহল্লায় আশেপাশে যারা ছিল, তারা দুখহরণের ঘরের ভেতর চমনের কান্না শুনতে পেয়েছে। শুধু কান্না নয়, যেন আর্তনাদ! সবাই দৌড়ে এলো। কী হয়েছে চমন? কী হলো রে তোর?

চমনেব সেই আর্তনাদ নাথদোয়ার পেরিয়ে একেবারে উদয়পুরের উদয়-সাগরে এসে হাজির হয়েছিল।

চমনেব আর্তনাদের সঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদের আর্তনাদও সেদিন সচকিত করে দিয়েছিল সমস্ত উদয়-সাগরকে। উদয়-সাগরের চল্‌কে ওঠা জলও যেন একই সুরে আর্তনাদ করে উঠেছিল সেদিন। সেদিন সেই সন্ধের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সকলের আর্তনাদ অশরীরী আত্মা হয়ে সমস্ত উদয়পুরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কিন্তু সেদিন স্বরূপ সিং কি তখনও জানতে পেরেছিল যে তারই একটা কথার জন্যে নট্‌নীদের সম্প্রদায়ে এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে?

সত্যিই সেদিন সে-আসরে যারাই বসেছিল তারা সেই বিপর্যয় দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল কযেক মুহূর্তেব জন্যে!

মহেশ্বরপ্রসাদ চিৎকাব করে উঠলো—এ দুষমণি—এ দুষমণি—

স্বরূপ সিং আত্মসংববণ করে বইলেন খানিকক্ষণ । তারপর জগমন্ত্ সিং-এর দিকে তাকালেন।

জগমন্ত্ সিংকে কাছে ডাকলেন—জগমন্ত্ সিং—

সামনের উদয-সাগরের জলের ওপর তখন ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠছে রাগে অভিমানে ক্ষোভে আর যন্ত্রণায।

ঠিক নাচতে নাচতে এসে যেখানে নট্‌নী জলের ওপর পা ফস্‌কে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে যেন একটা বোবা বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে ঝুলতে লাগলো অকারণে। আর তারপর সব বিপর্যয় জলের লেখায় ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে গিয়ে বিলীয়মান সূর্যের লাল আভায় রক্তাভ-আবরণে ঢেকে গিয়েছিল।

—জগমন্ত্ সিং।

—জী রাণাসাহেব।

—উদয়পুবের অর্ধেক ওই নট্‌নীকেই দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছিলাম। ওর দলিল-দস্তাবেজ তৈরি করো।

—কিন্তু নট্‌নী তো উদয়-সাগর পার হতে পারেনি।

—পারেনি সে তো তোমার জন্যেই জগমন্ত্ সিং।

—কেন রাণাসাহেব, আমি কী করলাম?

—আমি দেখেছি, যখন নটনী দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে এই বৃন্দাবন-পুরীর দিকে আসছিল, তুমি তোমার ভোজালি দিয়ে গোড়াটা কেটে দিয়েছো। দড়ি কেটে না দিলে নট্‌নী ঠিক এ-পারে চলে আসতো—ওদের অর্ধেক উদয়পুর দিতেই হবে, দলিল বানাও এখনি—

কিন্তু ওদিকে নট্‌নীর দল তখন সবাই রঙনাকে খুঁজছে। বিরাট পরিধি উদয়-সাগরের। কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? জলের স্রোতের তলায় তলিয়ে তখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সারা রাত সন্ধান চললো সেদিন। ভোরেও সন্ধান চললো। উদয়পুরের স্বরূপ সিং-এর হুকুমে রাজার ডুবুরিরা নামলো জলে। তারাও খুঁজলো। শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে উদয়-সাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে দেখা গেল রঙনার নিষ্প্রাণ দেহটা পাথরের শ্যাওলাতে গা এলিয়ে দিয়ে ঝুলছে।

দলবল নিয়ে মহেশ্বরপ্রসাদ চলে যাবার চেষ্টা করছে। সব শেষ। সব নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের। সেই সর্বস্বটুকুকে চিরকালের মত খুইয়ে তারা চলে যাচ্ছে উদয়পুরের অতিথিশালা থেকে।

হঠাৎ হুকুম এলো রাজ-দরবার থেকে। মহারাণা তলব দিয়েছেন মহেশ্বরপ্রসাদকে।

—কেন? আবার তলব কেন?

—স্বরূপ সিংজী একটা দলিল দেবেন মহেশ্বরপ্রসাদকে।

—কিসের দলিল?

—তা জানি না। আপ্ চলিয়ে।

মহেশ্বরপ্রসাদ যখন স্বরূপ সিং-এর দরবারে পৌঁছুল, তখন সব তৈরি। দলিল-দস্তাবেজ সীলমোহর করা হয়ে গেছে। নিজের হাতেই সই করে দিয়েছে মহারাণা স্বরূপ সিং। আমি অর্ধেক উদয়পুর পরলোকগতা নট্‌নী রঙনার উত্তরাধিকারীবর্গকে বংশপরম্পরায় ভোগ-দখল করিবার অধিকার দিলাম। ইত্যাদি......

—এইটে তুমি নাও মহেশ্বরপ্রসাদ। তোমার মেয়ের মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। কিন্তু তবু আমার জবান্ আমি রাখছি। জগমন্ত্ সিং আমার মন্ত্রী, সে দড়ি কেটে না দিলে তোমার মেয়ে ঠিক এপারে এসে পৌঁছোতে পারতো।

মহেশ্বরপ্রসাদ রাগে মনের মধ্যে গজরাতে লাগলো। বাইরে কিছু প্রকাশ করলে না।

স্বরূপ সিং আবার বললেন—নাও, এ দলিল নাও—

মহেশ্বরপ্রসাদ এবার হঠাৎ ফেটে পড়লো যেন।

বললে—না—

স্বরূপ সিং বললেন—কেন, নেবে না কেন? আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই দিচ্ছি—

মহেশ্বরপ্রসাদ পাথরের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—না, আমরা বেইমানের দান নিই না—

—বেইমানের দান? বলছো কী তুমি? আমি বেইমান?

মহেশ্বরপ্রসাদের সাহসেরও বলিহারি।

বললে—বেইমানের শুধু দানই নেবো না তা নয়, বেইমানের জলও খাবো না আমরা। যতদিন একজন নট্‌নীও বেঁচে থাকবে, ততদিন উদয়পুরের চৌহদ্দির মধ্যে কেউ আসবে না। উদয়পুরের জল,উদয়পুরের হাওয়া নট্‌নীদের কাছে বিষ বলে জ্ঞান করবে।

বলে আর দাঁড়ালো না মহেশ্বরপ্রসাদ। দলবল নিয়ে উদয়পুর ছেড়ে সেই দিনই চলে গেল। স্বরূপ সিং কথাগুলো শুনলেন শুধু কান পেতে। কোনও প্রতিবাদের ভাষা আর তাঁর মুখ থেকে বেরোয়নি সেদিন।

ভাট তিলকচাঁদের গানে সেই রকমই লেখা আছে।

বললাম—তারপর?

ডাক্তারবাবু বললেন—সেই তিনশো বছর আগেকার এই ঘটনা এখনকার নট্‌নীরা আজও গান গেয়ে গেয়ে শোনায় সকলকে। সেই যে তারা সেদিন উদয়পুর ছেড়ে চলে এসেছে, আর ফিরে যায়নি। স্বরূপ সিং-এর পর কত রাণা এসেছে গেছে, কিন্তু কেউই আর নট্‌নীদের এই সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি, কত বড় বড় শেঠজী এদের নিয়ে কত জায়গায় যায়। দিল্লি যায়, বোম্বাই যায়, প্যারিস, আমেরিকায় নিয়ে যায় স্ফূর্তি করবার জন্যে। সব জায়গাতেই তারা যায় সঙ্গে। কিন্তু লাখ লাখ টাকার লোভ দেখালেও উদয়পুরে যাবে না। সেই যে একদিন বেইমানি করে একজন নট্‌নীকে মেরে ফেলা হয়েছিল, সেই বেইমানির কথা ওরা এখনও ভুলতে পারেনি!

কিন্তু এখন আর উদয়পুর সে উদয়পুর নেই। এখন নেটিভ্‌ স্টেটের রাজাদের স্টেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এখন তাদের 'প্রিভিপার্স' থেকে সামান্য কিছু মাসোহারা দেওয়া হয়। এখন উদয়পুরের মহারাণা বৃন্দাবন প্যালেসটাকে হোটেল করে দিয়েছে। দিনে দু'শো তিনশো টাকা চার্জ দিয়ে যারা থাকতে পারে, তারাই সেই হোটেলে ওঠে।

এই সেদিন কুইন্‌ এলিজাবেথ এসেছিল, গ্রীসের রানী এসেছিল। সবাই উঠেছিল ওই প্যালেসে। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট-এর গেস্ট ছিল ওরা। কিন্তু ওরাও শুনেছে মাঝরাত্রে উদয়-সাগরের বুক থেকে যেন হু-হু করা কি-রকম একটা আর্তনাদ কানে আসে। কে আর্তনাদ করে, কে অমন করে কাঁদে, তা কেউ জানে না। কেউ বুঝতে পারে না।

কিন্তু ভাট তিলকচাঁদ লিখে গেছে চমনের অশরীরী আত্মা ওই উদয়সাগরের চারপাশে নাকি কেবল ঘুরে বেড়ায়। সে একদিন অসহায় হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। অন্ধ মানুষ। কিন্তু কোথায় যে সে গিয়েছিল, কী হয়েছিল তার, তার আর কোনও খোঁজ কেউ পায়নি। উদয়-সাগরের বুকের ওপর মাঝরাত্রের ওই শব্দটা শুনে অনেকে কল্পনা করে নেয়, ও চমন। ও চমনেরই আত্মা। চমনের আত্মাই ওই উদয়-সাগরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে রঙনাকে খোঁজে। কিন্তু খোঁজ পায় না। আর পায় না বলেই হাহাকার করে ওঠে। তার সেই আর্তনাদ হাহাকার হয়ে তাই উদয়-সাগরকে তোলপাড় করে তোলে মাঝরাত্রের অন্ধকারে।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু খেয়াল হলো যেন। বললেন—ইস্‌, একেবারে ভোর হয়ে গেছে। কিন্তু খেয়ালই ছিল না। ওই দেখুন, আজমীরের এক্সপ্রেসটা যাচ্ছে—

আমি কিন্তু তখনও সেই নট্‌নীর গল্পটাতেই মশগুল হয়ে আছি।

তোমরা দু'জন মিলে

এও এক রাণীর কাহিনী। কিন্তু এ এক অন্য ধরনের রাণী।

এ আমি কার কাহিনী লিখতে বসেছি? অটলদার, ইন্দুলেখার না কুন্তি দেবীর? ভুল সব মানুষই করে। কিন্তু সেই ভুলের খেসারত এমন মর্মান্তিকভাবে ক'জন দিতে পারে অটলদার মত। অটলদার ছিল না কী? বিদ্যা ছিল, স্বাস্থ্য ছিল। অন্য সব সাধারণ মানুষের যা থাকে — তাই-ই ছিল। কিন্তু তবু কোন ভুলের জন্যে সবকিছু গুণ ব্যর্থ হলো এমন করুণভাবে। আর ইন্দুলেখা দেবী?

স্ত্রী অনেকেরই থাকে। আবার অনেকেরই থাকে না। কিন্তু এমন স্ত্রীই-বা ক'জন পায় অটলদার মত। কারো স্ত্রী স্বামীর প্রতিভাকে সম্মান করে। কারো স্ত্রী স্বামীর সংসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ স্বামীর সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা দিয়ে আড়াল করে, কেউ অবহেলা দিয়ে স্বামীকে পীড়ন করে। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কত জটিল উপন্যাসই লেখা হয়েছে। কিন্তু এমন কাহিনীই-বা ক'টা উপন্যাসে পাওয়া যায়? আর ইন্দুলেখা দেবীর মত এমন স্ত্রীই-বা ক'জন স্বামী পায়? আবার এমন স্ত্রী পেয়ে এমনভাবে অবহেলাই-বা করে ক'জন স্বামী?

তাই বলছিলাম, এ আমি কার কাহিনী বলতে বসেছি? অটলদার, ইন্দুলেখার না কুন্তি দেবীর।

মনে পড়ে—বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।

যখন থেকে ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছি তখন বেশ বয়েস হয়েছে। কিন্তু তার আগে? তার আগেকার জীবনটা মনে করতে গিয়ে অনেক সময় হাঁপিয়ে উঠি। হঠাৎ কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে মুস্কিলে পড়ি। কী যেন নাম, কী যেন পরিচয়! কোথায় যেন দেখেছি, চেনা-চেনা মুখ—আর কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু শুধু এইটুকু মনে আছে যে, বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী কোনদিন বাদামতলায় থাকতেন?

মহিলাটি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন প্রশ্নটা শুনে।

এক-একজন ক'রে আসছিলেন আর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যথারীতি চলে যাচ্ছিলেন। গার্ল-স্কুলের টিচার-সিলেক্‌শান চলছিল। অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছিল। বি-এ পাস করা সবাই। সবাই কিছু কিছু অন্য স্কুলে পড়িয়েছেন। এক-এক করে সবাইকে পরীক্ষা করার ভার পড়েছিল আমার ওপর। স্থায়ী সেক্রেটারী ভুবনবাবু ছুটিতে। যাবার আগেই বলেছিলেন, দেখবেন, ম্যারেড-টিচারকেই প্রেফারেন্সটা দেবেন, মানে, আন্‌-ম্যারেডরা আবার কাজকর্ম শিখে শেষে বিয়ে ক'রে চাকরি ছেড়ে দেয় কি না।

স্কুলের কমিটিরও তাই মত। আমি নতুন পাড়ায় বাড়ি ক'রে উঠে এসেছি। ভুবনবাবু আমার পুরনো বন্ধু। কমিটির মেম্বাররা সবাই খাতা-পত্র দরখাস্তগুলো দিয়ে বলেছিলেন, পনেরো জন ক্যাণ্ডিডেট, এঁদের মধ্যে একজনকে আপনি বেছে নেবেন।

বললাম, শেষকালে আমাকে এই ভার দিচ্ছেন—আপনারা কেউ একজন থাকলে হতো সঙ্গে?

শেষ পর্যন্ত একলাই আমাকে থাকতে হলো। ভুবনবাবুই স্কুল, ভুবনবাবুই সর্বেসর্বা। তিনিই মোটা টাকা দিয়ে স্কুল করেছেন—বলতে গেলে তাঁর একলারই স্কুল।

ভুবনবাবু বললেন, আপনি এ-পাড়ার লোকদের চেনেন না মশাই, এখানে ভীষণ দলাদলি।

যাহোক্, পরীক্ষার দিন একলাই সকলকে ইন্টারভিউ দিচ্ছি। ভুবনবাবুর স্বর্গীয় স্ত্রী উর্ম্মিলা দেবীর নামে স্কুলটা। পঁচাত্তর টাকা বেসিক মাইনে, বছরে তিন টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট, বেড়ে-বেড়ে দশ বছরে একশো পাঁচে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর কোয়ার্টার্স ফ্রি, দৈনিক আট আনা টিফিন। পূজোর সময় সমস্ত টিচারদের পঞ্চাশ টাকা পুজা গিফ্‌ট। অনেকরকম সুযোগ-সুবিধে উর্ম্মিলা বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরিতে। সবই ভুবনবাবুর দান। ইউনিভার্সিটির গ্র্যান্টের তোয়াক্কা করেন না। যত টাকা ঘাটতি পড়ে তিনিই পকেট থেকে দিয়ে দেন।

আমাকে ভুবনবাবু বলেছিলেন, এ এক অদ্ভুত পাড়া মশাই, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, আপনি নতুন এসেছেন, ক্রমে-ক্রমে সব দেখতে পাবেন —

কুমারী সুলতা হাজরা, কুমারী সুবর্ণা সেন, কুমারী অর্চনা সেনগুপ্তা...

—আপনার নাম?

—শ্রীমতী ইন্দুলেখা দেবী।

মুখ তুলে চাইলাম। ক্যাণ্ডিডেটদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিতা মেয়ে। বেশ বয়েস হয়েছে। মোটা-সোটা চেহারা। চশমা রয়েছে চোখে। ভারী গম্ভীর মুখ। মুখের দিকে চাইলে ভক্তিও হয়, ভয়ও হয়। দেখলেই মেয়েরা সমীহ করবে এমন চেহারা! ভুবনবাবুও ব'লে গিয়েছিলেন ম্যারেড-ক্যাণ্ডিডেট নিতে।

বললাম, আপনার ছেলে-মেয়ে?...

ইন্দুলেখা দেবী বললেন, আমার ছেলেমেয়ে নেই।

—স্বামী কি করেন?

—আমার স্বামী নেই।

চম্‌কে উঠলাম। চম্‌কে উঠে মহিলাটির মুখের দিকে আবার ভালো ক'রে তাকালাম। তবে কী ভুল দেখছি? সিঁথিতে তো সিঁদুর রয়েছে ঠিকই। সিঁথিটা কপালের মধ্যখানে দু-ভাগে ভাগ করা—একটু যেন ঘোমটাও রয়েছে। বিয়ের সব লক্ষণই তো রয়েছে আমি যেন নির্বোধের মত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম মহিলাটির দিকে। কিন্তু সে খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরেই সামলে নিলাম নিজেকে। উর্মিলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নির্বাচনের ভারই শুধু আমার ওপর। আমি তো বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করতে এখানে আসিনি। এর বেশি জানবার আগ্রহ হওয়াও আমার অন্যায়। এর বেশি জিজ্ঞেস করাও আমার পক্ষে অসঙ্গত।

আরো যেন কী-কী জিজ্ঞেস করার ছিল। সব যেন গোলমাল হয়ে গেল আমার। বেশ মুস্কিলে প'ড়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে। এই সামান্য ব্যাপারটার মধ্যেও যে এত সমস্যা থাকতে পারে, কে জানতো! গল্প লিখে, উপন্যাস লিখে বেশ তো অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেছি। কল্পনায় অনেক জটিল জীবনের জট ছাড়িয়েছি। কিন্তু এমন হবে তা-তো জানা ছিল না। দরজা বন্ধ ক'রে নিজের চেয়ার-টেবিলে বসে কলম চালিয়ে খ্যাতিও হয়েছে খুব। সবাই জানে, আমি লোক-চরিত্র বুঝি। বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোকের চরিত্র! তা'হলে সিঁদুর থাকলেও স্বামী না থাকার রহস্য কী? তবে কী এঁর স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে?

মহিলাটির মুখের দিকে মুখ না তুলেই বললাম, আপনি বসুন।

গল্প লেখার অনেক সুবিধে আছে। সেখানে কলম বন্ধ ক'রে ভাবা যায়, ভুল লাইনগুলো কাটাকুটি করা যায়। বেঠিক কথাগুলো নতুন ক'রে লেখা যায়। অনেক সময় পাওয়া যায় হাতে।

কিন্তু মহিলাটি নিজে থেকেই বললেন, আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করেছি।

স্বামীকে ত্যাগ করেছি! কেমন যেন উল্টো কথা। স্ত্রীর কখনও স্বামীকে ত্যাগ করে নাকি? স্বামীই তো ত্যাগ করে স্ত্রীকে! কিন্তু ইন্দুলেখা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে আমার যেন কেমন মনে হলো—আমি তাঁকে চিনি! কী যেন নাম কী যেন পরিচয়—কোথায় যেন দেখেছি—বড় চেনা-

চেনা মুখ—আর কিছু মনে পড়ে না। যেন অনেক দিন আগেকার দেখা মুখখানা। অনেকদিন আগেকার। তখন হয়তো ডায়েরি লিখতাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কোনোদিন বাদামতলায় থাকতেন?

ইন্দুলেখা দেবী আমার দিকে চেয়ে কী যেন বলতে গিয়ে দ্বিধা করতে লাগলেন।

বললাম, আমি বাদামতলাতেই ছিলাম, ছেলেবেলা আমার ওখানেই কেটেছে—ওটাই আমার জন্মস্থান।

ইন্দুলেখা দেবী বললেন, তা'হলে আপনি ওদের নিশ্চয়ই চেনেন? আমার স্বামীর নাম...

আর বলতে হলো না। এক নিমেষে যেন স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ ক'রে এলাম। অটলদা, অটলদার বাবা, অটলদার মা। অটলদার মায়ের সে কি কান্না! পাড়ার সমস্ত লোকজন তখন জড়ো হয়েছে, শাঁখ বাজছে, নহবৎ, বাজছে, বেলফুলের মালা আস্তিনে জড়িয়ে বরযাত্রীরা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। সিগ্রেট খাচ্ছে, সরবৎ খাচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ সব গোলমাল থেমে গেল।

ভুবনবাবু ছুটি থেকে ফিরলেন একদিন।

বললেন, কী হলো মশাই? ঠিক করতে পারলেন কিছু?

বললাম, না, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভুবনবাবু বললেন, এতে আব ঠিক করাকরির কী আছে, যাকে হোক একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়ে দিন না। লোকের মখ দেখে চরিত্র বুঝতে পাববেন বলেই তো আঁপনাকে কাজটা দিয়েছিলাম।

বললাম, আমায় মাফ করবেন ভুবনবাবু, আমি হেরে গেছি—আমার গর্ব চুরমার হয়ে গেছে!

—কেন?

ভুবনবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে।

বললেন, কেন? হেরে যাবার কী আছে? গর্ব চুরমার হয়ে যাবার কী আছে?

বললাম, আছে ভুবনবাবু, আছে। আপনারা মনে করেন, সাহিত্যিক হলেই তারা লোক চিনতে পারে, ভুল ধারণা আপনাদের। বানিয়ে-বানিয়ে আমরা গল্পই লিখতে পারি। সেটা চেষ্টা করলে আপনারাও লিখতে পারেন, আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। একজনকে বেছেছিলাম, বি-এ পাশ, ছেলে-মেয়ে নেই—কিন্তু স্বামীকে সে ত্যাগ করেছে। রাখবেন আপনারা তেমন টিচার? বলুন?

স্বামীকে ত্যাগ করেছে?

ভুবনবাবু এত বছর স্কুল চালিয়ে আসছেন। বয়েসও হয়েছে তাঁর। অনেক দেখেছেন। অনেক দেশেও ঘুরেছেন। বহু লোক তাঁকে ঠকিয়েছে, তিনি শিখেছেনও প্রচুর। তাঁর মত লোকও দ্বিধা করলেন।

বললাম, আপনি বরং ভাবুন ক'দিন—কিংবা কমিটির মেম্বারদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

জানতাম কমিটি-টমিটি কিছুই নয়, ভুবনবাবু নিজেই সব। তবু কমিটির নাম করলাম।

ভুবনবাবু বললেন, সে যা করবার আমিই করবো, আপনি তো আর ভালো ক'রে চেনেন না সকলকে।

বললাম, কিন্তু শেষকালে কোনও দোষ হ'লে যেন আমাকে দুষবেন না।

ভুবনবাবু বললেন, সে তো না-হয় দোষ দেবো না, কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করলো কেন?

বললাম, নিশ্চয়ই স্বামীর কোনও দোষ ছিল বৈকি?

—আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন নাকি?

বললাম, তাই কী কখনও জিজ্ঞেস করা যায়!

কিন্তু ভুবনবাবু তো জানতেন না যে আমার সে-কথা জিজ্ঞেস করার দরকার হয়নি। আমি সবই জানতাম। তখন ডায়েরি লিখতাম না, তাই শুধু সঠিক সময় ও তারিখ জানা ছিল না। নইলে সবই তো মনে প'ড়ে গিয়েছিল।

মনে ছিল সেটা শীতকালের রাত। বোধহয় মাঘ মাসেই বিয়ে হচ্ছিল অটলদার। অটলবিহারী বসু। আমরা তখন কে-না চিনতাম। বাদামতলায় সব লোক চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতো—দেখ-দেখ, ছেলে তো নয়, হীরে!

সেই অটলদার বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।

অটলদা ছিল আমাদের ক্লাবের মাথা। শুধু ক্লাবেরই মাথা কেন, পাড়ারও আইডিয়াল! ঠিক আমাদের সমগোত্রের মধ্যে পড়তো না অটলদা। হাতে সব সময় দেখতাম মোটা-মোটা ইংরেজী বই। ছোট বেলায় সে-সব বই-এর নাম দেখেও কিছুই বুঝতে পারতাম না। খেলার মাঠে একবার দেখা দিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে যান। বাদামতলা তখন বেশ পেছনে প'ড়ে থাকার জায়গা। সেই অটলদাকে যদি কখনও জিজ্ঞেস করতাম—আজকে খেলবে না অটলদা?

অটলদা বলতো—না রে, আজকে একটু ভবানীপুরে যেতে হবে।

হেড-মাস্টার ছিলেন সুরেশবাবু। ভারী কড়া লোক। খদ্দর পরতেন। খদ্দরের চাদর পরতেন গায়ে। দেখলে আমাদের ভয়-ভয় করতো। কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও অটলদা এসে পড়তো স্কুলে, দেখতাম নির্ভয়ে ঢুকে পড়েছে হেড-মাস্টারের ঘরে। বাইরে থেকে শুনতে পেতাম অটলদার গলা। বড় গম্ভীর ভারী গলা ছিল অটলদার। অথচ ভারী মিষ্টি। হেড-মাস্টারও যেন স্নেহ ক'রে কথা বলতেন অটলদার সঙ্গে। কী কাজে যে আসতো অটলদা তা জানি না। আর শুধু কী স্কুলে হেডমাস্টারের কাছে? পাড়ায় দরিদ্র ভাণ্ডার ছিল। অটলদাই ছিল দরিদ্র ভাণ্ডারের পাণ্ডা। অটলদার চেষ্টাতেই দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা। পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে চাল ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আসতাম আমরা। এনে জড়ো করতাম দরিদ্র ভাণ্ডারের অফিসে। অটলদার ক্লান্তি ছিল না—শ্রান্তি ছিল না। আমাদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে চাল ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আসতো! চালই শুধু নয়, কাপড়, পয়সা সবই জড়ো হতো। সেই চাল বিলানো হতো বাদামতলার দুঃখী গরীব লোকদের মধ্যে। চুপি-চুপি তাদের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতে হতো যাতে কেউ লজ্জায় না পড়ে।

সেবার আই-এ পরীক্ষার খবর বেরোলো।

বাদামতলার লোক শুনতে পেল—অটলদা বাদামতলা থেকে একমাত্র ছেলে যে স্কলারশিপ্ পেয়েছে।

আমরা সবাই অটলদার বাড়ীতে গেলাম। অটলদা স্কলারশিপ পেয়েছে, সে তো একরকম আমাদের পাওয়াই হলো। অটলদা তো বাদামতলারই গৌরব। অটলদা সমস্ত বাদামতলার ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বাদামতলার স্কুল থেকে সেই-ই প্রথম স্কলারশিপ্ পাওয়া। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে শুনলাম—অটলদা নেই।

অটলদার বাবা আশুবাবু বললেন, কাল রাত্তির থেকে সে বাড়ী আসেনি।

অটলদা বাড়ী আসেনি! আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। অটলদা সারারাত্রি কোথায় থাকে। অটলদা কী রাত্রেও বাড়ীর বাইরে থাকে নাকি?

পরদিন ক্লাবে অটলদা এল। মুখ-চোখ ঢোকা। চুল উস্কোখুস্কো। যথারীতি ক্লাবে এসেই খেলার মাঠের জন্যে তৈরী হচ্ছিল। সবাই জড়ো হলাম অটলদার সামনে। অটলদা স্কলারশিপ পেয়েছে এ তো সামান্য কথা নয়! বাদামতলার ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। সেই অটলদাকে চোখের সামনে দেখছি এ আমাদের কতখানি সৌভাগ্য!

অটলদা নিজে থেকেই বললে, কী রে, কী দেখছিস অমন হাঁ ক'রে?

এতক্ষণ বলতে বাধা হচ্ছিল। কিন্তু আর সামলাতে পারলাম না।

বললাম, তুমি কাল বাড়ি ছিলে না অটলদা?

অটলদা বললে, হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেল কিনা, ভাই বাড়ি ফিরতে পারলাম না।

—আমরা রাত্তিরবেলা আবার গিয়েছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

অটলদা বললে, ভবানীপুরে।

তবু যেন আমাদের কৌতূহল মিটল না। কিন্তু সাহস ক'রে আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, ভবানীপুরে কোথায় যায় অটলদা? ভবানীপুরের কোন্ পাড়ায়? কী এমন কাজ অটলদার সেখানে যে কাজ করতে করতে বেশী রাত হয়ে যায়, আর দেরী হয়ে গেলে বাড়ি আসা যায় না? অটলদা এত বড় আদর্শের ছেলে যে তাকে নিয়ে কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার কল্পনা করতে আমাদের আটকাতো। অটলদা আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। অটলদা বাদামতলা স্কুলের মুখোজ্জ্বলকারী ছাত্র—অটলদা বাদামতলাব গৌরব। আমরা জানতাম যে সেই অটলদা কখনও কোনো অন্যায় করতে পারে না। আমার সঙ্গে অটলদার বয়েসের বেশি পার্থক্য ছিল না। হয়তো দু'-এক বছরের বড়ই মাত্র। কিন্তু অটলদার ব্যক্তিত্ব ছিল আকাশচুম্বী। অটলদার বয়েসটা ছিল গৌণ—অটলদার ব্যক্তিত্ব যেন সকলকে ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে গিয়ে ঠেকতো।

কিছুদিন পরে টের পেলাম অটলদা ভবানীপুরে যায় কেন। কেন এক-একদিন রাত হয়ে যায় সেখান থেকে ফিরতে। সেখানে সেই ভবানীপুরেই অটলদা একটা ক্লাব করেছে। যত গরীব-দুঃখী তাদের পড়ায় সেখানে। সেখানে তাদের জন্যে একটা নাইট-স্কুল করেছে অটলদা! তাদেরই বুঝি কার একজনের কলেরা হয়েছিল—দু'দিন দু'রাত সেই কলেরা রুগী ছেলেটারই সেবা করেছে। কিন্তু বাঁচাতে পারে নি!

অটলদার দিকে সেদিনও চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। কী ছেলে, নিঃশব্দে কতদিকে দেখছে অটলদা। নীরবে কত সেবা ক'রে যাচ্ছে। প্রশংসা চায় না, প্রচার চায় না। কথাটা আমাদের মুখে মুখে অনেকের কানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো চেয়ে চেয়ে।

অটলদা হঠাৎ সকলের মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

বললে, কী রে, কী দেখছিস অমন ক'রে?

অটলদার বাবা আশুবাবুর তেমন পয়সা-কড়ি ছিল না। ছোট গলিতে সরু রাস্তার ধারে ভাঙা একটি বাড়ি। বাইরে ইঁটের দেওয়ালে বালি খ'সে-খ'সে পড়ছে। সেই জীর্ণ বাড়িখানা ছিল আমাদের কাছে তীর্থস্থান। সেই ঘরখানাতেই ছিল অটলদার আসন। সেখানেই একটা উঁচু তক্তপোষের ওপর একটা মাদুর পাতা থাকতো। আর চারপাশে বই! কেরোসিন কাঠের সস্তা শেল্‌ফে সাজানো বই সব। পরে যে-সব বড-বড় লেখকের বই পড়েছি, তাঁদের নাম প্রথম শুনি অটলদার মুখে। নুট-হামসুন, ইব্‌সেন, বার্ণাড শ', আলডাস হাক্সলির নাম অটলদার মুখেই প্রথম শুনি। বইগুলো নাড়াচাড়া ক'রে দেখেছি—সে-সব বড় বড় কথা, তখন দু-একটা লাইন প'ড়ে তার কিছুই মানে বুঝতে পারিনি। অটলদা সব বুঝতে পারতো। মনে হতো, আমাদের বাদামতলা স্কুলের হেড্-মাস্টার সুরেশবাবুও যা না বুঝতে পারতেন, তাও বুঝি বুঝতে পারতো অটলদা। দেয়ালে কত রকম চার্ট! কড়িকাঠ থেকে ঝুলতো রিং। এই রিং ধ'রে শরীরচর্চা করতো অটলদা। ভোরবেলা উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করতো। তারপর খানিকক্ষণ ধ্যান করতো।

অটলদা আমাদেরও ধ্যান করতে বলতো।

আমরা বলতাম—ধ্যান যে করবো, মন্তর জানি না যে।

অটলদা হাসতো।

বলতো—ধ্যান করতে মন্তর দরকার হয়, কে বললে?

বলতাম—তা'হলে কী ব'লে ধ্যান করবো?

অটলদা বলতো—দেয়ালে একটা দাগ দিবি, পেন্সিলের গোল দাগ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবি, চোখের পলক ফেলবি না—এই দ্যাখ্ এমনি ক'রে—

ব'লে অটলদা তক্তপোষের ওপরে পাতা মাদুরের ওপর পদ্মাসন ক'রে বসতো। তারপরে দেয়ালে একটা পিচ-বোর্ডে লাল বিন্দু আঁকা ছিল, সেই দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর বললে, প্রথম-প্রথম এমনি পাঁচ-সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড ধ'রে চেয়ে থাকবি। তারপর এক-মিনিট, দু-মিনিট ক'রে বাড়াবি—অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কষ্ট হবে না।

বললাম, তুমি কতক্ষণ চেয়ে থাকো অটলদা?

অটলদা বললে, আমি কি তেমন করতে পারি, এখনও আমাকে অনেকদিন ধ'রে প্র্যাক্‌টিশ করতে হবে। ভারী শক্ত জিনিস!

বললাম, এ করলে কী হবে?

অটলদা বললে, এতে মনের একাগ্রতার ক্ষমতা বাড়বে, উইল পাওয়ার বাড়বে। শেষে এমন হবে, চার-পাঁচদিন না-খেয়ে থাকতে পারবি, সমুদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারবি।

—তুমি পারো অটলদা?

অটলদা হাসতো।

বলতো—দূর, অত সোজা নাকি? এ কি একদিনে হয়? কত বছর ধ'রে সাধনা করলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়। একবার সিদ্ধি হ'লে দেখবি—একখানা মোটা বই একবার পড়লে মুখস্থ হয়ে যাবে। তখন দেখবি—চোখ দিয়ে জ্যোতি বেরোচ্ছে তোর, তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না—তুই যাকে-তাকে দিয়ে যা খুশী করাতে পারবি। এই করেই আমি ফার্স্ট হই একজামিনে। আমি তো পড়ি না বেশি, অন্য ছেলেরা পঞ্চাশবার পড়লে যা হয়, আমি একবার পড়লেই সেই কাজ হয়ে যায়।

বললাম, আমিও তোমার মত করবো অটলদা।

অটলদা বললে, কিন্তু তা করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। ব্রহ্মচর্য পালন না করলে কিছু হবে না, বরং উল্টো ফল হবে।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, উল্টো ফল হবে?

—হ্যাঁ, ব্রহ্মচর্য পালন না ক'রে ধ্যান-ট্যান করলেই হার্টফেল করবি।

অটলদার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম।

অটলদা আবার বলতে লাগলো—একেবারে মারা যাবি। কত লোক এ করতে গিয়ে মারা গেছে একেবারে, কিম্বা প্যারালিসিস হয়ে চিরজীবনের মত ইন্‌ভ্যালিড্ হয়ে গেছে।

বললাম, ব্রহ্মচর্য কী-রকম ক'রে করতে হবে?

অটলদা বলতো, মেয়েমানুষের দিকে একেবারে মুখ তুলে চাইবি না। সমস্ত মেয়ে-জাতটাকে মায়ের জাত মনে করবি—তোকে একটা বই দেবো পড়তে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়েই তো আমি শিখেছি রে! অদ্ভুত লোক ওই একটা। একখানা বই একবার চোখ বুলোলেই সব মুখস্থ হয়ে যেত তাঁর, জানিস্—তিনি কোনো থিয়েটারের বাড়ীর ফুটপাত দিয়ে পর্যন্ত হাঁটতেন না।

বললাম, কেন?

—ওই যে থিয়েটারের মধ্যে যত খারাপ মেয়েমানুষের আড্ডা।

অটলদার ঘরে ব'সে থাকতে থাকতে অনেকদিন নিজেকে যেন কেমন ছোট মনে হয়েছে। কেবল মনে হয়েছে কেমন ক'রে অটলদার মত লেখাপড়ায়, স্বভাবে-চরিত্রে আদর্শ হবো। সে সব একদিন গেছে আমাদের। আমাদের ক্লাবের সব ছেলেদের এইরকম আশা ছিল। সবাই অটলদা হবো। আমরা সবাই অটলদার মত ক'রে চুল ছাঁটতাম, অটলদার মতন ক'রে ধুতি-শার্ট পরতাম। নিজের পড়বার ঘরটাকে অটলদার ঘরের মতন করে সাজাতাম। সেই নুট-হামসুনের বই, আলডাস-হাক্সলির বই, ইবসেনের বই, বার্নাড শ'র বই কিনে সাজাতাম। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-লেকচারের বই পড়তাম, ব্রহ্মচর্য পড়তাম। তখন বুঝেছিলাম ব্রহ্মচর্য কী কঠোর সাধনার জিনিস।

অটলদা বলতো, মনে খারাপ চিন্তা এলেই তোর মায়ের কথা ভাববি।

আরো বলতো শরীরটা ঠিক রাখবি, দেখবি শরীরটা যদি ঠিক থাকে তো, মনটা কখনো বেঠিক থাকতে পারে না।

এক-একদিন ভোরবেলা রাত থেকে উঠে বেড়াতে যাবার আগে অটলদাকে ডাকতে গেছি। ভেবেছি অটলদা হয়তো তখনও ঘুমোচ্ছে। শীতকাল। আলোয়ান মুড়ি দিয়ে নাক-কান ঢেকে বেরিয়েছি। কিন্তু অটলদার বাড়ীর সামনে গিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি, অটলদা ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিয়েছে। সেই শীতে দাড়ি কামানো, স্নান করা সব শেষ ক'রে ফেলেছে। বোধহয় ধ্যান-জপ-তপ সব শেষ হয়ে গেছে। হ্যারিকেন জ্বেলে একটা বই নিয়ে পড়তে বসেছে একমনে। মনে আছে, আমরা কোনোদিন অটলদাকে ভোরবেলা ওঠা নিয়েও হারাতে পারিনি।

সেই অটলদাই পরে আরো বড় হলো। কলেজের একজামিনে প্রথম হলো। আমরা তখন অটলদার দেখা পেতাম কম। বাদামতলা ছাড়িয়ে অটলদার কাজের ক্ষেত্র আরো অনেকদূর ছড়িয়ে পড়লো। কখন কলেজে যায়, কখন আসে টেরই পাই না। কলেজের ছুটির পর বাড়ি ফিরে আমাদের ক্লাবে রোজ আসতেও পারে না। বাড়িতেও আসতে পারে না সময়মত।

জিজ্ঞেস করি, কোথায় ছিলে কাল অটলদা?

অটলদা বলে, একটা মিটিং ছিল।

রোজই একটা-না একটা মিটিং থাকে অটলদার। রোজই প্রায় কাজ থাকে। কত কাজের মানুষ অটলদা তার তো শুধু আমাদের ক্লাব নিয়ে প'ড়ে থাকলে চলবে না।

অটলদা বলতো, আমি আসতে পারি না ব'লে তোদের কাজ যেন বন্ধ না হয়—কাজ ঠিকমত চালিয়ে যা তোরা।

কাজ আমাদের ঠিকই চলতো। আমাদের কাজ মানেই তো অটলদার কাজ।

অটলদা কখনও হঠাৎ এসে হাজির হতো। আবার কয়েকদিন তার দেখা পাওয়া যেত না। সকালবেলাও তার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ ছিল কয়েকদিন। অটলদা বলে দিয়েছিল—সময় নেই তার। অনেক কাজ তখন তার হাতে!

তখন বাদামতলা ছাড়িয়ে অটলদা আরো দূরের মানুষ হয়ে গেছে। কলেজের নতুন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অটলদা নতুন কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। আমাদেরও তখন ম্যাট্রিক দেবার সময়। আমরাও নতুন মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।

এক-একদিন হঠাৎ দেখা হ'লে অটলদা কাছে এগিয়ে আসে।

বলে, কী-রকম পড়াশুনা চলছে তোদের?

বলতাম, ভয় করছে অটলদা।

—ভয়? ভয় কীসের?

বলতাম, তোমার মতন তো ব্রেন নেই আমাদের।

অটলদা বলতো, ব্রেন কী কারো ভগবান দেয়? ব্রেন তৈরি করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের কি আমাদের থেকে আলাদা ব্রেন ছিল? সাধনা করতে হয়, মন দিতে হয়—তবে হয়। কঠোর ব্রহ্মচর্য চাই—তাহ'লে কেউ আটকাতে পারবে না—একবার যা পড়বি, সব মনে গাঁথা হয়ে যাবে—সেই নিয়মটা পালন করিস?

—কোন্ নিয়ম?

—সেই যে বলেছিলুম ধ্যান করতে?

বললাম, চেষ্টা করি, রোজ হয়ে উঠে না, ভোরবেলা ঘুম থেমে উঠতে দেরী হয়ে যায়।

—কেন?

বললাম, ওদিকে রাত জেগে পড়ি কিনা, তাই ভোরবেলা ঘুম ভাঙে না।

অটলদা বললে, ক'ঘণ্টা ঘুমোস?

অটলদার সামনে যেতেও শেষকালে যেন লজ্জা হতো। নিজেদের শক্তি নিজেদের সামর্থ্যের সীমা দেখেও যেন নিজেরা লজ্জা পেতাম। অটলদা তো প্রতিভা। আমরা তো সবাই অটলদার কাছে নগণ্য। আমরা কেমন ক'রে মুখ দেখাবো অটলদার কাছে। একটা থিয়োরেম কষতে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। দশবার একটা পাতা পড়েও মুখস্থ হয় না। আমাদের কতটুকু ক্ষমতা। রাস্তায় কোনও সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখলে একটুতেই চঞ্চল হয়ে উঠি। আমাদের কতটুকু সংযম—কতটুকু ব্রহ্মচর্য! নিজেদের ধিক্কার দিই আমরা। আমরা কী অটলদার মত সুন্দরী মেয়েদের দেখে মা'র কথা ভাবতে পারি? আমরা কত দুর্বল! আমাদের চরিত্র কত ভঙ্গুর! এক-একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ দেখি, অটলদা হাতে মোটা-মোটা বই নিয়ে হন্ হন্ ক'রে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বললে—কীরে, এত রাত্তিরে কোথায়?

বললাম—ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম ওষুধ আনতে—বাবার অসুখ। কিন্তু তোমার যে এত রাত হলো?

অটলদা বললে—আমার তো এমনি রাতই হয় আজকাল।

বললাম—তা ব'লে এত রাত? এখন যে রাত ন'টা বেজে গেছে।

অটলদা বললে—এক-একদিন এর চেয়েও রাত হয়।

বললাম—কেন? কেন রাত হয় অটলদা?

অটলদা বললে—আজকাল ভবানীপুর থেকে আবার এলগিন রোডে যাই কিনা—ওখানেও ছেলেরা ছাড়ে না। তারপর লাইব্রেরীতে যেতে হয়—এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে আজকাল বড্ড সময় দিতে হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বললে, এই দ্যাখ্ না, এই তিনখানা বই নিয়ে যাচ্ছি, এগুলো আজ রাত্রেই শেষ ক'রে আবার কাল সকালেই ফেরত দিয়ে আসতে হবে।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। অত মোটা-মোটা তিনখানা বই একরাত্রের মধ্যে কী করে শেষ করবে অটলদা? আর কখনই বা বই পড়বে, কখনই বা ঘুমোবে। অটলদার ক্ষমতাও অদ্ভুত, স্মরণশক্তিও অপূর্ব। বাদামতলার লোকেরা জানতো, আশুবাবুর ছেলে অটল ক্রমে ক্রমে বাদামতলার গৌরব আরো বাড়িয়ে দেবে একদিন। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ্ পেয়েছে, ইণ্টারমিডিয়েট

স্কলারশিপ্ পেয়েছে। যতদিন কলেজে পড়বে ততদিনই পাবে। ও ছেলে কখনও বদনাম করবে না বাদামতলার।

এমনি ক'রে একদিন বি-এও পাস করলো অটলদা।

আজ অনেকদিন আগেকার কথাগুলো ভাবতে গিয়ে কেমন যেন হাসি পাচ্ছে। সেদিন তো আমরা তাই-ই জানতাম, তাই-ই বিশ্বাস করতাম। ছোটবেলার পড়ার বইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই থেকে শুরু ক'রে মহা-মনীষীরা যা-যা সব কথা লিখে গেছেন, তাই-ই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতাম। তখন কী জানতাম, লেখাপড়াতে ফার্স্ট হওয়াও যেমন, তবলা-বাজানোতে ফার্স্ট হওয়াও তেমনি এক জিনিস! তখন কেবল বিশ্বাস করতাম, জীবনে উন্নতি করতে চাইলে, জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চাইলে লেখাপড়ায় প্রথম হতেই হবে! জীবনে কখনো স্কলারশিপ্ পাইনি পাঠ্যজীবনে, সাধারণভাবে পাশ করতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে আমাদের। তাই জানতাম আমাদের কিছুই হবে না। সমস্ত জয়মাল্যগুলো একমাত্র অটলদারই প্রাপ্য। শুধু আমি নয়, বাদামতলার সমস্ত লোকই সেই কথা ভাবতো। তাই সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে সবাই শুধু চেয়ে থাকতো অটলদার দিকে। কী চমৎকার ছেলে, কোনও বিলাস নেই, কোনও অহঙ্কার নেই। নিতান্ত সাদাসিধে নিরহঙ্কার মানুষ, অথচ জ্ঞানে, বিদ্যায়, প্রতিষ্ঠায় কত উঁচু। আর ক'টা বছর যাক, তখন একেবারে সকলের শীর্ষমণি হয়ে বসবে। আশুবাবুর মুখ উজ্জ্বল করবে, বাদামতলার মুখ উজ্জ্বল করবে, সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মুখ উজ্জ্বল করবে। লেখাপড়াই যখন সংসারে জ্ঞানের এবং প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাপকাঠি তখন অটলদাকে আর কে রাখে!

পাড়ার হিতৈষী-বৃদ্ধেরা কেউ কেউ বললেন, এবার আপনার ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে দিন আশুবাবু, ব্যারিস্টারী প'ড়ে আসুক।

কেউ বললেন, কেন, রুড়কীতে পাঠিয়ে দিন, ইঞ্জিনিয়ারিংই বা মন্দ কী?

আবার কেউ বললেন, পয়সা আছে ডাক্তারীতে—তেমন ডাক্তার ক'টা আছে দেশে!

আশুবাবু বললেন, আমি কী বলবো। আমাকে তো ছেলের পড়ার জন্যে কখনো একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি, ও ওর স্কলারশিপের টাকাতেই পড়ার খরচ চালিয়েছে—তার নিজের যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই যাক্।

—তা ছেলের কোন্‌দিকে ঝোঁক?

আশুবাবু বলতেন, ও তো বলে প্রফেসারী করবে।

—কিন্তু প্রফেসারীতে কি পয়সা আছে?

তা আমরা যখন আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছি, এ সেই সময়েব কথা।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, অটলদার বিয়ে। অটলদা তখন এম-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হয়ে বিলেত যাবার ব্যবস্থা করছে।

হঠাৎ খবরটা রটে যেতেই চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। শোনা গেল, বিয়ে হচ্ছে বিখ্যাত এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আলিপুরেব বিরাট ধনী। আমরা দূর থেকেই বাড়িটা দেখেছি। ভেতরে কখনও যাইনি। দেখেছি দাবোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে বন্দুক নিয়ে। শুনলাম বড়-বাজারে লোহার কারবার। সংসার সামান্য। কর্তা আর গিন্নী—আর কেবল একটি মাত্র মেয়ে। অর্থাৎ অটলদা গরীব হলেও কেবল ভাল পাত্র বলেই বিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। ছেলের বিলেত যাওয়ার যাবতীয় খরচ সবই তাঁরা দেবেন। শুধু তাই নয়, তারপর তাঁদের অবর্তমানে অটলদাই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

মানুষের জীবনে ভাগ্য কখন কেমন ক'রে কী ভাবে উদয় হয় কে বলতে পারে!

অটলদাই কী জানতো! না অটলদার স্ত্রীই জানতো, না জানতো বাদামতলার লোকেরা, না জানতে পেরেছিলাম আমরা?

সেই বিয়ে! সেই বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।

ইন্দুলেখা দেবীর দরখাস্ত, তার চেহারা, তার সিঁথির সিঁদুর, তার ঘোমটা সবটুকু কেমন যেন আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছিল। শেষকালে তার চাকরির দরখাস্তের বিচারের ভার এত লোক থাকতে আমার কাছে এসে পড়বে, এইটেই তো আশ্চর্য! আমি করবো অটলদার বিচার! আমি হবো অটলদার ভাগ্যনিয়ন্তা! এও এক পরিহাস বৈকি! আজ অটলদাকে সামনে পেলে যেন একবার বোঝাপড়া ক'রে নিতাম। এ পরিহাসের অর্থ কি! কেন এমন হয়! নইলে অটলদার কীসের অভাব ছিল? প্রতিভা, না প্রতিষ্ঠা, না বিদ্যা না জ্ঞান—কীসের? মনে আছে, শেষ যখন অটলদাকে দেখেছি তখন আমি চোখের জল রাখতে পারিনি। অটলদার সে চেহারা তখন কী যে হয়েছে! বুকের পাঁজরগুলো যেন গোনা যায়।

ঘাটশিলাব একটা টিনের চালের বাড়ির রোয়াকে এক বাটি মুড়ি খাচ্ছিল অটলদা!

অটলদা বলেছিল। তুই বড় হয়েছিস, তোর নাম হয়েছে, তাতে আমি খুশি হয়েছি ভাই!

বলেছিলাম, কিন্তু এ তোমার কী হলো অটলদা?

অটলদা বলেছিল, কেন, কী হয়েছে রে আমার?

বলেছিলাম, তোমার শরীর যে একেবারে ভেঙে গেছে?

অটলদা বলেছিল, তাতে কী হয়েছে, মন তো আমার ভাঙেনি, মনটাই তো সব।

বলেছিলাম, তোমার ওপর আমাদের কত আশা ছিল জানো, তুমি কত বড় হবে, কত গর্ব তুমি আমাদের সকলের!

অটলদা মুড়ি খেতে খেতে যেন থামলো একবার।

বললে, ওগো শুনছো, কোথায় গেলে তুমি?

আশে-পাশে চেয়ে দেখলাম, ঘরের ভেতর থেকে অটলদার স্ত্রী বেরিয়ে এলো।

অটলদা বললে, ওঁকে প্রণাম কর, তোর বৌদি।

মনটা একটু বিষিয়ে উঠেছিল প্রথমে! প্রণাম করতে হবে! সোজা চোখের ওপর চোখ তুললাম। কালো-রোগা চেহারা! একটা চশমাও পরেছে। সোনার চুড়ি দু'গাছা হাতে। মনে হলো যেন রাঁধতে রাঁধতে চলে এসেছে! মিলের একটা মোটা শাড়ি পরনে।

হাত তুলেই প্রণাম করলাম।

অটলদা বললে, ওর নাম বললে তুমি চিনতে পারবে, আমাদের বাদামতলার ছেলে, এখানে সাহিত্য-সভায় সভাপতি হয়ে এসেছে—মুড়ি খাবি তুই?

ঠিক দারিদ্র্যের জন্যে নয়, ঠিক ময়লা শাড়ি কিংবা টিনের চালের বাড়ির জন্যেও নয়। আর ঠিক কী কারণে যে তা-ও এখন এতদিন পরে বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হলো, এ-অবস্থায় এখানে না এলেই যেন ভাল হতো!

অটলদাকে ঠিক এ-অবস্থায় দেখতে চায়নি যেন মন। সেই অটলদা যাকে আমাদের সমস্ত ছেলেদের আদর্শ ব'লে মনে হতো, সেই অটলদাই কিনা ঘাটশিলায় এই মাস্টারি নিয়ে এই অবস্থায় প'ড়ে আছে। অথচ অটলদা কী না হতে পারতো! কত আশা করেছিল সবাই। অথচ শ্বশুরের কত টাকা, কত টাকার মালিক হতে পারতো অটলদা। সমস্ত লোহার কারবারটার একমাত্র মালিক হতো তো অটলদাই। আর কেউ নয়। কেন সব হারাতে গেল অটলদা! শুধু কী ভাগ্য? আর কিছু নয়?

অথচ বিয়েব আগের দিন পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে পাবেনি।

আমরাও জানতে পারিনি।

তাই বলছিলাম, অটলদার বিয়ের দিনেই ঘটনাটা ঘটলো।

সে সময় তো ডায়েরি লিখতাম না। তাই সঠিক তারিখটা মনে নেই। শুধু মনে আছে, আমরা সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেছি, বাদামতলার কেউ-ই আর নিমন্ত্রিত হতে বাকি থাকেনি। বড়লোকের বাড়ি। রসনচৌকি, নহবৎ, ব্যাণ্ড, ফুলের মালা। সমস্ত সামনের রাস্তাটা মোটরে-মোটরে ছেয়ে গেছে। আমরা বরযাত্রী। আমরা বাসে ক'রে গিয়ে হাজির। বাদামতলা থেকে আলিপুর—বেশী দূর নয়। অটলদাও মোটরে গিয়ে হাজির। সঙ্গে আশুবাবু, নাপিত, পুরুত, সবই আছে। সমস্ত মোটরটা ফুলে-ফুলে ঢাকা। অটলদাকে দেখে কেমন যেন বিব্রত মনে হচ্ছিল।

আশুবাবু বললেন, অটল কিছুতেই রাজী হতে চায় না। বললে, এত জাঁকজমক না করলেও চলতো।

অটলদা বিয়ের আগের দিনও কিছ জানতো না। গিয়েছিল রাঁচীতে। সেখানে গিয়েও আমাদের চিঠি লিখেছিল। বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রের কথাই লিখেছিল সে-চিঠিতে। কোথায় আমাদের চরিত্রের দোষ। মেরুদণ্ড নাকি আমাদের বেঁকে গেছে। একে সংশোধন করতে হবে। এ না করলে জাতি হিসেবে আমাদের পেছিয়ে পড়তে হবে। অন্য দেশের লোকেরা হু-হু ক'রে এগিয়ে চলেছে। তোরা মানুষ হ'। কথায় আর কাজে এক হতে হবে—বাঙালী চরিত্রের এই-ই তো দোষ। আমি বাইরে এসে দেখছি, এরা আমাদের মত নিষ্ঠাবান না হোক্, উদ্যমী। এদের মধ্যে একতা আছে—আমাদের মধ্যে যেটার সবচেয়ে বড় অভাব! আমি ফিরে আবার আমাদের ক্লাবে গিয়ে নতুন ক'রে তোদের বলবো সব। আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে হবে। শিক্ষাই যদি সার্থক না হয়, তাহলে জীবনে তো সবই পণ্ডশ্রম।

আরো অনেক কথা রাঁচী থেকে লিখেছিল অটলদা।

এমন ক'রে কাজে আর কথায় কে এক হতে পেরেছে অটলদার মত। তখনই শুনলাম অটলদার বিয়ে। যেদিন ফিরে এলো অটলদা—সেদিন আমরাও অপেক্ষা করছিলাম বাড়ির সামনে।

জিজ্ঞেস করলাম—কাল তো তোমার বিয়ে অটলদা।

—বিয়ে!

কথাটা শুনে অটলদা চম্‌কে উঠলো যেন।

তারপর বাড়ির মধ্যে চলে গেল। বাড়ির ভেতরে কী ঘটেছিল জানি না। আমরা বিয়েব দিন যথারীতি সেজে-গুজে নেমন্তন্ন খেতে গেছি বরযাত্রী হয়ে। এক-একগ্লাস সরবৎ দিয়ে গেছে সবাইকে। মাথায় পাগড়ি-পরা-খানসামা-বয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারো হাতে ট্রে, ট্রেতে পান, সিগ্রেট, দেশলাই, কিম্বা আইসক্রিম। সমস্ত বাদামতলার লোকই বরযাত্রী হয়ে এসেছে। আশুবাবুর প্রথম ছেলের বিয়ে—কাউকে বাদ দেননি। পাত্রীপক্ষ বড়লোক। তাদের কিছু গায়ে লাগে না।

অটলদাকে একটা কিংখাব-মোড়া সিংহাসনের ওপর বসানো হয়েছিল। কী চমৎকার দেখাচ্ছিল অটলদাকে। সমস্ত লোক অটলদাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। নাক-চোখ-মুখের অমন

গড়ন। এমন পুরুষমানুষের চেহারা! ফর্সা টক্‌টক্‌ করছে রঙ! গরদের পাঞ্জাবী প'রে সভা আলো ক'রে বসে ছিল অটলদা।

একসময় বরকর্তা এসে অটলদাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে বরণ হবে—তারপর সম্প্রদান! শাঁখ বেজে উঠলো। বাইরে থেকে শাঁখের আওয়াজ কানে এলো। তারপর খাওয়ার ডাক এলো আমাদের।

সামনের বাগানে চেয়ার-টেবিল পেতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। লুচি দিচ্ছে, মাংস দিচ্ছে, চপ-কাটলেট—কোনো কিছুই বাদ নেই। বড়লোকের বাড়ি—অটলদার শ্বশুরবাড়ি। অধিকার আছে আমাদের এখানে। আমাদের যেমন অধিকার আছে অটলদার ওপর, তেমনি অধিকার আছে অটলদার শ্বশুরবাড়ির ওপরও। বড়-বড় গরম গরম কাটলেট দিচ্ছিল। এক-এক কামড়ে উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। অটলদা একদিন এই বাড়িরই মালিক হবে। এই সমস্ত সম্পত্তির। পাড়ার অনেক লোক হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছিল। হবে না কেন? এমন পুত্রভাগ্য ক'জন বাপের হয়! এরপর অটলদা আরো কত বড় হবে, আবো কত ঐশ্বর্যবান হবে। সে তো আমাদের পক্ষে আনন্দেরই খবর, আমাদের পক্ষে সুখেরই কথা। আমাদের অটলদা বড় হওয়া মানে তো আমাদের ক্লাবই বড় হওয়া! আমাদের ক্লাবের নিজস্ব বাড়ি হবে, অটলদা বলেছিল আরো মেম্বার বাড়াবে। বাদামতলা ছাড়িয়ে ভবানীপুর, কালীঘাট, এলগিন রোডের ছেলেরা পর্যন্ত এই ক্লাবে আসবে। খেতে বসে এইসব কথাই ভাবছি, হঠাৎ..

হঠাৎ গোলমালের শব্দ কানে এলো। ভেতর বাড়িতে যেন হৈ-চৈ হচ্ছে খুব। কে যেন কাকে চিৎকার ক'রে ডাকলে।

ওদিকে বিয়ের শাঁখ বাজছে। সম্প্রদানও শেষ হয়ে এলো, এমন সময় কিসের যেন গোলমালে হঠাৎ সব থেমে গেল। যারা পরিবেশন করছিল—তারা দই আনতে গিয়ে আর যেন ফিরলো না।

কমলদা খেতে-খেতে বললে, কই হে, মিষ্টিওয়ালা কোথায় গেল?

বিশুদা বললে, ভেতরে কিসের গোলমাল শুনছি যেন?

কিন্তু বিয়ে-বাড়িতে অমন গোলমাল তো হবেই। গোলমাল না হলে তো বিয়েবাড়ি মানায় না! অসংখ্য লোকজন, আত্মীয়-বান্ধব জমা হয়েছে, বরযাত্রীরা এসেছে, গোলমাল তো হবেই। অনেকক্ষণ ব'সে-ব'সেও কেউ যেন আর পরিবেশন করতে আসছে না।

অটলদার বাবা আশুবাবুকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। তিনিও যেন উত্তেজিত। যেন ওদিক থেকে সেদিকে চলে গেলেন। কিছু-কিছু লোক তাঁর পেছনে-পেছনে ও-ধারে চলে গেল। যারা আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারাও কয়েকজন টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ওদিকে।

আমরাও উঠবো-উঠবো করছি—

বিশুদা বললে, চলো হে দেখে আসি, ব্যাপারটা সামান্য নয় বলে মনে হচ্ছে।

হুড়মুড় ক'রে সবাই দৌড়লাম।

বিরাট মার্বেল পাথরের বাড়ি। বাগান থেকে উঠে সামনের ঝুলবারান্দা। বারান্দার মধ্যে দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠেছে। সমস্ত বাড়িটা ফুলে-ফুলে ফুলময়। কিংখাবে ব্রোকেডে মোড়া। ঝালর-ঝোলানো পর্দার বাহার। সিঁড়ি দিয়ে আমরাও উঠলাম। আমাদের সামনেও অনেক লোক চলেছে। সবাই বরযাত্রী, সবাই উত্তেজিত।

বিশুদা বললে, নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বেধেছে!

সামনের দিকে আরো ভিড়! ভিড় ঠেলে আমরা এগিয়ে গেলাম। পাশাপাশি পর্দা-ঝোলানো অনেক দরজা। বিরাট হলের সবগুলো দরজার সামনে ভিড়। ভেতর থেকে হোমের গন্ধ আসছে। যেন অটলদার গলার শব্দও পেলাম বলে মনে হলো।

তারপর মনে হলো যেন আর-একজন মেয়েমানুষের গলাও শুনতে পেলাম। কৌতূহল আরো বাড়লো। ভিড় ঠেলে একেবারে ভেতরে যাবার চেষ্টা করলাম।

বিশুদা বললে, আমার পেছন-পেছন ঢুকে আয় তোরা।

কমলদা আমার পেছন-পেছন আসতে লাগলো।

কিন্তু ভেতরে উঁকি মেরেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম!

বোধহয় তখনো সম্প্রদান শেষ হয়নি।

হোমের আগুনের সামনে লাল বেনারসী প'রে নতুন বউ অটলদার হাতে-হাত রেখেছে। কন্যাকর্তা গরদের জোড় প'রে এতক্ষণ কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছিলেন। আশুবাবুও সামনে ছিলেন। আর সকলের সামনে দেখলাম আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারও মাথায় ঘোমটা। সর্বাঙ্গ একটা সুতির শান্তিপুরের শাড়িতে জড়িয়ে নিয়েছে শরীরটা। তার পেছনটা দেখতে পাচ্ছি শুধু।

একটু পাশে যেতেই মুখখানা দেখতে পেলাম!

শুধু মুখখানা নয়! সর্বাঙ্গ।

হাতে একগাছা শুধু চুড়ি। কানে পাতলা একজোড়া দুল। ছিপ্-ছিপে চেহারার কালো একটি মেয়ে। চোখদু'টো যেন তার জ্বলছে।

জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটা কে বিশুদা?

বিশুদা বললে, চুপ্ কর্ না—শুনি—

মেয়েটি বলছে, ইনি আমার স্বামী।

আশুবাবু বলছেন, কে তোমার স্বামী? অটল?

—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে।

বিয়ে! আশুবাবু যেন ক্ষেপে উঠলেন। আশুবাবু নিরীহ মানুষ। ক্ষেপেন না তিনি সহজে। রাগতে তাঁকে আমরা বাদামতলার লোকেরা কখনও দেখিনি।

মেয়েটি বললে, বিশ্বাস না হয়, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

আশুবাবু বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আমার ছেলে, আমি জানি না? আমি কবে ওর বিয়ে দিলুম যে, তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হতে গেল?

মেয়েটি বললে, বিয়ে আপনি দেবেন কেন? বিয়ে আমরা নিজেরা করেছি।

—বিয়ে তোমরা করেছো?

—হ্যাঁ, যদি বিশ্বাস না হয় তো আপনার ছেলেকেই জিজ্ঞেস করুন না—

কন্যাকর্তা উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, তুমি কাদের মেয়ে? তুমি এখানে কী করতে এসেছো?

মেয়েটি বললে, আপনারা আমাকে খবর দেননি, আমি খবর পেয়ে নিজেই এসেছি।

—কিন্তু এ-সময়ে কেন এলে? এখন যে বিয়ে হয়ে গেছে আমার মেয়ের সঙ্গে! আগে জানালেই হতো।

—আগে কি জানতাম, আপনারা আমাকে জানালেন না কেন?

কন্যাকর্তা হেসে উঠলেন। বললেন, শোনো কথা, আগে যদি জানতেই পারবো তো তোমাকে জানাতাম না মনে করেছো?

আশুবাবু বললেন, তুমি মা এখন এসো এখান থেকে, যা বলবার কাল অটলকে এসে বোলো—অটল তো কাল বউ নিয়ে বাড়ি যাবে, সেখানেই বোঝাপড়া হবে।

মেয়েটি বললে, আমি আজই জানতে চাই, আমি কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না।

কন্যাকর্তা বোধহয় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলেন আর একটু হ'লে।

বললেন, তুমি যদি কথা না শোন তো আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়েটিও যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বললে, যা ব্যবস্থা করবার ইচ্ছে তাই করুন—আমিও তাই চাই।

কন্যাকর্তা বললেন, বেয়াইমশাই, তাহলে ব্যবস্থা করি, আপনি কী বলেন?

আশুবাবু বুঝিয়ে বললেন, মা, কেন গণ্ডগোল করছো তুমি, এই সবে সম্প্রদান হলো, এখনও অনেক অনুষ্ঠান বাকি আছে, বেয়াইমশাই সারাদিন উপবাসী, তুমি পরে এসো, তোমার সব কথা শুনবো।

আশুবাবু প্রায় জোড়হাত করবার উপক্রম করলেন।

কিন্তু মেয়েটি তখনও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কন্যাকর্তা হাঁক দিলেন—বাহাদুর—

সমস্ত বাড়ি যেন কেঁপে উঠলো। সে-কি গম্ভীর গলা। সমস্ত বরযাত্রীর দল যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। আর দেরী নেই। এবার একটা না একটা কিছু ঘটবে। তখন সম্প্রদান হয়ে গেছে প্রায়।

পুরুতমশাই হাত মুছে হোমের ওপর শেষ কয়েক ফোঁটা ঘি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, হল-ঘরের মধ্যে কয়েকশো লোক জড়ো হয়েছে। অতিথি, বরযাত্রী, আত্মীয়-স্বজন—যারা কাছে পিঠে ছিল তারাও দৌড়ে এসেছে। সর্বনাশের ব্যাপার! কন্যাকর্তার ছেলে নেই, কিন্তু লোকবল আছে! লোকবল শুধু নয়, অর্থবলও আছে—সে যে কী ভয়ানক কাণ্ড! অটলদা—আমাদের অটলদার শেষে এই কাণ্ড! শুধু অটলদাই নয়, অটলদার সঙ্গে আমরাও যেন সব পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। অটলদার মতন আমাদেরও মুখ দিয়ে কোনো কথা আর বেরোচ্ছিল না। আমরা সব বিমর্ষ হয়ে দেখছিলাম—বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম। আমাদের অটলদা, বাদামতলার গৌরব অটলদা—সমস্ত ছাত্রদলের আদর্শ অটলদা, তাকে এমন ক'রে মিথ্যে কলঙ্ক দেওয়া! এও কী সম্ভব! বাদামতলার গঙ্গার জলে গলা ডুবিয়ে বললেও আমরা তা বিশ্বাস করবো না।

কমলদা বললে, মেয়েটার কোনও বদ্ মতলব আছে ঠিক—

বিশুদা বললে, এখান থেকে ভাগিয়ে দিলেই হয়—

আমারও যেন কেমন রাগ হচ্ছিল। অটলদার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করতে এসেছে মেয়েটা। ওই কালো কুচ্ছিৎ মেয়েটা কিনা অটলদার বউ! ভাবতেই যেন গা-ঘিন্-ঘিন্ কবতে লাগলো। অথচ সামনেই বসে আছে নতুন বউ, বেনারসীর ঘোমটা ঢাকা, হোমের আগুনে' আভা লেগে মুখটা তখনও লাল টক্-টক্ করছে—কী চমৎকার দেখাচ্ছে! হঠাৎ যেন গুন্-গুন্ ক'রে গুঞ্জন শুরু হলো চারিদিকে। সে-গুঞ্জন ক্রমে গোলমালে পরিণত হলো। আর গোলমালের মধ্যে কতরকম মন্তব্য শুনতে পেলাম কতরকম লোকের মুখ থেকে।

কেউ বলছে, মেয়েটা বদমাইস্—বদ্মায়েসির জায়গা পায়নি আর?

—মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হোক্ না।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে একজন বললেন, আমি পুলিশকে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি।

আর সহ্য করতে না পেরে কন্যাকর্তা বললেন, বেয়াইমশাই, তাহ'লে আপনি কী বলেন?

আশুবাবু বললেন, দাঁড়ান বেয়াইমশাই, আমি একটু বুঝিয়ে বলি।

মেয়েটি তখনও চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আশুবাবু বললেন, মা, আমি অটলের বাপ, আমি বলছি, তোমার কথা কাল আমি সব শুনবো।—এখন তুমি বরং এসো, এখানে গোলমাল ক'রে তোমার কী লাভ?

মেয়েটি বললে, আমি এ বিয়ে হতে দেবো না।

আশুবাবু বললেন, কিন্তু সম্প্রদান তো হয়েই গেছে। সম্প্রদান হলেই তো বিয়ে হওয়া হলো!

মেয়েটি বললে, না, এ বিয়ে হয়নি।

পাশ থেকে কে যেন টিট্‌কিরি কাটলে একবার, তুমি বললেই হয় নি! বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

আশুবাবু তাকে ইঙ্গিতে শান্ত হতে ব'লে আবার বলতে লাগলেন, বিয়ে হয়নি মানে?

মেয়েটি বললে, কারণ, একবার এই বরের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

—কবে বিয়ে হয়েছে?

মেয়েটি আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে তখন।

বললে, আপনি প্রমাণ চান?

আশুবাবুর অসীম ধৈর্য।

বললেন, মেনে নিলাম বিয়ে হয়েছে আপাততঃ, কিন্তু তুমি একটা প্রমাণ দেখাবে আর আমিও অমনি তা বিশ্বাস ক'রে নেবো, তা তো হতে পারে না। তার সাক্ষী চাই, সাবুদ চাই। তুমি কাদের মেয়ে, তোমার বাড়ি কোথায়, তোমার বাবার নাম কী সবই তো জানতে হবে।

মেয়েটি বললে, সবই আমি জানাতে প্রস্তুত।

—তা তুমি জানাতে প্রস্তুত হ'লে কী হবে, আমাদের যে হাতে এখন অত সময় নেই, এখনও অনেক বরযাত্রীর খাওয়া বাকি আছে।

মেয়েটি বললে, যা হবার আজকেই হোক্, কালকের জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারবো না।

—তা তোমার বাবার নাম কী? কোন্ গোত্র?

মেয়েটি তেমনি উত্তেজিত হয়েই বলতে লাগলো, দেখুন, গোত্র টোত্র আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি শুধু জানি আমাদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে। আমি অনেক দূর থেকে আসছি, শেষ মুহূর্তে খবর পেয়েছি, তাই দৌড়তে-দৌড়তে আসছি—এখনও আমার খাওয়া হয়নি।

—তা আমাদেরই কী খাওয়া হযেছে? আমরাও তো সারাদিন উপোস ক'রে আছি, তা জানো?

মেয়েটি বললে, আপনারা উপোস ক'রে আছেন কি না তা আপনারাই জানেন—আমাব তা জানবার দরকার নেই।

—তবে তুমি কী চাও শুনি?

মেয়েটি বললে, আমি ওকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

আশুবাবু এবার যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, এত বড় দুঃসাহস তোমার!

কন্যাকর্তা এতক্ষণ সব সহ্য করছিলেন। এবার আর পারলেন না চুপ ক'রে থাকতে। কে যেন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে একজন আবার বললে, পুলিশে ফোন ক'রে দেবো জ্যাঠামশাই?

সামান্য মেয়েটার স্পর্ধা দেখে সবাই যেন অবাক হয়ে গেছি আমরা।

হঠাৎ মেয়েটি আর-এক কাণ্ড ক'রে বসলো।

হঠাৎ অটলদার হাত ধ'রে বললে, চলো তুমি, চলে এসো।

অটলদা মুখ নিচু ক'বে যেমন বসে ছিল, তেমনি বসেই রইলো। ওঠবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না তার।

মেয়েটা আরও জোরে হাত ধরে টানতে লাগলো।

বললে, ওঠো, উঠে এসো, চলো আমার সঙ্গে। আমাকে এতটুকু জানালে না পর্যন্ত তুমি, ভেবেছিলে আমি কিছুই টের পাবো না? ভাগ্যিস্ খবরটা পেলুম, তুমি আমার কী সর্বনাশ করছিলে বলো তো?

সবাই বিমূঢ় দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে দেখছিলাম। আমাদের সকলেরই মুখে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভাবছিলাম, অটলদা তবে কি সত্যিই বিয়ে করেছে ওই কালো কুচ্ছিৎ

মেয়েটাকে! যদি করেই থাকে তো কেন করতে গেল? কিসের মোহ! অটলদা শেষে কি আমাদের এমন ক'রে মুখ পোড়ালো?

কন্যাকর্তা এতক্ষণ যদিও-বা কোনো রকমে সহ্য করতে পেরেছিলেন, এবার আর পারলেন না। চিৎকার ক'রে উঠলেন আবার, বাহাদুর—

তখন তো ডায়েরি রাখতাম না। তাই দিন তারিখ ক্ষণের হিসেব নেই। শুধু মনে আছে, সেদিন, সেই অটলদার বিয়ের রাত্রে সমস্ত বরযাত্রীর দল আমরা যেন মরমে মরে গিয়েছিলাম লজ্জায়। একী করলে অটলদা! এমন ক'রে মুখ পোড়াতে হয় নিজের, আর সেই সঙ্গে আমাদের!

মনে আছে ১৯৪২ সালে—তার অনেক বছর পরে যখন আমার দেখা হলো অটলদার সঙ্গে , তখন আমি লজ্জায় অনেকক্ষণ সে-কথা বলতে পারিনি।

ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম একটা সভায় সভাপতিত্ব করতে! দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। বোমা পড়ছে কলকাতায়। ছন্নছাড়া হয়ে গেছে কলকাতার মানুষ। যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। সেই দুঃসময়ের মধ্যেও সভা-সমিতি! ছেলেরা কিছুতেই ছাড়েনি। কিছুতেই তাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি আমি। অগত্যা বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল আমাকে ঘাটশিলায়।

বাংলাদেশই বলা যায়। অথচ বাংলাদেশও নয়। তবু অনেক বাঙালী আছে তখন সেখানে। অনেকে বাড়ি করেছে। কেউ-কেউ কলকাতায় কিছুদিন থাকে, আবাব কিছুদিনের জনো ঘাটশিলায় পালিয়ে যায়। এমনি অবস্থা তখন। সেইখানকার স্কুলেরই মিটিং।

সভাপতিত্ব করেছিলাম আমি যথারীতি। যেমন বানানো কথা, বানানো বক্তৃতা সবাই করে, তেমনি আমিও করেছিলাম। ফুলের মালা পরেছিলাম গলায়, ফটোও তলতে দিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু ফেরবার সময় একটা ঘটনা ঘটলো।

সেকেণ্ড-টিচার অক্ষয়বাবু বললেন, আমাদের হেড-মাস্টারের সঙ্গে আপনার আলাপ করানো হলো না। তাঁর বড় অসুখ, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'লে তিনি খুবই সুখী হতেন।

বললাম, কে তিনি?

অক্ষয়বাবু বললেন, তিনি এ-স্কুলের প্রাণ, কিন্তু বড্ড অসুস্থ এখন। তাঁর চেষ্টাতেই এ-স্কুলের এত উন্নতি হয়েছে।

তারপর একটু থেমে বললেন, ওই দেখুন তাঁর ছবি।

চেয়ে দেখলাম, দেয়ালে টাঙানো একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ফটো। চেহারাটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছি!

অটলদা না! জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের হেড-মাস্টারের নাম কি?

অক্ষয়বাবু বললেন, অটলবিহারী বসু।

মনে আছে, সেই টিনের চালের ঘরের মধ্যে ব'সে আমি শুধু চেয়ে চেয়ে সেদিন অটলদার সংসারটার চেহারাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলাম। একটা ময়লা হ্যারিকেন, জল-চৌকির ওপর বুঝি একটা কোন্ ঠাকুর দেবতার পট। আর একধারে একটা তক্তপোষ, তার ওপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। মাথার দিকে একটা ময়লা তেলচিটে বালিশ। আর সারা তক্তপোষময় বই ছড়ানো। কতরকমের যে বই, কত কী বিচিত্র বই, তারও যেন কোনো ইয়ত্তা নেই।

মনে আছে, এক ফাঁকে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা অটলদা—

অটলদা বলেছিল, কী বলবি বল?

বললাম, তোমার দুঃখ হয় না?

—দঃখ?

আমার দিকে চেয়ে প্রথমটা অটলদা যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু আমার চোখের জল বোধহয় আমি লুকোতে পারিনি। এই দারিদ্র্য, এই ময়লা কুৎসিৎ নোংরা আবহাওয়াতে আমারই যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল। কোথায় সেই আলিপুরে ফুলের বাহারওয়ালা বাড়ির মালিক হবার কথা! কোথায় বিলেত যাবে অটলদা! কোথায় ব্যারিষ্টারি পড়ে এসে অটলদা বিরাট গাড়ি চ'ড়ে বেড়াবে! কোথায় সমস্ত দেশের লোক ছুটে এসে অটলদার পায়ের ধুলো নেবে! ছোটবেলা থেকে তো এই চিত্রই মনের মধ্যে এঁকেছিলাম। আর শুধু কি আমি! বাদামতলার সবাই তো একদিন সেই কল্পনাই করতো। সবাই তো জানতো আশুবাবুর পুত্র-ভাগ্য ভালো। আশুবাবু মহৎ সন্তানের বাপ! আশুবাবুকে আর থলি হাতে বাজার করতে যেতে হবে না। বিরাট বাড়ি উঠবে আশুবাবুর। ছেলের গৌরবে আশুবাবুর গৌরব বাড়বে সকলের কাছে। কিন্তু পরে কতদিন দেখেছি অটলদাদের সেই ভাঙা বাড়িটা। আস্তে আস্তে তা ভেঙে যেতে লাগলো, খ'সে-খ'সে যেতে লাগলো। কতদিন অটলদার বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম। সেই অটলদার ঘরখানার দিকে তাকাতাম। ঘরের জানালাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ থাকতো, অটলদা চলে যাবার পর থেকে একদিনও সেগুলো আর খুলতে দেখিনি।

আশুবাবু তখনো ঠিক তেমনি করেই বাজারে যেতেন। বলতাম, দিন, আপনার থলিটা দিন কাকাবাবু, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি—

কিন্তু কিছুতেই দিতেন না থলিটা।

বলতেন, না-না আমি ঠিক পারবো—কেমন আছেন তোমার বাবা?

বলতাম, আপনি কেমন আছেন?

—ভালই তো আছি।

জিজ্ঞেস করতাম, অটলদা কোথায়?

আশুবাবু বলতেন, কী জানি বাবা, কোথায় যে আছে, আমায় একটা খবরও দেয় না।

অটলদার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, কাকীমা রান্নাঘরে রান্না করছেন।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে পেছন ফিরতেন। বলতেন, কে?

বললাম, আমি কাকীমা।

কাকীমা বলতেন, এসো বাবা, কী মনে ক'রে?

কিছু বলতে পারতাম না।

তারপর কাকীমাই বলতেন, অটলকে দেখতে এসেছো, সে তো নেই।

সে তো নেই! সে তো নেই! সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে যেন এই কথাটাই ভেসে বেড়াতো—সে তো নেই। অটলদা নেই, সে-কথাটা যেন কেউই ভুলতে পারতাম না। কিন্তু আস্তে-আস্তে যেমন সবই সহ্য হয়ে যায়, তেমনি সমস্তই সহ্য হয়ে গিয়েছিল—সবাই ভুলে গিয়েছিলাম।

আশুবাবু কাকীমা সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলে না গেলে চলবে কেন? ভুলে না গেলে মানুষ বাঁচবে কী ক'রে?

আশুবাবুকে দেখতাম, এক-একদিন বিকেলবেলা পার্কের ভেতরের রাস্তাটা ধ'রে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটছেন। সামনে দিয়ে গেলেও আর চিনতে পারতেন না। চোখে আর ভালো দেখতে পেতেন না তখন।

সামনে গিয়ে নমস্কার করতাম। পায়ের ধুলো নিতাম।

বলতেন, কে বাবা তুমি?

বলতাম, অটলদার কোনও খবর পেয়েছেন?

বলতেন, ও, তুমি? না বাবা।

বলতাম, আপনি একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন না কেন?

আশুবাবু হাসতেন। কিছু বলতেন না।

শেষে হঠাৎ একদিন শেষরাত্রের দিকে খবর পেলাম, কাকীমা মারা গেছেন। আমরা সবাই তাঁকে নিয়ে গেলাম শ্মশানে। ছেলে নেই, আমরাই মুখাগ্নি করলাম। শেষকৃত্য করলাম। তারপর আবার যেমন ক'রে চলছিল পৃথিবী তেমনি করেই চলতে লাগলো।

আশুবাবু তেমনি করেই এক-একদিন লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন।

আমার সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, আমার আর দুঃখ কিসের বাবা? কেন দুঃখ করতে যাবো আমি?

সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, কিন্তু অটলদারই-বা কেমন স্বভাব, একটিবার খবর পর্যন্ত নিলে না!

আশুবাবু হাসতেন।

বলতেন, না-ই বা নিলে বাবা, মনে করবো ছেলে আমার হয়নি, বুঝবো ছেলে হয়েছিল, সে মারা গেছে।

ঘাটশিলায় অটলদার কাছে ব'সে আমার সেইসব কথাই মনে পড়তে লাগলো কেবল। এমন ক'রে যে নির্দয় হতে পারে, তার কাছে আমি কী অভিযোগ করবো?

অটলদার স্ত্রী এসে এককাপ চা দিয়ে গেল।

অটলদা বললে, এই শোনো শোনো—

অটলদার স্ত্রী দাঁড়িয়ে গেল। তার দিকে মুখ তুলে চাইতেও যেন সাহস হচ্ছিল না। মুখ তুলে চাইতেও যেন—সত্যি বলতে কি, ঘৃণা হচ্ছিল সমস্ত গোলমালের মূল তো এই অটলদার স্ত্রীই।

রাগে আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরোচ্ছিল না।

অটলদা বললে, ইনিই তোর বৌদি, প্রণাম কর্।

ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু প্রণাম করলাম।

বৌদি বললেন, আপনার বই পড়েছি আমি, বেশ লেখা আপনার।

চুপ করেই ছিলাম মাথা নিচু করে।

মনে আছে, অটলদা যখন অনেক কথা বলছিল তখন হঠাৎ একসময়ে বললাম, কাকাবাবু কেমন আছেন তা জিজ্ঞেস করলে না তো অটলদা?

কাকাবাবু!

অটলদা কাকাবাবুর নামটা শুনে কেমন থেমে গেল হঠাৎ!

বললাম, তোমার কি মায়া-দয়া কিছুই নেই অটলদা? তুমি এমন পাথর হতে পারলে কী ক'রে। তুমি তো আগে এমন ছিলে না?

অটলদা কী যেন ভাবতে লাগলো। হঠাৎ যেন মনে প'ড়ে গেল বাড়ির কথা। যেন হঠাৎ তার এতদিন পরে স্মরণশক্তি ফিরে এলো। অটলদা বইগুলোর পাতায় হাত বুলোতে বুলোতে কী যেন বিড়-বিড় করতে লাগলো। মনে হলো, হঠাৎ যেন আচমকা তার মনের কোন গোপন তারে আঘাত দিয়েছি। আর আঘাত দিতেই যেন সমস্ত যন্ত্রটা জুড়ে একটা ঝঙ্কার উঠেছে।

আবার বললাম, ছোটবেলা থেকে তুমিই তো আমাদের আদর্শ ছিলে অটলদা—তুমি ছাড়া আর কোনও আদর্শকে আমরা জানতাম না—তা তো তুমি জানো!

অটলদা যেন অন্যমনস্কের মত বই-এর পাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

বললাম, ছোটবেলা থেকে বাদামতলার আমরা সব ছেলেরা বড় হয়ে তোমার মত হবো এই কথাটাই ভাবতাম। তাও তো তুমি জানো।

অটলদা তবু কিছু বললে না। মুখ নিচু ক'রেই ব'সে রইলো।

বললাম, তোমার বাবা, কাকীমা শেষজীবনে কত কষ্ট পেয়েছেন তা তুমি জানো? তা তুমি কল্পনা করতে পারো? বলো, উত্তর দাও?

অটলদা তবু কোনো কথা বললে না। যেন মাথাটা আরও নিচু করলে শুধু। বললাম, কিন্তু তুমি তো আগে এমন ছিলে না অটলদা। তুমি তো বরাবর এ সব অপছন্দ করেছো, যেখানে অন্যায় সেখানেই তো তুমি তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করেছো।

অটলদা তবু চুপ করে রইলো।

বললাম, অমন চুপ করে থাকলে তোমার চলবে না অটলদা—তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথার উত্তর দাও একবার।

বললাম, বলো, আজ স্বীকার করো তুমি, কেন এমন হলো? কে এর জন্য দায়ী? কর্তব্য করছো তুমি কার ওপর? কে সে? সে কি কাকাবাবুর চেয়েও বড় কেউ কাকীমার চেয়েও বড়?

অটলদা এবার যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

বললাম, ভয় নেই অটলদা, আমি তোমায় তার নাম জিজ্ঞেস করবো না। কিছুই জিজ্ঞেস করবো না।

অটলদা হঠাৎ আমার হাতদুটো ধ'রে ফেললে।

বললে শোন্, আজ তুই থাক্ আমার কাছে।

বললাম, কেন?

অটলদা বললে, তোর সব কথার উত্তর আমি দেবো। তুই আজকে আমার এখানে থাক্।

বললাম, তোমার এখানে থাকবো?

অটলদা বললে, কেন, খুব কাজ আছে তোর?

কাজের কথা নয়। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে কেমন যেন সঙ্কোচ হলো। কোথায় থাকবো? এই ঘরে? এই ছেঁড়া বিছানা আর ময়লার রাজ্যে? দু'খানা মাত্র ঘর বোধহয়। ওপাশ থেকে রান্নার শব্দ আর গন্ধ আসছে নাকে! এখানে থাকবো?

অটলদা বললে, আজ তুই থাক্, নতুন বই কিনেছি একটা, এই দ্যাখ্ পড়াবো তোকে।

নতুন বই-এর লোভ আমার ছিল না। অটলদার নতুন বই-এর লোভ এখনও থাকতে পারে। কিন্তু আমার লোভ অটলদার ওপর। কেন অটলদার সব থাকতেও এই দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়েছে। কিসের জন্যে? কার জন্যে? যাকে দেখেছি সেদিন সেই আলিপুরের বিয়ে বাড়িতে তারই এত আকর্ষণ? তারই এত মোহ? অন্ধকারে মিলের ময়লা শাড়ি-পড়া তার চেহারা তো আজও দেখলাম! তার মধ্যে এত কী আকর্ষণ পেলো অটলদা! যে-অটলদা ভোররাত্রে উঠে মনের জোর বাড়াবার জন্যে দেওয়ালের গায়ে আঁকা দাগের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো, যে অটলদা স্বামী

বিবেকানন্দের 'ব্রহ্মচর্য' প'ড়ে নিজেকে উন্নত করেছিল, তারই কী এই মর্মান্তিক পরিণতি। ইস্কুলের হেড-মাস্টার হয়েছে ভালো কথা। ছেলেদের মানুষ করছে, তাও ভালো কথা। কিন্তু নিজে? নিজে কী আজ পৃথিবীর মানুষের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে? মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে—আমি যা-কিছু করেছি, সব ন্যায় করেছি, যা-কিছু ভেবেছি সব ঠিক ভেবেছি।

অটলদা বললে, তাহ'লে তোর বৌদিকে ব'লে দিই তুই এখানে খাবি আজ।

তারপর ভেতরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললে, ওগো শুনছো—

অটলদার ডাক শুনে আবার সেই মহিলাটি এলো।

অটলদা বললে, শুনছো, এ-ও থাকবে আজ এখানে, বুঝলে? এই আমার ঘরেই বিছানা ক'রে দিও।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, একটু কষ্ট হবে তোর।

বৌদি বললেন, আপনি রাত্রে ভাত খান, না রুটি খান?

বললাম, আমার জন্যে আপনাকে বেশি ভাবতে হবে না, আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাবো।

বৌদি হেসে ফেললেন। বললেন, আপনি বুঝি আমার কষ্টের কথা ভাবছেন? রাঁধতে কষ্ট হয় নাকি মেয়েদের?

অটলদা বললে, ওকে দু'টো বেগুনভাজা ক'রে দিও, বুঝলে।

বৌদি বললেন, হ্যাঁ তুমি বেগুনভাজা খেতে ভালোবাসো ব'লে কী সবাই তাই ভালবাসে?

বাধা দিয়ে বললাম, না-না বৌদি, আপনার যা খুশী তাই আপনি দেবেন, আমার খাওয়ার কোনো বাদ-বিচার নেই।

বৌদি চলে যাবার পর অটলদা বললে, তোর হয়তো এখানে একটু কষ্ট হবে।

—না-না, কষ্ট হবে কেন? তুমি কিছু ভেবো না অটলদা।

অটলদা বললে, না, এখানে আজকাল বড় মশা হয়েছে।

বললাম, তা হোক, আজ তোমার সব কাহিনী শুনবো অটলদা, কেন এমন হলো? কিসের জন্যে তুমি এমন ক'বে পালিয়ে বেড়াচ্ছো?

অটলদা বললে, পালিয়ে বেড়াচ্ছি? কে বললে তোকে?

বললাম, তুমি কী বলছো অটলদা? পালাওনি তুমি? তোমার যা শক্তি ছিল, তোমার যা ক্ষমতা ছিল, তোমাব যা প্রতিভা ছিল, তার জোরে তোমার তো এখন সকলের নমস্য হ'য়ে থাকাব কথা, সকলের উদাহরণস্থল হয়ে থাকার কথা।

অটলদা হাসতে লাগলো।

বললে, কেন, এখন কী সকলের চোখে ছোট হয়ে গেছি আমি?

বললাম, হওনি? কী তুমি হতে পারতে ভাবো দিকিনি? কিসের তোমার অভাব ছিল বলতে পারো?

অটলদা মুখ নিচু ক'রে কী যেন ভাবতে লাগলো।

বললে, বলবো আজ বাত্তিরে তোকে সব, আজ তো আছিস্ তুই?

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় অন্যবকম। নইলে আমিই কি জানতাম যে, এতদিন পরে দেখা হ'লেও অটলদার কাহিনী আমার শেষ পর্যন্ত শোনা হবে না। সেদিন আলিপুরের বাড়িতে বিয়ে হবার দিনেও যেমন সমস্ত ঘটনাটা রহস্যাবৃত হয়ে আছে, ঘাটশিলাব সেই ইস্কুলের

মাস্টারি-জীবনের আড়ালেও সব কাহিনীটা আমার চিরকালের মতই অজানা রয়ে গেল। অটলদা কি শান্তি পেয়েছিল তার জীবনে? অনেক বার অনেক অবসরের মধ্যে ব'সে ব'সে ভেবেছি। একদিন এক মুহূর্তের জন্যেও কি অনুতাপ করেনি অটলদা?

কিন্তু সে-কথা জানবার আর কোন উপায় ছিল না। তারপরে কতবার কতদিকে গিয়েছি। ঘাটশিলার স্টেশনের ওপর দিয়েও কতবার গিয়েছি তার ঠিক নেই। অনেকবার মনে হয়েছে—নামি। নেমে দেখা ক'রে আসি অটলদার সঙ্গে। কিন্তু সেবার যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল জীবনে, তার জন্যে আর কখনও সাহস হয়নি ঘাটশিলায় যেতে। চিঠি লিখে খবর নিতেও সাহসে কুলোয়নি।

সেই কাহিনীটাই আজ বলি।

সে-রাত্রে ঘাটশিলায় থাকাই সাব্যস্ত করেছিলাম। এক ঘরে এক তক্তপোষে অটলদার সঙ্গে কাটাবো, অটলদার জীবনের কাহিনী শুনবো, সেই রকম ইচ্ছেই ছিল। ঘর থেকে হাত-মুখ ধোবার জন্যে বাইরের উঠোনে আসতে কোন্‌দিকে জলের বালতি খুঁজছিলাম, হঠাৎ বৌদি কাছে এলেন। বললাম, এই বালতির জলে হাত ধোব বৌদি?

বৌদি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কেন এলেন এখানে?

গলার শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম! হঠাৎ গলায় যেন ঝাঁজ বেরোতে লাগলো। বৌদি বললেন, কেন আপনারা আসেন আমার বাড়িতে? কেন আসেন বলতে পারেন?

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। অন্ধকারে অস্পষ্ট মুখটা যেন বড় বিরক্তিভরা মনে হলো। বলতে লাগলেন—সবাই মিলে আপনারা আমার সর্বনাশ করতে কেন আসেন, আমি আপনাদের কী এমন ক্ষতি করেছি? কী এমন অন্যায় করেছি?

বললাম, আমি? আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, আপনাদের সবাইকে বলছি! আপনাবা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন কেন? আমি কী করেছি আপনাদের? আমার নিজের স্বামীকে নিয়ে আমি এখানে সংসার পেতেছি, তাতে আপনাদের এত রাগ কেন?

আবার বললাম,—আপনি কী বলছেন?

মহিলাটি বললেন—কেন, আপনি বোঝেন না কিছু? আমাব সংসাবেব অবস্থা দেখেও বুঝতে পারেন নি? আমার এই ছেঁড়া শাড়ী, এই ভাঙা তক্তপোস, ময়লা মশাবি, কিছুই কি আপনি দেখতে পাননি? আপনাদের কী চোখ নেই? এর পবেও এখানে থাকবার, এখানে খাবার কি প্রবৃত্তি আপনাদের হয়?

আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বললাম, কিন্তু আপনিই তো আমাকে থাকবার কথা, খাবার কথা বললেন একটু আগে?

মহিলাটি হঠাৎ যেন রেগে গেলেন। বললেন, আপনি কিছুই বোঝেন না বলতে চান? কিন্তু এও আমি ব'লে রাখছি, আপনারা ওঁকে কিছুতেই পাবেন না, অনেকদিন ধ'রে ওঁকে আমি আপনাদের কাছ থেকে আগলে-আগলে রাখছি—যেটুকু আছে ওঁর তাও আমি নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবো।

—তার মানে?

মহিলাটি বলতে লাগলেন, তার মানে আপনারা ভালো করেই বোঝেন। আপনারা ভাবেন, একদিন সংসারের খাটুনি-খাট্‌তে-খাটতে যখন আমি মবে যাবো, আপনারা তখন যার জিনিস তাঁর কোলে ওঁকে তুলে দেবেন—সে আমি হতে দেবো না।

বললাম, এ আপনি কী বলছেন?

মহিলাটি বললেন, ঠিকই বলছি আমি, আমি কাউকে ভয় করি নাকি! আমার কিসের ভয়? গরীবের মেয়ে ব'লে আমি কিছু কম বুঝি? আমি কি কিছু কম জানি?

তারপর একটু থেমেই বললেন, আপনি চলে যান এখান থেকে, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আপনি জ্বালাবেন না আমাদের—

—আমি চলে যাবো?

—হ্যাঁ, আপনি এখুনি চলে যান, একটা রাত-না-খেয়ে থাকলে আপনি আর মরে যাবেন না, স্টেশনে গিয়ে রাত্রের ট্রেনেই চলে যান। ওঁর বাবা এসেছিলেন, তাঁকেও এমনি ক'রে আমি এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—কেন, বিয়ে করেছি ব'লে আমি কী এমন মহাপাপ করেছি ভগবানের কাছে?

বললাম, পাপের কথা তো বলিনি! আপনি কেন ও-সব কথা তুলছেন?

মহিলাটি যেন কাঁদতে লাগলেন। বললেন, অপরাধ করেছি? পাপের কথা তুলে আমি অপরাধ করেছি? অপরাধ যদি করেই থাকি তো ঠিকই করেছি—তার জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই। এখন আপনি যান এখান থেকে! আমি ওঁর চেনা লোকদের মুখ আর ওঁকে দেখাতে চাই না। আমি চাই না আমার শ্বশুরবাড়ির লোক কেউ এখানে আসুক। শ্বশুর-শাশুড়ী মারা গেছে—তবে আপনারা কেন জ্বালাতে আসেন মিছিমিছি?

বললাম, অটলদার বাবা-মা তো অটলদার শোকেই মারা গেছেন।

মহিলাটি বললেন, ভালোই হয়েছে, আপদ চুকেছে!

হঠাৎ ভেতর থেকে অটলদার গলা শোনা গেল।

—কই গো হা" পা ধোবার জল দিয়েছো?

আমি বললাম, ওই দেখুন অটলদা কী বলছেন—

মহিলাটি বললেন, সে আমি বুঝিয়ে বলবো'খন, আপনি যান—এখন বেরোন এখান থেকে!

ব'লে একরকম প্রায় জোর করেই আমাকে ঠেলে দরজার বাইরে বের ক'রে দিলেন!

বললাম, কিন্তু অটলদা রাগ করবেন নিশ্চয়!

মহিলাটি বললেন, ওঁর কথা আপনাদের আর দয়া করে ভাবতে হবে না, তার জন্যে আমি আছি—আপনি যান।

ব'লেই দরজাটা ঝপাং ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন আমার চোখের সামনে। আর আমি ঘাটশিলার সেই অন্ধকারের মধ্যে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সে-রাত্রে কখন ট্রেন এসেছে, কখন ট্রেন ছেড়েছে আর ট্রেনে ব'সে কখন কলকাতায় চলে এসেছি কিছুই মনে ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, যে অটলদাকে এতখানি শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম, সে-অটলদা কোথায় হারিয়ে গেল! কেন অটলদাকে আমরা এ-ভাবে হারালাম!

মনে আছে, তারপর কলকাতায় ফিরে এসে অনেকবার ভেবেছি কথাটা সকলকে বলবো। কিন্তু কাকেই-বা বলবো? যাকে চিনতাম, যাকে ভালোবাসতাম, সে তো নেই, সে তো মারা গেছে।

শুধু এইটুকু মাত্র শুনেছিলাম যে, বিয়ের রাত্রের পর অটলদার নতুন বউ-ই আর কোনও সম্পর্ক রাখেনি অটলদার সঙ্গে। অটলদার বড়লোক শ্বশুর জামাইকে ত্যাগ করেছিলেন। আর তারপর সংসারের নানা উত্থান-পতনের ছন্দে কে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলাম, তার সংবাদ কেউ-ই রাখতে পারেনি। আমাদের কারো তেমন অবসর ছিলও না।

এমন তো কত হয়, কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব একদিন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যায়, আর তাদের সাক্ষাৎ মেলে না জীবনে। তেমনি কত অনাত্মীয় অপরিচিতও আবার আপন হয়ে ওঠে—অনাত্মীয়ই পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে! সুতরাং অটলদার কথা, তার বাবা-মার কথা, তার বিবাহিতা স্ত্রীর কথাও আর মনে পড়েনি। বাদামতলা ছেড়ে কত পাড়া, কত পরিবেশ বদলে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে নতুন পাড়ায় এসে উঠছিলাম, তাও আগে থাকতে কিছুই জানা ছিল না।

তাই আজ এতদিন পরে সেই ঠিকানাটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ভুবনবাবু বললেন, আপনার যদি পছন্দ হয় তো আমার আপত্তি নেই।

তা আমার উপরেই যখন ভার, তখন আর-একবার ডেকে পাঠালাম ইন্দুলেখা দেবীকে। ইস্কুলের পিওনের হাত দিয়ে চিঠি পাঠালাম। লিখে দিলাম আর-একদিন যদি আসেন তো আর কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে, তা আমাদের জানা বিশেষ দরকার।

সত্যিই আমার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল—এত যাদের টাকা ছিল, বাপের সেই একমাত্র মেয়ের হঠাৎ কেন চাকরির দরকার হলো! সেই সময়েই তো শুনেছিলাম তার বাবার অনেক টাকা ছিল। লোহার কারবার। বাবা মারা যাওয়ার পর কি সেই সমস্ত টাকা নষ্ট হয়ে গেছে? শুধু এইটুকু শুনেছিলাম যে, স্বামীকে ত্যাগ করার পর অটলদার স্ত্রী আবার নাকি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আছে। ম্যাট্রিকটা পাশ করা ছিল—তারপব কোনো কলেজেও ঢুকেছে! কিন্তু সে যে বি-এ পাশ করেছিল, তা তো আমার জানা ছিল না।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই শ্যামবাজারে গেলা". আমাদের পুরনো বন্ধু অধীর। অধীর বোস। বললাম, শুনেছো—আমাদের অটলদার খবর?

অধীর কর্মঠ লোক। চারিদিকের খবরাখবর রাখে। স্বাস্থ্যও ভালো। অবসরও আছে প্রচুর। বললে, অটলদার কোন্ খবর?

বললাম, অটলদার দ্বিতীয় স্ত্রী এসেছিল আমাদের পাড়ার ইস্কুলে চাকরির জন্যে—কেন বলো তো?

অধীর এতটুকু অবাক হলো না। বললে, কেন, তুমি শোননি?

বললাম, ওদের তো অবস্থা ভালোই ছিল শুনেছিলাম। অতবড় লোহার কারবার বিরাট বাড়ি—বাবা মারা যাবার পর সব নষ্ট হয়ে গেছে নাকি?

অধীর বললে, সব তো নষ্ট করেছে ঐ অটলদাই।

সে-কী! আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—তখনও কোথায় বুঝি অটলদার ওপরে আমাব কী এক দুর্লঙ্ঘ আকর্ষণ ছিল! চেহারায় কিংবা চোখে, কে জানে! অধীরের কথায় আরো অবাক হয়ে গেলাম আমি।

বললাম, তারপর? আমি তো জানতাম না কিছু।

অধীর এতও খবব রাখতে পারে!

অধীর বললে, ঘাটশিলার স্কুলে একবার আমাদের টেক্সট বই ধরাতে গিয়েছিলাম। সেইখান থেকেই খবরটা জোগাড় করেছিলাম।

অধীরের বই-এর দোকান। নানা রকম পাঠ্য বই ছাপিয়ে নানা স্কুলে চালাবার চেষ্টা করে। এই সূত্রে তাকে নানা জেলায় নানা গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে হয়। প্রথমবারে গিয়ে অবশ্য বুঝতে পারেনি যে, অটলদা ওই ঘাটশিলার স্কুলেই আছে। কিন্তু কথাবার্তার পর ধরা পড়লো। আর তারপর যতবার গিয়েছি ততবারই কিছু-কিছু খবর জোগাড় ক'রে এনেছে। অটলদা ছিল আমাদের সকলের আদর্শ ছেলে। সেই অটলদার খবর পেতে কার না কৌতূহল হয়! তারপর যে-সব খবর সে সংগ্রহ করেছিল, তা সত্যিই গোপনীয়। এতদিন পরে সেই কাহিনী নিয়ে গল্প লিখছি জানতে পারলে সত্যিই অনেকেই ক্ষুণ্ণ হতো। কিন্তু এখন আর ক্ষুণ্ণ হবার কেউ নেই। এখন সে-নাটকের শেষ-অঙ্কের শেষ-দৃশ্যের শেষ যবনিকা প'ড়ে গেছে বলেই এ-কাহিনী লিখতে পারছি।

যা হোক, যে-কথা বলছিলাম।

আমাদের মতন বোধহয় ইন্দুলেখা দেবীও তখন অটলদার সন্ধান করছিলেন। বোধহয় অনেক জায়গাতে খোঁজও নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও না-পেয়ে হয়তো হতাশই হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে আমাদেরও যা হয়েছিল, ইন্দুলেখা দেবীরও তাই হলো। অর্থাৎ ইন্দুলেখা দেবী একদিন গিয়ে হাজির হলেন ঘাটশিলায়।

ভেতর থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলে, কে?

ইন্দুলেখা বললে, আমি।

—আমি কে? মনে নেই?

বলতে-বলতে যে বেরিয়ে এলো তাকে ইন্দুলেখা চিনতে পারলে! কুন্তি দেবী। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার আগেই একেবারে ভেতরে ঢুকেই পড়েছে। একেবারে অটলদার শোবার ঘরের মধ্যে।

অটলদা বুঝি তখন আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বই পড়ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখে বললে, তুমি?

আর কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল না কারোর। তবু অটলদা বললে, হঠাৎ এলে যে?

ইন্দুলেখা বললে, আমার বাবা মারা গেছেন আজ ছ'মাস হলো—

অটলদা বললে, বয়েস হয়েছিল তাই মারা গেছেন, তা আমি তার কী করতে পারি?

ইন্দুলেখা বললে, তুমি আবার কী করবে, তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

অটলদা বললে, তা এই খবরটা বলতেই কি এতদূর এলে?

ইন্দুলেখা বললে, নেহাত পাগল না হ'লে কেউ ওই খবরটুকু বলতে এতদূর আসে?

অটলদা বললে, তা বলবে তো মুখ ফুটে, কেন এসেছ তুমি?

ইন্দুলেখা বললে, নিশ্চয় বলবো, না বললে তুমি যে জিতে যাবে!

ভেবেছো, আমাকে হারিয়ে দিয়ে তুমি সংসারের কাছে বাহবা কুড়িয়ে বেড়াবে?

অটলদা বললে, আমার বাহবা নেবার কথা থাক্।

ইন্দুলেখা বললে, তখন ছোট ছিলাম তাই বুঝিনি, কিন্তু এখন বড় হয়েছি, এখন বুঝেছি কী তোমার মতলব।

—কী বুঝেছো?

সমস্ত ঘরখানা যেন থম্‌থম্ করতে লাগলো। ঘরের আল্‌না, বিছানা, তোষক—সব যেন কেমন সজীব হয়ে উঠল। বাইরের জানলা দিয়ে একটা চড়াই পাখি ঘরে ঢুকে পড়েছিল, সেও যেন আর সহ্য করতে পারল না।

ইন্দুলেখা বললে, তোমার সঙ্গে আমার তো শুধু সম্পত্তির লেনদেনেরই সম্পর্ক—আর কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে বলো?

অটলদা বললে, এতদিন পরে তুমি সেটা বুঝলে?

—নির্লজ্জের মত তুমি সেটা স্বীকার করতে পারলে তা'হলে?

অটলদা বললে, তোমাকে বিয়ে করতে যাওয়াটাই একটা নির্লজ্জতা হয়েছিল—সে-কথা কে-না জানে! আজ স্বীকার করলে কি সে নির্লজ্জতা কিছু কমবে?

ইন্দুলেখা বললে, কিন্তু এই অবস্থায় দিন কাটিয়ে সেই নির্লজ্জতাকেই তো ঢাকা দিতে চাইছো, আমি বুঝি না কিছু?

অটলদা বললে, আমার যে অবস্থাই হোক, তবু তোমার কাছে তো আমি ভিক্ষে করতে যাইনি।

ইন্দুলেখা বললে, ভিক্ষে চাইবার মতই যে তোমার অবস্থা তা-ও তো দেখছি, কিন্তু কেন যে ভিক্ষে চাওনি, তাও আমি জানি!

অটলদা বললে, কী জানো বলো?

ইন্দুলেখা বললে, তাই বলতেই তো এসেছি—আর কেন এতদিন আসিনি তাও বলবো। যে-সম্পত্তির জন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে, সেই সম্পত্তি না নিয়ে ভেবেছ, তুমি খুব জিতে যাবে?

—তার মানে!

ইন্দুলেখা বললে, বড় অহঙ্কার তো তোমার?

অটলদা বললে, কী বলতে এসেছ স্পষ্ট ক'রে বলো।

—স্পষ্ট করেই তো বলছি, অনেক চিঠি তোমায় লিখেছি, একখানারও তো উত্তর দাওনি। ভেবেছো, ভুগে-ভুগে না-খেয়ে, না-প'রে মরবে, আর তোমার শোকে সবাই কাঁদবে, না?

অটলদা বললে, তোমার একটা চিঠিও পেয়েছি ব'লে তো মনে পড়ছে না আমার। কিন্তু সে যাক্‌গে, সে চিঠিতে কী লিখেছিলে তুমি?

—শুনুন!

হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েলি-গলায় ডাক আসতেই ইন্দুলেখা পেছনে তাকালে। দেখলে, কুন্তি দেবী দাঁড়িয়ে আছে দরজার চৌকাঠের ওপর।

বললে, কী?

মহিলাটি বললে, দেখছেন, মানুষটার আজ একবছব ধ'বে অসুখ, আর এসব কী বলছেন আপনি?

ইন্দুলেখা বললে, কেন, একবছর ধ'বে যদি অসুখ তো ডাক্তার ডাকা হয়নি কেন? আর ভালো ডাক্তার ডাকার পয়সা না থাকে তো আমার কাছে চাওনি কেন তোমরা?

তারপর অটলদার দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, সম্পত্তিব জন্যেই তো আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তোমার বাবা, আর আজ সেই টাকা চাইতে এত লজ্জা?

—চোপরাও!

হঠাৎ যেন বোমা ফেটে পড়লো ঘরের ভেতর। অটলদার গলাতে যে এত জোব থাকতে পারে, তা যেন আগে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।

কিন্তু এত সহজেই যদি হার মানবে ইন্দুলেখা তবে সে ইন্দুলেখাই বা হয়েছিল কী করতে?

সে-ও গলা চড়িয়ে বললে, চুপ করতে বলছো তুমি কাকে?

অটলদা বললে, তোমাকে!

ইন্দুলেখা বললে, চুপ করে থাকবো ব'লে তো এখানে আসিনি। আজ চুপ ক'রে থাকবাব পালা আমার নয়, আমি আজ নিজের দাবী জানাবো বলেই এসেছি। আর সে-দাবী আমি জোর গলায় চেঁচিয়ে বলবো বলেই এসেছি।

অটলদা বললে, তা কি তোমার দাবী, বলো? ব'লে এখান থেকে চলে যাও।

ইন্দুলেখা বললে, শুধু দাবী জানানো নয়, তার প্রতিকারও আমি চাইবো।

অটলদা বললে তা বলো, কি দাবী তোমার বলো?

ইন্দুলেখা বললে, তোমরা দু'জনে মিলে কি এমন করেই আমার জীবনটা নষ্ট ক'বে দেবে? আমি কি কেউ নই? আমি কি তোমাদের কেউ-ই-নই? আমাকে কি তুমি অগ্নিসাক্ষী ক'রে বিয়ে করোনি?

অটলদা বললে, আমি তো বলেছি, সে আমার লজ্জা।

—সে যদি তোমার লজ্জা হয় তো আমার কী? তোমার লজ্জার ফল আমি ভুগবো কেন? তার জবাব দাও আমাকে?

অটলদা খানিকক্ষণ জবাব দিতে পাবলে না এ-কথার।

তারপর বললে, কি খেসারত পেলে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে, বলো? আমি তা-ই দেবো।

ইন্দুলেখা গর্জে উঠলো।

বললে, নির্লজ্জ ভীরু কোথাকার! কোন মুখে তুমি মুক্তির কথা বলতে পারলে? তোমার যদি মুক্তি হয় তো এই সমস্ত সবকিছু মিথ্যে। ভগবান মিথ্যে, চন্দ্র-সূর্য মিথ্যে, এই পৃথিবীটাই মিথ্যে!

অটলদা একটু থেমে বললে, তুমি কী চাও এখন তাই বলো—আমার শরীর খুব খারাপ।

ইন্দুলেখা বললে, আমি চাই তোমাকে সারিয়ে তুলতে!

অবাক হয়ে গেল কুন্তি দেবী। সারিয়ে তুলতে!

সামনে বাজ পড়লেও যেন এতটা অবাক হতো না কুন্তি দেবী। যে তেজী মেয়ে কুন্তি দেবী, সেও আজ যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে গেল। তার মুখ দিয়েও আর কোনো কথা বেরোলো না হঠাৎ।

ইন্দুলেখা বলতে লাগলো, তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কেন আমি তোমাকে সারিয়ে তুলতে চাইছি! আমার এত-বড় সর্বনাশ যে করেছে, তাকে সারিয়ে তুলে আমার লাভ কী? লাভ আমার আছে বলেই তোমাকে আমি সারিয়ে তুলতে চাই, তোমাকে সারিয়ে না তুললে আমার যে মুক্তি হবে না!

অটলদা যেন কিছু বলতে পারলে না। বললে, তার মানে?

ইন্দুলেখা বললে, তার মানে যদি তুমি বুঝবে, তাহ'লে আমার কপালে এত দুর্ভোগ হবে কেন? তার মানে তোমার বুঝেও দরকার নেই।

হঠাৎ অটলদার দিকে নজর পড়তেই ইন্দুলেখা দেখলে, মানুষটা যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে উত্তেজনার মধ্যে! এতক্ষণ বসেই ছিল অটলদা। এবার যেন টলছে। তারপর টলতে-টলতে বিছানার ওপর ঢ'লে পড়লো। আর সঙ্গে-সঙ্গে মুখ দিয়ে গল্-গল্ ক'রে রক্ত পড়তে লাগলো! ইন্দুলেখা সঙ্গে-সঙ্গে পেছন ফিরে বললে, কী দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? একজন ডাক্তারকে ডাকুন।

কুন্তি বললে, ও ওঁর নতুন নয়।

—নতুন নয় তো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলেই চলবে? একটা পিক্‌দানি কি কিছু দিন—না'হলে মানুষটা মারা যাবে যে।

কুন্তি তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বললে, আপনি এখানে থাকলে ওঁকে বাঁচাতে পারবো না, আপনি চলে যান—

ইন্দুলেখা বললে, চলে যাবো ব'লে তো আমি আসিনি।

—কিন্তু যদি ওঁর ভালো চান তো এখানে থাকা আপনার চলবে না।

ইন্দুলেখা বললে, এ অবস্থায় ওঁকে ফেলে রেখে তো আমি চলে যেতে পারবো না—আপনি হাজার বললেও না।

—তাহ'লে কি চোখের সামনেই ওঁর মৃত্যুই আপনি দেখতে চান?

ইন্দুলেখা বললে, আমি কী চাই সে আপনাকে ভাবতে হবে না, ওঁর ভালো-মন্দ—আমার নিজেরও ভালো-মন্দ, তার চেয়ে আমি নিজেই দেখি কী করতে পারি।

ব'লে ইন্দুলেখা নিজেই অটলদার মাথার কাছে ব'সে মাথাটা কোলে ক'রে নিয়ে বসলো।

তারপর নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে অটলদার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে মাথার ওপর পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। সে এক আশ্চর্য মূর্তি ইন্দুলেখা দেবীর!

কুন্তি দেবী সেই চেহারার দিকে চেয়ে হতবাক্ হয়ে রইলো।

আর তার পরদিন থেকে সেই রুগী, সেই সতীন, আর সেই সংসারের ভার পড়লো—ইন্দুলেখা দেবীর ওপর।

এবার গল্পটা থামিয়ে অধীর এক গ্লাস জল চাইলো।

কিন্তু আবার আমি বললাম—তারপর?

অধীর বোস এবার গল্পটা পুরো বললে।

তারপর বললে, শেষে অটলদা আমাদের সেই হিরো অটলদা, দ্বিতীয় পক্ষের বউ-এব টাকা ধ্বংস ক'রে খেতে লাগলো। ওষুধ, ডাক্তার, বাড়িভাড়া সব জোগাতে লাগলো ওই ইন্দুলেখা দেবী।

—তারপর?

অধীর বললে, তারপর আজ পুরী, কাল ওয়ালটেয়ার এই তো করতো! বাপ মারা যাবার পর থেকেই লোহার কারবার চলে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল, সেই টাকা ভাঙিয়ে-ভাঙিয়ে চলছে! আমাদের সেই অটলদার যে শেষকালে এমন পরিণতি হবে ভাবতে পারিনি ভাই! বউ-এর টাকায় কিনা অটলদার সংসার চলে?

মনে-মনে ভাবলাম, হয়তো তাই হবে। অধীর বোসের কথাই হয়তো সত্যি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে, এখন চাকরীর দরকার হয়েছে ঐ অটলদার জন্যেই।

অধীর জিজ্ঞেস করলে, চাকরি দিলে নাকি শেষ পর্যন্ত?

বললাম, দেখি, কী উত্তর আসে, কাল একবার আসতে বলেছি। ভাবছি জিজ্ঞেস কববো তাঁর চাকরি করবার কী দরকার?

ভেবেছিলাম, আমার চিঠি পেয়ে পরদিনই চলে আসবেন ইন্দুলেখা দেবী। ভুবনবাবুকেও বলে রেখেছিলাম—এ মহিলাটি আমার পরিচিত। এঁকেই চাকরিটা দিন। ভুবনবাবুও রাজী ছিলেন। কিন্তু যে-সময় আসার কথা সে-সময় এলেন না। দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, কখন দেড়টা বেজে গেছে। অথচ খববটা ঠিক সময়েই দেওয়া হয়েছিল লোক মারফত। বেলা তখন দুটো তখনও খবর এলো না।

যখন বেলা তিনটে বাজলো তখন ইন্দুলেখা দেবী এলেন।

চেহারাটা কেমন যেন উস্কোখুস্কো। দেখে মনে হলো, যেন সারা রাত ঘুম হয়নি তাঁর। আমি তাঁর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

তিনি বললেন, না।

বললাম, আপনাকেই আমরা এই পোস্টের জন্যে সিলেক্ট্ করেছি। আপনি যথাসময়েই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবেন।

তাঁর চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে উঠলো। তিনি আমাকে নমস্কাব ক'বে চলে গেলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আপনি যে আমার কী উপকার করলেন তা মুখে বলে প্রকাশ করতে পারবো না।

শুধু সিলেক্‌শানের ভারই ছিল আমার ওপর আর কিছু নয়, তারপব আমি আর কেউ নই। স্কুলের সঙ্গে আমার নিজের কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। তাই আমি আমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। স্কুল-কমিটির কেউই নয় আমি।

স্থায়ী সেক্রেটারী ভুবনবাবু ছুটি থেকে ফিরে এসে আমার কাছে একদিন এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখছেন ইন্দুলেখা দেবীকে? টিচার সিলেক্‌শান কেমন হয়েছে বলন?

ভুবনবাবু বললেন, অত্যন্ত ভালো, এত ভালো টিচার আমাদের স্কুলে আর নেই।

—কী রকম?

ভুবনবাবু বললেন, ভদ্রমহিলা অদ্ভুত পাঙচুয়াল। একদিনের জন্যেও কামাই নেই ওঁর।

বললাম, কিন্তু আমি একটা রিস্ক্‌ নিয়েছিলাম।

—কী রিস্ক্‌?

বললাম, ভদ্রমহিলার স্বামী ভদ্রমহিলাকে ত্যাগ করেছেন, তাই আমার একটু ভয় হয়েছিল।

ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কিসের ভয়?

বললাম, হয়তো আপনাদের স্কুলের মেয়েদের চরিত্রে কিছু রিফ্লেক্‌শন করতে পারে।

ভুবনবাবু বললেন, না মশাই, বরং ঠিক তার উল্টো। ও-রকম আদর্শ চরিত্রের মহিলা টিচার আমি তো আগে কখনও দেখিনি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম একটু। স্কুলে এত মহিলা-টিচার থাকতে ইন্দুলেখা দেবীকেই বা কেন এত আদর্শস্থানীয়া মনে হলো, তাও বুঝতে পারলাম না।

বললাম, কী জন্যে আপনার মনে হলো ও-কথা, বলুন তো? কিসের আদর্শস্থানীয়?

ভুবনবাবু বললেন, খুব সাদাসিধে পোষাক-পরিচ্ছদ। চা, পান কোনও নেশা নেই, ছাত্রীদের ক্লাসে খুব যত্ন নিয়ে পড়ান, আমাদের হেডমিস্ট্রেসও খুব খুশী ওঁর ওপর, তাছাড়া ছাত্রীরাও ওঁকে খুব ভক্তি করে, এবং ভালোবাসে।

বললাম, যাক্‌, আমার নির্বাচন যে ভালো হয়েছে, তাই-ই ভালো, আমার সেইজন্যেই একটু ভয় ছিল।

সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে বেশ সুনাম ছড়িয়ে গেল ইন্দুলেখা দেবীর। সকলেই ইন্দুলেখা দেবীর কাছে পড়তে চায়। বাড়িতেও ইন্দুলেখা দেবী কয়েকজন ছাত্রীকে পড়াতে লাগলেন। সকালে বাড়িতে ছাত্রী পড়ানো, রাত্রেও বাড়িতে ছাত্র পড়ানো। দুপুরবেলা স্কুল।

ভুবনবাবুও মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তিনি তখন স্কুলে যাচ্ছিলেন। বেশ ঘোমটা দিয়ে কোনোদিকে দিক্‌পাত না ক'রে নিচু-মুখে রাস্তার দিকে চেয়ে চলেছেন। একবার ভাবলাম, ডেকে কথা বলি। কিন্তু আবার ভাবলাম, এ উচিত নয়। নিঃসম্পর্কীয়া মহিলার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা অভদ্রতা। দেখলাম, আটপৌরে একটা শাড়ি! একজোড়া সাধারণ চটি পায়ে। সাধারণ ব্লাউজ। মাথায় ছোট ছাতা।

একবার ইচ্ছে হলো, জিজ্ঞেস করি—অটলদার খবর কী? অটলদা কেমন আছে?

কিন্তু আমার এ-প্রসঙ্গ হয়তো ইন্দুলেখা দেবী স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না, তাই ভেবেই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

পরে ভুবনবাবুর কাছেই শুনলাম সব।

তিনি বললেন, শুনেছেন কাণ্ড?

বললাম, কিসের কাণ্ড?

—আপনার ইন্দুলেখা দেবীর কাণ্ড?

বললাম, না। কিছু শুনিনি তো।

ভুবনবাবু বললেন, দেবী মশাই, দেবী। ইন্দুলেখা আসলে মানুষ নন্, দেবী।

ব'লে তিনি সমস্ত ইতিবৃত্ত ব'লে গেলেন। কেমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। কেমন ক'রে স্বামীর কাছ থেকে অবহেলা, অত্যাচার, অনাদর পেয়েছেন। সমস্ত কাহিনী। তারপর সেই রুগ্ন স্বামীর জন্যে কেমন ক'রে পৈত্রিক সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি খরচ করেছেন। যে স্বামী তাঁকে বিয়ের প্রথম দিনটি থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই স্বামীর জন্যেই কীভাবে তিনি নিজের বিলাস-ব্যসন, অর্থ, স্বাস্থ্য সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। সেই স্বামীকেই তিনি কতবার কত স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠিয়েছেন. কত বড়-বড় ডাক্তার ডাকিয়ে দেখিয়েছেন, কত দামী-দামী ওষুধ কিনে খাইয়েছেন, সব কাহিনীই বললেন।

শেষে ভুবনবাবু বললেন, সত্যি, আজকালকার সমাজে এমন পতি-ভক্তি দেখা যায় না মশাই, এ যে সাক্ষাৎ দেবী একেবারে।

বললাম, আমি সব জানি।

—আপনি সব জানেন?

ভুবনবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, আপনি সমস্ত জানতেন?

বললাম, জানতাম বলেই তো ওঁকে এই পোস্টের জন্যেই সিলেক্ট্ করেছিলাম।

ভুবনবাবু বললেন, আজ পনেরো বছর ধ'রে এইরকম ক'রে স্বামীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এ তো বড় কম কথা নয় মশাই। আজকাল কোন্ স্ত্রী এ-রকম করতে পারে, বলুন?

বললাম, তা তো বটেই।

ভুবনবাবু বললেন, আমি ভাবছি মশাই, এ-রকম পতিব্রতার একটা সম্বর্ধনা হওয়া উচিত—আপনি কী বলেন?

বললাম, আপনারা যদি তাই মনে করেন তো করুন, আমার কোনো অসম্মতি নেই।

ভুবনবাবু বললেন, কিন্তু ইন্দুলেখা দেবী যে আপত্তি করছেন, তিনি বলছেন তাঁর এতে অমত আছে। তিনি বলেছেন, আমি স্বার্থত্যাগ করেছি আমার রুগ্ন স্বামীর জন্যে, সম্বর্ধনার কী দরকার!

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি যদি একটু রাজী করাতে পারেন, দেখুন না।

বললাম, আমার সঙ্গে যে ওঁর স্বামীর পরিচয় আছে, সেটা আমি জানাতে চাই না।

—তা'হলে এক কাজ করুন।

ব'লে ভুবনবাবু আর একটা প্রস্তাব দিলেন।

বললেন, তাহ'লে আমরা যদি পাবলিকের কাছে কিছু চাঁদা তুলে ওঁর রুগ্ন স্বামীর জন্যে সাহায্য করি?

আমার মনটা তাতে খুশী হলো।

বললাম, সে তো ভালোই, তাতে আমার আপত্তি নেই।

ভুবনবাবু বললেন, তাহলে সেই প্রস্তাবটাই করি ওঁকে—কী বলেন?

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। কিছু দিনের মধ্যে ভুবনবাবুর চেষ্টাতেই হাজারখানেক টাকা চাঁদা তোলা হলো। কম-বেশী সবাই কিছু-কিছু দিলেন। আমিও দিলাম পাঁচ টাকা। ভুবনবাবুও দিলেন শ'খানেক টাকা। আমার এতে আনন্দ হবারই কারণ ছিল! অটলদা—আমাদের সেই ছোটবেলাকার অটলদার জন্যে আরো বেশি কিছু করতে পারলেও খুশী হতাম আমরা।

অনুষ্ঠানটা গোপনভাবেই হলো। কারণ, ইন্দুলেখা দেবী এ নিয়ে জাঁক-জমক কিছু করতে চান না। তিনি হাত পেতে টাকাটা নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, প্রার্থনা করুন, যেন আমার স্বামী তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, অটলদা কলকাতায় এসেছে। অধীর বোসই খবরটা দিলে। অটলদা পেনড্রা-রোডের টি-বি স্যানিটোরিয়ামে ছিল, সেখান থেকে কলকাতায় আনিয়েছেন ইন্দুলেখা দেবী।

বললাম, তাহলে অটলদা নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে?

অধীর বোস বললে না, সেরে উঠলে আর কলকাতায় নিয়ে আসবে কেন?

বললাম, ঠিকানাটা তুমি জানো?

অধীব বোসই অটলদার ঠিকানাটা দিলে। তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েই আমি গেলাম বউবাজারের একটা বাড়িতে।

কলকাতায় এত বাড়ি থাকতে অটলদা এই পাড়ায়, এই অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে কেন বাড়ি-ভাড়া নিলে কে জানে! আর কোন ভালো আলো-হাওয়া রোদওয়ালা বাড়ি পেলে না?

অন্ধকার ড্যাম্প্ ঘবখানার মধ্যে বহুদিন পরে অটলদাকে দেখে সেবারকারই মত অবাক হয়ে গেলাম। যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, বুঝলাম, তিনি সেদিনের সেই বৌদি কুন্তি দেবী। তাঁর চেহারা আরো বদলে গিয়েছে।

বললাম, আমায় হয়তো আপনি চিনতে পারছেন?

বৌদি বললেন, না।

বললাম, আমি বহুদিন আগে ঘাটশিলাতে গিয়েছিলাম অটলদাকে দেখতে—আমি অটলদার সঙ্গে একই স্কুলে পড়তাম।

—আপনি কেন এসেছেন?

বললাম, শুনলাম, অটলদা এখানে আছেন, তাই একবার দেখতে।

—কী দেখবেন তাঁর?

বললাম, কেন, তাঁর সঙ্গে কি দেখা করা নিষেধ?

—না, নিষেধ নয়, কিন্তু তাঁকে দেখলে তিনি হয়তো আরো অনেকদিন বেঁচে যেতে পারেন।

আমি কথাটা শুনে প্রথমে একটু চমকে উঠলাম। কথাটার মানে বুঝতে যেন আমার একটু দেরি হলো। বললাম তার মানে?

বৌদি বললেন, তার মানে তাঁর তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ভালো।

—কেন?

বৌদি বললেন, মারা গেলেই তিনি শান্তি পাবেন। আর আমিও তাই চাই।

আবার অবাক হয়ে বললাম, আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

বৌদি বললেন, আমি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাড়াতাড়ি মারা যান, তাঁর কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পারছি না!

—আপনি বলছেন কী?

বৌদি বললেন, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, মারা যাওয়াই তাঁর পক্ষে মঙ্গল, তাতে আমারও মঙ্গল।

—কিন্তু আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না,। আমি শুনেছিলাম, অনেকদিন ধ'রে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে। অনেক টাকা খরচ হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে। আরো শুনেছিলাম, একজন তাঁর জন্যে তাঁর নিজের সমস্ত সম্পত্তি বেচে তাঁর চিকিৎসার খরচ চালাচ্ছেন, তিনি নিজেও উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন অটলদার জীবন বাঁচাবার জন্যে?

বৌদি বললেন, ভুল শুনেছেন।

বললাম, না বৌদি, ভুল নয়, আমাদের পাড়ার একটা স্কুলে তিনি চাকরি করছেন। আমরা—পাড়ার লোকেরা সবাই মিলে তাঁর স্বামীর চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছি।

বৌদি বললেন, আপনারা ভুল করেছেন। অতবড় জোচ্চোর, অতবড় নিষ্ঠুর, অতবড় নীচ মেয়েমানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি। আমি সামনে পেলে তাকে খুন ক'রে ফেলতাম।

আমার অবাক হবার যেন তখনও অনেক বাকি ছিল।

বললাম, আগনি রাগের মাথায় কার সম্বন্ধে কী বলছেন এ-সব?

বৌদি বললেন, আপনি জানেন না বলেই এই কথা বলছেন, জানলে আর তাকে সোহাগ ক'রে হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিতেন না। জানেন, সে কতবড় বেহায়া নীচ মেয়েমানুষ?

বললাম, কিন্তু আমরা তো তাঁকে ভালো মহিলা বলেই জানি। তাঁর স্বামীর জন্যে তিনি সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

—আপনারা কিছু জানেন না, তাই। জানলে তাকে ঝাঁটা মেরে স্কুল থেকে বিদেয় করতেন।

—কেন?

বৌদি বললেন, তবে শুনুন, এতবড় নীচ মেয়েমানুষ যে, স্বামীর ওপর একটু দয়ামায়াও নেই শরীরে। বাইরের লোক জানে যে, স্বামীর জন্যে ওই মেয়ে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে, কিন্তু অতবড় নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ ভূ-ভারতে আর জন্মায়নি। আমি ওঁর দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখি আর অবাক হয়ে যাই। মানুষটা হয়তো বেঁচে যেত, কিন্তু ওই পোড়ারমুখীর হাতে যে দিন থেকে পড়েছে, সেদিন থেকে আর ওঁর বাঁচবার কোনও আশা নেই।

বললাম, সে কী?

—হ্যাঁ, লোকে যেমন ইঁদুরকে আধমরা জীইয়ে রেখে মজা পায়, এও তেমনি ওষুধ পত্তর, টাকা-কড়ি সব কিছ দিচ্ছে। দরকার হ'লে চেঞ্জেও পাঠাচ্ছে। এই সেদিন ওয়ালটেয়ারে পাঠিয়েছিল ছ'মাসের জন্যে, পুরীতে রেখেছিল দু'বছর, এবার পেনড্রা-রোডে তিন বছর ধ'রে টি-বি স্যানিটোরিয়ামে রেখেছিল—

বললাম, কিন্তু তার জন্যে তো সব খরচ তিনিই দিচ্ছেন?

—তা তো দিচ্ছেই, আজ পর্যন্ত কত-হাজার, কত লক্ষ টাকা যে খরচ করেছে, তার কোনো হিসেবই নেই। হাজার-হাজার টাকা খরচ ক'রে আমাকে আর ওঁকে পাঠিয়েছে সব জায়গায়। যেখানে যত ডাক্তার আছে, সকলকে পয়সা দিয়ে ডেকে ওঁর চিকিৎসা করিয়েছে। যেখানে যত ওষুধ পাওয়া যায় সব কিনিয়ে দিয়ে খাইয়েছে—কখনও কোনো চিকিৎসার কিছু ত্রুটি রাখেনি--

বললাম, তা হ'লে? তা হ'লে কেন ও-কথা বলছেন, মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন তাঁর নামে?

—দোষ দেবো না? তাহ'লে সারছে না কেন? এত ওষুধের পরেও সারছে না কেন ওঁর অসুখ?

বললাম, অসুখ সারা কি মানুষের হাতের মধ্যে?

—না, সে জন্যে নয়, সারলে যে আমার কপালে সুখ হবে তাই।

—কিন্তু তিনি তো সারিয়েই তুলতে চাইছেন আপনার স্বামীকে?

বৌদি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, বললেন, সেই কথাই সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কী জানেন?

বললাম, আপনিই বলুন না, আসল উদ্দেশ্য তো স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলা, সুস্থ ক'রে তোলা—আর কী?

বৌদি বললেন, না আসল উদ্দেশ্য তা নয়।

বললাম, তাহ'লে আসল উদ্দেশ্য কী স্বামীর মৃত্যু ঘটানো?

—না, তা-ও নয়।

—তবে?

বৌদি বললেন, আসল উদ্দেশ্য হলো, মানুষটাকে না-মরা, না-বাঁচা অবস্থায় রাখা। সারা জীবন যেন এই রকম পঙ্গু-অথর্ব হয়ে থাকে, এই-ই সে চায়।

—সে কী?

—হ্যাঁ, নইলে যেই চিকিৎসায় একটু সেরে ওঠার মত অবস্থা হয়, অম্‌নি কেন চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেয়? সেবার ওয়ালটেয়ারে শরীরের বেশ উন্নতি হচ্ছিল ওঁর। যেই খবরটা পেয়েছে, অমনি বললে, আর ওয়ালটেয়ারে থাকতে হবে না। চলে এসো! আর কিছুদিন ওখানে থাকলে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যেতেন। কিন্তু তা তো ওর সহ্য হবে না। আর-একবার একটা ওষুধে বেশ কাজ হচ্ছিল। খুব দামী ওষুধ। যেই দেখলে সত্যি-সত্যিই মানুষটা বেঁচে উঠেছে, অম্‌নি টাকা পাঠানো বন্ধ করলে!

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এই তো এবার পেনড্রা-রোডের স্যানিটোরিয়ামে তিন বছর রাখলে, বেশ ওজন-টোজন বাড়তে লাগলো, ক্ষিধে হ'তে লাগলো, কিন্তু যেই সে-খবর কানে গেল, অম্‌নি চিঠি লিখলো—চলে এসো এখানে, আর টাকা পাঠাতে পারছি না।

আমি কথাগুলো শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোচ্ছিল না।

অনেক পরে বললাম, তাহ'লে আসল উদ্দেশ্যটা কী?

—উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, মজা দেখা। ইঁদুরকে যেমন আধমরা ক'রে রেখে লোকে মজা দেখে, এও তাই। ছেড়ে দেবে না, অথচ মেরেও ফেলবে না—এ এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর আনন্দ। ওকে আমি খুন করতে পারলেই মনের সাধ মেটাতে পারতাম।

এর পর আমার আর কিছু বলবার ছিল না। চলে আসবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা এখন কেমন আছেন অটলদা?

বৌদি খানিক থেমে উত্তর দিয়েছিলেন, এত কথা শোনার পরেও আপনি এই কথা জিজ্ঞেস করছেন?

যাহোক, অটলদা তখন ঘুমোচ্ছিল। দূর থেকে তাকে দেখেই সেদিন চলে এসেছিলাম। কোনও কথা বলবার সুযোগ আমার হয়নি অটলদাব সঙ্গে।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার। ঠিক এ-ধরনের কোনও গল্প কোনও উপন্যাসেও পড়িনি। এমনও যে হতে পারে তা যেন কল্পনা করতেও পারি না। মনে-মনে কদিন বড় অশান্তিতে কাটালাম। এ কেমন ক'রে হয়? এমনি ক'রে আর-একটা সংসারের সর্বনাশ লোকে কেমন ক'রে করতে পারে? আর এতে কি ইন্দুলেখা দেবী নিজেই শান্তি পেয়েছে। আমিও অনেক মোটা-মোটা উপন্যাস লিখেছি। ভেবেছি আমিই বুঝি মানুষ-চরিত্রটা বুঝি, ভেবেছি মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র সবই বুঝি আমার জানা। তাছাড়া পৃথিবীর অনেক উপন্যাসই তো প'ড়ে দেখেছি।

সেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ ক'রে টলস্টয়, বাল্‌জাক, মোঁপাশা, গোর্কী কিছুই তো বাদ দিইনি। শুনেছি বাল্‌জাক নাকি 'The greatest creator of human characters next to God'। কিন্তু তাঁর বইতেও তো এমন চরিত্র একটাও নেই। তবে কি কুন্তি দেবী মিথ্যে কথা বললে? সবই রাগের কথা? নিজের সতীনের ওপর নিজের মনের ঝাল মেটাতে চেয়েছে? কী জানি। আমি অনেক মাথা খাটিয়েও এ রহস্যের কিছু সমাধান করতে পারলাম না।

সেদিন হঠাৎ অধীর বোস বাড়িতে এসে হাজির।

অধীর বোস এমনিতে কারো বাড়ি যাবার সময় পায় না। আমার নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানা ছিল না তার। রবিবারটা ছুটির দিন দেখে বেরিয়ে পড়েছে।

এসেই বললে, এসে পড়লাম।

আমি বললাম, সেই ব্যাপারে কোনও খোঁজ পেয়েছো!

—কিসের খোঁজ?

আমি বললাম, আমি ভাই সেই অটলদার ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।

অধীর বোস বললে, আমিও তো সেই ব্যাপার সম্বন্ধেই বলতে এসেছি।

তারপর সে যা বললে, তা শুনে আরো অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, মানুষের সংসারে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে, মানুষের মন যে কত বিচিত্র পথে আনাগোনা করে, তার হিসেব কি বিধাতা পুরুষই জানতে পারে! এ পৃথিবীতে যত রকমের মানুষ, তত রকমের চরিত্র। উপন্যাস-লেখকের সাধ্য কি সকলের মন সে জানবে, সকলের মনের খবরদারি সে করবে। তা যদি হতো, তাহ'লে লেখার মাল-মশলাও কবে ফুরিয়ে যেত সংসারে, উপন্যাস লেখাও বন্ধ হয়ে যেত চিরকালের মতো। ফরমুলা দিয়ে যদি মনের বিচার করা সম্ভব হতো, মানুষ তাহ'লে আর মানুষ থাকতো না। মানুষও মেশিন হয়ে যেত।

সে অনেকদিন আগের কথা। এ উপন্যাসের একেবারে গোড়ার ঘটনা।

অটলদা তখন আমাদের পাড়ার মধ্যমণি! লেখাপড়ায় ফার্স্ট আদর্শ-চরিত্র ছেলে। পাড়ায়-পাড়ায় তখন চরিত্র গঠনের আয়োজন-অনুষ্ঠান চলছে। ছোট ছেলেদের মনের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব। এখন যেমন রাজকাপুর, দিলীপকুমার, নার্গিসের নাম সকলের মুখে, তখন তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের নাম। তাঁর ব্রহ্মচর্যের বই ছেলেদের পড়তে দেওয়া হয় চরিত্র-গঠনের জন্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" ছেলেদের ক্লাবে-ক্লাবে ঘোরে। সে সেই অগ্নিযুগের শেষের দিককার কথা। পাড়ায়-পাড়ায় টেগার্ট সাহেব ঘরে বেড়ায়। টেগার্ট সাহেব তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। স্পাই-এর জাল পাতা সমস্ত শহরে। এক-একটা পাড়ায় ঘুরে-ঘুরে দেখে আর ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ভাব করে। টেগার্ট সাহেবের পায়ে পাম্প্‌-শু গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরণে দিশী তাঁতের কোঁচানো ধুতি। কোথায় কারা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলছে, কারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লোক খেপাচ্ছে, কারা কোথায় লাঠি-খেলা ছোরা-খেলা শিখছে, এইসব দেখে বেড়ানোই কাজ ছিল টেগার্ট সাহেবের। তারপর একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে হানা দিত পাড়ায় আর বাছা-বাছা কয়েকজনকে ধ'রে নিয়ে যেত।

আজকের দিনে যারা ছোট, তাদের এসব জেনে রাখা দরকার। ইণ্ডিয়ার এ-স্বাধীনতা অকারণে আসেনি। কোটি কোটি লোকের চিন্তায়, চেষ্টায় আত্মত্যাগেই এর আবির্ভাব। আজকে

আমরা নিশ্চিন্ত মনে যা-খুশী তাই করছি। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারছি। সেদিন লাট-সাহেবের বাড়ির আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করলে পুলিশ এসে ধ'রে নিতো। চৌরঙ্গীতে নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাঘুরি করা যেত না। টমিদের ছড়ি এসে পড়তো মাথায়। অথচ তার কিছু প্রতিকার ছিল না। নালিশ করলেও কিছু হতো না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে ছিল অরাজক রাজত্ব।

ট্রেনে যে-কামরায় ইংরেজরা চড়তো, সেখানে ইণ্ডিয়ানদের চড়া চলবে না।

থার্ড ক্লাশ কামরাতেও দু'চারজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকলে আর কোনও ইণ্ডিয়ানদের ঢোকবার অধিকার নেই সেখানে। সে এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তখন বাস করতাম আমরা। অর্থাৎ সেই উনিশশো পঁচিশ-ছাব্বিশ সালে। তখন এই কংগ্রেসের সুরও ছিল নরম। আবেদন-নিবেদন ক'রে কিছু-কিছু ক্ষমতা আদায় করবার চেষ্টা করছে কেবল। বছরে একবার ক'রে এক-একটা দেশে বড় ক'রে মিটিং হতো। কিছু রেজিলিউশান পাস হতো আর লম্বা-লম্বা বক্তৃতা। যা-কিছু আসল কাজ হতো তা পাড়ায়-পাড়ায় গুপ্ত-সমিতিতে। তাদেরই বেশি ভয় করতো ইংরেজরা। আজ যারা মন্ত্রী বা যারা সরকারী উঁচু চেয়ারে ব'সে আছে, তাঁরা তার মধ্যে ছিল না। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তখন বৃটিশ গভর্ণমেন্টের খয়ের-খাঁ, নয়তো এইসব ক্লাব থেকে দূরে স'রে থেকে গা বাঁচিয়েছে। তারা লেখাপড়া করেছে। ইংরেজদের আণ্ডারে ভালো সরকারি চাকরি পাবার আশায় সমস্ত স্বদেশী হাঙ্গামা থেকে আড়ালে থেকেছে। যেন তাদের গায়ে দাগ না লাগে। একবার দাগ লাগলে সরকারী পুলিশের ব্ল্যাক-বুকে তাদের নাম উঠে যাবে। তখন তারা দাগী হয়ে যাবে। কিন্তু এখন সব উল্টে গেল। এখন কংগ্রেসী আমলে তারাই গদিতে চেপে বসলো আর যারা সেদিন দেশের কাজের জন্যে লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা শিখেছে, ক্লাব ক'রে নাইট স্কুল ক'রে ছেলে-মেয়েদের মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টায় নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, তাদের আজ কেউ চিনতে পারে না। তারা এই দেশে এখনও বেঁচে রয়েছে, কিন্তু তাদের এই আজকের উৎসবের আনন্দের দিনে কেউ ডাকে না। কেউ পঁচিশ টাকা কি তিরিশ টাকা পেন্‌শন পায়। এইমাত্র।

যাহোক, আমাদের পাড়ার অটলদা ছিল সেদিনকার সেই আদর্শবাদী ছেলেদের একজন। আর সবাই যখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিজের কাজ গুছোবার চেষ্টায় মশগুল, তখন অটলদা আমাদের মানুষ করবার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করেছে। সে কী অমানুষিক পরিশ্রম!

আশুবাবু এটা পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে তাঁরই মতো কোনও অফিসে ভালো চাকরি করবে। তাঁর চেয়েও ভালো চাকরি। বিরাট গাড়ি ক'রে অফিসে যাবে। দশজনে দেখবে। যা সাধারণত সব বাবাই চাইতো তখন, তিনিও তাই-ই চাইতেন। তার বেশি কিছু নয়। আর বড়-জোর হয়তো বাড়িখানা দোতলা করবেন। মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির চরম আকাঙ্ক্ষাটুকুই তিনি চরিতার্থ করতে চাইতেন তাঁর নিজের ছেলের মধ্যে দিয়ে।

তাই মাঝে-মাঝে অনুযোগ করতেন অটলদার কাছে।

বলতেন, একটু সাবধানে চলবে বাবা, দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে।

অটলদা বুদ্ধিমান ছেলে। বাবার কথার প্রতিবাদ করেনি কখনও।

বলতো, হ্যাঁ, আমি তো বুঝে-শুঝেই চলি।

আশুবাবু বলতেন, শুনছি নাকি টেগার্ট সাহেব পাড়ায়-পাড়ায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—হ্যাঁ, তাই তো আমিও শুনেছি।

—তা এই সময় আর বাইরে-বাইরে না-ই বা ঘোরাঘুরি করলে—চারিদিকেই তো শুনছি স্পাই ঘুরছে।

শুধু আশুবাবু কেন, অন্য লোকেরাও সাবধান ক'রে দিতো। অটলদার ভালোর জন্যেই তারা সৎ উপদেশ দিতো।

বলতো, তোমার বাবার কথাও তো ভাবতে হয় বাবা, তোমার ওপরেই তো তোমার বাবার বৃদ্ধ বয়সের সব আশা-ভরসা নির্ভর করছে!

আমরাও জানতাম সে কথা। কিন্তু আমরা তখন ছোট। আমরা তখন বুড়োমানুষের কথার দিকে কান দিতাম না। আমরা শিখেছিলাম, দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে অগৌরব নেই। আমরা জানতাম, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ না হ'লে দেশের কোন মঙ্গল নেই। আমরা দেখতাম, হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে পাশ ক'রে বেকার বসে আছে। তারা চাকরি পায়না কোথাও। আমরা তখন সি আর দাসের বক্তৃতা শুনি। আমরা পার্কে-পার্কে গিয়ে লেকচার শুনি। মিটিং-এর সময় পুলিশের দল লাঠি নিয়ে তৈরী থাকে। এক-এক দিন হঠাৎ লাঠি চালায় তারা। মিটিং ভেঙে দেয়। অনেক লোকের মাথা ফেটে যায়। চোখ কাণা হয়ে যায়। পুলিশ যত অত্যাচার করে, ততই আমাদের গোঁ বেড়ে যায়। আমরা আরও মনে মনে বৃটিশ-বিরোধী হয়ে উঠি। আমরা চাই ইংরেজ তাড়াতে। আমরা চাই একদিন আমাদের দেশ ছেড়ে ইংরেজ চলে যাবে। আমরা আর তাদের দাসত্ব করবো না। তখন চরকা কাটার যুগ নয়। চরকা কাটার যুগ চলে গেছে ১৯২০-২১ সালে। চরকা কাটা দিয়ে স্বরাজ হয়নি। এবার মেরে তাড়ানো হবে ইংরেজদের। গুলী মেরে, বোমা মেরে আর ভাতে মেরে। সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি বয়কট তো আছেই।

আমবা লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ পড়তাম।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন—'শরীর জোরালো হলে মনও জোরালো হবে।'

অটলদা সেইগুলোই আমাদের শোনাতো। আমাদের পড়তে দিত সেই সব বইগুলো। আমবা সবাই স্বামী বিবেকানন্দ হতে চাইতাম। এখানকার মতো তখন সিনেমা ছিল না। থিয়েটার ছিল বটে তখন, কিন্তু সে শ্যামবাজারের দিকে। অত টাকা দিয়ে থিয়েটার দেখার সামর্থ্যও ছিল না আমাদের। আগ্রহ ছিল না মোটের ওপর।

ঠিক এই সময়েই অটলদার কাজ পড়লো বাইবে। আমাদের পাড়ার বাইরে। ছোট পাড়া থেকে শুরু হয়েছিল তার কাজ। সেই পাড়ার বাইরে ডাক পড়লো ক্রমে। সেখানেও ক্লাব করলে। কারণ স্বামীজির বাণী তো সারা দেশে ছড়াতে হবে। তবেই দেশে স্বরাজ আসবে। তবেই ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াতে পারা যাবে।

আমরা জানতাম না অটলদা কোথায় কী করছে। কোথায় কোন্ পাড়ায় আবার ক্লাব করছে! কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তখন অনেক শাখা-প্রশাখা গ'ড়ে উঠেছে। সব জায়গাতেই অটলদা যায়। সব জায়গাতেই অটলদা অপরিহার্য। অটলদা না দেখা-শোনা করলে কোনও ক্লাবই চলে না।

সেই রকম একটা ক্লাবে গিয়েই এই বিপর্যয়টা ঘটলো।

বিপর্যয় মানে এমন কিছু নয়। প্রথমটায় সেই রকমই মনে হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তো বলেছিলেন, "যে নিজে নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্যে কাতর হয়, জীব-উদ্ধারের চেষ্টা করে, সে-ই রামকৃষ্ণের পুত্র। যে এই মহাসন্ধি পুজার সময় কোমর বেঁধে গ্রামে-গ্রামে ঘরে ঘরে তার সন্দেশ বিতরণ করবে, সে-ই আমার ভাই, সে-ই তাঁর ছেলে এই-ই পরীক্ষা—সে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে নিজের ভালো চায় না, প্রাণত্যাগ হলে পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তারা। যারা নিজের আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার নিজের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজী, তারা আমাদের কেউ নয়, তফাৎ যাক।"

অটলদাও ছিল এই ছেলে।

নিজে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কী হবে, যদি আর সকলে পিছিয়ে প'ড়ে থাকে? নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে, যদি আর সবাই অন্ধকার কুসংস্কারে বন্দী হয়ে থাকে? সবাইকে যে চাই। মায়ের আহ্বানে সবাইকে একসঙ্গে সাড়া দিতে হবে। মা যে সকলের আত্মাহুতি চায়। সকলে মিলে সর্বস্ব আহুতি দিলেই তো মা আবার জাগবে, আবার চিন্ময়ী হবে! মৃন্ময়ীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।

এইসব কথা বলতো অটলদা সব ক্লাবে গিয়ে।

সব ছেলে-মেয়েরা হাঁ ক'রে শুনতো অটলদার কথাগুলো। অটলদাকে দেবতার মতো ভক্তি করতো সবাই।

ছেলে-মেয়ে মানে তখন বড়-বড় ছেলেরা আসতো বটে, কিন্তু মেয়েরা ছিল ছোট ছোট। ফ্রক-পরা মেয়ের দল তারা। একটু বড় হয়ে গেলেই আর তাদের আসা হতো না ক্লাবে! গার্জিয়ানরা আর আসতে দিত না তাদের। তখন তাদের বিয়ে হবার পালা। ছেলে হবার পালা। সংসার করবার পালা।

কিন্তু অটলদাকে অবিশ্বাস করা পাপ। অটলদার চরিত্রে কোনও পাপ থাকতে নেই।

একদিন কুন্তি বললে, বাবা আপনাকে একবার ডেকেছেন অটলদা।

—কেন?

কুন্তি বললে, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।

হেসে ফেলে, অটলদা বললে, বা রে, আমাকে দেখবার কী আছে?

কুন্তি বললে, না, আপনার কথা আমি বাবাকে বলেছি কিনা।

কুন্তি বাবাকে কী বলেছিল কে জানে! একদিন কিন্তু কুন্তি আর ছাড়লে না। একেবারে টেনে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। ভবানীপুরেও যে এমন পাড়া থাকতে পারে, তা অটলদাও বুঝি কল্পনা করতে পারেন নি।

অটলদাকে দেখে ভদ্রলোক বিছানায় উঠে বসলেন।

কুন্তি বললে, আমার বাবার জ্বর হয়েছে—

—জ্বর হয়েছে, তা উঠছেন কেন? আপনি শুয়ে থাকুন।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বললেন, জ্বর আমার আজকের নয়, আজ সাত বছর ধরেই আমি জ্বরে ভুগছি—

—কেন? ডাক্তার কী বলছে?

ভদ্রলোক বললেন, ডাক্তারের সাধ্যি নেই আমাব এ রোগ সারায়—এ আমার মনের রোগ।

বড় অবলীলাক্রমে ভদ্রলোক সব কথা ব'লে গেলেন। ভদ্রলোকের নাম মঙ্গল সরকার।

বললেন, কুন্তির কাছে আপনার কথা শুনি আর ভাবি কেবল। আর তো কোনও কাজ করবার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখি। আমারও একদিন বা" তোমার মতো কাজ করবার ক্ষমতা ছিল। তাই সেদিন বললাম তোর অটলদাকে একবার বাড়িতে ডেকে আনিস তো—

তারপর একটু থামলেন। আবার বললেন, তোমাকে দেখে আমার আশা হচ্ছে বাবা—তুমি পারবে।

অটলবিহারী বসু। অটলদা আশুবাবুর ছেলে এই এত বয়সের বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে কখনও উৎসাহ পায়নি আগে।

বললে, আপনার মতো আগে কেউ আমার কাজে উৎসাহ দেয়নি, সবাই নিন্দে করেছে—সবাই বলে আমি চাকরি নিয়ে সংসারের সাশ্রয় করলেই বেশি ভালো কাজ হতো—তাতে বাবা-মা'র উপকার হতো। আপনিই আমার কাজের প্রথম সমর্থন করলেন।

—সমর্থন কী বাবা, সে-বয়েস থাকলে আমিও তোমার সঙ্গে কাজে নেমে পড়তাম। জীবন তো একটা। কিন্তু তোমার বয়সে আমাকেও কেউ উৎসাহ দেয়নি ব'লে আমার ক্ষতি হয়েছে বাবা, আমি হেরে গিয়েছি, আমি পারিনি, আশীর্বাদ করছি, তুমি জিতবে, তুমি পারবে।

এমনি করেই সূত্রপাত হলো কুন্তিদের বাড়ী যাওয়া। চারদিকের কাজের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতো অটল। অটলবিহারী বসু। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয়।

মঙ্গলবাবু ব'লে দিয়েছিলেন, যখনই সময় পাবে তুমি এসো—দ্বিধা কোরো না।

অটলদা দাঁড়াতো। বসতো কাছে। নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাব কথা অকপটে প্রকাশ করতো। মঙ্গলবাবুর কাছে তার যেন আর কোনও আড়ালই থাকতো না। মঙ্গলবাবুরও যেন একটা কথা বলার লোক মিলে গিয়েছিল এতদিনে।

মঙ্গলবাবুর নিজের জীবনও অদ্ভুত।

বলতেন, ফরিদপুরে লাটসাহেবের ট্রেনে বোমা পড়েছিল জানো তো? অনেক লোকই তো ধরা পড়েছে সেই বোমার মামলায়! কিন্তু পুলিশ আসল লোককে খুঁজে বার করতে পারেনি হে। আসল লোকটা—যে আসলে বোমাটা ফেলেছিল, যে আসল বোমাটা তৈবী করেছিল, তারও আজ পর্যন্ত খোঁজ পায়নি—এখনও তার নামে হুলিয়া ঝুলছে—

—কে? আসল লোকটা কে?

মঙ্গলবাবু বলতেন, আর আমার আসল নামও মঙ্গল সরকার নয়—আমাব আসল নামটা কুন্তিও জানে না।

অটলদা অবাক হয়ে শুনছিল।

বললে, তা'হলে আপনার আসল নামটা কী?

মঙ্গলবাবু বললেন, ব্রজেন।

অটলদার সামনে বুঝি বাজ পড়লো? কিন্তু বাজ পড়লেও বুঝি অটলদা এত চমকাতো না। বললে, আপনিই ব্রজেন?

—হ্যাঁ!

—আপনার নামেই পুলিশ দশ হাজাব টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছিল?

—হ্যাঁ, এখনও ব্রজেনকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারেনি। কেউ তার খোঁজও পায়নি। কেউ জানেই না ব্রজেন কোথায় কেমন অবস্থায় আছে, বেঁচে আছে কি-না! সবাই জানে ব্রজেন ইণ্ডিয়া থেকে পালিয়ে জার্মানী, না-হয় রাশিয়া, না-হয় আমেরিকা টোকিওতে পালিয়ে গেছে রাসবিহারী বসুর মতো। এক তুমিই প্রথম জানলে—

অটলদা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো মঙ্গলবাবুর দিকে।

—আশা করি, তুমিও আমাকে আগেকার মতই মঙ্গলবাবু ব'লে জানবে। একজন অসুস্থ মধ্যবিত্ত কেরানী বলেই মনে কোরো, স্বাস্থ্যের জন্যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছি। হয়তো এখান থেকে পালিয়ে বাইরে চলে গেলেই ভালো হতো, হয়তো তাতেই আরো বেশী কাজ হতো, তাতে হয়তো আমার স্বাস্থ্যও এত খারাপ হতো না—

—সত্যি, আপনি বাইরে গেলেন না কেন? সে-ই তো ভালো হতো।

মঙ্গলবাবু বললেন, বাইরে গেলেই যে ভালো হতো তা আমিও জানতাম। কিন্তু তার চেয়েও যে একটা বড় কাজের ভার আমার ওপর পড়লো।

—কী কাজ?

মঙ্গলবাবু বললেন, ওই যে, ও-ঘরে যে রয়েছে! কুন্তি! ওর জন্যেই আমাকে এখানে থাকতো হলো।

—আপনার মেয়ের জন্য?

মঙ্গলবাবু ধীর গলায় আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, ওকে আমার মেয়ে বলেই সবাই জানে। কুন্তিও জানে আমি ওর বাবা!

—তাহ'লে আপনি ওর বাবা নন?

—না!

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সেই বাংলাদেশ। বিপ্লববাদ তখন আস্তে আস্তে মাথা তুলে জাগছে, জাগাচ্ছে। একদিন আয়ার্ল্যাণ্ডও এমনি ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। পৃথিবীর যেখানেই অত্যাচার হয়েছে জনসাধারণের ওপব, সেখানেই সন্ত্রাসবাদ জন্ম নিয়েছে। আর এই সন্ত্রাসবাদের পতাকা যারা প্রথম উচ্চে তুলে ধরেছে তারা চিরকালই মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকই বরাবর এগিয়ে এসেছে তাদের অনুযোগ অভিযোগ সামনে খাড়া ক'রে। সমাজেব মধ্যে তাবাই সবচেয়ে স্পর্শকাতব অংশ। মঙ্গলবাবু সেই সম্প্রদায়ের লোক। তিনি যেমন ক'রে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন সে-যুগের যন্ত্রণাকে, এমন ক'রে অটলদারাও অনুভব করেনি। অটলদাকে তিনি সেই কথাই বুঝিয়ে দিতেন।

১৯০২ সালে বুয়োর যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। আর এক যুদ্ধের তোড়-জোড় চলছে তখন রাশিয়াব সঙ্গে জাপানের। ঠিক সেই সময়েই গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলো। এর পেছনে যে-মহিলার দান একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তিনি ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা।

অটলদা এই প্রথম একজন বিপ্লবীর মুখ থেকে সেই সব দিনের ইতিহাস শুনলো। এতদিন বইতে পড়ে এসেছিল। এবার চাক্ষুষ প্রমাণ মিললো!

—আপনারা ভয় পাননি কখনও?

—কীসের ভয়? কাকে ভয়? কেন ভয় করবো? ভয়টাই তো মৃত্যু! আমার বন্ধু ছিল সত্যেন। সত্যেনের নাম শুনেছো?

অটলদা বললে, শুনেছি।

—এই সত্যেন ছিল ক্ষুদিরামের গুরু। আমরা দু'জনে মেদিনীপুরের মিঞা বাজারে কুস্তির আড্ডায় কুস্তি করতাম। একসঙ্গে দু'জনেই আগুনের সামনে দীক্ষা নিয়েছিলাম। আমার আর তার পথ ছিল এক। সে যখন ধরা পড়লো, আমি পালিয়ে গেলাম! প্রাণের ভয়ে নয়। মনে হয়েছিল, সত্যেন যে-কাজ শেষ করতে পারেনি, তা আমি শেষ করবো। কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিয়ে সত্যেনই জিতে গেল ভাই, সে-ইতিহাস তো এখন সবাই জানে! তুমিও নিশ্চয় জানো?

—জানি!

অটলদা সে ইতিহাস জানতো। প্রতিদিন সব কাজ সেরে অটলদা একবার ক'রে আসতো! সে-যুগের বিপ্লবীদের গল্প শুনতে শুনতে এক-একদিন অনেক রাত হয়ে যেত অটলদার। রাত্রিতে এক-একদিন কুন্তিদের বাড়িতেই খেয়ে নিতো। কুন্তি তখন ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে। লাঠি-খেলা আর তাকে মানায় না। মঙ্গলবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না,

কিন্তু আপত্তি ছিল সমাজের। তখনকার দিনে অতবড় মেয়ে ক্লাবে যাওয়া দূরে থাক্, রাস্তাতেও বেরোত না।

গল্প শুনতে শুনতে অটলদা বলতো, তারপর?

মঙ্গলবাবু বলতেন, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, কালকে শুনো।

মঙ্গলবাবুর বাড়িতে যাওয়া শেষকালে যেন একটা নেশা হয়ে গেল অটলদার। কোনও ক্লাবের ছেলেরাই আর তাকে পায় না তেমন ক'রে। সবাই জানে অটলদা ব্যস্ত। বাড়ির লোকও দেখতে পায় না তাকে।

আশুবাবু জিজ্ঞেস করতেন কোথায় ছিলে কাল অত রাত পর্যন্ত?

শুধু একটা জবাব দেয় অটলদা। বলে, একটা কাজ ছিল।

কী কাজ, কেমন কাজ, কোথাকার কাজ, নিজের না পরের কাজ, তাও বলে না অটলদা। সে যা ভালো বোঝে, তাই-ই করে। বরাবরই অটলদা কম কথার মানুষ। কখনও ছোটবেলা থেকেই তাকে লেখা পড়ার কথা বলতে হয়নি। মাস্টার রাখতেও হয়নি তার জন্যে। সে নিজেই লেখাপড়া করেছে। নিজের চেষ্টাতেই ফার্স্ট হয়েছে। নিজের ভালো-মন্দ সে নিজেই ভালো ক'রে বোঝে। সুতরাং ছেলেকে কিছু বলতেন না আশুবাবু। কিন্তু মনে-মনে ঠিক করলেন, ছেলের বিয়ে দিলে বোধহয় ছেলে বাড়িতে আসবে সকাল-সকাল।

বন্ধু-বান্ধবরাও সেই পরামর্শ দিলেন।

বললেন, আপনার স্ত্রীরও তো বয়স হচ্ছে, তাঁরও তো একটা কথা বলবার লোক হবে। আপনার মেয়ে থাকলে তবু আলাদা কথা ছিল।

তখন থেকেই তিনি সম্বন্ধ খুঁজতে লাগলেন।

শেষকালে অনেক খোঁজের পর এই সম্বন্ধটা পেলেন। এই আলিপুরেই সম্বন্ধটা। ইন্দুলেখা দেবী। ইন্দুলেখা দেবীকে একদিন চুপি-চুপি দেখেও এলেন।

বন্ধুরা বললেন, ভালো করেছেন, ওখানেই বিয়ে দিন। অত বড়লোক বেয়াই পাবেন, আপনার ছেলের একটা বল-ভরসা তো থাকা দরকার! অত বড়লোক আর তাঁর একমাত্র মেয়ে—এ-কি কম কথা!

অটলদা তখন যেন আর-এক জগতে বাস করছে। তার আহার নেই, নিদ্রা নেই। সে আবার এক নতুন প্রেরণা পেয়েছে। সংসার তো সবাই করে, চাকরিও তো সবাই করে। জঙ্গলের একটা জানোয়ারও পেট চালাবার উপায়টা জানে। তাহ'লে এত লেখাপড়া শিখে অটলদাও কী তাই করবে? তাহ'লে অটলদার সঙ্গে অন্য লোকের তফাতটা কোথায় রইলো?

সেই মঙ্গলবাবুর কাছেই শোনা গল্প।

মেদিনীপুরের মিঞা-বাজারের একটা পোড়ো-বাড়িতে ছিল আমাদের গুপ্ত সমিতি। কালীমূর্তি ছিল ভেতরে। চাকর-বাকর কেউ ছিল না। আমরা নিজেরাই রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া করতাম। সামনের ঘরে একটা তাঁত বসানো হয়েছিল। তাতে আধখানা কাপড় তৈরী অবস্থায় থাকতো সব সময়ে। সেই তাঁতশালার ভেতরে আমরা সবাই একে একে জড়ো হতাম। আমি থাকতাম, ক্ষুদিরাম থাক্তো, শচীন থাকতো, নিরাপদ রায় থাকতো। আমরা তখন আর মানুষই নই—আমরা তখন এক-একটা আগুনের ফুল্‌কি।

সে-সব দিনের কথা এখনকার ছেলেরা কেউ জানে না। এখন তো সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে। টেগার্ট সাহেবকে দেখে এখন সবাই ভয়ে কাঁপে। এখন পুলিশকে দেখে মানুষ ঘরের মধ্যে লুকোয়। কী ক'রে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবে, তাই কেবল ভাবে। তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল অন্য। সত্যেনের দাদার একটা দো'নলা বন্দুক ছিল। সেইটে নিয়ে সে শহরের বাইরে গিয়ে আমাদের বন্দুক ছোঁড়া শেখাতো।

ক'দিন থেকেই সত্যেন সন্দেহ করছিল। তাকে যেন কারা অনুসরণ করে মাঝে-মাঝে। একদিন সত্যেন আমাকে বললে, আমাকে যদি পুলিশ ধরে, তো তোকে একটা কাজ করতে হবে ব্রজেন—

—কী কাজ বল?

সত্যেন বললে, সংসারে কারুর ওপর আমার কোনও দায়-দায়িত্ব নেই, আমি মরলে কারো কোনো লোকসান হবে না—একজন ছাড়া।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? তোর দাদা? জ্ঞাননাথবাবু?

সত্যেন বললে, না, দাদাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি, দাদাও আমাকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু দাদা নয়।

—তাহ'লে কে? কার কথা বলছিস্?

সত্যেন বললে, সে আমার আপন কেউ নয়, কখনও তুই জানতে চাস্‌নি তার সম্বন্ধে— কিন্তু তারও আপন বলতে কেউ নেই। আমিই বলতে গেলে বরাবর তাদের ভরণ-পোষণ ক'রে এসেছি, কিন্তু আমি ধরা প'ড়ে গেলে তাদের কী হবে, তাই শুধু ভাবছি।

বললাম, তার জন্যে ভাবিসনি তুই, আমি সে-ভার নিলাম।

সত্যেন বললে, তাহ'লে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে যে, কখনও কাউকে তাদের কথা বলতে পারবি না। কে তারা, তারা আমার কে হয়, তাও বলতে পারবি না।

বললাম, প্রতিজ্ঞা করছি, বলবো না।

সত্যেন আবার বললে, তারপর যখন আবার আমি ফিরবো জেল থেকে, তখন আমিই আবার তাদের ভার নেবো—তখন আর তোকে তাদের ভার নিতে হবে না, তখন বলবো কে সে! তখন বলবো কেন তোকে তার ভার নিতে বলেছিলাম।

তারা যে কে, সত্যেনের সঙ্গে তাদের যে কীসের সম্পর্ক, তাও সত্যেনকে জিজ্ঞেস করিনি। কারণ আমি জানতাম, সত্যেন এ-রকম অনেক অনাথ অসহায়দের সাহায্য ক'রে থাকে। যেদিন মেদিনীপুরে পুলিশ এসে সত্যেনকে ধরে নিয়ে গেল, মেদিনীপুরসুদ্ধু লোক অবাক হয়ে গেল। কেন যে সত্যেনকে তারা ধরে নিয়ে গেল, তা আর কেউ না-জানুক, আমি জানি। আমি জানলেও কাউকে বলবার উপায় নেই। বলবার প্রয়োজনও নেই। আমাকেও হয়তো ধরতে পারতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি পুলিশের নজর এড়িয়ে গিয়েছি। আমি পরদিনই মেদিনীপুর ছেড়ে চলে এলাম।

কিন্তু আসবার দিন সকালেই একটা ঘটনা ঘটলো। আমি ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তখন রাতই বলতে গেলে। শেষ রাত। কিন্তু আকাশে তখনও চাঁদ রয়েছে। তারাগুলোও জ্বলছে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে পালাবো বলেই অমন সময় বেরিয়েছিলাম। আশা ছিল কোনও রকমে লোকাল ট্রেনটা ধ'রে একবার কলকাতায় এসে পৌঁছতে পারলেই আর কেউ আমাকে ধরতে-ছুঁতে পারবে না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যেই সামনে কে যেন এসে দাঁড়ালো। সেখানটা বাজার। বাজার তখনও খোলেনি। সেই বাজারের মোড়ে একজন লোক আমার সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। সঙ্গে ছোট্ট একটা মেয়ে। একেবারে ছোট্ট। দু'বছর কি তিন বছর বয়েস।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে?

মনে মনে একটু ভয়ও ছিল বৈকি আমার। তবু বাইরে তা না প্রকাশ করে সোজা হয়ে বুক খাড়া ক'রে দাঁড়ালাম।

লোকটা বললে, আপনার সঙ্গে একটা দরকার ছিল।

—কিন্তু আপনি কে?

লোকটা বললে, নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি সত্যেনের কাছ থেকে আসছি।

সত্যেন?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি ভুলে গেলাম আমার প্রতিজ্ঞার কথা। একবার সন্দেহ হলো, পুলিশের লোক নাকি? আমাকে এই ব'লে একই মামলায় জড়াতে চায়। সত্যেনকে পুলিশের ধরাটা এত হঠাৎ ঘটেছিল যে, আমি তার কার্য-কারণ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনি। তখনকার দিনে পুলিশের ধর-পাকড় এত নিঃশব্দে, এত চুপি-চুপি হতো যে, এক-ঘণ্টা আগেও তার আভাস পাওয়া যেত না! এই বাংলাদেশের বাঙালীরাই ছিল সেদিনকার ইংরেজ-পুলিশের গুপ্তচর। স্বদেশী আন্দোলনেও যেমন পৃথিবীতে বাঙালী ছেলেদের সাহসের তুলনা নেই, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালী-গুপ্তচরদের চালাকিরও যেন তুলনা নেই।

তাই সত্যেনের নাম শুনেই কেমন একটু চম্‌কে উঠেছিলাম।

লোকটা হয়তো তা জানতে পারলে। বললে, সে জন্যে নয়, ঠিক, সত্যেনবাবু আমাকে আপনার কথাই ব'লে গিয়েছিলেন—আপনাকে একটা ছোট মেয়ের ভার নিতে বলেছিলেন কি?

বললাম, হ্যাঁ, সত্যেন বলেছিল—

—এই সেই মেয়েটি।

আমি চাইলাম মেয়েটির দিকে। আধ-ময়লা ফ্রক-পবা একটা মেয়ে। আমাদেব কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পাবছে না। চুপ ক'বে লোকটাব হাত ধ'বে দাঁড়িযে বযেছে। এখনি যদি বাজাবের লোকজন জেগে উঠে পড়ে তো আমাদেব দেখে ফেলবে। আমাদেব চিনে বাখবে। তাবপর চবম সর্বনাশ!

—আমি তাহ'লে আসি—

হঠাৎ আমার যেন চমক ভাঙলো। ফিরে দেখি, লোকটা চলে যাচ্ছে মেয়েটাকে রেখে। আর মেয়েটাও তেমনি। সে-ও কাঁদছে না, সে-ও ডাকছে না। আমি ডাকতে গেলাম, মশাই—

কিন্তু গলাটা বুঁজে এলো আপনা থেকেই। আমি চুপ ক'রে রইলাম। দেখলাম লোকটা আস্তে-আস্তে চুপচাপ অন্ধকারের আড়ালে মিলিযে গেল। আর আমি মেয়েটাব দিকে ফিরে দেখলাম—সে যেন আমার দিকে চেয়ে আমাকে ভালো করে যাচাই কবে নিচ্ছে।

কিন্তু তখন আর ও-সব ভাববার সময় নেই। ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে। ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে। তাতেও কিছু সময় লাগবে।

তাড়াতাড়ি আমি মেয়েটার হাত ধরলাম। হাত ধ'রে স্টেশনের দিকে হন্‌-হন্‌ ক'রে চলতে লাগলাম। আর মেয়েটাও নির্বিবাদে আমার সঙ্গে চলতে লাগলো।

তারপর কখন টিকিট কেটেছি, কখন ট্রেনে উঠেছি, কখন কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছি তাকে নিয়ে, তা আর খেয়াল নেই। সত্যেনের কাছে প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম, কথা দিয়েছিলাম, সুতরাং আমাকে তার কথা রাখতেই হবে। তার কাছে দেওয়া কথার মূল্য আজীবন শোধ করতে হবে। অন্ততঃ যতদিন না সে জেল থেকে ছাড়া পায় ততদিন।

তা সেইদিন থেকে আমি মঙ্গলময় হয়ে গেলাম। আমি ভুলে গেলাম যে আমার নাম ব্রজেন। আমি নিজের কাছেই নিজে অচেনা হয়ে গেলাম। আমি আমাকেও আর সেইদিন থেকে চিনতে পারলাম না। আমি হয়ে গেলাম কুন্তির বাবা।

গল্প শুনতে শুনতে যেদিন এই ঘটনাটা বললেন মঙ্গলবাবু, সেদিন অনেক রাত হয়েছিল। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। অটলদা জানালার বাইরে চেয়ে দেখলে।

তারপর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কুন্তি? সে জানে এ-সব কথা?

মঙ্গলবাবু বললেন, না, তাকে জানাবার কথা তো দিইনি সত্যেনকে—শুধু কথা দিয়েছিলাম তার ভার নেবো।

—আর আপনার আসল নাম যে ব্রজেন, তা-ও কি কুন্তি জানে?

—না, কিছুই জানে না ও। এক আমি ছাড়া শুধু তুমি জানলে। দু'একজন যারা জানতো, তাদের সকলের ফাঁসি হয়ে গেছে, কেউ-বা মারা গেছে। এখন একথা শুধু তোমাকেই বললাম।

অটলদা শুনে গম্ভীর হয়ে রইলো। তার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

—এত কথা তোমাকে বলতাম না। কিন্তু অনেক দিন ধ'রে তোমাকে দেখে-দেখে আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি। তোমার মধ্যে আমি আবার আমার নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। তুমি ই পারবে অটল! তুমিই পারবে। অন্য অন্য ছেলেদের দেখি আর হতাশ হয়ে যাই। ছোটবেলায় আমরা ইংরেজ-তাড়ানোর সাধনা আরম্ভ করেছিলাম তখন তোমাদের মত ছেলে কিছু-কিছু ছিল। কিন্তু আজ তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তোমার মধ্যে সেই পুরানো দিনের 'আমি'কে দেখেছি বলেই আজ তোমাকে বললাম। আজ আমার দিন শেষ হয়ে আসছে।

বুঝতে পারছি আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। আর চিরকাল কে-ই বা সংসারে বেঁচে থাকে বলো না। আমার নিজেকে দিয়ে আর কিছু হলো না। দেখো না, যে-নামে আমি ছোটবেলা থেকে পরিচিত, সে-নাম আমি ব্যবহার করতে পারি না। যাঁরা আমায় এই পৃথিবীতে এনেছেন, তাঁরাও আমাকে দিয়ে তাঁদের কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করতে পারলেন না। আমি হেরে গেলাম ভাই! শুধু সত্যেনকে যে-কথা আমি দিয়েছিলাম, সেই কথাটাই আমি মনে-প্রাণে রাখতে পেরেছি—এইটেই আমার আনন্দ।

—তারপর থেকে কেউ আপনার আসল পরিচয় জানে না?

মঙ্গলবাবু বললেন, না কেউ না।

—তাহলে এতদিন কোন্ পরিচয়ে আপনার দিন কাটলো?

মঙ্গলবাবু বললেন, আমি ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, এইটেই আমার একমাত্র পরিচয়।

—এখানে চাকরি করার সময়ও কেউ কি জানতে পারেনি আপনি কে?

—না, আমি দেশবন্ধু সি-আর দাশের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী দেখে হয়তো বুঝেছিলেন আমি দেশ-ভক্ত। তার বেশি কিছু নয়—তার পরেই আমার চাকরি হয়ে গিয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর সেই যে একদিন চাকরিতে ঢুকলাম, সেই থেকে আমি ক্লার্কই রয়ে গেলাম, আর কিছু হতে চাইলাম না, আর কিছু হতে পারলামও না। হলে অন্যায় হতো। সত্যেন আমাকে যে-ভার দিয়ে গিয়েছিল, তার ভার বইতে পারতাম না। তাকে কে দেখবে?

—কেন?

মঙ্গলবাবু বলতে লাগলেন, কুন্তি যে আমার মেয়ে নয়, এ-কথা জানলে কুন্তির ক্ষতি হবে, আর আমারও কথার খেলাপ করা হবে। ও আমার মেয়ে এইটেই সবাই জানুক। তাতে যদি কুন্তির ভালো হয়, তাই-ই আমি চাই। তা-ই আমি চেয়েছিলাম। আমার নিজের ভালোর চেয়ে সত্যেনকে দেওয়া কথার দাম অনেক বেশি, কুন্তির স্বার্থটা অনেক বেশি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমরা যে কী দুর্যোগের মধ্যে দিন কাটিয়েছি। শুনে না থাকো, আমার কাছে শুনে নাও। 'বন্দেমাতরম' কথাটা উচ্চারণ করাও ছিল তখন পাপ। সেই পাপের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হতো বলেই আমরা অত কঠোর হয়েছিলাম। আমরা ব্রহ্মচারীর মত জীবন কাটাতাম। ভাবতাম, আমরা যদি কষ্টও করে যাই তো আমাদের উত্তরাধিকারীরা তো আরামে থাকবে। তারা তো স্বাধীন বাংলার বুকে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। তাহ'লেই হলো। আমার নিজের সুখের চেয়ে আমাদের চরিত্রের সংশোধনের দিকেই বেশি মন দিতাম।

তা এক-এক সময়ে যে আমার কুন্তির সম্বন্ধে ভাবনা হতো না তা নয়। কে কুন্তি? কে তার বাবা? কে তার মা? যে ভদ্রলোক আমার হাতে কুন্তিকে তুলে দিয়ে গিয়েছিল তিনিই বা কে? অনেক কথা ভাবতাম। কিন্তু ভেবে-ভেবেও কিছু বার করতে পারতাম না। তবে আমি একথা

ভালো করেই জানতাম, সত্যেন কোনও অন্যায়ই করতে পারে না। ভগবানেরও যদি কোনও পাপ থাকে, তো তা থাকতেও পারে, কিন্তু সত্যেনের নেই। সত্যেন হয়তো কারো কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। সত্যেন হয়তো কারো কাছে কথা দিয়েছিল, তার অনাথ মেয়েটার ভার নেবে। সত্যেন আমাকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করতো বলেই আমার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি পরেছিল গলায়। আমার সঙ্গে আর তার জীবনে দেখা হয়নি বটে, কিন্তু সে যেখানেই থাকুক, এইটুকু ভেবেই আমি সুখ পাই যে, আমি তার কথা রেখেছি—রাখতে পেরেছি। এ ভার আমি চিরকালই হয়তো বয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পরমায়ুর তো শেষ আছে। আজ মাঝে-মাঝে সেই শেষ আহ্বান শুনতে পাই। মনে হয়, আর তো বেশি দিন নেই আমার। আমার অবর্তমানে আমি কুন্তির ভার কাকে দিয়ে যাবো?

অটলদা হঠাৎ বললে, আমি যদি ভার নিই, আপনার আপত্তি আছে?

—আপত্তি থাকবে আমার?

বলে কেমন একটা বিষাদের হাসি হেসে উঠলেন মঙ্গলবাবু।

বললেন, আমার ভার আমি তোমাকে দিয়ে নিশ্চিত হবো, এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে আমার কাছে। আমি তো মুক্ত হলাম, আমি তো নিশ্চিন্ত হলাম। আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম অটলদা। তুমি অনেকদিনের দুশ্চিন্তা থেকে তো আমাকে মুক্তি দিলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।

তখন অটলদা জানতেও পারলে না। অটলদা কল্পনাও করতে পারলে না, কী নিদারুণ ভার সে নিলে। কী নিদারুণ বোঝা চিরজীবনের মত মাথায় চাপলো তার।

আর তারপরই একদিন মঙ্গলবাবুর অসুখ হলো।

সেইটেই তাঁর শেষ অসুস্থতা। সেই অসুস্থতার মধ্যেই বাক্‌দান-সম্প্রদান-বিয়ে-পরিণয় সমস্ত কিছুর সমাধান হয়ে গেল। ভবানীপুরের ছোট্ট একখানা ভাড়াটে বাড়ির উঠোনে অসুস্থ মঙ্গলবাবুর চোখের সামনেই অটলদা আর কুন্তি দেবীর জীবনের চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো।

কিন্তু অটলদা ত্যাগে বিশ্বাসী, শক্তিতে বিশ্বাসী, ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাসী। অটলদার কাছে বাবা-মার চেয়ে দেশ বড়, মাতৃভূমি বড়। আর কুন্তিও তখন অটলদার মন্ত্রশিষ্য। অটলদাই তার আদর্শ পুরুষ। তার হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য মনে করলো।

মঙ্গলবাবু শেষ আশীর্বাদ করলেন।

বললেন, তোমরা সুখী হও, তোমরা দু'জনে মিলে দেশের কল্যাণ করো, দেশকে মুক্ত করো—আমি আর কিছু চাই না।

ছোট্ট অনুষ্ঠান। তার চেয়েও ছোট উৎসব তিনটি প্রাণী জানলো সেদিনকার ঘটনা। কোথাকার এক অজ্ঞাত-অখ্যাত একটি মেয়ে অটলদার জীবনে পাকে-পাকে সাপের মত জড়িয়ে গেল। কুন্তি ঘোমটা-মাথায় অটলদার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। দু'টো জীবন এক হয়ে সেদিন একাকার হয়ে গেল।

মঙ্গলবাবু মারা যাবার আগে ব'লে গেলেন—আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি, সে শুধু তোমার-আমার মধ্যেই গোপন থাকুক, আমি চাই আর কেউ যেন তা জানতে না পারে।

অটলদা কথা দিলে—তাই-ই হবে।

এ গল্প যদি এখানেই প্রথম আর এখানেই শেষ হতো তাহ'লে আর অটলদার জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখবার প্রয়োজন হতো না।

অধীর বোসও তাই বললে।

বললে, লোকে বিয়ে করে এবং সেটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে। সেইজন্যেই দশজনকে নেমন্তন্ন ক'রে দশজনকে সাক্ষী রেখে তাদের খাওয়ানোর রীতিটা হয়েছে। এ-নিয়মটা আজ মনে হচ্ছে ভালো। আগে মনে করতাম ওটা অপব্যয়—ভূত-ভোজন। কিন্তু তা নয়।

সত্যিই, যখন আমরা অটলদা বলতে অজ্ঞান, অটলদার কথাকে বেদবাক্য বলে মেনে চলেছি, তখন কিন্তু অটলদা আমাদের সব আস্থা ভেতরে-ভেতরে টলিয়ে দিয়েছে। আমরা জানতাম অটলদার অনেক কাজ। অটলদা বৃহৎ দেশকে গ'ড়ে তোলবার জন্যে আরো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করেছি, শ্রদ্ধা জানিয়েছি। অকারণে বিরক্ত ক'রে তাঁকে যোগভ্রষ্ট হতে দিইনি।

এমনি করেই হয়তো চলতো। এমনি করেই অটলদা আর কুন্তি দেবীর জীবন নতুন ঐশ্বর্যে মহীয়ান হয়ে উঠতো হয়তো। কিন্তু তা আর হলো না।

কেন হলো না, তা বলবার কিংবা ব্যাখ্যা করবার দায় আমার নয়। মানুষের জীবন কি অঙ্ক ক'ষে মেলানোর জিনিস? মানুষের জীবন কি রুল-অফ্-থ্রি? দুই-এ আর দুই-এ চার হয় গণিত-শাস্ত্রে। গণিত-শাস্ত্র দিয়ে কি জীবন-বিচার চলে?

নইলে ফরিদপুরে লাটসাহেবের ট্রেনের উপর বোমা মারবার জন্যে যে-ব্রজেনকে সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই ব্রজেনই মঙ্গলময় হয়ে যে কলকাতা শহরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, তাই বা কে জানতো এক অটলদা ছাড়া? অটলদাই কি জানতো মানুষের সবচেয়ে বড় আদর্শের অধিকারী হয়েও সে এমন করে ভেসে যাবে শেষ পর্যন্ত? তুমি, আমি এবং আর পাঁচজন যেমনভাবে বেঁচে আছি, ভাবছি, বড় হচ্ছি, সেই ভাবে অটলদাও তো বড় হতে পারতো! বড় হয়ে সরকারী অফিসে বড় একটা চাকরি নিয়ে সহজ ভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো! আর পাঁচজন যেমনভাবে সংসারে আপোষ ক'রে বেঁচে থাকে, তেমনি ক'রে আপোষ করলেই আমরা তাঁর বাহোবা দিতাম, আমরা তাঁর প্রশংসা করতাম, কিম্বা মৃত্যুর পরে চাঁদা তুলে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভও করতে পারতাম!

কিম্বা হয়তো জীবনের সঙ্গে আপোষ করতে গিয়েই এমন হলো অটলদা'র। কে জানে।

যদি কুন্তি দেবীকে বিয়েই করেছিল অটলদা, তাহ'লে সে-কথা প্রকাশই না করলে না কেন?

রোজ রোজ বাড়ি ফিরতে রাত হয় দেখে একদিন আশুবাবু ছেলেকে জেরা করলেন। বললেন, এত রাত হয় কেন তোমার?

অটলদা বরাবর সত্য-কথার মানুষ। বললে, আমার কাজ থাকে।

কিন্তু বাড়ির কাজও তো থাকতে পারে! আমি বুড়ো বয়েসে কি সেইসব কাজ করতে পারি? আমার তো বয়েস হচ্ছে।

এ-কথার কোনও জবাব থাকে না দেবার মত!

এর পরেই আশুবাবু আর চুপ ক'রে থাকা যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করলেন না। বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। তাঁরও বয়েস হচ্ছে। এরই মধ্যে তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতে ছেলের একটা ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া তাঁর কর্তব্য।

সেদিনও যথারীতি অটলদা বেরোচ্ছিল বাড়ি থেকে। আশুবাবু বললেন, এখন বেরিয়ে যেয়ো না, তোমাকে একটু থাকতে হবে বাড়িতে।

—কেন?

আশুবাবু ভাবলেন সব কথা খুলে বলা উচিত নয় ছেলেকে। তাহ'লে আপত্তি করতে পারে। কিছু না বলেই তিনি তাঁর নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। কিন্তু অটলদার কেমন যেন সন্দেহ

হলো। সে ছট্‌-ফট্‌ করতে লাগলো! মনে হলো, কোথায় যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সমস্ত সকালটা যেন বড় অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো! অটলদা সোজা মা'র কাছে গেল।

—মা, আজকে বাড়িতে এসব কিসের ব্যবস্থা হচ্ছে? কী হবে বাড়িতে?

মা বললে, তোকে দেখতে আসছে!

—আমাকে দেখতে? যেন আকাশ থেকে পড়লো অটলদা।

তারপর বললে, দেখতে আসবে মানে? আমি কি বাঘ না ভালুক যে আমাকে দেখতে আসবে!

—হ্যাঁ, পাকা-দেখা হবে আজকে তোর।

মাথায় যেন ব্রজাঘাত হলো অটলদার। এতদিন বাড়িতে আসেনি অটলদা। এতদিন শুধু কয়েক-ঘন্টার জন্যে রাত কাটাতে বাড়িতে এসেছে। আর তারই মধ্যে এত ষড়যন্ত্র হয়েছে তার বিরুদ্ধে সে কিছুই টের পায়নি।

অটলদার অন্তরাত্মা হঠাৎ এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে উঠলো। বললে, আমি থাকবো না বাড়িতে, আমি কিছুতেই থাকবো না মা! আমি এখনি চলে যাচ্ছি—

ব'লে সদর দরজার দিকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার সামনে যেতেই পাত্রীপক্ষের গাড়ি এসে হাজির। গাড়ি থেকে নামছিল পাত্রীর বাবা। পুরোহিত। আর দু'চারজন সাজা-গোজা ভদ্রলোক। একেবারে মুখোমুখি। আশুবাবুও বেরিয়ে এলেন।

নমস্কার, প্রণাম, অভ্যর্থনা শুরু হয়ে গেল। সবাই এসে বসলেন বাইরের ঘরে। মধ্যবিত্তের সংসার। মধ্যবিত্তেরই বৈঠকখানা। সে-সম্বন্ধে কারো কোনও অভিযোগ বা লজ্জা কিছুই ছিল না।

এ জানা কথা। সব জেনেই এখানে পাত্রীকে দিচ্ছেন তাঁরা। ছেলেটি মেধাবী, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান। ছেলে সম্বন্ধে তাঁরা অনেক খোঁজ খবর নিয়েছেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছেন, এ ছেলে রত্ন! এ-ছেলে একদিন জীবনে সাফল্যের উচ্চ-শিখরে উঠবে। পাড়ায়-বেপাড়ায় সবাই একবাক্যে এক কথাই বলেছে। সবাই বলেছে, এমন পাত্র লাখেও একটা মেলা ভার। সুতরাং ছেলের বাবার আর্থিক অবস্থা দেখে তাঁদেরও অভিযোগ করবার কিছু নেই, আশুবাবুরও লজ্জা পাবার কিছু নেই।

আর আশ্চর্য! আশ্চর্য অটলদা! আশ্চর্য অটলদার ব্যবহার!

অটলদা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করলে। সহ্য করলে এইটুকু ভেবে যে, এর পরেই তার মুক্তির উপায় আছে। এই ই তার চরম দণ্ডাজ্ঞা নয়! বাবার মুখ চেয়ে সে এটুকু অত্যাচার অনায়াসেই সহ্য করতে পারে। এর পরে না হয় অটলদা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে কলকাতা থেকে। তারপর অন্যায় যদি কিছু করেই থাকে সে, তো সে-অন্যায়ের জন্যে জবাবদিহি চাইতে যাচ্ছে না কেউ তার কাছে। জবাবদিহি করবার জন্যে সে আর পরিচিত মানুষের সমাজে ফিরেও আসছে না এ-জীবনে। তখন কোথায় কে পাবে তাকে?

আর ব্রজেনবাবুর জীবনও তো সে জানে! সেই রোমাঞ্চকর জীবনীও তো মঙ্গলবাবু তাকে ব'লে গেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে-মিথ্যাচার, তা মিথ্যাচার নয়। জীবনের চেয়ে দেশ অনেক বড়। পারিবারিক কর্তব্যের চেয়ে বড় দেশ। এমন কি বাবার চেয়েও বড় বিবেক!

পাত্রীপক্ষ খুশী হয়ে চলে গেলেন। অটলদাও বেরলো বাড়ি থেকে।

তখন কুন্তির নতুন বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হওয়া মানে আমূল পরিবর্তন হওয়া। এ-মানুষটা যতদিন তার কাছে গুরু ছিল, যতদিন আদর্শ-চরিত্র ছিল, ততদিন অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে অটলদাকে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর অটলদার আর-এক রূপ সে দেখতে পেল। এতদিন বাবাই ছিল তার কাছে একমাত্র পুরুষ। কিন্তু সব পুরুষমানুষই যে একরকম হয় না, তার প্রমাণ সে প্রথমবার পেলে অটলদাকে দেখে। অটলদা যেন সারা দিন কী ভাবে!

কুন্তি জিজ্ঞেস করতো—তুমি এত কী ভাবো সারাক্ষণ?

—কই কিছু তো ভাবি না!

ব'লে কুন্তির প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো অটলদা। অটলদার মনে হতো সে যেন ধরা পড়ে যাবে। শুধু কুন্তির কাছেই ধরা পড়ার প্রশ্ন নয়। আশে-পাশে, পাড়ায়-বেপাড়ায় সকলের কাছে ধরা পড়ার প্রশ্ন। ছোটবেলা থেকে অটলদা সকলের কাছে শুধু ভালোবাসাই পেয়ে এসেছে, শুধু শ্রদ্ধাই পেয়ে এসেছে। সকলে একবাক্যে শুধু প্রশংসাই ক'রে এসেছে তাকে। নিন্দে, কুৎসা, অপবাদ পাবার দুর্ভোগ কখনও বইতে হয়নি অটলদাকে। তার সুনামটা ছিল সস্তা, প্রশংসাটা ছিল প্রাপ্য! এই সুনামের জন্যে অটলদাকে কোনও মূল্য দিতে হয়নি কোনোও দিন। যা এসেছে তা সহজেই এসেছে। সেই সহজ পাওয়ার পথে হঠাৎ যেন কেউ প্রথম বাধা দিলে। তারপর থেকেই মনে হতো সবাই যেন সন্দেহ করছে তাকে। সবাই জানে জানতে পারলেই তাকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে একেবারে মাটিতে ফেলে দেবে। যেন সেই ভয়েই অটলদা আড়ালে-আড়ালে লুকিয়ে বেড়াতে ভালোবাসতো।

রাস্তায় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই কেমন এড়িয়ে যেতে চাইতো তাদের। কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করতো, কি হে, খবর কী তোমার? কী করছো আজকাল?

অটলদা বলতো, এখন কাজ আছে ভাই, চলি।

—তা কী এত কাজ তোমার, শুনিই না।

অটলদা বলতো, কাজের কি শেষ আছে?

ব'লে অন্যদিকে স'রে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতো।

তা বটে! সত্যিই তো! অটলদার কী একটা কাজ! আমাদের মতন তো সাধারণ মানুষ নয় অটলদা, যে সারাদিন তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে। সারাদিন রাস্তায় মিটিং-এ আড্ডায় দেখা যাবে। অটলদা যে জিনিয়াস। অটলদা যে প্রতিভা! অটলদা যে অসাধারণ!

যত লোকের কাছে সম্মান পেতো, অটলদা ততোই যেন ভয়ে আঁতকে উঠতো। সবাই যদি জেনে যায়। সবাই যদি ধরে ফেলে তাকে! সকলের চোখের আড়াল থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করবার যে সহজ পন্থাটা আছে, অটলদা সেই সহজ পন্থাটাই বেছে নিলে তখন থেকে। ভক্তদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্মান আদায় করবার ক্ষমতাটুকু যেন তার লোপ পেয়ে গেল।

কুন্তি বলতো, সারাদিন কোথায় ছিলে আজ?

অটলদা বলতো, কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—কী কাজ?

অটলদা বলতো, কাজ কি একটা? আজ আবার বরানগরে যেতে হয়েছিল।

—কিছু টাকা আনবে বলেছিলে যে? টাকার কী হলো? বাড়ি ভাড়া বাকি প'ড়ে রয়েছে যে দ'মাস।

অথচ সমস্ত মিথ্যে কথা! সমস্ত দিন হয়তো অটলদা ময়দানের নিরিবিলি মাঠে ঘাসের ওপর বসে কাটিয়েছে। কিম্বা একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে চিন্তায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তোলপাড় করে বেড়িয়েছে।

মনে হতো—কী হলো তার? সমস্তই কি ফাঁকি? তার যদি টাকাই নেই, তাহলে কেন সে ব্রজেনবাবুর কথা রাখতে গেল? সেও কি অন্যের চোখে নিজেকে মহৎ-সাধু প্রমাণ করবার জন্যে!

এক-একবার মনে হতো চাকরির একটা চেষ্টা করলে হয়। চাকরির চেষ্টা করলে লোকে তাকে লুফে নেবে! কিন্তু সেখানেও তো ওই একই সমস্যা! সে যে তাহ'লে সকলের সমান হয়ে যাবে। সকলের সমান হয়ে সকলের সঙ্গে এক স্তরে নেমে দাঁড়ালে কেউ যদি আগেকার মত ভক্তি না করে? শ্রদ্ধা না করে? যদি বলে অটলদা লেখাপড়া শিখে যা হয়েছে, আমরা লেখাপড়া না-শিখেও তাই-ই হয়েছি। অটলদা আর আমরা একই।

সমস্ত দিন ময়দানে-ময়দানে ঘুরে অস্থির হয়ে উঠতো অটলদা। এই কলকাতা, এই বাংলাদেশ, এই ইণ্ডিয়ান, সমস্ত মানুষের কাছে অটলদা যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাকে যেন আর কেউ আগেকার মত ঈর্ষা করে না। এ-ও এক যন্ত্রণা, এ-ও এক নিদারুণ অভিশাপ।

রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে কুন্তিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো।

কুন্তি সেই একই প্রশ্ন করতো—চাকরি পেলে তুমি?

চাকরির নাম শুনলেই রাগ হয়ে যেতো অটলদার।

—চাকরি? আমি করবো চাকরি? চাকরি করলে তো আমি অনেক আগেই তা করতে পারতাম! তুমি কি মনে করো আমি সাধারণ লোকের মত চাকরি কববার জন্যে জন্মেছি?

কুন্তি প্রথম-প্রথম শ্রদ্ধা নিয়েই কথা বলতো। তখনও তাব মোহ পুরোপুরি ঘোচেনি। বলতো, কিন্তু চাকরি না করলে চলবে কী করে?

অটলদা বলতো, আমার সঙ্গে যখন তোমার জীবন জড়িয়ে গিয়েছে, তখন আমার যেমনভাবে চলবে, তোমারও তেমনিভাবেই চলা উচিৎ।

—কিন্তু আমার না চলুক, তোমারও তো চলছে না।

অটলদা বলতো, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কিন্তু আমারই বা কী ক'রে চলবে, সেটাও তো ভাবা উচিত। আর তাই-ই যদি না ভাববে, তাহলে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?

এ-কথার উত্তর দিতে গিয়ে অটলদার মত অটল ধৈর্যের লোকেরও কেমন যেন মনটা টলে উঠতো সামান্য। কিন্তু তখুনি আবার সামলে নিতো। এক-একবার মনে হতো, সমস্ত প্রকাশই ক'রে দেবে। কে কুন্তি, কী তার পরিচয়, কেন তাকে বিয়ে করেছে, সমস্ত কথাই প্রকাশ ক'রে দিয়ে চিরকালের মত সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে কোথাও চলে যাবে।

কিন্তু তা শুধু সাময়িক। আবার নিজেকে সামলে নেয় অটলদা। নিজের বাড়িতে বাদামতলায় চলে আসে। আবার কিছুক্ষণের জন্যে প্রশান্ত দৃষ্টিতে কুন্তিকে ক্ষমা করে। নিজের স্বরূপ খুঁজে পায় নিজের মধ্যেই। তখন আবার মনে পড়ে, সে সাধারণ মানুষ হয়ে সংসারে বাঁচতে আসেনি। সংসারে আর-পাঁচজন মানুষের মত চাল-ডাল-তেল-নুনের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। সে ক্ষণজন্মা। স্বামী বিবেকানন্দের মত অটলদা নিজেও ঘর-ছাড়া। স্বামী বিবেকানন্দের মত তাকেও সংসারের লোকের আবেদন-নিবেদন গ্রাহ্য করলে চলবে না। তার নিজের আদর্শে পৌছতে হ'লে এ-সমস্ত বাধা আসবেই। এ-বাধা দূর করার মধ্যেই তার মহত্ত্ব, এ-বাধা অতিক্রম করার মধ্যেই তার গৌরব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

অধীর বোস বলতে লাগলো, আমরা যখন অটলদাকে মনে-মনে পুজো করেছি, মনে মনে ভেবেছি অটলদা কত ব্যস্ত, কত ছেলে-মেয়েকে মানুষ করবার সাধনায় বিব্রত, যখন আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি অটলদা নিজের তপস্যায় মগ্ন, তখন আসলে কিন্তু অটলদা পাগলের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন অটলদা লুকিয়ে-লুকিয়ে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে, তখন গোপনে বিয়ে করার জ্বালা মনের মধ্যে পুষে রেখে তুষের আগুনেব মত নিজেকে হত্যা করছে।

কুন্তি বলতো, আমাকে যদি তুমি প্রতিপালন না করবে তাহলে আমি কোথায় যাবো?

অটলদা বলতো, কেন? তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।

—আর তুমি?

অটলদা বলতো, তোমাকে বিয়ে করেছি বলে কি তোমার কেনা চাকর হয়ে গেছি? আমার কি নিজের স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই?

—কে বলছে নেই? আমি কী তাই বলেছি?

—তোমার জন্যে আমার লেখাপড়া সাধনা-তপস্যা সব যে গোল্লায় গেল! এমন করলে আর কিছু দিনের মধ্যে আমি পাগল হয়ে যাবো।

কুন্তি বলতো, কিন্তু তার আগে যে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি—আমার যে আর মাথার ঠিক নেই—

অটলদা বলতো, কিন্তু পাগলই যদি হয়েছো তো আর একজনকে মিছিমিছি পাগল ক'রে দিচ্ছো কেন?

—আমার জন্যে তোমার কি একটুও ভাবনা হয় না? আমি কি তোমার কেউ নই? আমাকে কি তুমি আগুন-সাক্ষী রেখে বিয়ে করোনি? বলো, তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে ব'লে যাও।

অটলদা স্থির হয়ে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। খানিকক্ষণের জন্যে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেল। বোধহয় রাগের ঝোঁকে একটা কিছু করেই ফেলতো সেদিন। কিন্তু সামালে নিলে তখনই।

বললে, তুমি কি আমাকে একটু শান্তিও দিতে পারো না?

—শান্তি?

কুন্তি যেন হেসে উঠলো নিজের মনে। বড় ম্লান সে হাসি।

বললে, শান্তি কি তুমি আমায় দিয়েছো এক মুহূর্তের জন্যে?

অটলদা বললে, জানো, তোমার জন্যে কতবড় স্বার্থ ত্যাগ করেছি?

—বলো, কী তুমি ত্যাগ করেছো? শুনি তোমার ত্যাগের ফিরিস্তি।

—তার মানে? তোমাকে বিয়ে করার আগে আমার কত শক্তি ছিল, জানো? আমার কত সম্মান ছিল, জানো? আমার কত কাজ ছিল, তা তুমি জানো? সকলে আমাকে কত শ্রদ্ধা কবতো তা জানো?

কুন্তি বললে, খুব জানি। একদিন আমিও তো তোমাকে কত সম্মান দিয়েছি—

—কিন্তু সে-সম্মান চলে গেল কেন? কেন আমি আর মাথা উঁচু করে আগেকার মত লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, কথা বলতে পারি না? বলো, কেন পারি না?

কুন্তি বলে, বলবো? সত্যি কথা বলবো?

—হ্যাঁ, বলো!

কুন্তি বললে, আসলে তোমার নিজের মধ্যেই ফাঁকি ছিল। আসলে তোমার মধ্যে কোনও গুণই ছিল না। এক একজামিনে ফার্স্ট হওয়া ছাড়া আর কোনও গুণই ছিল না তোমার মধ্যে। সবাই তোমাকে 'বড়-বড়' ব'লে ব'লে তোমাকে বড় ক'রে দিয়েছিল, সত্যিকারের বড় কিন্তু তুমি ছিলে না। তুমি চাইতে সবাই তোমাকে অসাধারণ ব'লে ভাবুক, সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করুক, সবাই তোমাকে 'গুরু' বলে মানুক—কিন্তু সত্যিকারের গুরু হওয়া কি অত সোজা? তাতে অনেক ত্যাগ করতে হয়—তাতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়! তুমি কিছু না ত্যাগ করেই সকলের মাথায় উঠতে চেয়েছিলে—

কথাগুলো অটলদার শুনতে ভালো লাগছিল না।

বললে, শেষকালে আমার সম্বন্ধে এই তোমার মত?

কুন্তি বললে, তুমি আমার মত জানতে চেয়েছিলে বলেই তোমাকে বললাম। তোমার অনুমতি নিয়েই তো আমি বলেছি।

—তাহ'লে তাই-ই বেশ! আমাকে যদি শ্রদ্ধা করতে না পারো তো আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে কেন আর যন্ত্রণা দিচ্ছো?

ব'লে রাগ ক'রে চলে আসছিল অটলদা। হঠাৎ পেছন থেকে অটলদার হাত ধ'রে ফেললে কুন্তি। বললে, কোথায় যাচ্ছো!

—যেখানে আমার খুশি!

—যেখানে খুশি চলে গেলে তো চলবে না। ভুলে যেও না, তুমি আমায় বিয়ে করেছো।

—কিন্তু বিয়ে করেছি ব'লে কি আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছে বলেও কিছু থাকতে নেই?

কুন্তি হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে বললে, না নেই।

—তার মানে?

—তার মানে তুমি ভালো করেই জানো। আমি তোমার সহধর্মিনী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই! থাকলে আইনে আট্‌কাবে।

—তুমি আমাকে আইন দেখাচ্ছো?

কুন্তি বললে, পুলিশের আইন ছাড়া আরো অনেক আইন আছে সংসারে। ঈশ্বর যদি মানো তো তারও আইন আছে। এই পৃথিবী যাঁর আইনে চলছে, এই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র যে আইনে নড়ছে, সেটাও তো একটা আইন! সে-আইনেও তো আটকাবে?

অটলদা বললে, আমি সে আইন মানি না।

—তুমি মানো না বললে আইন তা শুনবে কেন? আর আমিই বা কেন তা শুনতে যাবো?

অটলদা আর সহ্য করতে পারলে না। বললে, তুমি শুনবে কি শুনবে না তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথার দায় নেই, আমি চললাম—

ব'লে তাড়াতাড়ি কুন্তির হাতটা এক-ঝট্‌কায় ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর...

কিন্তু কুন্তি তার আগেই গায়ের পাঞ্জাবিটা টেনে ধরেছে। টানতেই পাঞ্জাবিটা টান লেগে অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। অটলদা থমকে দাঁড়ালো। ছেঁড়া পাঞ্জাবিটার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপ'র আর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা বাইরে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

কুন্তি পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে দিয়ে নিজেও যেন একটু বিব্রত বোধ করছিল। কিন্তু যখন তার জ্ঞান হলো, তখন অটলদা আর সেখানে নেই। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে!

এমন ঘটনা কুন্তি দেবীর বিবাহিত জীবনে এই-ই প্রথম, অটলদার জীবনেও এই-ই প্রথম। চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-সম্মান পেয়ে-পেয়ে অটলদার অহমিকা বোধহয় স্ফীত হয়ে

উঠছিল। মনে হতো, সে কেন ছোট হবে কারো কাছে? সে কেন অন্য মানুষের সমালোচনার পাত্র হবে। সে তো কোনও অন্যায় করতে পারে না। তার অন্যায় যদি কিছু হয়, তা-ও ন্যায় ব'লে ধ'রে নিতে হবে। অটলদা যে জিনিয়াস। অটলদা যে প্রতিভা। অটলদার অন্যায় প্রতিভার অন্যায়। অটলদার ভুল জিনিয়াসের ভুল। আসলে তা ভুলই নয়।

তারপর সেই অবধারিত লগ্ন ঘনিয়ে এলো।

তখন নিমন্ত্রণের চিঠি-পত্র ছাপানো, বিলোনো সমস্তই হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে সারারাত অনিদ্রায় কাটলো অটলদার। শেষ মুহূর্তে এই সমস্ত আয়োজনকে পণ্ড করে দিয়ে পালিয়ে যাবে সে? যেখানে কেউ তাকে জানবে না, চিনবে না। যেখানে গেলে তার অতীতটা মুছে ফেলতে পারবে? যেখানে গেলে নতুন ক'রে আবার আরম্ভ করতে পারবে তার জীবনটা?

ভেবে-ভেবে অটলদা পূবের চাঁদটাকে পশ্চিমের আকাশে ঠেলে পাঠিয়ে দিতো! মাঝে-মাঝে আশুবাবু জিজ্ঞেস করতেন, তোমার চেহারাটা দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

অটলদার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে আশুবাবু কেমন যেন ভয় পেয়ে যেতেন। আর একটা দিন। আর একটা দিন কোনও রকমে কাটাতে পারলেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়!

স্ত্রীকে গিয়ে বললেন, অটলের মুখখানা শুক্‌নো-শুক্‌নো কেন গো?

কাকীমা বললেন, কই, আমি কিছু বুঝতে পারিনি তো?

—না, ও তোমাকে কিছু বলেছে-টলেছে?

—কী আবার বলবে?

আশুবাবু বললেন, ওই যে ক'দিন ধ'রে বিয়ে করবো না বলছিল--

—সে তো সব ছেলেই ব'লে থাকে!

—না, আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, শেষে হয়তো ভদ্রলোকের কাছে আমায় বে-ইজ্জত হতে হবে। বরাবরই তো অটল একটু একগুঁয়ে।

না, সে-সব কোনো ভয়ই টিকলো না। অটল ক'দিন বাড়ী থেকে বেরোলই না। আশুবাবুও অবাক হয়ে গেলেন। যে-ছেলে দিনরাত বাইরে-বাইরে ঘুরতো সারাদিন, সেই ছেলেই যে এমন ক'রে আবার ঘরে এসে ঘর থেকে নড়তে চাইবে না, তাই-ই বা কে কল্পনা করতে পারতো।

সারাদিন ধ'রে বাজার-হাট হলো! অটলদার বিয়েতে খাটবার লোকের অভাব হবার কথা নয়। আশুবাবু যা-যা করতে বলতেন, আমরা তাই-ই করতাম। আটা-ময়দা-ঘি নানা জিনিস কিনে আনলাম আমরাই। বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি হয়ে গেল। নহবৎ-এর অর্ডার দিলাম। কিন্তু অটলদা সারাদিন নিজের ঘরে চুপ করে বসে রইলো।

আমাদের দেখে আগে কথা বলতো। সেদিন তেমন কোনও কথা বললে না। দেখলাম, অটলদার চেহারাটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমার শরীর খারাপ নাকি অটলদা?

অটলদা গম্ভীর গলায় বললে, না—

কী জানি, আমাদের মনে হলো, হয়তো বিয়ের দিন চেহারা ওই রকম শুকিয়েই যায় সকলের। উপোস করতে হয় তো! উপোস ক'রে থাকলে শরীর তো শুকিয়ে যাবেই।

বললাম, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে অটলদা?

অটলদা বললে, ভালো।

যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিলো না অটলদার। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মুখটা এমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

অটলদা জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা করলে। শীতকালে ঠোঁট ফাটলে মুখ দিয়ে যে-রকম হাসি বেরোয়, সেইরকম হাসি। সে অটলদার হাসি নয়। কাঁদবার পরই লোকের মুখে এরকম হাসি

দেখেছি। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অটলদা শুধু বললে, আমি খুব ভাবনায় পড়েছি—

—কেন? তোমার আবার ভাবনা কী অটলদা?

অটলদা বললে, ভাবনা কি কম? কত কাজ প'ড়ে রয়েছে চারিদিকে, অথচ কিছুই করা হচ্ছে না।

আমরা তো তখন ভেতরের ব্যাপার জানতাম না। অটলদার ভেতরে তখন যে ঝড় বয়ে চলেছে, তা-তো আমরা জানতাম না—যে, অটলদা লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলেছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে কুন্তি দেবীকে না-জানিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। অটলদা ভেবেছিল কুন্তি দেবী হয়তো কিছুই জানতে পারবে না। এখানে এসে চুপি-চুপি বিয়ে ক'রে কোথাও দূরে চলে যাবে। চাকরি নিয়ে অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে নতুন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করবে।

মানুষের পক্ষেই ভুল করা সম্ভব। দেবতার পক্ষে নয়।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি এ অটলদার ভুল নয়, নির্বুদ্ধিতা। সকলের চোখে বড় হবো, সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা চিরকাল ধ'রে পেয়ে যাবো, সকলের মাথায় চড়ে ব'সে থাকবো, এ-ধারনাই তো নির্বুদ্ধিতা।

সত্যিই তো, কেন আমরা অটলদাকে অত উঁচুতে তুলে দিয়েছিলাম। আমাদেরই তো দোষ! তাই অটলদাকে বিচার-বিবেচনা করেই মনে হয়, মানুষের পক্ষে আঘাত পাওয়াই বোধহয় ভালো। অনাদর পাওয়াই বোধহয় স্বাস্থ্যকর। ছোটবেলা থেকে পাড়ার ছেলে, বাবা-মা সকলের কাছ থেকে আদর পেয়ে-পেয়েই বোধহয় অটলদা এমন হয়ে গিয়েছিল। সকলের চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়েই বোধহয় এমন নির্বুদ্ধিতা ক'রে বসলো! নইলে আর কী কারণ থাকতে পারে?

সন্ধ্যেবেলা বরযাত্রী যাবার জন্যে আমরা সবাই তৈরী হয়ে নিয়েছি।

অধীর বোস বললে, সে-সব তো তোরা জানিস্! আশুবাবু যা ভয় করেছিলেন, তার কিছুই হলো না। অটলদা যে অত সহজে সব কাজ করতে রাজি হবে, তা কেউই ভাবতে পারেনি। যে অটলদা বরাবর খদ্দর পরতো, সেই অটলদাই সেদিন গরদের পাঞ্জাবি পরলে। জরি-পাড় ধুতি পরলে। বরের বেশে সেজে-গুজে গাড়ি চড়ে বিয়ে করতে গেল।

আমরা তখনও কেউ কিছু সন্দেহ করিনি।

আমরা ভেবেছিলাম, বিয়ে করতে যাবার সময় বোধহয় সব ছেলেই এমনি বাধ্য-বিনয়ী হয়ে ওঠে। আমরা ভেবেছিলাম, বিয়ে জীবনের একটা স্মরণীয় পরিচ্ছেদ। হয়তো সেইজন্যেই খানিকটা লজ্জা, খানিকটা সঙ্কোচ মিলিয়ে বরকে এমন সহিষ্ণু ক'রে তোলে। লোকে সেদিন তাকে যা করতে বলে তাই-ই সে করে, তাই সে নির্বিবাদে পালন ক'রে যায়। যে-অটলদা আমাদের অত উপদেশ দিয়ে এসেছে, স্বামী বিবেকানন্দের ব্রহ্মচর্যের বাণী শুনিয়েছে, তার এই ব্যবহার দেখে মনে-মনে কেমন আমরা হতবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ভেবেই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে, অটলদা তো আর সমাজের বাইরের মানুষ নয়। অটলদাও তো আর-পাঁচজনের মত একজন সামাজিক জীব। সুতরাং কেনই বা বিয়ে করবে না। অন্যায়টাই বা কোথায়? কে বিয়ে করেনি? মহাত্মা গান্ধী, সি-আর-দাশ, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে শুরু ক'রে প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং পর্যন্ত সবাই-ই তো বিয়ে করেছে! তবু অটলদা বিয়ে করাতে আমরা এত হতাশ হলাম কেন?

তবে হয়তো এইজন্যেই কথাটা মনে এসেছিল যে, অটলদাকে সেই বরের পোষাকে যেন কেমন বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। মুখের সেই দৃঢ়তা, চরিত্রের সেই ধার কোথায় গেল? না কি, সব বরকেই এইরকম বোকা-বোকা দেখায়! পৃথিবীতে যত বিয়ের বর দেখেছি, সকলের মুখখানা মনে আনবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, তখনও আমরা কল্পনাই করতে পারিনি যে, অটলদা তখন আর এক ভাবনায় অস্থির। তখনও আমরা ধারনাই করতে পারিনি যে, অটলদার আর-একটা বউ আছে। তখনও আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, অটলদা একটা বউ থাকতে আর-একটা বিয়ে করতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে।

কিন্তু এ-ও কি নির্বুদ্ধিতা? এক-একবার মনে হয়, নিবুর্দ্ধিতাই যদি হবে তো অটলদা তাহলে অত বিচলিত হয়েছিল কেন? নির্বোধ লোকেরা তো বেপরোয়া হয়। বিচার-বিবেক শূন্য হয়। তাহ'লে?

তাহ'লে হয়তো অটলদার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে মানুষ বোধহয় অটলদার মত নিজের অমঙ্গল নিজে বুঝতে পারে না। বুদ্ধিভ্রংশ হলে মানুষ বুঝি একটা অপরাধ অন্য অপরাধ দিয়ে ঢাকতে চায়।

বিয়ের আসরে আমরা অটলদার পাশে গিয়ে বসেছিলাম।

দেখেছিলাম, অটলদা খুব ঘামছে দর-দর করে। ভাবলাম, গরদের পাঞ্জাবি পরার জন্যেই হয়তো ঘামছে। কিংবা হয়তো উত্তেজনা। অটলদাকে অমন ঘামতে দেখে একজন মাথার ওপবের পাখাটা জোর করে খুলে দিয়েছিল। তবু অটলদার ঘাম কমেনি।

অটলদাকে এত ঘামতে দেখে আমরা অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, অটলদা তো সাধারণ মানুষ নয়। অটলদা কেন আমাদের মত অসহায় বোধ করবে নিজেকে।

আমাকে অটলদা বললে, এই শোন্, এক গ্লাস জল দিতে বল তো?

আমি বললাম, জল খাবে? আজ কি তোমার কিছু খেতে আছে?

— তা হোক, বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে।

আমি কাকে আর জল আনতে বলবো? আশেপাশে পাত্রীপক্ষের অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে। তাদেরই একজনকে বললাম জলের কথাটা। কিন্তু তারপব সে জল দিলে কিনা তা দেখা হলো না! হঠাৎ আমাদের সকলের খাওয়ার ডাক পডলো। আমরা দল বেঁধে সবাই খেতে চলে গেলাম। তারপরে কখন পাত্রীপক্ষেরা বরকে তুলে নিয়ে গেছে, কখন বরণ করা হয়েছে বরকে, কিছুই জানি না। আমরা তখন গরম-গরম লুচি দিয়ে বেগুন-ভাজা খাচ্ছি, ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই খাচ্ছি, চিংড়ি মাছের মালাই-কারি খাচ্ছি, পোলাও খাচ্ছি—

হঠাৎ তখন ওদিকে হৈ-চৈ উঠলো। তুমুল হট্টগোল।

আমরা খাওয়া ছেড়ে বিয়ের আসরে গিযে দেখি অবাক কাণ্ড।

অধীর বোস বলতে-বলতে আবার থামলো। আমি বললাম—তারপর?

অধীর বোস বললে, তারপর তো সব জানিস্ তোরা। এতদিনে সব-ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ভাই।

আসলে সেই থেকেই অটলদা আর অটলদা নেই। অটলদার জীবনের সূর্য এরপর থেকেই অস্ত গেল। এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন অটলদার অধঃপতন হলো এমন ক'রে। হয়তো সেদিনই বিয়ের সময়ে অটলদা যা ভয় করছিল, তাই-ই হয়েছিল। এই জন্যেই হয়তো অটলদা অত ঘামছিল। অত জল-তেষ্টা পাচ্ছিল তার।

তারপর বিয়ে শেষ হয়ে গেল। নির্বিবাদেই বিয়ে শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু তারপর আর জানতাম না। যে অটলদাকে না দেখে আমরা ভেবেছিলাম রাঁচি চলে গেছে, সেই অটলদা যে তখন ভবানীপুরে কুন্তি দেবীর বাড়িতে ছিল, তা আমরা কেমন ক'রে কল্পনা করতে পারবো!

তখন তো ডায়েরি রাখতাম না। তাই সব ঘটনার সাল তারিখ মনে নেই। বহুদিন পরে অধীর বোসের কাছে সব ঘটনা শুনে আবার মনে পড়তে লাগলো। অথচ চিঠির মাথায় তো রাঁচির নামই লেখা ছিল। সেই রাঁচি থেকেই তো অটলদা লিখেছিল : বাঙালীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। একে সংশোধন করতে হবে। এ না করলে জাত হিসেবে আমরা পেছিয়ে পড়বো। অন্য প্রদেশের লোকেরা হু-হু ক'রে এগিয়ে চলেছে। তোরা মানুষ হ'। কথায় আর কাজে এক হতে হবে। আমি বাইরে এসে দেখছি, এরা আমদের মত নিষ্ঠাবান ক্ষমতাবান না হোক, উদ্যমী। এদের মধ্যে একতা আছে—যেটার অভাব আমাদের মধ্যে। আমি ফিরে গিয়ে আবার আমাদের ক্লাবে ব'সে বলবো সব তোদের। আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে হবে। শিক্ষাই আমাদের যদি সার্থক না হয়, তাহ'লে জীবনে তো সমস্তই পণ্ডশ্রম!

এমনি আরো কত কথা লিখেছিল অটলদা।

আজ এতদিন পরে সব নতুন ক'রে মনে পড়তে লাগলো। সে-চিঠি কে লিখেছিল? কোন্ অটলদা লিখেছিল? যে অটলদা তখন কুন্তি দেবীকে বিয়ে ক'রে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্বর্গ-মর্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই অটলদা, না যে-অটলদা আমাদের বাদামতলার আদর্শ ছেলে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মন্ত্র-শিষ্য, সেই অটলদা? একই মানুষের মধ্যে কি দু'টো বিরুদ্ধ-চরিত্র একই সঙ্গে বাস করে?

সেই অতীতে যা-ই করে থাকুক অটলদা, যে-ভুলই ক'রে থাকুক, এতদিন পরেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি?

আর ভুলই বা বলি কেন? কোথায় গেলেন সেই মঙ্গলবাবু! সেই ব্রজেনবাবু! ফরিদপুরে লাট-সাহেবের ট্রেনে যিনি বোমা ফেলে ছিলেন, যাঁকে ধরবার জন্যে পুলিশ দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল! কেন অটলদা তাঁর সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে গেল? যদি কাঁধে তুলে নিতেই গেল তো তখনই নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিলে না কেন? কেন বড় হতে চাইলো অটলদা? কেন সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি সম্মান পেতে চাইলো? কেন নিজেকে বিলিয়ে দিলে না সকলের মধ্যে? কেন সব মানুষের সেবার মধ্যে নিজের অহংকারকে ভুলতে পারলে?

অধীর বোস চলে যাবার পর অটলদার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনীটা শুনে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। অতীতের সব জানা, সব দেখা যেন আবার না-জানা, না-দেখা হয়ে গেল। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ইন্দুলেখা দেবীর বাড়ীতে গেলাম। ভাবলাম, যেমন, ক'রে হোক তার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি আদায় করতে হবেই।

ইন্দলেখা দেবী তখন নিজের ভাড়া-বাড়িতে বাইরের ঘরে ব'সে কয়েকজন ছাত্রীকে পড়াচ্ছিলেন, আমাকে যেতে দেখেই উঠে এলেন। বেশ বিনীত-সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা করলেন।

বললেন, আপনি? আমার সঙ্গে কোনও কথা আছে?

বললাম, হ্যাঁ একটু নিরিবিলি হ'লে ভালো হতো—

ইন্দুলেখা দেবী বললেন, পাশের ঘরে আসুন, এ-ঘরে কেউ নেই—

বলে পাশের ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। ভদ্র-সভ্য রুচিসম্মত ঘরের সাজ। আমাকে একটা চৌকিতে বসতে ব'লে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি কী-ভাবে কথাটা পাড়বো বুঝতে পারলাম না। এই এঁকেই কি আমরা এত শ্রদ্ধা করছি। ভুবনবাবু এঁকে দেখেই কি দেবী ব'লে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন! আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো। হঠাৎ বললাম, আমি বউবাজারে গিয়েছিলাম অটলদাকে একবার দেখতে।

ভেবেছিলাম, আমার কথাটা শুনে ইন্দুলেখা দেবী চম্‌কে উঠবেন। কিন্তু না, তিনি তেমনি শান্ত গলাতেই বললেন, কেমন দেখলেন?

বললাম, ভালো নয়!

—আমি কিন্তু শুনেছি তিনি ভালোই আছেন এখন!

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, কিন্তু আপনি তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছেন না কেন?

ইন্দুলেখা দেবী এতক্ষণে চম্‌কে উঠলেন। বললেন, তার মানে?

বললাম, আপনি কি সত্যিই তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চান, না মেরে ফেলতে চান?

ইন্দুলেখা দেবী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, আপনি ঠিক কী বলতে চান, বুঝতে পারছি না।

আরো স্পষ্ট ক'রে বললাম, তাহ'লে পেনড্রা-রোড থেকে ভালো হবার খবর শুনেও কেন হঠাৎ সেখানে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন? কেন কলকাতায় চলে আসতে চিঠি লিখলেন? কেন কলকাতার এত জায়গা থাকতে বউবাজারে এঁদো ড্যাম্প্‌ বাড়িতে তাকে এনে তুললেন?

ইন্দুলেখা দেবী যেন হঠাৎ আমার মুখ থেকে এতখানি অভিযোগ আশা করেন নি।

বললাম, বলুন, জবাব দিন—

ইন্দুলেখা দেবী তখন যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, আপনাকে কে এ-কথা বললে?

বললাম, সেই লোক, কথাগুলো সত্যি কি-না বলুন, আমি আপনার কাছ থেকে জবাব চাইতেই এসেছি। আপনি হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা রুগ্ন স্বামীর জন্যে খরচ করেছেন এবং এখনও করছেন, এইটেই লোককে জানিয়েছেন। স্বামীর জন্যে আপনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন, সেইটেই লোককে বিশ্বাস করিয়েছেন। কিন্তু কার জন্যে এমন ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন? কার কোন্‌ ভালোটা এতে সিদ্ধ হবে! আপনার না অটলদার?

ইন্দুলেখা দেবী তখনও চুপ ক'রে রইলেন। কোনও উত্তর তিনি দিলেন না। আমি বললাম, চুপ করে থাকবেন না, উত্তর দিন। আজ আমি এর জবাব নিয়ে তবে যাবো। বাইরের লোকের কাছে আপনি কেন দেবী হয়ে আছেন, এর আসল উদ্দেশ্য আমার জানা দরকার।

ইন্দুলেখা দেবী এবার চোখ নামালেন।

বললেন, তাহ'লে সবই শুনেছেন দেখছি—

বললাম, হ্যাঁ শুনেছি, শুনেছি আব বিশ্বাসও করেছি, শুধু আপনার জবাবদিহিটা জানবার জন্যেই আমাব এখানে আসা। কারণ অটলদা আমাদের গুরু—

—আপনার গুরু?

বললাম, হ্যাঁ, সেটা এতদিন আপনাকে জানানো হয়নি। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আপনি বলুন, এত নিষ্ঠুর হতে পারলেন কেমন ক'রে? বেড়াল ইঁদুরকে আধমরা ক'রে রেখে খেলা করে যেমন মজা পায়, আপনিও কি অটলদাকে নিয়ে সেই রকম মজা করছেন?

দেখলাম, ইন্দুলেখা দেবীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তিনি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন। তারপর বললেন, আপনি কি এই কথা বলতেই এখানে এসেছেন?

বললাম, হ্যাঁ, আর কী কথা থাকতে পাবে আপনার সঙ্গে?

—তাহলে জেনে রাখুন, আমি আমার স্বামীর ভালোমন্দ নিয়ে যা-খুশী করবো, তাতে কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। আমার স্বামীর ভালোটাও আমার হাতে, মন্দটাও আমার হাতে। তাতে আপনার কী?

আমি সেই শান্ত-ধীর-স্থির মূর্তির মুখ থেকে কথাগুলো শুনে যেন স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুলেখা দেবী আবার বলতে লাগলেন—যেদিন আমার স্বামী জেনে-শুনে আমার সর্বনাশ করেছিলেন, যেদিন আমার স্বামী আমার বাবাকে ঠকিয়ে আমার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধেছিলেন, সেদিন তো আপনারা আমার স্বামীর কাছে জবাবদিহি চাইতে যাননি? সেদিন তো আমার ওপর তাঁর নিষ্ঠুরতা দেখে তাঁর বাড়ি বয়ে গিয়ে তাঁকে ধিক্কারও দেননি? তবে আজ কেন এসেছেন আমার কাছে আমার কাজের জবাবদিহি চাইতে? যান, আপনি চলে যান—

এ-কথার পর আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

ইন্দুলেখা দেবী বললেন—আমি আমার বাবার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম, আব সেইসব সম্পত্তিই স্বামীর অসুখের পেছনে খরচ করেছি, সে কি তাঁর উপকারের জন্যে? যে আমার সর্বনাশ করবে, আমি তার উপকার করবো, এ-কথা আপনারা ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে?

—এর চেয়ে যে খুন করে ফেলাও ভালো।

—কিন্তু তাতে তো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। খুন করলে তার তো শাস্তি হবে না, খুন করলে তার তো উপকার করা হবে।

বললাম, তাহ'লে বাঁচিয়ে রাখুন—

কিন্তু সেও তো একই কথা। তাহলে তার আর শাস্তি হলো কই? এই বাঁচাও নয়, মরাও নয়, এইভাবেই আমি তাকে রাখতে চাই! মানু৺া জানুক, সব মেয়েমানুষই নিরীহ গো-বেচারা নয়—মেয়েদেরও আত্মসম্মান-বোধ আছে। মেয়েদেরও আত্মমর্যাদা আছে—মেয়েদেরও প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে।

তারপর হঠাৎ থেমে বললেন, অনেক রাত হলো, আপনি বাড়ী যান—এ-পাপের কোনও জবাবদিহি নেই, কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই।

তারপর আর সেখানে দাঁড়াইনি। হতবাক্ হয়ে ইন্দুলেখা দেবীর বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, জিনিসটা প্রচার ক'রে দেবো। ইন্দুলেখা দেবীর মিথ্যা গৌরবটুকু সমূলে ধূলোয় মিশিয়ে দেবো। কিন্তু তারপরই হঠাৎ আমাকে তিন বছবের জন্যে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হলো। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ ঘটলো যে, ভুবনবাবুকেও খবর দিতে যেতে পারিনি। সমস্ত রাজস্থানে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার চাকরি। সে অন্য কাহিনী, অন্য পটভূমিকা অন্য জগৎ। সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

হঠাৎ একদিন ভুবনবাবুকে চিঠি লিখে এক অদ্ভুত উত্তর পেলাম। ভুবনবাবু লিখলেন—আপনি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন যে, আমাদের স্কুলের ইন্দুলেখা দেবী হঠাৎ আত্মহত্যা করে এখানকার অধিবাসীদেব মর্মাহত করে দিয়েছেন। কেন যে তিনি এ-কাজ করতে গেলেন কে জানে। তাঁর মত টিচার পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। পুলিশ এর রহস্য ভেদ করতে পারেনি। আমরাও কিছু বুঝতে পারছি না কেন উনি নিজেকে এমনি করে নিয়তির পায়ে বলি দিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এখানে আমাদের স্কুলে বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সকলেই একবাক্যে বক্তৃতা দিলেন যে, তাঁর মত সতী, পতিভক্তি-পরায়ণা মহিলা এ জগতে দুর্লভ। আমরা সকলে তাঁর স্বর্গত আত্মার মুক্তি কামনা ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। স্কুলে তাঁর একটা তৈলচিত্রও টাঙাবার প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এ খবরে আপনি নিশ্চয় খুশী হবেন, আশা করি।

এ-চিঠি পাবার পর আমি অটলদার খবরের জন্যেও চিঠি লিখেছিলাম ভুবনবাবুকে। অধীর বোসকেও লিখেছিলাম। কিন্তু কেউই অটলদার খবর দিতে পারেনি। তিন বছর পরে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন বউবাজারের সেই ঠিকানাতেও একবার গিয়েছিলাম! কিন্তু তারা অটলদার কোনো সন্ধানই দিতে পারলে না। হয়তো অটলদাও আর এ-পৃথিবীতে নেই। কুন্তি দেবীও নেই। কিন্তু পৃথিবীর কোনও কোণে যদি আজও তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে, তবে প্রার্থনা করি—যেন অটলদা একটা মুহূর্তের জন্যও একটু শান্তি পায়। যশ সবাই পায় না, অর্থও সবাই পায় না। পেলেও তা জীবনে অনেকেই কাজে লাগাতে পারে না। তার চেয়েও মূল্যবান বস্তু শান্তি। জানি অটলদা সেই শান্তি চায়নি। লগ্নে যার ঝড়, সারা জীবনে তার শান্তি পাবার কথা নয়।

অটলদা আর ইন্দুলেখা দেবীর এই কাহিনী ভালোবাসার কাহিনী, না প্রতিশোধের কাহিনী, না নিছক নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কাহিনী, তাও বুঝতে পারিনি এতদিন! এখনও বুঝতে পারছি না। কাহিনী যেমন ঘটেছিল তেমনিই লিখে গেলাম। আপনারা এই কাহিনীর ভেতরকার তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে আনন্দ বা বেদনা একটা কিছু পেলেই আমি কৃতার্থ হবো।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যত

মাথায় যখন গল্প থাকে না তখন যদি কেউ গল্প লিখতে পীড়াপীড়ি করে, তখনকার অবস্থা বোঝাতে পারব এমন ক্ষমতা আমার নেই। তখন ওষুধ খেতে হয়, ডাক্তারের দ্বারস্থ হতে হয়। তখন সমস্ত পৃথিবীটাই আমার কাছে তেতো লাগে। সারা জীবন এই রকমই চলছে। বিশেষ করে যেদিন থেকে লেখক হয়েছি।

মানুষের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেই ক্ষমতার অপব্যবহারে যে বদনামের ভাগী হতে হয় সে সম্বন্ধেও আমি সচেতন। তবু সামাজিকতা বলে একটা জিনিস আছে সেটা সব সময়ে এড়ানো যায় না।

এ বছরে এই রকম অবস্থাতেই আমি পড়েছি। মাথায় কিছুই নেই, অথচ লিখতে হবে। কেমন করে কোথা থেকে কী নিয়ে তুমি লিখবে, তা আমার ভাববার দরকার নেই, আমি তোমার লেখা চাই-ই চাই।

এও বোধহয় বর্তমানের গতির যুগের এক অবধারিত অভিশাপ।

হ্যাঁ, অভিশাপই বটে! এ-রকম অভিশাপের দায় আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। অথচ আমি তো জেনে-শুনেই এই বিষ পান করেছি। কতবার যে খারাপ লেখা লিখেছি, তার ঠিক নেই। সে সব লেখা পড়ে আমার নিজেরই লজ্জা হয়েছে। ভেবেছি যা হয়েছে তা হয়েছে, এবার থেকে আর এ-পাপ করব না।

কিন্তু যেই নতুন বছর শুরু হয় আর তখনই অনুরোধ-উপরোধ পীড়াপীড়ির পালা শুরু হয়। তখন আর কারো মুখের ওপর 'না' বলতে পারি না। বন্ধু-বান্ধব যারা বাড়িতে আসে তাদের জিজ্ঞেস করি। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনি। তাতে যদি কোন-গল্পের সন্ধান পাই।

সেদিন আমার এক বন্ধু বাড়িতে এলো। পরিতোষ। পরিতোষ সরকার। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, কী হে, তোমার চেহারা এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

বললাম, গল্পের ভাবনায়—

বন্ধু পরিতোষ নানান রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। হাই সোসাইটিতে মেশে। দশ-বারোটা ক্লাবের মেম্বার। মাসের মধ্যে আটাশ দিন পার্টিতে যায়। সমাজের যারা মাথা, অর্থাৎ ভি-আই-পি, তাদের সঙ্গেও যেমন মেলামেশা আছে, তেমনি আবার মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একজন গোঁড়া পাণ্ডা। আমার সমস্যার কথা শুনে বন্ধু পরিতোষ বললে, 'তাহ'লে তুমি মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে লেখ না'।

—মিস্টার গাঙ্গুলী কে?

পরিতোষ বললে, আরে, তুমি চিনবে না তাকে, তিনি আমাদের ক্লাবে আসেন বটে, কিন্তু এক ফোঁটা মদও খান না, এক রাউণ্ড তাসও খেলেন না। যাকে বলে পুরোপুরি চরিত্রবান লোক।

বললাম, তেমন লোককে নিয়ে গল্প হবে?

পরিতোষ বললে, কেন, মদ না খেলে, তাস না খেললে, তাদের নিয়ে কি গল্প হয় না?

বললাম, না, তা বলছি না। কিন্তু সাধারণত যারা সাতে-পাঁচে থাকে না, তাদের জীবনে তো কন্‌ফ্লিক্ট থাকে না। কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। তাই জন্যেই বলছি।

পরিতোষ বললে, মিস্টার গাঙ্গুলী নয়, তার মেয়েই এ গল্পের আসল নায়ক।

—সে কী রকম? মেয়েমানুষ নায়ক? মেয়েরা তো নায়িকা হয়।

পরিতোষ বললে, গল্পের যদি কেউ কেন্দ্র-চরিত্র হয়, তাকেই আমরা বলি নায়ক। সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক।

বললাম, তাহ'লে গোড়া থেকে বলো। শুনে নিই। শুনে যদি ভালো লাগে, তাহ'লে মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়েই গল্প লিখবো।

পরিতোষের একটা গুণ আছে, সে গল্প বলে ভালো।

এক-একজন মানুষের এক-এক রকমের নেশা থাকে। কারো নেশা থাকে রেস খেলার, কারো থাকে সিগারেট খাওয়ার নেশা ; আবার কারো নেশা থাকে মেয়েমানুষের বা মদ খাওয়ার। নেশার কি অভাব আছে মানুষের সংসারে?

যাদের টাকা-কড়ি নেই, তারাই শুধু টাকা উপায়ের ধান্দায় জীবনপাত করে। সারাদিন কোন অফিসে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমোয় আর বছর বছর সন্তানের জন্ম দেয়। গরীবদের যে নেশা নেই তা নয়। তাদের আবার অন্য রকম নেশা।

একবার পুরীতে গিয়েছিলাম। পুরীতে অবশ্য বারো-তেরো বার গিয়েছি। একবার গিয়ে দেখি নৌকা ভর্তি চিংড়ি মাছ ধরেছে জেলেরা। প্রত্যেক নৌকোতে দু' মণ, তিন মণ করে চিংড়ি মাছ। প্রায় দশটা নৌকোর জেলেদের খুব আনন্দ। তখনই গাড়ি আসবে সব মাছ-কোম্পানির। তারা মণ-মণ মাছ পাইকারি হারে কিনে নিয়ে সারা পৃথিবীতে এক্সপোর্ট করবে। জাপানে যাবে, ইংলণ্ডে যাবে, আমেরিকায় যাবে সে সব মাছ। মোটা দামে বিক্রি হবে সে সব মাছ। ইণ্ডিয়া গভর্মেন্ট সেই মাছ বিক্রির টাকার ভাগ পাবে বিদেশী টাকা। আর গরীব জেলেরাও মোটা দাম পাবে।

আমার মনটা খুব খুঁশি হলো জেলেদের কথা ভেবে। গরীব লোক তারা। কাপড়-জামা কেনবার পয়সা নেই তাদের। তারা সেই কোন্ ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়েছিল, বেলা বারোটার সময় পাড়ে এসে ঠেকেছে। মহাজনরা তাদের মোটা টাকা দাম দেবে।

আমি খবরটা দিলাম আমার এক বন্ধুকে। আমার বন্ধুর গেস্ট-হাউসেই উঠেছিলাম। কথায়-কথায় তাকে বললাম, যে আজকে খুব মাছ উঠেছে।

বন্ধু মদ্য ব্যবসায়ী। বিহার, উড়িষ্যার বাজারে মদ বিক্রি করা তার ব্যবসা। সে শুনে খুব খুশি হলো। বললে, যাক একটা ভাল খবর দিলে তুমি।

বন্ধুর মদের কারবারের সঙ্গে চিংড়ি মাছের বিক্রীর যে কী সম্বন্ধ, তা বুঝতে পারলাম না। বন্ধু বললে, আজকে আমাদের খুব মদ বিক্রি হবে।

—কেন? মদ বিক্রি বেশি হবে কেন?

বন্ধু বললে, জেলেদের যত মাছ উঠবে, আমদের মদ ততো বিক্রি হবে।

এতক্ষণে বুঝলাম খবরটা শুনে বন্ধুর এত আনন্দ হলো কেন? জেলেরা যতো টাকা উপায় করে, সেই সব টাকার বেশির ভাগটা চলে যায় মদের দোকানে।

আর সেই দিনই বুঝলাম যে, গরীব লোকই হোক আর বড়লোকই হোক, নেশা সকলেরই আছে। তবে বড়লোকেরা বড় নেশা করে, আর গরীব লোকেরা ছোট নেশা।

এই যেমন আমাব লেখার নেশা। কবে একদিন লেখার নেশা শুরু করেছিলুম, সে আজ

মনেও পড়ে না। আজ এতদিনেও সেই নেশা ছাড়তে পারলাম না। এখন আমি আর লিখতে চাই না, কিন্তু নেশাই আমাকে দিয়ে লেখায়। এখন না লিখে থাকতে পারি না বলেই লিখি।

পরিতোষের নেশা কলকাতার বড়-বড় ক্লাবের মেম্বার হওয়া। কারণ, তাতে বড়-বড় লোকেদের সঙ্গে মেশা যায়। লোকেদের বলতে পারা যায় যে, আমার অমুক লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। এও এক রকমের নেশা বই কি।

মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলী যেমন মদ খান না, তাস খেলেন না, অথচ ক্লাবে যান সস্ত্রীক। পরিতোষ যেমন অন্য ভি-আই-পিদের সঙ্গে মেশে, মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলীর সঙ্গেও তেমনি মেশে। মিস্টার গাঙ্গুলী ভি-আই-পি, এই তাঁর কোয়ালিফিকেশন। মিস্টার গাঙ্গুলীর একমাত্র নেশা তাঁর মেয়ে। মেয়েই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন।

এককালে মিস্টার গাঙ্গুলী ছিলেন আই-সি-এস। ব্রিটিশ আমলের আই-সি-এস হওয়া ছোট ব্যাপার নয়। বলতে গেলে তাঁরাই তখন দেশ চালাতেন। যখন তিনি গৌহাটিতে পোস্টেড ছিলেন, তখন কংগ্রেসের গুণ্ডাদের পিটিয়ে ঘায়েল করেছেন। তাঁর ওপর অর্ডার ছিল কংগ্রেসী দেখলেই তিনি যেন তাঁদের ধরে যে-কোন ছুতোয় জেলে পোরেন। কোন অপরাধ থাকার দরকার নেই। খদ্দর-পরা লোক দেখলেই বোঝা যেত সে দেশভক্ত কংগ্রেসী। দেশভক্ত হওয়াটাই সে-যুগে ছিল মস্ত অপরাধ।

মিস্টার গাঙ্গুলী তখন কত যে কংগ্রেসীদের পিটিয়ে মেরেছেন, তার গোনাগুন্তি নেই। তখনকার দিনে আই-সি-এস-রা যত লোক খুন করতে পারতো, ততো তার চাকরিতে উন্নতি হতো। মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলীর তাই খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়েছিল জীবনে।

কিন্তু ব্রিটিশ গভর্মেন্ট যখন ১৯৪৭ সালে ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গেল। তখনই হলো বিপদ! তখন আর তেমন খাতির রইল না কংগ্রেস আমলে।

যে সব কংগ্রেসীদের জেলে পুরেছিলেন গাঙ্গুলী সাহেব, যাদের বেত মেরে একদিন ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন, তখন থেকে তাদেরই সেলাম দিতে হলো গাঙ্গুলী সাহেবকে। 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হতো। বিমলা প্রসাদ চালিহা তখন গৌহাটির চিফ্ মিনিস্টার। ব্রিটিশ আমলে তাঁর ওপর কত অত্যাচার করেছেন গাঙ্গুলী সাহেব, কিন্তু সেই আসামীই যখন আবার আসামের চিফ্ মিনিস্টার হলেন, তখন তাঁকে সেলাম করতে বাধল না গাঙ্গুলী সাহেবের।

কিন্তু গাঙ্গুলী সাহেবের একলারই বা দোষ কী। যারা ইংরেজ আই-সি-এস ছিল, তারা দেশ স্বাধীন হবার পর আবার নিজেদের দেশে ফিরে গেল। রয়ে গেল শুধু তারাই, যারা ইণ্ডিয়ান। তাদেরই হলো যত বিপদ!

কিন্তু গাঙ্গুলী সাহেবের কোন অসুবিধে হলো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেলের ছবি টাঙিয়ে দিলেন। বাড়ির জানলা-দরজায় খদ্দরের পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। রাতারাতি রং বদলাতে গাঙ্গুলী সাহেবের এতটুকুও কষ্ট হলো না। তখন থেকে অফিসার্স ক্লাবে তিনি খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আসতে লাগলেন। আর ইংরেজীয়ানা চলতে লাগল শুধু অফিসে।

সেখানে তিনি পুরোপুরি সাহেব। তবে দিশী মিলের কাপড়ের কোট-প্যাণ্ট। বাড়িতে দেশের সব বড় বড় কংগ্রেসী নেতাদের ফটো দেখে অনেকে জিজ্ঞেস করত, আপনি আই-সি-এস হয়েও এঁদের ছবি টাঙিয়েছেন যে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, চাকরির জন্যে এতদিন এঁদের ফটো আমি বাড়ির দেওয়ালে টাঙাতে পারিনি। নইলে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, প্যাটেলজী ওঁরাই বরাবর ছিলেন আমার কাছে আদর্শ। আমি বরাবর অহিংসাধর্মে বিশ্বাসী।

স্বাধীনতার পর মিস্টার ডি গাঙ্গুলী রাতারাতি যে দেবব্রত গাঙ্গুলী হয়ে গেলেন, এতে বাইরের আদলটা যেমন বদলালো, মিসেস গাঙ্গুলীরও তেমনি সব কিছু আমূল বদলে গেল।

মিসেস গাঙ্গুলী মানে রমা গাঙ্গুলী। রমা গাঙ্গুলী আগে বেশীর ভাগ সময় ইংরেজী কায়দায় চলাফেরা করতেন। ইংরেজী কায়দায় পার্টিতে যেতেন, ইংরেজী দোকান থেকে মার্কেটিং করতেন, নিউ মার্কেট ছাড়া অন্য কোথাকার জিনিস পছন্দ করতেন না।

বলতেন, আর সব বাজার তো নোংরা। নোংরা বাজারে যেতে আমার খুব খারাপ লাগে। সমস্ত ডার্টি নেটিভদের এ্যাট্‌মোসফেয়ার। আমার মোটেই ভালো লাগে না।

বাড়িতে যখন পার্টি দিতেন, তখন যত সাহেব-সুবোদের নেমন্তন্ন করতেন। দিশী নেটিভ বলে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই আধা-বিলিতি আদমী। তাছাড়া ছিল গভর্মেন্ট সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারি র‍্যাঙ্কের লোক। ডেপুটি কমিশনারদের নিচের পোস্টের ঠাঁই ছিল না মিসেস গাঙ্গুলীর পার্টিতে।

কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পরে যত পার্টি দিতেন তিনি, তাতে আসত যত সব পা-ফাটা খদ্দরধারী কংগ্রেসীরা।

মিস্টার গাঙ্গুলীর যা কিছু প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সব কিছু ওই তাঁর স্ত্রী রমা গাঙ্গুলীর জন্যেই। রমা গাঙ্গুলীই বলতে গেলে স্বামীকে আই-সি-এস থেকে একেবারে ডেপুটি সেক্রেটারির র‍্যাঙ্কে তুলেছিলেন। মিস্টার গাঙ্গুলী তা জানতেন। তখন থেকেই তিনি সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

এক-একজন লোকের আসল বৃত্তিটার পাশাপাশি আর একটা নেশা থাকে। কারো নেশা থাকে গল্‌ফ-খেলার, কারোর বা তাসের নেশা। কিংবা কারো আবার পোশাক-পরিচ্ছদের নেশা। দিল্লী কালীবাড়ির একবার প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন তিনি। দফতরের বাইরে একটা গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত হতে গেলে এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তাতে ইজ্জৎ ডবল হয়ে যায়।

অফিসের তো একটা আলাদা ইজ্জৎ আছেই, তার ওপর বাড়তি ইজ্জৎ থাকলে ভালো লাগে। নন্‌-পলিটিক্যাল ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে ভেতরে বাইরে ইজ্জৎ। কালীবাড়ি এমনই একটা ইজ্জৎদার জায়গা, যার প্রেসিডেন্ট হলে সমাজের নামজাদা লোকেরা তোমাকে খাতির করবে।

মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলী তাই-ই হলেন। সেখানে মাঝে মাঝে ফাংশান হয়। সেই ফাংশানে গান-বাজনা-নাচ থিয়েটার হয়। সেই ফাংশানের আগে সবাই এসে ধরে মিস্টার গাঙ্গুলীকে। বলে, আপনার মেয়ের নাচ হবে তো?· সেবার যা বিউটিফুল নেচেছিল আপনার মেয়ে, এখনও ভুলতে পারিনি।

মিস্টার গাঙ্গুলীর মেয়ের নাম বুলা। স্কুলের নাম শর্বরী।

সারা দিল্লীময় লোকের মুখে শর্বরীর নাচের প্রশংসা। কেউ কেউ বাড়িতে এসে পর্যন্ত শর্বরীর নাচের প্রশংসা করে যায়। বলে, শর্বরী একটা জিনিয়াস মিস্টার গাঙ্গুলী। দেখবেন ও একদিন খুব ফেমাস্‌ হয়ে উঠবে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেন, বরাবর ছোটবেলা থেকেই ওর নাচের নেশা।

আসলে খুব খোসামোদ করতো লোকে। সেটা মেয়ের নাচের জন্যে খোসামোদ, না মিস্টার গাঙ্গুলীর চাকরির জন্যে খোসামোদ তা বোঝা যেত না। কিন্তু বাইরের লোকের তাতে কার্যোদ্ধার হতো। কেউ চাকরিতে যদি প্রমোশন চায়, তো তাকে তাঁর মেয়ের নাচের প্রশংসা করতে হবে এইটেই ছিল নিয়ম।

যখন সাহিত্য সম্মেলন হল দিল্লীতে, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শর্বরী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত হাততালি পেয়ে যেত। যারা মিস্টার গাঙ্গুলীর কৃপা-প্রসাদ পাবার প্রত্যাশী, তারা মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলীকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাততালি দিত।

তাতে কাজ হতো। মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী তাদের চিনে রাখতেন। ভবিষ্যতে তাদের চাকরিতে প্রমোশন হতো আর যারা চাকরি করত না, তারা রাস্তায় দেখা হলে নমস্কার করত।

মিসেস গাঙ্গুলী কনট্ প্লেসের দিকে গেলে কত লোক যে তাঁকে নমস্কার করত তার ঠিক নেই। সকলকে তিনি চিনতেও পারতেন না।

তারা জিজ্ঞেস করত, আমায় চিনতে পারছেন তো?

মিসেস গাঙ্গুলী না চেনবার মতো মুখের ভঙ্গি করতেন। তারা বলত, সেই সেদিন আপনার মেয়ে শর্বরী নেচেছিল, আপনি তো তারই মা।

বড় কৃতার্থ হয়ে যেতেন মিসেস গাঙ্গুলী।

আসলে সবাই জেনে গিয়েছিল যে কার্যসিদ্ধি করতে কিংবা চাকরী পেতে গেলে মেয়ের প্রশংসা করতে হবে। তা হলেই দেবা-দেবী খুশি হবেন। মিস্টার গাঙ্গুলী হলেন সেই দেবতা যাকে খুশি করতে পারলে সেক্রেটারীয়েটে একটা ছোটখাটো কিংবা বড় গোছের একটা চাকবি পাওয়া যায়।

কিন্তু হঠাৎ মিস্টার গাঙ্গুলীর সাহিত্য করবার ইচ্ছে হলো। শুধু কালীবাড়ির প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি ঠিক তুষ্ট হতে পারছিলেন না। সাহিত্যিক হবার বাসনা তাঁর ছোটবেলা থেকে, সেটা এতকাল পূর্ণ হয়নি। এবার চাকরিতে পাকা হয়ে বসে তিনি খাতির মর্যাদা সেলাম সব পেয়েছেন। কিন্তু যাকে বলে যশ সেটা তাঁর কপালে তখনও জোটেনি। তিনি ভাবলেন, ওটা চাই।

সাহিত্যিক হতে গেলে খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় চাকরি পাবার পর থেকেই ছিল! তারা তাঁর অফিসে আসত। রিপোর্ট নেবার জন্যে তাঁর সহায়তা দরকার। একদিন ইন্দ্রনাথ তরফদার এলো কিছু খবর নিতে।

খবরের কাগজের লোক এলে সেক্রেটারি হিসেবে তাদের একটু বেশি খাতির করতেন মিস্টার গাঙ্গুলী। কারণ তিনি জানতেন খবরের কাগজ হলো প্যারালাল গভর্মেণ্ট। তারা ইচ্ছে করলে দেশের মিনিস্ট্রি বদলাতে পারে। ইচ্ছে করলে পার্টিরও ক্ষতি করতে পারে, গভর্মেণ্টকেও নাস্তানাবুদ করতে পারে।

সেদিন ইন্দ্রনাথ তরফদার আসতেই তিনি বললেন, আমি একটা উপন্যাস লিখেছি ইন্দ্রনাথবাবু।

ইন্দ্রনাথবাবু তো শুনে থ'। বললেন, উপন্যাস লিখেছেন আপনি নিজে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সাহিত্যের ওপর আমার চিরকালের ঝোঁক। ছোটবেলা থেকে আমি সাহিত্যিক হবো, এই ছিল আমার এ্যামবিশন, কিন্তু সাহিত্যিক হতে গিয়ে আমি হয়ে গেলুম আই-সি-এস। আই-সি-এস হবার পর আর সাহিত্য করার সময় পেলুম না! কিন্তু বাড়িতে বসে রাত জেগে আমি এই উপন্যাসটা লিখেছি কেবল, কেউ তা জানতে পারেনি।

—কত দিন লাগল লিখতে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তা প্রায় দশ বছর।

—দশ বছর!

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তার বেশি হবে তো কম হবে না।

অবাক হয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথবাবু! বললেন, তাহ'লে বইটা ছাপিয়ে ফেলুন।

মিস্টার গাঙ্গুলী এই জবাবটাই চাইছিলেন। বললেন, আগে কোন পত্রিকায় ছাপাতে চাই।

আপনাদের তো একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে কলকাতায়, তারা ছাপাবে না?

ইন্দ্রনাথ তরফদার বললেন, ছাপাবে না মানে? পেলে লুফে নেবে।

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি বলছি না তো কি মিথ্যে বলছি? একে আপনার লেখা, তার ওপর আপনি দশ বছর ধরে রাত জেগে উপন্যাস লিখেছেন, এ খবর যদি কোন সম্পাদক জানতে পারে তো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার ওপরে। আপনি ওটা কাউকে দেবেন না। ও আমাদের কাগজে আমি ছাপাব। আমি নিজে আপনাকে কথা দিচ্ছি।

মিস্টার গাঙ্গুলীর তবু সন্দেহ হল। বললেন, একটা কথা কিন্তু তার আগে আপনাকে বলে রাখি! যদি পড়ে খারাপ লাগে, তাহ'লে যেন না ছাপায়। লেখাটা যদি সত্যিই ভালো লাগে, তাহ'লেই যেন ছাপায়।

ইন্দ্রনাথ তরফদার বললে, ভালো লাগতে বাধ্য। কালীবাড়িতে সেদিন যে লেকচারটা আপনি দিয়েছিলেন, তা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার কত জ্ঞান। আপনি নির্ভয়ে কপিটা আমাকে দিতে পারেন, আমি আমাদের কলকাতায় 'দেশ-দর্পণ' কাগজে ছাপিয়ে দেব, আপনার পুরোটা লেখা হয়ে গেছে তো?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হ্যাঁ, পুরো লেখা হয়ে গেছে।

তাহ'লে আজ সন্ধেবেলাতেই আমাকে লেখাটা দিয়ে দিন, আমি রাত জেগে পড়ে নেব।

সেইদিনই মিস্টার গাঙ্গুলী পাণ্ডুলিপিটা ইন্দ্রনাথ তরফদারকে দিয়ে দিলেন। ইন্দ্রনাথ তরফদার জানতেন, যে লেখাটা ততো ভালো হবে না। তবু যদি কোন রকমে তাঁদের 'দেশ-দর্পণে' ছাপানো যায়, তাহ'লে তাঁর মাইনে বেড়ে যাবে। ইন্দ্রনাথ তরফদার কলকাতার খবরের কাগজের দিল্লীর প্রতিনিধি। তার খবর পাঠানোর ওপরেই কাগজের বিক্রি বাড়ে।

সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। গিয়ে সম্পাদককে ধরলেন। বললেন, এটা যে-কোন রকমে যদি ছেপে দেন তো আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

ইন্দ্রনাথ বললেন, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের কমিউনিকেসান মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি, মস্ত বড় পোস্ট। এঁর লেখা যদি ছাপেন তো আমাদের পেপারেরও খুব ভালো হবে। এঁর হাতে অনেক ক্ষমতা।

সম্পাদক শেষ পর্যন্ত ছেপেছিলেন। তারপর বিজ্ঞাপনেও অনেক কিছু প্রশংসা করা হয়েছিল। মিস্টার গাঙ্গুলী ভীষণ খুশি। এতদিন তিনি ছিলেন সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি। তারপরে কালীবাড়ির প্রেসিডেণ্ট। সেই থেকে তিনি হয়ে গেলেন সাহিত্যিক।

কিন্তু বই তো লিখলেন। সাপ্তাহিক 'দেশ-দর্পণে' তা ছাপাও হলো। কিন্তু বই? বই ছাপবে কে?

মিস্টার গাঙ্গুলী ডিউটি নিয়ে কলকাতায় এলেন। এদিকে অফিস থেকে টি-এও পাবেন, আবার নিজের বই ছাপানোর ব্যবস্থাও হবে।

তিনি তখন জেনে গিয়েছেন যে তিনি নামজাদা হয়েছেন। তার ওপর ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের আই-সি-এস সেক্রেটারি। তিনি মনে-মনে এক ফন্দি আঁটলেন। একজন প্রকাশকের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আপনি আমার 'দেশ-দর্পণে' ছাপা বইটা ছাপাবেন?

প্রকাশক নিজেও সাহিত্য-টাহিত্য করেন। আই-সি-এস দেখে সম্মান করে না এমন লোক ইণ্ডিয়ায় নেই। বেশ খাতির করলেন, চা খাওয়ালেন।

বললেন, আপনার উপন্যাসের নামটা কী যেন?

—'মানব-সুন্দরী'। 'দেশ-দর্পণে' ছাপার সময় খুব নাম হয়েছিল।

প্রকাশক বললেন, কাগজের দাম বড্ড বেড়ে গেছে, এখন ছাপা মুশকিল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, এবার রাজস্থানে আমাদের নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্যের সম্মেলন বসছে, আপনাকে মূল সভাপতি করে দিতে পারি।

মিস্টার গাঙ্গুলীর কথায় চিঁড়ে ভিজল। প্রকাশক বললেন, তা হতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বই ছাপাবার কাগজের দামটা দিতে হবে আপনাকে—

তা তাই-ই সই। টাকা তো অঢেল আছে মিস্টার গাঙ্গুলীর। কাগজের দামটা সবই দিলেন তিনি। 'মানব-সুন্দরী' ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল সভাপতি এর আগে অনেক বড়-বড় সাহিত্যিক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অতুলপ্রসাদ সেন, সবাই। এবার সেই পোস্টে গেলেন 'মানব-সুন্দরী' উপন্যাসের প্রকাশক।

মিস্টার গাঙ্গুলীর লেখা পড়ে দিল্লীতে তাঁর বাড়িতে বহু লোক গিয়ে হাজির। সবার মুখেই ওই এক কথা। সবাই-ই বললেন, আপনার নতন প্রতিভাকে দেখতে এসেছি, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বড়-বড় সাহিত্যিকেবা অভিনন্দন-পত্র পাঠাতে লাগলেন এই নতুন প্রতিভাকে। কিন্তু কেউই জানতে পারলো না কী ভাবে 'মানব-সুন্দরী' লেখা, কী ভাবে সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ছাপানো, এবং কী ভাবে বই প্রকাশ করা হলো। মাঝখান থেকে মিস্টার গাঙ্গুলীর খ্যাতি আবো বেড়ে গেল।

এবার পরিতোষ থামল। আমি বললাম, তোমার মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে কী করে গল্প লিখব? এতক্ষণ যা বললে তুমি, এতে গল্পের এলিমেণ্ট কোথায়?

পরিতোষ বললে, এতদিন তো অন্য ধরনের গল্প অনেক লিখেছ। এবাব আবো একটু অন্য ধরনের গল্প লেখ না।

বললাম, কিন্তু এ-গল্পের নায়কই বা কে আর তার নায়িকাই বা কে?

পরিতোষ বললে, সব গল্পেতে কী নায়ক-নায়িকা থাকতেই হবে? মানুষের তো অন্য অনেক সমস্যাও থাকতে পারে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মিস্টার গাঙ্গুলীর কী সমস্যা?

পরিতোষ বললে, সেই সমস্যার কথা এবার আসছে। এতক্ষণ তো কেবল গল্পেব ব্যাকগ্রাউণ্ড হলো। এবার হবে আসল গল্প।

বলে পরিতোষ আবার বলতে আরম্ভ করলো।

আসলে মিস্টার গাঙ্গুলীর কোন আপাত সমস্যাই ছিল না। স্বামী-স্ত্রী আর একটি মাত্র মেয়ে বুলা, মানে শর্বরী। আর টাকার কথা যদি বলো তো সেটা কোন সমস্যাই ছিল না মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে। সেকালের আই-সি-এস যারা, তারা এত খাতির পেত সব জায়গায়, আর এত

উপরি পেত যে বলতে গেলে তাদের মাইনের টাকাতে হাতই পড়ত না।

ধর, কোন নেটিভ স্টেটে বেড়াতে গেলো তো রাজাদের গেস্ট-হাউসে রইলো। সেখানে তাদের জন্যে গাড়ি থেকে আরম্ভ করে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সবই ফ্রি। এমন কী সঙ্গে যে চাপরাশি বা সেক্রেটারি যেত, তাদেরও কোন খরচ-পত্র হতো না। অথচ সবাই টি-এ বিল করত।

এ হেন জীবেরা যখন রিটায়ার করত, তখন তাদের অবস্থা হতো প্রায় শোচনীয়। কেউ তাদের আর আগেকার মতো সেলাম দিত না, কেউ ভেট দিত না। পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও কেউ চিনতে পারত না।

তখন আর কোন উপায় না পেয়ে বড় বড় ক্লাবে গি, । ভর্তি হতে হতো। শুধু বড় বড় মেম্বারদের কাছে নিজেদের অতীত জীবনের ঐশ্বর্যের গল্প করা ছাড়া আর কোন কাজই থাকতো না।

সত্যিই তাদের অবস্থা হতো বড় প্যাথেটিক। দেদার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেও কোন সুখ নেই। সেই টাকা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চাকরি করার সময় উপন্যাস যারা লিখেছেন, সে উপন্যাসের ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রশংসা বেরিয়েছে কাগজে। রিটায়ার করার পর আর কেউ তাদের পরোয়া করে না! আগে বাড়িতে সকাল থেকে অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড় লেগে থাকতো। অফিসেও দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল অঢেল। একটু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেই তারা খুশিতে গলে যেত।

কিন্তু সব জিনিসেরই তো একটা শেষ আছে। চিরকাল তো কারোর চাকরি থাকে না। তাই মিস্টার গাঙ্গুলীর আই-সি-এসের চাকরির মেয়াদও একদিন শেষ হলো। একটিমাত্র সন্তান মিস্টার গাঙ্গুলীর। যখন চাকরি ছিল, তখন সেই সন্তানেরও কত খাতির, কত সুখ্যাতি। শর্বরী বলতে সব কৃপাপ্রার্থীরা অজ্ঞান। তখন শর্বরীর নাচের ছবি উঠত কাগজে: কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, আমেদাবাদ সব জায়গার যত পত্র-পত্রিকা সব কাগজেই শর্বরীর নাচের ভঙ্গির ছবি ছাপা হতো। কলকাতার কাগজের ইন্দ্রনাথ তরফদার নিজের ক্যামেরাম্যানদের দিয়ে ছবি তুলিয়ে নিত। আর কাগজকে চিঠি লিখে দিত, এ ছবি ছাপতেই হবে ; নইলে মিস্টার গাঙ্গুলী আগেকার মতন আর ভেতরকার খবর দেবেন না। সেক্রেটারিয়েটে যে সব ঘটনা ঘটে, তার খবর মিস্টার গাঙ্গুলী জোগাড় করে ইন্দ্রনাথ তরফদারকে দিয়ে দেন। তাতে পত্রিকাওয়ালাদের যেমন লাভ, মিস্টার গাঙ্গুলীরও তেমনি লাভ। মিস্টার গাঙ্গুলীকে খুশি করতে গেলে তাঁর মেয়েকে আগে খুশি করতে হবে, এইটেই ছিল সকলের পলিসি।

কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী মনে করতেন, তাঁর মেয়ে বুঝি সত্যিই ভালো নাচে।

খবরের কাগজওয়ালারা জিজ্ঞেস করত, আপনার মেয়েব এত প্রতিভা, এত ভালো নাচ শিখল কোথা থেকে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, উদয়শঙ্করের কাছ থেকে।

উদয়শঙ্কর! নামটা শুনে সবাই শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠত।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, আর কত্থক নৃত্য শিখিয়েছি তামিলনাড়ুর বালা সরস্বতীর কাছ থেকে।

শ্রোতারা বলত, তাই বলুন! অনেক টাকা আপনি খরচ করেছেন মেয়ের জন্যে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলতেন, শর্বরীর বয়েস তো মাত্র তেরো বছর, এরই মধ্যে শুধু নাচের জন্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছি।

—আর লেখা-পড়াতেও তো আপনার মেয়ে খুব ভালো।

মিসেস গাঙ্গুলী বলতেন, প্রত্যেক বছরই তো স্কুলে ফার্স্ট হয় শর্বরী।

সবাই বলে সত্যিই মিসেস গাঙ্গুলী রত্নগর্ভা। মেয়ে তো অনেকেরই আছে দিল্লীতে। কিন্তু

এমন প্রতিভা-সম্পন্ন মেয়ে ক'জনের আছে? আরো তো অনেক সেক্রেটারি আছে, কই তাদের মেয়ে তো এমন নয়। তারা স্কুলে পড়ে, তারপর কলেজে ওঠে, তারপর তাদের বিয়ে দিতেই নাকাল হয়ে যায় বাপ-মায়েরা।

ভাগ্য বটে মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলীর। সুন্দর মায়ের সুন্দরী মেয়ে। ভগবান যাকে দেন তাকে এমনি করেই দেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এমন মিলন বড় একটা দেখা যায় না! সবই মিসেস গাঙ্গুলীর ভাগ্য।

তার ওপর আবার মিস্টার গাঙ্গুলী আই-সি-এস হয়েও মস্ত বড় সাহিত্যিক। তাঁর 'মানব-সুন্দরী' উপন্যাসের কত সমালোচনা কাগজে বেরিয়েছে। সকলেই বইয়ের প্রশংসায় মুখর।

—এবার নতুন কী উপন্যাস লিখছেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, উপন্যাস লেখার সময় কোথায় পাচ্ছি। আজকাল মিনিস্টার আমাকে খাটিয়ে-খাটিয়ে মারছে। তবু যখনই একটু সময় পাই, একপাতা দু'পাতা লিখে ফেলি।

—কখন লেখেন?

—রাত জেগে-জেগে।

সবাই ধন্য-ধন্য করত। বলতো, আর কেন চাকরি করছেন? চাকরি ছেড়ে দিন না। আপনি যদি হোল-টাইম লেখক হতেন, তাহ'লে এর থেকে অনেক বেশী টাকা উপায় করতে পারতেন।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, আমি তো চাকরি ছাড়তেই চাই। কিন্তু মিনিস্টার চায় না যে আমি চাকরি ছাড়ি। মিনিস্টার বলে, গাঙ্গুলী, তুমি চলে গেলে আমাদের সেক্রেটারিয়েটের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ভালো সেক্রেটারি পাওয়াও তো শক্ত। আজকাল তো আই-এ-এস অফিসাররা আই-সি-এসদের মতো অত কাজের নয়, আমরা সব কাজ শিখেছি ঝানু ব্রিটিশ অফিসারদের কাছ থেকে। আমাদের সঙ্গে আজকালকার আই-এ-এসদের তুলনা হয়?

লোকে মন দিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলীর কথাগুলো শুনে বলত, তা-তো বটেই, তা-তো বটেই।

তারপর মিস্টার গাঙ্গুলী রিটায়ার করলেন। তখনই বিপদ ঘনিয়ে এলো মিস্টাব আর মিসেস গাঙ্গুলীর জীবনে। শর্বরী তখন বি-এ পাশ করেছে। ল' পাশ করেছে। হঠাৎ একদিন সে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড! সেদিন রিটায়ারমেন্টের দিন। তাঁকে অফিসের স্টাফরা ফেয়ার-ওয়েল দিচ্ছে. মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী দু'জনেই সেখানে গেছেন। প্রায় পঞ্চাশটা ফুলের মালা তাঁর গলায়। একটা ব্রোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো। তিনি বিদায়-ভাষণ দিলেন।

ভাষণে বললেন, আমি ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করে সারা জীবন দেশসেবা করেছি। চাকরিকে কখনও আমি চাকরি বলে মনে করিনি। আমি বরাবর ভেবেছি আমি দেশসেবা করছি। ব্রিটিশ আমলে আমি যে চাকরি করেছি, সেটা ছিল আমার সত্যিকারের চাকরি, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমি ভেবেছি এ আমার চাকরি নয়, এ আমার দেশসেবা। দেশের কল্যাণের জন্যে আমি প্রাণ দিয়ে কাজ করেছি। আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তা আমার প্রাপ্য নয়, আপনাদের এ সম্মান আমি সেই দেশমাতৃকার কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, যিনি এই সম্মানের প্রকৃত অধিকারী...

যথারীতি চটাপট করে হাততালি পড়ল। তিনি সকলের কাছে সবিনয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। বাড়ি মানে কোয়ার্টার। এই কোয়ার্টার ছেড়ে তিনি কলকাতায় নতুন করা তাঁর বাড়িতে চলে যাবেন। ভবিষ্যতে সেখানেই বসে-বসে শেষ জীবনটা তিনি সাহিত্য করে কাটাবেন। সমস্ত প্ল্যান হয়ে আছে। অন্য সব বাঙালী আই-সি-এস-রা সাহিত্যিক হয়েছেন, তাহ'লে তিনিই বা কেন সাহিত্যিক হবেন না?

বাড়িতে এসে ডাকলেন, বুলা—বুলা—

কোন সাড়া শব্দ পেলেন না। মিসেস গাঙ্গুলীও ডাকলেন, বুলা কোথায় রে?

চাকর-বাকররা সবাই দৌড়ে এল। বেবী কোথায়?

সবাই ভয়ে অস্থির। সাহেব-মেম সকলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায় গেল বেবী। বাবা-মায়ের কাছে যে বুলা বা শর্বরী, কিন্তু চাকর-বাকর-আয়া-বাবুর্চির কাছে সে বেবী। মিসেস গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে কেউ এসেছিল?

আয়া বললে, না মেমসাহেব, কেউ তো আসেনি।

—তাহ'লে কী উড়ে গেল সে?

কারোর মুখেই কোন জবাব নেই। কেউ জানে না বেবী গেল কোথায়?

একজন বেয়ারা বললে, আমি তো দেখেছিলুম বেবী পড়ছেন।

না, শেষ পর্যন্ত বুলাকে পাওয়া গেল না। অনেক জায়গায় টেলিফোন করলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে খোঁজ করলেন। কারোর বাড়িতেই যায় নি। তবে গেল কোথায়?

মিসেস গাঙ্গুলী তাঁর নিজের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতেও টেলিফোন করতে লাগলেন। তারাও বললে, বুলা তাদের বাড়িতে যায়নি।

শেষকালে টেলিফোন করা বন্ধ করলেন। মিছিমিছি মেয়ে পালানোর খবরটা বেশি জানাজানি না হওয়াই ভালো। সেদিন তাঁর ফেয়ার-ওয়েল সভা হয়ে গেছে। সমস্ত আনন্দটা তাঁর বিস্বাদ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্য ভাবনাও ছিল। ভাবনাটা প্রত্যেক রিটায়ার্ড লোকেরই হয়। আর আগেকার মতো তিনি সেলাম পাবেন না, খাতির পাবেন না। সেক্রেটারিয়েটে গেলে কেউ আর তাঁকে তেমন করে মাথা নিচু করে সম্মান করবে না। আরো কতজন তাঁর আগে রিটায়ার করে গেছে। কত লোক তাঁদের ভয় ক'ত, ভক্তি করত। আর ঠিক রিটায়ার করবার দিন থেকে অন্য রকম। জামা-কাপড় কোট-প্যাণ্ট আগেকার মতোই আছে, কিন্তু কোথাও যেন কিছুর মিল নেই। স্টাফ সেই একই আছে, অথচ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব বদলে গেছে। হঠাৎ সামনে মুখোমুখি হলে কেউ অবশ্য অপমান করে না। কিন্তু সে রকম ভক্তিতে গদগদ হওয়া আর আগেকার মতো নেই।

ফেয়ার-ওয়েল থেকে ফেরবার পথে সারা রাস্তাটা তিনি কেবল এইসব কথাই ভাবছিলেন। তাঁরও সেই একই দশা হবে। সেক্রেটারিয়েটে এলে তাঁকে আর কেউ ভক্তি করবে না। তখন তাঁকেই ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস কবতে হবে, কি গো সরকার, কেমন আছ সব?

সরকার তাঁর ডিপার্টমেণ্টের হেড। সেই সরকার কতদিন খোসামোদ করেছে, তার জামাইয়ের একটা চাকরির জন্যে। চাকরি একটা তার জামাই-এর করেও দিয়েছিলেন। তার জন্যে মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে তার চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু তা নয়। তার জায়গায় যে এসে বসবে, তখন তাকেই আবার খাতির করবে তারা। এই-ই জগৎ, এই-ই নিয়ম পৃথিবীর। একজন আসে, আর সে চলে গেলে তখন আবার আর একজন এসে তার জায়গাটা নিয়ে নেয়।

আর এ তো চাকরি। চাকরিটাই তো সব নয়। এর পরে আছে জীবন। জীবনেরও এই নিয়ম। এই পৃথিবী থেকেও এমনি করে একদিন চলে যেতে হবে। মিনিস্টার চলে যাবে, সেক্রেটারি চলে যাবে, হেড ক্লার্ক চলে যাবে, আজকের যারা স্টাফ তারাও একদিন চলে যাবে।

থাকবে শুধু 'সেক্রেটারিয়েট' নামক বাস্তব বাড়িটা। এই বাড়িটাও কি চিরকাল থাকবে? তাও থাকবে না।

তিনিও একদিন থাকবেন না। তারপর যদি কিছু থাকে, তো তাঁর উপন্যাস 'মানব-সুন্দরী'টা হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। কারণ বিক্রি কিছু না হোক, প্রশংসা করেছে প্রায় সব পত্রিকাই।

কিংবা এও হতে পারে, প্রশংসা যেটা করেছে লোকে সেটা হয়তো তাঁর 'আই-সি-এস-এর চাকরির জন্যে। আজ তাঁর চাকরি গেল, সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো তাঁর বইটার কথাও লোকে ভুলে যাবে। গাড়িতে যখন আসছিলেন, তখন এই সব কথাই মনে পড়ছিল কেবল।

মিসেস গাঙ্গুলীও পাশে বসেছিলেন। তিনি কি ভাবছিলেন কে জানে। স্বামীর জন্যে তাঁরও একটা খাতির ছিল সমাজে। সব পার্টিতে স্বামীর সঙ্গে তাঁরও নেমন্তন্ন হতো। তাঁর ঐশ্বর্য দেখাবার একটা সুযোগ মিলত। এর পরে যখন কলকাতায় যাবেন তখন হয়তো আর পার্টিতে এমন নেমন্তন্ন হবে না।

কিন্তু যেদিন চাকরিতে ঢুকেছিলেন সেদিনই তো জানতেন যে, এ চেয়ার চিরকাল থাকবে না। একদিন তাঁকে চেয়ার থেকে বিদায় নিতে হবে। সুতরাং দু'জনেই এই অবস্থার জন্য তৈরি ছিলেন মনে মনে। কিন্তু সে-দিনটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে তা কল্পনা করতে পারেন নি।

হঠাৎ মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, বুলার বিয়ে তো দিতে হবে এবারে।

মিস্টার গাঙ্গুলী অন্যমনস্ক ছিলেন। ফেয়ার-ওয়েলে কে কী বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই সবই ভাবছিলেন। হঠাৎ স্ত্রী'র প্রশ্ন শুনে বললেন, তা তো দিতেই হবে।

স্ত্রী বলেছিলেন, তোমার চাকরিতে থাকতে থাকতেই দিয়ে দিলে ভালো হতো, এখন কি আর কেউ আমাদের কথা শুনবে?

—কেন শুনবে না?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, আর আমরা তো দিল্লীতে থাকছিই না। কলকাতায় কে আর আমাদের চিনবে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, তা হলেও সেক্রেটারির খাতিব কলকাতায় নাই-বা পেলাম, কিন্তু সাহিত্যিক মহল তো আমায় খাতির করবে। কত জায়গায় সাহিত্যিকদের সভাপতিত্ব করার চান্স দিয়েছি।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, সাহিত্যিকদের কথা ছেড়ে দাও, তারা বেচারা গরীব মানুষ, ওদের দিয়ে আর আমাদের কী উপকার হবে। ওদের নিজেদের কে উপকার করে তার ঠিক নেই।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, তবু যা-ই হোক একটা উপন্যাস তো লিখেছি। বইটার প্রশংসাও তো কিছু হয়েছে, বিক্রি না-ই বা হলো।

সে তুমি এই চাকরিতে ছিলে বলে লোকে প্রশংসা করেছে। সেটা তো তাদের মনের কথা নয়, ওটা তোমাকে খোসামোদ করবার জন্যে করেছে।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, সে যা-ই হোক, বুলার বিয়ের কথা আমি ভাবছি না। তুমিও ভেবো না। নেচেও তো ওর খুব নাম হয়েছে। তারপর বি-এ পাশ করেছে, ল' পাশ করেছে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, ছি-ছি, লোকে বলবে কী? আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেব? আর তা ছাড়া, আমাদের তো একমাত্র মেয়ে। যে বিয়ে কববে সে তো আমার সব টাকা পাবে, সেটার কি কম দাম? সেই লোভও তো অনেকের আছে।

মিস্টার গাঙ্গুলী ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছিলেন। মিস্টার মহেশ সাকসেনার ছেলে আই-এ-এস হয়েছিল। আই-এ-এস মানে আগেকার আই-সি-এস। মহেশ সাকসেনার ছেলে গোবিন্দ সাকসেনা।

মিসেস গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছেলের বাপ কী করে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিলেন, বাপ মহেশ সাকসেনা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিভিশনের হেড। মাইনে বেশি পায় না, কিন্তু তার ছেলেটা ভালো। ছেলে এখন ভালো চাকরিতে পোস্টিং পেয়েছে।

—কত মাইনে পায়?

—এখন আটশো টাকা পাচ্ছে। পরে ভাগ্য ভালো হলে আমার মতো কোন ডিপার্টমেণ্টে সেক্রেটারী হয়ে যাবে।

মিসেস গাঙ্গুলীর বরাবর সাধ মেয়ের সঙ্গে কোন আই-এ-এস অফিসারের বিয়ে দেওয়া। আই-সি-এস-এর জামাতা অন্ততঃ আই-এ-এস হওয়া চাই। নইলে সোসাইটিতে ইজ্জৎ থাকে না। লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, আপনার জামাই কী করে? তখন কী জবাব দেবেন মিসেস গাঙ্গুলী?

আপার-ডিভিশন ক্লার্ক, চরিত্র ভালো, প্রমোশন পেয়ে একদিন হয়তো হেড ক্লার্ক হবে, এ-রকম পাত্রের সঙ্গে তো বিয়ে দেওয়া যায় না। লোকে তাহ'লে বলবে কী? দিল্লীর সমাজে তাহ'লে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তখন আর লজ্জায় কাউকে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যদি শোনে আই-এ-এস পাত্র তাহ'লে গাঙ্গুলী পরিবারের ইজ্জৎ বাড়বে বই কমবে না।

মিস্টার দেবব্রত গাঙ্গুলী বললেন, গোবিন্দকে তাহ'লে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিই।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, তাই করো। আমিও দেখি তাকে, বুলাও দেখুক।

তা তাই-ই ঠিক হলো। সব কিছুর ব্যবস্থা হলো। একদিন রাত্রে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন করা হলো গোবিন্দ সাকসেনাকে।

সাকসেনারা হলো কায়স্থ আর গাঙ্গুলীরা হলো ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না আজকাল। আজকালকার যুগ হচ্ছে টাকার যুগ। কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, ও-সব বিচার উঠে গেছে সমাজ থেকে। আজকাল দেখতে হয় পাত্র কত মাইনে পায়। বাপ গরীব হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। পাত্র ভাল মাইনে পেলেই মেয়ের বাপের জাত, কুল বজায় থাকে। তা তাকেই একদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন। যাতে মেয়ে পাত্রকে দেখতে পায়। গাড়িতে আসতে-আসতে সেই সব কথাই ভাবছিলেন।

মনে আছে একদিন গোবিন্দ সাকসেনা নিজেই গাড়ি চালিয়ে এলো মিস্টার গাঙ্গুলীর বাড়িতে। ঘড়িতে তখন সন্ধে সাতটা।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে গোবিন্দ। নিজের চেষ্টায় কাউকে ধরাধরি না করে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় এক চান্সে পাশ করেছে সে। অর্ডিনারী হেড ক্লার্কের ছেলে হয়েও নিজের প্রতিভায় বড় হয়েছে।

মিস্টার গাঙ্গুলী এলেন, মিসেস গাঙ্গুলী এলেন। দারোয়ান অভ্যর্থনা করে গোবিন্দ সাকসেনাকে ড্রয়িং-রুমে বসিয়েছিল।

মিসেস গাঙ্গুলী একটা শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি পরে নিয়ে মুখে পাউডার স্নো মেখে তৈরি হয়েই ছিলেন। বুলা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কোন্ শাড়িটা পরবো মা?

—কেন? তুমি তোমার কালো জর্জেটটা পরবে বলেই তো আমি শান্তিপুরী ডুরে শাড়ি পরেছি। তাতে আমার পাশে তোমাকে কনট্রাস্ট দেখাবে। মনে রেখো, যে আসছে সে যে-সে লোক নয়, আই-এ-এস অফিসার।

বুলা বলেছিল, কিন্তু তুমি তো বলেছিলে ওর বাবা সেক্রেটারিয়েটে হেড অ্যাসিস্টেন্ট?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, তাতে কী হয়েছে? তুমি তো আর শ্বশুরবাড়িতে ঘর করছ না।

—কেন, বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে না?

মা বলেছিলেন, সে কথা তোমাকে কে বললে? গোবিন্দ আই-এ-এস, ও কোয়ার্টার পাবে। সেখানেই থাকবে তোমরা।

—কিন্তু যতদিন কোয়ার্টার না পায়, ততদিন?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেছিলেন, বিয়ের কথা পাকা হলেই কোয়ার্টার পেয়ে যাবে। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে তোমার বাবা। তোমার বাবা আই-সি-এস, সেক্রেটারি, ভুলে যাচ্ছ কেন? আই-সি-এস-রাই যে ইণ্ডিয়া চালাচ্ছে, এটা তো তুমি ভালো করেই জানো। মিনিস্টাররা আর কে? তুমি জানো না যে তোমার বাবাই মিনিস্টারদের চালায়। মিনিস্টাররা কি লেখাপড়া জানে তোমার বাবার মতো? মিনিস্টাররা জেল খেটেছে বলেই তো ভোট পেয়ে মিনিস্টার হয়েছে। তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু তোমার বাবা রীতিমত লেখাপড়া করে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে বিলেত গিয়ে সেখানকার পরীক্ষায় পাশ করে তবে চাকরি পেয়েছে।

মেয়েকেও সাজিয়ে দিয়েছিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। কালো জর্জেটের ওপর সোনালি ব্রোকেডের ব্লাউজ। তারপর মুখে, কানে, ঘাড়ে, ক্রীম দিয়ে গ্রাউণ্ড তৈরি করে তার ওপর ম্যাক্স-ফ্যাক্টর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি বেশি কথা বলবে না। শুনে রাখো, বেশি টকেটিভ মেয়েদের পছন্দ করে না আই-এ-এস-রা। তারা চায়, কথা বলবে তারা আর বাকি অন্যরা শুনবে।

সব রকম রিহার্সাল দেওয়া ছিল মেয়েকে। যেই গোবিন্দ সাকসেনার আসার খবর দিয়ে গেল বয়, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসেছিলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। পেছনে পেছনে এসেছিলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

—হ্যাল্লো, গোবিন্দ, কেমন আছ? বাড়ি চিনতে তোমার কষ্ট হয়নি তো?

গোবিন্দ খুব লাজুক প্রকৃতির ছেলে। বেশি কথা বলে না। চিরকাল লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়েছে। হঠাৎ আই-সি-এস-এর বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে সে বর্তে গেছে। বললে, না, আমার কোন কষ্ট হয়নি।

এই সময় বুলা এসে ঘরে ঢুকল। আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া ছিল। বলা ছিল যে, কথা আরম্ভ হওয়ার একটু পরেই সে ঘরে ঢুকবে।

—এই দেখ, আমার মেয়ে শর্বরী। ও বি-এ পাশ করে ল' পড়ছে। নমস্কার কর বুলা, তুমি এটিকেট জানো না?

বুলা নমস্কার করলে, গোবিন্দ সাকসেনাও নমস্কার করলে তাকে।

কালো জর্জেট পরে মুখে ম্যাক্স-ফ্যাক্টর মেখে বুলাকে লোভনীয় দেখাচ্ছিল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, নতুন চাকরি কেমন লাগছে তোমার?

গোবিন্দ বললে, মন্দ নয়।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তোমরা তো ব্রিটিশ আমলে চাকরি করনি, সে ছিল রাজার চাকরি। কাজ করে সুখ ছিল। আমি যখন আসামে পোস্টেড তখন ম্যাক্‌ফার্সন আমাকে যে কী ভালোবাসত জানো। আমি যা করতুম সব কাজে বলত—ইয়েস ভেরি গুড, ইউ আর এ ভেরি ক্লেভার চ্যাপ। আমার কাজে খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করত। তোমরা কংগ্রেস আমলে জন্মেছ, সে-সব দিনের কথা তোমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না।

তারপর গল্প চলতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। সেকালের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা।

মিসেস গাঙ্গুলী মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা শুধু গল্পই করবে? গল্প করলেই পেট ভরবে? মিস্টার সাকসেনার হয়তো ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

তারপর বুলাকে বললেন, বুলা, খানসামাকে বল টেবিল সাজাতে।

খানসামা আবদুল টেবিল সাজাল। অনেক রকম আয়োজন করেছিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ভাবী জামাই, তাকে ভালো করে খাতির করতে হয়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন গোবিন্দ চলে গেল তখন মিসেস গাঙ্গুলী মেয়েকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, গোবিন্দ সাকসেনাকে তোর পছন্দ হয়েছে? বল্?

বুলা চুপ করে রইল। মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানিস, গোবিন্দ যে-সে পাত্র নয়, আই-এ-এস। তোর বাবার মতন।

বুলা বললে, কিন্তু মা, ও যে বড় কালো।

মা বললে, কালো তো কী হয়েছে, তোর বাবাও তো কালো। পুরুষ মানুষ কালো হলে ক্ষতি কী? ইণ্ডিয়ায় তো সবাই কালো।

তবু মেয়ের মন ভিজল না। মিস্টার গাঙ্গুলী মিসেসকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বললে বুলা? গোবিন্দ সাকসেনাকে পছন্দ হয়েছে ত?

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, না।

—কেন?

—বললে আই-এ-এস হলেও কালো ছেলেকে ও বিয়ে করবে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তা বললে না কেন যে আমিও তো কালো। কালো রঙ দিয়ে কি মানুষের বিচার হবে? পোস্টটা দেখতে হবে না? কত লোক সেলাম করবে, কত বড় গাড়ি পাবে, কত জায়গায় সভাপতি হবে, কত ফুলের মালা পাবে ও! যেমন আমি পাচ্ছি।

তা মেয়েও তেমনি একগুঁয়ে। কালোকে কিছুতেই বিয়ে করবে না।

এমনি করে আরো দশটা পাত্রকে বাড়িতে ডেকে ডিনার খাওয়ালেন। কত ডাক্তার, কত ইঞ্জিনিয়ার, কত বড়-বড় ফ্যামিলির ছেলে, কত এম্‌ব্যাসির নতুন সার্ভিস পাওয়া ছেলে। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি মিস্টার গাঙ্গুলী।

কেউ কালো, কেউ রোগা, কেউ বেঁটে, আবার কেউ বা গরীব। কাউকেই পছন্দ হলো না বুলার। মেয়ে বড় হয়েছে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছু করা যায় না! গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে হলে তাকে যার-তার গলায় ঝুলিয়ে দিলে চলে, কিন্তু এ তো তা নয়।

এমনি করে চলতে-চলতেই একদিন মিস্টার গাঙ্গুলী রিটায়ার করলেন।

সেই রিটায়ারমেণ্টকে উপলক্ষ্য করেই আজ এই ফেয়ার-ওয়েল হলো।

সেখান থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে এই দুঃসংবাদ!

রাত আটটা বাজল, রাত ন'টা বাজল, শেষকালে রাত দশটাও বাজল।

মিস্টার আর মিসেস গাঙ্গুলী খেয়েও নিলেন। তাঁরা না খেলে চাকর-বাকর-খানসামা-বাবুর্চি কেউই খেতে পাবে না। শেষকালে খেয়ে-দেয়ে উঠে তিনি থানায় গেলেন। সেখানে ও-সি খুবই খাতির করে বসালেন। ডায়েরী লেখা হলো মেয়ের ঘটনা দিয়ে।

ও-সি বললে, কিন্তু স্যার, পেছনে কোন লাভ-টাভ ছিল না তো কারোর সঙ্গে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, না-না, মেয়ে আমার সে-রকম নয়। সে গাড়িতে ওর কলেজে যেত আর গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে আসত। কারো সঙ্গে মেশবার সুযোগই তার ছিল না।

—অন্য সময়ে মিস গাঙ্গুলী কী করত?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, বই পড়ত আর না হয় আমাদের সঙ্গে মার্কেটিং বা পার্টিতে যেত।

—চিঠি-পত্র?

—না-না, কারো চিঠি-পত্র তার নামে বাড়িতে আসতে দেখিনি কখনও। আমার মেয়ে অন্যরকম, সে-রকম নয়।

ও-সি বললে, ঠিক আছে স্যার, আমি নিজে এন্‌কোয়ারি করবো এ ব্যাপারে।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, দেখবেন, যেন বেশি জানাজানি না হয়ে যায়। জিনিসটা বেশি ছড়াক, এটাও আমি চাই না।

ও-সি অভয় দিলে। বললে, না-না সে আমাকে বলতে হবে না। আমি জিনিসটা খুব সিক্রেট রাখব। একটা কাজ করবেন, একটা পাসপোর্ট সাইজের ফোটোগ্রাফ শুধু আমাকে দিয়ে যাবেন। আর যদি বলেন তো আমিই কাল ফোটোগ্রাফটা আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারি।

আই-সি-এস হওয়ার অনেক সুবিধে। বাস্তব জীবনে অনেক কাজে লাগে। পুলিশও তাদের সম্মান জানায়। অথচ সাধারণ লোক তাদের কাছে যাক, তখন তারা তেমন খাতির করবে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী জানতেন এ-সব কথা। তাই সমস্ত ব্যাপারেই তার সুযোগ নিতেন। সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁর যে নামডাক তা ওই জন্যেই। তিনি যে একজন লেখক, তার পেছনেও ওই একই কারণ। তিনি জানতেন, যতক্ষণ তিনি তাঁর চেয়ারে থাকবেন, ততক্ষণ বিশ্বসুদ্ধ লোক তাঁর কৃপা পাবার জন্যে উৎসুক থাকবে। তিনি এতদিন সেই সুযোগ-সুবিধাই পেয়ে এসেছেন। কিন্তু এবার থেকে আর তা হবে না। এবার তাঁর চেয়ার গেল। ফেয়ার-ওয়েল পার্টিতে তিনি যত ফুলের মালাই পান না কেন, এ ফুল কাঁটা ছাড়া আব কিছু নয়। এর পর থেকে তাঁকে আব অফিসে যেতে হবে না। তাঁর অভাবে অফিসও অচল হবে না। সেক্রেটারিয়েট যেমন চলছে, তেমনিই চলবে। তাঁর চেয়ারে এখন থেকে ন৲ন যে বসবে, তাঁকেই সবাই সেলাম করবে।

জীবনের নিয়মই এই। একজন যায় আব একজন আসে। কারোর অভাবে সংসাবে কিছুই অচল হয় না। ইংলণ্ডের বাজা পঞ্চম জর্জ চলে গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাযক চার্চিল চলে গেছে, জার্মানির হিটলার চলে গেছে, মহাত্মা গান্ধী চলে গেছে, জহবলাল নেহেরু পর্যন্ত চলে গেছে, তবু কাবোব কিছু অসুবিধে হয়নি, তাদের জায়গায় আবার অন্য লোক এসে তাদের চেয়ারেই বসেছে। তবু পৃথিবী চলছে। আগেও যেমন চলেছে, এখনও তেমনি চলছে, এরপরেও তেমনি চলবে।

এসব চিন্তা তিনি বিটায়ার করার আগে থেকেই করছিলেন। এখন আবার নতুন কবে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ভেবেছিলেন, ব্যাঙ্কে যা টাকা আছে, তাতে তাঁর জীবনটা চলে যাবে। আর যদি তিনি সে টাকাটা বাড়াতে চান তো ইনভেস্ট করবেন। সবচেয়ে ভালো ইনভেস্টমেণ্ট হচ্ছে শেয়ার মার্কেট। বাজারে যখন শেয়াবের দাম কমবে তখন কিনবেন, আর যখন দাম বাড়বে, তখন বেচবেন। বুড়ো বযেসে একটা মোটা পেনসনও পাবেন। তাঁব তো ওই একটাই মেয়ে। মেয়েটার একটা ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত।

মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মেয়েও বুদ্ধিমতী। দেখতেও সুন্দরী। সেদিক থেকে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য, যেদিক থেকে দুশ্চিন্তা আসবার কথা নয়, সেই দিক থেকেই চরম দুশ্চিন্তাটা এলো। এও এক আশ্চর্য ঘটনা।

পুলিশে খবর দেওয়ার পর অনেক দিন কেটে গেল, তবু কোন খবর পেলেন না। মিসেস গাঙ্গুলী সেই দিন থেকেই সেই যে শয্যা নিয়েছেন, আর ওঠেননি।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, ও রকম ভেঙে পড়লে কি চলে? সংসারে দুঃখ-শোক-যন্ত্রণা তো আসবেই, যা প্রতি মানুষেরই আসে।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, ভেঙে পডব না? তুমি বল কী? খাইয়ে পরিয়ে তাকে এতদিন ধবে মানুষ করলুম, আর সে কি না আজ এই রকম করলে? সোসাইটিতে আমি মুখ দেখাব কী করে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সোসাইটির কার সঙ্গেই বা এবার থেকে আমাদের দেখা হচ্ছে? আমরা তো আর দিল্লীতে থাকছি না।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, কিন্তু কলকাতাতেই বা কী করে মুখ দেখাব? সেখানেও তো

আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা তো খবরটা শুনলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচবে!

মিস্টার গাঙ্গুলী সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, তাদের সঙ্গে না মিশলেই হলো। কোনদিন তো আত্মীয়-স্বজনদের আমল দিইনি, এবার থেকেও আর তাদের আমল দেব না। চুকে গেল ল্যাঠা।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, আমরা না হয় তাদের আমল দেব না, কিন্তু খবরটা শোনার পর তারা তো নিজে থেকেই আমাদের বাড়ি আসবে, তখন? তারা যদি জিজ্ঞেস করে, বুলা কোথায়?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, বলবো বুলার বিয়ে হয়ে গেছে।

—যদি জিজ্ঞেস কবে কোথায় বিয়ে হয়েছে?

—বলবো লণ্ডনে বিয়ে হয়েছে। লণ্ডনে তো আর কেউ দেখতে যাচ্ছে না!

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, দেখ, খারাপ খবর আগুনের মতো ছড়ায়। তুমি যখন আই-সি-এস হয়েছিলে, তখন তো আত্মীয়-স্বজনের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের কোন খারাপ খবর শুনলে দেখবে সকলের মুখে আবার হাসি বেরিয়েছে।

কথাগুলো এত সত্যি যে আর মিস্টার গাঙ্গুলীর মুখ দিয়ে এর কোন জবাব বেরোল না।

পরদিন তিনি আবার পুলিশ স্টেশনে ফোন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোনও ট্রেস্ পেলেন আমার মেয়ের?

ওধার থেকে জবাব এলো, না স্যার, এখনও হদিস পাই নি, ট্রেস পেলেই আপনাকে জানাব।

মিস্টার গাঙ্গুলী বুঝতে পারলেন যে আর সে-মেয়ের ট্রেস পাবেন না। এখন সে মেজর, এখন আর তাঁর মেয়ের ওপর কোন অধিকার নেই। এখন সে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। শুধু তিনজন সাক্ষী হলেই চলে যাবে। হয়তো তাই-ই করে ফেলেছে সে। তাব নিজের ইচ্ছে মতো কাউকে হয়তো বিয়ে করেছে।

সাতদিন কেটে গেল। দেখতে-দেখতে একটা মাসও কেটে গেল। এবার তাঁকে কোয়ার্টার ছাড়তে হবে। কোয়ার্টার ছাড়বার নোটিশও এসে গেছে। তিনি ঠিক করলেন কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যাবেন।

পরিতোষ একটানা গল্প বলে যাচ্ছিল। এবার একটু থামল। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল?

পরিতোষ বললে, খবর পাওয়া গেল কলকাতায়। মিস্টার গাঙ্গুলী দিল্লীর পাট উঠিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। যেখানে একদিন রাজার হালে কাটিয়েছেন, সেখানে প্রজার হালে থাকতে তাঁর লজ্জা হবে। তাই চলে এলেন। এসে এখানে আমাদের ক্লাবের মেম্বার হলেন। তখন পেন্‌সনটুকুই যা ভরসা। তবু ঠাট্ বজায় রাখার জন্যে গাড়িটা রেখে দিলেন।

ক্লাবে আসেন স্ত্রীকে নিয়ে। ঠিক যেমনভাবে দিল্লীতে অফিসার্স ক্লাবে যেতেন, তেমনি।

কিন্তু দিল্লী আর কলকাতা আলাদা। দিল্লী হচ্ছে রাজধানী। সেখানে উঁচু-নীচুর মধ্যে অনেক প্রভেদ। সেখানে অফিসারদের বেশি খাতির। কলকাতায় রাজায় আর প্রজায় কোন প্রভেদ নেই। এখানে তুমি বড় হতে পারো, কিন্তু আমিও ছোট নই। এখানে মিনিস্টারই হও আর সেক্রেটারিই হও, আমি তোমাকে থোড়াই কেয়ার করব! আমিও ট্যাক্সো দিই আর তুমিও ট্যাক্সো দাও। তুমি বেশি ট্যাক্সো দাও আর আমি হয়তো কম ট্যাক্সো দিই, এই যা তফাৎ। কিন্তু তাতে কী? কলকাতা হলো সাম্যবাদী শহর। এখানে তুমি যদি গাড়ি চালিয়ে যাও, আমি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যেমন

গল্প করছিলাম, তেমনি গল্প করতে থাকবো। তোমার গাড়ি আসছে দেখে, আমি আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করবার অধিকার ছাড়ব না। তোমার গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাক। তোমার গাড়ি আছে বলে তোমার বেশি অধিকার, এ-কথা আমরা মানি না।

মিস্টার গাঙ্গুলী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিলেন।

কিন্তু মুশকিল হলো মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে। এখানে এই কলকাতায় এসে তিনি অসুখে পড়লেন।

অসুখ মানুষের হয় আবার একদিন সে ওষুধ খেয়ে সেরেও ওঠে।

ক্লাবে সবাই জিজ্ঞেস করলে, কী হলো, মিসেস গাঙ্গুলী এলেন না যে? তাঁর কী হয়েছে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তাঁর শরীরটা একটু খারাপ।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এমন হলো?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, কলকাতার জল-হাওয়া মিসেস গাঙ্গুলীর সহ্য হচ্ছে না। দিল্লীর জল-হাওয়া ভালো।

দিল্লীর জল-হাওয়া যে কলকাতার চেয়ে ভালো, এ সম্পর্কে সকলেই একমত হলেন। তারপর উঠল সাধারণভাবে জল-হাওয়া নিয়ে আলোচনা। কেউ নাম করলে মধুপুবের, কেউ নাম করলে রাজস্থানের, আবার কেউ নাম করলে ভুবনেশ্বরের। জল-হাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে-করতেই সন্ধেটা কেটে গেল। সব ক্লাবে এই রকমই হয়। যারা ড্রিঙ্ক করে, তারা অনেক রাত পর্যন্ত ক্লাবে থাকে। তারপর আছে তাস। তাস খেলার আবার জয়-পরাজয় আছে। অর্থাৎ টাকা-পয়সার লেনদেন আছে।

মিস্টার গাঙ্গুলীর ও-সব রোগ নেই। তাঁর শুধু সময় কাটানো। তাও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন না বলে কিছু দুঃখ থাকে।

প্রথম দিকে শুধু জ্বর। জ্বর লোকের হয় আবার সেরেও যায়। মানসিক আঘাত পেলে সামান্য জ্বরও গিয়ে বেশি জ্বরে দাঁড়ায়। রাত্রে ঘুম আসে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। বলেন, মনে করে নাও না যে তোমার বুলা মারা গেছে। যে আমাদের ওপর এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে, তার কথা আমাদের না ভাবাই ভালো।

কিন্তু ভাবা না-ভাবা কি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে?

তারপর সেই জ্বর একটু কমে আসে তো আবার বাড়ে। ডাক্তার ডাকা হয়, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি সবই চেষ্টা করে দেখানো হয়। যাতে রোগ সারে তাই ভালো। সে এলোপ্যাথিই হোক আর কবিরাজীই হোক।

ঘুম থেকে উঠেই মিস্টার গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করেন, আজ কেমন আছ?

মিসেস গাঙ্গুলী বলেন, কাল রাত্তিরে এক মিনিটও ঘুম হয়নি। কেবল বুলার কথা মনে পড়েছে। কোথায় আছে, কী খাচ্ছে, কী পরছে, সেই কথাই কেবল ভেবেছি।

—ও-সব আর ভেবো না। সে এখন মেজর হয়েছে, তার মনে একটা স্বাধীন হবার ইচ্ছে জেগেছে, এখন সে যা খুশি করতে পারে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলেন, বুলা এমন করবে যদি জানতুম, তাহ'লে তো আগেই ধরে-বেঁধে তার বিয়ে দিয়ে দিতুম।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেন, সে চেষ্টা তো আমরা কতবার করেছি, সেই গোবিন্দ সাক্সেনার মতো পাত্রকেও সে কালো বলে রিজেক্ট করে দিলে। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে ওর কপালে অনেক কষ্ট আছে।

মিসেস গাঙ্গুলী বিছানা থেকে উঠতেন না তখন। কেবল মনে পড়ত মেয়ের কথা। কোথায় না জানি সে কত কষ্টে আছে। সকালবেলা এক কাপ দুধ খাওয়া ছিল তার অভ্যেস। চান করবার

আগে দুধের সর আর কমলালেবুর খোসা একসঙ্গে বেটে সারা শরীরে মাখত গায়ের চামড়া ভালো থাকবে বলে। কলেজ থেকে এসে পেস্তা-বাদাম-আঙর-আপেল ছিল তার দৈনিক জলখাবার। মেয়ের জন্যে কত কী করেছে বাপ-মা। সেই সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল?

ক্লাবে একলা একলা এসে বসতেন মিস্টার গাঙ্গুলী। ড্রিঙ্ক করবার অভ্যেস কোনদিনই ছিল না তাঁর। থাকলে ভালো হতো। তিনি অন্ততঃ মদ খেয়েও সমস্ত ভুলে থাকতেন।

কলকাতার পুলিশ একদিন এসে খবর দিয়ে গেল, আপনার মেয়েকে পাওয়া গেছে, আপনার ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিলে গেছে।

চমকে উঠলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, কোথায় আছে?

পুলিশের ও-সি বললে, কড়েয়ার একটা বস্তিতে।

—সে কী! আমার মেয়ে বস্তিতে আছে?

পুলিশ বললে, আপনি একবার চলুন স্যার সেখানে।

—সঙ্গে কে আছে?

পুলিশ বললে, একটা মোটর মেকানিক। একটা কারখানায়—

—সে কত টাকা মাইনে পায় যে, আমার মেয়েকে নিয়ে সংসার চালায়?

পুলিশ বললে, কোন রকমে চালায়, মাইনে তো বেশি পায় না। আর আপনার মেয়ে তো হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করে।

—হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করে? অবাক কাণ্ড!

সেদিন পুলিশ মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে কড়েয়ার বস্তিতে গেলেন। ঠিক বস্তির সামনে একটা ছোট পুরনো একতলা বাড়ি। সেখানেই তাঁর মেয়ে থাকে ভেবে চোখ দিয়ে তাঁর জল এসে গেল। যে-মেয়েকে তিনি অত আদরে মানুষ করেছিলেন, অত আরামে যে-মেয়েকে রেখেছিলেন, সেই মেয়ে কিনা এই রকম বাড়িতে থাকে! এটা ভাবতেও তাঁর লজ্জা হলো। দরজার কড়া নাড়তেই একজন ঝি ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে।

পুলিশের লোকের সাদাসিধে পোশাক। পুলিশ বলে চেনা যায় না।

জিজ্ঞেস করলে, বিজনবাবু বাড়িতে আছেন?

ঝি-টা বললে, বাবু তো অফিসে গেছেন।

—কখন আসবেন?

—বাড়ি আসতে সন্ধে হয়ে যাবে।

—আর তোমার মা?

—মা কোর্টে গেছেন।

—তুমি কি এ বাড়িতে কাজ করো?

—হ্যাঁ।

—তোমার মা কখন কোর্টে যান?

ঝি-টা বললে, সকাল সাড়ে দশটার পর।

—এ-বাড়ির ভাড়া কত?

—ঝি-টা বললে, তা জানি না আমি।

মিস্টার গাঙ্গুলী এতক্ষণ কিছুই বলছিলেন না। তিনি শুধু চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন। এই পাড়া, এই বস্তি, এই কষ্ট—এ কেমন করে সহ্য করলে বুলা! এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

পুলিশের সঙ্গে মিস্টার গাঙ্গুলীও চলে এলেন। জীবনে তিনি অনেক লোককে কষ্ট দিয়েছেন, অনেক কংগ্রেস নেতাকে জেলে পুরেছেন। আসামে থাকবার সময় কত মানুষের ওপর অত্যাচার

করেছেন। কত লোক কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল করে যাওয়ার সময় তাদের গুলি মেরে খুন করেছেন। কত স্ত্রীকে বিধবা করেছেন, তখন তাঁর কান্না আসেনি। কিন্তু আজ নিজের মেয়ের এই দুর্দশা দেখে তাঁর কান্না পেল।

সন্ধেবেলায় বিজন কারখানা থেকে ফিরল। সাধারণতঃ সে-ই আগে আসে। সারাদিন কারখানায় কাজের মধ্যে ডুবে থেকে এই সময়ে বাড়িতে এসে চান করে নিয়ে আবার সেজে-গুজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে!

তারপর বাড়ি আসে বুলা। সারাদিন হাইকোর্টে মক্কেল আর জজদের এজলাসে এ-ঘব থেকে ও-ঘরে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বাসে চড়ে বাড়িতে এসে পৌঁছোয়।

সেদিন বিজন সরকার বাড়িতে আসতেই অচলা খবরটা দিলে। বললে, আজকে সকালে দু'জন বাবু এসেছিল আপনাকে খুঁজতে।

—আমাকে? বিজন সরকার একটু অবাক হয়ে গেল। বললে, আমাকে খুঁজতে এসেছিল, না তোমার দিদিমণিকে?

অচলা বললে, দু'জনের নামই করলে। দু'জনকেই খুঁজছিল, আব জিজ্ঞেস করছিল এ বাড়ির ভাড়া কত?

—তুমি কী বললে?

—আমি বললুম দাদাবাবু কারখানায় আর দিদিমণি হাইকোর্টে গেছে।

—আর কিছু বললে না? বাড়ির ভাড়া তুমি কত বলেছ?

—আমি বলেছি আমি জানি না।

খানিক পরে বুলাও এসে গেল। যেদিন থেকে সে হাইকোর্টে যেতে আরম্ভ করেছে, সেইদিন থেকেই তার ভালো সিনিয়র জুটে গিয়েছিল।

সমীর ব্যানার্জী হাইকোর্টের নাম করা এ্যাড্ভোকেট। তিনি বিশেষ সুনজরে দেখেছিলেন শর্বরী সরকারকে। তিনি বলে দিয়েছিলেন, প্রথমেই কিছু আশা কোরো না মা। প্রথম-প্রথম তোমার খুবই অসুবিধে হবে, কিন্তু হতাশ হয়ো না। আমি যখন হাইকোর্টে প্রথম ঢুকি, তখন বাস-ট্রামের ভাড়াটাও এক-একদিন উঠত না। কিন্তু হতাশ হইনি আমি। তুমিও ধৈর্য ধরে থেকো, একদিন সাক্সেস আসবেই। সাক্সেস এলে তখন আরো সাবধানে থাকতে হবে। এ বড় পরিশ্রমের কাজ।

সত্যিই প্রথম দু'বছর খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছিল শর্বরী সরকারকে। দিনেরবেলা সিনিয়ার এ্যাড্ভোকেট সমীর ব্যানার্জীর সঙ্গে কোর্টে ঘুরতে হতো। তারপর তাঁর বাড়িতে যেতে হতো সন্ধেবেলা। সন্ধে থেকে আরম্ভ করে অনেকদিন রাত দশটা-এগারোটার আগে উঠতে পারেনি। তারপর ফাইল নিয়ে বাড়ি যেতে হয়েছে। রাত জেগে-জেগে আইনের বই ঘাঁটতে হয়েছে।

তখন অনেক রাত। বিজন বলত, এখনও জেগে আছ? শোবে না তুমি?

শর্বরী বলেছে, আজকে একটু বেশি খাটতে হবে, বড় শক্ত কেসটা।

সে-সব দিনের কথা মনে ছিল শর্বরীর। তখন সবে বিজনের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়। বাবা-মা তাকে খুঁজবে, পুলিশে খবর দেবে, সবই সে জানত। জানত, বাবা তার প্রতিশোধ নেবেই একদিন।

প্রথমে ভেবেছিল তারা দু'জনে ইণ্ডিয়ার বাইরে চলে যাবে। কিন্তু টাকা? পাসপোর্ট? সে-সব ব্যবস্থা করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। জানাজানিও হয়ে যাবে। অনেক ধকল, অনেক হয়রানি তাতে। তার চেয়ে কলকাতায় চলে যাওয়া ভালো। সেখানে মানুষের ভিড় সবচেয়ে বেশি। সেখানে লুকিয়ে থাকা সহজ। মানুষের ভিড়ে কেউ তাদের দেখতে পাবে না।

বিজন একটু ভয় পেয়েছিল। বলেছিল, যদি আমাকে জেলে পুরে দেয় তোমার বাবা? তোমার বাবা তো আবার আই-সি-এস।

শর্বরী বলেছিল, আমি তো আছি, আমি তোমাকে বাঁচাবো।

বড় ভীতু মানুষ বিজন সরকার। দিল্লীর এক মোটরের কারখানায় সামান্য একটা মিস্ত্রীর কাজ করত সে। সামান্য চার টাকা রোজের চাকরি।

প্রথম যেদিন দেখা সেদিনই ভালো লেগে গিয়েছিল শর্বরীর। কলেজ থেকে ফেরবার পথে মাঝ রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার গাড়িটা ঠেলতে-ঠেলতে কারখানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল।

গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে গেলে কারখানায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিগড়োনো গাড়িটা ঠেলতে-ঠেলতে যখন কারখানায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন বিজন সরকারই প্রথম দৌড়ে এসেছিল সাহায্য করতে। ড্রাইভার ইব্রাহিম একলা ঠেলে তুলতে পারছিল না কারখানার ভেতরে। বিজনকে ডাকতে হয়নি। সে নিজে থেকে এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, কার গাড়ি?

ইব্রাহিম বলেছিল, আই-সি-এস গাঙ্গুলী সাহেবের গাড়ি।

বিজন বুঝে নিয়েছিল, ভেতরে যে বসে আছে সে আই-সি-এস গাঙ্গুলী সাহেবের মেয়ে। গাড়ির বনেট খোলবার আগেই শর্বরীকে বলেছিল, আপনি গরমে বসে থাকবেন কী করে? আপনার কষ্ট হবে।

শর্বরী বলেছিল, না, আমার কষ্ট হবে না।

বিজন বলেছিল, না, এই গরমে অতক্ষণ গাড়ির ভেতরে বসে থাকবেন কী করে? তার চেয়ে আমি একটা চেয়ার এনে দিচ্ছি, আপনি সেখানে বসুন, পাখার তলায় আরাম করতে পারবেন।

বলে কারখানার টিনের শেডের তলা থেকে একটা গদি মোড়া হ্যাণ্ডেলওয়ালা চেয়ার এনে দিলে। তারপর মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা খুলে দিলে।

শর্বরীর বেশ আরাম হলো হাওয়ার তলায় বসে।

বিজন বললে, একটু ঠাণ্ডা জল খাবেন?

শর্বরী বললে, না।

বিজন বললে, তাহ'লে একটু সরবৎ খান—বলেই সে উধাও হয়ে গেল। আর তারপর একটা ঠাণ্ডা থামস্-আপের বোতল এনে বললে, এটা খান।

শর্বরী বললে, এটা আবার আনতে গেলেন কেন? এর দাম কত? বলে নিজের ব্যাগ থেকে দু'টাকা বার করে দিতে গেল।

বিজন সরকার মাথা নাড়াল। বললে, দাম আপনাকে দিতে হবে না, ওটা আপনি ঘামছেন দেখে এমনিই দিলাম।

শর্বরী বললে, দাম না নিলে আমি কিন্তু এটা খাব না।

বিজন সরকার বললে, তাহ'লে ওটা বিলের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করে দেবো।

শর্বরী তবু আপত্তি করতে লাগল। বললে, না, তবু আমি এ খেতে পারব না—

বিজন সরকার বললে, তাহ'লে মনে করে নিন কোম্পানি আপনাকে খাওয়াচ্ছে।

শেষকালে পাখার তলায় বসে শর্বরী সরবৎটা খেয়ে নিলে। আর বসে বসে দেখতে লাগল বিজন সরকারকে।

বিজন সরকারের পরনে তখন চিট্ ময়লা একটা শার্ট-প্যাণ্ট, আর খালি গা। সে তখন গাড়ির বনেট খুলে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছে। তার শরীরের নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাস্‌লগুলো ফুলে-ফুলে উঠছে। আগে বিজনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শর্বরী, এবার মুগ্ধ হয়ে গেল তার শরীরের গড়ন দেখে।

প্রায় আধ ঘণ্টা শর্বরীকে সেই পাখার তলায় ধুলো-ময়লার মধ্যে বসে থাকতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু এক পলকের জন্যেও বিজনের স্বাস্থ্যের দিক থেকে তার নজর সরে যায়নি। তারপব গাড়ি সারানো শেষ হলে বিজন সরকার এসে বললে, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, আপনাকে কষ্ট দিলুম। ·

শর্বরী বললে, কত লাগবে?

বিজন সরকার বললে, টাকা এখন দিতে হবে না।

—কখন দিতে হবে?

বিজন সরকার বললে, আমি বিল দিলে তখন টাকা দেবেন।

—কবে বিল দেবেন?

বিজন সরকার বললে, সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক সময় মতো বিল নিয়ে আপনার বাড়ি যাব।

ইব্রাহিম তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। বিজন সরকার বললে, আপনি গাড়িতে উঠে বসুন, গরমের মধ্যে আপনার খুব কষ্ট হলো।

শর্বরী বললে, না, কষ্ট আর কিসের? গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে।

—আচ্ছা নমস্কার। এবার থেকে গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে আমার কারখানায় দেবেন। এটা আমারই কারখানা।

শর্বরী বললে, বাবাকে তাই-ই দিতে বলব, আচ্ছা নমস্কার।

তারপরে একদিন কলেজে যাবার মুখে শর্বরী ইব্রাহিমকে বললে, ইব্রাহিম, সেই মোটরের কারখানায় একবার চল্ তো।

ইব্রাহিম গাড়ি নিয়ে সেই কারখানায় গিয়ে উঠল।

গাড়ি দেখেই দৌড়ে এলো বিজন সরকার। সে তখন অন্য গাড়ি মেরামতেব কাজে ব্যস্ত ছিল। সে কাজ ছেড়ে দৌড়ে এসে বললে, নমস্কার। গাড়ির আবার কী খারাপ হলো?

শর্বরী বললে, নমস্কার। গাড়ির কিছু খারাপ হয়নি, শুধু বলতে এসেছি আপনি বিল তো পাঠালেন না?

সেদিনও বিজন সরকাবের সেই পোশাক। শুধু একটা চিট্ ময়লা শার্ট-প্যাণ্ট আর মাস্‌লভর্তি দেহ। সে বললে, তাড়াতাড়ি কিসের? একটু হাত খালি হলেই আমি নিজে গিয়ে আপনাদের বাড়িতে বিল দিয়ে আসব।

শর্বরী বললে, আমি ভাবলাম আপনি হয়তো ভুলে গেছেন।

বিজন সরকার বললে, না, মাসকাবার হলে তখন যাব ভাবছিলাম।

শর্বরী বললে, মাসকাবার হবার দরকাব কী? আমি টাকা এনেছি আজ। নেবেন?

বিজন সরকার বললে, না, এখনও বিল তৈরি করবার সময় পাইনি। দিনে-দিনে কাজ বাড়ছে। সেই সকাল ন'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করতে হয় আমাকে।

শর্বরী বললে, আমার ঠিকানা জানেন তো?

বিজন সরকার বললে, আপনাদের ঠিকানা কে না জানে! আই-সি-এস মিস্টার গাঙ্গুলীর নাম বললে একবাক্যে সবাই বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

—ঠিক আছে, আসবেন একদিন। এই বলে শর্বরী কলেজ চলে গিয়েছিল।

একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ বিজন সরকার বাড়িতে এসে হাজির। আয়ার কাছে খবর পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলো শর্বরী। দেখলে বিজনের একেবারে অন্য রকম চেহারা। পরনে সেই চিট-ময়লা শার্ট-প্যান্ট নেই। বেশ লম্বা ডোরা-ডোরা দাগের টেরিকটের প্যান্ট, গায়ে লাল রঙের স্পোর্টস শার্ট। এসে বললে—ও আপনি? আমি চিনতেই পারিনি।

হাসতে লাগল বিজন সরকার। বললে, আই-সি-এস-দের বাড়ি ওই পোশাক পরে আসতে লজ্জা করে।

শর্বরী বললে, সেদিন আপনার সেই পোশাকটাই কিন্তু দেখতে বেশি ভালো লেগেছিল।

বিজন সরকার বললে. আমরা মিস্ত্রী মানুষ, কালি-ঝুলি-ময়লা নিয়ে আমাদের কাজ। তাই কারখানায় যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ ওই বিশ্রী পোশাক পরে থাকি। কিন্তু ওই পোশাকে এখানে আসতে লজ্জা করল।

শর্বরী বললে, কী খাবেন বলুন? চা না কফি?

বিজন সরকার বললে, কিছুই খাব না।

শর্বরী বললে, তা হতে পারে না। আপনি সেদিন আমাকে থামস্-আপ খাইয়েছিলেন, সে কি আমি ভুলে গেছি মনে করেছেন? কিছু খেতেই হবে। চা-কফি না খান একটা থামস্-আপ আনিয়ে দিই।

বিজন আবার হাসল। বললে, ধার শোধ দিচ্ছেন? সেদিন ভাগ্যিস আপনার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই তো আজ এত বড়লোকের বাড়িতে ঢোকবার সুযোগ হলো! নইলে মোটর মিস্ত্রীদের কেউ মানুষই মনে করে না।

শর্বরী ততক্ষণে আয়াকে থামস্-আপ কিনে আনতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বললে, এইবার আপনার বিলটা দিন।

বিজন সরকার বললে, অত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? আমাকে বুঝি শীগগির-শীগগির তাড়িয়ে দিতে চান?

শর্বরী বললে, না-না, সে কী! আপনি থামস্-আপ খেয়ে তবে যাবেন, আমি আয়াকে আনতে দিয়েছি।

বিজন সরকার পকেট থেকে বিলটা শর্বরীর দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

শর্বরী বিলটা দেখে অবাক! বললে, এ কী? মাত্র দশ টাকা চার্জ!

বিজন সরকার বললে, দশ টাকাই হয়েছে, তাই দশ টাকাই চার্জ করেছি।

শর্বরী কথাটা বিশ্বাস করলে না। বললে, আপনি আধঘণ্টা খাটলেন গাড়ির পেছনে আর চার্জ করলেন মাত্র দশ টাকা। জানেন না আই-সি-এস-রা বড়লোক। এত কম চার্জ করলে তাদের যে খারাপ লাগে?

বিজন সরকার বললে, সে কী!

—হ্যাঁ। তাতে তাদের ইজ্জতে ঘা লাগে! আই-সি-এস-দের যদি পেটের অসুখ হয়, তো

সেটা তাদের লজ্জা। পেটের অসুখ হবে গরীব লোকদের। কারণ তারা গরীব লোক, আজে-বাজে জিনিস খায়। আর বড়লোকদের রোগ হলে হবে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, কিংবা ডায়াবেটিস কিংবা ব্লাড প্রেসার। বড়লোকদের বড়-বড় রোগ না হলে তাতে তাদের লজ্জা করে। আপনি আমাদের কী বলে মোটর সারানোর চার্জ করলেন দশ টাকা?

বিজন সরকার বললে, এ আমি নতুন কথা শুনছি আপনার মুখ থেকে।

শর্বরী বললে, কেন, আপনি জানেন না ডাক্তাররা বড়লোকদের অসুখ হলে দামী-দামী ওষুধ প্রেসক্রাইব করে, আর সেই একই রোগ গরীব লোকদের হলে কম দামী সস্তার ওষুধ লিখে দেয়?

বিজন সরকার বললে, এ আমি আপনার কাছ থেকে এই প্রথম শুনলুম।

শর্বরী বললে, তা এর সঙ্গে থামস্-আপের দামটা তো যোগ করেন নি।

ততক্ষণে ট্রেতে করে আয়া একটা থামস্-আপ এনে সামনে ধরল।

বোতলটি নিয়ে বিজন সরকার বললে, এই তো, তার দাম শোধ হয়ে গেল। তারপর একটু থেমে বললে, যাক, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, মিস্টার গাঙ্গুলী কোথায়? বাড়ি আছেন?

—না, তিনি তো এখন অফিসে।

বিজন সরকার বললে, তাহ'লে বিলটা তাঁকে দিয়ে দেবেন। আমি অন্য আর একদিন এসে টাকা নিয়ে যাব।

শর্বরী বললে, বাড়িতে মিস্টার গাঙ্গুলীও নেই, মিসেস গাঙ্গুলীও নেই। তিনি গেছেন মার্কেটিং করতে। এখন শুধু মিস গাঙ্গুলী বাড়ি আছে। মিস গাঙ্গুলীই আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে—বলে সে ভেতরে চলে গেল।

তার খানিকক্ষণ পরেই একটা দশ টাকার নোট এনে বিজন সরকারের হাতে দিলে। নোটটা নিয়ে বিজন সরকার দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর দরজার দিকে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল। বললে, একটা কথা রাখবেন?

—কী?

বিজন সরকার বললে, আপনার গাড়ি যখনই খারাপ হবে, তখনই আমাব কারখানায় পাঠাবেন।

শর্বরী বললে, আর যদি গাড়ি খারাপ না হয়?

বিজন সরকার হেসে বললে, তাহ'লে বুঝব আমার দুর্ভাগ্য। গাড়ি খারাপ না হলে তো আর শুধু-শুধু আপনাকে আমার কারখানায় যেতে বলতে পারি না।

শর্বরী বললে, গাড়ি ঘন-ঘন খারাপ হলে তো আমারও ভালো।

—কেন?

শর্বরী বললে, তাহ'লে এক বোতল থামস্-আপ ফ্রি খেতে পারব।

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

তারপর বিজন সরকার তার স্কুটারে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

তারপর মজা এই যে তারপর থেকে গাড়িটা প্রায়ই খারাপ হতে লাগল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, শর্বরী, তোমার গাড়িটা রোজ-রোজ খারাপ হয় কেন বলো তো?

শর্বরী বললে, আমি তা কী করে বলব?

ইব্রাহিমকে ডাকলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, দিদিমণির গাড়ি খাবাপ হয় কেন? ভালো করে সারাও না কেন? কোন্ ওয়ার্কশপে দাও তুমি?

ইব্রাহিম বললে, হুজুর, গাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে, নতুন মডেল কিনলে ভালো হয়।

মিস্টার গাঙ্গুলীও তাই বললেন মেয়েকে। বললেন, তোমায় একটা নতুন গাড়ি কিনে দিতে হবে বুলা। ওটা পুরনো হয়ে গেছে। ইব্রাহিম বলছিল।

শর্বরী বলল, না-না বাবা, নতুন গাড়ি কিনো না। পুরনো গাড়ি হলেও এই গাড়িটা পয়া।

—কেন, কী করে বুঝলে এ গাড়িটা পয়া?

শর্বরী বললে, এই গাড়িটা করে আমি যেখানে গিয়েছি, সেখানেই সাকসেসফুল হয়েছি। আই-এ, বি-এ যত পরীক্ষা দিয়েছি, সবগুলোতে ভালো রেজাল্ট করেছি।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, তা পয়া হলে কি চিরকাল এই গাড়িটাই রাখতে হবে? গাড়িটারও তো বয়েস হচ্ছে। নতুন একটা গাড়ি ওকে কিনে দাও।

শর্বরী বললে, না মা, আগে ল'টা পাশ করে নিই তখন গাড়ি বদলাব।

এটা সত্যিই খুব পয়া গাড়ি। আসলে যে গাড়ি নিয়ে সারাতে যাবার নাম করে বিজন সরকারের সঙ্গে দেখা করাটাই শর্বরীর উদ্দেশ্য ছিল, সেটা প্রকাশ করা যায় না। শর্বরী গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই ইব্রাহিমকে বলত, ওই শব্দটা কিসের হচ্ছে ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম বুঝতে পারত না। বলতো, কিসের শব্দ? কোথায় শব্দ? আমি তো কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।

গাড়িটা নিয়ে ইব্রাহিম কারখানায় যেত। বিজন বলত, আবার কী হলো?

শর্বরী বলতো, গাড়ির চাকায় কী রকম একটা শব্দ হচ্ছে।

ইব্রাহিম ধরতে পারতো না কিছুই।

বিজন সরকার বলতো, তাহ'লে তো গাড়িটা চালিয়ে দেখতে হবে।

ইব্রাহিম কারখানায় বসে থাকতো। আর বিজন সরকার শর্বরীকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেত। গাড়ি চালাতে-চালাতে অনেক দূর চলে যেত। বিজন সরকার বলতো, কই, কোথাও শব্দ পাচ্ছি না তো?

শর্বরী বলতো, ইব্রাহিম যখন চালাচ্ছিল তখন কিন্তু শব্দ হচ্ছিল, আরো একটু জোরে চালান তো।

বিজন সরকার আরো জোরে চালাতো। তারপর দিল্লী ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর গ্রামের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে যেত গাড়িটা।

পরিতোষ গল্প বলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, তারপর?

তারপর যা হয় তাই-ই হলো। বাবা-মা কেউই কিছু জানতে পারলে না।

একদিন শর্বরী বললে, আজকে সেক্রেটারিয়েটে আমার বাবার ফেয়ারওয়েল। চলো, আজকেই পালিয়ে যাই। বিকেলের আগে না গেলে সবাই জানতে পারবে। তখন বাড়িতে বাবাও থাকবে না, মা-ও থাকবে না।

বিজন সরকার আগে থেকেই তৈরি ছিল। তার অতদিনকার নিজের হাতে গড়া কারখানাটা বিক্রি করে সব টাকাটা পকেটে রেখে দিয়েছিল। সত্যিই অনেক দিনের অমানুষিক পরিশ্রম করা টাকা। বেচে দিতে একটু কষ্ট হয়েছিল তার। টাকা তো নয় যেন নিজেরই গায়ের রক্ত। গায়ের রক্ত বললেও কম বলা হবে। একদিন খালি হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। বাঙালী ছেলে, বিজন সরকার। না কেউ সহায়, না কিছু সম্বল। ময়লা প্যান্ট পরে মোটর সারাতো। আর প্রথম-প্রথম অল্প টাকায় মোটর সারাতো। তাতেই কয়েকটা বাঁধা খদ্দের জুটে গিয়েছিল। তাতেই তার পেট চলতো।

কিন্তু যেদিন থেকে শর্বরীর গাড়ি এসে তার কারখানায় ঢুকলো, সেই দিন থেকে সে রোজ-

রোজ দাড়ি কামাতে লাগলো। সেই দিন থেকেই দু-একটা জামা-প্যান্ট কিনতে লাগলো। বিজন সরকার যেদিন বিল নিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলীর বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন নতুন টেরিলিনের শার্ট আর প্যান্ট কিনে নিয়ে তাই পরেই গিয়েছিল। সেই দিনই বুঝে গেল শর্বরী মরেছে। আর তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

তারপর থেকে শর্বরীর গাড়ি কারণে-অকারণে তার কারখানায় আসতে লাগলো। তখন থেকেই তার নিজের দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জা হতে লাগলো।

বিজন সরকার জিজ্ঞেস করেছিল, পালিয়ে কোথায় যাবে?

শর্বরী বলেছিল, কোথায় আর যাবো, যাবো কলকাতায়, সেখানে গেলে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। তুমি সেখানে গিয়ে একটা কারখানায় কাজ নেবে, আর আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করবো।

বিজন সরকার বলেছিল, কোথায় গিয়ে উঠবো? সেখানে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে?

শর্বরী বলেছিল, কেন পাওয়া যাবে না? পয়সা দিলে কলকাতায় কী না পাওয়া যায়? যতদিন বাড়ি না পাওয়া যায় ততদিন হোটেলে থাকবো। টাকা তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে অনেক।

হ্যাঁ, শর্বরীর অনেক টাকা ছিল ব্যাঙ্কে। সে সেদিনই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়েছিল। বিজন সরকারের কাছেও কারখানা বিক্রির টাকা রয়েছে।

তারপর দিল্লী স্টেশনে ট্রেন ধরে সোজা কলকাতা। ট্রেনে উঠে শর্বরী বললে, আর খানিক পরেই বাবা-মা এসে খোঁজাখুঁজি করবে।

বিজন সরকার বলেছিল, তারপরে তাঁরা পুলিশে খবর দেবেন।

শর্বরী বলেছিল, পুলিশে এখনই খবর দেবে না। কারণ তাতে জানাজানি হয়ে যাবে। খবর যদি পুলিশকে দেয় তো দু-তিন দিন পরে। ততক্ষণে আমরা কলকাতায় পৌঁছে হোটেলে উঠে পড়েছি। হোটেলে আমাদের আসল নাম লিখবো না।

বিজন সরকার বললে, তার মধ্যে বিয়েটা সেরে নিতে হবে।

শর্বরী আইন পাশ করা মেয়ে। তাকে আইন শেখাতে হবে না কাউকে। সে জানে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে এমন একজন মানুষকে, যার কোন সামাজিক মর্যাদা নেই। বাবা-মা জীবনে কখনও তাকে জামাই বলে গ্রহণ করবে না। সে জানতো সে নাবালিকা নয়। তার বয়েস হয়েছে। সে যা করতে যাচ্ছে, তার সব দিক ভেবেচিন্তেই করছে।

অনেক সময়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগে মেয়েরা একটা চিঠি লিখে রেখে যায়, 'আমাকে তোমরা খোঁজ কোরো না। আমি নিজের ইচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' কিন্তু এক্ষেত্রে তারও দরকার নেই।

জীবনে যে বাবা-মার কাছে কখনও সে অনাদর পেয়েছে তা নয়, বরং উল্টে বাবা-মার চোখের মণি সে। তার ভবিষ্যৎ নিয়েই ছিল বাবা-মার একমাত্র চিন্তা-ভাবনা। অনেক সম্ভাব্য পাত্র সে দেখেছে, কিন্তু বিজন সরকারের মতো এমন স্বাস্থ্য, এমন ভালো ব্যবহার আর কারো কাছ থেকে পায়নি।

এতক্ষণ আমি পরিতোষের গল্প শুনছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

পরিতোষ বললে, এরপর তুমি তার মানসিক অবস্থা নিয়ে অনেক পাতা লিখতে পারবে। সেগুলো আমি তোমায় বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু বলি যে তাদের দু'জনের ভাগ্যটা খুব ভালো। তাদের মাত্র দু'দিন হোটেলে কাটাতে হলো। তারপরেই একশো কুড়ি টাকা ভাড়ায় কড়েয়াতে একটা পাকা বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেল।

তারপর বিয়ে। বিয়েতে তিনজন সাক্ষীর দরকার। তা তাও জোটাতে বেশি বেগ পেতে হলো না। যে কারখানায় বিজন সরকার চাকরি পেলে সেখানকারই তিনজন মিস্ত্রী সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালো। একটা উৎসব নেই, একটা সানাই-বাজনা নেই, কিংবা আলোর লাল-নীল রোশনাইও নেই। এমন কি খাওয়ানো-দাওয়ানোর পাটও নেই। এ বিয়ে শুধুই বিয়ে।

বলতে গেলে বিয়ে তাদের আগেই হয়ে গিয়েছিল, যখন শর্বরীকে নিয়ে গাড়ি চালাতে-চালাতে দিল্লী ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামে কোন গাছের তলায় বসে-বসে তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প বলতো।

এবার সরকারী ছাপ-মারা বিয়ে। সুতরাং এর মধ্যে যেমন বাইরের আড়ম্বর থাকে, তা নেই। শুধুমাত্র একটা অনুষ্ঠান। আর সে অনুষ্ঠান যত সহজ যত সরল হতে পারে তাই। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর বিজন সরকার যেমন চাকরি করতে লাগলো, তেমনি একজন সিনিয়ার উকিলের জুনিয়ার হয়ে শর্বরী হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতে লাগলো।

এ সেই সময়ের কথা। শর্বরী কোর্ট থেকে সিনিয়ারের বাড়িতে কাজ করে বাড়ি আসতে রাত হয়ে গেল সেদিন। আসতেই বিজন বললে, জানো, আজকে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

শর্বরী বললে, কী কাণ্ড?

বিজন বললে, অচলা বলছিল বিকেলবেলা দু'জন লোক এসেছিল আমাদের খুঁজতে।

শর্বরী বললে, আমার কোন নতুন মক্কেল নয়তো?

বিজন বললে, মক্কেল কেন বিকেলে আসতে যাবে? তাহ'লে সে কোর্টে যেত।

—তাহ'লে কে?

বিজন বললে, আমার মনে হচ্ছে তোমার বাবা!

—আমার বাবা? রিটায়ার করে কলকাতায় এসেছেন?

বিজন বললে, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

শর্বরী বললে, তাহ'লে তো ভালোই হয়েছে। এইবার সোজাসুজি বোঝাপড়া হয়ে যাবে। এতদিন যে ভয় ছিল তা কেটে যাবে। কী বলে গেছেন অচলাকে?

—বলে গেছেন আবার কালকে তাঁরা সকাল-সকাল আসবেন।

সমস্ত রাতটা উদ্বিগ্নতায় কাটলো দু'জনেরই। ভোর হবার আগেই দু'জনেরই ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে তৈরি হয়ে নিলে।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলে না বিজন। তার কারখানায় সকাল আটটার মধ্যে হাজিরা। রইল শুধু শর্বরী। অচলা রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

একজন মক্কেল এলো সকাল ন'টার সময়। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে শর্বরী। এমন

সময়ে হঠাৎ বাবা এসে হাজির। বাবাকে দেখে শর্বরীর মনে হলো এই ক'টা বছরেই বাবা যেন একটু বেশি বুড়ো হয়ে গেছে।

—বুলা! বাবার সেই অনেক কাল আগের আদরের ডাক।

বাবা বললেন, তুমি এখানে? আমি কতদিন ধরে তোমাকে খুঁজছি তা জানো? বলে বাবা চারিদিকে দারিদ্র্যের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, তোমার একটু দয়া-মায়া নেই বুলা? তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। আমি তোমায় বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।

বুলা বললে, আমি তোমার বাড়িতে গেলে আমার বাড়ি কে দেখবে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, কিন্তু তোমার নিজের মা, তার অসুখে একবার দেখতে যাওয়া কী তোমার উচিত নয়?

—মা'র কী অসুখ হয়েছে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হজম হয় না, ঘুম হয় না, আর বেশিদিন বোধহয় বাঁচবেনও না। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, তো এখনই একবার চলো।

—তুমি ডাক্তার দেখাচ্ছ তো?

—ডাক্তার তো দেখছেই। কিন্তু অসুখটা তোমার জন্যেই—

—আমার জন্যে কেন?

—তোমার জন্যে না তো কী? তুমি না বলে-কয়ে আমাদের ছেড়ে চলে এলে, মনের ওপর কতখানি চাপ পড়েছে বলো তো? তুমিই তো আমাদের একমাত্র সন্তান। তুমি চলে গেলে কষ্ট পাব না আমরা?

বুলা বললে, আমি যখন মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তখন একদিন না একদিন আমাকে পরের বাড়িতে বউ হয়ে চলে যেতে হতোই, তখন?

—কিন্তু এই কী আমার মতো একজন আই-সি-এসের মেয়ের যোগ্য শ্বশুরবাড়ি? আমি কী তোমাকে এই রকম একজন লোফারের সঙ্গে বিয়ে দিতুম? তোমাকে আই-এ-এস কি ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিতুম।

বুলা রেগে গেল। বললে, তুমি কী আমাদের গালাগালি দেবার জন্যেই এখানে এসেছ?

—আমি তো তোমাকে গালাগালি কিছু দিইনি।

বুলা বললে, গালাগালি তুমি আমাকে দাওনি বটে, কিন্তু আমার স্বামীকে গালাগালি দিলেও তো সেটা আমার গায়েই লাগে।

মিস্টার গাঙ্গুলী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উত্তেজনায় তিনি থর-থর করে কাঁপছিলেন। এবার একটা খালি চেয়ার দেখে তাতেই বসে পড়লেন তিনি। বললেন, তুমি যাকে তোমার স্বামী বলছো সে কী তোমার মতো লেখাপড়া জানা মেয়ের যোগ্য? আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি তার কী এই ফল?

বুলা বললে, আমি তোমাকে আবার বলছি, আমার স্বামীকে গালাগালি দিলে সেটা আমার গায়েই লাগে।

—তেমন স্বামীর মতো স্বামী হলে আমি কিছু বলতুম না, কিন্তু এ যে একজন অশিক্ষিত মোটর মেকানিক!

বুলা বললে, কে শিক্ষিত, কে অশিক্ষিত তা বোঝবার মতো বয়েস আর শিক্ষা আমার হয়েছে। নইলে নিজের ইচ্ছেয় আমি তাকে বিয়ে করতুম না।

—তাহ'লে বুঝতে হবে তোমার বয়েসও হয়নি আর উচিত শিক্ষাও হয়নি। তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মনে হয়, আমি শুধু টাকাই নষ্ট করেছি।

বুলা বললে, তোমার কী মনে হয় না-হয়, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

—যাক্ এ বিষয়ে তর্ক করে সময় নষ্ট করবো না ; আর তর্ক করে কোন লাভও নেই। আমি চাই তুমি আমার বাড়িতে ফিরে এসো। আর ডিভোর্সের ব্যবস্থা যদি করতে হয়, তাহ'লে তার ব্যবস্থাও আমি করে দিতে পারি।

বুলা বললে, বাবা তুমি ভুলে যাচ্ছো যে, আমি একজন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। ডিভোর্স করবার দরকার হলে আমি নিজেই তা করতে পারি। কিন্তু তার দরকার হবে না। আমার স্বামী মোটর মেকানিক হতে পারে, কিন্তু সে সত্যিকারের ভালো মানুষ।

—কী যা তা বকছো তুমি?

বুলা বললে, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আই-সি-এস তো তোমার কল্যাণে অনেক দেখেছি। তারা সবাই শিক্ষিত মানুষ আর মোটর মেকানিক হলেই তারা অমানুষ, এ আমি বিশ্বাস করি না। এটা ভুলে যেও না যে মানুষের পেশা দিয়ে মানুষের বিচার হয় না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, এখন বুঝেছি তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমি ভুল করেছি। কিন্তু যা করেছি, তা করেছি, এখন আমার অনুরোধ তুমি তোমার মাকে একবার দেখতে চলো।

বুলা বললে, তা আগে যদিও-বা যেতাম, কিন্তু এখন তোমার এইসব কথা শোনবার পর আর যাবো না। সেখানে গেলেও মা আমাকে এইসব কথাই বলবে। তুমি শুধু মাকে গিয়ে এই কথাই বোলো যে, আমার স্বামীর হাতে তোমার মতো টাকা নেই, আমার স্বামী তোমার মতো আই-সি-এসও নয়। কিন্তু আমার স্বামীর সংসারে আমি খুব সুখেই আছি, এখানে আমার কোনরকম কষ্ট নেই।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, আর একটু বয়েস হলে বুঝবে যে এ-সুখ সুখ নয়। এ এক রকমের আত্ম-প্রবঞ্চনা। যৌবনের নেশা যেদিন কেটে যাবে সেদিন তোমাকে এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে, তাও বলে রাখছি।

বুলা বললে, তুমি যে যুক্তিই দেখাও, আমাকে তুমি আমার সংকল্প থেকে নড়াতে পারবে না। তোমাদের নকল ভদ্রতা আমি দিল্লীতে থেকে অনেক দেখেছি। সে-সব মেকি জিনিসে আমি আর ভুলছি না। তোমাদের সমাজে যারা মানুষ নামের যোগ্য নয়, তাদের মধ্যেই যে সত্যিকারের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়, তার সন্ধান আমি পেয়েছি।

—কিন্তু ধরো, ভগবান না করুন, যদি তোমার একটা শক্ত অসুখ হয় তার জন্যে ভালো নার্সিং হোমে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারবে তোমার স্বামী?

বুলা বললে, তুমি বোকার মতো এ-সব কী বলছো? যারা দিনে তিনশো টাকা খরচা করতে পারে না, তারা বুঝি এই কলকাতায় বেঁচে নেই?

মিস্টার গাঙ্গুলী এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তোমার সঙ্গে আর তর্ক করবো না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা তাই বলে দাও।

বুলা বললে, না।

—মা-বাবার জন্যে কী তোমার মনে এতটুকু মায়া-দয়াও হয় না?

বুলা বললে, যে সস্তা মায়া-দয়ার কোন মানে হয় না সেই মায়া-দয়া আমার নেই। মনে করে নাও তোমাদের মেয়ে মারা গিয়েছে। তা মনে করতে পারো না?

—কিন্তু একটা কথা মনে রেখে দাও যে, যে ছেলেটি তোমাকে বিয়ে করেছে, সে কেবল আমার টাকার লোভে।

বুলা বললে, টাকার লোভ মানে?

—মানে আমি মারা গেলে আমার টাকা-কড়ি সমস্তই সে পাবে।

বুলার মুখে ঘৃণা ফুটলো। বললে, বাজে কথা। আমি তা বিশ্বাস করি না। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি। বরং আমি তাকে বিয়ে করতে বলেছি, তবে সে আমাকে বিয়ে করেছে। তোমার ধারণা ভুল।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, আমি বলে রাখছি একদিন কিন্তু এর জন্যে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। তুমি অত আরাম ছেড়ে এই কষ্টের মধ্যে কাটাচ্ছো, এরজন্যে একদিন কিন্তু আমার কাছে গিয়ে আশ্রয়ের জন্যে কেঁদে পড়বে। সেদিনের কথা যেন তোমার মনে থাকে।

বুলা বললে, আমি যদি উপোস করেও মরি তাহ'লেও তোমার কাছে আমি হাত পাততে যাবো না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মিস্টার গাঙ্গুলী মেয়ের কাছ থেকে এ-সব কথা শুনবেন আশা করেননি। বললেন, তোমার তো দেখছি বড় অহঙ্কার। এত অহঙ্কার ভালো নয়।

—এতে তুমি অহঙ্কার কোথায় দেখতে পেলে বুঝতে পারছি না।

—চিরকাল কারো সমান যায় না, এটা তুমি মনে রেখো।

বুলা বললে, চিরকাল তোমারও সমান যাবে না, এটা তুমিও ভুলো না।

—যাক্, তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করতে চাই না, এখন তুমি তোমার মা'কে একবার দেখতে যাবে কিনা তাই বলো। তোমাকে দেখলে হয়তো তোমার মা একটু সেরে উঠতো।

বুলা বললে, আমার সময় নেই আজ, আমাকে এক্ষুনি কোর্টে যেতে হবে, আজকে আমার একটা জরুরী আপিল কেস আছে।

—তাহ'লে কী কাল যাবে?

বুলা বললে, কালকের কথা কাল বলতে পারবো।

—তাহ'লে পরশু?

বুলা বললে, দেখ বাবা, যেদিন তুমি আমার স্বামীকে নিজের জামাই বলে স্বীকার করবে, সেইদিনই আমি তোমার বাড়ি যাবো।

—তুমি কি বলতে চাও যে, একজন লোফারকে আমি আমার জামাই বলে স্বীকার করবো? এত অধঃপতন আমার হয়নি।

বুলা বললে, তোমারও তো দেখছি এখনও অহঙ্কার যায়নি। তুমি কী ভাবছো তুমি এখনও আই-সি-এস আছো, আর তোমার আণ্ডারে আমরা চাকরি করি? আমরা তোমার চাকরি করি না, এটা মনে রেখে কথা বলবে!

এরপর মিস্টার গাঙ্গুলীর পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এত অপমান তিনি নিজের মেয়ের কাছ থেকে পাবেন, এটা আশা করেননি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

পরিতোষ বললে, ভাগ্যের চাকা যে কার কখন কোন্‌দিকে ঘোরে, তা স্বয়ং ভগবানও বোধহয় বলতে পারেন না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বাড়িতে এলেন। স্ত্রী বিছানায় শুয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে, কী হলো? দেখা হলো বুলার সঙ্গে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে, দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হতো।

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, কেন?

—তোমার মেয়ে আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।

—তার মানে?

—সে তোমাকে আর কী বলব? জীবনে আমাকে কেউ এমন করে অপমান করেনি, আমি ঠিক করেছি আর আমি তার মুখদর্শন করব না।

—তুমি আমার অসুখের কথা বলেছিলে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, বলেছিলুম, কিন্তু তার উত্তরে সে কী বললে জানো? বললে যেদিন আমি বুলার স্বামীকে জামাই বলে স্বীকার করব, সেইদিনই সে আসবে, তার আগে নয়। তা সেই লোফারটাকে কিনা আমি জামাই বলে কোনদিন স্বীকার করবো বলতে চাও?

—তা তো বটেই। সে তো একটা লোফারের চেয়েও অধম, একটা মোটর-মিস্ত্রী বই তো কিছু নয়।

—তুমিই বলো, আমি কী কিছু অন্যায় বলেছি?

—আমি হলেও তো তাই-ই বলতুম।

—যাক্‌গে, বুলার কথা ভুলে যাও, মনে করে নাও সে ম'রে গেছে।

মিসেস গাঙ্গুলীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। শুধু দু'চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল। মিস্টার গাঙ্গুলী নিজের রুমাল দিয়ে তার চোখ দু'টো মুছিয়ে দিলেন।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, কী রকম অবস্থা দেখলে তার?

—আরে রাম রাম, সে এমন একটা বাড়িতে আছে যাকে বস্তি বাড়ি বললেই ঠিক হয়। একটা ভাঙা টেবিল, আর দু'খানা হ্যাণ্ডেল-ভাঙা চেয়ার। না আছে ঘরের মেঝেতে একটা কার্পেট পাতা, না আছে ফ্যান। বোধহয় বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইনও নেই।

মিসেস গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে, তাহ'লে কী করে আছে সে বাড়িতে? ও তো আমাদের কাছে ইলেকট্রিক ফ্যান ছাড়া ঘুমোতেই পারত না। চব্বিশ ঘণ্টা পাখার তলায় থাকত—সে বাড়িতে চাকর-বাকর কিছু আছে?

—আরে কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। শুনছো সে একটা লোফার। সে তোমার মেয়েকে অত আরামে রাখতে পারবে?

—তা সেই ছোঁড়াটাকে কেমন দেখলে?

—সে ছোঁড়াটা বাড়িতে থাকলে তবে তো তাকে দেখতে পাব! সে তো সকাল সাতটার মধ্যে কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করতে বেরিয়ে যায়।

—আর বুলা?

—সে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করে বললাম তো।

—প্র্যাকটিশ কী রকম করছে?

—ছাই-ছাই, আমি জানি না নতুন এ্যাডভোকেটদের প্র্যাকটিশের কথা: অর্ধেকদিন ট্রাম-বাসের ভাড়াটাও জোটে না।

—তোমায় কিছু খেতে দিলে না?

—খেতে দেবে? আর দিলেও আমি তার পয়সায় খাবো? আমার এত অধঃপতন হয়নি যে সেই লোফারটার পয়সায় আমি খাব? তুমি বলছো কী?

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, খাও না খাও, সে পরের কথা। কিন্তু তার তো অফার করা উচিত ছিল, তুমি এতদিন পরে গেলে?

—আমি যে তার বাড়িতে গিয়েছি, সেইটেই তার মহা সৌভাগ্য বলে মনে করা উচিত! আমি বলে এসেছি যে, চিরকাল কারো সমান যায় না, একদিন তাকে আমার কাছে এসেই হাত পাততে হবে।

—তাতে কী বললে সে?

—বললে আমারও নাকি চিরকাল সমান যাবে না। আরো বললে, আই-সি-এস বলে আমার নাকি খুব অহঙ্কার। তারা আমার আণ্ডাবে চাকরি করে না, যে আমি যা বলবো, তাই-ই তাদের করতে হবে!

মিসেস গাঙ্গুলী শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে, তাহ'লে সে তোমায় অপমান করলে বলো!

—অপমানই তো করলে। সেইজন্যেই তো ওই কথা শোনবার পর আমি আর সেখানে এক মিনিটও দাঁড়ালুম না, সোজা বেরিয়ে চলে এলুম।

মিসেস গাঙ্গুলী বললে, ঠিক করেছ, আমি হলে তো তাকে জুতো-পেটা করতুম। আমার শরীরটা খারাপ তাই যেতে পারলুম না। নইলে আমি রাগে কী যে করতুম, বলা যায় না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, যাক্ গে। ওসব কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, আমিও মাথা ঘামাব না। মাথা ঘামালে মিছিমিছি তোমার প্রেসার বেড়ে যাবে। তার চেয়ে মনে করো আমাদের মেয়ে-জামাই নেই।

মিসেস গাঙ্গুলী আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

কিন্তু মানুষের সমস্যা কী একটা? কলকাতায় আসার পরই মিস্টার গাঙ্গুলী কয়েকটা ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু স্ত্রীব অসুখ হওয়ার পর আর আগেকার মতো নিয়ম করে আসতে পারতেন না। মাঝে-মাঝে একলা আসতেন আর পরিতোষের সঙ্গে গল্প করেই উঠে পড়তেন। বলতেন, আজকে উঠি।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করত, মিসেস কেমন আছেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী গম্ভীর মুখে বলতেন, ভালো নয়।

রোজই ওই এক কথা। মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, সারা জীবন চাকরি করে শেষ জীবনটায় যে একটু আরাম করে দিন কাটাব, তার উপায় আর রইল না। এখন যদি মিসেস মারা যায় তো আমার কী হবে বলুন তো? বাড়িতে একলা কী করে কাটবে?

কথাটা শুনে পবিতোষ বলত, আপনি অত ভাবছেন কেন? মিসেস তো ভালোও হয়ে যেতে পারেন।

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, ডাক্তাররা যে সে-ভরসা দিচ্ছে না। তা ছাড়া এখন তো শুধু সাতশো টাকা পেনসনের ওপরই ভরসা।

পরিতোষ বলত, মাত্র সাতশো টাকা?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলতেন, আরো একটা নতুন ঝামেলা হয়েছে। আগে যে বাড়িটা কলকাতায় তৈরি করেছিলুম, তার ভাড়া পাই আড়াইশো টাকা। এখন যে ভাড়া বাড়িতে আছি, তার ভাড়া গুনি মাসে পাঁচশো টাকা। অথচ আমার নিজের বাড়ি রয়েছে সেখানে ঢুকতে পারছি না। এখন সেই ভাড়াটের সঙ্গে মামলা চলছে। তিন বছর হয়ে গেছে, এখনও মামলার কোন ফয়সালা হচ্ছে না। মাঝখান থেকে যেদিন মামলার দিন পড়ছে, সেইদিন দু'শো করে টাকা নষ্ট হচ্ছে।

পরিতোষ বলত, তা আপনার নতুন বাড়ি তখন ভাড়া দিয়েছিলেন কেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তখন দিল্লীতে থাকি, ভাবলাম বাড়িটা খালি পড়ে আছে—ভাড়া দিয়ে দিই! ভাড়া দিলে বাড়িটা অন্ততঃ ভালো থাকবে। বাড়ি খালি পড়ে থাকলে তো ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে। এখন যদি এই বাড়ি নতুন করে ভাড়া দিই তো কম করে এক হাজার টাকা ভাড়া আসবে।

শেষকালে ঝঞ্ঝাট আরো বেড়ে গেল মিস্টার গাঙ্গুলীর। একদিকে মিসেস গাঙ্গুলীর অসুখের খরচা, তারপরে মামলার খরচা। তার ওপর অনেক টাকার শেয়ার কিনেছিলেন। শেয়ারে টাকা খাটিয়ে মোটা ডিভিডেণ্ড পাওয়ার লোভে। সেই শেয়ারের দামও সব একসঙ্গে কমে গেল।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে কম সুদ আর শেয়ারে টাকা খাটালে লাভ বেশি। তাই শেয়ারেই তিনি বেশি টাকা খাটিয়েছিলেন।

এতগুলো বিপর্যয় একসঙ্গে আসবে, বিশেষ করে রিটায়ার করবার পর, সেটা তিনি আগে কল্পনা করতে পারেন নি। ভরসার মধ্যে ভরসা শুধু এই পেনশনের সাতশো টাকা! তাতে গাড়ি চালিয়ে ইজ্জৎ রাখা যায় না।

সেদিন দেখলুম মিস্টার গাঙ্গুলী ট্যাক্সি করে ক্লাবে এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি কী হলো?

—গাড়িটা বেচে দিলুম।

—সে কী! তাহ'লে আপনার চলবে কী করে?

—ড্রাইভার আমার তিনশো টাকা মাইনে চায়, অত টাকা দেব কোত্থেকে? আর নিজে তো ড্রাইভ করতে পারি না। তারপর পেট্রলের দাম ঠিক এই সময়েই কিনা বেড়ে গেল! দশ লিটার পেট্রল কিনেছিলাম, সত্তর টাকা নগদ দিতে হলো। এত টাকা আমি কোথা থেকে যোগাবো?

মিস্টার গাঙ্গুলীর অবস্থা দেখে আমার বড় দয়া হল ভাই। চোখের সামনে একটা লোককে ধাপে-ধাপে কেবল নেমে যেতেই দেখলাম। অথচ আই-সি-এস মানুষ—এককালে কত লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। প্রথম প্রথম যখন ক্লাবে আসতেন তখনও দাপট দেখেছি, তখনও স্যুটের বাহার দেখেছি। দু'হাতে বেয়ারাদের বখশিস্ দেওয়ার বহর দেখেছি। তখনও এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি তখনও আই-সি-এস।

তারপর আবার সেই লোকেরই অন্য চেহারা দেখলাম। পুরনো স্যুট, মামলা, স্ত্রীর অসুখ, গাড়ি বিক্রি করে দেওয়া। আর তারপর অনেক দিন আর তাঁর পাত্তা নেই!

পরিতোষ বললে, অনেকদিন পরে হঠাৎ আবার একদিন এলেন। দেখলুম চেহারাটা শুকনো-শুকনো। অনেক রোগা হয়ে গেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম চেহারা হলো কেন? অনেক দিন আসেন নি আপনি। ব্যাপারটা কী? অসুখ হয়েছিল নাকি?

—আমার স্ত্রী মারা গেলেন।

—শেষকালে কী হয়েছিল?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হার্ট তো আগে থেকেই খারাপ ছিল, এবার হঠাৎ থার্ড স্ট্রোক হল। একদিন ভোরবেলা দেখলাম তখনও ঘুমোচ্ছে। ভাবলুম ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। ঘড়িতে সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, ন'টা বাজতে চললো, তখন ভাবলুম ডেকে তুলে ওষুধটা খাইয়ে দিই। গায়ে হাত দিতেই দেখি একেবারে ঠাণ্ডা গা। তখনই ডাক্তার ডাকলুম, কিন্তু সে অবস্থায় ডাক্তারই বা কী করতে পারবে। তার অনেক আগেই সে মারা গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েকে খবর দিয়েছিলেন?

—খবর দিয়েছিলুম কিন্তু মেয়ে আসেনি।

—তারপর?

—তারপর আর কী? লোকজন ডেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। সতী-লক্ষ্মী চলে গেল। শেষ পর্যন্ত মেয়েই তার চরম শত্রু হয়ে রইল। আসলে বলতে পারা যায়, মেয়ের জন্যেই অকালে তার প্রাণটা গেল। মেয়ে যেদিন দিল্লীর বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেইদিন থেকেই তার হার্ট খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমার সব ক্যালকুলেশান ভুল হয়ে গেল।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক বোঝালাম। বললাম, যার যা নিয়তি তা কে রোধ করতে পারে? মেয়ের বদলে যদি ছেলে থাকতো, তাহলেও হয়তো এই রকমই হতো।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, তাই তো এখন নিয়তিকেই বিশ্বাস করি। আগে ওকে বিশ্বাস করতুম না। তখন ভাবতুম, জীবনটা যেমন চলছে, সেই রকমই বুঝি চলবে। তা যে কত বড় ভুল, তা স্ত্রীর মৃত্যুতে যেমন করে বুঝলুম, এর আগে কখনও তা বুঝিনি। আমি ব্রিটিশ আমলের আই-সি-এস, তখনকার আমিতে আর এখনকার আমিতে যে কত তফাৎ, আমাকে যারা আগে দেখেছে আর এখন দেখছে তারা তা বুঝতে পারবে। কে বলবে যে এককালে আমি 'মানবসুন্দরী' উপন্যাস লিখে কত নাম করেছিলুম। তখনকার দিনে আমার সঙ্গে শুধু একবার কথা বলতে পারলে যে কত জন ধন্য হয়ে যেত, তা আমার এখনও মনে আছে। অথচ এখনও তারা বেঁচে আছে। আমি কত সাহিত্যিককে যে তখন কত সম্মেলনে সভাপতি করেছি, তা আজ তাদেরও মনে নেই। আমি যাতে তাদের সভাপতি করি, তার জন্যে তারা যে কত খোসামোদ করেছে, তা আমার সব মনে আছে। অথচ এখন দেখা হলে তারা আমার সঙ্গে কথাই বলে না।

বললাম, এটাই তো নিয়ম।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, ভাবতে পারেন, এখন আমি ট্যাক্সি চড়ছি, আর আমার মেয়ের এখন দু'টো গাড়ি। একটা আমার সেই লোফার জামাই চড়ে, আর একটা আমার মেয়ে!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, দু'টো গাড়ি হলো কী করে?

—এখন তো প্র্যাকটিশ করে মেয়ের খুব পশার হয়েছে। সার্দান এ্যাভিনিউতে একটা তিনতলা বাড়ি করেছে শর্বরী।

—কিন্তু কোথা থেকে এরকম হলো?

—আমার জামাই একটা মোটর মেরামতের ওয়ার্কশপ করেছে। এখন তার কারখানায় চল্লিশজন লোক খাটে।

—আপনি এসব জানলেন কী করে?

—আমি যে শ্রাদ্ধের আগে মেয়েকে বলতে গিয়েছিলুম।

—মেয়ে শ্রাদ্ধেতে এসেছিল?

—আসবে যে তার সময় কোথায়? দিন-রাত ক্লায়েন্ট নিয়েই সে ব্যস্ত। তার ক্লায়েন্টরাই যে তাকে আসতে দেবে না। এমন কী সেই বখাটে লোফার জামাই, যাকে আমি মানুষ বলেই মনে করিনি কখনও, সেও কিনা শুনলুম দেড় লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে লাস্ট ইয়ারে।

পরিতোষ গল্প বলতে বলতে থামলো। আমি বললাম, তারপর?

পরিতোষ বললে, যাবার সময় বেয়ারা একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে। তিনি তাতে চড়ে বাড়ি চলে গেলেন। ক্রমেই মিস্টার গাঙ্গুলীর ক্লাবে আসা কমে গেল। তারপর অনেকদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বুঝলাম, মিসেস গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর তিনি মুষড়ে পড়েছেন। তার ওপর বয়স হচ্ছে। বাড়িতে বসে বসেই হয়তো সময় কাটান। সব মানুষেরই একদিন বয়েস বাড়বে, বার্ধক্য আসবে। তখন সকলেরই বাইরে বেরুনো কমে যাবে—এটাই নিয়ম। আগেও ক্লাবে কত লোক আসত। তারপর তারা আস্তে আস্তে আসা বন্ধ করেছেন। তাদের কথা সবাই ভুলে গেছে। এইটেই এতকাল দেখে এসেছি। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। সেই ঘটনাটা বলি।

সেদিনও আমি ক্লাবে বসে গল্প করছি অন্য মেম্বারদের সঙ্গে। হঠাৎ দেখি একটা বিলিতি গাড়ি এসে থামল। মনে হলো নতুন কেনা ইমপোর্টেড কার। এ-গাড়িটা আগে কখনও ক্লাবে আসেনি। উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে দিতেই নেমে এলেন মিস্টার গাঙ্গুলী।

আমি ওই রকম গাড়িতে মিস্টার গাঙ্গুলীকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর চেহারাটা বদলে গেছে। পরনে গ্যাবার্ডিনের নতুন স্যুট। আমি তাঁকে দেখেই এগিয়ে গেলাম। বললাম, কী হলো, এতদিন আসেন নি যে?

—এখন আর আগেকার মতো সময় পাই না।

আমি বললাম, এত ব্যস্ত কীসে?

—সমস্ত দিন নাতনীকে নিয়ে কেটে যায়।

—নাতনি?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, হ্যাঁ, খুব সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে বুলার। বুলা আমাকে মেয়ের নাম রাখতে বলেছিল, আমার দেওয়া নামটা বুলার খুব ভালো লেগেছে, বিজনেরও নামটা খুব পছন্দ হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম রেখেছেন?

—বল্লরী। ভালো নাম নয়?

বললাম, বাঃ চমৎকার নাম দিয়েছেন তো আপনি। আপনি দেখছি বাংলা ভাষাতেও এক্সপার্ট!

খুব খুশি হলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, বুলার নামেরও প্রথম অক্ষর ব আর বিজনের নামের প্রথম অক্ষর ব—এমন নামের মিল কারো নেই।

বললাম, এ গাড়িটা কার?

—মেয়ের। আজ তো কোর্ট ছুটি তাই বুলা বললে, বাবা, তুমি আমার গাড়িটা নিয়েই ক্লাবে যাও।

আমি বললাম, আপনি কী এখন মেয়ের কাছেই থাকেন নাকি?

—হ্যাঁ, কী আর করি বলুন, মেয়ে এসে একদিন আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। জামাইও বললে, বাবা, আপনি একলা একলা এ বাড়িতে থাকবেন কী করে? আমাদের বাড়িতে অনেক ঘর, আপনি সেখানেই চলুন। ওরা দু'জনেই আমাকে খুব যত্ন করে, জানেন?

বললাম, আপনার সেই ভাড়াটের মামলা? সেটার কী অবস্থা?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সে অনন্তকাল ধরে চলছে, আবার অনন্তকাল ধরে চলবে। তবে আমার মেয়ে তো নিজেই উকিল, সেই এখন সে-মামলার ভার নিয়েছে। কিন্তু আমার আর সে-বাড়ির ওপর কোন লোভ নেই। কারণ আমার স্ত্রীর জন্যেই বাড়িটা করেছিলুম, সেই স্ত্রীই যখন চলে গেল তখন আর কার জন্যেই বা মামলা, আর কোন্ কাজেই বা সে বাড়ি লাগবে? বাড়ির মালিকানা যদি কোনদিন আমার কাছে ফিরেও আসে তো ও-বাড়ি নিয়ে আমি করবোই বা কী? ওতে তো আবার ভাড়াটেই বসাতে হবে!

বললাম, তা ভাড়াটেরা কী বলছে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, ভাড়াটেরা আর কী-ই বা বলবে? তারা নিজেরাই একটা বিরাট বাড়ি করেছে। সে-বাড়িটা মোটা টাকায় ভাড়া দিয়ে নিজেরা সস্তা ভাড়াতে বাস করছে! সে-বাড়ির মামলা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবে। আমার মেয়ে সেই রকম কথাই বলছে। মাঝখান থেকে উকিল-মুহুরি-পেশকার সকলেই মোটা ঘুষ খাচ্ছে, তার কাছ থেকে।

তারপর একটু হেসে বললেন, এবার যে কাজের জন্য এসেছি সেই কথাটাই বলি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি সেই জন্যেই।

বললাম, বলুন—

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, আসছে রবিবার আমার নাতনী বল্লরীর অন্নপ্রাশন, আপনাকে কিন্তু দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে, এই কার্ডেই ঠিকানা লেখা আছে। এই দেখুন—

বলে একটা ছাপানো কার্ড দিলেন আমার হাতে।

দেখলাম, কার্ডে সার্দান এ্যাভিনিউ-এর ঠিকানা লেখা।

বললাম, নিশ্চয়ই যাবো, আপনি কিছু ভাববেন না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, একটু সকাল সকাল যাবেন, গল্প করব।

রবিবার দিন যথারীতি গেলাম মিস্টার গাঙ্গুলীর মেযেব বাড়িতে।

যেতেই দেখি বিরাট তিনতলা একটা বাড়ি। চারদিকে আলোয আলো। সমস্ত বাড়িটা জুড়ে লাল-নীল টুনি-বাল্‌ব জ্বলছে নিভছে। বাড়ির সামনে লন্‌। প্রায় দু'হাজাব লোকেব ভিড। উর্দি-পবা খান্‌সামারা সিগারেট আর কোল্‌ড ড্রিংস্‌-এর ট্রে নিযে চারদিকে ঘুবে ঘুরে বেডাচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেযে মিস্টাব গাঙ্গুলী এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, এত লোক নেমন্তন্ন করেছেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন, সব আমার জামাই-এর ফ্যাক্টবির লোক আব বন্ধুবান্ধব। জামাই-এর অটোমোবাইল ওয়ার্কস্‌-এ কী কম লোক চাকরি কবে? আব আমাব মেযের কোর্টের এ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার আর জজ-ম্যাজিস্ট্রেটবা পর্যন্ত সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে।

তারপর বললেন, চলুন, আমার নাতনী বল্লরীকে দেখবেন চলুন।

ভেতবে নিয়ে গেলেন তিনি আমাকে। অন্দর-মহলে মহিলাদের ভিড। সেখানে একটা ঘবেব মধ্যে মিস্টার গাঙ্গুলীর মেয়ে বুলা তার মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছে। আমি উপহাব দেবার জন্যে একটা জাপানী খেলনা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা মিস্টার গাঙ্গুলীর নাতনীর হাতে দিলাম। মেয়েটি সেটা নিয়ে খেলতে লাগল। বড় সুন্দর নাতনী মিস্টার গাঙ্গুলীব। দেখলেই মনে হয় যেন একটা রঙীন মোমেব পুতুল।

মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বললেন, ইনি আমাদের ক্লাবেব ফ্রেণ্ড পরিতোষবাবু।

মেয়ে হাত তুলে নমস্কার করলে। আমিও প্রতি-নমস্কার করলুম। জামাই বিজন সরকারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। ক্যালকাটা অটোমোবাইল ওয়ার্কস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। দেখলাম, ছেলেটি ভারি ভদ্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান। শ্বশুরের বন্ধু আমি, তাই আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। অতবড় কোম্পানির মালিক তবু এতটুকু অহঙ্কার নেই তার। সামান্য কিছু খেয়ে আমি উঠে পড়লাম।

বিদায় নেবার সময় মিস্টার গাঙ্গুলী আমায় গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন আমাব নাতনীকে?

বললাম, এক-কথায় চমৎকার!

তিনি বললেন, মেয়ে সকালবেলা হাইকোর্টে চলে যায়, আর জামাইও ফ্যাক্টরিতে বেরিয়ে যায়, তখন আমি ওই নাতনীকে নিয়ে সময় কাটাই।

তারপর একটু থেমে বললেন, একটাই শুধু দুঃখ রয়ে গেল পরিতোষবাবু, আজকে আমার

মেয়ের যে এত ঐশ্বর্য হয়েছে, আমার স্ত্রী এ-সব কিছুই দেখে যেতে পারলেন না।

আমি গাড়িতে করে আসবার সময় ভাবতে লাগলাম সেই সব পুরনো কথাগুলো। একদিন ওই মিস্টার গাঙ্গুলীই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আর মেয়ের মুখ-দর্শন করবেন না। একটা সামান্য মোটর-মিস্ত্রীকে বিয়ে করেছিল বলে সেদিন তিনি মেয়েকে কত কথা শুনিয়েছিলেন, কত ভয় পেয়েছিলেন মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সেদিন যদি সত্যি-সত্যিই মেয়ের সঙ্গে গোবিন্দ সাকসেনা আই-এ-এস-এর বিয়ে হতো! তাহ'লে কী এত বড় বাড়ি হতো? এত বড় বিলিতি গাড়ি হতো? না এত প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, মান-সম্মান হতো? আসলে মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে ভালোবাসা-টালোবাসা সমস্তই তুচ্ছ, তাঁর কাছে একমাত্র খাঁটি জিনিস হচ্ছে টাকা। আজ যে মিস্টার গাঙ্গুলী এত হাসি-খুশি, সেও তো মেয়ে জামাইয়ের টাকা হয়েছে বলে। নাতনী যদি সুন্দরী না হয়ে কালো-কুৎসিত হতো, তাহ'লেও তিনি হয়তো ঠিক এমনিই আদর করতেন! কারণ ওই— মেয়ে-জামাই-এর টাকা।

পরিতোষ গল্প শেষ করে বললে, তুমি যদি ভাই এই মিস্টার গাঙ্গুলীকে নিয়ে কখনও উপন্যাস লেখ তো সে উপন্যাসের নাম দিও, 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ'।

আমি বুঝলাম না তার কথাটা। জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

পরিতোষ বললে, মিস্টার গাঙ্গুলী হলেন অতীত, আর মেয়ে শর্বরী হলো বর্তমান, আর ওই নাতনী বল্লরী হলো ভবিষ্যৎ। আবার এমন একদিন আসবে যেদিন মেয়ে শর্বরী হবে অতীত, আর ওই নাতনী বল্লরী হয়ে যাবে বর্তমান, আর, আর-একজন যে জন্মাবে, সে হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ। এই অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের আবর্তেই পৃথিবী অনাদিকাল থেকে গড়িয়ে চলেছে, আর চিরকালই গড়িয়ে চলবে। এই হলো ঘূর্ণাবর্তের আসল তাৎপর্য।

হরেকৃষ্ণ হরেরাম

এতক্ষণ আপনারা বিবাহিতা শর্বরীর কাহিনী শুনলেন। এবার শুনুন আর একটি মেয়ের কাহিনী। এর নাম কুমকুম। কুমকুম শর্বরীর মত বিয়ে-হওয়া মেয়ে নয়, অবিবাহিতা। কিন্তু কেন যে সে অবিবাহিতা, তা সমস্ত কাহিনীটা পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন। কিন্তু যদি তাব বিয়ে হতো তাহ'লে সে হয়ত একদিন সুগৃহিণী হতে পারতো, প্রেমময়ী স্ত্রী হতে পারতো, কিংবা পরম স্নেহশীলা মা হতে পারতো।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে কিছু হওয়াই তার হযে উঠলো না। কেন সে-সৌভাগ্য তাব হলো না, সম্পূর্ণ কাহিনীটা পড়লেই তা জানতে পারবেন। আপনারা মাঝে-মাঝে খববের কাগজে হয়ত একটা বিশেষ বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন। বিজ্ঞাপনটা এই রকম ঃ

"কুমকুম,

তুমি কোথায় জানি না। তোমার ওপর আমি প্রচণ্ড অন্যায় কবেছি। তুমি ফিবে এসো। কিংবা আমার নিচের ঠিকানায় চিঠি দাও। আমি আমার সমস্ত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

ইতি—মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন।"

এর নিচেয় একটা ঠিকানা লেখা থাকতো। কখনও কলকাতার ঠিকানা, কখনও বোম্বাই-এর ঠিকানা, আবার কখনও বেনারসের ঠিকানা।

'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এ-বিজ্ঞাপন অনেকেই দেখেছে। এই বিজ্ঞাপন ভারতবর্ষের সব পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। কখনও বাঙলা ভাষায়, কখনও গুজরাটি, কখনও হিন্দি, বা কখনও ইংরেজী ভাষায়। ভারতবর্ষে যত পত্র-পত্রিকা বেবোয—সেই সব কাগজেই এই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।

আমাব মত অনেকেই এ বিজ্ঞাপন দেখেছে। দেখে অবাক হয়ে গেছে। কে কুমকুম! কে-ই-বা মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন, তা কেউই জানতো না। আর কী কারণেই বা এই বিজ্ঞাপন, তাও কেউ বলতে পারতো না। তাছাড়া একজন মুসলমানের সঙ্গে একজন হিন্দু মেয়ের কী যে সম্পর্ক, তাও আমরা বুঝতে পারতাম না। তবু বিজ্ঞাপন যখন বরাবর বেরোতো, তখন কল্পনা করে নিতাম যে, দু'জনের দেখা এখনও হয়নি। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে কী কারণ ছিল, তা আমরা অনুমান করতেও পাবতাম না।

গল্পের সূচনা এইখান থেকেই। অন্ততঃ বাইরের লোকের কাছে এইটুকুই কৌতূহল জাগাতো।

একবার বেনারসে গিয়ে যে হোটেলে উঠেছিলাম, সেখানেই ব্যাপারটার একটু হদিশ পেলাম। হোটেলে বহু লোক নানা সূত্রে দেখা কবতে আসতো। আলোচনা হতো নানা বিষয়েব।

হোটেলের কাছেই থাকতেন বলে কেশর শর্মা আমার কাছে ঘন-ঘন আসতেন। কেশর শর্মা মানুষ হিসেবে এমন কেউ-কেটা ব্যক্তি নন যে, এক ডাকে তাঁকে সবাই চিনতে পারবে। 'নাগরী প্রচারণী সভা'র সম্পাদনা বিভাগের কর্তা ছিলেন। বড়-বড় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া যা হিন্দী ভাষায় বারো খণ্ডে বেরিয়েছিল, তার প্রায় সমস্ত কাজটা একলাই করেছিলেন কেশর শর্মা। এদিকে ইংরিজী এবং হিন্দী, দু'টো বিষয়েই এম-এ এবং ডক্টরেট।

কেশর শর্মা একদিন এসে বললেন, কালকে আপনার কাছে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে আসবো। দেখবেন সে এক অদ্ভুত ভদ্রলোক। এমন মানুষ বোধহয় আপনি জীবনে দেখেন নি!

—তার মানে?

কেশর শর্মা বললেন, তিনি এলেই আমার কথার মানে আপনি বুঝতে পারবেন। তার আগে আমি কিছু বলবো না।

বললাম, জীবনে তো অনেক অদ্ভুত মানুষ দেখলাম, এবার না-হয় আর একজন অদ্ভুত মানুষ দেখবো।

কেশর শর্মা বললেন, না, আমি হলফ্ করে বলতে পারি আপনি এ-রকম অদ্ভুত মানুষ আর একটাও দেখেন নি।

আমার কৌতূহল আরো বাড়লো। বললাম, বেশ তো, নিয়ে আসবেন। আর নয়তো আমি নিজেই তাঁর কাছে যাবো। আমার এখানে তো কোনও কাজ নেই। তবে ওঁর কাজের ক্ষতি করবো সেটা আমি চাই না।

কেশর শর্মা বললেন, না, তাঁর কোনও কাজ নেই। তিনি কিছুই করেন না।

কিছু কাজ করতে হয় না যাঁদের, তাঁদের নিশ্চয় পৈত্রিক কিছু টাকা আছে। বা উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নিশ্চয়ই অনেক টাকা পেয়েছেন।

কেশর শর্মা বললেন, এককালে তিনি একজন বড় এ্যাডভোকেট ছিলেন। তখন তিনি অনেক টাকা কামিয়েছেন।

—আর এখন?

—এখন আর ওকালতি করেন না।

বললাম, কেন, খুব বয়েস হয়ে গেছে বুঝি?

কেশর শর্মা বললেন, না, এখন বয়েস বড় জোর বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ।

—তা'হলে তাঁর সংসারে কে-কে আছে?

কেশর শর্মা বললেন, স্ত্রী আছে আর একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু আর কেউ নেই সংসারে। তিনি বেশির ভাগ সময়েই বেনারসের বাইরে কাটান।

—কেন?

কেশব শর্মা বললেন, সেটাই তো গল্প। আপনি তাব সঙ্গে দেখা করলে একটা গল্পের প্লটও পেয়ে যেতে পারেন।

মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন কেন বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান তারও একটা কারণ আছে, নইলে আর তাঁকে নিয়ে গল্প হতো না। যে-গাড়ি সোজা পায়ে চলে গন্তব্যস্থলে পৌছোয়, তা আর গল্পের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য নয়।

কেশর শর্মার কথা শুনে বললাম, একদিন তাঁকে নিয়ে আসুন না আমার কাছে, কিংবা আমিও তাঁর কাছে যেতে পারি।

কেশর শর্মা বললেন, বরং তাঁকেই আমি আপনার কাছে নিয়ে আসবো। কালই তাঁকে দেখেছি বহুদিন পরে বেনারসে ফিরতে।

সেইরকম কথাই রইল। পরের দিন মোহাম্মদ শফিকুল হোসেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি এলেন না। কেশর শর্মাও এলেন অনেক দেরি করে। বললেন, না স্যার, দেখা হলো না।

—কেন?

—তিনি আজ সকালেই আবার বেনারস ছেড়ে চলে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেছেন?

কেশর শর্মা বললেন, তা কেউ বলতে পারবে না। কারোর বাপের সাধ্যি নেই যে বলে, কোথায় গেছেন তিনি।

—যে লোক সারাজীবন ঘুরে বেড়ান, তাঁর সংসার তাহ'লে চলে কী করে?

কেশর শর্মা বললেন, নিজে তো কিছুই করেন না।

—তাঁর বাড়িতে কে কে আছেন?

—ওই এক স্ত্রী। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর আর কোনও দায়-দায়িত্ব নেই তাঁর। যখন বেনারসে আসেন, খবর পেলে আমরা দু'একজন বন্ধু-বান্ধব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

এরপর আমার প্রশ্ন, টাকা কোত্থেকে আসে তাঁর?

কেশর শর্মা বললেন, ওঁরা তো জমিদার মানুষ। এককালে বাবার অনেক জমি-জমা ছিল। জমিদারী যখন উঠে গেল, তখন অনেক টাকাও পেয়ে গিয়েছিলেন, তারপর অনেক জমি হাতছাড়াও হয়ে গিয়েছিল।

কেশর শর্মার কাছেই গল্পটা শুনেছিলাম। অদ্ভুত মানুষ ওই মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন। এম-এ, বি-এল। এককালে বিরাট ল' ইয়ার মিস্টার মৌলার জুনিয়ার ছিলেন তিনি। মিস্টার মৌলা তখনও জজ হননি। সেই সময়ে মিস্টার মৌলা খুব সাহায্য করতেন। সে-সব একদিন গেছে শফিকুল হোসেন সাহেবের। টাকা উপায়ের জন্যে নয়, একজন গণ্য-মান্য মানুষ হিসেবে সমাজে গণ্য হওয়াই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। হোসেন সাহেব জানতেন সংসারে প্রচুর টাকা থাকলেও কোনও সম্মান বা ইজ্জৎ পাওয়া যায় না। ইজ্জতই হচ্ছে আসল জিনিস জীবনে, সেটা পেলে মানুষের সব পাওয়াই সার্থক হয়ে যায়।

প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজ করবার জন্যে তৈরি হয়ে নিতেন। মামলার নথি-পত্রগুলো দেখলে পড়তে আরম্ভ করতেন। এমন মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, যেন সেই মামলার সাফল্যের সঙ্গে তাঁর খাওয়া-পরার সামর্থ্যের একটা যোগ আছে।

বেশির ভাগ মানুষই কাজ করে যায় জীবনে উন্নতির জন্যে। জীবনে উন্নতি করার একটা মাত্র অর্থই হলো বেশি অর্থ উপায় করা। যে যথেষ্ট টাকা উপায় করতে পারে না, লোকে তাকে ফেলিওর বলে থাকে। লোকে তাকে এড়িয়ে যায়, লোকে তাকে মানুষ বলে মনে করে না। পৈত্রিক টাকা পেয়ে যে-মানুষ বড়লোক, তার বেশি খাতির নেই সমাজে। কারণ সে-টাকা জন্মসূত্রে পাওয়া। কিন্তু যে-মানুষ নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি-হিম্মৎ দিয়ে টাকা উপায় করে অনেক টাকার মালিক হয়েছে, তার খাতির আলাদা!

শফিকুল হোসেন সাহেবের নিজের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সামনে-পেছনে কচোয়ান আর সহিস থাকতো। তাদের পরনে উর্দি, মাথায় সেই সঙ্গে ম্যাচ্ করা পাগড়ি। তিনি যখন তাঁর বাড়ি থেকে বেরোতেন, তখন সে একটা দেখবার মতন বস্তু ছিল। সবাই হাঁ করে দেখতো সে দৃশ্য! সবাই জানতো পুরুষানুক্রমে তিনি বড়লোক মানুষ, তাঁর এ বিলাসিতাকে তারা ঈর্ষা করতো না, বরং ক্ষমা করতো! তাঁকে মানাতোও বেশ!

তাঁকে দেখে সবাই বলতো, ওই হোসেন সাহেব কোর্টে যাচ্ছেন।

মৌলা সাহেবের তখনও অত নাম হয়নি। কিন্তু তাঁরও বয়েস হয়েছিল, প্রচুর অর্থের মালিকও হয়েছিলেন তিনি।

শেষের দিকে তিনি আর আগের মত যার-তার ব্রীফ নিতেন না। একটু ছোট ব্রীফ হলেই দিয়ে দিতেন শিষ্য শফিকুল হোসেন সাহেবকে। বলতেন, এ কেসটা তুমি করো!

হোসেন সাহেবও মিস্টার মৌলার দেওয়া কেসগুলো নিতেন। টাকা উপায়ের জন্যে নয়, শুধু সিনিয়রের কথার সম্মান রাখবার জন্যে। সব মামলাই যে তাঁর পছন্দ হতো, তা নয়। কিন্তু সিনিয়ারের হুকুম না মানলে সিনিয়ারকে অপমান করা হয়। সিনিয়ার আর জুনিয়ারের মধ্যে গুরু-শিষ্যের মত সম্পর্ক।

সিনিয়ার মৌলার যত বয়েস বাড়তে লাগলো, ততোই তিনি ফিস্ বাড়াতে লাগলেন। তা না হলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। মামলা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে রাত্রের ঘুম নষ্ট হয়, সাংসারিক শান্তি থাকে না। টাকা একটা দরকারী জিনিস, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি টাকা অনর্থ ডেকে আনে। তখন ব্যারিস্টারের স্ত্রীদের সময় কাটতে চায় না, তখন বদ্‌খেয়াল চাপে তাদের মাথায়। অনেককে মদের নেশা করতে দেখেছি। ব্যারিস্টার মৌলা বিবেচক লোক ছিলেন। তিনি হোসেন সাহেবকে বলতেন, তোমাদের এখন বয়স কম, তোমরা অক্লান্ত কাজ করে যাও, ভালো-মন্দ বাছাই করো না। তোমাদের বয়েসে আমিও তাই করেছি। যখন বয়স বাড়বে, তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে, কোন্ কেস্‌টা নেবে আর কোন্ কেস্‌টা নেবে না। এখন শুধু পরিশ্রম আব পরিশ্রম। তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি?

হোসেন সাহেব বলতেন, একটি মাত্র মেয়ে।

মিস্টার মৌলা বলতেন, ওই একটিই যথেষ্ট। ওই একটির বেশি হলেই যত ঝঞ্ঝাট। তখন নিজেব প্রফেশানে সমস্ত মনটা দিতে পারবে না। তোমার স্ত্রী সেই সন্তান নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, আর তুমি পুরো সময়টা দাও তোমার প্রফেশানে।

আবো বলতেন, জীবনটা আরাম করবার জন্যে নয়। অনবরত স্ট্রাগল করাই হচ্ছে মানুষের বিধিলিপি। কার্ল মার্কসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—সুখ কী? হোয়াট ইজ্ হ্যাপিনেস? তিনি কী জবাব দিয়েছিলেন জানো? বলেছিলেন—স্ট্রাগল। আর আমাদের এক ইণ্ডিয়ান পোয়েট টেগোর বলেছিলেন—তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ঘিরে পরাও রণসজ্জা। এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। এই স্ট্রাগলের মধ্য দিয়েই সুখ খুঁজে নিতে হবে। যে আরাম করে তার ভাগ্যও আরাম করে, যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে চলে বেড়ায় তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে।

মিস্টার মৌলা সময় আর ফুরসৎ পেলেই শফিকুল হোসেনকে এইসব কথা শোনাতেন। তবে, এ-রকম অবসর বেশি হতো না তাঁর। তিনি নিজে যা শিখেছেন, জেনেছেন, পড়েছেন, তাই-ই শোনাতেন শফিকুল হোসেন সাহেবকে। আর শফিকুলেরও শুনতে ভালো লাগতো। মৌলা সাহেবও নিজে কথাগুলো মনপ্রাণ দিয়ে মানতেন। তাই যখন ওকালতি করে-করে ক্লান্ত হয়ে গেলেন, তখন স্বাস্থ্যের খাতিরে পরিশ্রমটা কমিয়ে দিলেন। অনেক কেস তিনি নিজে আর করতেন না, জুনিয়ার শফিকুল সাহেবকে দিয়ে দিতে লাগলেন।

আর অন্যদিকে শফিকুল হোসেন সাহেবের মেহনত বেড়ে গেল। সকাল থেকে রাত দু'টো পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন তিনি। টাকা তো আগে থেকেই ছিল, সেটা তখন পাহাড় হয়ে জমতে লাগলো। আরাম তিনি করবেন না। মৌলা সাহেব তাঁকে সেই উপদেশই দিয়েছেন।

হোসেন সাহেবের স্ত্রী বড় নিরীহ প্রকৃতির মহিলা। জিজ্ঞেস করতো, তুমি শোবে না?

হোসেন সাহেবের তখন সম্বিত ফিরে আসতো। বলতেন, আমার মরবার সময় নেই, এখন তুমি আমাকে শুতে বলছো?

—কিন্তু রাত দু'টো বাজলো যে ঘড়িতে!

শফিকুল সাহেব চোখ তুলে ঘড়ির দিকে দেখলেন। দেখলেন সত্যিই রাত দু'টো। বললেন, আমি টেরই পাইনি যে এত রাত হয়েছে।

তারপর একটু থেমে বললেন, তা তুমি কেন রাত জেগে কষ্ট করছো? তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই তো পারতে!

বেগম সাহেবা বললে, ঘুমিয়েই তো পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। তাই তোমাকে ডাকতে এলুম। এত রাত জাগলে যে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। কাল সকালে উঠতে-না-উঠতে তো আবার মক্কেলদের ভিড় শুরু হবে। এ-রকম করে খাটলে কী তোমার শরীর টিকবে।

শফিকুল হোসেন সাহেব বললেন, মৌলা সাহেব বলেছেন, এইটেই হচ্ছে খাটবার বয়েস। এখন খাটবো না তো আর কবে খাটবো?

বেগম সাহেবা বললে, তা বলে শরীর নষ্ট করে খাটবে?

শফিকুল সাহেব বললেন, প্রথম দিকে এই রকম সবাই-ই খাটে। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খাটুনিও কমবে, ফিসও বাড়বে।

বেগম সাহেবা বলতো, কিন্তু আমাদের তো তেমন অবস্থা নয় যে, টাকা উপায় না করলে আমরা উপোস করে থাকবো?

শফিকুল সাহেব বলতেন, উপোস করার কথা হচ্ছে না। মতিলাল নেহেরু যে প্র্যাকটিশ করতেন, সে কী টাকা উপায় করবার জন্যে? গান্ধী যে প্র্যাকটিশ করতেন, সে কী টাকা উপায় করতে? সি-আর-দাশ যে প্র্যাকটিশ করতেন, সে কী টাকা উপায় করতে? ইজ্জতটার কথা ভাবো! সেই ইজ্জৎ নিয়েই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের তফাৎ! আর বেশি কিছু নয়। আমি সেই ইজ্জতের জন্যেই এত খাটছি!

—কিন্তু আগে তো শরীর!

শফিকুল সাহেব বলতেন, শরীরের কথা রেখে দাও। এখন বয়েস কম, যত পারি ততো খেটে নিই। তারপর তো সমস্ত জীবনটা সামনে পড়ে আছে।

সত্যি বেশি কথা বলবার সময় থাকতো না হোসেন সাহেবের। বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাও যেন একটা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। আগে তাঁর প্রফেশনের ইজ্জৎ। তারপরে আর সব কিছু। ইজ্জৎ মানে সব উকিলের মাথার ওপরে ওঠা। সবাই যেন এক ডাকে চিনতে পারে। সবাই যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে—কাকে ব্রীফ্ দিয়েছ? উত্তরে কেউ যদি বলে—হোসেন সাহেবকে, তখন লোকে বুঝবে যোগ্য লোককেই ব্রীফ্‌টা দেওয়া হয়েছে।

সংসারে লোক কী চায়? টাকা?

কিন্তু যার পর্যাপ্ত টাকা আছে, সে কী চায়?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সেই পাওয়াতেই মানুষের চরম আনন্দ, যে-পাওয়ার মধ্যে কিছু না-পাওয়া জড়িত থাকে। অর্থাৎ পরমার্থ!

যে টাকা চায় তার টাকা পাওয়া হয়ে গেলেই সে কৃতার্থ। যে খেতে চায়, তার খাওয়া হয়ে গেলেই সে কৃতার্থ!

কিন্তু এমন মানুষও সংসারে আছে, যার সব কিছু পাওয়ার পরও মনে হয় যেন তখনও কিছু পাওয়া বাকি রইল!

শফিকুল হোসেনও সেই জাতীয় লোক। তাই মিস্টার মৌলার জুনিয়ার হয়ে অনেক মামলায় জিতেও পুরো তৃপ্তি হতো না। তাঁর কেবল মনে হতো আরো মামলা আসুক তাঁর হাতে, আর তিনি সবগুলোতেই জিতুন। হারবার কথা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না। জয়েরও একটা যেন নেশা আছে।

মিস্টার মৌলা বলতেন, ভবিষ্যতে তুমি খুব বড় ল' ইয়ার হবে হোসেন, যদি এই রকম নিরলস পরিশ্রম করতে পারো।

হোসেন সাহেব বলতেন, এখন আমি দিনে বাইশ-তেইশ ঘণ্টাও খাটি স্যার, আর কত খাটবো?

মিস্টার মৌলা বলতেন, না-না, ওতেই যথেষ্ট হবে! নিজের স্বাস্থ্য বজায় রেখে কাজ করবে!

হোসেন সাহেব বলতেন, এই-তো খাটবার বয়েস আমাদের। আপনি তো আমাদের মতন বয়েসে অনেক খেটেছেন!

মিস্টার মৌলা বলতেন, তা খেটেছি। খেটেছি বলেই তো আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। আমি এখন নিজে ব্রীফ্ নেওয়া কমিয়ে দিয়েছি।

গল্প বলতে বলতে কেশর শর্মা থামলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

—তারপর একটা কাণ্ড হলো। মিস্টার মৌলার কাছে একটা অদ্ভুত কেস এল। একটা নারী-ধর্ষণের কেস!

এই ধরনের কেস মিস্টার মৌলা সাধারণতঃ নিতেন না। প্রথমতঃ বিবেকে বাধতো, তার ওপর অন্যায়কে প্রশয় দেওয়া হতো!

শফিকুল হোসেন সাহেবের ডাক পড়লো।

হোসেন সাহেব এসে জিজ্ঞেস করলে, কী স্যার? ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

মিস্টার মৌলা বললেন, এই দ্যাখ, এরা কী বলতে চায়, এদের মুখ থেকেই শোন। আমি এদের ব্রীফ্ নেব না। আমি চাই তুমি এ কেসটা করো।

শফিকুল সাহেব চেয়ে দেখলেন পাশে বসে-থাকা ভদ্রলোকের দিকে। দেখে মনে হলো খুব বড়লোক এবং সম্ভ্রান্ত লোকও বটে।

হোসেন সাহেব ভদ্রলোককে নিজের চেম্বারে নিয়ে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আসামী পক্ষ না ফরিয়াদী পক্ষ?

ভদ্রলোক বললে, আসামী পক্ষ!

—আসামী কে?

ভদ্রলোক বললে, আমার ছেলে!

—আপনার ছেলে একলা? না, সঙ্গে আর কেউ আছে?

ভদ্রলোক বললে, সঙ্গে আরো দু'জন বন্ধু আছে! তাদের সবাইকে আমি জামিনে খালাস করে এনেছি।

—কী, কেসটা কী?

ভদ্রলোক বললে, নারী-ধর্ষণ!

হোসেন সাহেবের মুখটা কালো হয়ে এল। এই ধরনের কেসগুলো সাধারণত তিনি এতদিন এড়িয়ে এসেছেন।

তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন যান আপনি, কালকে সকালে ন'টার মধ্যে আপনি একবার আমার বাড়ি আসবেন। তখন সমস্ত কথা হবে।

ভদ্রলোক বললে, আপনি টাকার কথা ভাববেন না স্যার। আমার অনেক টাকা আছে। আপনার যা খরচ-খরচা লাগবে, সবই আপনাকে দেব। কারণ আমার ছেলের কন্‌ভিকশন হলে

আমাদের বংশের গায়ে কলঙ্ক লাগবে। এ কেসটা থেকে ছাড়া পেলেই আমি আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে দেব। সে বি-এ পড়ছে এখন। বুঝতেই তো পারছেন, এখন যদি ছেলের লম্বা জেল হয়ে যায়, তাহ'লে আমার কী হবে!

হোসেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আর দু'জন? তারা কী করে?

ভদ্রলোক বললে, তাদের জেল হলেও যা, আর না হলেও তাই। আমি বাড়িতে ছেলেকে খুব বকে দিয়েছি। খুব মেরেছি তাকে। কিন্তু একবার যখন পুলিশ কেসটা হাতে নিয়েছে, তখন মেরে তো কোন লাভ নেই। তাই আর কিছু কথা তাকে বলছি না এখন। এখন আপনিই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পারেন।

বলে ভদ্রলোক সত্যি-সত্যি হোসেন সাহেবের পা ছোঁবার জন্যে দু'টো হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হোসেন সাহেব বললেন, করছেন কী, করছেন কী? আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমানের পা ছুঁচ্ছেন?

ভদ্রলোক বললে, আমি হিন্দু-মুসলমানের কোন তফাৎ দেখি না। আমি মৌলা সাহেবেরও পা ছুঁয়েছি। আমার ওই এক ছেলে হোসেন সাহেব। ওর যদি এখন জেল হয়ে যায় তো, তখন আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচবো? আমার আশা ছিল হোসেন সাহেব যে আমি ছেলেকে ল' পড়িয়ে এ্যাডভোকেট তৈরি করবো, কিন্তু সঙ্গদোষে পড়ে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল। এখন একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন।

হোসেন সাহেব আর শুনতে চাইছিলেন না। কারণ তখন কোর্টে যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। ভদ্রলোক চলে গেল।

হোসেন সাহেবের বড় দুঃখ হতে লাগলো ভদ্রলোকের জন্য। একমাত্র ছেলের শোকে বাপের মন যে ভেঙে যাবে তা আশ্চর্যের নয়। কিন্তু বাপের কথা শুনে তাঁর যা মনে হলো তাতে বোঝা যায়, ছেলেই অন্যায় করেছে এবং দোষী।

কোর্টে গিয়ে হোসেন সাহেব মিস্টার মৌলাকে একলা পেয়ে বললেন, স্যার, আমাকে আপনি এ কী কেস দিয়েছেন?

মিস্টার মৌলা বললেন, কেন?

হোসেন সাহেব বললেন, এটা তো দেখছি একটা রেপ্ কেস?

মিস্টার মৌলা বললেন, তাতে কী হয়েছে? তুমি তো টাকা পাবে! আর ভালো টাকাই পাবে! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

মিস্টার হোসেন বললেন, টাকাটাই কী সব স্যার? আমি তো টাকার জন্যে এ-লাইনে আসিনি! আমি চেয়েছিলাম মানুষের উপকার করতে!

মিস্টার মৌলা বললেন, এতেও মানুষের কল্যাণ করা হবে।

হোসেন বললেন, কিন্তু এই ছেলেগুলো তো বখাটে। এদের বাবা-মায়েরা মনে যত কষ্টই পাক, কিন্তু এরা তো পাপ করেছে, এদের তো শাস্তি হওয়াই উচিত!

—কী করে বুঝলে যে এরা দোষী, এরা পাপ করেছে?

—এদের মধ্যে একজনের বাবা আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি বলে গেছেন! সব স্বীকার করে গেছেন। তিনি বলে গেছেন তাঁর ছেলের দ্বারা সব রকম পাপ করাই সম্ভব। কিন্তু তবু তাকে জেল থেকে বাঁচাতে হবে! আমি জেনে বুঝে এ-কেস নিতে পারবো না।

মিস্টার মৌলা বললেন, তুমি আমার কাছে এতদিন কাজ করে এই কথা বলছো?

হোসেন সাহেব বললেন, কিন্তু আমার বিবেকে যে বাধছে! বিবেক বড় না টাকা বড়?

মিস্টার মৌলা বললেন, বিবেকও বড় নয়, টাকাও বড় নয়, বড় হচ্ছে এভিডেন্স। তুমি ব্রীফ্ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। যদি এভিডেন্স পাও যে ছেলেরা দোষী, তখন হোক তাদের শাস্তি, সে হাকিম বুঝবে, তুমি বিচার করবার কে?

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। সিনিয়ারের কথার বেশি প্রতিবাদ করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া মিস্টার মৌলা প্রবীণ আইনজীবী। জীবনে তিনি অনেক কেস করেছেন, বেশির ভাগ কেসেই তিনি জিতেছেন। যখন দেখলেন হোসেন সাহেব আর কোনও প্রতিবাদ করলেন না তাঁর কথার, তখন শান্তভাবে বোঝালেন—আইন জিনিসটা কী। আইনে সত্য-মিথ্যার কোন স্থান নেই। উকিল হচ্ছে নিবপেক্ষ। সে শুধু এভিডেন্স দেখবে। এভিডেন্স মানে প্রমাণ। তুমি যা-কিছু চোখের সামনে প্রমাণ পাবে, তাই নিয়ে কাজ চালাবে। তার একচুল বেশিও নয়, একচুল কমও নয়। তোমার জানবার অধিকার নেই—তুমি ন্যায়ের পক্ষে প্লিড করছো, না অন্যায়ের পক্ষে ওকালতি করছো। তুমি এ্যাডভোকেট, তুমি শুধু আইন মানবে। আইন ছাড়া আর কিছু তোমার ভাববার দরকার নেই!

হোসেন সাহেব মিস্টার মৌলার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন, কোনও প্রতিবাদ কবলেন না।

বাড়িতে আসতেই বোজকার মত স্ত্রী এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? এ-রকম চেহারা কেন তোমার? কী হয়েছে?

হোসেন সাহেব বললেন, না, কিছু হয়নি।

বেগম সাহেবা বললেন, নিশ্চযই কিছু হযেছে। না হলে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

হোসেন সাহেব বললেন, জানো, মিস্টাব মৌলা আমাকে আজ যা বললেন, তা শুনে আমার মন বড খাবাপ হয়ে গেছে।

—কেন, কী বলেছেন?

হোসেন সাহেব বললেন, সে তুমি বুঝবে না। আমার কাছে আইন আর বিবেক একই জিনিস, কিন্তু ওঁর কাছে তা নয। ওঁর কাছে আইনই বড। ওঁব মতে আমি এ্যাড্‌ভোকেট, আমি ন্যায বা অন্যায কিছুই দেখবো না, আমি শুধু আইনের স্বার্থ দেখবো!

বেগম সাহেবা তাতেও কিছু বুঝতে পাবলে না। বললে, তাব মানে?

হোসেন সাহেব বললেন, তাব মানে তুমি বুঝবে না।

বলে তাঁব নিজেব ব্রীফটা নিযে আবাব পডতে লাগলেন।

প্রত্যেক মানুষেব একটা বাস্তব জগৎ আছে, আর আছে একটা তার ইচ্ছেব জগৎ। খুব কম ক্ষেত্রেই বাস্তব জগতেব সঙ্গে এই ইচ্ছেব জগৎ মেলে। বাস্তব মানুষকে বলে—এটা কবো না, এতে তোমাব খাবাপ হবে, এটা করা দোষনীয়। আব ইচ্ছের জগৎ কেবল বলে—তোমার ইচ্ছেটা পূরণ কবে নাও যে-কোনও উপায়ে। তোমার যদি খাবার ইচ্ছে হয় তো পেট ভরে খেয়ে নাও। বেশি খেলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, সে-কথা কল্পনা করে খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হযো না। ইচ্ছে জগৎ আরো বলে—তোমার যদি আগুনে হাত দিতে ইচ্ছে হয়, তাহলে আগুনেই হাত দাও। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করবে, এ-কথা ভেবে ইচ্ছের আনন্দ থেকে বিবত হযো না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, আনন্দটা চিরকালেব।

এই ইচ্ছের জগতেব হাতছানিতেই একটা শহরে একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বড় করুণ বড কলঙ্কময় সে দুর্ঘটনা। একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ের জীবনে গভীর গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। মেয়েটাকে পুলিশ যখন উদ্ধার করল, তখন তার যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে।

ওই যে বললুম ইচ্ছে। মানে ইচ্ছের জগৎ।

তা ছাড়া ইচ্ছের আবার সু আছে কু আছে। ছেলেগুলো বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করে আসছিল যে, ইস্কুল থেকে একটা মেয়ে অন্য মেয়েদের দল ছেড়ে একটা রাস্তার মোড়ের মাথায় এসে একলা বাড়ির দিকে যায়।

কয়েকদিন লক্ষ্য করলে সবাই। সবাই মানে তিনটে বখাটে ছেলে। বুধুয়া, চৌবে আর রামখেলাওন। তিনজন হরিহর-আত্মা বন্ধু। বাপেদের টাকা আছে, পেট চালাবার সমস্যা নেই, বাপের হোটেলের তিনটে অপোগণ্ড-অপদার্থ জীব। বাড়ি থেকে বের হয় একসঙ্গে। তারপর কোন্ দিকে কোথায় যাবে ঠিক থাকে না কোনদিনই। রাস্তায় যখন সাইকেল-রিক্‌শাগুলো যায়, তখন তাতে কোনও সুন্দরী আওরত থাকলে শিস্ মারে। নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গী করে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। তারপর আছে বাপেদের টাকায় কেনা সাইকেল। ওই সাইকেল চড়েই তারা বাস্তব জগৎ ছেড়ে ইচ্ছার জগতে বিচরণ করে। সেই জগতে তারাই বা কে, আর রাজা-মহারাজা, সম্রাটই-বা কে। তাদের ইচ্ছে পূরণে বাধা দেওয়াব কেউ নেই, অথচ হুকুম তামিল করবার জন্যে যে আইন-কানুন আছে, তাও তারা মানবে না। তাই তারা সম্রাট। কখনও ভাঙ খেয়ে তারা মত্ত হয়ে বেহেস্তের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, কখনও রাবড়ি-মালাই খেয়ে অমৃত-আস্বাদ করবার সাধ মেটায়।

এই-ই হলো এই ত্রিমূর্তির দৈনিক প্রোগ্রাম। বাপেদের কাছে হাত পেতে টাকা নেয়, তাতে তাদের লজ্জা করে না। কারণ বাপ যখন জন্ম দিয়েছে, তখন তাদের ভরণ-পোষণ করবার দায়িত্বও তাই বাপেদেরই। লেখাপড়া শেখবার জন্যে একদিন তারা স্কুলের ছায়া মাড়িয়েছিল, কিন্তু তখন আর তার পাশ দিয়েও যায় না। বাপেরা নিজেদের কাববার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সকাল থেকে কারবারে জম-জমাট খদ্দের, সে খদ্দের বিদেয় হয় রাত দশটার পর যখন শহব সিদ্ধির নেশায় বেঘোরে।

সিদ্ধি খাওয়াটা একদিন হয়ত পুজোর অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এখন সেটা নিত্য-প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

বুধুয়া, চৌবে আর রামখেলাওন সিদ্ধি আর ভাঙ খেয়ে গঙ্গাব ঘাটে বসে হাওয়া খায়। তার সঙ্গে আছে মালাই। মালাই-এর মিষ্টিতে আর সিদ্ধিতে মিলে নেশাটা জোবদার হয়ে ওঠে। তখন আবোল-তাবোল বকে তিনজনে। এক-একদিন বোম্বাইয়ে তৈরি সিনেমা দেখে উন্মত্ত হযে ওঠে। তখন সিনেমার ছায়াগুলো দেখে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে তিনজনকে ভেতরে-ভেতরে সুড়সুড়ি দেয়। তাদের মনে হয় তাদেরও অধিকার আছে অত্যাচার করবার। সিনেমায় নায়ক-নায়িকাদের যদি সামনে পাওয়া যেত, তাহ'লে তাদেরও অত্যাচাব করতে তাদের বাধতো না।

বুধুয়া বলতো, শালা দুনিয়াটা ভূমিকম্প হয়ে গুঁড়িয়ে গেলেই ভালো।

চৌবে বলতো, তাহ'লে তো আমরাও মারা যাবো রে!

রামখেলাওন বলতো, না, শুধু আমাদের তিনটে বাড়ি থাকবে, আর থাকবে কুমকুমের বাড়িটা!

কুমকুম! নামটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও আরাম। কিন্তু শুধু নামটা উচ্চারণ করে কী আশ মেটে?

চৌবে বললে, আজকে কী-রকম হলুদ রং-এর শাড়ি পরেছিল দেখেছিস?

হলুদ রং-এর শাড়ি পবলে যে কুমকুমকে কী চমৎকার দেখায়, সে ব্যাপারে তিনজনেই একমত!

বুধুয়া বললে, আমি ওকে ডেকে বলে দেব!

—কী বলে দিবি?

—বলবো তুমি রোজ-রোজ হলুদ রং-এর শাড়ি পববে!

—বলতে তোর হিম্মত হবে?

—আলবাৎ হবে!

বুধুয়া বললে, তোর হিম্মত বোঝা গেছে, কুমকুমকে দেখলেই তোর হাত-পা-বুক কাঁপে, আমি দেখেছি।

—আর তোর বুঝি কাঁপে না?

—আমার হাত-পা কাঁপবে? আমি যদি ওকে একলা পাই তো জোর করে চুমু খেয়ে ফেলবো, দেখিস।

রামখেলাওন বলে, তোর মুখেই যত বড়াই! কাজের বেলায় তুই পিছিয়ে যাবি। তোকে চেনা আছে। এক চুমুক মাল খেয়েই তো তুই কুপোকাৎ।

বুধুয়া বলে, সত্যি ইয়ার, কুমকুমকে দেখলেই আমার যেন কেমন গা-হাত-পা হিম হয়ে আসে। মনে হয় ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি। ও যে রাস্তা দিয়ে যায় সেই রাস্তার ধুলোকেও চুমু খেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ওই রাস্তার ধুলোর ওপর গড়াগড়ি দিই।

বেকার ছেলে সব। বেকার হলেও পকেট কারো গড়ের মাঠ নয়। বাপেদের টাকায় পকেট ঝন্-ঝন্ করে। লেখাপড়া বেশিদূর হয়নি। লেখাপডা করবার দরকারই বা কী? কাউকে তো বড় হয়ে চাক্‌রি করতে হবে না। টাকার গাছ আছে। যত নাড়া দেবে, ততই টাকা ঝর-ঝর করে ঝরে পড়বে!

প্রথমে ওদের শুরু হয়েছিল গঙ্গার সিঁড়িতে বসে ভাঙ্ খাওয়া। ভাঙের নেশায় মত্ত হয়ে কুমকুমকে কল্পনা করে স্বপ্ন দেখা। স্বপ্নেতে কুমকুম তাদের পাশে এসে বসতো, তাদের সঙ্গে জড়াজড়ি করে ঢলাঢলি করতো। সেই রকম গলা-জড়াজড়ি করে তিনজনের সঙ্গেই শুতো। একটা কুমকুম তিনটে কুমকুম হয়ে উঠতো। সবাই শুয়ে-শুয়ে ভাবতো সে বুঝি কুমকুমের সঙ্গে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে আছে। যখন সকাল দশটা-এগারোটা বাজতো, তখন ডেকে-ডেকে ঘুম ভাঙাতে হতো!

বাপেরা কিছু বলতো না। বলবার সময়ও থাকতো না কারো। তারা ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে যে-যার দোকানে বেরিয়ে যেত। দোকান যত সকালে খুলবে ততই লাভ। খদ্দেররা ভোর থেকে আসতে শুরু করে। কাশীর খদ্দের মানে ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের লোক। তারা তীর্থ করতে আসে, আর তীর্থস্থানে এসে সওদাও করে নিয়ে যায়।

বাড়িতে ছেলে-মেয়ে-বউ কী করছে, তা দেখবার শোনবার ভাববার সময় থাকে না তাদের। তারা কেবল বোঝে টাকা আর টাকা।

কিন্তু একদিন তাদের টনক নড়লো। তিন বাপের বাড়িতেই একদিন পুলিশের দারোগা এসে হাজির হলো।

—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার খুবই খারাপ। বুধুয়া, চৌবে আর রামখেলাওন, তারা তিনজনই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। চৌকের একটা নিরিবিলি গলির ভেতর কুমকুমকে পাওয়া গিয়েছে। তার পরনে শাড়িটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

—কী ব্যাপার?

—তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

—কিন্তু কী করে এটা হলো?

দারোগা সাহেব বললেন, সকালবেলা যথারীতি কুমকুমও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু বিকেলবেলা থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার বাবা-মা বিকেলবেলা তার জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগল। যেমন অন্যদিন অপেক্ষা করে। বিকেল পাঁচটা বাজলো, ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো, তখনও ফেরে না দেখে খোঁজখবর

করতে শুরু করলে। শেষকালে কোথাও খবর না পেয়ে পুলিশের ফাঁড়িতে খবর দিলে। তারা সারা অঞ্চলটা তল্লাসী করলে। শেষকালে পরের দিন যে-স্কুলে কুমকুম পড়তো, সেখানেও গেল। কিন্তু তারাও কিছু জানে না।

শেষকালে সঙ্কটা দেবীর মন্দিরের পেছনে একটা নিরিবিলি অন্ধকার জায়গায় পাওয়া গেল কুমকুমকে। রক্তে তার শাড়িটা তখন কয়েক জায়গায় ভিজে গেছে। তার তখন জ্ঞান ফিরেছে। সে সেখানে তখন বসে-বসে কাঁদছে। কী করবে, কোথায় যাবে, কার সাহায্য নেবে!

সেই অবস্থায় কারা বুঝি তাকে দেখতে পেয়েছে। তারপর কী সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছে—কে তুমি মা?

কুমকুম কাঁদতে লাগলো! কী করে বলবে কে সে!

সবাই জিজ্ঞেস করলে, তোমার এ-রকম অবস্থা করলে কে?

কুমকুম বললে, আমি তাদের চিনতে পারিনি। তারা কাপড় দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দিয়েছিল, চোখ চেপে ধরেছিল।

—তারপর?

—তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আর কিছু জানি না!

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—সঙ্কটার মন্দিরের গলির ভেতরে।

—বাড়িতে পরে যাবে, আগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

পৃথিবীতে যেমন খারাপ দুশ্চরিত্র লোকও আছে তেমনি আবার সচ্চরিত্র লোকেরও অভাব নেই। তারাই কুমকুমকে কোন রকমে ধরাধরি করে কাছের হাসপাতালে নিয়ে গেল। তারপর চৌকের পুলিশের ফাঁড়িতে গিয়ে খবর দিলে।

পুলিশের দারোগার কাছে আগেই খবর পৌছেছিল। তারা হাসপাতালে গিয়ে দেখলে সত্যিই তাই। নাম-ধাম-ঠিকানা সব মিলে যাচ্ছে।

তখন কুমকুমের বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে। কুমকুমের মা তো খবরটা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। বাপ বড় রগ্‌চটা লোক। বললে—অমন হাউ-হাউ করে কাঁদছো কেন? লোক-জানাজানি হয়ে যাবে যে!

মা বললে—লোক জানাজানিটাই তোমার কাছে বড় হলো? আমার মেয়েটা যে মরে গেল, তা তুমি একবার ভাবলে না?

এর ক'দিন পরেই পুলিশের দারোগা আবার বাড়িতে এল। বললে—আপনার মেয়ে ভালো আছে—

বাপ বললে—আমাদের বাড়িতে আমরা কী করে তাকে তুলবো?

দারোগা সাহেব বললেন—আপনার বাড়িতে এখন তাকে আসতে দেব না। এখন মামলা হবে।

—মামলা?

—হ্যাঁ, মামলা।

—কাদের সঙ্গে মামলা?

দারোগা সাহেব বললেন—যারা আপনার মেয়ের এই সর্বনাশ করেছে, তারা যে সবাই ধরা পড়েছে। তাদের আসামী করে আমরা মামলা করবো। আপনাদের একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না। সব খরচ গভর্মেন্টের।

মামলা হবার নাম শুনে বাপ-মায়ের মন আরো খারাপ হয়ে গেল।

মামলা হওয়া মানেই তো খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হওয়া। তাতে তো কেলেঙ্কারীর একশেষ! তাতে তো আরো জানাজানি হয়ে যাবে। যারা এখনও ঘটনার কথা জানেনি, তারাও

খবরের কাগজ পড়ে জেনে যাবে। আত্মীয়-স্বজনেরা এসে জিজ্ঞেস করবে—কী হয়েছিল দিদি? কুমকুমের কী হয়েছিল? আমরা তো কিছুই শুনিনি!

শুধু কি তাই? শেষকালে ঐ মেয়ের তো একদিন বিয়েও দিতে হবে!

এত কাণ্ডের পর কে ঐ মেয়েকে বিয়ে করবে?

বাপ-মায়ের যতটা না উদ্বেগ মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্যে, তার চেয়ে বেশি উদ্বেগ মেয়ের চরিত্রের আর বংশের বদনামের জন্যে!

তারপর কুমকুমের আরো একটা ছোট বোন আছে। একদিন সেও বড় হবে। তখন তার বিয়ের সময়ও কথা উঠবে। এমন একটা মুখরোচক খবর পেলে কেউ কি ছাড়বে? পাড়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে তবে তাদের শান্তি!

সত্যিই বড় হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা মহল্লায়। কেস্‌টা কোর্টে উঠলো।

মানুষের ভিড়ে কোর্টে পুলিশ পর্যন্ত ঢুকতে পারে না এমনি অবস্থা।

—হঠো, হঠো সব, হঠ্ যাও—

কিন্তু কে হঠবে? সকলেরই আগ্রহ যাকে দেখবার, সে তখন নিজের মুখটা শাড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছিল কুমকুমের। লজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শাড়ির ফাঁক দিয়ে সে চেয়ে দেখলে লোকে-লোকারণ্য চারিদিকে। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে এল।

আর যারা আসামী, তারা তখন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশের দারোগা মামলা শুরু করলেন। লম্বা বক্তৃতা। সবাই চুপ করে শুনতে লাগলো সে বক্তৃতা।

মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন আসামীদের পক্ষে উঠে দাঁড়ালেন।

মোহাম্মদ শফিকল হোসেনের সিনিয়ার মহম্মদ মৌলাব কথামত কেসটা তিনি হাতে নিয়েছেন। মোহাম্মদ শফিকুল হোসেন শুধু একজন বিচক্ষণ এ্যাডভোকেটই নন, বড় ধার্মিক মুসলমান। মামলাটা যখন তাঁর হাতে এল, তিনি আসামীদেব বাপেদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

তাঁদের কথা শুনে মনে হলো ছেলেদের সম্বন্ধে বাপেরা কিছুই খবর রাখেন না। ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা খবরই রাখেন না ছেলেবা কী করে সারাদিন?

একজন বললে—আমাদের সময় কোথায় ভকীল সাহেব? আমরা আমাদের কারবার নিয়ে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকি, তার মধ্যে ছেলেরা কী করছে, তা দেখবার সময় কোথায় পাব বলুন?

—তাহ'লে তাদের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিন!

সবাই বললে—তা যদি করতে পারতুম তাহ'লে তো ভালোই হতো। অনেক বলেছি আমরা, কিন্তু তারা কিছুই শোনে না।

শফিকুল সাহেব বললেন—তাহ'লে তো কোর্ট সে-কথা শুনবে না। এখন আমি কিছু করতে পারবো না—

ভদ্রলোকেরা বড় মুশকিলে পড়লো।

বললে—আপনি যত টাকা লাগে নিন, আমাদের বাঁচান—

শফিকুল সাহেব বললেন—আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না—আমি টাকার জন্যে কেস্ নিই না। নেহাত আমার সিনিয়ার বলেছেন বলেই এই ব্রীফ্‌টা নিয়েছি—

সত্যিই তাই! মিস্টার মৌলার কথা অমান্য করতে পারেননি শফিকুল সাহেব। শফিকুল সাহেব নিজের জীবনে টাকা উপায় করবার জন্যে এ লাইনে আসেননি। ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের মানুষ শফিকুল সাহেব। পৈত্রিক সম্পত্তিও তাঁর অনেক ছিল। তাঁর আদর্শ ছিল বড় মহৎ।

এদিকে পারিবারিক দিক থেকে সুখী মানুষ। নিজের ধর্ম অনুযায়ী রোজ সন্ধেবেলা নামাজ পড়তেন। ওকালতিতে বাবাই ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

বাবা বলেছিলেন, দেখ বাবা, পেশার দিক থেকে এ-রকম পেশা আর নেই। সমাজের উপকার করতে হলে ওকালতিই সবচেয়ে বেশি উপকারী। শোষিত মানুষের সেবা করার পক্ষে এই পেশাই সবচেয়ে উপযুক্ত।

সিনিয়ার মিস্টার মৌলা ছিলেন ভালো গুরু। তাঁর মত ধার্মিক লোকও এ লাইনে বিরল। একবার তিনি মৌলা সাহেবকে জিজ্ঞেস করছিলেন, কী করলে আপনার মতো ভালো আইনজীবী হওয়া যায়?

মৌলা সাহেব উত্তরে বলেছিলেন, দেখ, এ লাইনের খারাপ দিকও আছে, আবার ভালো দিকও আছে। কিন্তু ল'ইয়ার হিসেবে যা তুমি দেখতে পাবে, তাই-ই তোমার মূলধন করা উচিত। ন্যায় বা অন্যায় দেখা আমাদের কাজ নয়। তারপর আর একটা দামী কথা বলেছিলেন, ভাল ল'ইয়ার হতে গেলে সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাওয়া চাই, গান শুনে আনন্দ পাওয়া চাই, তবেই ভালো ল'ইয়ার হওয়া যাবে।

শফিকুল সাহেব সারা জীবন সেই কথাই মেনে এসেছেন। ছবির এক্জিবিশন দেখেছেন, গানের জলসা শুনেছেন আর অবসর পেলেই ক্লাসিক সাহিত্য পড়েছেন।

শফিকুল সাহেবের ধর্মভীরু মন কেবল চেয়েছে মানুষের তথা সমাজের ভালো করতে। জীবনে কখনও তিনি টাকার লালসা করেননি। তিনি জানতেন খ্যাতির সঙ্গে টাকাও জড়িয়ে থাকে একাকার হয়ে। খ্যাতি হলে টাকা আসবেই। সুতরাং এ্যাড্‌ভোকেট হিসেবে যাতে তাঁর খ্যাতি হয়, তিনি সেই চেষ্টাই করতেন।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় রোজ একদল ভিখিরি বসে থাকতো তাঁর গেটের সামনে। তারা অপেক্ষা করতো তাঁর গাড়ি বেরোবার জন্যে। তারা জানতো তিনি কাউকে নিরাশ করবেন না। ঠিক নিয়ম করে সকাল সাড়ে দশটার সময় শফিকুল সাহেবের গাড়ি বেরোবে। তাঁর ড্রাইভার গেটের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দিত খানিকক্ষণের জন্যে।

গাড়িটা দাঁড়াতেই শফিকুল সাহেব পকেট থেকে খুচরা পয়সা বার করে প্রত্যেকের হাতে দেন। কাউকে নিরাশ করেন না। এটা তাঁর নিত্য-কর্ম। এতে তাঁর মন খুশীতে ভরে যায়। তখন তাঁর বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবাও এমনি করতেন। তবে রোজ নয়, রোজার সময়। রোজার মাসে তিনি রোজ ভিখিরিদের পয়সা দান করতেন। তাতে হিন্দু-মুসলমানের কোন তফাৎ করতেন না। যে এসে তাঁর সামনে হাত পেতে দাঁড়াতো, তাকেই তিনি তাঁর সাধ্যমত দান করতেন।

বাবা বলতেন—এতে আল্লা খুশী হয়।

শফিকুল তখন ছোট। বলতো—আল্লা খুশী থাকলে কী হয় আব্বাজান?

বাবা বলতেন—আল্লা খুশী হলে মানুষের ভাগ্যও খুশী হয়। মনে আনন্দ থাকে। তার কোনও দুঃখ থাকে না। আল্লাহ্-তালাই এই দুনিয়ার মালিক।

ছোটবেলাকার বাবার কাছে শোনা এই কথাগুলো বড় হয়েও শফিকুল সাহেবের মনে ছিল। তাই ওকালতি করতে গিয়েও এ-সব কথা কখনও তিনি ভোলেন নি। কোর্টে গিয়ে কত রকম লোক কত অন্যায় কাজের জন্যে তাঁকে ব্রীফ্ দিতে এসেছে, কত মোটা-মোটা টাকা দিতে এসেছে, কিন্তু তাদের তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। বলতেন, পাপ করবার সময় মনে ছিল না, আর এখন এসেছেন আমার কাছে? যান চলে যান আমার সামনে থেকে, নইলে অপমান করে তাড়িয়ে দেব আপনাকে।

মক্কেলরা তাঁর কথা শুনে ভয়ে পালিয়ে যেত। তখন অন্য উকিলরা সে-সব ব্রীফ্ লুফে নিয়ে নিত।

কেশর শর্মা গল্প করতে করতে থামলেন। আমি বললাম, তারপর?

কেশর শর্মা বললেন, শফিকুল হোসেন সাহেবকে তাই সবাই ভয় করতো। তাই যখন মিস্টার মৌলা তাঁকে এই ব্রীফ্‌টা নিতে বললেন, তখন তিনি একটু দ্বিধা করেছিলেন। কিন্তু সিনিয়ারদের অনুরোধ এড়ানো শক্ত। মক্কেলরা জানতো মিস্টার মৌলাকে ধরলেই শফিকুল হোসেন সাহেবকে রাজি করানো যাবে।

বড়-বড় টাকাওয়ালা লোক সব আসামীপক্ষ। তারা জানে টাকা দিয়ে সংসারে সব কিছু কেনা যায়। সারা জীবন তারা তাই-ই করে এসেছে। টাকা দিয়ে কোর্টের মুহুরি, পেশকার, পুলিশ সকলকে কিনে এসেছে। টাকা দিলে দুনিয়াটাও কেনা যায়, এইটেই তাদের বদ্ধ ধারণা।

শফিকুল হোসেন সাহেব ব্রীফ্‌টা পড়ে বুঝতে পারলেন যে, আসামীরা দোষী। তাই ব্রীফ্‌টা নিয়ে সোজা মিস্টার মৌলার কাছে গেলেন। মিস্টার মৌলা অভিজ্ঞ ল'ইয়ার। জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম দেখলে ব্রীফ্‌টা?

শফিকুল হোসেন সাহেব বললেন, পুলিশ রিপোর্ট তো আসামীদের পক্ষে।

—তার মানে?

শফিকুল সাহেব বললেন, মনে হয় পুলিশ ঘুষ খেয়েছে।

—কী করে জানলে?

শফিকুল সাহেব বললেন, আসামীপক্ষ আমাকে মুখে বলেছে যে, তাদের তিনটে ছেলেই বখাটে মার্কা। তিনটে ছেলেই বাপের টাকায় ফুর্তি করে বেড়ায়। বাপ-মা'র কনট্রোলের বাইরে। তারা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তারা কোথায় যায়, কেন যায় এবং কখন ফেরে, তা কেউই জানতে পারে না। তাছাড়া তারা নেশা-ভাঙও করে। তা থেকে মনে হয় পুলিশ ঠিক রিপোর্ট দেয়নি।

মিস্টার মৌলা বললেন, তাহ'লে কেসটা তো পুলিশের বিপক্ষে যাবে।

শফিকুল সাহেব বললেন, তা জানি না। এই অবস্থায় আমার পক্ষে এ ব্রীফ্ নেওয়া কি ভালো?

মিস্টার মৌলা বললেন, তুমি যা এভিডেন্স পাবে সেইমত কাজ করবে! তুমি ল' ইয়ার, তোমার তো ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার অধিকার নেই।

মিস্টার মৌলা যখন বললেন তখন আর শফিকুল হোসেনের কোনও আপত্তি টিকলো না। তিনি কেসটা নিলেন। মক্কেলরা তার ফিস দিয়ে গেল।

এরপর কোর্টে শুনানীর দিন পড়লো। সেদিন কোর্টঘর লোকে লোকারণ্য। সবাই যেন মজা পেয়েছে। এমন ঘটনার নায়িকা আর নায়কদের দেখতে পাওয়ার লোভ কে ছাড়তে পারে?

কোর্টের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল আসামীর কাঠগড়ায় বুধুয়া, চৌবে আর রামখেলাওন। গালপাট্টা জুলফি। চেহারাগুলো দেখেই বোঝা যায় বাপের কুপুত্র সব। লাল, নীল, বিচিত্র সব পোশাক, এলিফ্যান্টা প্যান্ট। সিগারেট খেয়ে আঙুলগুলো সব হলদে হয়ে গেছে। বেপরোয়া সব ভাব তাদের।

কোর্টের ভেতর তাদের দেখে লোকের একরকম জৈবিক আনন্দ হয়। এ আনন্দ যে কেন তারা পাচ্ছিল, তা তারাই জানে। কিম্বা হয়ত এটাই স্বাভাবিক। যা নিজেরা ভোগ করতে

পারেন, তা যারা ভোগ করেছে তাদের চাক্ষুষ দেখেও এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। এও বোধহয় সেই রকম।

বিরাট কোর্ট রুম। একধারে আসামীদের অভিভাবকরা উদ্‌গ্রীব আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। তারা জানে না তাদের কপালে কী আছে। অগাধ টাকার মালিক তারা। কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় আজ তারা উকিল এবং জজ সাহেবের করুণার ওপর আত্মসমর্পণ করে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে।

পাবলিক প্রোসিকিউটারের অভিযোগের বিবরণ পড়া হলো। অভিযোগ এই যে—আসামীরা একটি স্কুলের বালিকার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এই তিনজন দুর্বৃত্ত তাকে নির্জন নিরিবিলি পুরনো বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে তাকে পর-পর তিনজনেই তিনবার ধর্ষণ করে। মহামান্য হাকিম এর যথাযোগ্য বিচার করুন।

লম্বা ফিরিস্তি। যখন পাবলিক প্রোসিকিউটার ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন সবাই নিস্তব্ধ। কারো মুখে একটা কথা নেই। তারাও উপভোগ করছে ঘটনার বিবরণ। হতভাগ্য মেয়েটি তখন মুখখানা ঢেকে ফেলেছে—যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। তার মুখের একটা ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশ দেখবার জন্যে লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তার যদি মুখের কিম্বা দেহের একটু অংশ দেখতে পায়, তাহ'লেই তারা যেন ধন্য হয়ে যাবে।

তারপর ডাক্তার তাঁর রিপোর্ট দিলেন। ডাক্তার নিজে রিপোর্ট পড়তে আরম্ভ করলেন। সে রিপোর্ট বড় মর্মন্তুদ, বড় করুণ। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছেন পুলিশের রিপোর্ট সত্যি।

কেশর শর্মা গল্প বলতে-বলতে থামলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? তারপর আসামীরা কি শাস্তি পেলে?

কেশর শর্মা বললেন, আসামীরা যদি শাস্তিই পাবে, তাহ'লে শফিকুল হোসেন সাহেব আসামী পক্ষের ব্রীফ্ নেবেন কেন?

—তারপর?

—তারপর মামলা চলতে লাগলো। সে কী ভিড় কোর্টের ভেতরে। যত দিন যায়, ভিড় ততো বেড়েই চলে। লোকের মুখে-মুখে এইসব আলোচনা চলতে লাগলো সব জায়গায়। চায়ের দোকানে, শুঁড়িখানায়, চাটের দোকানে, গঙ্গার ঘাটে, ক্লাবে, লাইব্রেরিতে, সর্বত্র এই একই প্রসঙ্গ।

সংসারে পরচর্চার মত মুখরোচক জিনিস আর কিছু নেই। অনেক মেয়ে ছিল স্কুলের। তাদের তো কেউ রেপ্ করে না?

একজন বিজ্ঞ লোক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সমাজ-সংসার সব গোল্লায় গেল ভাই। আজকাল আর ভালোর যুগ নেই। ভালো হওয়াটাই বড় পাপ হে।

বড় দুঃখের বড় লজ্জার দিন সে-সব। কুমকুমকে তখন পুলিশের হেফাজতে এক নারী কল্যাণ আশ্রমে রাখা হয়েছে। সেখানে মেয়েটা দিন-রাত কেবল কাঁদে। কান্নায় চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে। যেদিন কোর্টে কেস ওঠে, সেদিন তাকে লক্ষ-লক্ষ চোখের মধ্যমণি হতে হয়। তারপর যখন কোর্টের শুনানী শেষ হয়, তখন তারা হতাশ হয়ে যে-যার বাড়িতে চলে যায়।

আর কুমকুমের বাড়িতে?

কুমকুমের বাড়ি থেকে শুনানীর দিনে কেউ-ই কোর্টে আসতো না।

জগমোহনবাবুর মনে আগে ফুর্তি ছিল। আগে তিনি গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে আসতেন। জগমোহন দাস। বহুদিন আগে তিনি চাকরি সূত্রে এখানে এসেছিলেন। এসে ভেবেছিলেন শেষ জীবনটা এখানেই কাটাবেন। পেনসনের টাকা ক'টা ভরসা করে জীবন কাটিয়ে দেবেন। সংসারে দু'টি সন্তান। দু'টিই মেয়ে। একটি মেয়ের নাম কুমকুম আর একটি মেয়ের নাম চন্দ্রা। ভাবতেন, একটা ছেলে হলে ভালো হতো। বিয়ে করেছিলেন বেশি বয়সে। তাই সন্তানও হয়েছে শেষের দিকে!

গৃহিণী বলতেন, তুমি যে এখানে এলে, মেয়ে দু'টোর বিয়ে দেবে কী করে?

জগমোহনবাবু বলতেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনিই।

গৃহিণী বলতেন, কিন্তু বিয়ে? মেয়েদের বিয়ে তো দিতে হবে। মেয়েদের বিয়ে দিতে তো এক কাঁড়ি টাকা লাগবে। তখন? তখন টাকা পাবে কোথায়?

জগমোহনবাবু বলতেন, ওই যে বললুম, জীব দিয়েছেন যিনি, আহারও দেবেন তিনি।

গৃহিণী রেগে যেতেন। বলতেন, তোমার ওই ভগবান-টগবানের দোহাই ছাড়ো। আমার তো ভেবে-ভেবে রাত্তিরে ঘুম হয় না।

জগমোহনবাবু বলতেন, অত ভাবো কেন? মেয়ে হলেই-বা। মেয়েদের রূপ দেখেই লোকে বউ করে নেবে। ওদের বিয়েতে একটা পয়সাও খরচ হবে না। দেখে নিও।

গৃহিণী বলতেন, এখন কী সে-যুগ আছে যে তোমার মেয়েদের দেখে রাজপুত্তুররা এসে একেবারে রাণী করে নিয়ে যাবে? এই কলিযুগে ও-সব হয় না। এখন মেয়েদের রূপ থাকুক, আর গুণই থাকুক, টাকা খরচ না করলে বিয়ে হয় না।

জগমোহনবাবু বলতেন, তোমার রূপ দেখেই তো বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কি বিয়েতে একটা পয়সা যৌতুক নিয়েছিলুম?

—সে যুগের কথা ছেড়ে দাও।

জগমোহনবাবু বললেন, সে-যুগ এ-যুগ বলে কোনও তফাৎ নেই। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। কোনও না কোনও ছেলের বাপের নজরে পড়বেই। তখন দেখবে হঠাৎ কেউ আমার বাড়িতে এসে নিজে থেকেই তার ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেবে!

গৃহিণী বলতেন, ওই ভরসাতেই তুমি বসে থাকো। এদিকে মেয়ের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকে তো তোমার খেয়াল নেই। আমি মেয়ের মা হয়েছি, তাই মেয়ের ভালো-মন্দ সব আমাকেই দেখতে হয়। তুমি তো কেবল তোমার গঙ্গাচান আর পুজো-আচ্চা নিয়েই আছো।

জগমোহনবাবু বলতেন, তা কী করবো বলো? আমার কি টাকা আছে, না লোকবল আছে, যে আমি মেয়ের পাত্তোর খুঁজে বেড়াব?

গৃহিণী বলতেন, তাহ'লে যা করছো করো, হাত কোলে করে বসে থাকো!

এরপর স্বামী-স্ত্রীতে অনেকদিন আর এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হতো না। কুমকুম আর চন্দ্রা স্কুলে পড়তে যেত আর বাড়িতে ফিরে আসতো!

দিন-মাস-বছর এমনি করেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেত। ইতিমধ্যে একদিন সেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল! চন্দ্রা কাঁদতে কাঁদতে একলা বাড়িতে এসে হাজির হ'লো।

মা জিজ্ঞেস করলে, কী রে, তোর দিদি কোথায়? তার ইস্কুল ছুটি হলো না?

মেয়ে কিছু উত্তর দিলে না প্রথমে। কেবল কাঁদতেই লাগলো।

মা বললে, কী রে কাঁদছিস কেন? তোর দিদি কোথায় গেল বল?

চন্দ্রা বললে, দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে।

—কে ধরে নিয়ে গেছে? কোথায় ধরে নিয়ে গেছে?

চন্দ্রা বললে, তা জানি না। দিদির মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তিনজন কোথায় ধরে নিয়ে গেল।

—তিনজন? মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধরে নিয়ে গেল? তারা কারা?

—তা জানি না মা, গুণ্ডার মত চেহারা। তাদের চিনতে পারলুম না।

মা যেন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেল। বললে, কী সব্বোনাশ, তুই কিছু করতে পারলি না? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারলি না?

এরপর আর কিছু বললে না মা। একেবারে সোজা জগমোহনবাবুর ঘরে চলে গেল। জগমোহনবাবু তখন একমনে গীতা পড়ছিলেন।

- ওগো শুনছো?

তবু বোধহয় ধ্যান ভাঙলো না জগমোহনবাবুর। মুখ তোলবার আগেই গৃহিণী তাঁর গীতাটা টেনে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জগমোহনবাবু বললেন, করলে কী, করলে কী?

গৃহিণী বললেন, বেশ করেছি। ওটাকে আমি আজই উনুনের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। তুমি এদিকে গীতা পড়ছো, আর ওদিকে যে আমাদের সব্বোনাশ হয়ে গেছে!

—সব্বোনাশ! কী সব্বোনাশ আবার হলো?

—তোমার বড় মেয়ে কুমকুম বাড়ি ফেরেনি! ইস্কুল থেকে চন্দ্রা কাঁদতে কাঁদতে একলা ফিরে এসেছে। বলছে, তিনজন গুণ্ডা নাকি কুমকুমকে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কোথায় নিযে পালিয়ে গেছে!

জগমোহনবাবু একেবারে গীতার আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। কিন্তু ঘটনাটা শুনে কী যে করণীয়, তা বুঝতে পারলেন না। বললেন, তা আমি কী করব এখন?

গৃহিণী বললেন, তুমি কী করবে তা আমি মেয়েমানুষ হয়ে বলে দেব? তাহ'লে পুরুষ মানুষ হয়েছিলে কেন তুমি? মেয়ের বাপ হয়েছিলে কেন? যাও, এখন থানায় যাও, পুলিশে খবর দিয়ে এসো।

পুলিশ-কোর্ট-আদালত-উকিল, এ-সব কাজ জীবনে করেন নি জগমোহনবাবু। পুলিশের নাম শুনলেই তিনি বারবার ভয় পেয়ে এসেছেন। এখন কিনা ভাগ্যের ফেরে তাঁকে পুলিশের কাছেই যেতে হবে? সেখানে গিয়ে কী বলবেনই বা তিনি?

গৃহিণী বললেন, পুলিশকে কী বলতে হবে তাও কি সেই আমাকেই বলে দিতে হবে? তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে জানবে না, আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে জানবো! ওঠো, কী ভাবছো বসে-বসে? যদি কিছু না-ই জানবে তো মেয়ের জন্ম দিয়েছিলে কেন?

এরপর জগমোহনবাবু আর বসতে পারলেন না। বললেন, আমার জামাটা দাও, দেখি চেষ্টা করে থানাটা কোথায়?

জামাটা গায়ে দিয়ে জগমোহনবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেন। তারপর গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিলেন। রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে থানার ঠিকানা খুঁজে নিলেন।

কিন্তু থানার ভেতর ঢুকতে গিয়ে বুকটা দুর-দুর করতে লাগলো তাঁর। কী ঝামেলাতেই যে পড়েছেন তিনি। তাঁর মনে হলো যতদিন বিয়ে করেননি, সেই ক'দিনই সুখে কেটেছে তাঁর। কী দরকার ছিল তাঁর বিয়ে করবার। আর যদি বিয়ে করলেনই তো অত দেরী করে করলেন কেন?

থানার দারোগা কেসটা লিখে নিলেন। তাঁর ডিউটি তিনি করলেন।

জগমোহনবাবু বললেন, ওইটিই আমার বড় মেয়ে স্যার, দেখতে খুব সুন্দরী। আজ রাত্তিরের মধ্যেই তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন স্যার। নইলে আমরা পাগল হয়ে যাব। একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মেয়ের কোনো ফোটো দিতে পারেন?

—ফোটো? ফোটো তো নেই। কখনও তার ফোটো তোলাই হয়নি!

—ফোটো পেলে সুবিধে হতো আর কী! কিন্তু যাক্ গে, যখন ফোটো নেই তখন আর ভেবে কী হবে? অথচ কেন যে আপনার অমন সুন্দরী মেয়ের ফোটো তুলে রাখেননি, তা বুঝতে পারছি না। সব বাপ-মায়েরাই তো মেয়ের ফোটো তুলে রাখে, বিয়ের সময় কাজে লাগবে বলে।

জগমোহনবাবু বললেন, আমি সে-সব কথা আগে ভাবিই নি স্যার। আমি ভাবতাম মেয়ের রূপ দেখেই পাত্রের বাপেরা বিনা-খরচে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে।

পুলিশের দারোগাদের অত বাজে কথা শোনার সময় থাকে না।

বললেন, ঠিক আছে, ডায়েরি তো করে নিলাম। আপনার মেয়ের খোঁজখবর পেলে আপনার ঠিকানায় লোক গিয়ে জানিয়ে আসবে।

জগমোহনবাবু বাড়ি চলে এলেন। তখন সন্ধে উৎরে গেছে।

বাড়িতে আসতেই গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, কী, থানায় গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, এই সেখান থেকেই তো আসছি। দারোগাবাবু ডায়েরি লিখে নিলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন কুমকুমের ফোটো আছে কিনা। আমি বললুম কোনো ফোটো তোলানো হয়নি।

—তা দারোগাবাবু তো ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার মেয়েদের ফোটো তোলাওনি কেন এতদিন?

—তুমি তো কই কখনও ওদের ফোটো তোলার কথা বলোনি।

গৃহিণী বললেন, তুমি হলে পুরুষমানুষ, ও-সব তোমার কাজ! আমি মেয়েমানুষ হয়ে বলবো তবে তুমি তাই করবে? তোমার নিজের একটা বুদ্ধি-বিবেচনা নেই?

তারপর একটু থেমে বললেন, তা ডায়েরি করতে কত খরচা হলো?

—খরচা? ডায়েরি করবো তাতে আবার খরচা কী। ওইটেই তো পুলিশের ডিউটি।

গৃহিণী বললে, তা আজকাল বিনা খরচায় কিছু হয়? দারোগাবাবুর হাতে তুমি কিছু গুঁজে দিয়ে আসতে পারলে না?

জগমোহনবাবু বললেন, কই, দারোগাবাবু তো কিছু চাইলেন না।

গৃহিণী বললেন, ঘুষ কি কেউ মুখ ফুটে চায়, ওটা পকেটে গুঁজে দিতে হয়। এই সামান্য জিনিসটাও তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তবে তুমি বুঝবে?

জগমোহনবাবু বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

তারপর সে-রাতটা যে সে-বাড়িতে কী করে কাটলো, তা বাইরের লোক কেউই জানতে পারলে না।

মানুষের মৃত্যু হয়, মানুষের মাথাব ওপর দুর্যোগের ঘটা ঘনিয়ে আসে, মানুষের সমস্ত জীবনটা যন্ত্রণায় ছটফট করে, তবু মানুষের প্রাণ ভরে বাঁচবার চেষ্টায় এতটুকু ত্রুটি হয় না। সে নিজের জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা চালায়। অসখে ডাক্তার দেখায়, বিপদে জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হয়। এইটেই রীতি। সেই উপনিষদের যুগ থেকে এই-ই চলে আসছে। তবু মানুষ আশা ছাড়ে না। মানুষ আশা কবে একদিন তার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে। একদিন তার জীবনে দুঃখের মেঘ কেটে যাবে। একদিন সে সুখী হবে।

কিন্তু সুখ? সুখের ব্যাখ্যা কী? এক অভিধান ছাড়া সুখের ব্যাখ্যা কি কোথাও আছে?

জগমোহনবাবু আর পাঁচজনের মতো সুখ চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন সন্তানদের বিয়ে

হয়ে গেলেই তিনি সুখী হবেন। পেন্‌সনের টাকায় তাঁর কোনও অভাব থাকবে না। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন ঐ পেন্‌সনের টাকাতেই তাঁর কেটে যাবে।

কিন্তু অত সহজ নয় কারো জীবন। সে কোটিপতিই হোক আর সাধারণ মানুষই হোক, সকলের জীবনই জটিল। এই জটিলতার জট্ ছাড়ানোর প্রয়াসের মধ্যেই মানুষের জীবনের মহা-ইতিহাস।

জগমোহনবাবুর ভাগ্য ভালো, মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল পরদিনই, কিন্তু পাওয়া না গেলেই বুঝি ভালো হতো। একটা ভাঙ্গা পরিত্যক্ত মন্দিরের মধ্যে অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় সে পড়ে ছিল। পুলিশ এসে তাকে সেই অবস্থায় স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে গেল হাসপাতালে। রক্তে তার কাপড় ভেসে গেছে।

তারপর জগমোহনবাবুর বাড়িতে খবর পাঠালে পুলিশ। জগমোহনবাবু খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী করবো আমি?

—আপনি আর কী করবেন, মেয়েকে যদি দেখতে চান তো আপনার স্ত্রীকে নিয়ে দেখতে যেতে পারেন।

—তারপর?

—তারপর আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা হবে। আসামী তিনজনকে আমরা ধরেছি।

—মামলা করতে গেলে তো খরচা আছে। আমার তো অত টাকা নেই।

পুলিশ বললে, আপনার কোন খরচ লাগবে না। পুলিশ সব খরচ দেবে। হাসপাতালের খরচও পুলিশ থেকে দেওয়া হবে। আর আপনার উকিলের খরচাও লাগবে না। সমস্ত খরচ করবে পুলিশ।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর জগমোহনবাবু তখন থর-থর করে কাঁপছেন।

গৃহিণী দেখতে পেয়ে বললেন, কী গো, অত কাঁপছো কেন? পুলিশ কী বলে গেল? কুমকুমকে পাওয়া গেছে?

জগমোহনবাবু বললেন, হ্যাঁ, পুলিশ তাকে খুঁজে পেয়েছে।

—তা খুঁজে পেয়েছে, সে তো ভালো কথা। কবে বাড়ি আসবে?

—সে তো হাসপাতালে রয়েছে।

—কেন?

জগমোহনবাবু বললেন, আমি ভাবছি তাকে কি ঘরে আনা ভালো হবে। সে তো নষ্ট হয়ে গেছে। তিনজন গুণ্ডা মিলে তাকে শারীরিক অত্যাচার করেছে।

গৃহিণী চিন্তিত হলেন। বললেন, তাও তো ভাববার কথা।

—সেই জন্যেই তো আমিও ভাবছি। চন্দ্রার তো বিয়ে দিতে হবে। তখন? তখন যদি লোকে শোনে যে তার বড় বোন নষ্ট হয়ে গেছে, তাহ'লে কি পাত্র মিলবে?

—তাহ'লে কী হবে?

জগমোহনবাবু বললেন, তাই তো আমিও ভাবছি তাহ'লে কী করবো? হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখা করে আসবো?

গৃহিণী বললেন, না-না দেখা করতে যেও না। যা করবার পুলিশই করুক। পুলিশ আছে, ডাক্তার আছে, তারাই যা করবার করুক। এখন সেই মেয়েকে বাড়িতে আনলে পাড়ার লোকের কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

—তা আমারও তো সেই ভয় করছে।

—তা বলে জলজ্যান্ত মেয়েটা বেঘোরে মারা যাবে? তাহ'লে সে কোথায় যাবে?

জগমোহনবাবু বললেন, তবু ছোট মেয়েটার কথাও একবার ভাবো। তারও তো একদিন বিয়ে দিতে হবে।

জগমোহনবাবুর তখন মাথা ঘুরছে। নিজেই বললেন, না, আমি আর ভাবতে পারছি না। বলে সেখানেই খাটের ওপর বসে পড়লেন।

কুমকুম তখন কোর্টের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তার মুখখানা দেখতে চাইছে। যে মেয়ে ধর্ষিতা, তাকে দেখবার জন্যে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। শুধু দেখা নয়, কল্পনা করেও আনন্দ যে, অন্য লোকে ওই একজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এ একরকম অপ্রত্যক্ষ লাভ। আমি ভোগ করতে না পারি, কিন্তু আর কেউ তো সম্ভোগ করেছে, সেটাই কী আমার কম লাভ! ধর্ষণ করবার সময় কেমন করে গায়ে হাত দিয়েছে, কেমন করে তাকে ভাঙা মন্দিরের ভেতর চিৎ করে শুইয়ে ফেলে ধর্ষণ করেছে।

মানুষের ইতিহাসের আদি পর্ব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই ঘটনা কোটি-কোটিবার ঘটে এসেছে। নর-নারীর এই অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে অনেক কাহিনীও লেখা হয়েছে। আরব্য উপন্যাস আর কথাসরিৎ-সাগর তো এরই উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সব ঘটনার জন্যে কতবার কত লোক কত কঠোর শাস্তি পেয়েছে। তবু তার কোনও প্রতিকার হয়নি। হয়ত-বা হবেও না। তাই বার-বার এই নিয়ে কোর্টে কত মামলা উঠেছে। আর মাঝখান থেকে উকিল, মুহুরি-পেশকারের পকেট ভারী হয়েছে। সমস্যা যা ছিল তাই-ই রয়ে গিয়েছে। তার কোন হেরফের হয়নি।

ক'দিন ধরে শফিকুল হোসেন সাহেবের বেগম লক্ষ্য করছিলেন সাহেব যেন কেমন অন্যমনস্ক ভাবে থাকছেন। খেতে হয় বলেই খাচ্ছেন, কোর্টে যেতে হয় বলেই যাচ্ছেন। আর বাড়িতে প্রায় সমস্তক্ষণই আইনের বই মুখে নিয়ে বসে আছেন।

বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শরীর খারাপ?

শফিকুল সাহেব বললেন, কই, না তো।

—তাহলে তুমি সমস্তক্ষণ কী ভাবো?

শফিকুল সাহেব বললেন, একটা কেস নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছি।

এরপর খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। একটা মেয়ে ছিল শফিকুল সাহেবের। মাঝেমাঝে তার সঙ্গেও তিনি কথা বলতেন। কেমন তার লেখাপড়া চলছে, সব জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু সেদিন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

সেদিন রাত্রে আর তাঁর ঘুম এলো না। বারবার কুমকুমের চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগলো! কুমকুম ফরিয়াদি আর তিনি আসামী পক্ষের এ্যাডভোকেট। অহি-নকুল সম্পর্ক। কিন্তু দিনে-দিনে কোথায় বুকের-কোণে একটা সহানুভূতির অঙ্কুর ধীরে-ধীরে গজিয়ে উঠেছে। তিনি বার-বার মনে করতে চেষ্টা করতে লাগলেন এটা অন্যায়। তিনি আসামী পক্ষদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়েছেন তাদের জিতিয়ে দেবার জন্যে। এটাও সত্যিই অন্যায়। আসামীরা অন্যায় করেছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে তিনি নিজে বেশি অন্যায় করেছেন। তিনিই বড় অপরাধী, আসামীরা তত বড় অপরাধী নয়। কারণ তাদের তো বয়েস কম, কিন্তু তিনি তো বয়েসে অনেক বড়। তাঁর নিজের অনেক টাকা আছে, তাছাড়া তাঁর পৈত্রিক টাকা। তিনি জেনে বুঝে কেন এমন অন্যায় করলেন, কেন এমন অপরাধ করলেন।

সেদিন কোর্টের করিডোরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখা গেল মিস্টার মৌলার সঙ্গে। মিস্টার মৌলা জিজ্ঞেস করলেন, এ-রকম শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? তোমার কি শরীর খারাপ?

শফিকুল সাহেব বললেন, না, আমি নিজেকে গিল্‌টি—মানে নিজেকে অপরাধী মনে করছি।

মিস্টার মৌলা জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

শফিকুল সাহেব বললেন, আপনার জন্যে!

—আমার জন্যে? হাউ ইজ্‌ দ্যাট? আমি তোমার কী করেছি?

—আপনি তো স্যার সেই রেপ্‌ কেসের ব্রীফ্‌টা আমায় দিয়েছেন। নইলে আমি ও কেস ঘাড়ে নিতুম না।

মিস্টার মৌলা বললেন, এসো এসো, তমি আমার চেম্বারে এসো। দেখছি তুমি খুব একসাইটেড হয়ে উঠেছো।

বলে শফিকুল সাহেবের হাত ধরে তাঁর নিজের চেম্বাবে নিয়ে গেলেন।

তারপর তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলো তো কী হয়েছে?

শফিকুল সাহেব সব খুলে বলতে লাগলেন। বললেন, কেস আমার ফেভারে। আসামীরা সবাই খালাস পেয়ে যাবে।

—কী করে বুঝলে? এভিডেন্স কিছু পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—কী এভিডেন্স?

—আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, যেদিন ঐ রেপের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ দাবী করেছে, সেদিন আসামী তিনজনই এখানে ছিল না। তারা একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল।

—বিয়ে বাড়ির লোকজনের এভিডেন্স কী?

—তারাও সাক্ষী হয়ে কোর্টে এসে বলে গেছে আসামীরা সেদিন বিয়ে বাডিতেই ছিল, সকাল থেকে পবের দিন সকাল পর্যন্ত।

মিস্টার মৌলা বললেন, তাহ'লে জাজমেণ্ট তোমার ফেভারেই যাবে।

—তা-তো জানি স্যার, কিন্তু এও জানি যে আসামীরা সে বিযে বাড়িতে যাযনি। টাকা দিযে মিথ্যে সাক্ষী সাজানো হয়েছে।

—তাতে তোমাব কী করবার আছে? তুমি যেমন এভিডেন্স পাবে, তেমনই কববে।

শফিকুল সাহেব একটু থেমে গেলেন। কথা বলতে তাঁর একটু দেবী হলো। বললেন, না স্যার, দেখছিলুম এতদিন ধরে মামলা চলেছে, মেয়েটির বাবা-মা-বোন কেউ একদিনও কোর্টে আসছে না।

মিস্টার মৌলা বললেন, তারা না এলে তুমি কী করতে পারো? তুমি তো রোজ আর জোব করে তাদের কোর্টে আনতে পারো না।

শফিকুল সাহেব বললেন, মেয়েটাকে দেখে আমার বড কষ্ট হয স্যার। মেযেটা তো ইনোসেণ্ট।

—হোক ইনোসেণ্ট। তুমি শুধু তোমার এভিডেন্স নিয়ে কেসটা বিচার করবে। অত সেণ্টিমেণ্টাল হলে তুমি কিন্তু কোনওদিন বড় ল' ইয়ার হতে পারবে না।

শফিকুল সাহেব বললেন, কিন্তু তা জেনেও মনকে স্থির রাখতে পারছি না। আমিও তো একজন বাপ। আমারও ও'রকম একটা মেয়ে ছিল।

মিস্টার মৌলা বললেন, আমি তো জানি তোমার একটি মাত্র মেয়ে।

—না স্যার, আমার আবো একটা মেযে ছিল। সে ক্লাস টেন-এ পডতো। তার নামও ছিল কুমকুম। আমার স্ত্রী সাধ করে তার নাম রেখেছিল কুমকুম।

মিস্টার মৌলা বললেন, মুসলমানেব মেয়ের হিন্দু নাম?

—আমার স্ত্রী স্যার ইস্টবেঙ্গলের মেয়ে। আমার বিয়ে হয় এক ইস্টবেঙ্গল ফ্যামিলিতে।

—তারপর?

শফিকুল সাহেব বললেন, সে ক্লাস টেন-এ পড়তো। বড় ভালোবাসতুম আমি আমার মেয়েকে। ঠিক এই কুমকুমের মতই গায়ের রঙ ছিল সে মেয়ের। সে হঠাৎ মারা যায়। তারপর থেকেই আমার স্ত্রীর শরীর, মন সব কিছু খারাপ হয়ে যায়। বহুদিন তাকে সেন্ট্রাল হসপিট্যালে রাখতে হয়। আজ যে আসামীদের পক্ষে আমি ব্রীফ্ নিয়েছি, তারা সেই কুমকুমকেই রেপ্ করে তার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে, একথা আমি ভুলতে পারছি না।

মিস্টার মৌলা জিজ্ঞেস করলেন, তাহ'লে কী করবে ঠিক করেছো?

শফিকুল সাহেব বললেন, কেস করছি, কেসটা করেও যাবো।

—গুড্। ভেরি গুড্। তা তুমি কি ভাবো আসামীরা রিয়্যাল কালপ্রিট?

শফিকুল সাহেব বললেন, হ্যাঁ।

—তার জন্যে তোমার বিবেকে বাধছে না তো?

শফিকুল সাহেব বললেন, আমি বিবেকের গলার টুঁটি টিপে ধরে ডিফেণ্ড করে চলেছি।

—গুড্, ভেরি গুড্। তোমার জীবনে আবো উন্নতি হবে শফিকুল। আই উইশ ইওর অল সাকসেস! যদি পাবো তো তোমার নিজের পরলোকগতা মেয়ের কথা ভুলে যাও।

শফিকুল সাহেব বললেন, ভুলতে চেষ্টা তো করছি প্রাণপণে।

—তোমার স্ত্রীকে এ মামলার কথা যেন বোলো না। ফ্যামিলি ইজ ফ্যামিলি, প্রফেশন ইজ প্রফেশন। দুটোকে এক করে দিও না কখনো—তোমার মামলার কথা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কোনোদিন আলোচনা কর়ো না।

বলে মিস্টার মৌলা নিজের কাজে চলে গেলেন।

জগমোহনবাবুর দিন তখন আর কাটছে না। মেয়েকে নিয়ে মামলা হচ্ছে, পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাতে পাবছেন না। পাড়ার লোক বিশেষ করে পাড়ার মেয়েরা আসে।

বলে, তোমাদের মেয়ের খবর কী দিদি? কুমকুমের?

জগমোহনবাবুর গৃহিণী প্রশ্নটা শুনে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হন। কী জবাব দেবেন তিনি? মেয়ের কথা ভেবে বাত্রে ঘুম হয না, দিনেরবেলা কর্তাব মুখের চেহারা দেখলে ভয় লাগে। তবু একেবাবে সংসার বন্ধ থাকে না। রাতের অন্ধকাবে জগমোহনবাবু বাজাবের থলিটা নিয়ে যা হোক দুটো শাক-পাতা-আলু-কচু কিনে আনেন। কপালে যাই থাকুক, পেট তো তা বলে মানবে না। প্রকৃতি তার দাবি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে নেবেই। তাই এ সংসারের গৃহিণীকে রোজ উনুনে আগুন দিতে হয়, রান্নাও করতে হয়, খেতেও হয়।

এই রকম অবস্থায় একদিন দরজায় খটাখট করে শব্দ হলো। জগমোহনবাবু প্রথমে দরজা খুলতে চাননি। কিন্তু খটাখট শব্দ তখনও হয়ে চলেছে।

ভেতর থেকে তিনি বললেন, কে?

বাইরে থেকে কার গলার শব্দ শোনা গেল—আমরা নারী কল্যাণ আশ্রম থেকে আসছি।

নারী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে তাঁর কী প্রয়োজন, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। যে কথা তিনি ভুলতে চান সেই কথাই আবার শোনাতে এসেছে নাকি!

জগমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে দেখলেন, বাইরে 'নারী কল্যাণ আশ্রমে'র সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে আছেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার মেয়ের কথা বলতে এসেছি—আপনার মেয়ে কুমকুম

আপনার কাছে আসতে চায়। বাপ-মাকে সে দেখতে চায় বড্ড, তার একটা ছোট বোন আছে, তাকেও সে দেখতে চায়।

জগমোহনবাবু রেগেই ছিলেন। এ-কথা শোনার পরে আরো রেগে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলেন ঝপাং করে। ভদ্রলোকেব সঙ্গে আর কোনও কথা বলার দরকার মনে করলেন না।

কিন্তু কী ভেবে আবার দরজা খুললেন। বললেন, আমার মেয়েকে বলবেন, সে আমাদের কেউ নয়। আমরা তাকে ভুলে গিয়েছি!

বলে আবার শেষবারের মতো ঝপাং করে দরজাটা বন্ধ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। গৃহিণীও এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা আবার এসেছিল?

জগমোহনবাবু বললেন, হ্যাঁ, দ্যাখো না, বলে কিনা মেয়েকে দেখতে যেতে, আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি সে আমাদের কেউ নয। আমরা তাকে ভুলে গিয়েছি।

গৃহিণী বললেন, বেশ করেছ, ঠিক করেছ।

কেশর শর্মা গল্পটা বলছিলেন। এবার একটু দম নিলেন। বললাম, তারপর?

কেশর শর্মা বললেন, তাবপর একদিন মামলার রায় বেরলো।

—কী রায দিলেন জজসাহেব?

কেশর শর্মা বললেন, আসামীবা বেকসুর খালাস।

—সে কী?

—কেশর শর্মা বললেন, হ্যাঁ, টাকার জোব থাকলে আজকেব যুগে সবই সম্ভব। সাক্ষীবা প্রমাণ করে দিলে যে ঘটনার দিন বুধুযা, চৌবে আর রামখেলাওন, তিন বন্ধু মিলে এক রিস্তাদারের বাড়িতে বিযেব নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। শফিকুল হোসেন সাহেবও রায় শুনলেন। তারপর সেখানে আর দাঁড়ালেন না। ধড়া-চূড়ো খুলে স্যুটকেসের ভেতবে পুবে সাধারণ পোশাক পবে সোজা একেবারে নিজের বাড়িতে এসে উঠলেন।

বেগম সাহেবা যথাবীতি ঘরে এসে স্বামীকে দেখে কী-রকম একটু অবাক হযে গেলেন। স্বামীর কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত সকাল-সকাল কোর্ট থেকে ফিবে এলে যে? তোমার জ্বর হয়েছে নাকি?

তারপর আবার আরো ভালো করে স্বামীর কপালটা হাত দিয়ে অনুভব করলেন।

বললেন, হ্যাঁ, যা বলেছি ঠিক। তোমার জ্বর হয়েছে। ডাক্তার সাহেবকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

শফিকুল হোসেন সাহেব মানা কবলেন।

বললেন, না, ডাক্তার সাহেবকে ডাকতে হবে না। ও জ্বব নয়।

বেগম সাহেবা বললেন, ও জ্বর নয়তো কী?

—ও এমনিই সেবে যাবে। আমি আমাব মেয়েকে আর একবার খুন করেছি!

—কী বলছো তুমি যা-তা?

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। কুমকুম আবার মারা গেছে!

বেগম সাহেবা আরো অবাক হয়ে গেলেন।

—বলছো কী তুমি? সে তো অনেক কাল আগে মারা গেছে।

শফিকুল সাহেব বললেন, অনেক কাল আগে মারা গেলেও, আজকে আবার আমি তাকে নিজের হাতে খুন করেছি।

তারপর নিজের হাত দুটো দেখিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে আমার হাতে—

বেগম সাহেবা অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, কোথায় রক্তের দাগ? কী বলছো? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি পাগলই হয়ে গিয়েছি। তুমি আর আমায় বিরক্ত করো না, তুমি যাও, তুমি চলে যাও এখান থেকে।

বলে তিনি হাত দিয়ে বেগম সাহেবাকে ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন।

পরের দিন তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। তিনি কাউকে না জানিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে বেরোলেন। আস্তে-আস্তে রাস্তায় নামলেন। তখনও ভালো করে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়নি। সাইকেল-রিকশাও বেশি বেরোয়নি। খানিক দূর হেঁটে গিয়ে একটা সাইকেল রিকশা পেলেন।

সেই সাইকেল রিকশা'তে উঠে বললেন, চৌক্ চলো।

ঠিকানাটা মনে ছিল তাঁর। নন্দন শাহু গলি, চৌক। আস্তে আস্তে সকাল হলো। আকাশ ক্রমেই ফর্সা হলো। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ লোকই চলেছে গঙ্গাস্নানে।

পুলিশের চৌকির কাছে গিয়ে তিনি নামলেন। রিকশার ভাড়াটা মিটিয়ে দিলেন। তারপর রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে ঠিকানাটা ভালো করে পরখ করে নিলেন। নন্দন শাহু গলি, চৌক। যথাস্থানে পৌঁছে একবার এদিক-ওদিক দেখলেন। দু'পাশে বড়-বড় তিন-চারতলা উঁচু সব ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। মাঝখানে সরু পাথরে বাঁধানো রাস্তা। অত ভোরেও দু'একটা ষাঁড় বসে-বসে গলি আটকে জাবর কাটছে।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করলেন—জগমোহনজীর মোকানটা কোথায়?

একজন পথচারী দেখিয়ে দিলে—ওই যে, ওই টে—

শফিকুল হোসেন সাহেব বাড়িটার সামনে গিয়ে দরজায় খটাখট্ শব্দ করলেন।

ভেতর থেকে একজন রেগে চিৎকার করে উঠলো—আবার এসেছেন? বলছি না, আমার কুমকুম মরে গেছে!

শফিকুল সাহেব বললেন, আমিই তাকে মেরে ফেলেছি জগমোহনজী—

ভেতর থেকে ঠিক একই রাগী গলায় লোকটা বলে উঠলেন—বারবার কেন আসেন আপনারা? আমার মেয়ে নেই। আমার কুমকুম মারা গেছে—আপনি বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান—আউর কভি মাত্ আনা—নিকালো নিকালো, ইঁহাসে—

শফিকুল সাহেব আর সেখানে দাঁড়ালেন না। বুঝলেন, কুমকুমের বাপ-মা চায় না যে, মেয়ে তার ঘরে ফিরে আসুক!

আবার গলি পেরিয়ে রিকশায় উঠে বাড়িতে চলে এলেন। তখন দলে-দলে পুণ্য-সঞ্চয়ীরা গঙ্গাস্নানে চলেছে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করতে-করতে।

নিজের বাড়িতে এসে যেমন করে যে-রাস্তা দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেই একই রাস্তা দিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু বেগব সাহেবার নজর এড়াতে পারলেন না।

বেগম সাহেবা বললেন, কী হলো, এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

শফিকুল সাহেব সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। বেগম সাহেবাও পেছন পেছন গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি, কী হয়েছে বলো তো তোমার?

শফিকুল হোসেন সাহেব বললেন, এক কথা বারবার কেন জিজ্ঞেস করছো? বলেছি তো আমি আমার কুমকুমকে আবার খুন করেছি!

বেগম সাহেবা বললেন, তুমি কী সব যা-তা বলছো? তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

শফিকুল সাহেব বললেন, পাগল? পাগল হলে তো বেঁচে যেতুম গো। আমি যে পাপ করেছি, তাতে পাগল হওয়াই আমার উচিত ছিল! সত্যি, কী করলে পাগল হতে পারি বলতে পারো?

বেগম সাহেবা সেই দিনই ডাক্তার ডেকে আনলেন।

ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেলেন। বললেন, ওভার-ওয়ার্ক-এর জন্যেই এই রকম হয়েছে। একটু রেস্ট নিতে হবে।

কোর্টে যাওয়া বন্ধ! মক্কেলরা বাড়িতে এসে ফিরে যায়। মিস্টার মৌলাও খবর পেয়ে একদিন এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার হোসেন?

শফিকুল হোসেন সাহেব সব বুঝিয়ে বললেন। ঘুমোতে পারেন না। সারা রাত জেগে কাটে। ক্ষিদেও নেই। চলতে কষ্ট হয়। পা দুটো বড্ড ভারি লাগে। মাথা ভার হয়ে থাকে। আর কিছুই ভালো লাগে না!

মিস্টার মৌলাও বলে গেলেন—কিছুদিন রেস্ট নাও, তোমার তো আর টাকার দরকার নেই। তুমি কিছুদিন আর কোনও ব্রীফ্ নিও না।

সত্যিই টাকার অভাব নেই শফিকুল হোসেন সাহেবের। পৈত্রিক অগাধ সম্পত্তি। পূর্ব পুরুষ উত্তরপ্রদেশের জমিদার ছিলেন। জীবনে তাঁরা কখনও চাকরি বা ব্যবসা কবেননি। কেবল হুকুম করেছেন আর পায়ের ওপর পা দিয়ে জমির ফসলের ভাগ নিয়েছেন। নানা শহবে বাড়ি করেছেন। এলাহাবাদে, বারাণসীতে, গোরক্ষপুবে, কানপুরে—সব জায়গায় তাঁদের বাড়ি ছিল। সে-সব বাড়ি এক-একটা এখন পাঁচ লাখ-ছ' লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। শফিকুল হোসেন সাহেবই বংশধরদের মধ্যে প্রথম যিনি ওকালতি করে টাকা উপার্জন করেছেন। তাও বলতে গেলে সখের ওকালতি।

একমাস ধরে বিছানার ওপর শুয়ে থেকে থেকে তিনি ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। তারপব আব শুয়ে থাকতে না পেরে একদিন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।

বেগম সাহেবা অবাক! জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছো?

—বাইরে।

বেগম সাহেবা বললেন, ডাক্তারবাবু যে তোমাকে কেবল শুয়ে থাকতে বলেছে।

—তা বলুক, বলে তিনি গাড়ি জুততে বললেন। গাড়ি জোতা হলে তিনি তাতে উঠে বসলেন।

তারপর বললেন, চলো 'নারী কল্যাণ আশ্রম—'

'নারী কল্যাণ আশ্রম' এ শহরের একপ্রান্তে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে বহুদিন ধরে। যাদেব কেউ নেই, যে-সব মহিলাদের দেখবার কেউ নেই, কিংবা অনাথা, নিঃসন্তান, তাদেরই আশ্রয়স্থল হচ্ছে এখানকার এই 'নারী কল্যাণ আশ্রম'। কুমকুমকেও পুলিশ এখানেই রেখেছিল।

শফিকুল হোসেন সাহেব সঙ্গে অনেক টাকা নিয়েছিলেন।

ক'দিন ধরেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন কিভাবে মেয়েটাকে সাহায্য কবা যায়। নিজের বাপ-মা যাকে গ্রহণ করলে না, নিশ্চয়ই তার খুব তকলিফ হচ্ছে। তিনি যা অন্যায় কবেছেন, তার জন্যে তাকে তিনি খেসারত দিতে চান।

'নারী কল্যাণ আশ্রমে'র সামনের গেটে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে দিনরাত। উঁচু পাঁচিল

দিয়ে ঘেরা বাড়ি। শফিকুল হোসেন সাহেব আশ্রমের সামনে গিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি চাইলেন। ভেতরে গেল লোক। সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক বাইরে এসে হাজির। শফিকুল সাহেব নিজের পরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ও আপনিই কুমকুমের মামলায় আসামীপক্ষের উকিল ছিলেন?

শফিকুল হোসেন সাহেব বললেন, হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন?

—আমি যে অন্যায় করেছি তার ওপর, তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

—প্রায়শ্চিত্ত? কী করে প্রায়শ্চিত্ত করবেন?

—আমি তাকে কিছু টাকা দেব। আমি ক্ষমা চাইবো তার কাছে। আমি তার বাড়িতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করলে না। তাই এই 'নারী কল্যাণ আশ্রমে' এসেছি।

—কিন্তু তার তো দেখা পাবেন না।

—কেন?

—সে এখন এখানে নেই।

—এখানে নেই তো কোথায় গেছে?

—তা আমরা জানি না। আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে সে একদিন সকলের নজর এড়িয়ে কোথায় কোন্ দেশে অজ্ঞাতবাস করছে। আমরা অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাইনি।

—সে কতদিন আগে এখান থেকে চলে গেছে?

—তা একমাসেরও বেশিদিন আগে।

শফিকুল হোসেন সাহেব বুঝতে পারলেন মামলার রায় বেরোবার পর যখন তিনি একমাস বিছানায় শুয়েছিলেন, তখনই এই বিভ্রাট ঘটেছে। তিনি আবার সেই গাড়িতেই বাড়িতে ফিরে এলেন।

বেগম সাহেবা তাঁর চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলে?

শফিকুল হোসেন সাহেব বললেন, সে তুমি বুঝবে না। আমি এতদিন যা কিছু করেছি, যা কিছু পড়েছি, যা কিছু ভেবেছি, সমস্ত ভুল। আমি সারা জীবন শুধু ভুলই করে এসেছি।

—হঠাৎ ও-কথা বলছো কেন?

—তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি মিছিমিছিই এতদিন নামাজ পড়েছি, ঈদের রোজা পালন করেছি, উপোস করেছি। আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তার মানে?

শফিকুল হোসেন সাহেব বললেন, তার মানে তুমি জানতে চেয়ো না। আমার যা কিছু মনে হচ্ছে তাই-ই তোমাকে বলছি। আমি কিছুদিন বাইরে যেতে চাই, এই সব-কিছুর বাইরে। যদি আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয় তো তখন আবার আসবো। তোমাদের তো কোন অভাব রইল না। আমি তোমাদের জন্যে প্রচুর সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি। টাকার জন্যে তোমাদের কোনও কষ্ট হবে না, এটা তো বিশ্বাস করো।

বলে নিজের ঘরে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ক'দিন বড় অশান্তিতে কাটলো। বেগম সাহেবা ভাবলেন নিশ্চয়ই স্বামী তাঁর পাগল হয়ে গেছে। এই সবই তো পাগলামির লক্ষণ। একেই তো বলে বিকার। মনোবিকার।

বেগম সাহেবা ডাক্তার ডাকিয়ে আনলেন। মনের রোগের ডাক্তার।

কিন্তু শফিকুল সাহেব বিদ্রোহ করে উঠলেন। কিছুতেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন না। ডাক্তার হতাশ হয়ে ফিস নিয়ে ফিরে গেল।

সেদিন সকালবেলা চাপরাশি এসে খবর দিলে তিনজন লোক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তারা বৈঠকখানায় বসে আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শফিকুল সাহেব বৈঠকখানায় গেলেন। দেখলেন তিনজন ছেলে। সেই তিনজন আসামী। বুধুয়া, চৌবে আর রামখেলাওন। যাদের তিনি আসামীর কাঠগড়া থেকে আইনের কূটপ্যাঁচে খালাস করিয়ে দিয়েছেন।

—তোমরা এখানে?

তিনজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

বললে, আপনার জন্যে কিছু ইনাম এনেছি ভকিল সাহাব!

—ইনাম? কিসের ইনাম?

ছেলে তিনটে একটা ঝুলি থেকে দু'টো হুইস্কির বোতল আর পকেট থেকে কয়েক তাড়া নোট বার করে টেবিলের ওপর রাখলে।

—এইগুলো আপনার ইনাম। আপনার মেহেরবাণীর খেদমদ্। আপনি আমাদের জেল থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তারই সামান্য প্রতিদান, আর কিছু নয়—এই দু' বোতল খাঁটি স্কচ্ হুইস্কি আ..., আর এতে দশ হাজার টাকা ..

ওদের কথা শেষ হবার আগেই শফিকুল সাহেবের চোখ দু'টো করমচার মতো লাল হয়ে উঠলো। তারপর তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন।

ছেলে তিনটের মাথা লক্ষ্য করে তিনি বোতল দু'টো ছুঁড়ে মারলেন। ছেলে তিনটে মাথা সরিয়ে নিতেই বোতল দু'টো ঘরের দেয়ালে গিয়ে লেগে চুরমার হয়ে একটা ঝন্‌ঝন্ করে আওয়াজ হলো। আর নোটগুলো ছুঁড়ে মারলেন তাদের দিকে লক্ষ্য করে।

মুখ দিয়ে কথা বেরোতে লাগলো দু'তিনটে কথা—হারামজাদ্, বেত্তমিজ, শয়তান, নিকালো ঘরসে—

ছেলে তিনটে আর সেখানে নেই, ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পাঁই-পাঁই করে যে যেদিকে পারলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শফিকুল হোসেন সাহেবের চিৎকার শুনে ভেতর থেকে তাঁর চাপরাশি দৌড়ে এসেছে। বেগম সাহেবাও দরজার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু শফিকুল হোসেন সাহেবের এমন চিৎকার এমন গালাগালি তার চাপরাশি বা আর কেউ কখনও শোনেনি।

—আমাকে ইনাম দিতে এসেছে! ইনাম!

তারপর চাপরাশিকে দেখতে পেয়েই বললেন, একটা দেশলাই আন্—

চাপরাশি দেশলাই নিয়ে এল। শফিকুল সাহেব তাকে হুকুম দিলেন—ওই টাকাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দে!

এতক্ষণে বেগম সাহেবা আর থাকতে পারলেন না। বললেন, এ-সব কী হচ্ছে?

শফিকুল সাহেব বললেন, আমাকে ইনাম দিতে এসেছিল ওরা, তা জানো?

—কারা? কারা ইনাম দিতে এসেছিল? কিসের ইনাম?

শফিকুল সাহেব বললেন, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর ওরা এসেছিল আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে—চেয়েছিল আমাকে দোজখে পাঠাতে, এত বড় শয়তান, হারামজাদা, বেত্তমিজ ওরা।

—কারা? তুমি কাদের কথা বলছো?

—সে তুমি বুঝবে না। তুমি মেয়েমানুষ হয়ে সব কথা বুঝতে চাও কেন? তুমি অন্দরমহলে

যাও, দফতর-ঘরে এসেছো কেন?

বেগম সাহেবা তবু অন্দরমহলে গেলেন না। দেখতে লাগলেন নোটগুলো সব দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে চাপরাশি।

যখন সব নোট পোড়ানো হয়ে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল দশ হাজার টাকা, তখন শফিকুল হোসেন সাহেব তার নিজের ঘরে চলে গেলেন।

বেগম সাহেবাও পেছন পেছন আসছিলেন। বললেন, তুমি খাবে না?

—আজকে আমার ক্ষিদে নেই—বলে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

কয়েকজন মক্কেল বাড়িতে এল। সকলেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। ভকিল সাহেবের তবিয়ত খারাপ, আজকে কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

শুধু সেই দিনই নয়, পরের দিনও তাই। তারপরের দিনও তাই।

তারপরে আর কোনও দিন কেউ শফিকুল হোসেন সাহেবকে দেখতে পেলে না। তিনি কারোর সঙ্গেই দেখা করলেন না।

বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, তুমি কোর্টে যাবে না?

শফিকুল সাহেব বললেন, না, আর কোনও মামলা নেব না। তবে তুমি ভেবো না কিছু, তোমার খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট হবে না কোনওদিন।

পৃথিবীতে বহুলোকের জীবনে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যার ফলে তার সারা জীবনের যাত্রাটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে অন্য মানুষে রূপান্তরিত করেছে। শফিকুল হোসেন সাহেবের জীবনেও ঠিক তাই হলো।

একদিন বেগম সাহেবা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আর স্বামীর কোনও সন্ধান পেলেন না। বাড়ির আয়া, চাপরাশি, বাবুর্চি, খানসামা, সকলকেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কেউই তাঁর কোনও হদিস দিতে পারলে না।

অনেক পরে, তখন বেশ বেলা হয়েছে, বেগম সাহেবা স্বামীর বালিশের তলায় একটা চিঠি পেলেন। লিখে গেছেন সাহেব নিজের হাতে। চিঠিটা এই রকম :

"প্যারে বেগম সাহেবা,

তোমাকে না বলে আজ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু চিরকালের মত নয়। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি পাগল হইনি, দিওয়ানাও হইনি। বলতে পারো আমি আমাকে খুঁজে বেড়াতে যাচ্ছি। আমাকে খুঁজে পেলেই আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো। তোমাদের নামে অনেক টাকা রাখা আছে, তা তুমি জানো। সুতরাং জানি তোমাদের টাকার অভাব কখনও হবে না। মনে করো না আমি চিরকালের মত চলে যাচ্ছি। চিরকালের মত চলে যাওয়ার এখনও অনেক দেরি। এখন শুধু 'আমাকে' খুঁজতে বেরোচ্ছি। জিজ্ঞেস করতে পারো যাচ্ছিই যখন তখন তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি না কেন? কিন্তু জানিয়ে গেলে তুমি কি আমাকে যেতে দিতে? যাহোক, আমি চললাম। এইটুকু শুধু বলে যাই যে আমার মাথা খারাপ হয়নি। আমি আবার আসবো, কথা দিচ্ছি। ইতি তোমার..."

এরপর বহুদিন আর কোনও সংবাদ নেই শফিকুল হোসেন সাহেবের।

মিস্টার মৌলাও খবর নিয়ে জানলেন যে, শফিকুল হোসেন তাঁর বাড়ি ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তিনি খবরটা শুনেই বুঝলেন, শফিকুল উকিল হবার অনুপযুক্ত। দয়া-মায়া এখনও যখন আছে, তখন আর ওর পক্ষে সাকসেসফুল এ্যাডভোকেট হওয়া সম্ভব নয়।

ওদিকে শফিকুল হোসেন সাহেব কাছাকাছির মধ্যে এলাহাবাদ গিয়ে পৌঁছেছেন। সঙ্গে

ট্র্যাভেলার্স চেক্ রেখে দিয়েছেন। দরকার মত ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নেবেন। উঠেছিলেন হোটেলে। হোটেলের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী কাজে এসেছেন এখানে?

শফিকুল সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, এমনি, বেড়াতে।

—কতদিন থাকবেন?

—তার কোনও ঠিক নেই।

কী করে ঠিক থাকবে? হয়ত পাঁচ দিনও লাগতে পারে, আবার পঁচিশ দিনও লাগতে পারে। তবু চেষ্টা করতে হবে। এলাহাবাদ ছোট শহর নয়। কোনও শহরই ছোট শহর নয়। কম-বেশি আজকাল সব শহরই বড়। লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভিড়ের ভেতরে কোথায় লুকিয়ে আছে কুমকুম, তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

এক-একদিন এক-একটা বস্তিতে গিয়ে দাঁড়ান। কিছু লোককে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে কুমকুম নামে কোনও মেয়ে আছে?

এইরকম রোজই নানা পেশার লোককে একই প্রশ্ন করেন। বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। সবাই অবাক হয়ে যায় প্রশ্ন শুনে।

বলে, কত বয়েস?

—এই পনেরো-ষোল হবে।

লোকে ভাবে লোকটা পাগল। জিজ্ঞেস করে, আপনার মেয়ে? হারিয়ে গিয়েছে?

শফিকুল সাহেব বলেন, হ্যাঁ, আমার মেয়ে। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে।

—তা পুলিশে খবর দিন না।

শফিকুল সাহেব এ কথার কিছু জবাব দেন না। সেখান থেকে আবার চলে যান। একটা ছোটখাটো হোটেলে গিয়ে ওঠেন। বড় হোটেলে থাকবার পয়সা কোথায় তাঁর কাছে, যে বড় হোটেলে তিনি উঠবেন।

তাই বড় হোটেল থেকে তলপি-তলপা গুটিয়ে ছোটখাটো হোটেলে গিয়ে ওঠেন।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন, কুমকুম বলে কোনও মেয়েকে দেখেছেন?

—কুমকুম? সে আপনার কে?

শফিকুল সাহেব বললেন, সে আমার মেয়ে।

—বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাকে খুঁজতেই বুঝি এলাহাবাদে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—তবেই হয়েছে। এলাহাবাদ কি ছোট শহর ভেবেছেন? পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তারা কী বলছে?

শফিকুল সাহেব বললেন, পুলিশের কথা ছেড়ে দিন। তারা তাদের ডিউটি করে নাকি? তারা যদি তাদের ডিউটি করতো, তাহ'লে দেশ অন্য রকম হয়ে যেত। আর তাছাড়া তাদেরই বা দোষ কী? আমাদের ইণ্ডিয়া কি ছোট দেশ? ষাট-সত্তর কোটি লোকের দেশ এটা, এখানে কে কার খবর রাখে!

হোটেলের ম্যানেজারের খুব কৌতূহল হলো।

—সেই মেয়েকেই খুঁজতে বেরিয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায়-কোথায় গিয়েছেন?

—এই এলাহাবাদেই প্রথম এলাম। কিছদিন বারাণসীতে খুঁজেছি, সেখানে না পেয়ে

এলাহাবাদে এসেছি।

—আর কোথায়-কোথায় ঘুরবেন?

—সারা ইণ্ডিয়ায় খুঁজবো।

—যদি খুঁজে না পান? কতদিন ধরে খুঁজবেন?

—খুঁজে না পেলে বাড়ি ফিরবো না।

—আপনি কি আশা করেন তাকে পাওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত? যদি আত্মহত্যা করে থাকে?

শফিকুল সাহেব বললেন, তাও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন খুঁজে বেড়াবো। একটা জীবনে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু যতবার পৃথিবীতে জন্মাবো, ততবার খুঁজে বেড়াবো। এই-ই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

ম্যানেজার কথাগুলো শুনে কী ভাবলে কে জানে! হয়ত পাগল ভেবেছে। বেগম সাহেবাও তো তাঁকে পাগল ভেবেছিলো। তাতে কী হয়েছে? পাগল হওয়া কি সহজ?

ম্যানেজার বললে, আজকের খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম, তাহ'লে সেটা কি আপনিই দিয়েছেন?

গল্প বলতে-বলতে কেশর শর্মা থামলেন। আমি বললাম তারপর?

তারপর একে একে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো। শফিকুল সাহেবও এক দেশ থেকে আর এক দেশে যান। সেই কাশ্মীর থেকে কেপকমোরিন, ডিব্রুগড় থেকে দ্বারকা, চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শফিকুল সাহেব। দিন-মাস-বছর, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত জীবনের সামনে দিয়ে কেটে গেল।

সব জায়গাতে গিয়ে হোটেলে ওঠেন। যেখানে হোটেল নেই সেখানে ধর্মশালা। যেখানে তাও নেই, সেখানে স্টেশনের ওয়েটিং রুম। মাথার চুল আস্তে আস্তে পেকে গেল শরীর ভেঙে এল।

একবার নিজের দেশে এলেন। এসে শুনলেন বেগম সাহেবা মারা গেছেন।

শফিকুল সাহেব বাড়ি এসেছেন শুনে আমরা সব দেখতে গেলাম তাঁকে।

দেখলাম চেহারা একেবারে বদলে গেছে। বয়সের ছাপ পড়েছে চেহারাতে। তাঁর সম্পত্তি যারা দেখা-শোনা করে তারাও এসেছে। তিনি সকলের সঙ্গেই কথা বলছেন। কাকে কী করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে। তার কথাও বললেন।

নিজের বেগম সাহেবার কথাও বললেন। বললেন, দেখুন শর্মাজী, আমার জীবনে যে এরকম একটা ট্র্যাজেডি হবে, তা প্রথম জীবনে আমি কল্পনাও করিনি। আপনি জানেন না শর্মাজী আমি আমার বেগম সাহেবার ওপর কী রকম অত্যাচার করেছি। অথচ তাঁর তো কোনও দোষ ছিল না। তাঁকে বাড়িতে রেখে আমি বছরের পর বছর একলা সারা ইণ্ডিয়া ঘরে বেড়িয়েছি—অথচ আমার সব অত্যাচার তিনি মুখ বুঁজে সহ্য করেছেন।

আমি বললাম, কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আপনি কুমকুমকে খুঁজে পাবেন কোনওদিন?

শফিকুল সাহেব বললেন, না-ই বা খুঁজে পেলাম কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

আল্লাহতালাহকে তো আজ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায় না, তবু তাঁকে খোঁজার কি বিরাম আছে? এও তো একরকম আমার নিজেকেই খোঁজা! আত্মানুসন্ধান।

তারপর একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো।

একদিন রাজকোটে গিয়েছেন। ঠিক ওইরকম একটা হোটেলে উঠেছেন আর রাজকোটের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

একদিন হোটেলে একটি মহিলা এসে হাজির। বললে, আপনি কুমকুমকে খুঁজছেন, আমিই সেই কুমকুম!

শফিকুল সাহেব মেয়েটিকে ভালো করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কুমকুম?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ, আপনি তো কুমকুমকেই খুঁজছিলেন? আমিই সেই কুমকুম।

শফিকুল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বারাণসীর লোক?

মেয়েটি বললে, না, তামিলনাডুর।

—তোমার বাবার নাম কী?

—থিরু রামচন্দ্রন।

শফিকুল সাহেব বললেন—না, আমি খুঁজছি বারাণসীর জগমোহন দাসের মেয়ে কুমুকুম দাসকে।

মেয়েটা হতাশ হয়ে চলে গেল। সেইদিনই শফিকুল সাহেব রাজকোট ছেড়ে চলে এলেন।

তারপরে কোথা দিয়ে কত বছর কেটে গেল, আবার একদিন এখানে ফিবে এলেন। খবব পেয়ে আমিও গেলাম দেখা করতে। দেখলাম তিনি আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। মেযে বাপেব বাড়ীতে এসেছে।

বাপ মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো তুমি?

মেয়ে চায় আব্বাজানকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে। চায় আব্বাজানের সেবা করতে।

শফিকুল সাহেব বললেন, আমার অনেক কাজ, আমি যেতে পারবো না। তোমার যদি টাকার দরকার হয় বলো, সমস্ত স্টেট থেকে দেওয়া হবে।

তারপর ম্যানেজারকে ডেকে আর কী করতে হবে সব বুঝিয়ে বলে দিলেন। দিযে আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন।

বললাম, তারপর?

কেশর শর্মা বললেন, আপনি কি এ কাহিনী বইতে লিখবেন?

বললাম, আগে পত্রিকায় ছাপাবো, পরে বই আকারে বেরোবে।

কেশর শর্মা বললেন, যদি পত্রিকায় লেখেন তো ধারাবাহিক উপন্যাস হিসেবে লিখবেন। পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস হিসেবে লিখবেন না। তাতে সমস্ত রস নষ্ট হয়ে যায়। অনেক তাড়াতাড়ি লিখতে হয়, যার ফলে রস ঠিক ঘন হয় না। আমাদের পড়তে ততো ভালো লাগে না।

বললাম, সে যা হয় হবে, তারপর কী হলো বলুন?

তারপর হঠাৎ একবার শফিকুল হোসেন সাহেব আবার এখানে ফিরলেন। খবর পেয়েই

আমরা দেখা করতে গেলাম। আরো অনেক লোক ছিল। আমি চলে আসছিলাম। তিনি ইশারা করে আমাকে বসতে বললেন।

অনেক বৈষয়িক কাজ তাঁর। অতবড় সম্পত্তির দায়। তার সমস্ত তদারকির ভার ম্যানেজারের ওপর দিয়ে চলে যান। যখন ফিরে আসেন তখন দেনাদার-পাওনাদার সবাই তাঁকে ঘিরে বসে থাকে। ম্যানেজার সমস্ত দেখাশোনা করে বলে তাকেও সব সময় সব প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয়।

যখন সবাই চলে গেল, তখন তিনি তার ম্যানেজারকেও চলে যেতে বললেন।

তখন আমরা দু'জনে একসঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে লাগলাম।

শফিকুল হোসেন বললেন, জানেন শর্মাজী, এবার কুমকুমের দেখা পেয়েছি।

বললাম, কোথায়?

—বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের এক আশ্রমে।

বৃন্দাবনের সে এক বিচিত্র আশ্রম। শফিকুল হোসেন সাহেব আগ্রা থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে মথুরা, মথুরা থেকে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে বৃন্দাবনে গিয়ে উঠলেন। সেখানেও ওই একই প্রশ্ন—কুমকুম নামে কোনও মেয়ে থাকে এখানে?

—কোন কুমকুম?

—বারাণসীতে বাড়ি, কুমকুম দাস! এখানে তাকে পাওয়া যাবে?

—না সাহেব, এখানেও সবাই সেই একই জবাব দিলে।

বৃন্দাবনের পাণ্ডারা সমস্ত খবরই রাখে। সকলের নাম-ধাম-পরিচয় খাতায় লিখে রাখে। কারো খাতায় ও-নাম লেখা নেই।

একদিন একটা গলি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ কানে এল সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়া হচ্ছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

মাত্র ঐ দুটি পঙক্তি। আর কোন পঙক্তি নেই। কাছে গিয়ে একটা বাড়ি নজরে পড়লো। জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। প্রায় জন পঞ্চাশেক মহিলা সকলের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওই গানটা গাইছে। ঐ গানটার দুটো পঙক্তিই বার-বার গেয়ে চলেছে। সকলেরই মাথা কামানো। কারো মাথায় চুল নেই।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে মেয়েদের গান গাওয়া দেখতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে লাগলেন। দেখলেন সামনের দিকে একটা কুণ্ডতে আগুন জ্বলছে। বোধহয় কোনও যজ্ঞ হচ্ছে। তারপর হোটেলে ফিরে এলেন।

তারপর বিকেলের দিকে আবার গেলেন। দেখলেন তখনও সেই একই সুরে একই গান চলেছে! কিন্তু এ অন্য দল। সকালবেলা যারা গান গাইছিল তারা নয়। সেবারও সেই দু'টো লাইনই গেয়ে চলেছে সবাই। সকলেরই মাথা কামানো। কারো মাথায় চুল নেই।

হোটেলে এসে ম্যানেজারকে খুলে বললেন ব্যাপারটা।

ম্যানেজার বললে, হ্যাঁ, ওটা কলকাতার এক শেঠজী করে দিয়েছে।

—ওরা কারা? ওইসব মেয়েরা?

ম্যানেজার বললে, ওরা সবাই অনাথা। ওদের কেউ নেই জগতে। থাকলেও কেউ হয়ত দেখে না, তাই এখানে পেট চালানোর জন্যে ওই কাজ করে।

—ওরা কী পায়?

ম্যানেজারবাবু বললেন, বছরে দু'টো করে গামছা, চারটে করে কাপড়, সপ্তাহে একসের

আটা আর আধসের চাল। আব প্রতিদিন আট আনা পয়সা। ওই ওদের রোজগার। তার বদলে দিনে আট ঘণ্টা করে গান গাওয়া ডিউটি ওদের। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দু'টো, দু'টো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত, আর রাত দশটা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত। তিন শিফ্‌টে কাজ হয়।

শফিকুল হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ওদের মধ্যে কুমকুম দাস নামে কোনও মহিলা আছে কিনা বলতে পারেন?

ম্যানেজারবাবু বললেন, না, তা বলতে পারবো না।

—আপনি একবার খোঁজ নিয়ে বলতে পারেন? তাহ'লে আমার খুব উপকার হয। এই উপকারটা যদি আপনি কবেন তো আমি চিরকাল আপনাব কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ম্যানেজারবাবু বললেন, আচ্ছা, আমি একবার যে মুন্সী ওখানে আছে তাকে জিজ্ঞেস করবো—কাল এসে আপনাকে জানাবো।

পরের দিন ম্যানেজাব এলেন। এসে বললেন, হ্যাঁ শফিকুল সাহেব, আছে, বাবাণসীতে ওদের বাড়ি এখনও আছে, মেযেটা এখানে এসে ঐ কাজ নিযেছে।

—নামটা কী তাব?

—কুমকুম দাস!

—বাবার নাম কী জানেন?

—বললে জগমোহন দাস।

শফিকুল হোসেনেব মুখটা আনন্দে লাল হযে উঠলো। বললেন, আজ পনেবো বছব সাবা ইণ্ডিয়ার সব অঞ্চল ঘুবে বেড়াচ্ছি, ওকে দেখতে পাবো বলে! আজকে আপনি আমাব মহা উপকার করলেন। আজকে আপনি আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারেন?

ম্যানেজারবাবু বললেন, কিন্তু আপনি তো মুসলমান, আর ও হিন্দু। ওর সঙ্গে আপনাব কী সম্পর্ক?

—অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক! সে আপনাকে আমি পরে সব বলবো।

সেইদিনই ম্যানেজারবাবু শফিকুল হোসেন সাহেবকে নিয়ে গেলেন সেই বৈষ্ণবদেব আশ্রমে। মোহান্তজীর কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

বললেন, ইনি একবার দেখা করবেন কুমকুম দাসের সঙ্গে।

শফিকুল হোসেন সাহেব হাতের এ্যাটাচি কেস্‌টা খুললেন, খুলে তার ভেতর থেকে একটা বাণ্ডিল বার করলেন। বেশ হলদে কাগজে মোড়া বড় বাণ্ডিল।

সত্যিই তখন সেই কুমকুম এল। মাথাটা মুগুন করা। তখন তার ডিউটি ছিল না। সাবা রাত জেগে ভগবানের নাম করেছে। সকাল ছ'টায় ডিউটি শেষ হবাব পর চান করে রান্না চাপাতে যাচ্ছিল। এমন সময় মুন্সীজী তাকে ডেকে এনেছে। পাশেই ভগবানেব নাম গান চলছে চব্বিশ প্রহর ধরে।

সামনে দু'জন অচেনা লোক দেখে যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারলো না দু'জনকে।

বললে, কারা দেখা কবতে এসেছে আমার সঙ্গে?

শফিকুল হোসেন সাহেব এগিয়ে গেলেন। বললেন, আমি। তোমার নামই তো কুমকুম। কুমকুম দাস?

কুমকুম বললে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?

—আমাকে তুমি না-ও চিনতে পাবো। তোমার বাবার নাম তো জগমোহন দাস? তোমরা বারাণসীতে নন্দন সাহু গলিতে থাকতে। তোমার একটা ছোট বোন আছে, তার নাম চন্দ্রা—

কুমকুম বললে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?

শফিকুল সাহেব বললেন, আমাকে তুমি চিনতে পারবে না ; কিন্তু আজ থেকে পনেরো বছব

আগে তোমাকে নিয়ে কোর্টে মামলা হয়েছিল, তা কি তোমার মনে আছে? আমি ছিলাম আসামী পক্ষের উকিল। আমি আসামীদের দোষী জেনেও তাদের মামলা থেকে মুক্তি দিয়েছিলুম। আমি পাপী। আমি মহা-অপরাধী। আমি তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি জানি তোমার ওপর জঘন্য অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু আমি টাকার জন্যে আসামীপক্ষের উকিল হয়ে তাদের নির্দোষ প্রমাণ করেছিলাম। তার ফলে বাড়িতে তোমার স্থান হয়নি। তোমার বাবা-মাও তোমাকে বাড়িতে আশ্রয় দেননি। বলো, সত্যি কিনা!

কুমকুম কিছু বললে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সবাই দেখতে পেলে কুমকুমের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে।

শফিকুল হোসেন বললেন, তারপর থেকে আমি ওকালতি ছেড়ে দিয়েছি। আমি আজ পনেরো বছর ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুধু তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চাইবার জন্যে। একবার শুধু বলো তুমি আমাকে ক্ষমা করলে।

কুমকুম তবু কিছু কথা বললে না। তেমনি তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো।

শফিকুল হোসেন সাহেব হাতের বাণ্ডিলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই ধরো, এতে আমার সম্পত্তির অর্ধেক দানপত্র লিখে দেওয়া আছে, আর দু'লাখ টাকা নগদ। এইটে নিয়ে তুমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমাকে উদ্ধার করো। আমার স্ত্রী আমার অবহেলাতেই মারা গিয়েছে, তবু আমি মুষড়ে পড়িনি! কিন্তু তুমি যদি এটা না নাও, তা'হলে আমি সত্যিই মারা যাবো—নাও—

শফিকুল সাহেব হাত বাড়াতেই কুমকুম সেটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখান থেকে দেখা যায় জায়গাটা। কুমকুম সেই দানপত্র আর নগদ দু'লাখ টাকা হোমের জ্বলন্ত কুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ওপর যেন ঘৃতাহুতি পড়লো।

তারপর আর সে সেখানে দাঁড়ালো না! তখন ঘরের ভেতরে যে কীর্তন চলছিল, তা তেমনি ভাবেই চলতে লাগলো।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

হোটেলের ম্যানেজারবাবু এতক্ষণ সব চুপ করে শুনছিল দেখছিল। এবার শফিকুল সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে শফিকুল হোসেন সাহেবও কাঁদছেন। তাঁর চোখ দিয়েও টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে।

এবার পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখটা মুছে নিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। ম্যানেজারবাবুকে বললেন, চলুন চলে যাই, কুমকুম আমাকে ক্ষমা করলে না। তা হোক, তবু আমি আশা ছাড়বো না ; আবার আসবো, আবার ক্ষমা চাইবো, দেখবো কতবার কুমকুম আমাকে ক্ষমা না করে পারে।

বলে সেই দিনই বৃন্দাবন ছেড়ে চলে এলেন।

আসবার সময় ম্যানেজারবাবুকে বলে এলেন—কিছুদিন পরেই আমি আবার আসছি। দেখি কতবার আমাকে ও ফেরায়। জীবন থাকতে আমি আশা ছাড়বো না।

কেশর শর্মা গল্প শেষ করলেন এখানে। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

কেশর শর্মা আবার বললেন, তারপর আর কী! তারপর একবার এখানে আসেন, তারপর আবার চলে যান বৃন্দাবনে। কুমকুম ক্ষমা করে না কখনও আবার দেখাও করে না। তবু হতাশ হন না শফিকুল সাহেব। তিনি বার-বার বৃন্দাবনে যান, আর হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। এখন অনেক বয়েস হয়ে গেছে। বেশি যেতে পারেন না। তবু বৃন্দাবনে যান। গিয়ে সেই হোটেলে ওঠেন। নতুন করে দানপত্র তৈরি করিয়ে নিয়ে যান উকিলকে দিয়ে, আর সঙ্গে নগদ টাকা। প্রত্যেক বারই কুমকুম সেই হোমের কুণ্ডে আগুনের মধ্যে তা ফেলে দেয়। আর তিনি ফিরে আসেন—তবু আবার যান।

কেশর শর্মা বললেন, এ-সব ঘটনার কথা আপনি কখনও কোথাও আগে শুনেছেন? বোধহয় শোনেননি—তাই বললাম। যদি কখনো এই গল্প লেখেন, তাহ'লে কোন পত্রিকার পূজা সংখ্যায় লিখে গল্পটাকে যেন নষ্ট করবেন না।

—:—

অনেকদিন পরে সুলতানপুরে গেলাম। সেই সুলতানপুর! নাম বললে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। বাঙলাদেশের যে কোনও গ্রামের সঙ্গেই আপনারা সুলতানপুরের তুলনা করতে পারবেন। বাঙলাদেশের কোনও গ্রামে গেলেই যেমন দেখতে পাবেন হাড়-জিরজিরে ছেলের দল, দেখতে পাবেন ভুঁড়ি-পেট কিছু বেকার বুড়ো, কিংবা ভাঙা একটা মন্দির, এই সুলতানপুরেও তাই। সুলতানপুরের সব কিছুরই যেন দৈন্য-দশা।

তবু অনেকদিন পরে আবার সেই সুলতানপুরে গেলাম। যে বাড়িতে আমি আগে বহুদিন কাটিয়েছি, সে বাড়িটার তখন আরো ভগ্নাবস্থা। বহুকাল ওখানে কেউ বাস করত না। গিয়ে দেখলাম বাড়িটার একটা ঘর তখনও খাড়া আছে।

গোলাম মোল্লা আমাদের পুরোনো প্রজা। বয়স হলেও তখন খুব শক্ত-সামর্থ্য আছে। সেই গোলামই আমার সব বন্দোবস্ত করে দিল। ঘরে ঝুল জমেছিল। তক্তপোষটার ওপর ধুলোর পাহাড় জমে উঠেছিল। বাড়িটার চারদিকে আশশ্যাওড়ার জঙ্গল কেটে সে একটা রাস্তা করলো।

গোলাম জিজ্ঞেস করলে, আপনার খাওয়ার কী হবে ছোটবাবু?

আমি বললাম, তুমিই ডাল-ভাত দুটো ফুটিয়ে দাও—

গোলাম বললে, সে কি ছোটবাবু, আমি আপনার ডাল-ভাত ফুটিয়ে দেব?

বললাম, কেন, তাতে দোষ কি? আমি অত জাত-ফাত মানি না।

গোলাম বললে, কিন্তু ধম্মো বলে তো একটা কথা আছে। আপনার ধম্মো গেলে পাপ হবে না?

বললাম, পাপ যদি হয় তো সে আমার পাপ হবে, তাতে তোমার কি?

গোলাম তবু রাজি হল না। সে কোথা থেকে এক বুড়ী বিধবাকে ডেকে তাকে দিয়েই রান্নার ব্যবস্থা করে দিলে। আমি তাকে টাকা দিলুম, সে চাল-ডাল-তেল-নুন-সবজি কিনে নিয়ে এলো। কিন্তু রান্না ছুঁলে না।

খবর পেয়ে একে একে অনেকে এলো। তাদের মুখে সব পুরোনো কালের কথা। আমার বাবা-ঠাকুর্দার আমলের পুরোনো ঐশ্বর্যের আর বিলাস-বৈভবের কাহিনী। আগে আমাদের বাড়িতে ঘোড়া ছিল, বাবা সেই ঘোড়ায় চড়ে কিভাবে মাঠের চাষ-বাস দেখতে যেতেন, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে কী রকম গ্রামের মাতব্বরদের আড্ডা বসতো, জাতপাতের বিচার হতো, সেই সব গল্প। বাবা এই চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে দু'ঘণ্টা ধরে গায়ে সরষের তেল মাখতেন, আর অশ্বিনী নাপিত পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথা টিপে দিত, গা-হাত টিপে দিত। আর এই যে বার-বাড়ির উঠোন, এখন যে-উঠোনে আশশ্যাওড়া আর ভ্যারেণ্ডা গাছের জঙ্গল হয়েছে, এইখানে বাবা গোষ্ঠ কয়ালকে চাবুক মেরেছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোষ্ঠ কয়াল কে?

—আজ্ঞে ছোটবাবু, গোষ্ঠ কয়াল হল গিয়ে শম্ভু কয়ালের ছেলে।

জিজ্ঞেস করলাম, গোষ্ঠ কয়াল কী করেছিল?

সে মুর্গী খেয়েছিল যে! হিন্দুর ছেলে মুর্গী খাবে এটা বড়বাবু কী করে সহ্য করবেন বলুন। বড়বাবু ছিল বলে তবু ছোটলোকরা একটু জব্দ ছিল তখন—

আমার বাবাকে সুলতানপুরের লোক বড়বাবু বলে ডাকত। বাবা ভোরবেলা উঠে মাঠে চলে যেতেন, যখন ফিরতেন তখন খাঁক খাঁক করত রোদ। পিছন পিছন গোলাম মোল্লা ফিরে আসত

খালি গাড়ুটা হাতে করে। বাড়িতে এসে গোলাম মোল্লা মাটি দিয়ে ভালো করে মেজে গাড়ুটা পরিষ্কার করে রেখে দিত। পরের দিন আবার কর্তাবাবুর সঙ্গে সেটা মাঠে নিয়ে যেতে হবে তাকে।

তারপর তেল মাখার পালা। ভেতর বাড়ি থেকে সরষের তেল নিয়ে আসত গোলাম মোল্লা। প্রায় এক পোয়া-তেল। বাবা চণ্ডীমণ্ডপের ওপর একটা কাঠের পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসতেন। আর গোলাম মোল্লা সেই সমস্ত তেলটা ঘষে ঘষে বাবার গায়ে মাখিয়ে দিতো।

তেল মাখতে মাখতে বাবা গোলাম মোল্লার সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন, হ্যাঁ রে, দক্ষিণের মাঠে রাজু মাতলা তো এবার এখনও বিদে দিলে না, তাকে একবার ডাক তো আমার কাছে।

তেল মাখা ছেড়ে গোলাম মোল্লা রাজু মাতলাকে ডেকে আনতে যেত। গোলাম মোল্লার সঙ্গে রাজু মাতলা হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে এসে পায়ের কাছে টিপ্ করে একটা পেন্নাম করতো।

—কী রে, কাঁপছিস কেন অমন করে?

রাজু বলত, বাবু আমার জ্বর হয়েছে—

বাবা বলতেন, জ্বর হয়েছে বলে আমার মাঠে বি'দে পড়বে না?

—আজ্ঞে হুঁজুর জ্বরটা একটু কমলেই আমি মাঠে বিদে কাঠি দেব—

—আর তোর জ্বর যদি না সারে তো আমার ফসলী জমিটা নষ্ট হবে বলতে চাস্?

তা সেই দিনই রাজু মাতলা বিদে দিতে গেল। সঙ্গে আরো অনেক মজুর নিয়ে গেল। সারাদিন রোদের তাপে খেটে বাড়িতে ফিরে আবার অসুখে পড়ল। সারারাত জ্বরের তাড়নায় বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করতে লাগল। আর সকাল থেকে একেবারে অচৈতন্য অজ্ঞান। কথাও বলে না, নড়েও না। এমন কি চোখ মেলেও চায় না।

খবরটা দু'দিন পরে বাবার কানে এলো। বাবা তখন খেতে বসেছিলেন। আধ-খাওয়া অবস্থায় উঠে পড়লেন তিনি। অনেক বলা হল ভাত খেয়ে নিতে। কিন্তু তিনি তখন বেগে অগ্নিশর্মা। বললেন, ওদিকে হারামজাদা আমার সব্বোনাশ করেছে আর আমি বসে বসে ভাত গিলব?

বলে তখনই তিনি গোলাম মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন। হ্যাঁ, প্রায় ছোটারই মতন। রাজু মাতলার বাড়িতে তখন প্রায় কান্নার রোল উঠেছে। রাজু মাতলা তখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। বাড়ির সবাই ভেবেছে রাজু বুঝি মরে গেছে। বাবা বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, কই, হারামজাদা কোথায়? হারামজাদার অসুখ করেছে আর আমাকে একবার খবরটা দিলে না!

রাজু মাতলার বউ ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে বাবুর হঠাৎ আবির্ভাবে যেন আশার আলো দেখতে পেলে। বাবা চিৎকার করে উঠলেন, কোথায়, বেটা কোথায় গেল? কোন্ ঘরে—

রাজু মাতলার বউ হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রাজুর বউয়ের কান্না শুনে বাবা ধমকে উঠলেন। বললেন, আবার শাঁকচুন্নির মতন নাকি-কান্না কাঁদছ! চুপ কর! বাড়িতে বসে কেবল কাঁদলেই চলবে! আমাকে একবার খবর দিতে পারলি নে তোরা? তোরা মানুষ না জানোয়ার, একটা লোক জ্বরে পড়ে কাতরাচ্ছে আর তোরা কিনা চুপ করে বসে আছিস? কই, সে ব্যাটা কোথায়?

ঘরের ভেতরে রাজু মাতলা একটা খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর অচৈতন্য হয়ে শুয়ে ছিল। বাবা সেখানে গিয়ে আবার ধমক দিলেন, এ্যাই ব্যাটা! কি হয়েছে তোর? ওঠ—

রাজু চোখ দুটো খুলল এতক্ষণে। চোখের সামনে বাবাকে দেখে যেন চিনতে পারলে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

চোখের জল দেখে বাবা আরো ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আবার কাঁদছিস হারামজাদা? জ্বর বাধিয়ে আবার কান্না? একটা খবর দিতে পারলিনে? আমি কি মরে গিয়েছিলুম?

রাজু মাতলার কানে বাবার গালাগালিগুলো গেল কিনা কে জানে। সে আরো কাঁদতে লাগল। বাবা গোলাম মোল্লাকে ডাকলেন।

গোলাম মোল্লা আসতেই তাকে বললেন, এই, যা তো, একবার বিশ্বম্ভর কবিরাজকে ডাক হতো। বল যেন সব কাজ ফেলে এক্ষুনি রাজু মাতলার বাড়িতে আসে—আমি এখানে অপেক্ষা করছি—

গোলাম দৌড়ে গেল বিশ্বম্ভর কবিরাজের বাড়িতে। বিশ্বম্ভর কবিরাজ তখন সুলতানপুরের নামজাদা কবিরাজ। আশেপাশের দশখানা গ্রাম থেকে তার ডাক আসে। বাড়িতে সব সময়ই লোকের ভিড় লেগে থাকে। দূর থেকে একজন লোক এসেছিল তাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যেতে। কবিরাজ মশাই তখন সে গ্রামে যাবার জন্য তৈরি। গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময়ে গোলাম সেখানে গিয়ে হাজির। বাবার নাম শুনে সব কাজ পড়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজু মাতলার বাড়ি এসে হাজির। বাবাকে দেখে প্রণাম করলে, ডেকেছেন কর্তা?

বাবা বললেন, এই দেখ কবিরাজ, ব্যাটা রাজুর কীর্তি! ব্যাটা জ্বর বাধিয়ে বসেছে আজ তিনদিন ধরে, ব্যাটা এমন হারামজাদা যে আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি। ওর জ্বর হয়েছে, যত জ্বালা আমার—

বিশ্বম্ভর কবিরাজ রাজুকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললে, হুজুর এর কফাধিক্য হয়েছে, পাঁচন খাওয়াতে হবে—

বাবা বললেন, তা পাঁচন খাওয়াও তুমি।

বিশ্বম্ভর বললে, পাঁচন তৈরি করতে কিছু খবচ করতে হবে রাজুকে—

বাবা বললেন, রাজু কী করে খরচ করবে! খরচ করব আমি। তুমি খরচের কথা ভেবো না। ও ব্যাটার কি পয়সা আছে যে খরচ করবে? ওকে বেচলেও ওর পাঁচনের দাম উসুল হবে না। ও সব আমারই গচ্চা যাবে। তুমি বাড়িতে গিয়ে পাঁচন বানাও, পয়সার জন্যে ভেবো না। ওর জ্বর সারা চাই, নইলে তোমার কবিরাজি ঘুচিয়ে দেব আমি। যাও—

বিশ্বম্ভর কবিরাজ উঠে দাঁড়াল। উঠে চলে যাচ্ছিল।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, চলে যাচ্ছ যে বড়? টাকা নেবে না?

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশ্বম্ভর।

বাবা বললেন, এসো, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে এসো—

বলে বাবা উঠলেন। উঠে বাড়ি এলেন। বিশ্বম্ভর কবিরাজও সঙ্গে সঙ্গে এলো। কবিরাজকে টাকা দিয়ে বললেন, রাজুর জ্বর যেন ছাড়া চাই। না ছাড়লে তুমি টের পাবে, হ্যাঁ—

কবিরাজকে টাকা দিয়ে বিদেয় করার পর হাত-পা-মুখ ধুয়ে আবার খেতে বসলেন। শুনেছি সেবার রাজুর অসুখ সারাতে বাবার সব সুদ্ধ একশো টাকার মতন খরচ হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব ব্যাপার সুলতানপুরের সকলেরই শোনা। বিশেষ করে যাদের বয়েস হয়েছে তারা সবাই-ই জানে। এ ঘটনা যখন ঘটেছে তখন আমি ছোটো ছিলাম। তখন আমিও গ্রামে থাকতাম।

আমাদের সুলতানপুরে তখন সভ্যতার খবর পৌঁছায়নি। আমরা থাকতাম পৃথিবীর জানালা-দরজা বন্ধ করে। পৃথিবীতে কি ঘটনা ঘটছে তা আমাদের কানে এসে পৌঁছতো না।

একদিন এক ভদ্রলোক গ্রামে এলো। নতুন কেউ গ্রামে এলে তাকে প্রথমে আমাদের বাড়িতে আসতেই হতো। এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে হতো। ভদ্রলোকও এসে বাবাকে প্রণাম করলেন। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

ভদ্রলোক বললে, কলকাতা থেকে—

—এখানে আসার উদ্দেশ্য?

ভদ্রলোক বললে, এখানে আমি একটা সভা করব, আপনাদের গ্রামে যেখানে হাট হয়, সেইখানে।

—মশাইয়ের নাম?

ভদ্রলোক বললে, বিনোদ মাইতি, আমরা জাতে মাহিষ্য।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, সভা কি নিয়ে হবে?

বিনোদবাবু বললে, আমি স্বদেশী প্রচার করতে এসেছি—কংগ্রেস আমাকে পাঠিয়েছে।

—তার মানে?

বিনোদবাবু বললে, তার মানে সভায় দাঁড়িয়ে গ্রামের লোককে আমি বিদেশী জিনিস ব্যবহার করতে বারণ করবো। আমাদের দেশে বিলেতের ম্যানচেস্টার থেকে কাপড় আসে। আমাদের বাঙালী তাঁতীরা যে কাপড় তৈরী করে সে কাপড় কেউ পরে না। তারা উপোস্ করে মরে। আর আমাদের গরীব দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের পয়সা পরের দেশে চলে যায়। তাতে বিলেতের তাঁতীরা বড়লোক হয় আর আমাদের দেশের গরীব লোকেরা আরো গরীব হয়ে যায়। এটা বন্ধ করতেই হবে। এটা বন্ধ না হলে আমাদের সকলের ক্ষতি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি যে এসব কথা বলবে তাতে দেশের ইংরেজবা রেগে যাবে না?

বিনোদবাবু বললে, তা তো রাগবেই!

—বাগলে তখন তোমরা কি করবে? ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে তোমরা পারবে? ইংরেজদের গোরা সৈন্য-সামন্ত আছে, দারোগা-পুলিশ আছে, টাকা-পয়সা আছে। যদি তোমাদের ধরে জেলে পোরে?

বিনোদ বলল, তা তো পুরছেই। কলকাতার লোক বিলিতি কাপড় আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছিল দেখে ইংরেজদের পুলিশরা তাদের ধরে জেলে পুরেছে। প্রায় দশ হাজার লোক এই জন্যে এখন জেল খাটছে। তবু তাতে কেউ ভয় পাচ্ছে না। গান্ধীজী বলেছেন...

বাবা বুঝতে পারলেন না। বললেন, গান্ধীজী কে?

বিনোদ বললে, আপনি গান্ধীজীর নাম শোনেননি? সারা ভারতবর্ষের লোক নাম শুনেছে, আর আপনি তাঁর নাম শোনেননি? তাঁকে আমরা 'মহাত্মা গান্ধী' বলে ডাকি।

—কী করে সে?

বিনোদ বল্লে, তিনি গুজরাটে থাকেন, বিলেত থেকে ব্যারিস্টাবি পাশ করে দেশে এসেছেন। কিন্তু ইংরেজদের আদালতে তিনি ব্যারিস্টারি করবেন না বলে এখন স্বদেশীর ডাক দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ, সুভাষচন্দ্র বোস, লাজপত রায়, গোখলে। দেশের সমস্ত বড় বড় লোক আছেন তাঁর সঙ্গে—

বাবা এঁদের কারোর নাম আগে শোনেননি। শুধু বাবা নন, আমাদের সুলতানপুরে কোন লোকই সে-সব নাম শোনেনি!

গ্রামে কোন নতুন লোক এলেই সেখানে মানুষের ভিড় হত। এমনিতেই সুলতানপুরে সাধারণত কোন মনে রাখবার মতো ঘটনা ঘটত না। কারোর বাড়িতে কারো ছেলের কি মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্য হলেই তিন মাস আগে থেকে লোকেরা তাই নিয়ে আলোচনা করত। কাকে সে-বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হলো আর কাকে নেমন্তন্ন করা হলো না, তাই নিয়ে সকলের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলতো। তারপর আছে অন্নপ্রাশন কি উপনয়ন।

এই সব ঘটনা নিয়েই সুলতানপুরের লোক বিভোর হয়ে থাকত। পৃথিবীতে যে নিঃশব্দে কত বিরাট বিরাট ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে, তারা কিন্তু মাথা ঘামাত বৃষ্টি নিয়ে। যেবার চৈত্র মাসে একবারও বৃষ্টি হত না, সেবার মঙ্গলচণ্ডীব মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসত মেয়েরা।

কিন্তু যদি বৈশাখ মাসেও বৃষ্টি না হতো সুলতানপুবের লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যেত। ধান বুনবে কি করে? মানুষ খাবে কী করে? এই-ই সকলের একমাত্র প্রশ্ন।

থালা থালা বাতাসা আর সন্দেশ নিয়ে মেয়েরা যেত পীরের দরজায়, আর বুড়ো শিবের

মন্দিরে। তবুও কোন কোন বছরে বৃষ্টি আসত না। তখন হতো মুশকিল। এর পর যদি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বৃষ্টি না হতো তো কান্নাকাটি পড়ে যেতো। সুলতানপুরে এইটেই ছিল একমাত্র সমস্যা। বৃষ্টি হলো কি হল না। চাষ-বাস হবে কি হবে না।

গ্রামের বারোয়ারিতলায় মনোহর শা'র গাঁজা-আফিমের দোকান ছিল। বৃষ্টি যদি না হয় তো মনোহর শার দোকানে গাঁজা-আফিমের বিক্রি কমে যাবে। তার পকেটেও টান পড়বে। সুতরাং বৃষ্টির সঙ্গে মনোহর শা'র সম্পর্কও ছিল বড় ঘনিষ্ঠ।

আর ছিল শরৎ আড্ডির দেশী ভাঁটিখানা। দেশী মদের ব্যবসা করে শরৎ আড্ডি বেশ পয়সা কামিয়েছিল। শরৎ আড্ডির গলায় সোনার চেন ঝুলত। শরৎ আড্ডি ভোরবেলায় দোকানে এসে বসত আর তারপর যখন তার ছেলে ভুপেন এসে বসত তখন আড্ডির ছুটি। তখন শরৎ আড্ডি বাড়িতে খেতে যেত। চাষীদের মাঠে ফসল হলে শরৎ আড্ডির লাভ।

বৃষ্টি আসবে কিনা দেখবার জন্য শরৎ আড্ডি আকাশের দিকে চেয়ে দেখত। রাস্তা দিয়ে নিমাই যাচ্ছিল। শরৎ আড্ডি ডাকলে। বললে, ও নিমাই, কোথায় যাচ্ছ?

নিমাই শরৎ আড্ডির ডাক শুনে দাঁড়াল। বললে, আমাকে ডাকছেন আড্ডি মশাই?

শরৎ আড্ডি বললে, ক'দিন তোমার দেখা নেই কেন গো?

—হাত তো এখন ফাঁকা আড্ডি মশাই, তাই আসতে পারিনি।

—হঠাৎ হাত ফাঁকা হল কেন? অসুখ-বিসুখ হল নাকি?

—আজ্ঞে না বৃষ্টি হয়নি, ক্ষেত-খামারের কাজ বন্ধ।

সুলতানপুরের অনেক লোক ক্ষেত-খামারে কাজ করে দু-পয়সা কামাত। বৃষ্টি না হলে তাদেরও আকাল চলত। সন্ধ্যাবেলা খাটাখাটুনির পর যে শরৎ আড্ডির দোকানে এসে একটু মৌজ করবে তারও উপায় নেই। বৃষ্টি না হলে যেমন রাজু মাতলাদের কেউ ডাকে না, তেমনি শরৎ আড্ডি কি মনোহর শা'রও অসুবিধে।

আবার এর ওপর যদি অতিবৃষ্টি হয় তো তাতেও সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। তখন অত কষ্টের ধান-পাট-সরষে-কলাই সব ডুবে যায়। তার সঙ্গে ডুবে যায় রাস্তা-ঘাট। বৃষ্টির সময়েই শরৎ আড্ডির দোকানে একটু কেনা-বেচা বাড়ে। তখন শরৎ আড্ডির দোকানের সামনের দিকে এক কোণে এককড়ি তেলেভাজা ভাজতে বসে যেত।

এককড়ি সারা বছর ক্ষেত-মজুর করে। তখন কিছু কামায়, যখন খোরাকিযটাও সে পায় নিয়ম করে। কিন্তু বর্ষাকালে সে-সব কাজ বন্ধ। তখন তেলেভাজার দোকান দে । অনেক রাত পর্যন্ত তার দোকান খোলা থাকে। টিমটিমে একটা কেরোসিনের লম্ফ'র সামনে বসে সে বেগুনি, আলুর চপ, পেঁয়াজি ভাজে। যারা শরৎ আড্ডির দোকান থেকে বেরোয় তারা এককড়ির দোকানে গিয়ে উবু হয়ে বসে। এককড়ি তখন এক একটা করে তেলেভাজা ভাজে আর শালপাতা-পরিবেশন করে।

দু'পয়সার একটা আলুর চপ। তাও সবাই আপত্তি করে। বলে, দামটা বড্ড বেশি রেখেছ গো এককড়ি। এইটুকু টুকু আলুর চপ, তার দামও দু'পয়সা—

এককড়ি বলে, আলুর দামটা কী রকম বেড়েছে, তাই আগে বল। ভাবছি সামনের মাস থেকে আলুর চপ আরো ছোট করে দেব—

নিমাই বলে, তাহলে একবারে ধনে-প্রাণে মরে যাবো এককড়ি। মাঠে কাজ-কম্মো নেই, এই সময়ে তুমি কিনা আলুর চপটাও ছোট করে দেবে! তাহলে মাল খেয়ে সুখ কী বল তো?

এককড়ি বলে, আর তেল? তেলের দামটা কি রকম চড় চড় করে বাড়ছে, সেদিকে তোমাদের খেয়াল আছে? এত খেটে যদি পকেটে একটা পয়সাও না আসে তাহলে দোকান করে লাভটা কি? যদি দুটো পয়সা পকেটে না আসে তো ভূতের বেগার খাটতে যাব কেন? তোমরাই বলো?

এরপর আর কারো আপত্তি করবার কিছু থাকে না। সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছে মনে করে সবাই তেলেভাজা চিবোতে থাকে। শরৎ আড্ডির মালের সঙ্গে গরম তেলেভাজা যেন অমৃত। তারপর যখন নেশায় সকলের চোখ জড়িয়ে আসত, তখন একে একে সবাই টলতে টলতে বাড়ি চলে যেত। এই-ই ছিল বলতে গেলে তখনকার সুলতানপুরের হালচাল।

কিন্তু সুলতানপুরের তখন আর একটা দিকও ছিল। সেটা বাইরে থেকে তেমন দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে বোঝা যেত। গুণধর কর্মকারের ছেলে ভানু সদরের কলেজ থেকে পাশ করে বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি-বাকরি পাওয়ার কোন আশাও ছিল না তার। সে সুলতানপুরের আরো কিছু বেকার ছেলের সঙ্গে তাস খেলত।

গুণধর কর্মকার গরুর গাড়ির চাকা তৈরী করে কিছু পয়সা কামিয়ে ছিল। নিজের বাড়ির সামনে তার ছিল কারখানা। সে করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করত। কিম্বা হাপরের সামনে বসে বিদে কাঠির দাঁতগুলো হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে ধারালো করত। লাঙলের সামনে যে লোহার ফলা থাকে সেটা কিছুদিন জমি চাষ করার পর ভোঁতা হয়ে যায়। চাষীরা গুণধরের কাছে আসত সেই ফলাটা ধারালো করতে।

গুণধরকে অনেকদিন দেখেছি সে গণ্‌গণে গরম লোহাব ওপরে হাতুড়ি পিটছে। তার কারখানার সামনে দিয়ে খেয়াঘাটে যাওয়ার রাস্তা। যদি সমবয়েসী কেউ আসত তো তাকে গুণধর ডেকে বসাত। বলত ও খুড়ো, কোথায় চলেছ?

ষষ্ঠী দাস চাষী মানুষ। সামান্য কয়েক বিঘে জমির মালিক। বললে, যাচ্ছি ভাই একবার দুবরাজপুরে।

গুণধর জিজ্ঞেস করলে, দুবরাজপুরে? দুবরাজপুরে তোমার কি কাজ?

ষষ্ঠী দাস বললে, যাচ্ছি আমার মেয়েটার বিয়ের একটা সম্বন্ধ করতে। ওখানে গোবিন্দ পালের একটা বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে শুনেছি। দেখি, যদি রাজি হয় গোবিন্দ পাল—

গুণধর বললে, তা যাবে অখন। এখন তো বেলা বেশি বাড়েনি। একটু তামুক খেয়ে যাও।

তামাকের ব্যাপারে ষষ্ঠী দাসের দুর্বলতা ছিল। সেখানেই একটা চেলা কাঁঠের ঢিবির ওপর বসে পড়ল। বললে, বেশিক্ষণ বসব না গুণধব, এক কোশ রাস্তা যেতে—

গুণধর বললে, আরে, যাবে'খন। আমি কি তোমাকে আটকে রাখব? আমারও তো হাতে অনেক কাজ আছে। সাজা তামাক ফেলতে নেই।

হাপরের সামনে কাঠের আগুন থেকেই চিম্‌টে দিয়ে গোটা কতক জ্বলন্ত কাঠের আগুনের ড্যালা তুলে নিয়ে কল্‌কেতে দিলে। তারপর কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে বললে, তুমিই আগে ধরাও—

ষষ্ঠী দাস হুঁকো টানতে টানতে বললে, তোমার ছেলে এখন কি করছে হে?

গুণধর বললে, ছেলে আর কী করবে, পাশ কবে বসে আছে, আর সকাল-সন্ধ্যেয় তাস খেলছে—

—তা এইবার তোমার কারবারে ঢুকিয়ে দাও। তুমি থাকতে থাকতে তোমার কাজটা হাতে কলমে শিখে নিক।

গুণধর বললে, আজকালকার ছেলেরা যদি বাপের কথা শুনবে আর কলিকাল বলছে কেন? সে ততক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলবে—

একজনের ছেলের অকর্মণ্যতার অভিযোগ আর একজনের মেয়ের বিয়ের অনিশ্চয়তা। দু'জনেই দুঃখী। দু'জনের দুঃখের কথা বলতে বলতেই ছিলিম তামাক পুড়ে যায়। একজনেব হাত থেকে হুঁকোটা আর একজনের হাতে যায়। হুঁকো হাত-ফেরতা হতে হতেই বেলা বাড়ে। তখন দু'জনেরই খেয়াল হল যে বেলা দুপুর হয়ে গেছে। তখন দু'জনেরই হুঁশ হয় যে কাজ-কর্ম নষ্ট হয়ে গেল। তখন দু'জনেই ওঠে। গুণধর বাড়ির ভেতরে যায় খাওয়া-দাওয়া করতে।

ষষ্ঠী দাসও বাড়ির দিকে যায়। বলে, আজ আর দুবরাজপুরে যাওয়া হল না, পরে একদিন যাব—

সুলতানপুর ছোট গ্রাম। ছোট গ্রাম বলে কিন্তু সুলতানপুরের মানুষের সমস্যাগুলো ছোট নয়। বৃষ্টি না হলে তারা যেমন সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে, তেমন বেশি বৃষ্টি হলেও আবার সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে। মনোহর শা'র দোকানে তখন নেশাখোরের ভিড় কমে যায়, শরৎ আড্ডির মদের দোকানেও আর তেমন খদ্দের-পাতি থাকে না। নেশার জিনিস। একেবারে যে বিক্রি হয় না তা নয়। বিক্রি ঠিকই হয়, কিন্তু খদ্দের কমে যায়। নিমাইয়ের তেলেভাজার দোকানে তখন আর তেমন ভিড় জমে না। রাজু মাতলা আমাদের বাড়ি এসে বাবার কাছে বসে। তার সঙ্গে বাবার চাষ-বাসের কথা হয়। গোলাম মোল্লা বাবাকে তেল মাখায় আর বাবা তেল মাখতে মাখতে বলেন. এবার পশ্চিমের জমিতে ছোলা বুনবো, জানিস রাজু—

রাজু বলে, খুব ভালো হবে হুঁজুর, ও জমিতে ছোলা খুব ভালো হবে—

যেদিন বিনোদ মাইতি সুলতানপুরে এলো সেদিন বাবা তেল মাখছিলেন।

বললেন, সভা করো তুমি, আমি যাব তোমার সভা শুনতে—

বিনোদ মাইতি বলে, আপনি গেলে তো ভালোই হয়। আমি একটু সাহস পাই—

বাবা বলেন, তুমি ভালো ভালো কথা বলবে আর আমি শুনব না?

বিনোদ মাইতি বলে, তাহলে যদি গ্রামের পাঁচজনকে বলে দেন তাহলে খুব ভালো হয়।

বাবা বলেন, নিশ্চয়ই বলে দেব। বলে গোলাম মোল্লাকে বলেন, এই গোলাম, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় তো যে আজকে বিকেলে বারোয়ারিতলায় সভা হবে, সবাই যেন সেখানে হাজির থাকে।

গোলাম মোল্লা জিজ্ঞেস করলে, কাকে কাকে খবর দেব?

বাবা বললেন, সবাইকে। ওই মনোহর শা, শরৎ আড্ডি, গুণধর কর্মকার, শম্ভু কয়াল। আর বিশ্বম্ভর কবিরাজ মশাইকেও বলবি। যাকে সামনে পাবি তাকেই বলবি। বলবি আমিও থাকবো সভায়।

গোলাম মোল্লা তখন বাবাকে চান করাতে বসল। বার-বাড়ির কুয়ো থেকে জল তুলে সে বাবার মাথায় জল ঢালতে লাগল। এ তার প্রত্যেক দিনের কাজ। চান করে উঠে বাবা তামাক খেতে বসবেন। সে তামাকও গোলাম মোল্লা সেজে দেবে। তামাক খেয়ে তিনি কাপড় বদলে অন্দরবাড়িতে ভাত খেতে যাবেন।

বাবাকে তামাক সেজে দিয়েই গোলাম মোল্লা বেরোল। সবাইকে বলে এলো মিটিং-এর কথা। প্রথমে গেল মনোহর শা'র দোকানে, তারপর শরৎ আড্ডির আড্ডায়। তারপর খেয়াঘাটে যাবার পথে গুণধর কর্মকারের কারখানায়, তারপর বিশ্বম্ভর কবিরাজের ডাক্তারখানায়। সবাই জিজ্ঞেস করলে, কীসের সভা হবে?

—আজ্ঞে স্বদেশী-সভা। দেশের ভালোর জন্য বিনোদ মাইতি মশাই বলবেন।

তারা জিজ্ঞেস করলেন, বিনোদ মাইতি কে?

গোলাম মোল্লা বললে, তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। বড়বাবু বলেছেন তিনিও সভায় থাকবেন। আপনারা যাবেন কিন্তু—

সবাই-ই কথা দিলে যে যাবে। খবরটা পৌঁছে গেল ভানু কর্মকারদের তাসের আড্ডাতেও। ভানু কর্মকার বেকার, কিন্তু পাশ করা ছেলে। সারাদিন ধুতি ফেরতা মেরে তেড়ি বাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কোন কিছু কাজ না থাকলে বারোয়ারিতলায় এসে বসে। একটা বাঁশের মাচা করা আছে সকলের জন্য। খালি থাকলে যে কেউ এসে বসে সেখানে। দিন আর কাটতে চায় না। তারাপদকে দেখে ভানু বলে, কী রে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

তারাপদ বলে, গঞ্জে যেতে হয়েছিল—

ভানু জিজ্ঞেস করে, গঞ্জে কী করতে?

—মাছ কিনতে?

—হঠাৎ মাছ কেন রে? কেউ এসেছে নাকি বাড়িতে?

তারাপদ বলে, জামাইবাবু আসবার কথা আছে সন্ধ্যেবেলা। বাবা তাই গঞ্জে পাঠালে।

গোলাম মোল্লা ভানু আর তারাপদকে মাচার ওপর বসে থাকতে দেখে বললে, আপনারাও সভায় আসবেন কিন্তু—

ভানু বুঝতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলে, কিসের সভা?

গোলাম মোল্লা বললে, আমাকে বড়বাবু খবর দিতে বলেছেন সবাইকে। কলকাতা থেকে লোক এসেছে সুলতানপরে। বিনোদ মাইতি মশাই। তিনি আজ এই বারোয়ারিতলায় বিকেলবেলায় সভা করবেন।

—কেন, কেন সভা করবেন?

—তা জানিনে। দেশের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলবেন সবাইকে। আমাকে বড়বাবু সবাইকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের বাড়িতে গিয়ে গুণধর খুড়োমশাইকে বলে এসেছি, তিনিও আসবেন।

তারাপদ বললে, কিন্তু কি করে আসব? আমাদের যে তাস খেলা আছে ঐ সময়—

—একটা দিনের জন্যে তাস না-ই বা খেলেন।

ভানু বললে, আরে, তাস খেলা কি বন্ধ রাখা যায়।

গোলাম মোল্লা বললে, একটুখানি সভায় নাম মাত্তোর এসে না হয় তাস খেলতে যাবেন—

সেদিন সুলতানপর গ্রামের সমস্ত লোকই জেনে গেল যে বড়বাবুব হুকুমে সকলকে বিকেলবেলায় বারোয়ারিতলায় যে সভা হবে তাতে আসতে হবে।

বারোয়ারিতলাটা সুলতানপুর গ্রামের একেবারে কেন্দ্র বললে ঠিক বলা হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে কিংবা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে গেলে ওই বারোয়ারিতলায় আসতেই হবে। যাত্রা বলো, পাঁচালি বলো, হাটবাজারই বলো সব কিছু হয় ওই বারোয়ারিতলায়। শনিবার সুলতানপুরে যে হাট বসে তা ওই বারোয়াবিতলাতেই। সেদিন ওই হাটে কেনা-বেচা করতে নানান্ গ্রাম থেকে লোক আসে। যার ক্ষেতে যা হয় তাই এনে তারা হাজির করে বারোয়ারিতলায়।

কিন্তু ওই শুধু শনিবারটাই। সন্ধ্যের পর বারোয়ারিতলা আবার খাঁ খাঁ করে। তখন চারপাশে যে ক'টা দোকান আছে তারও ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। তখন অন্ধকারের আড়ালে কেউ কেউ ঢোকে শরৎ আড্ডির শুঁড়িখানায়, আবার কেউ কেউ ঢোকে মনোহর শা'র গাঁজা আফিমের দোকানে। শরৎ আড্ডির দোকানের সামনের সদর দরজা বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে গিয়ে বোতল কিনে নেয়। শরৎ আড্ডি কাউকে বঞ্চিত করে না। তারপর অন্ধকাবে গা ঢাকা দিয়ে সবটুকু খেয়ে নিয়ে নিমাইয়ের তেলেভাজার দোকানে এসে বসে। শালপাতার ঠোঙায় গরম তেলেভাজা চিবিয়ে খেতে খেতে টলতে টলতে বাড়ি যায়।

এই পরিস্থিতিতেই সুলতানপুরে এসে হাজির হল বিনোদ মাইতি।

গঞ্জের বাজারে আগে একদিন মিটিং হয়ে গেছে। সেখানে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হয়েছে। পুলিশ হামলা করেছে। সে খবর সুলতানপুরে এসে পৌঁছয়নি। বিনোদ মাইতি একলা নয়, তার সঙ্গে আরো দু-তিনজন এসে হাজির হল সুলতানপুরের বারোয়ারিতলায়।

বারোয়ারিতলায় একটা পাঠশালা আছে বহুদিনের। সরকারের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মশাইয়ের মাইনে আসে পাঁচ টাকা। সেই পাঁচ টাকাতেই পণ্ডিত মশাইয়ের ভাত কাপড়ের সমস্যা মিটে যেত।

মিটিংয়ের দিন পাঠশালার একটা চেয়ার ও দুটো বেঞ্চি এনে রাখা হল বারোয়ারি বটগাছের

তলায়। আস্তে আস্তে লোক জমতে লাগল। বাবা গিয়ে বসলেন একটা বেঞ্চিতে। বিনোদ মাইতি বাবাকে বললে, আপনি একটু আমাদের কথা বলে দিন কর্তাবাবু।

বাবা বললেন, আমি কি বলব বল?

বিনোদ মাইতি বললে, আপনি বলুন আমার নাম করে। বলবেন, আমরা দেশের লোকেদের ভালো ভালো কথা শোনাতে এসেছি, যাতে দেশের মানুষের অবস্থা ফিরে যায় তাই বলতে এসেছি—আর বলবেন যেন কেউ বিলিতি কাপড় জামা না কেনে—

বাবা উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আজ সুলতানপুরের ইতিহাসে এক শুভদিন। তোমরা যারা এখানে এসে হাজির হয়েছ, তারা সবাই শোনো। এতদিন তোমরা এই বারোয়ারিতলায় যাত্রা শুনেছ, কবির লড়াই শুনেছ, হাফ আখড়াই শুনেছ, কিন্তু স্বদেশীর কথা শোনোনি। আমাদের সুলতানপুরের এই বারোয়ারিতলায় এবার কলকাতা থেকে তোমাদের কাছে একজন এসেছে যার নাম বিনোদ মাইতি। এই যে আমার পাশে বসে আছে। এই ছেলেটি আমার কাছেই প্রথম আসে, এসে আমার অনুমতি চায়। আমি একে বক্তৃতা করবার অনুমতি দিয়েছি। এ যা বলবে তা তোমরা মন দিয়ে শোন্। আমি আর কিছু বলব না। এবার তোমরা ওর কথা শোন—বলে বাবা বসে পড়লেন। সবাই হাততালি দিল একসঙ্গে।

হাততালি দেওয়া শেষ হলে বিনোদ মাইতি মশাই উঠে দাঁড়াল। বিনোদ মাইতির গলাটা খুব মিষ্টি। সেই মিষ্টি গলায় বিনোদ মাইতি বলতে আরম্ভ করলে—

ভাই সব, আমি কলকাতা থেকে এই সুলতানপুরের মানুষদের কাছে কিছু বলতে এসেছি। আমি এখানে আসবার আগে আরো অনেক গ্রামে গিয়েছি। সেখানেও তাদের আমি অনেক কথা বলে এসেছি। আজ সুলতানপুরের লোকদেরও সেইসব কথা শোনাতে চাই। আচ্ছা ভাই, একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞেস করি—তোমরা যে দেশে বাস করো এ দেশ কি তোমাদের?

সামনে কিছু কিছু লোক বললে, হ্যাঁ, এ দেশ আমাদের—

—তা এ-দেশ যদি তোমাদের হয় তাহলে এ দেশের রাজা কে?

সবাই বললে, ইংরেজ।

বিনোদ মাইতি বললে, ঠিক বলেছ তোমরা। কিন্তু এ দেশ যদি তোমাদের হয় তাহলে তোমাদের মধ্যেই একজন রাজা হওয়া উচিত। অথচ তোমাদের রাজা হলো ইংরেজরা! সেই ইংরেজদের রাজা কোথায় থাকে জানো?

উত্তরটা কেউ জানত না। বাবা মনোহর শা'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী গো মনোহর, তুমি চুপ করে রইলে কেন, জবাব দাও ইংরেজদের রাজা কোথায় থাকে?

মনোহর শা কী বলবে বুঝতে পারলে না। মনোহর শা গাঁজা-আফিমের দোকান করে আর ইউনিয়ন বোর্ডে দরখাস্ত করে লাইসেন্স পায়। তার জন্যে একটা নামমাত্র নিলেম হয় বছরে বছরে। কিন্তু প্রত্যেক বছরেই একটা মোটা রকমের টাকা অফিসের বড়বাবুর হাতে গুঁজে দিতে হয়। আর কিছুর খবর রাখে না ও, রাখতে চায়ও না।

বাবা এবার শরৎ আড্ডির দিকে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী গো শরৎ, তুমি জানো?

শরৎ আড্ডি মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি বাতের ব্যথা নিয়ে বারবার জ্বলছি, আমার খবর রাখবার ফুরসৎ হয়নি!

বাবা বললেন, তা বাতের ব্যথার সঙ্গে আমাদের রাজার কি সম্পর্ক? তোমার ছোট বয়সে তো আর বাতের ব্যথা ছিল না—

বাবা বিনোদ মাইতির দিকে চেয়ে বললেন, আমাদের সুলতানপুর একেবারে পাড়াগাঁ যাকে বলে, দেখছ তো? শুনছ তো ওদের কথা? ওরাই আবার এ গাঁয়ের সব মাথা—

বিনোদ মাইতি বলতে লাগল, ইংরেজের রাজা থাকে সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে আমাদের এই দেশ শাসন করছে। এবার তোমরা

বুঝতে পারলে কেন আমাদের এত দুর্দশা? আমরা কেন পেট ভরে খেতে পাই না? আমরা কেন বছরে একটার বেশি কাপড় পরতে পাব না? তোমরা যেমন তোমাদের রাজার খবর রাখো না, তোমাদের রাজাও তেমনি তোমাদের খবর রাখে না। তোমাদের দুঃখের কথাও রাজার কানে পৌঁছায় না।

বাবা এতক্ষণ বিনোদ মাইতির কথা শুনছিলেন। বললেন, তাহলে আমাদের খবর রাজাব কানে কী করে পৌঁছে দেওয়া যায়?

বিনোদ মাইতি বললে, পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে বিলেতের যে-সব জিনিস এখানে আমদানী হয়, তা বয়কট করা?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, বয়কট মানে?

বিনোদ মাইতি বললে, সেই কথা বলতেই তো আমি আজ সুলতানপুরে এসেছি। বয়কট মানে পরিত্যাগ করা। মানে সে জিনিস না ব্যবহার করা। বিলেত থেকে আমাদের দেশে সাহেবদের কলে তৈরি কাপড় আমদানি করা হয, তা তো জানো তোমরা? সেই কাপড় তোমরা কিনবে না, তাহলে সাহেবদের কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে যাবে। ইংরেজরা আসার আগে আমরা কি কাপড পরতাম না? আমরা কি উলঙ্গ হযে থাকতাম। আমাদের দেশেও তখন তাঁতী ছিল। তাবা দেশী সূতো দিয়ে তাঁত বুনে কাপড় তৈরি করত। তখন সেই কাপড় কিনত বিলেতের লোকেরা। কিন্তু সেই তাঁতীবা আজ কোথায় গেল? সেই কাপড়ই বা পবে না কেন কেউ? কেন তাঁতীদের ভাত গেল? কে তাদের ভাত মারলে? তোমরা বলো, কেন তাদের কাববার লাটে উঠল। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলার তাঁতীরা আজ উপোষ করছে। বলো, আমার কথার জবাব দাও তোমরা। আমি তোমাদেরই জিজ্ঞেস করছি সে-কথা। কেন? কেন? এ চালাকি কাদের? কারা আমাদের এ সর্বনাশ করলে?

সমস্ত সভা তখন নিস্তব্ধ। অত বড় বারোয়ারিতলায় তখন আর তিল ধারণের জায়গা নেই। আগেও তারা এখানে যাত্রা শুনতে এসেছে, মা মনসার ভাষণ-গান শুনতে এসেছে। কোন না কোন উৎসব হলেই তারা এখানে আসে গান-বাজনা-খেমটা নাচ শুনে তারা মজাও পেয়েছে। তারপর বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এ সব কথা সুলতানপুরের কেউ কোনদিন শোনেনি।

বিনোদ মাইতি আবার বললে, বলো, বলো কারা আমাদের এই সর্বনাশ করলে?

বাবা শরৎ আড্ডির দিকে চেয়ে বললেন, বলো শরৎ, তুমি জবাব দাও, কারা আমাদের এ সর্বনাশ করলে?

শরৎ আড্ডি মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে, বিলেতের সায়েবরা—

বিনোদ মাইতি শরৎ আড্ডির কথা শুনে খুশি হল। বললে, ঠিক বলেছ তুমি। সায়েবদের জন্যেই আমাদের এই সর্বনাশ হল। কিন্তু কি করে তারা আমাদের এই সর্বনাশ করলে?

কেউ আর কিছু বলে না। সবাই চুপ। সুলতানপুরের বারোয়ারিতলার বটগাছে একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডেকে উঠল। চারিদিকের ওই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্যাঁচার ডাকটা বড় কর্কশ ঠেকল সকলের কানে।

বিনোদ মাইতি বললে, ওই প্যাঁচার ডাক থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ, এটা একটা গর্হিত কাজ। প্যাঁচারাই বুঝতে পারে কোন্‌টা শুভ কাজ করে কোন্‌টাই বা অশুভ কাজ। যেদিন বিলেত থেকে সায়েবরা এই দেশে এসেছিলেন সেদিন ঐ প্যাঁচা ডেকেছিল কিনা কেউ জানে না। হয়তো ডেকেছিল, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা তার ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি। অথচ আমাদের দেশে দেশী তাঁতীদের তৈরি কাপড় আগে রোম দেশে রপ্তানি হতো, ইটালি দেশে রপ্তানি হতো। ইংরেজরা দেখলে আমাদের দেশে তাঁতীদের তৈরি কাপড়ের যদি বিদেশের বাজারে অত চাহিদা থাকে, তাহলে তাদের দেশের তৈরি কাপড় তো কেউ কিনবে না। তখন তারা এক অমানুষিক অত্যাচার

করতে লাগল। তারা আমাদের ভালো ভালো নামজাদা তাঁতীদের ধরে তাদের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে দিতে লাগল, যাতে তারা আর কাপড় তৈরি করতে না পারে। তারপর থেকে সায়েবদের তৈরি কাপড় এসে আমাদের দেশের বাজার ছেয়ে ফেললে। এমনি করে আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা চলে যেতে লাগল বিদেশে। তারা সেই টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে গেল, আর আমরা হয়ে গেলুম গরীব।

বাবা এতক্ষণ সব শুনছিলেন। এবার বললেন, তাহলে তো খুব খারাপ কাজ মাইতি মশাই। এর কি প্রতিবিধান।

বিনোদ মাইতি বললে, এর কি প্রতিবিধান তা তোমরাই আমাকে বল। বলে দাও কি করলে আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা আর সায়েবদের দেশে চলে যেতে না পারে। বলো, তোমরাই বলো আমাকে।

সবাই চুপ করে রইল। বিনোদ মাইতি বললে, তোমরা বোধহয় এ-সব কথা আগে কখনও ভাবোনি, তাই এর জবাব দিতে পারছ না। কিন্তু আমরা অনেক ভেবেছি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ভেবে তুমি কি সমাধান বার করেছ?

বিনোদ মাইতি বললে, আমরা ভেবে ভেবে এই সমাধান বাব করেছি যে আমরা বিলিতি কোন জিনিস ব্যবহার করব না। আমরা যদি বিলিতি জিনিস ব্যবহাব না করি তাহলে সাহেবরা উপোস্ করবে। সাহেবদের কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের যত কারিগর সব বেকার হয়ে যাবে। আমরা যদি বিলিতি কাপড় না কিনি তো তাদের দেশে ম্যাঞ্চেস্টাবের কারখানায় যে কাপড় তৈরি হয় তা বিক্রি হবে না। তখন সাহেবরা জব্দ হবে। তোমাদের বাড়িতে যেসব বিলিতি কাপড় আছে সমস্ত আজই পুড়িয়ে ফেল। আর প্রতিজ্ঞা করো যে কেউই আর কখনও বিলিতি কাপড় কিনবে না—

সবাই চুপ করে থেকে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বাবা বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও বিলিতি কাপড় কিনব না—

মনোহর শা বললে, বিলিতি কাপড় কিনব না তো তাহলে কি পরব?

বিনোদ মাইতি আবার বললে, কেন, আমি যে কাপড় পরেছি তা কি খারাপ? এ একটু মোটা কাপড় বটে, কিন্তু নিজের দেশের তুলোয় তৈরী সূতোয় নিজের দেশের তাঁতীর তৈরী কাপড় পরতে লজ্জা কী?

মনোহর শা বললে, এ-কাপড় কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে?

গঞ্জের বাজারে এই কাপড়ের দোকান আমরা খুলেছি। সেখানে গেলেই তোমরা কিনতে পাবে এ-কাপড়। এককালে আমাদের দেশের লোক তো এই কাপড়ই পরত। তখন তো তা পরতে কারো লজ্জা করত না। এসো আজই আমরা বিলিতি কাপড় পোড়াতে আরম্ভ করে দিই, তোমরা তোমাদের বাড়িতে যার-যার বিলিতি কাপড় আছে, সব নিয়ে এসো, আমি নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে দেব—

বাবা গোলাম মোল্লাকেও আমাদের বাড়ি থেকে সব বিলিতি কাপড় আনতে বললেন। মনোহর শা'ও বাড়ি গেল বিলিতি কাপড় আনতে। শরৎ আড্ডিও গেল। সভার অনেকেরই একখানা-দু'খানা বই কাপড় ছিল না। যাদের বেশি কাপড় জামা ছিল সবাই তা নিয়ে এসে জড়ো করল।

বিনোদ মাইতি বললে, তোমরা হয়তো ভাবছ এই ক ৮। কাপড় পুড়িয়ে সাহেবদের কী আর ক্ষতি হবে? কিন্তু তোমাদের জানিয়ে দিই, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়েই আমরা এই রকম কাপড় পোড়াচ্ছি। আরো অনেক গ্রামে আমাদের যেতে হবে। সব গ্রামেই আমাদের বিলিতি জিনিসের বিক্রি বন্ধ করতে হবে। দেশ থেকে সাহেবদের তাড়াবার আর কোন উপায় নেই। আমাদের হাতে বন্দুক নেই, পিস্তল নেই, আর ওদের হাতে আছে রাইফেল, কামান সব কিছু। লড়াই করে

তাদের সঙ্গে আমরা পারব না। এই বিলিতি জিনিস বর্জন করেই ওদের আমরা দেশ থেকে তাড়াব। ভাই সব, তোমরা আমার গলায় সুর মিলিয়ে বলো, 'বন্দেমাতরম্'—

সভায় যত লোক ছিল সবাই বিনোদ মাইতির গলার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, বন্দেমাতরম্—

সেই শব্দে বটগাছ যত পাখি হুটপাট্ করে উড়ে পালাল।

তারপরে জড়ো করা কাপড়গুলো বিনোদ মাইতি এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে তাতে দেশলাই কাঠি জ্বেলে তার ওপরে ফেলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের হল্‌কায় বটগাছের নিচেকার ডালের পাতাগুলো ঝল্‌সে উঠল। আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠল সুলতানপুরেব আকাশ। একেবারে লালে লাল। সেই আগুন দেখে আরো অনেক লোক এসে বারোযাবিতলায় জডো হল।

আগুনে যখন শিখা বাব হয়ে চারদিকে ছডিযে যাচ্ছে তখন বিনোদ মাইতি আবার চেঁচিয়ে উঠল, বলো ভাই সব, বন্দেমাতবম্—

সবাই চিৎকার কবে উঠল এক সুবে, বন্দেমাতরম্—

সুলতানপুবের গবীবদেব সামান্য যা-কিছু কাপড় ছিল সব পুডে ছাই হয়ে গিযেছিল।

এই ছিল তখনকার সুলতানপুব। সুলতানপুরের মানুষ বড় সহজ সরল। বিশেষ করে শহরের ভদ্রলোকদের কথা বড সরল মনে বিশ্বাস কবত। গ্রাম্য রাজনীতি বলে যে কথা আছে, তা সেখানকার কেউ জানত না। খাওয়া-পরার অভাব ছিল বটে, কিন্তু তার জন্যে যে পরের জিনিস চুরি করতে হবে, তা তাবা জানত না। যদি তারা কোন কষ্ট পেত না কোন অসুখে ভুগত তাহলে ভগবানকে ডাকত। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করত। মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দিত।

বিনোদ মাইতি মশাই যেদিন এসে বিলিতি কাপড় পুড়িযে দিলে সেইদিন তারা বুঝল যে তাদের দুঃখ-কষ্টেব জন্য দাযী ভগবান নয়, ইংরেজ। তারাই তাদের এমন কষ্টের মধ্যে বেখেছে। এ-সব কথা সুলতানপুবেব কেউ জানত না।

বিনোদ মাইতি মশাই আবাব গঞ্জে চলে গেল। যাবার সময বলে গেল সে আবার একদিন আসবে। আরো বলে গেল, আমি এখানে এসে তখন কংগ্রেসের একটা অফিস খুলব—

নিমাই জিজ্ঞেস কবলে, কংগ্রেস কী?

বাবাও জিজ্ঞেস কবলেন, কংগ্রেস কী গো?

তখন কেউই জানে না কংগ্রেস কি বস্তু। বাইরের সব লোক জেনে গেছে কংগ্রেসেব মানে। কিন্তু সুলতানপুর আমাদেব এমন এক গ্রাম যেখানে বাইরের কোন খববই ঠিক সময়ে আসে না। যদিও বা আসে তো তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। ততক্ষণ ভাত-কাপডের চিন্তা করতেই তাদের পুরো সময় চলে যায়। তার ওপর আছে জন্ম-মৃত্যু বিয়ের চিন্তা। জন্ম হলে কোন সমস্যা নেই। মৃত্যু হলেও তেমন কিছু সমস্যা নেই। মৃত্যু হলে চার-পাঁচজন লোক মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিযে পুড়িয়ে আসে।

কিন্তু বিয়ে নিযে সমস্যাটা সবচেয়ে বড় কঠিন সমস্যা। বিশেষ করে মেয়ের বিয়ের সমস্যা। মেয়ের বিয়ের জন্যে সোনা-দানা দিতে হবে। পণ-যৌতুকও দিতে হবে। তারপর আছে বরপক্ষের বাড়িতে গিয়ে খোসামোদ। এই সমস্ত করলেও অনেক সময় অনেক মেয়ের অনেকদিন পর্যন্ত বিয়ে হয না।

তা এই যখন সুলতানপুরের অবস্থা তখন কোথা থেকে কোন্ এক বিনোদ মাইতি এসে সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল। তখন বারোয়ারিতলায়, শরৎ আড্ডি আর মনোহর শার দোকানে কেবল ওই নিয়েই আলোচনা।

গুণধর কর্মকার নিজের কারখানায় বসে সেই আলোচনাই করে। রাস্তা দিয়ে রাজু মাতলা যাচ্ছিল, তাকে ডাকল গুণধর। বললে ও রাজু, এত সকালে কোথায় চললে?

রাজু মাতলার কাঁধে লাঙল, আর সামনে দুটো দামড়া গরু। গুণধর কর্মকারের ডাকে কাছে এলো। বললে, পশ্চিমের মাঠে চাষ দিতে যাচ্ছি—

আরে, চাষ দেবে'খন, একটু তামুক খেয়ে যাও—

রাজু মাতলা কাজের লোক। তার কাজে গাফিলতি হলে কর্তাবাবুর কাছে গাল-মন্দ খেতে হবে। গরু দুটোকে লাঙলের সঙ্গে বেঁধে রেখে বসে পড়ল গুণধর কর্মকারের সামনে। তারপর কলকেটা নিয়ে টান দিতে লাগল। গুণধর জিজ্ঞেস করলে, তুমি সভায় গিয়েছিলে রাজু?

গিয়েছিলাম। কর্তাবাবু যে আমাকে যেতে বলেছিলেন। না-গেলে কি আর আমাকে আস্ত রাখতেন?

কী বুঝলে তুমি?

রাজু মাতলা বললে, আমি আর কী বুঝব খুড়োমশাই। আমি কি আর লেখা-পড়া জানি? আপনি কী বুঝলেন?

গুণধর তখন হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়েছে। হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়ে কল্‌কেটা তার ডগায় বসিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক করে টান দিতে লাগল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আমিও তো খেটে-খাওয়া লোক, আমি আর কী বুঝব, তোমার কর্তাবাবু গোলাম মোল্লাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল বলেই গিয়েছিলাম। মাঝখান থেকে আমার খালি কাজের কিছু লোকসান হল।

রাজু মাতলা জিজ্ঞেস করলে, আপনি ঘরের কাপড় কিছু পোড়াতে দিয়েছিলেন না কি?

গুণধর বললে, দিয়েছিলুম, কিন্তু সে ছেঁড়া-কাপড়। তা আর পরা যেত না। সে ফেলেই দিতে হতো। তুমি দিয়েছিলে?

রাজু মাতলা বললে, আমি আর কী কাপড় দেব, আমার তো এই একখান কাপড় ছাড়া দু'খান কাপড় নেই যে তা পোড়াতে দেব—

আর তোমার কর্তাবাবু?

কর্তাবাবুর বাড়িতে যত কাপড় ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছেন—

সব কাপড়?

হ্যাঁ, তাবপর আজ গঞ্জ থেকে কর্তাবাবু সকলের জন্যে নতুন কাপড় কিনে এনেছেন। ওঁরা বড়লোক ওঁরা যা পারেন আমরা কি তা পারি?

বলে উঠে পড়ল রাজু। বললে, যাই রোদ উঠে গেছে, বেলাবেলি চাষটা দিয়ে আসি গে— তারপর গরু দুটোকে তাড়াতে তাড়াতে পশ্চিম দিকে পা বাড়ালে রাজু মাতলা।

হ্যাঁ, সত্যিই, আমার মনে আছে, আমরা সবাই সেদিন বাড়িতে নতুন কাপড় পরলাম। কাপড়গুলো বিলিতি কাপড়ের চেয়ে অনেক মোটা। প্রথম প্রথম আমাদের সে কাপড় পরতে তত ভালো লাগত না।

কিন্তু বাবা বললেন, তা হোক মোটা। এই কাপড় বেচার যত টাকা সব আমাদের দেশের লোক পাবে। সায়েব বেটারা আমাদের দেশ থেকে টাকা লুটে নিয়ে যাবে, এটা ভালো নয়।

বাবা যে শুধু নিজেই দেশী কাপড় পরতে আরম্ভ করলেন তাই-ই নয়, সুলতানপুরের সবাইকেই তাই করতে বললেন। আমার বাবা ছিলেন বড় ধার্মিক মানুষ। নিজে যা মুখে বলবেন, কাজেও তাই। আমাদের বাড়িটা ছিল বিরাট, দু'মহলা। ঠাকুর্দাদার এক ছেলে আমার বাবা। তাই সম্পত্তি ভাগাভাগির দুর্ভোগ সইতে হয়নি বাবাকে।

মা বলত, বিলিতি কাপড় যে তুমি সব নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিলে, এখন আমরা পরবো কী?

বাবা বলতেন, সে সব তোমাকে বুঝতে হবে না, সে বুঝব আমি। কেন আমি বিলিতি কাপড় পরব বলতে পারো? বিনোদ মাইতি তো অন্যায় কিছু বলেনি। ন্যায্য কথাই বলেছে। আমিও তাই বলি, কেন আমরা নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে সায়েবদের পেট ভরাব?

মা বলত, তা ওরা যা করে করুক, তুমি ওর মধ্যে থাকছ কেন? শেষকালে যদি পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়?

বাবা বলতেন, ধরে নিয়ে যাবে, ধরবে। আমি তাতে ভয় করি?

মা বলত, তোমার ভয় না করতে পারে। কিন্তু আমরা? তুমি জেলে গেলে আমরা কী করব? আমাদের কে দেখবে?

বাবা বলতেন, কে আবার দেখবে, যিনি সকলকে দেখেন তিনিই দেখবেন।

সত্যিই বাবা কিছুতেই ভয় পেতেন না। একবার একটা মামলায় গিয়ে সত্য কথা বলায় তাঁর চার লাখ টাকার জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

উকিল বলেছিল, আপনি ও-কথা বলবেন না কর্তামশাই, জজ আপনার মামলা খারিজ কবে দেবে।

বাবা রেগে বলেছিলেন, তুমি আমাকে মিথ্যে বলতে পরামর্শ দিচ্ছ?

উকিল বলেছিল, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, নইলে অমন ভালো জমিটা আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বাবা বলেছিলেন, হোক হাতছাড়া, আমি তো আগে মানুষ তারপরে জমিদার। আমার মনুষ্যত্ব বড় না জমিদারি বড়? জমিদারি গেলে আবার জমিদারি হবে, কিন্তু মনুষ্যত্ব গেলে যে সব চলে যাবে—

আমাদের অল্প বয়স থেকে বাবাকে দেখে এসেছি। বাবার কথার আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। রাজু মাতলার অসুখ হলে তিনি যেমন তার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন, তেমনি মদের দোকানের মালিক শরৎ আড্ডির অসুখ শুনলেও দৌড়ে যেতেন।

গোলাম মোল্লা কি শুধু মাইনের লোভে বারবার তাঁবেদারি করত? মাইনে ছাড়া এমন কিছু পেত যা অন্য কেউ পেত না।

এবার বিনোদ মাইতি আর একলা এলো না। সঙ্গে নিয়ে এলো আর একজনকে।

ইনি কে?

বিনোদ মাইতি পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি হচ্ছেন দেশবন্ধু, ব্যারিস্টার সি. আর. দাস। মানে চিত্তরঞ্জন দাস। ইনি দেশের দাস, দশের দাস, মায়ের দাস। ইনি হাজার হাজার ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে নেমেছেন। দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন বলে দেশের লোক এঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়েছে—

বাবা এমনিতে কারোকে প্রণাম করেন না। কিন্তু এ হেন মানুষকে দেখে আর এ-হেন মানুষের পরিচয় পেয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। দেশবন্ধু বললেন, এই বিনোদের কাছে আপনাব পরিচয় পেয়েই এই সুলতানপুরে এলাম, আপনি আমাকে একটা ভিক্ষে দিন—

সে কী কথা! বলুন কী দিতে পারি আপনাকে?

তারপর ঘরের কোণের দিকে একটা চরকা দেখে বললেন আপনি চরকাতে সুতো কাটা আরম্ভ করেছেন? খুব ভালো খুব ভালো। কে সুতো কাটে?

বাবা বললেন, আমি নিজে কাটি, আমার ছেলে কাটে, বাড়ির মেয়েরাও সময় পেলেই চরকা কাটে—

দেশবন্ধু অবাক হয়ে গেলেন। সুলতানপুরের মতো এই অজ পল্লীগ্রামে যে এমন একজন দেশপ্রেমিক আছেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

বাবা বললেন, এই বিনোদ মাইতি মশাই এখানে এসেই আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেছে।

দেশবন্ধু বললেন, আমিও আজ এখানে একটা জনসভায় বক্তৃতা দেব। আপনি একটা জনসভার ব্যবস্থা করতে পারবেন?

নিশ্চয়ই পারব।

ততক্ষণে আমাদের বাড়ির সামনে অনেক ভিড় হয়েছিল। তারা শুনেছিল যে কলকাতা থেকে একজন বিখ্যাত দেশসেবক এসেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম তারা শোনেনি কিন্তু তাতে কী? তিনি যখন ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে স্বদেশী করছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন বিখ্যাত মানুষ।

ভিড় দেখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা?

বাবা বললেন, এরা সবাই সুলতানপুরেরই লোক—

এখানে কী দেখছে?

খবর পেয়েছে আপনি এসেছেন। তাই আপনাকে দেখতে এসেছে—

আমার নাম কি জানে ওরা?

বাবা বললেন, আজ্ঞে, আমাদের সুলতানপুরের লোকদের কেউই লেখাপড়া জানে না। পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা ইস্কুল আছে কেউ কেউ সেখানে যায় লেখাপড়া করতে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সেখানে যেতে পারে না।

দেশবন্ধু বললেন, তাহলে তো বড় দুর্দশা ওদের। আপনারা নিজেরা একটা অবৈতনিক ইস্কুল করতে পারেন না। যারা পড়বে তাদের মাইনে দিতে হবে না, আর যারা পড়াবে তারাও কিছু মাইনে নেবে না। আমি বলি, একটা নাইট স্কুল করুন আপনারা।

বাবা বললেন, ইস্কুল করতে গেলেও তো একটা ঘর লাগবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বললেন, আপনি গ্রামের মোড়ল, আপনি আপনার এই ঘরখানাই না হয় দিন।

বাবা বললেন, তা দেব। কিন্তু মাস্টার কোথায় পাবো?

দেশবন্ধু বললেন, প্রথম প্রথম একজন দু'জনে কাজ চালান। এ-রকম না করলে চলবে না। ইংরেজ সরকার যখন চায় না যে গ্রামের লোক লেখা-পড়া শিখুক, তখন আমাদের নিজেদেরই সেই ভারটা নিতে হবে।

বাবা বললেন, আমি আমার বৈঠকখানার একপাশে করব। দিনের বেলা কংগ্রেসের কাজ হবে সেখানে, আর রাত্তির বেলা হবে ইস্কুল—

সেদিন সুলতানপুরের বারোয়ারিতলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন। সে কি বক্তৃতা! সেদিন যারা সে-বক্তৃতা শুনছিল সকলেরই রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠল। তারা নতুন করে যেন জানতে পারল যে তাদের নিজেদের দারিদ্র্যের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। ইংরেজ সরকার উপলক্ষ্য মাত্র। ইংরেজ তাদের সব কেড়ে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু কেন তারা ইংরেজদের তা কেড়ে নেবার সুযোগ দিল? যাতে তারা আর সে সুযোগ না পায়, তার জন্যে তাদের নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে হবে। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই একদিন ইংরেজ এ দেশে এসেছিল, এবং তাদের দুর্বলতার জন্যেই ইংরেজ এখন এ-দেশে তাদেব শোষণ করে চলেছে। তাদের প্রথম কর্তব্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঝেড়ে ফেলতে হবে। এই সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশকে দুর্বল করে রেখেছে। হিন্দু আর মুসলমান কি আলাদা মানুষ? ধর্ম আলাদা বলেই মানুষ আলাদা হয় না। তাদের শরীরে যে রক্ত বইছে, আমাদের শরীরেও সেই একই রক্ত বইছে। তারাও ঈশ্বরের সৃষ্টি, আমরাও সেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যারা গরীব, যারা বঞ্চিত, যারা প্রবঞ্চিত, তাদের নিজের ভাই বলে আপন করতে হবে। আপনার মানুষ বলে ভাবতে হবে। তাদের নিজেদের বুকে ঠাঁই দিতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, বলো, চণ্ডাল আমার ভাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলে গিয়েছেন, আচণ্ডালে কোল দিতে। আর আজকের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, যে রাম সে-ই হল রহিম। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

সভার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনছিল।

তিনি বলছিলেন, বন্ধুগণ, আমাদের এই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধু হিন্দুর স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়,

আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সব ধর্মের লোকের স্বাধীনতা চাই। আমরা সব ধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা চাই। অর্থাৎ এক-কথায় মানুষের স্বাধীনতা দরকার। আর বিশেষ করে গ্রামের মানুষের। আমাদের দেশে সাড়ে সাত লক্ষ গ্রাম আছে। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। শুধু শহরের মানুষের স্বাধীনতা হলেই চলবে না, গ্রামের মানুষের স্বাধীনতা আনতে হবে । এর জন্যে আমাদের প্রথম কাজ হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ত্যাগ করতে হবে। তারপর আরো দুটো কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ বিলিতি জিনিস কিনব না। আর দ্বিতীয় কাজ হল মদ্য বর্জন। মদ-গাঁজা-আফিম সব নেশা ত্যাগ করতে হবে। ও-নেশা শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তাই-ই নয়, মনের ওপরেও ও নেশা খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। অনেক গরীব লোক আছে, যারা নিজের সংসারের প্রতিপালনের টাকায় মদ খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এই মদ খাইয়েই ইংরেজ সরকার আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। এমনি করে ইংরেজরাও চীন দেশকে আফিম খাইয়ে পঙ্গু করে রাখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরকম করে আর বেশি দিন চলবে না। একদিন আমরাও স্বাধীন হব। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই যেদিন আমাদের দেশের তাঁতীদের তৈরী কাপড় ইংরেজরা কিনতে বাধ্য হবে। আসুন, আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি, সাম্প্রদায়িকতা, বিলিতি-বর্জন আর মদ্যপান ত্যাগ করি, বন্দেমাতরম্—

এবার বিনোদ মাইতি বলে উঠল, বন্দেমাতরম্—

সভার সকলেই বলে উঠল, বন্দেমাতরম্—

সভা শেষ হয়ে গেল। সকলেই খুশি। আমাদের বাড়িতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর বিনোদ মাইতির খাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। আমি খুব কাছ থেকেই দু'জনকে দেখলাম। মনে হল ওঁকে দেখতে পাওয়াও সৌভাগ্য।

তারপর এক সময়ে গরুর গাড়ি এসে গেল। রাজু মাতলাই গাড়োয়ান হয়ে বসল। তাতে বিনোদ মাইতি মশাই ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর তারপর সকলের শেষে বাবা গিয়ে উঠলেন।

বাবা বললেন, গাড়ি ছাড় রাজু—

আমরা বাড়ির সদরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম রাজু মাতলা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। তারপর সামনের পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে গিয়ে সদর রাস্তা পড়ল গাড়িটা। আর তারপর বাঁশবাগানটা পেরিয়ে সেটা আমাদের সকলের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।

বাবা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন কংগ্রেস ফাণ্ডের চাঁদা হিসেবে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়িতেই একটা নাইট্-স্কুল গড়ে উঠল। পাড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে ছেলেদের ডেকে আনা হল স্কুলে পড়বার জন্যে। কাউকে মাইনে দিতে হবে না। বইও কিনতে হবে না পয়সা খরচ করে। বই কেনবার পয়সা দেবেন বাবা। আর পড়াবে পাড়ার ছেলেরা, যারা পাশ করে গ্রামে বসে আছে। তার বদলে সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে যে বিগ্রহের সন্ধ্যে-পূজো হয় তার প্রসাদ পাবে।

তা সে প্রসাদও বেশ পেট ভরার মতো। কোনদিন লুচি, কোনদিন খিচুড়ি। আর তার সঙ্গে ক্ষীর ফল-মূল। আর পূর্ণিমার দিন তো ডাল, ভাজা, নানা রকম তরকারি।

বাবা সবাইকে বলতেন, খা খা, পেট ভরে খা, আর একটু খিচুড়ি নে—

যতটা না পড়ার লোভে তার চেয়ে ছেলেদের বেশি লোভ তাদের খাওয়ার ওপর। ওই খাওয়ার লোভের জন্যেই দিন দিন ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

গুণধর কর্মকারের ছেলে ভানু কর্মকার বি-এ পাশ। সে [illegible] বন্ধু [illegible] নিয়ে তাস খেলত। তারাও সন্ধ্যেবেলা একটা কাজ পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ ম্যাট্রিক, কেউ নন্-ম্যাট্রিক, আবার কেউ বি-এ পাশ।

বাবা তাদের মাইনে দিতেন না। হাত-খরচ হিসেবে দিতেন মাসে পাঁচ টাকা করে। তা তখনকার দিনে মাসে পাঁচ টাকা কম কথা নয়। তখনকার দিনে মাসে পনেরো টাকা মাইনেতে সংসার খরচ ছাড়াও মেয়ের বিয়ে অন্নপ্রাশনেও অনেক টাকা খরচ করেছে। সে যুগটাই ছিল ওই রকম। বাবা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে মাস্টারদের পড়ানো শুনতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, মাস্টার, ওদের নামতাটা ভালো করে মুখস্থ করিয়ে দাও—

তারপর যেই ভেতর-বাড়ি থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠত, তখনই ছেলেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠত। এইবার খাওয়ার ডাক আসবে। খানিক পরে ছেলেরা পাততাড়ি বগলে নিয়ে তৈরি হত। কলাপাতা জল দিয়ে ধুয়ে পাতা হত সার সার। খাবার পরিবেশন করার আগেই ছেলেরা পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে যে যার জায়গায় বসে পড়ত। তারপর পাতে খাবার পড়তে না পড়তে তা নিঃশেষ হয়ে যেত। আমি নিজেও পড়তুম সেই স্কুলে, আমিও তাদের সঙ্গে বসে প্রসাদ খেতুম।

বাবা বলতেন, আমার ইস্কুলে জাত-টাত মানা চলবে না। এ কংগ্রেস ইস্কুল। দেশবন্ধু বলে গিয়েছেন, তোমরা শোননি?

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেশবন্ধুর নাম শোনেনি, কিন্তু মাস্টার মশাইরা শুনেছে। তারাপদ বলত, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি শুনেছি—

বাবা বলতেন, আহা, আহা, তোমরা তো সোনার ছেলে, তোমরা তো শুনবেই। কিন্তু গ্রামের আর পাঁচজন কি তা মানছে? তাহলে তো সবাই এই কংগ্রেসের ইস্কুলে ছেলে পাঠাত। এদিকে দেখ, যত পাপ যেন আমার হয়েছে। গ্রামের বামুন কায়েতরা তো তাদের ছেলেদের পাঠাচ্ছে না—

কথাটা সত্যি। সেদিন বাবা কমল ভট্টাচায্যি মশাইকে ডেকে পাঠালেন। কমল ভট্টাচার্য্য এলেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ভটচার্য, তুমি তোমার ছেলেকে পাঠাচ্ছ না কেন আমার ইস্কুলে?

কমল ভট্টাচায্যি মশাই আমাদের বাড়ির সঙ্গে বহুদিন ধরে জড়িত। আমাদের বাড়ির পুজো-আর্চার কাজ বরাবর পুরুষানুক্রমে তাঁরাই করে আসছেন। আগে তাঁর বাবা শরৎ ভট্টাচায্যি মশাই করতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে কমল ভট্টাচায্যি এ কাজ করছিলেন। বললেন, কর্তাবাবু, আপনাদের এখানে ছোট জাতের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে খাওয়াটা কি ভালো, আপনিই বলুন?

বাবা বললেন, তা এই কথা আগে বলনি কেন? আগে যদি বলতে তো আমি অন্য ব্যবস্থা করতুম তার জন্যে—

—কি ব্যবস্থা করতেন?

বাবা বললেন, যারা ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে এক সারিতে বসে খাবে না, তারা না খেলেই হল। তারা লেখাপড়া করুক একসঙ্গে, তারপর খাওয়ার আগে বাড়ি চলে যাক। আমি কোন আপত্তি করব না।

শুধু কমল ভট্টাচায্যি মশাই-ই নয়, এই রকম যারা ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় আপত্তি তুলেছিল, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়ার আগেই বাড়ি নিয়ে যেতে লাগল। এমনি করে প্রথম প্রথম অনেক বাধা আসতে লাগল। কিন্তু বাবা বরাবর ছিলেন অক্লান্ত উৎসাহী। কোন বাধাই বাবাকে দমাতে পারলে না। বাবা কথা দিয়েছেন দেশবন্ধুকে যে দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে দূর না করলে দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না, সেকথা তিনি রাখবেনই।

তিনি গোলাম মোল্লাকে কাছে পেলেই বলতেন, আমার আর ক'টা দিন, আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না, সকলের ভালোর জন্যেই আমি এই ইস্কুল করেছিলুম, লোকে যদি ছেলেদের এ ইস্কুলে পাঠায় তো ভালো, নইলে তারাই ভুগবে। আমার আর কি লোকসান।

সেদিন কলকাতা থেকে কংগ্রেস অফিসের এক চিঠি এলো যে দেশবন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ছ'মাসের জেল দিয়েছে। খবরটা অন্দরে যেতে মা খুব ভয় পেয়ে গেল। বলল, কেন আর তুমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাচ্ছ? তুমিও কংগ্রেস ছেড়ে দাও না—

বাবা কথাটা শুনে বললেন, তুমিও ওই কথা বলছ? আমি যদি দেশের কিছু কাজ না করি তো সুলতানপুরের কি হবে বলে তো?

মা বললে, সুলতানপুরের লোকেরা কি তোমার কথা ১ বাই মানছে?

বাবা বললেন, সুলতানপুবেব লোকেরা তো মানবেই না। যদি মানত তাহলে ওরা বুঝতে পারত আমি ওদের ভালোর জন্যেই এসব করছি। দেশবন্ধুর কথাই কি দেশসুদ্ধ লোক মানছে বলতে চাও?

মা বললে, তোমার দেশবন্ধুর কথা ছেড়ে দাও। তাঁরা বড় বড় লোক সব। তাঁরা দেশের জন্যে কিছু করলে তাঁদের মান-মর্যাদা বাড়বে। আর তুমি জেলে গেলে সেখানকার কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

বাবা বললেন, তুমি জানো দেশবন্ধু নিজের সর্বস্ব দেশকে দিয়ে দিযেছেন? তিনি শুধু নিজে নন, তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবীও জেল খেটেছেন, তা জানো?

মা ভয় পেয়ে গেল। বললে, আমি কিন্তু বাপু জেল খাটতে পারব না। সে তুমি যাই-বলো আর তাই-বলো।

বাবা বললেন, তোমাকে জেলে যেতে কে বলেছে?

মা বললে, তোমাকেও যদি ধরে নিযে যায় তো তখন আমিই কি বাঁচব মনে করেছ? জেলে নিযে গিয়ে যদি তোমাকে ঘানিতে ঘোরায়, তখন কী হবে?

বাবা বললেন, তা ঘানিতে ঘোরাবে! ইংরেজ-ব্যাটারা সব পারে।

তাহলে কেন, ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাচ্ছ তুমি? দেশের কথা তো তুমি ভাবছ, আব আমরা? আমাদের কথা একবার ভাববে না? তোমার ছেলেব কথা ভাববে না।

বাবা বললেন, দবকাব হলে সব অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে থাক। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরুর নাম শুনেছ? দেশবন্ধুব কাছে শুনেছি তাঁরা সবাই জেল খেটেছেন।

মা বললে, কী জানি বাপু, তুমি শেষ পর্যন্ত কী করবে তাই-ই আমি ভাবছি। কেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে তোমাকে! কোথাকার কে এক বিনোদ মাইতি এলো আর তুমি একেবারে বদলে গেলে।

বাবা বললেন, অনেক দিন তো বাঁচলুম। বেঁচে কী এমন বাজ-কার্য কবলুম। শুধু খেযেছি আর-ঘুমিয়েছি, খাওযা আব ঘুমোনো ছাড়া আর কোন কাজ তো এতদিন করিনি। এবাব না-হয় একটা কাজের মতো কাজ করি।

মা বললে, সবাই যা কবে তুমিও না-হয় তাই করেই বেঁচে থাকলে।

বাবা বললেন, এতদিন যা করেছি তা ভুলই করেছি। এতদিন বিলিতি কাপড কিনে পরেছি। তাতে কত টাকা বিলেতে চলে গেছে বলো দিকিনি?

মা বললে, সবাই তো ছেঁড়া কাপড় আগুনে পোড়াতে দিলে আর তুমিই শুধু নতুন নতুন কাপড় পুড়িয়ে ভস্ম কবে দিলে।

বাবা বললেন, তা কি আমি জানি না ভেবেছ? তবু ভালো করার ভানও ভালো, তা জানো? ওই করতে করতেই যদি একদিন ওদের সুমতি হয়।

মা বললে, তা তোমরা কি দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে পারবে ভেবেছ? তারা কি ভাবছ তোমাদের ছেড়ে কথা কইবে?

বাবা বললেন, তুমি দেখে নিও, আমাদের দেশের তিরিশ কোটি লোক, আর ওরা মাত্র দু'শো কি পাঁচশো জন। এই তিরিশ কোটি লোকের সঙ্গে ওই পাঁচশো লোক কি করে পারবে?

মা বাবার সঙ্গে তর্ক করে পেরে উঠল না। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, আমি মেয়েমানুষ, আমি আর কী বলব তোমাকে। তবে একটা কথা বলে রাখছি, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা কি ভালো?

বাবা বললেন, আমার জীবনে ভালো না হতে পারে, কিন্তু আমার পরে ভবিষ্যতে দেশের তো ভালো হবে। তাহলেই হলো।

কিন্তু শুধু যে আমার নিজের মা-ই প্রতিবাদ করলে, তা নয় বাবার বিরুদ্ধে সামনে কারো কিছু বলবার সাহস ছিল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাবার কাজে কারোরই যেন সমর্থন ছিল না। কেউ কিছু মুখে না বললেও মনে মনে সবাই-ই বলতে লাগল, ছোটলোকদের লেখা-পড়া শেখানোটা কি ভালো হচ্ছে? এত আস্কারা দিলে যে তারা মাথায় উঠবে। মুসলমানেরা যে শেষকালে হাতে মাথা কাটবে সকলের।

বিশ্বম্ভর কবিরাজ মশাই সেদিন পাড়ায় এসেছিলেন রোগী দেখতে। ফিরে যাবার পথে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই বাবা ডাকলেন, কী বিশ্বম্ভর, কোথায় গেছ্‌লে?

বিশ্বম্ভর কবিরাজ থেমে গেল। বললে, এই গিয়েছিলাম কোমলপুরে, একটা রোগী ছিল—

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সেদিন মিটিং-এ এসেছিলে?

আজ্ঞে, খুব ভালো ভালো কথা শুনলাম। তবে...বলে একটু থামল।

বাবা বললেন, থামলে কেন? তবে...কি?

আজ্ঞে, সবাই বলছিল ছোটলোকেরা ওতে আসকারা পেয়ে যাবে। আপনি যে রকম লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ওদের। দিনকতক বাদে ওরা কেউ আব ক্ষেতে-খামারে-মাঠে কাজ করতে চাইবে না।

বাবা রেগে গেলেন। বললেন, কে বলছিল ও কথা বল তো?

বিশ্বম্ভর কবিরাজ বললে, আজ্ঞে কোমলপুরের সিধু বিশ্বাস—

কোমলপুরের সিধু বিশ্বাস? বুঝেছি পাট বেচে দুটো পয়সা হয়েছে কিনা তাই ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে। তা এখন না হয় দুটো পয়সা হযেছে, কিন্তু এককালে ওই সিধু বিশ্বাসই আমার কাছে এসে পায়ে ধরে কেঁদেছে। তখন ,খতে পেত না। আমি খালি হাতে টাকা দিয়েছিলুম বলে তবু সে যাত্রায় বেঁচে যায়। আজ কি-না আমার নামে সে ওই কথা বলে। তা আমি কি গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিযে পয়সা উপায় করি যে আজ সে ওই কথা বলে? তুমি এ-সব কথা ওকে বললে না কেন।

বিশ্বম্ভর কবিরাজ বললে, আজ্ঞে, ওদের কথা ছেড়ে দিন আপনি। আজকাল মানুষ ওই রকম অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে সব! কেউ কারও·ভালো দেখে না—

বাবা বললেন, না কবিরাজ, শুধু কোমলপুরের সিধু বিশ্বাসই নয়, আমাদের গাঁয়েরও অনেকেই ওই কথা বলছে। তাই ভাবি আমাদের দেশ কি সাধে এখন ইংরেজ ব্যাটার গোলামি করছে? নইলে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইংরেজ ব্যাটারা কি এই দেশে এসে রাজত্ব করতে পারে? তুমিই বলো না লেখাপড়া কেউ জানে না বলেই তো আমাদের আজ এই দুর্গতি।

বিশ্বম্ভর কবিরাজ বললে, ও সব লোক বলবেই। হাজা' ' চেষ্টা করলেও আপনি ওদের মুখ চাপা দিতে পারবেন না—

সুলতানপুরে কংগ্রেস অফিস হওয়ার পর থেকেই একটা বাঙলা খবরের কাগজ আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজ সেই কেষ্টগঞ্জ থেকে আনার ব্যবস্থা কবা সোজা কথা নয়। সকালবেলার ট্রেনে খবরের কাগজ আসত স্টেশনে, আর গোলাম মোল্লা সেখান থেকে বাবার জন্যে একখানা 'বঙ্গবাসী' কিনে নিয়ে আসত। কেষ্টগঞ্জ স্টেশন সুলতানপুর থেকে পাঁচ

ক্রোশ রাস্তা। মাঝখানে তিন চারটে গ্রাম অতিক্রম করতে হয়। গোলাম মোল্লাকে সাইকেলে চড়তে যেতে দেখে, অন্য গ্রামের অনেকেই ডাকত। বলত ও গোলাম মোল্লা, দাঁড়াও না একটু, কথা আছে। বলি তোমাদের সুলতানপুরের কি খবর গো?

গোলাম মোল্লা এক একদিন সাইকেল থেকে নামত, দু-চারটে কথা বলত, আবার তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে চলে যেত।

সেদিনও ওই রকম যেতে যেতে ডাক পড়তেই গোলাম মোল্লা সাইকেল থেকে নামল। সেদিনও ভাজনঘাটের অধর সরকার ডাকলে কি গো গোলাম, খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছ?

গোলাম মোল্লা বললে, হ্যাঁ—

অধর সরকার বললে, একটু নামো না, একটা বিড়ি খেয়ে যাও। তোমাদের সুলতানপুরের কিছু খবর দিয়ে যাও।

অধর সরকার আড্ডাবাজ লোক। সকালবেলাতেই এসে ভাজনঘাটের মোড়ের মাথায় এসে বসে। বাড়ি আর ক্ষেত-খামারের কাজ করে ছেলেরা। বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মেবে তবে বাড়িতে খেতে যায়। তারপর দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে আবার বেলা থাকতে থাকতে এসে বসে। সেখানে আরো চার-পাঁচজন জোটে। কোন কাজকর্ম নেই কারো। রাস্তা দিয়ে কেউ গেলেই অধর সরকার ডাকে। বলে, কে যায় গো?

লোকটা বলে, আজ্ঞে আমি উমরপুরে যাব?

মশাইয়ের নাম?

লোকটা নিজের নাম বলে। কিন্তু তাতেও তার রেহাই নেই। জিজ্ঞেস কবে, উমবপুবে কাব বাড়ি যাওয়া হবে—

সিধু বিশ্বাসেব বাড়ি।

সিধু বিশ্বাস আপনার কে হন?

আমার শ্বশুবমশাই।

ও, তুমি সিধু বিশ্বাসের জামাই? তা আগে বলবে তো। এই সেদিন যার বিয়ে হল?

লোকটা হ্যাঁ বলে চলে যায়।

এমনি অধর সবকারেব স্বভাব। শুধু অধর সরকার কেন, সুলতানপুবের ধাবে কাছে যত গ্রাম আছে সব গ্রামের লোকদেরই এই স্বভাব। তাই গোলাম মোল্লাকেও সেদিন যখন ডাকলে তখন গোলাম মোল্লা সাইকেল থেকে নামল।

অধর সরকাব গোলাম মোল্লার দিকে একটা বিড়ি এগিযে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, শুনছি, নাকি তোমার কর্তামশাই ভদ্দরলোকের জাত মারছেন?

গোলাম মোল্লা বললে, কই, তা তো শুনিনি—

অধব সরকাব অবাক। বললে, সে কী! আমরা এত দূরে বসে সব শুনতে পাচ্ছি, আর তুমি কর্তামশাই-এর খাস-খানসামা হয়ে কিছু শোননি? কর্তামশাই নাকি বলেছেন, জাত-পাত মানা চলবে না?

গোলাম মোল্লা বললে, কর্তামশাই জাত মানেন না।

অধর সরকাব বললে,, তোমার কর্তামশাই জাত না মানলেই হল? জাত কি তোমার কর্তামশাই নিজে তৈবি করেছেন যে আমাদের দেশের পণ্ডিতদের তৈরি জাত-ধর্ম তুলে দিতে চান। শেষকালে কোন্ দিন হয়তো তোমার কর্তামশাই বলবেন, হিন্দুদের ছেলেদের সঙ্গে মুচিদের মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে! তোমার কর্তামশাইয়ের তো সাহস কম নয়।

গোলাম মোল্লা বললে, আজ্ঞে দেশ যাতে উচ্ছন্নে না যায় সেই জন্যই তো কর্তামশাই ওই সব করছেন। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তাদের খেতে দিচ্ছেন—

অধর সরকার বললে, ওই খেতে দেওয়া মানেই তো জাত-মারা! আর তা ছাড়া মেয়েদের যে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তার মানে কী জানো?

আজ্ঞে না!

জানো না তো জেনে নাও। মেয়েদের লেখা-পড়া শেখালে তারা বিধবা হয়। এটা তোমার কর্তামশাইকে বলে দিও। বলে দিও যে ভাজনঘাটের অধর সরকার এই কথা বলেছে—

আচ্ছা বলব—বলে গোলাম মোল্লা আবার সাইকেলে চড়ে বসল। তারপর পা চালিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে সে হতবাক হয়ে গেল। স্টেশনের কাছাকাছি যাবার আগেই একজন বললে, ওদিকে যেও না হে, পুলিশের লাঠি খাবে।

কেন, পুলিশের লাঠি খাব কেন? আমি কী করেছি? আমি তো কর্তামশাইয়ের খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছি—

সবাই তখন দৌড়ে পালাচ্ছে। অন্যদিন গম্ গম্ করে স্টেশন। লোকেরা আর খদ্দেরদের ভিড়ে জায়গাটা সরগরম থাকে সকালবেলাটা। কিন্তু সেদিন দেখা গেল পুলিশের ভিড়। সারা জায়গাটা পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেছে। গোলাম মোল্লা সেদিকে যাবে কিনা ভাবতে লাগল। একজন লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে গো ওখানে?

লোকটা বললে, ওখানে পাঁচকালী শা'র মদের দোকানে পিকেটিং করছে কংগ্রেসের ছেলেরা।

কেন?

লোকটা বললে, কংগ্রেসের ভলান্টিয়াররা মদ বেচতে দেবে না। পুলিশ সব ভলান্টিয়ারদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে—ওদিকে যেও না তুমি, তোমাকে পুলিশে ধরবে।

গোলাম মোল্লার খবরের কাগজ কেনা হল না। সুলতানপুরে এসে বাবাকে সব বললে গোলাম মোল্লা। বাবা সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। দেশবন্ধু যেবারে সুলতানপুরে এসেছিলেন সেবারই বলে গিয়েছিলেন যে মদ্য বর্জন আন্দোলন করবে কংগ্রেস। কিন্তু তিনি তো অঞ্চল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, তাঁর কাছে তো কোন খবর আসেনি!

বিকেলবেলার দিকে শরৎ আড্ডি তার ছেলে ভূপেন আড্ডিকে নিয়ে বাবার কাছে এল। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর শরৎ, কী মনে করে?

শরৎ আড্ডির মুখটা কাঁদো কাঁদো। বললে, খবর শুনেছেন কর্তামশাই?

বাবা বললেন, কী খবর বল তো?

শরৎ আড্ডি বললে, আজ্ঞে, কেষ্টগঞ্জে নাকি মদের দোকানে হামলা হয়েছে। আপনি শোনেননি?

বাবা বললেন, শুনেছি, গোলাম আমাকে বলেছে—

শরৎ আড্ডি বললে, তাহলে কী হবে? সুলতানপুরেও যদি হয়?

বাবা বললেন, আমার কাছে তো মণ্ডল কংগ্রেসের থেকে কোন খবর আসেনি। যদি তা হয় তো হবে।

তাহলে আমার কী হবে? আমি তো গভর্ণমেণ্টের লাইসেন্স নিয়েই কারবার করি। আমার দোকানেও যদি মদ বিক্রি বন্ধ করেন আপনি, তো আমি খাব কী? কী খেয়ে আমি বাঁচব? আপনারা তো আমার দিকটাও দেখবেন!

বাবা বললেন, তুমি একটা কথা বুঝে দেখ শরৎ, কংগ্রেস তোমাকে পেটে মারতে চায় না, কিন্তু মদটা কি ভালো জিনিস? তোমার দোকানে যারা মদ খেতে যায়, তারা এ-গাঁয়েরই লোক। তাদের তো সকলকেই তুমি চেনো। তাদের অবস্থা কি ভালো? মদ খেয়েই যদি তাদের যে-ক'টা টাকা আছে সব খরচা হয়ে যায় তাহলে তারা বউ-ছেলে-মেয়েদের কি খাওয়াবে?

শরৎ আড্ডি বললে, সে তো আমি বুঝি। কিন্তু ওই ব্যবসাটাই তো আমি এতকাল ধরে করে

আসছি। আর তো কোন ব্যবসা আমি করিনি কখনও, অন্য কোন ব্যবসাও আমি বুঝি না। আমার তাহলে কি হবে?

বাবা বললেন, দেখ শরৎ, আমি ও-সব বুঝি না। আমার কাছে যদি কংগ্রেস থেকে অর্ডার আসে, তাহলে আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তা পালন করতেই হবে। আর তাছাড়া এটা তো ভালো বোঝ যে মদ খাওয়া ভালো নয়! কি—জবাব দাও?

আজ্ঞে, মদ খাওয়া যে ভালো নয় তা তো আমি ভালোই জানি।

বাবা বললেন, তুমি কি নিজে মদ খাও?

আজ্ঞে না, আপনাকে আমি মিছে কথা বলব না। আমি মদ খাই না। মদ কি-রকম খেতে তা আমিও জানি না, আমার এই ছেলেও জানে না।

তাহলে? মদ বেচা বন্ধ হওয়াই তো ভালো!

শরৎ আড্ডি বললে, তা তো আমি জানি। কিন্তু দোকান বন্ধ হলে আমি খাব কি?

কেন, মদ বেচে তুমি কত জমি-জমা করেছ, তা তো আমার জানতে বাকি নেই। আর পাঁচজন যেমন জমি-জমা চাষ-বাস করে চালাচ্ছে তুমিও তেমনি কববে।

শরৎ আড্ডি আর কিছু বললে না। চুপ করে রইল। তাবপর উঠে দাঁড়াল। বললে, তাহলে আমি এখন আসি কর্তামিশাই। আমাদের এখানে কবে থেকে হামলা শুরু হবে?

বাবা বললেন, এখন আমি তা কি কবে বলব? আগে আমাব কাছে চিঠি আসুক তখন আমি ঠিক করব। তখন আমিও জানতে পারব, তুমিও জানতে পারবে।

শরৎ আড্ডি আর দাঁড়াল না, ছেলেকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

মনে আছে, সে-সব দিনগুলো যেন আগুন দিয়ে ঘেরা। সুলতানপুব আগে যেমন শান্ত-শিষ্ট ছিল, পরে ঠিক তেমনি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল।

আর কলকাতার খবর ছিল আরো ভীষণ।

বাবা খবরের কাগজ পড়তেন আব সুলতানপুবের সবাইকে যতটুকু সম্ভব শোনাতেন। সবাই গোল হয়ে বসে সে-খবরগুলো শুনত। কোথায বিলিতি কাপড পোডাবার জন্যে কত লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে, কোথায় মহাত্মা গান্ধী কি বিবৃতি দিয়েছেন, বিলেতের পার্লামেন্টে কে কি বলেছে তার বিশদ বিবরণ ছাপা হত খবরের কাগজে।

বাবা খবব শোনাতেন আর বলতেন, এবার ইংরেজ ব্যাটাদের দেশ ছেড়ে পালাতেই হবে। লর্ড কার্জন একবার বাঙলাদেশকে দু'খণ্ড করবার চেষ্টা কবেছিল তা বাঙালীদের চেষ্টাতেই রদ হয়েছিল। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড সাহেবেব ওপব বোমা মারবার চেষ্টা করেছিল, সে-সব গল্পও বাবা সব লোককে শোনাতেন।

বিশেষ করে গুণধর কর্মকাবের ছেলে ভানু কর্মকারের দলের ছেলেরা মন দিয়ে শুনত। তাদের লক্ষ্য করেই বাবা বলতেন, তোমরাই আমাদের ভরসা ভাই। তোমরা সবাই এক-একজন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, অরবিন্দ, বাবীন ঘোষ হতে পাবো না? আমি আর ক'দিন? আমি আর বেশিদিন নেই। কিন্তু তোমরা যে-দেশে মানুষ, সেই দেশটাকে স্বাধীন করতে তোমাদেরই সামনে এগিয়ে আসতে হবে।

আগে বাবা এমন ছিলেন না। গ্রামে আর পাঁচজন মানুয যেমন করে খেয়ে ঘুমিয়ে দিন

কাটাত বাবাও তাই করে দিন কাটাতেন। আর তাছাড়া সুলতানপুর তখন ছিল বলতে গেলে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। একটা খবরের কাগজও আসত না গ্রামে। দেশের নেতাদের মধ্যেও কেউ কখনও সুলতানপুরে আসত না।

গ্রামের মানুষদের জলের জন্যে আগে বারবার সেই নদীতে যেতে হত। ইছামতী নদী। মেয়েরা পেতলের ঘড়া নিয়ে নদীতে স্নান করতে যেত, আর আসবার সময় ভিজে কাপড়ে এক ঘড়া খাবার জল নিয়ে আসত নদী থেকে। স্নান বল, কাপড় কাচা বল সব কিছু কাজের জন্যে ছিল ওই নদী। বাবা অনেকদিন ধরে ভাবছিলেন এর একটা বিহিত করতে হবে। ইউনিয়ন বোর্ডে গিয়ে অনেকবার ধর্ণা দিয়েছেন, তারা কিছুই করেনি। শুধু মিথ্যা স্তোত্র-বাক্য দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেবার তিনি নিজেই কাজে নেমে গেলেন। আশে-পাশেব সব গ্রামেই একটা-দুটো করে টিউবওয়েল হয়েছিল। শুধু সুলতানপুরেই কিছু হয়নি। সবাই একদিন বাবাকে এসে ধরল, কর্তামশাই, আপনি এর একটা কিছু বিহিত করুন, আর তো পারি না আমরা—

বাবা তাদের কথা দিলেন। বললেন, ঠিক আছে, ইউনিয়ন বোর্ড যখন কিছু করবে না, আমি নিজের পয়সাতেই ওটা করে দেব—

মনে আছে যেদিন বারোয়ারিতলায় টিউবওয়েল থেকে প্রথম জল উঠল, সবাই এসে জড়ো হয়েছিল। জল দেখে সকলের কী আহ্লাদ। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল বাবাকে।

তা শেষ পর্যন্ত একটা টিউবওয়েল হল। পশ্চিম পাড়াতেও একটা টিউবওয়েল করে দিতে হল। খাঁটি জল খেয়ে লোকে বাঁচল। আর কাউকে খাবার জলের জন্যে এক মাইল ঠেঙিয়ে নদীতে যেতে হল না। আর নদীতে ছিল আবার কুমীরের উৎপাত।

আর শুধু তো টিউবওয়েল নয়, আরো অনেক সমস্যা ছিল সুলতানপুরের। চলা-ফেরার সুবিধের জন্যে ভালো রাস্তা ছিল না সুলতানপুরে। বর্ষার সময় রাস্তা জলে ডুবে যেত। ধান পাট বেচতে যে কেষ্টগঞ্জের বাজারে যাবে, তারও সুবিধে ছিল না চাষীদের।

সাধারণের এ-সব কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের। কিন্তু তাদের ছিল একমাত্র অজুহাত, টাকার অভাব। বাবা তখন ভানুদের ডাকলেন। ভানুদের বন্ধুরাও এলো। কর্তামশাই ডেকেছেন, সুতরাং না এসে তারা পারে না।

বাবা সবাইকে ডেকে বললেন, তোমরা আমার কথা শুনবে?

তারা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই—

আমি তোমাদের যা করতে বলব তোমরা করবে?

তারা বললে, হ্যাঁ কর্তামশাই, করব—

বাবা বললেন, তাহলে বলি, তোমাদের সকলকে গাঁয়ের রাস্তা মেরামত করতে হবে—

কথাটা শুনে তারা প্রথমে চুপ করে রইল। বুঝল না কিছু।

বাবা বললেন, সুলতানপুরেব চাষীরা গঞ্জে যেতে পারে না বর্ষার দিনে। গাড়ির চাকা কাদায় বসে যায়, তোমরা পাশের জমি থেকে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে রাস্তায় ফেলে রাস্তা উঁচু করবে। ভেবো না, তার জন্য কিছু পাবে না। যারা কাজ করবে তারা হাত-খরচের টাকা পাবে আমার কাছ থেকে।

তখন সবাই রাজি হল।

প্রথম প্রথম আপত্তি উঠেছিল জমির মালিকদের কাছ থেকে। কিন্তু বাবা যখন সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের ক্ষতি হওয়ার চেয়ে লাভটাই বেশি তখন তারা রাজী হয়ে গেল। বৃষ্টির জল রাস্তায় এসে পড়লে তাদেরই ক্ষতি, বরং জমির পাশের গর্ততে জলটা জমে থাকবে, গ্রীষ্মকালে সেই জমা জল ক্ষেতে সেচের কাজে লাগবে।

আমি তখন কলকাতায় থেকে পড়তাম। গরমের ছুটিতে দেশে এসেছিলাম। আমাকেও

সকলের সঙ্গে কোদাল ধরতে হল। গরমে ঘেমে নেয়ে উঠতাম মাটি কোপাতে কোপাতে।

মা বাবাকে বললে, খোকাকে আবার ও কাজে লাগালে কেন?

বাবা মা'র আপত্তি শুনলেন না। বললেন, পরের ছেলেরা কাজ করবে, আর আমার ছেলে বাড়িতে বসে আরাম করবে—এটা দেখলে লোকে খারাপ বলবে না? আর কাজ করলে তো ওর শরীরও ভালো থাকবে।

মা কোনদিনই বাবার ওপর কথা বলত না। বাবার কথায় মা চুপ করে গেল।

তারপর দেখতে দেখতে সুলতানপুর থেকে ভাজনঘাট পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। যখন বর্ষা এলো তখন আর রাস্তায় জল জমল না। সব জল রাস্তার দু'পাশের ডোবাতে জমা হয়ে রইল।

মা বললে, তুমি কত টাকা নষ্ট করলে বল তো?

বাবা বললেন, কিন্তু কত লোকের উপকার হল সেটা তো কই একবারও বলছ না—

মা বললে, তা তো হলে, কিন্তু গাঁয়ের লোক কি তা মানবে?

বাবা বললেন, না মানুক, মুখে হয়তো মানবে না, কিন্তু মনে মনে তো সবাই স্বীকার করবে।

তা মা ঠিকই বলেছিল, সুলতানপুরের লোক কিন্তু সত্যিই অকৃতজ্ঞ। তারা বলতে লাগল, কর্তামশাই নিজের সুবিধের জন্যে রাস্তাঘাট করে দিলেন—

বাবার কানেও এলো। তিনি বললেন, কে ⁻ ়লছে ও-সব কথা?

গোলাম মোল্লা বললে, ওই ভাজনঘাটের অধর সরকার, আমি খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে ডেকে বলল—

বাবা বললেন, তুই কি বললি?

গোলাম মোল্লা বললে, আমি আর কি বলব, আমি ওদের কোন কথার জবাব দিই না—

বাবা বললেন, দিবিনে জবাব। যখনই শুনবি কেউ আমার নিন্দে কবছে তখনই বুঝবি আমি ঠিক কাজ করছি। আর যখনই শুনবি কেউ আমায় ভালো বলছে তখনই বুঝবি আমার কোথাও গলদ আছে।

আগে বাবা খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা ঘুমোতেন আব বিকেলবেলা গোলাম মোল্লা কি রাজু মাতলার সঙ্গে গল্প করতেন। সেবার কলকাতা থেকে এসে দেখলাম বাবা চরকায় সুতো কাটছেন আর মুখে কথা বলছেন। বাবা সেই সুতো গোলাম মোল্লাকে দিয়ে কেষ্টগঞ্জে পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে সেই সুতোয় বাবার ধুতি, মা'ব শাড়ি তৈরি হয়ে আসত। বাবার দেখাদেখি আরো অনেকেই চরকা কাটতে শুরু করেছিল। ভানু কর্মকাব, তারাপদ, কার্তিক, অধীর—যারা এতদিন তাস খেলে সময় কাটাত তারাও বাবার সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। তারাও খদ্দর পরতে শুরু কবেছিল। দেখলাম সুলতানপুরে নতুন হাওযা বইছে। টাকা পয়সা তেমন কারো হাতে এলেও সবাই ভাবতে আরম্ভ করেছে নতুন কবে। ভাবছে ইংবেজরা চলে গেলেই আবার দেশের লোকেরা সব চেয়ারে গিয়ে বসবে। আবার সকলে ভালো চাকরি পাবে।

শরৎ আড্ডি সেদিন রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। মানে দোকানের সামনের ঝাঁপটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পিছনের দরজা তার আধ-খোলা।

সে বাড়ি যাবে। কিন্তু যারা পুরোন খদ্দের তারা জানে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলে তাদের

রাস্তা খোলা থাকবেই। তখন নিঃশব্দে বোতল পাচার হয়। চিরকালই এমনি হয়ে আসছে। তখন ভিন্‌গ্রাম থেকেও কিছু কিছু লোক আসে। শরৎ আড্ডি কি তার ছেলে ভূপেন আড্ডি তাদের সকলেরই মুখ চেনে। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তখন আর কাউকেই হতাশ হয়ে ফিরতে হয় না।

এমনি করে অনেকদিন রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত মাল কেনা-বেচা চলে। তাতে কেউ আপত্তি করে না। সরাসরি এক্সসাইজ-ইন্সপেক্টার মাসে মাসে হিসেব দেখে পরীক্ষা করে যায়। তার সঙ্গে শরৎ আড্ডির গোপন বন্দোবস্ত আছে। তার হাতে শরৎ আড্ডি বেশ মোটা কিছু গুঁজে দেয়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাংস ভাত খেতে দেয়। ইন্সপেক্টার মশাই ভাত মাংস খাবার আগে ভালো বিলিতি মদ খায়। সে-বব্যস্থা করতে হয় শরৎ আড্ডিকে।

তা এক্সসাইজ দারোগা সুকুমারবাবু অকৃতজ্ঞ মানুষ নয়।

শরৎ আড্ডি সেবার জিজ্ঞেস করলে, কেমন বুঝছেন সুকুমারবাবু?

সুকুমারবাবুর তখন বেশ নেশা জমে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলে, কীসের কী বুঝব?

শরৎ আড্ডি সুকুমারবাবুর সামনে বংশবদ হয়ে থাকে বরাবর। বলতে গেলে সুকুমারবাবুর দয়াতেই এতদিন খেতে পরতে পাচ্ছে। তাকে খুশি রাখতে পারলে শরৎ আড্ডির কোন ভয় নেই। বললে, গঞ্জের মদের দোকানে কংগ্রেসীরা কী কাণ্ড করেছে তা শুনেছেন তো?

সুকুমারবাবু বললে, আরে আপনি রাখুন তো। এ হচ্ছে ইংরেজ রাজত্ব। কংগ্রেসীই বলুন আর যা-ই বলুন ইংরেজ গভর্মেন্টের সঙ্গে কেউ পারবে? আপনাদের গান্ধী তো কোন ছার, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও যদি আসে তাহলেও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, এই আপনাকে বলে রাখলুম।

কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে এখানে লেকচার দিয়ে গেলেন মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে?

সুকুমারবাবু গেলাসে আর একবার চুমুক দিয়ে বললে, ও সব দেশবন্ধু-টেশবন্ধুর কথা ছেড়ে দিন, কারো বাপের সাধ্যি নেই দেশ থেকে মদ বন্ধ করতে পারে। মদ এখন মানুষের রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

শরৎ আড্ডি বললে, আমি এখানকার কর্তামশাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম। তিনি তো আমাকে আমার দোকান বন্ধ করতে বলে দিলেন। বললেন, কেষ্টগঞ্জে যা হয়েছে এই সুলতানপুরেও তাই হবে?

সুকুমারবাবু বললে, কর্তামশাইয়ের বাবারও সাধ্যি নেই মদ আর ঘুষ বন্ধ করে, এই কথা আমার কাছে শুনে রাখুন।

শরৎ আড্ডি খুশি হয়ে বললে, আর একটা বোতল খুলব স্যার?

সুকুমারবাবু বললে, আর নয়, আর নয়, আমি এবার উঠব—

সুকুমারবাবু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল। ভাগ্যের জোর মেজের ওপর পড়ে গেল না, চেয়ারের ওপরেই বসে পড়ল। বসে বললে, আর মাংস আছে?

শরৎ আড্ডি বললে, কী যে বলেন স্যার, মাংস থাকবে না? আপনার জন্যেই তো একটা খাসি কেটেছি। কত খাবেন খান না—বলে তখনই আবার এক প্লেট মাংস আনিয়ে দিলে।

মাংস খেয়ে যেন সুকুমাববাবু একটু ধাতস্থ হল। শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, তাহলে স্যার বলছেন আমার কোন ভয় নেই?

সুকুমারবাবু বললে, যদি বেঁচে থাকি তাহলে আপনি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন, আপনার কর্তামশাই তো তুচ্ছ মানুষ, তিনি কী করবেন?

শরৎ আড্ডি বললে, কিন্তু স্যার, গ্রামের বখাটে ছোকরারা যে সব ওঁর হাতের মুঠোর মধ্যে, উনি খদ্দর পরছেন, সকলকে বিলিতি কাপড় পরতে মানা করে দিয়েছেন। সুলতানপুরে কেউ আর বিলিতি কাপড় পরে না। উনি বলেন ইংরেজদের সঙ্গে বন্দুক-গুলি দিয়ে তো পেরে উঠবেন না, তাই ইংরেজ ব্যাটাদের ভাতে মারবেন। তা মদ বন্ধ হলে তো ইংরেজ সরকারের এর থেকে আয়ও কমে যাবে।

সুকুমারবাবু বললে, ইংরেজরা এখানে এসেছে ব্যবসা করতে—মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করলে তারা কি চুপ করে বসে থাকবে? তাদের পুলিশ আছে, বন্দুক আছে, লাঠি আছে—তারা কি কংগ্রেসীদের ছেড়ে কথা বলবে?

শরৎ আড্ডি খানিকটা আশ্বস্ত হল সুকমারবাবর কথা শুনে। তারপর খেতে বলল সুকুমারবাবুকে। খাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু সুকুমারবাবুর পেটে তখন জায়গার অভাব। যেমন খাবার দেওয়া হয়েছিল তেমনিই সব পড়ে রইল। শেষকালে আর ওঠবার অবস্থাও ছিল না তার।

শরৎ আড্ডির গাড়ি ছিল। নিজের গরুর গাড়ি। গাড়ির ভেতর তোষক পেতে আয়েস করে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুকুমারবাবুকে ধরে উঠিয়ে সেখানে শুইয়ে দিতে হল। তারপর কয়েকটা নোট কাগজের বাণ্ডিল করে তার জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলে।

শরৎ আড্ডি বললে, স্যার, বাণ্ডিলটা আপনার জামার পকেটে রেখে দিলুম, খুব সাবধানে রেখে দেবেন স্যার—

সুকুমারবাবুর তখন আর কথা বলবার সামর্থ নেই। চোখ বুজেই অবস্থাতেই বললে, ঠিক হ্যায়—

শরৎ আড্ডি বললে, স্যাব ভূপেনকে আপনার সঙ্গে পাঠাব? সে আপনাকে আপনার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসত।

সুকুমারবাবু বললে, তার দরকার নেই, আমি ঠিক আছি—

গাড়ি চলতে আবম্ভ করল। শরৎ আড্ডি গাড়োয়ানকে খুব সাবধান করে দিলে। বলে দিলে যেন বাবুকে ধরে নামিয়ে সে বাড়িতে তুলে দিয়ে আসে—

গাড়ি চলতে লাগল। তখন শরৎ আড্ডি, ভূপেন আড্ডি সবাই নিশ্চিন্ত।

সেদিনও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে শরৎ আড্ডি, হঠাৎ একটা অচেনা লোক পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। শরৎ আড্ডি বললে কি চান? এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আর মদ পাওয়া যাবে না—

অচেনা লোক বলেই এমন কথা বলতে পারলে শরৎ আড্ডি। নইলে খদ্দেরকে কখনো ফেরায় না সে।

লোকটা বললে, না মদ কিনতে আসিনি। আমি এসেছি অন্য কাজে।

শরৎ আড্ডি লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিলে একবার। তারপর বললে, কি কাজ?

লোকটা বললে, আপনি ঝাঁপ বন্ধ করে নিন। পরে বলছি—

শরৎ আড্ডি দোকানের কেরোসিনের ডিবেটা নিভিয়ে দিযে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে। তারপর বললে, এইবার বলুন কি কথা?

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকটা বেশ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল। দোকানেব পিছনেই একটা গাছ। গাব গাছের পাতাগুলো বেশ ঘন। সেই গাব গাছটাব জন্যেই জায়গাটা আরো অন্ধকারময় হয়ে উঠল। লোকটার মুখটা তখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আগে কেরোসিনের ডিবের আলোয় যতটুকু দেখা গেছে তাতে দেখা গেছে লোকটা অন্য গ্রামের হবে। শরৎ আড্ডি লোকটার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলে, এখানকটায় নিরিবিলি আছে, কি বলবার আছে বলুন।

শরৎ আড্ডির তখন একটু ভয়ও করছিল। পকেটে অতগুলো টাকা রয়েছে। লোকটা কেড়ে নেবে না তো? লোকটা আরো কাছে সরে এলো এবার।

গলাটা নামিয়ে একটু চুপি চুপি বললে, আপনি যেন শুনে ভয় পাবেন না, আমি পুলিশের লোক—

শরৎ আড্ডি চমকে উঠল। কথাটা শুনে একটু ভয় হল বৈকি। পুলিশের লোক তার কাছে কেন? পুলিশের লোকের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?

লোকটা বললে, আমাকে কেষ্টগঞ্জ থেকে বড় সাহেব পাঠিয়েছে।

শরৎ আড্ডি বললে, তা আমার সঙ্গে বড় সাহেবের কী সম্পর্ক? আমি কি দোষ করেছি?

লোকটা বললে, না, আপনি কেন দোষ করতে যাবেন, আপনি কোন দোষ করতে পারেন না। আপনার যদি কোন বিপদ-আপদ হয় তাই বড় সাহেব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

শরৎ আড্ডি যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলে। বলল, শুনছি নাকি কংগ্রেস আমার দোকানে পিকেটিং করবে। আমাকে মদ বেচতে দেবে না। অথচ আমার কাছে তো মদ বিক্রী করবার সরকারী লাইসেন্স আছে। আমি কী দোষ করলুম বলুন তো? আমার মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেলে আমি কী খাব বলুন তো? আমার চলবে কী করে? সেই কথা বলতেই তো আমি আজ কর্তামশাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম—

তা তিনি কী বললেন?

শরৎ আড্ডি বললে, কর্তামশাই বললেন কংগ্রেস হুকুম কবলেই আমায় দলবল নিয়ে পিকেটিং করতে হবে। আমি তো এখানকার অঞ্চল প্রেসিডেণ্ট—

লোকটা বললে, সেই কথা বলবার জন্যেই তো আমায় বড়বাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার যদি কোন পুলিশ-ফোর্সের দরকার হয় তো আমাকে জানাবেন।

শরৎ আড্ডি বললে, যদি সুলতানপুরের লোক তা টের পায়?

লোকটা বললে, টের পেলে তো আমার বড় সাহেব আছে।

শরৎ আড্ডি বললে, যদি তেমন কাণ্ড হয়, যদি আমার দোকানে কেউ বদমাইশি করে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন তো পুলিশকে ডাকতেই হবে।

লোকটা বললে, তার আগে আমরা তৈরি থাকব। আপনার কোন ভয় নেই—

শরৎ আড্ডি লোকটার কথায় যেন আশার আলো দেখতে পেলে। জিজ্ঞেস করলে আপনার নামটা কী?

লোকটা বললে, আমার নাম জেনে আপনার লাভ কী? কাজের সময়েই সব জানতে পারবেন—

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো?

লোকটা বললে, আপনি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন তো। আমার বড় সাহেবকে গিয়ে আমি সব জানিয়ে দেব। তবে একটা কথা...লোকটা বললে, আমি যে আজ আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলুম এ কথা কাউকে বলবেন না যেন!

শরৎ আড্ডি বললে, না, আমি তা বলতে যাব কেন? তাতো আমারই ক্ষতি—

লোকটা বললে, সে আপনাকে বলবো না। আমাদের তা বলা নিয়ম নেহ। আমরা পুলিশের লোক, কখন আসব কখন যাব কেউ তা জানতে পারবে না। আপনাকে খবরও পাঠাতে হবে না।

শরৎ আড্ডি বললে, খবর না পাঠালে আপনারা জানবেন কী করে?

লোকটা বললে, সেইটেই তো মজা। কংগ্রেসের ভেতরেই আমাদের দলের লোক আছে। তারা বাইরে কংগ্রেসের মেম্বার, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে টাকা পায়। তারাই আমাদের রোজকার খবর দিয়ে যায়। নইলে কোথায় কী হচ্ছে তা আমরা কী করে জানতে পারি?

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, তারা কি আমাদের সুলতানপুরেরই লোক?

লোকটা বললে, তা আপনাকে বলব না মশাই। বিভীষণ কি শুধু লঙ্কাতেই ছিল, সুলতানপুরে নেই?

বলে আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেল! শরৎ অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে কেমন অবাক হয়ে গেল। এই সুলতানপুরেও কংগ্রেসের মেম্বার সেজে পুলিশের লোক আছে? কে সে? কার

কথা বললে লোকটা? গুণধর কর্মকার, না রাজু মাতলা, না নিমাই ঘোষ! না কি ওই ছোকরার দল? ওই ভানু, অধীর, কার্তিক কি?

মনে আছে এর কিছুদিন পরেই একদিন বোধহয় ১৯২৪ সালে খবরের কাগজে পড়লাম দেশবন্ধু সি-আর-দাশ দার্জিলিং-এ মারা গেলেন। আমি তখন কলকাতায়। স্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে পড়ি। খবরটা পেয়েই সমস্ত শহর কলকাতাটা যেন একেবারে নির্জীব হয়ে গেল। সেদিন শহরে বোধহয় কোন মানুষ আর বাড়ির ভেতরে ছিল না। সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

দার্জিলিং থেকে তাঁর মরদেহ কলকাতায় হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছুল। রাস্তায় রাস্তায় কাতারে কাতাবে মানুষের ভিড়। সবাই একবার শেষ দেখা দেখতে চায়। তাঁর মরদেহটাকে কেওড়াতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। আমিও রাস্তায় বেরোলাম। হেঁটে হেঁটে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়ে কী করে কাটল খেয়াল ছিল না। মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু এসেছেন সবাই বলতে লাগল। কিন্তু অনেক চেষ্টা কবেও তাঁদেব দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যে হবার আগেই বোর্ডিং-এ ফিরে এলাম। আমার কান্না পেতে লাগল। কেবল মনে পড়তে লাগল আমাদেব সুলতানপুরের বাড়িতে যেদিন গিয়েছিলেন সেই দিনেব কথা। বাবাকে তিনি কী কী বলেছিলেন সমস্তই মনে পড়তে লাগল।

রাস্তার সবারই মনে তখন একই চিন্তা, এবার কি হবে? দেশবন্ধু মাবা যাবাব পর ইংরেজদের সঙ্গে কে লড়াই চালাবে? ইংরেজদের কে দেশ থেকে তাড়াবে? দেশবন্ধু ছাড়া আর কে নেতা আছে? মহাত্মা গান্ধী তো অনেক দূরে থাকেন। বাঙালীদের আর কে আছে? বাঙালীদের কথা কে ভাববে?

পরেব দিন বাবার একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন তুমি শনিবার দুপুরের ট্রেনে বাড়ি আসিও। বিশেষ একটা কাজ আছে, ইত্যাদি—

ভোর পাঁচটা পঁচিশের ট্রেনে শেয়ালদা স্টেশনে উঠে সকাল সাড়ে সাতটায় কেষ্টগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। কেষ্টগঞ্জের বাজারের মধ্য দিয়ে রাস্তা। দু'পাশে বাজার বসেছে। বেচা-কেনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তখন। মানুষের ভিড় এড়িয়ে রাস্তার মধ্যখান দিয়ে যাচ্ছি। ক'দিন আগেই এখানে মদের দোকানে পিকেটিং হয়েছিল। মদের দোকানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

হঠাৎ পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। ছোটবেলায় আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন, তিনি সুলতানপুরের লোক, কিন্তু মাস্টারি করেন কেষ্টগঞ্জের স্কুলে। যাতায়াত করতে অসুবিধে হয় বলে তিনি কেষ্টগঞ্জেই বাসা ভাড়া করে থাকেন। তাঁর আসল নাম শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য, ছাত্ররা পণ্ডিতমশাই বলে ডাকত তাঁকে।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালাম।

পণ্ডিতমশাই আশীর্বাদ করলেন। বললেন, কেমন আছ বাবা?

আমি বললাম, ভালো—

পণ্ডিতমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন ট্রেন থেকে নামলে?

বললাম, হ্যাঁ, বাবা লিখেছেন, তাই আসতে হল।

পণ্ডিতমশাই বললেন, তোমার বাবা সুলতানপুরের জন্য যা করেছেন এমন আর কেউ আগে করেনি। গ্রামের লোকদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কে এত করে বল? তোমার বাবা একজন মহাপুরুষ। আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি তোমার বাবার মতো হও—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শুনলাম এখানেও নাকি মদ বেচা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়েছে? আপনি জানেন কিছু?

পণ্ডিতমশাই বললেন, চরিত্রবলই মানুষের বড় বল বাবা। আমাদের চরিত্রবল যদি থাকত তো ইংরেজরা কি আমাদের ওপর এই অত্যাচার করতে পারত? এখন 'বন্দেমাতরম্' শব্দটা উচ্চারণ করলেও পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। সেদিন এখানে পঞ্চাশজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে লাঠি পেটা করে মেরেছে পুলিশ।

আমি বললাম, কিন্তু মদের দোকানে আগুন লাগাবার তো কথা ছিল না। কে আগুন লাগালে দোকানে? বাবা তো অহিংস লড়াইয়ের কথা বলেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের তো দোষ ছিল না। তারা তো পুরোপুরি অহিংস ছিল। শুধু সবাইকে মদ কিনতে বারণ করছিল। তাদের হাতে লাঠিও ছিল না।

বললাম, তাহলে? আগুন লাগালে কে দোকানে?

পণ্ডিতমশাই বললেন, সেইটেই তো রহস্য। আমি তো সেখানেই দাঁড়িয়েছিলুম। আমি গোড়া থেকে সমস্ত দেখেছি। অনেক লোকে বলছে পুলিশের লোকই সাদা পোশাকে মদের দোকানে আগুন লাগিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করিয়েছিল। এই দেখ না—বলে তিনি নিজের হাঁটুটার ওপর কাপড় তুলে দেখালেন।

বললেন, আমার পায়ের ওপরেও পুলিশের লাঠি পড়েছিল। আমি এক মাস বিছানায় শুয়েছিলাম। আমিও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাইনি, পুলিশ আমাকেও জেলে পুরেছিল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কেন জেলে পাঠিয়েছিল? আপনি কি করেছিলেন?

পণ্ডিতমশাই হাসতে লাগলেন। বড় ম্লান সে হাসি। বললেন, আমি নিরীহ লোকদের মারপিট করতে আপত্তি জানিয়ে ছিলাম। যারা মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, সুভাষ বোসের ওপর অত্যাচার করতে পারে, তারা সব পারে বাবা। কিন্তু দোষ তো ইংরেজদের দিতে পারি না। কেননা, তারা হল রাজার জাত। তারা এ দেশ শাসন করতে এসেছে, তারা তো অত্যাচার করবেই। কিন্তু যারা মারপিট করছে তারা তো আমাদেরই দেশের লোক। তারা জানেও না যে দেশ স্বাধীন হলে তাদের ভালো হবে—

পণ্ডিতমশাই যাবার সময় বললেন, বুঝলে বাবা, তাই বলছিলুম চরিত্রবলই বড় বল, তোমার বাবা বরাবর আমাকে বলতেন দেশের মানুষেব চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেছে—

তিনি চলে গেলেন। আমি সুলতানপুরের দিকে হাঁটা-পথে পাড়ি দিলাম।

আমি যখন সুলতানপুরে পৌছলাম তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়িতে মা ছিল। আমাকে দেখে মা খুব খুশি হল। তাড়াতাড়ি আমার খাবারের বন্দোবস্ত করতে লেগে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, মা বাবা কোথায়?

মার মুখটা যেন ভার-ভার। বললে, তিনি তো আজকাল বাড়িতে বেশি থাকেন না। কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান।

জিজ্ঞেস করলাম, কি এত কাজ তাঁর?

মা বললে, ছাই কাজ। যত সব ছোটলোকদের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তাদের বোঝাচ্ছেন, তোমরা মদ খেও না। মদ খাওয়া খারাপ।

বললাম, আর শরৎ আড্ডি?

মা বললে, শরৎ আড্ডি তো এসেছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। উনি তাকে খুব ধমকে দিয়েছেন। বলেছেন, মদ খাইয়ে তুমি দেশের লোকের চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছ। তা সেটা তার ব্যবসা। সে মদ বেচে খায়, সে সে-কথা শুনবে কেন? সে রেগে-মেগে চলে গেল।

দুপুরবেলার দিকে বাবা বাড়ি এলেন। সঙ্গে সুলতানপুরের আরো অনেক ছেলে। তাদের সকলের হাতে কাগজের তৈরি কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ। সারা সুলতানপুর তারা টহল দিয়ে এসেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, বন্দেমাতরম্—

বেশি করে চেঁচিয়েছে শরৎ আড্ডি আর মনোহর শা'র দোকানেব সামনে দাঁড়িয়ে। উদ্দেশ্য ঃ আগামী কাল মিটিং আছে বারোয়াবিতলায। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'টার ট্রেনে এলে?

বললাম, ভোর পাঁচটা-পঁচিশেব ট্রেনে—

তারপর বললেন, শুনেছ তো, দেশবন্ধু মারা গেলেন? এখন আমার কাজ বেড়ে গেল। বিনোদ মাইতি মশাই এসেছিল। তাব কাছে সব কথা শুনলাম। এখন আমাদের ওপরেই সব কাজের ভাব পড়ে গেল। কাজ তো বলে বন্ধ কবা চলবে না। আজকে সাবা সুলতানপুবে ঘুরে ঘুরে কালকের মিটিং-এর কথা জানিয়ে এলাম। দেখি কী হয।

বাবাকে দেখে যেন খুব চিন্তিত মনে হল। ছেলের দলকে বললেন, এখন সব বাড়ি যাও, সন্ধ্যেবেলা আবার সবাই এসো—

চেয়ে দেখলাম সকলেরই খুব উৎসাহ। যেন সে সুলতানপুর আর নেই। বাস্তা দিয়ে আসবার সময়েই তার পরিচয় পেয়েছিলাম। সুলতানপুরে ঢুকতেই দেখা হয়েছিল যতীন কাকার সঙ্গে। যতীন মৌলিক মশাইকে আমি কাকা বলে ডাকতাম। যতীন কাকা বললেন, কী, করে দেশে এলে?

বললাম, হ্যাঁ, বাবার চিঠি পেযেই আসছি।

যতীন কাকা বললেন, তোমার বাবার জন্যে আমরা গাঁয়ে বেঁচে আছি খোকা। আগে রাস্তাব কী অবস্থা ছিল দেখেছিলে তো, আর এখন কী অবস্থা হয়েছে দেখ। আগে তো বর্ষার সময় এখানে হাঁটু জল জমত। এই সব কিছু তোমাব বাবার জন্যেই হল। ইউনিয়ন বোর্ড তো কিছু কাজ করেনি।

আমি এর জবাবে আর কী বলবো। তারপরে বাবোযারিতলায় আসতেই দেখি বিরাট বটগাছটার ডালে কংগ্রেসের তেবঙা ফ্ল্যাগ উড়ছে। কার্তিক আমাকে দেখতে পেয়ে এগিযে এলো। সে ফ্ল্যাগ টাঙাচ্ছিল। বললে, খোকাদা তুমি এসে গেছ! ভালোই হয়েছে। কাল এখানে মিটিং আছে—

বাবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন। খেতে খেতেই আমাকে বললেন, তোমাকে ডেকেছি কালকের মিটিংয়ের জন্যে। রাস্তায় আসবার সময় কিছু দেখলে?

বললাম, দেখলাম, ফ্ল্যাগ টাঙানো হয়েছে জায়গায় জায়গায়—

বাবা বললেন, আমি সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এলাম।

বললাম, যতীন কাকার সঙ্গে আসবার সময় দেখা হল। তিনি বললেন, আপনার জন্যেই গ্রামের রাস্তা-ঘাট সব তৈরী হয়েছে।

বাবা বললেন, ওরা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ওই ভানু, তারাপদ, কার্তিক, অধরের দল। এতদিন কাজ পায়নি বলে কেবল বসে বসে তাস পিটত। এখন কাজ দিয়েছি, আর সামান্য হাত খরচাও দিচ্ছি ওদের।

এতক্ষণ মা পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। এবার মা বললে, এত খরচ করলে শেষকালে সংসার চালাব কি করে বুঝতে পারছি না।

বাবা বললেন, আরে তুমি কেবল তোমার নিজের সংসারটার কথাই ভাবছ, এদিকে মানুষের অবস্থার কথাটা ভেবেছ? ওই গঞ্জের রাস্তারটার কথাই ধরো না। ওই শোন না, মালোপাড়ার যতীন মৌলিক খোকাকে কি বলেছে—

মা বললে, কিন্তু খরচটা তো সব তোমার পকেটে থেকেই গেল। আর কেউ তো একটা পয়সাও বার করলে না—

বাবা বললেন, তা না বার করুন, আমার পয়সা আছে, আমি খরচা করেছি। আমার একটা ছেলে। ওর আর কত টাকা লাগবে। আমার জমি-জমা তো রইল। ওইতেই ওর যথেষ্ট চলে যাবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি, আবার কি চাও তুমি? তুমি কি বড়লোক হতে চাও? দেশবন্ধুর কথা মনে নেই? তিনি কত টাকা উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু সব তো দেশের জন্যে দান করে গেলেন। শেষ জীবনে একটা পয়সাও তাঁর ছিল না। অথচ ব্যারিস্টারি করলে তিনি কত টাকা উপায় করতে পারতেন। তা দেশ বড় না টাকা বড়?

আমি কিছু বললাম না। বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে দেশ বড় না টাকা বড়? জবাব দাও?

বললাম, দেশই বড় বাবা।

আমার কথা শুনে বাবা যেন খুব খুশি হলেন মনে হল। আমাকে তিনি আর কিছু বললেন না। বলবার সুযোগও হল না। বাইরে কে যেন ডাকতে এলো। আমিও বাবার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে গেলাম। দেখলাম চণ্ডীমণ্ডপের ভেতবেব চেহারা বদলে গিয়েছে। দেশবন্ধুর একটা বিরাট ছবিতে একটা টাট্‌কা ফুলের মালা ঝুলছে।

যে ভদ্রলোক এলেন তিনি হচ্ছেন বিনোদ মাইতি মশাই। বাবা যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি সোজা কলকাতা থেকেই আসছি। আপনাদের এখানকার সব ব্যবস্থা পাকা তো?

বাবা বললেন, আমি তো সকাল থেকে সুলতানপুর চষে বেরিয়েছি।

বিনোদ মাইতি মশাই বললেন, দেশবন্ধু মারা যাওয়ায় আমাদের দায়িত্ব এবার আরো বেড়ে গেল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কে কে এসেছিলেন কলকাতায়।

বিনোদ মাইতি বললেন, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন, সরোজিনী নাইডু সবাই এসেছিলেন। এখন কে বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হবে তাই নিয়ে মিটিং হবে আজকালের মধ্যেই। আমি সেই নিয়েই খুব ব্যস্ত। সেই কথা বলতেই আমি সুলতানপুরে এসেছি। বলতে এসেছি যে কালকে আপনাদের মিটিং-এ আমি থাকতে পারব না। কিন্তু তা বলে আপনাদের এখানকার কাজ বন্ধ রাখলে চলবে না। আপনার নাইট-স্কুল ঠিকভাবে চলছে তো?

বাবা বললেন, হ্যাঁ সব ঠিক-ঠাক চালাচ্ছি—

বিনোদ মাইতি বললে, আর চরকা কাটা?

বাবা বললেন, সেও চলছে। সুলতানপুরে একটাই কা~ড়ের দোকান চলছিল তাতে আর বিলিতি কাপড় আনতে দিচ্ছি না। আপনি কলকাতায় গিয়ে কিছু খদ্দরের ধুতি-শাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা কবতে পারেন?

বিনোদ মাইতি বললেন, কেন পারব না? খাদি-ভাণ্ডারকে বললেই তারা এখানে পাঠিয়ে দেবে। কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে বলুন?

বাবা বললেন, আমার ঠিকানায়। ভাবছি আমিই আমার চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিনা লাভে খদ্দরের

ধুতি-শাড়ি বেচব। যদি খরচ-খরচা বাদ দিয়ে কিছু লাভ থাকে তো সে কংগ্রেস-ফাণ্ডে যাবে।

বিনোদ মাইতি মশাই বললেন, ঠিক আছে। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। কাল তাহলে আপনাদের মিটিং হচ্ছে? কখন হবে মিটিং?

এই বিকেল পাঁচটা-ছ'টার সময়। গ্রামের লোকের ক্ষেত-খামারের কাজ শেষ হলে লোক আসে।

বিনোদ মাইতি মশাই বললে, আর মদের দোকানে পিকেটিং কখন হবে?

বাবা বললেন, ওই একই সময়ে আরম্ভ হবে। সন্ধ্যেবেলাটাতেই মদের খদ্দের বাড়ে—

এরপরে বিনোদ মাইতি মশাই আর বেশিক্ষণ থাকলেন না। তাঁর অনেক কাজ। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁর কলকাতাতে যেতেই হবে। শুধু তাই-ই নয়। তাঁর গতি সর্বত্র। আজ কলকাতা, কাল সুলতানপুর, পরশু মেদিনীপুর, তার পরদিন হয়তো আবার ঢাকা, ফরিদপুর কিম্বা বরিশাল। সারা দেশময় তাঁর গতিবিধি। এক জায়গায় তাঁর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না।

সন্ধ্যেবেলা ছেলেরা এলো। এলো ভানু, তারাপদ, অধীর, কার্তিক আরো অনেক ছেলে। তাদের সকলকে বাবা সন্ধ্যেবেলা আসতে বলে দিয়েছিলেন। তারাই বাবার নাইট-স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পড়াত। তারাই সুলতানপুরের রাস্তা করে দিয়েছে নিজের হাতে। বাবা তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল তোমরা সবাই বেলাবেলি আসবে, মনে আছে তো?

তারা সবাই বললে, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই, আমরা সকলকে বলে রেখেছি—

বাবা বললেন, আমি তোমাদের আবার বলে রাখছি, কেউ কোন রকম হিংসামূলক কাজ করবে না। দেশবন্ধু আমাকে বার-বার বলে দিয়ে গেছেন সরকারের হাতে বন্দুক আছে, কামান আছে, সৈন্য-সামন্ত আছে, আর আমরা নিরস্ত্র। আমাদের হাতে একটা লাঠিও নেই। লাঠি থাকলেও পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করবে। সুতরাং ইংরেজদের হারাতে গেলে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল অহিংসা। দরকার হলে আমরা মরব, তবু মারব না ওদের। মহাত্মাজী বলেছেন এই অস্ত্র দিয়েই আমরা মরব, তবু মারব না ওদের। মহাত্মাজী বলেছেন এই অস্ত্র দিয়েই আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছি। কাল যখন শরৎ আড্ডির মদের দোকানে তোমরা পিকেটিং করবে তখন একটা জিনিস সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকবে। কারোর কোন প্ররোচনাতে তোমরা উত্তেজিত হবে না। তোমাদের গায়ে যদি পুলিশের লাঠিও পড়ে তোমরা মাথা পেতে তা সহ্য করে যাবে। বুঝলে?

সবাই বাবার কথায় বলে উঠল, হ্যাঁ।

বাবা আবার বলতে লাগলেন, হয়তো পুলিশ এসে তোমাদের গ্রেফতার করবে। তবু কিন্তু তোমরা বাধা দিতে পারবে না বুঝলে?

সবাই বললে, হ্যাঁ—

বাবা আবার বললেন, দেখ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো রেগে যেতে পারো। কারণ কেউ অন্যায় করছে দেখলে অনেকেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক। শরৎ আড্ডির ব্যবসার ক্ষতি হলে সে তোমাদের গালাগালি দিতে পারে। বাইরে থেকে গুণ্ডা এনে তোমাদের লাঠিপেটা করতে পারে। তবু তোমাদের মুখ বুঁজে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করতে হবে। পারবে তো?

সবাই বললে, পারব জ্যাঠামশাই, পারব।

বাবা আবার বলতে লাগলেন, দেখ, এ সত্যাগ্রহ আমাদের এক দিনের নয়। কাল থেকে বরাবর প্রতিদিন এই সত্যাগ্রহ করে যেতে হবে। দেখতে হবে যেন মদের দোকানে কোন খদ্দের না ঢুকতে পারে।

অধীর জিজ্ঞেস করলে, যদি কেউ জোর করে দোকানে ঢুকতে চায়?

বাবা বললেন, তোমরা তাকে অনুরোধ করবে যেন সে মদ না কেনে। তাকে বোঝাবে যে মদ খাওয়া খারাপ, তাতে টাকাও নষ্ট, শরীরও নষ্ট—

অধীর আবার জিজ্ঞেস করলে, যদি আমাদের কথা না শোনে সে? যদি আমাদের ঠেলে দোকানে ঢুকতে চায়?

বাবা বললেন, যদি দোকানে ঢুকতে চায় তো তবুও তার গায়ে হাত দিতে পারবে না। দরকার হলে দোকানে ঢোকবার রাস্তায় তোমরা শুয়ে পড়বে। যদি তারা ঢোকে তো তোমাদের মাড়িয়ে তারা ঢুকুক।

কার্তিক জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আমরা কী বলে শ্লোগান দেব? কী বলে সকলকে আমরা বোঝাব?

বাবা বললেন, আমি তো তোমাদের সঙ্গে থাকব। আমিও তো সত্যাগ্রহ করব। আমি যা বলব তোমরা তার প্রতিধ্বনি করবে। আমি বলব, মদ খাওয়া বন্ধ করুন। তোমরাও বলবে মদ খাওয়া বন্ধ করুন। আমি বলব বন্দেমাতরম্, তোমরাও বলবে বন্দেমাতরম্!

তারপরে আরো দু-একটা কথার পর সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেল। বাবা আর আমি তখন একলা। আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখে মনে হল বাবা যেন এই ক'মাসেই সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার ভয় হচ্ছে?

আমি আর কী বলব। বললাম, না।

বাবা বললেন, ভয়টাই সবচেয়ে বড় পাপ। ভয়টাকে যদি জয় করতে পারো তাহলেই তুমি সবকিছুকে জয় করতে পারবে। গোড়াতে আমারও খুব ভয় হত। কিন্তু এই বয়সে এসে বুঝে গিয়েছি যে ভয়কে ভয় করলেই সে তোমাকে গ্রাস করবে। মৃত্যু তো একদিন আসবেই, কিন্তু সেই মৃত্যু আসবার আগেই যে মরে যায় তাকেই বলে ভীরু। যে মানুষ হয় সে কখনও মরার আগে মরে না। রোগে ভুগে মরার চেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যে মরে সে-ই হল আসল বীর—

সেদিন বাবা আরো অনেক কথা আমাকে বলেছিলেন, আজ সে-সব কথা এখন পুরো মনে নেই। তখন বাবার কথা শুনে কেবল মনে হয়েছিল এসব কথা বাবা কার কাছ থেকে শিখেছিলেন? দেশবন্ধুর কাছ থেকে কি?

আমরা দু'জনেই চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ভেতর-বাড়ির দিকে যাবার উপক্রম করছিলাম। হঠাৎ সেই অত রাত্রে শরৎ আড্ডি মশাই চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরে এসে হাজির হল। বাবা তাকে সেই অসময়ে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এ কী শরৎ, তুমি এত রাত্রে?

শরৎ বললে, আমি আপনার কাছে একটু দরবার করতে এসেছি কর্তামশাই।

বাবা বললেন, আমার কাছে কী দরকার? আমি কী করতে পারি?

শরৎ বললে, আপনিই সুলতানপুরের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে রাখতেও পারেন আবার মারতেও পারেন।

বাবা বললেন, না, আমি তা পারি না। আমি কংগ্রেসের দাস। কংগ্রেস আমাকে যা বলবে আমি তাই করতে বাধ্য।

শরৎ বললে, আপনাকে আমি শেষবারের মতো অনুরোধ করতে এসেছি, আপনি আমার দোকানে পিকেটিং করবেন না—

বাবা বললেন, তা হয় না শরৎ, আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে—

শরৎ এবার এক কাণ্ড করে বসল। সে হঠাৎ বাবার পায়ের ওপর হুড়মুড় করে শুয়ে পড়ল। বললে, আমাকে আপনি বাঁচান কর্তামশাই, আমি ধনে-প্রাণে মারা যাব। আমি বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে বসব। তখন আমাকে সপরিবারে আপনাকেই খাওয়াতে হবে। দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে, আপনি কি তাই চান কর্তামশাই?

বাবা বললেন, তাহলে কথা দাও তুমি কাল থেকে মদ বেচা বন্ধ করবে?

শরৎ বললে, তা কি করে করি বলুন? মদের ব্যবসা কি আমি করেছি? ও আমার ঠাকুর্দার

আমল থেকে চলে আসছে। আমি তো সেই ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছি কেবল। আপনি তো জানেন আমি নিজে জীবনে কখনো মদ জিভেও ঠেকাইনি। আমার ছেলে ভূপেনও মদ খায় না।

বাবা বললেন, তাহলে তো তুমি আরো পাপ করেছ। যে বিষ তুমি নিজে খাও না সেই বিষ তুমি গাঁয়ের সব লোককে খাওয়াচ্ছ! তুমি তো দেখছি শুধু পাপী নও, মহাপাপী, জ্ঞানপাপী। তুমি নিজে জানো যে ওটা বিষ, আর তা জেনেও তুমি টাকার লোভে অন্য লোককে সেই বিষ খাওয়াচ্ছ। তোমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না। তুমি আমার পা ছাড়, অনেক রাত হয়ে গেছে, সারাদিন আমার খুব খাটুনি গেছে, আমি এবার খেতে যাব—

এবার শরৎ উঠে দাঁড়াল। কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, তাহলে আপনি কিছুই বিহিত করবেন না?

বাবা বললেন, তোমার বিহিত করা আমার ক্ষমতায় নেই। আমার ক্ষমতায় থাকলে আমি নিশ্চয় বিহিত করতাম—

শরৎ বললে, কিন্তু গভর্মেণ্ট তো আমাকে মদ বিক্রির লাইসেন্স দিয়েছে, আমি গভর্মেণ্টের আইন অমান্য করি কি করে?

বাবা বললেন, যে আইন বে-আইন তা অমান্য করতে তো দোষ নেই—

শরৎ বললে, কিন্তু তাতে যদি আমায় সরকার জেলে পোরে?

বাবা বললেন, সরকার জেলে পোরে পুরবে। মহাত্মা জেলে গেছেন, দেশবন্ধু জেলে গেছেন, সুভাষ বোস জেলে গেছেন। দেশের হাজতে হাজার লোক আইন অমান্য করে জেলে গেছে আর তোমারই জেল খাটতে যত ভয়? তুমি এত ভীতু? দেশের মানুষের ভালোর জন্যে তুমি না হয় জেলই খাটলে। তুমি জানো না কেষ্টগঞ্জে কত লোক জেল খেটেছে। আমাদের গাঁয়ের শরৎ পণ্ডিত সেদিন জেল থেকে ছাড়া পেল। সে তো সামান্য একজন ইস্কুলেব পণ্ডিত। তাব জেল খাটতে ভয় হল না, আর তুমি বুড়ো হয়ে মরতে চললে আর তোমারই জেলের ভয়? মরতে তো একদিন হবেই তোমাকে। শুধু একলা তোমাকে নয়, আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন মরতে হবে। এখানে কেউ চিরকাল বাঁচতে আসেনি। তা সেই যখন একদিন মাবাই যাবে তুমি, তার আগে না হয় একটা সৎ কাজের জন্যেই মরলে।

শরৎ বললে, বলা যত সহজ কাজ করা কি অত সহজ। আপনারই যদি মদের দোকান থাকত তো আপনিই কি তা ছাড়তে পারতেন?

বাবা বললেন, আমি মুখে যা বলি কাজেও তাই করি শরৎ। তুমি তো আমাকে এতকাল ধরে দেখে আসছ, এখনো আমাকে চিনতে পারলে না?

এরপর শরৎ-এর বলবার কিছু ছিল না। শুধু জিজ্ঞেস করলে, তাহলে এই কি আপনাব শেষ কথা?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, এই-ই আমার শেষ কথা। শুধু একটা কথা জেনে যাও যে তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া নেই। ঝগড়া আমাদের আদর্শের। তোমার যা আদর্শ আমার আদর্শ তা নয়। ইংরেজদের সঙ্গেও আমাদের কোন ঝগড়া নেই। ঝগড়া তাদের শোষণ নিয়ে। ইংরেজদের যে আইন আমাদের শোষণ করে, যে আইন আমাদের অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধেই আমাদের যত প্রতিবাদ। আর কিছু না।

শরৎ কথাগুলো শুনে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

চারদিক ঘন অন্ধকার। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শরৎ ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে পড়েছে সেইটাই সুলতানপুরের বাবোয়ারিতলা। সেখানেই তার দোকান। দোকানের ঝাঁপ তখন বন্ধ। তার পিছনেই সেই ঝাঁকড়া মাথা গাব গাছ।

সেইখানটায় আসতেই কে যেন পিছন থেকে চাপা গলায় ডাকলে, শরৎবাবু!

শরৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না।

লোকটা এবার কাছে এসে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন না?

শরৎ বললে, না তো! কে আপনি?

লোকটা 'বললে, আপনার মনে পড়ছে না? আমি সেই আপনার কাছে এসেছিলুম। বড় সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল?

এবার শরৎ-এর মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলে, কিছু কথা আছে?

লোকটা বললে, কথা আছে বলেই তো এই অসময়ে আপনার কাছে এসেছি।

শরৎ বললে, বলুন কি কথা? কাল তো আমার দোকানে কংগ্রেসীদের হামলা হবে। চারদিকে তারা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে।

লোকটা বললে, কিছু ভয় নেই আপনার। আমরা তো আছি।

শরৎ বললে, আমি কি করব বুঝতে পারছি না। এখন গিয়েছিলুম কর্তামশাইয়ের কাছে। তাঁর পা জড়িয়ে ধরলুম আমাকে বাঁচান। তা কিছুতেই তাঁকে টলাতে পাবলুম না। তিনি বললেন কংগ্রেসের হুকুম, আমি কি করব!

তাহলে কি করবেন ঠিক করলেন?

শরৎ বললে, এ তো একদিনের ব্যাপার নয়, এ ব্যাপার অনেক দিন ধরে চলবে। সবাই যদি মদ খাওয়া বন্ধ করে তো আমার কি হবে?

লোকটা বললে, আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন স্যার, আমি তো বলেইছি আমি আপনার দলে। আমার বড় সাহেব থাকতে আপনি ভয় পাবেন না।

শরৎ বললে, কাল থেকে কর্তামশাইরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবে, আর বলছেন আমি ভয় পাব না? আমার সংসার চলবে কি করে তাই ভাবছি। আমি যখন উপোস্ করব তখন আপনার বড় সাহেব আমাকে খাওয়াবে? তখন আপনার বড় সাহেব আমাকে দেখতে আসবে।

লোকটা বললে, আপনি দেখুন না, কী মজা হয় কাল।

শরৎ আড্ডি বললে, কী মজা হবে?

লোকটা বললে, সে আমি আগে থেকে এখন বলব না। তার আগে আপনি একটা কাজ করুন—আপনি আপনার দোকানে যত মদের বোতল আছে সব আজ রাত্তিরেই সরিয়ে ফেলুন।

শরৎ বললে, কি করে সরাব? সে যে অনেক বোতল।

লোকটা বললে, তাতে যদি দোকানে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয় তো বোতলগুলো অন্তত বেঁচে যাবে। শুধু দোকানটাই যা পুড়বে, মাল বেঁচে যাবে।

শরৎ বললে, দোকানে আগুন লাগাবে কেন? সে-রকম তো কথা নেই—কংগ্রেসের লোকেরা তো অহিংস। তারা কারও গায়ে হাত তুলবে না, তারা কারও কোন ক্ষতি করবে না। শুধু বলবে আপনারা মদ খাওয়া বন্ধ করুন। কর্তামশাই আমাকে নিজে এ-কথা বলেছেন—

লোকটা বললে, মুখে অমন কথা সবাই বলে।

শরৎ বললে, কিন্তু কর্তামশাই তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নয়।

লোকটা বললে, আগুন তো লাগাবে পুলিশের লোকেরা।

সে কি!

লোকটা বললে, কেষ্টগঞ্জে তো তাই-ই হয়েছিল! আপনি কি ভাবছেন কংগ্রেসের লোক সেখানে মদের দোকানে আগুন লাগিয়ে ছিল? বলে, লোকটা হাসল। হাসতেই তাঁর দাঁতগুলো অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

সে বললে, আপনি সরল সাদাসিধে মানুষ, তাই ওই কথা বিশ্বাস করেছেন। সেইজন্যেই তো বড় সাহেব আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি এখন যা বললুম তাই করুন। তাতে আপনিও বাঁচবেন, পুলিশও বাঁচবে। পুলিশের কাজ সহজ হয়ে যাবে।

শরৎ বললে, আগুন লাগালে পুলিশের কি সুবিধে হবে?

লোকটা বললে, এই সোজা কথাটা আপনি বুঝলেন না? আগুন লাগলেই তো পুলিশের লাঠি চালাতে সুবিধে হবে। তখন আর কেউ কিছু বলতে পারবে না, পুলিশকে কেউ কিছু দোষ দিতে পারবে না। যা বললুম তাই করুন। আমি চলি—বলে লোকটা চলে গেল।

শরৎ এক মনে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগল। তারপর নিজের বাড়িতে চলে গেল।

ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বললে। ছেলে সব ভেবে রাজি হল তারপর ভাত খেয়ে নিয়ে চুপি চুপি কাজে লেগে গেল। দুজনে দুটো ঝুড়ি নিয়ে আবার দোকানের পিছনের দরজা খুললে। তা অত বোতল বাড়িতে আনা কি সোজা কথা। বাপ-বেটায় মিলে একে একে সব বোতল যখন বাড়িতে এনে তুলল তখন প্রায় রাত্রি তিনটে। সারা রাত্রি পরিশ্রম করে শরৎ যখন ঘুম থেকে উঠল তখন বেলা ন'টা বেজে গেছে। শরৎ-এর বাড়ির সবাই তখন খুব গম্ভীর গম্ভীর। সমস্ত বাড়িতে যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভূপেন এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, আজ দোকান কে খুলবে বাবা? তুমি না আমি?

শরৎ বললে, তুই যাস্‌নি, আমিই যাব—

শরৎ-এর মনে হল যদি কোন গণ্ডগোল হয় তো ছেলে অন্তত নিরাপদে থাকুক। নিজে আর কতদিনই বা বাঁচবে! যা হামলা হয় তার নিজের ওপর দিয়েই হয়ে যাক। শরৎ-এর ওই একই ছেলে, আর বাকি সব মেয়ে। সেই মেয়েদের একদিন বিয়ে দিতে হবে। ছেলে বেঁচে থাকলে সেই সব দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিতে পারবে। শরৎ-এর মাথায় যদি লাঠি পড়ে তো পড়ুক। তার তিন পুরুষের কারবার। এ হয়তো চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ভূপেন চাষ-বাসের দিকে মন দেবে।

সেই দিনকার কথা ভাবতে গিয়ে শরৎ-এর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বেশ তো ছিল ইংরেজ সরকার। তাদের তাড়িয়ে কি লাভ হবে।

বাড়ির সামনের রাস্তায় আসতেই নিমাই ঘোষের সঙ্গে দেখা। নিমাই ঘোষ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছেন আড্ডিমশাই? দোকান খুলতে?

শরৎ উদাস দৃষ্টিতে বললে, কী আর করব বল নিমাই, সবকাবের লাইসেন্স নিয়েছি, দোকান কি বন্ধ রাখতে পারি?

নিমাই ঘোষ বললে, কিন্তু আজ যে শুনছি কর্তামশাই দলবল নিয়ে নিজে দোকানে বন্ধ করতে আসবেন?

শরৎ বললে, এলে আমি আর কী করতে পারি, বলো? দোকান বন্ধ রাখলে তো ওদিকে আবার উল্টো উৎপত্তি হবে। আমার হাতে সরকার হাতকড়ি পরাবে।

নিমাই ঘোষ বললে, আমারও বিপদ কম নয় আড্ডিমশাই—

শবৎ বললে, কেন, তোমার আবার কী বিপদ? নিমাই ঘোষ বললে, আপনার মদ বিক্রী না হলে আমারও তেলেভাজার দোকানে কি আর খদ্দের আসবে। মদ না খেলে তেলেভাজা কে খাবে? আমার কারবারও বন্ধ হয়ে যাবে।

শরৎ বললে, তা অবিশ্যি সত্যি। কিন্তু তোমার ওপরে তো কারো রাগ নেই, যত রাগ আমার ওপর আমি মদ বেচি বলে।

নিমাই ঘোষ বললে, সেবার বিলিতি কাপড় পোড়াতে বলাতে আমার একখানা ধুতি কাপড় ছিল, তাও পোড়াতে দিয়েছিলুম। তাতে বেশি ক্ষতি হয়নি, অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার? আমি তো 'দিন-আনি-দিন-খাই' মানুষ। আমার কী দশা হবে। আমি এই তেলেভাজা বেচে যা দুটো পয়সা পাই তাই দিয়েই পেট চালাই।

একটু থেমে নিমাই ঘোষ আবার বললে, আচ্ছা আড্ডিমশাই, আমি একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনিই বলুন তো, ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে আমাদের কী ভালোটা হবে? তাতে আমার অবস্থা ভালো হবে? আমি জমি পাব? পেট ভরে খেতে পাব?

শরৎ বললে, তবে? তবে কেন এত হাঙ্গামা করছেন কর্তামশাই। যদি পুলিশ এসে কেষ্টগঞ্জের মতো সবাইকে লাঠিপেটা করে? ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তখন কি হবে?

শরৎ বললে, যা হবে তুমিও দেখতে পাবে আমিও দেখতে পাব।

নিমাই ঘোষ সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বললে, আমার কি মনে হয় জানেন আড্ডিমশাই? আমার মনে হয় কর্তামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! জনাকতক ছোঁড়াকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তিনি নাম কিনতে চাইছেন!

শরৎ বললে, তা ছাড়া আর কী?

নিমাই ঘোষ এবার ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করে বললে, আপনি দেখে নেবেন আড্ডিমশাই, গরীব লোকদের এমন ক্ষতি করলে কর্তামশাইয়ের ভালো হবে না।

শরৎ বললে, ভালো তো হবেই না!

নিমাই ঘোষ বললে, ইংরেজরা যে কিসের খারাপ তা তো আমি বুঝতে পারছি না। ইংরেজ রাজত্ব আছে বলে তবু এখনও আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠছে। গান্ধীর কথা যে বলছে, গান্ধীর কি আছে শুনি যে তা নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়বে? গান্ধীর কি পুলিশ আছে না সৈন্য আছে যে তাই নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে নামবে। মদ বন্ধ করলেই আর বিলিতি কাপড় পোড়ালেই ইংরেজরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে?

শরৎ বললে, যাও নিমাই, তুমি তোমার কাজে যাও, আর আমিও দোকান খুলিগে যাই। দেখা যাক আজকে কি হয়।

নিমাই চলে গেল। কিন্তু কোথায় আর যাবে সে? তার তো কোন কাজ নেই তখন। হাঁটতে হাঁটতে গুণধর কর্মকারের দোকানে গিয়ে পৌঁছল। গুণধর কর্মকাবের ছেলে ভানু কর্মকার কর্তামশাইয়ের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াতে তার মন ভালো ছিল না।

নিমাই যেতেই গুণধর ডাকলে। বললে, কি নিমাই, কোথায় যাচ্ছ?

নিমাই বললে, এই আপনার কাছেই এলাম।

গুণধর বললে, ভালোই করেছ এসে। কি খবর বলো?

নিমাই বললে, আপনার ছেলে তো আমার সর্বনাশ করে বসল। আপনি শুনেছেন তো সব। আমার কারবারটাই বন্ধ করে দিলে। আমি তবু শরৎ মশাইয়ের দোকানের সামনে বসে তেলেভাজা ভেজে দুটো পয়সা উপায় করতাম, সে রাস্তাও সে বন্ধ করে দিলে।

গুণধর বললে, ও আমার ছেলে নয় নিমাই, ও হারামজাদা। আমি ওর জন্ম দিয়ে মহাপাতক করেছি! আমার সামনে ওর নাম মুখে এনো না নিমাই।

নিমাই বললে, তা বলে তো আর নিজেব ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্তুর করতে পারো না। গুণধর বললে, ওর গর্ভধারিণী যে এখনও বেঁচে আছেন, নইলে কবে ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম। ও ছেলে আমার থাকাও যা, আর না থাকাও তাই। ওর মুখদর্শনও আমি করতে চাই নে—

নিমাই ঘোষ উঠে আসছিল। কিন্তু ওঠা হল না। দেখতে পেলে গুণধরের ছেলে ভানু বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। দেখতে পেয়েই গুণধর একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে তার দিকে তেড়ে গেল। বললে, আবার এসেছিল? বেরো বলছি, বেরো—আবার কি করতে বাড়ি এসেছিস? যেখানে ছিলিস সেখানেই যা, বাড়ি এলি কেন?

ভানু বাবার এই ব্যবহারে একটু থমকে দাঁড়িয়ে। তারপর বললে, আমি খেতে এসেছি—

গুণধর তখনও তার হাতের চ্যালাকাঠটা উঁচিয়ে ধরে রয়েছে। সেই অবস্থাতেই বললে, কেন, খেতে এসেছিস কেন? যেখানে গিয়েছিলি সেখানেই খেয়ে এলে পারতিস। সেখানে কর্তমশাই খেতে দিলে না তোকে?

ভানু বললে, সেখানে তো রাত্রে প্রসাদ খাই। দুপুরবেলা খেতে আসব না?

গুণধর বলল, না। আমার বাড়িতে আজ থেকে তোর দরজা বন্ধ, এই বলে রাখলুম। আর এ বাড়িতে ঢুকতে পাবি না তুই।

ভানু বললে, কেন, আমি কি করেছি?

গুণধর বললে, কেন, তোর ও সব ব্যাপারে থাকবার দরকার কি? শরৎ-এর ওপরে তোর এত রাগ কিসের? সে তোর কি ক্ষতি করেছে? সে নিজের দোকানে বসে মদ বেচে, তাতে তোর অত গায়ের জ্বালা কেন? যার ইচ্ছে সে মদ খাবে, তাদের টাকা নষ্ট হবে, তাতে তাদের পেটে ঘা হবে। তুই তো মদ খাস না, তোর টাকা তো নষ্ট হচ্ছে না।

ভানু বললে, কর্তামশাই যে মদ খাওয়া বন্ধ করতে বলেছেন। মদ খেয়ে লোকের শরীর নষ্ট হচ্ছে—

গুণধর বললে, লোকের শরীর নষ্ট হচ্ছে তো তোর কি?

ভানু বললে, কংগ্রেস থেকে যে হুকুম এসেছে মদের দোকানে পিকেটিং করতে হবে।

গুণধর বললে, তাহলে তাই কর গিয়ে, বাড়িতে আর তুই আসিস নি।

ভানু বললে, ঠিক আছে, আজ থেকে আমি আর বাড়িতে আসব না—

গুণধর বললে, না, আসিস নি। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। তুই বাড়ি না এলে তো আমি বাঁচি।

ভানু আর বাড়ি ঢুকল না। সে যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই চলে যেতে লাগল। গুণধর তখনও রাগে গজ্ গজ্ করছে। বললে, শুনলে তো ছেলের কথা? শুনলে তো সব নিজেব কানে? ও সব ঐ কর্তামশাইয়ের কীর্তি। ছেলেরা বসে বসে এতদিন তাস পিটত, সে তবু ভালো ছিল। এ কোত্থেকে এক কংগ্রেস এসে হাজিব হল, তারপর থেকেই দেশে যত গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল।

নিমাই ঘোষ বললে, জানেন কর্মকার মশাই, কংগ্রেস-ফংগ্রেস যত সব বড়লোকদের কাণ্ড, আমাদের মতো গরীব লোকদের কী ভালো করবে বলুন তো?

গুণধর বললে, ইংরেজরা আমাদের ক্ষতিটা কি করলে সেটাই আমি এখনও বুঝতে পারলাম না নিমাই। তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ?

নিমাই বললে, আমি তো শরৎ মশাইকে তাই-ই বলছিলুম এতক্ষণ। ইংরেজরা আমাদের ক্ষতিটা কি করলে? আর গান্ধীই বা আমাদের কি ভালোটা করবে? এই যে আমি তেলেভাজা ভেজে দুটো পয়সা উপায় করি, ইংরেজরা চলে গেলে কি আমার আয় বাড়বে?

গুণধর বললে, ছাই বাড়বে! গান্ধীব কি অত পয়সা আছে যে তোমাকে আমাকে খাওয়াবে? আমাদের যা কপাল তা কেউ বদলাতে পাববে না।

নিমাই ঘোষ বললে, তা আপনার ছেলে এখন কি করবে?

গুণধর বললে, সে যা করে করুক গে। আমাব সে-সব দেখাব কি দবকাব। এই আজই দেখ না, বারোয়ারিতলায় কি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। বলে হুঁকোটা নিয়ে তামাক সাজতে লাগল। বললে, একটু তামাক খেয়ে যাও নিমাই।

নিমাই বললে, তামাক খাওয়া এখন আমার মাথায় উঠেছে। আমি যে কি জ্বালায় জ্বলছি তা আমিই জানি। বলে হুঁকোটা নিয়ে তামাক টানতে লাগল।

না, সেদিন তেমন কিছু হল না। সেটা প্রথম দিন। কর্তামশাই বন্দেমাতরম আওয়াজ দিতে দিতে বারোয়ারিতলায় এলেন। সঙ্গে তাঁর ভলান্টিয়ার সব। আমিও তার মধ্যে আছি।

বাবা বলতে লাগলেন, বন্দেমাতরম্—

আমরাও তাঁর কথা অনুযায়ী চিৎকার করে উঠলাম, বন্দেমাতরম্—

গাছের ডালে ডালে কংগ্রেসের তেরঙা কাগজের ফ্ল্যাগ। সমস্ত গ্রামের লোক দেখতে এসেছে বারোয়ারিতলায়। কাতারে কাতারে লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে এসেছে।

কেষ্টগঞ্জ থেকে খবব পেয়ে পুলিশও এসেছে শরৎ-এর দোকানের সামনে। যদি কোন হামলা হয় তো তখন তারা লাঠি চালাবে! সব পুলিশের হাতে লাঠি। তারা শরৎ-এর দোকান পাহারা দিচ্ছে। বাবা এক সময়ে বললেন, তোমরা এখানে থামো—

আমাদের দলবলের ছেলেরা সবাই থেমে গেল।

বাবা বললেন, আর এগিয়ো না তোমরা—

আমরা একেবারে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

শরৎ দোকানের ঝাঁপ খুলে যেমন বরাবর বসে থাকে তেমনি বসে ছিল। তার মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্ন। দেখেই মনে হয় ভয় করছে।

কর্তামশাই বলতে লাগলেন, দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু দেশবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর আত্মা আমাদের মধ্যে দিয়েই প্রেরণা দিচ্ছে। তিনি বলে গিয়েছিলেন বিলিতি জিনিস বর্জন করতে। আমরা তা করেছি। তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন দেশে মদ খাওয়া বন্ধ করতে। আমরা আজ তাঁর সেই আদেশ পালন করতে এখানে সবাই এসে সমবেত হয়েছি। আজ থেকে আমরা প্রতিদিন এই মদের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করব। আপনাদের তিনি এই বারোয়ারিতলায় দাঁড়িয়ে মদ বর্জন করতে বলে গিয়েছিলেন। আপনারা সেদিন তাঁর সেই আদেশ শুনেছিলেন। আজ তিনি জীবিত নেই, কিন্তু আমরা তাঁর অনুগামীরা আছি। তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি—আপনারা আজ থেকে মদ কিনবেন না। মদ স্পর্শ করবেন না। আপনারা এই সভায় প্রতিজ্ঞা করুন, আপনারা মদ খাবেন না।

ভানু কর্মকার, অধীর, তারাপদ, আমি, কার্তিক, আর যারা যারা সত্যাগ্রহ করবার জন্যে হাজির হয়েছিলাম তারা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বললাম, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন না এই মদের দোকান বন্ধ হচ্ছে ততদিন আমরা এখানে প্রতিদিন সত্যাগ্রহ করব। এ-ব্যাপারে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন। বন্দেমাতরম্—

আশে পাশে যারা মজা দেখতে এসেছিল তারাও সবাই সুরে সুর মিলিয়ে বারোয়ারিতলা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম্—

দুপুরবেলা পিকেটিং আরম্ভ হয়েছিল, রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত পিকেটিং চলল। প্রথম দিনের সত্যাগ্রহ সেদিনকার মতো শেষ হল। পরের দিনও আবার সেই রকম। আবার সেই বন্দেমাতরম্ আওয়াজ। সেদিনও পুলিশ তৈরি ছিল। কিন্তু কোনরকম হাঙ্গামা হল না। শরৎ আড্ডির দোকানে এক ফোঁটা মদও বিক্রি হল না।

এই রকম এক সপ্তাহ কাটল। পনেরো দিন কাটল। জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ সত্যাগ্রহী রোজ কর্তামশাইয়ের বাড়িতে খেতে লাগল। কর্তামশাই দু'হাতে টাকা খরচ করতে লাগলেন।

সুলতানপুরের যারা নিয়ম করে মদ খেত তারা মদ খেতে পেলে না। শরৎ আড্ডিরও লোকসান হল খুব। নিমাই ঘোষের তেলেভাজার দোকানও বন্ধ হয়ে গেল। তাদের কারো একটা পয়সা আয় নেই। সমস্ত গ্রামময় একটা উত্তেজনা। আশে পাশের গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল সত্যাগ্রহ দেখতে। সে এক দিন গেছে সুলতানপুরের।

মনে আছে ক'দিন ধরে বারোয়ারিতলার হাট-বাজারও বন্ধ রইল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

কর্তামশাইয়েরও খুব উৎসাহ। মা একদিন আর থাকতে পারলে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, আর কতদিন এ-রকম চলবে তোমাদের? এতগুলো লোক যে বাড়িতে খাচ্ছে, এদের আর কতদিন খাওয়াবে বসিয়ে বসিয়ে?

বাবা বললেন, যতদিন পারি খাইয়ে যাব।

মা বললে, শেষকালে যে তুমি পথে বসবে!

বাবা বললেন, পথে বসি বসব।

মা বললে, কিন্তু তোমার ছেলে? নিজে তো পথে বসছই তার ওপরে ছেলেটাকেও যে পথে বসাবে।

বাবা বললেন, দেশবন্ধুও তো সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দেশের জন্যে। আর আমি তো তাঁর তুলনায় কিছুই না। আমি আমার এই সামান্য সম্পত্তিও ত্যাগ করতে পারব না?

মা বললে, যাক্ গে, তোমার সম্পত্তি তুমি নষ্ট করবে তাতে আমার কী বলবার আছে? বলে আর সেখানে দাঁড়াল না।

কিন্তু তার কিছুদিন পরেই হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল। এতদিন সুলতানপুরের মাতালদের মদ না খেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছিল। তারা অনেক মাইল হেঁটে রাণাঘাটে গিয়ে মদ খেয়ে আসছিল। শরৎ আড্ডিরও অভাব চলছিল খুব। এক পয়সাও বিক্রি নেই তার। তারই বা দিন চলে কী করে?

সেদিন যখন সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেছে, অনেক রাত হয়েছে, আবাব সেই লোকটা এলো। শরৎ-এর বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকল, শবৎবাবু আছেন?

ভেতর থেকে শরৎ ভয়ে ভয়ে বাইবে এসে জিজ্ঞেস করলে, কে?

লোকটা গলা নামিয়ে বললে, আমি! আমায় চিনতে পারছেন না? সেই আগে একদিন এসেছিলাম।

এতক্ষণে শবৎ লোকটাকে চিনতে পারলে। বললে, কই মশাই, আপনি তো অনেক কথাই বলে গিয়েছিলেন। আপনার বড় সাহেব তো কিছুই করলেন না। আপনার কথাতেই তো আমি মাল-টাল সরিয়ে রাখলাম। এখন একটা পযসা আমদানি নেই, আমি সংসার চালাই কী কবে?

লোকটা বললে, আজই ফয়শালা হবে। আপনি কিছু ভাববেন না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, কী ফয়শালা হবে?

লোকটা বললে, সে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

শরৎ তবু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, কী ফযশালা হবে? পিকেটিং আর করবে না কংগ্রেস?

লোকটা বললে, সে আমি এখন আপনাকে বলব না। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। এই কথাটা বলতেই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। আমার বড় সাহেব আজকে নিজে এখানে আসবে।

বলে লোকটা চলে যাচ্ছিল। শরৎ ডাকলে, ও মশাই, চলে যাচ্ছেন কেন? বলে যান কী হবে? আর আমি সাবধানেই বা থাকব কেন?

লোকটা বললে, আমি তো সবই বললাম আপনাকে। এর বেশি আর জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে। এর বেশি বলতে বারণ আছে।

শরৎ আড্ডি জিজ্ঞেস করলে, আমি দোকান খুলব কাল?

লোকটা বললে, নিশ্চয় খুলবেন।

শরৎ আড্ডি বললে, যদি কিছু হয়।

—সেই জন্যই তো বলছি আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—

বলে লোকটা আর দাঁড়াল না। অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সেদিনও যথারীতি চারদিকে লোক এসে জড়ো হয়েছে। ঠিক দুপুরবেলার দিকে কর্তামশাই দলবল নিয়ে হাজির হলেন। সকলের হাতেই অন্য দিনের মতো তেরঙা কংগ্রেস ফ্ল্যাগ।

কর্তামশাই চিৎকার করে উঠলেন, বন্দেমাতরম্—

ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম্—

কর্তামশাই বলতে লাগলেন, আমাদের এ সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংস সংগ্রাম। কংগ্রেসের নীতি অহিংস সংগ্রামের নীতি। আমরা যে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি সে স্বাধীনতা শুধু হিন্দুদের স্বাধীনতা নয়, কিম্বা শুধু মুসলমানদের স্বাধীনতা নয়, আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি। আমরা বৃটিশ জাতিকে ঘৃণা করি না, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের শোষণ-নীতিকে ঘৃণা করি। সেই শোষণ এবং অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যেই এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেছি। সেই সত্যাগ্রহের একটি নীতি হল মদ্য বর্জন। আমরা চাই দেশ থেকে মদ্যপান বন্ধ হোক। মদ্যপান বন্ধ করতে হলে মদের দোকানও বন্ধ করতে হবে।

কর্তামশাই প্রত্যেক দিন ওইখানে দাঁড়িয়ে দুটো একটা কথা বলতেন। সেই কথা সবাই শুনত। সমস্ত লোক শুনত, পলিশ শুনত আর শরৎ আড্ডিও শুনত। তারপর কেবল 'বন্দেমাতরম্' আর 'বন্দেমাতরম্' শব্দ—

সেদিন কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। কী করে যে ঘটল কেউ জানে না। হঠাৎ শরৎ আড্ডির মদের দোকানে আগুন লেগে গেল। সেই আগুন অনুকূল হাওয়া পেয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। শরৎ আড্ডি আগুন দেখেই ছিটকে একেবারে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সবাই চিৎকার করে উঠল, আগুন—আগুন—

কর্তামশাই সামনে এগিয়ে গেলেন। ছেলেদের বললেন, তোমরা জল আনবার ব্যবস্থা কর, আগুন নেভাতে হবে, দেরি নয়, শিগগির কর—

কিন্তু হঠাৎ ওদিক থেকে পুলিশের দল সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুধু লাঠি নয়, বন্দুকের গুলির শব্দও হল। কংগ্রেসীরা আগুন লাগিয়েছে মদের দোকানে। সমস্ত লোকজন যে যেদিকে পারলে বাঁচতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কর্তামশাইয়ের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পাশেই একটা ডোবা ছিল সেখান থেকে জল নিয়ে আসবার জন্যে বললেন সবাইকে।

কিন্তু তার আগেই পুলিশের দল লাঠি চালাতে লাগল সত্যাগ্রহীদের ওপর। একটা লাঠি এসে পড়ল কর্তামশাইয়ের মাথার ওপর। আঘাতটা সহ্য করতে পারলেন না তিনি। সেখানেই মাটির ওপর পড়ে গেলন। সন্ধ্যার অন্ধকারে কার ওপর যে কে লাঠি মারলে কেউ দেখতে পেলে না।

পুলিশ বোধ হয় জানত যে মদের দোকানে আগুন লাগানো হবে।

ভানু কর্মকার কর্তামশাইয়ের কাছে যাচ্ছিল তাঁকে ধরে তুলতে। কিন্তু তাকেও ধরে ভ্যানের ওপর তুলে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তামশাইকেও ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। অধীর, কার্তিক, আমি, তারাপদ কেউই বাদ পড়লুম না। একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যেই সকলকে পুরে গাড়ি ছেড়ে দিলে। সকলেরই গা থেকে ঝর্-ঝর্ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু বাবার অবস্থাই ছিল সবচেয়ে খারাপ। বাবার মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে সমস্ত জামা-কাপড় ভেসে যাচ্ছিল। ভানুর অবস্থাও খুব খারাপ। তবু বারবার সে বলছিল ওরে তোরা জ্যাঠামশাইকে একটু দেখ। বাবা তখন অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে।

ভ্যানটা তখন সোঁ সোঁ করে ভাজনঘাট পেরিয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরের কেষ্টগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ও সব কতদিন আগেকার কথা। সেই ১৯২৩ কি ১৯২৫ সালের ঘটনা। কিম্বা ১৯২৬ সালও হতে পাবে। সময়টাও খুব দুর্যোগময়। অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীকে তখন জেলে পুরেছিল ইংবেজ সরকার। কযেক বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধটা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার কালো ছায়া তখনও গ্রামের মানুষের মন থেকে মুছে যাযনি। মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে ছাড়া পেলেন ১৯২৪ সালে। দেশবন্ধু মারা গেলেন ১৯২৫ সালে। ১৯২৪এর অক্টোবব মাসে বাঙলা গভর্মেন্ট কালা অর্ডিন্যান্স জাবি করে নতুন দমন নীতি শুরু কবে দিলে। তখন থেকে গ্রামে গ্রামে আবাব নতুন কবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবম্ভ হয়ে গেল। ছেলেরা বোমা-গুলি গোলা তৈবি কবতে ল্যাগল। উদ্দেশ্য দেশ থেকে ইংবেজ তাড়াবে।

সেই সময় জেলখানার ভেতরেই বাবা মারা গেলেন। বাকি যাবা জেলে ছিল তাদের নামে মামলা হল। সেই মামলায় আমাদের সকলের ছ'মাসের জেল হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে একদিন সুলতানপুবে ফিরে এলাম সবাই। ফিরে এসে দেখি মা মারা গেছে। মা'র দেহ সৎকার করেছে গ্রামের লোকেরা।

কয়েকদিন গ্রামেই কাটল। তারপর গোলাম মোল্লাকে বাড়ি দেখাশোনাব ভাব দিয়ে আমি কলকাতায় চলে গেলাম। আর তাবও পবে সুলতানপুরেব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ভাগ্য-সমুদ্রের ঢেউ আমাকে কোথায় ভাসিযে নিয়ে গেল আমি তা জানতেও পাবলাম না। বাবার জমি-জমা যা ছিল তা সবই বিক্রি করে দিয়ে আমি বলতে গেলে দেশত্যাগীই হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় কলকাতা, কোথায বোম্বাই, কোথায় মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সব ঘাটের জল খেয়ে স্থিতু হয়ে গিয়েছিলাম হায়দরাবাদে। হাযদরাবাদই ছিল আমার শেষ স্থাযী ঠিকানা। সেই ভানু, অধীব, কার্তিক, তারাপদ—যাদের সঙ্গে একই জেলে কয়েক মাস কাটিয়েছিলাম তাদেরও কোন খোঁজ-খবর রাখবার অবকাশ পাইনি।

শেষকালে শেষ জীবনে আবার একবাব আমার সেই পুরনো জন্মস্থান দেখবাব ইচ্ছে হওয়াতেই সুলতানপুরে এলাম।

গোলাম মোল্লা আমার খাওয়ার জন্য রান্না চাপিয়েছিল। হঠাৎ কানে এলো বহু লোকেব সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আমি অবাক হয়ে গেলাম শব্দ শুনে। এখানেও ওই শব্দ?

গোলাম মোল্লা তখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। সেও আওয়াজটা শুনতে পেয়েছিল। বললে, ওই ওমরপুরেব কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলছে তো তাই তার মজুররা মিছিল করে চলেছে—

জিজ্ঞেস করলাম ওমরপুরে কাপড়ের কল কবে হল? আগে তো ছিল না?

গোলাম মোল্লা বললে, ওখানে মাইতিদের কাপড়ের কল হয়েছে একটা—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে মাইতি আবার কারা?

গোলাম মোল্লা বললে, সেই বিনোদ মাইতি মশাইয়ের কথা আপনার মনে পড়ে? সেই যে বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছিলেন বারোয়ারিতলায়?

বললাম, হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

গোলাম মোল্লা বললে, তিনি এখন বেঁচে নেই, তিনি মারা যাবার আগেই ওই কাপড়ের কল বসিয়েছিলেন, এখন তার ছেলেরা ওই মিল চালাচ্ছে। এখন সেখানে মজুরদের ধর্মঘট চলছে, তাই ওরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ শব্দ করছে—

বললাম সেই 'বন্দেমাতরম্' আর কেউ বলে না বুঝি?

গোলাম মোল্লা বলে না, এখন ওসব উঠে গেছে।

আমি গোলাম মোল্লাকে বললাম, তুমি রান্না করো, আমি একটু ঘুরে আসি—

বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধ মানুষ আমার দিকে আসছেন। আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। হাতে লাঠি, চোখে সুতো দিয়ে বাঁধা মোটা কাঁচের চশমা।

আমার নাম ধরে ডাকতেই গলার আওয়াজে আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। শরৎ পণ্ডিত মশাই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, পণ্ডিতমশাই, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন, আমি তো যাচ্ছিলাম, বারোয়ারিতলায়, আপনার বাড়িতেও যেতুম—

পণ্ডিতমশাই বললেন, তুমি বাড়ি এসেছ শুনলাম আর আমি আসব না? কেমন আছো?

আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন তাই বলুন?

পণ্ডিতমশাই বললেন, আমি আর কী করে ভালো থাকি বল! আমার এই নব্বুই বছর বয়েস হল। এতদিন বেঁচে থাকাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। মারা গেলেই ভাবছি ভালো হত। আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না, দিনকাল যা পড়েছে, এর পর ভালো থাকা সম্ভব নয়—

তাঁকে একটা টুলের ওপর বসালাম। বললাম, ও-কথা কেন বলছেন মাস্টারমশাই? আপনি যে বেঁচে আছেন এ তো আমাদের সৌভাগ্য—

পণ্ডিতমশাই বললেন, না বাবা, ও-কথা আর বোলো না। দুটো বড় বড় যুদ্ধ দেখলাম। তার মধ্যে মানুষ যে কত অধঃপাতে নেমেছে, সে-সব ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কর্তামশাই যা কিছু করেছিলেন সব ভস্মে ঘি ঢেলে গিয়েছিলেন—

দূর থেকে আবার সেই আওয়াজটা এলো, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই শোন, শুনতে পাচ্ছ?

বললাম, এ-সব তো আগে ছিল না সুলতানপুরে। আমরা তো আগে 'বন্দেমাতরম্' বলে মিছিল করেছি। এখন আবার এ-সব কী শ্লোগান এলো? শুনলাম নাকি মাইতিদের কাপড়ের কল হয়েছে ওমরপুরে। সেখানকার মজুররা নাকি ধর্মঘট করেছে—

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই যে আমরা এককালে 'বন্দেমাতরম্' বলতাম, তারপর এলো জয়হিন্দ্, আমরা বন্দেমাতরম্ ভুলে গিয়ে জয়হিন্দ্ বুলি ধরলাম। এখন আবার জয়হিন্দ্ ভুলে গিয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ বুলি ধরেছি। একদিন দেখবে এই ইনক্লাব জিন্দাবাদও আমরা ভুলে যাব, ভুলে গিয়ে আবার নতুন কোন বুলি ধরব। এই-ই আমাদের দেশ। এই আমাদের দেশের অবস্থা। অথচ একদিন ওই বন্দেমাতরম্ বুলির জন্যে কত লোক পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, তা তো জানো?

একটু থেমে পণ্ডিতমশাই আবার বলতে লাগলেন, আর ওই দেখ বিনোদ মাইতি মশাইয়ের কথা। তিনি বিলিতি কাপড় পোড়াবার জন্যে একদিন সারা বাঙলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। নিজে তক্‌লিতে সুতো কেটে সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনে পরেছেন। ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে কত বক্তৃতা করেছেন, সেই তিনিই দেশ স্বাধীন হবার পর কাপড়ের কল তৈরি করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন—এখন তাঁর ছেলেরা আছে, তারাই কল চালাচ্ছে, আর দামী দামী মোটর গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে—

বলতে বলতে তিনি হাঁফাতে লাগলেন।

বললাম, চলুন পণ্ডিতমশাই, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই—

তিনি লাঠি ধরে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর হাত ধরে চলতে লাগলাম। বারোয়ারিতলায় এসে

আর চিনতে পারলাম না। বললাম, এ যে দেখেছি বারোয়ারিতলাকে আর চিনতে পারা যায় না—

একটা জায়গায় দেখি কয়েকটা পাকা বাড়ি। আগে পাকা বাড়ি মোটে ছিল না বারোয়ারিতলায়। এ কি সেই বারোয়ারিতলা? আমার যেন কেমন সন্দেহ হল। এখানেই কি বাবার মাথায় পুলিশের লাঠি পড়েছিল? এখানেই কি আমি, ভানু, অধীর, তারাপদ, কার্তিক সবাই মিলে শরৎ আড্ডির মদের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করে পুলিশের লাঠি খেয়েছিলাম?

হঠাৎ পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভানুকে চিনতে? গুণধর কর্মকারের ছেলে?

বললাম, খুব চিনি, আমরা একসঙ্গে মদের দোকানে পিকেটিং করে পুলিশের লাঠি খেয়েছি, একই জেলখানায় একসঙ্গে ছ'মাস কাটিয়েছি।

পণ্ডিতমশাই বললেন, ওই দেখ সেই ভানুর মদের দোকান—

আমি চেয়ে দেখলাম। একটা পাকা বাড়ির ওপর বাঙলায় সাইন্ বোর্ডে লেখা—বিলিতি মদের দোকান।

বললাম, ভানু বেঁচে আছে?

পণ্ডিতমশাই বললেন, হ্যাঁ, আগে ভানুই দোকানে বসে মদ বেচত। এখন ছেলেরা বেচে। সে বাড়িতে বসে থাকে।

বললাম, সেই ভানুকে তো গুণধর কর্মকার মশাই ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, ছেলের টাকা হবার পর বাপ সে-সব ভুলে গিয়েছিল। ছেলের জন্যেই বাপের শেষ জীবনটা খুব আরামে কেটেছিল। টাকায় সব হয় আজকাল বাবা। ভানুর টাকা হবার পর গুণধর কর্মকার ছেলের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ, সকলকে ডেকে ডেকে ছেলের প্রশংসা করত।

আমি সব শুনে নিজের মনেই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এ কী হল? মনে পড়ে গেল তখন আমি কলকাতায়। ধর্মতলা-চৌরঙ্গীতে সেই রসিদ আলির মুক্তির দাবীতে দুর্বার আন্দোলন, রামেশ্বর-আবদুস্ সালেমের রক্ত-রাঙা পথে দুরন্ত ছাত্র-মিছিল, সারা দেশে ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট আর হরতাল ডাকা হলো। স্কুল-কলেজ-অফিস কল-কারখানা-হাট বাজার-গাড়ি ঘোড়া, এমন কি খবরের কাগজ পর্যন্ত বেরোল না। সেদিন বেডিও পর্যন্ত বন্ধ রইল। সারাদিন শুধু গানের রেকর্ড বন্ধ রইল। সেদিন ছিল ২৯শে জুলাই ১৯৪৬ সাল। তখন সকলের কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধল। শেষ পর্যন্ত জার্মানী হেরে গেল সে-যুদ্ধে। সুভাষ বোস নেতাজী হলেন। গান্ধীজী জেল থেকে মুক্তি পেলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। আসমুদ্র হিমাচল উল্লাসে উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠল। দেশ অবশ্য ভাগ হল, কিন্তু তা হোক, ভারতবর্ষ থেকে সেই ইংরেজরা তো চলে গেল।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, চরিত্র গেলে সব চলে যায় বাবা। আমাদের চরিত্রটাই চলে গেছে। মানুষের চরিত্র নষ্ট হলে দেশের চরিত্রও নষ্ট হয়ে যায়। কথায় আছে রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, কিন্তু প্রজার দোষেও যে রাজ্য নষ্ট হয় তা এই সুলতানপুরকে দেখলেই বুঝতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য বাবা যে আমাকে বেঁচে থেকে এই সব দেখতে হচ্ছে—

আমি বললাম, আপনি তো অনেকদিন জেল খেটেছিলেন, আপনি সরকারী পেনসন পাচ্ছেন না? পণ্ডিতমশাই বললেন, না বাবা, আমি ও নিইনি। ওই মদের দোকানের মালিক ভানু কর্মকার যে-পেনসন্ পাচ্ছে সে-পেনসন্ ছুঁতেও আমার ঘেন্না হয়। আমি নেব সরকারি পেনসন? তার চেয়ে না খেয়ে উপোস্ করে মরাও ভালো। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি আর কোন কথা তাঁকে বলতে পারলাম না। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমিও বাড়ি ফিরে এলাম।

হরিপদকে আবার ডেকে পাঠালাম। হরিপদকে আপনারা চেনেন! এই হরিপদই আমাকে কতবার বাঁচিয়েছে। ভক্তের বিপদে যেমন মধুসূদন, আমার বিপদে তেমনি হরিপদ।

বিশেষ করে পূজো-সংখ্যার মরসুম যখন আসে তখন আবার তাকে ডেকে পাঠাই। অন্য সময়ে ডাকলে হরিপদ তাড়াতাড়ি আসে। কিন্তু পূজোর মরসুমে ডাকলে পায়াভারি হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে তাকে না হলে আমি অচল। অন্য সময়ে প্লট পিছু পাঁচ টাকা করে দিলে সেটাই হাত পেতে নেয়। বিশেষ আপত্তি করে না।

কিন্তু পূজোর সময় তার পায়াভারি হয়ে ওঠে। বার বার লোক পাঠিয়ে ডাকলেও তার দেখা পাওয়া যায় না। আমার লোককে বলে—তুমি যাও, আমি যাবো'খন কাল—

তারপর আমি হাঁ করে তার পথ চেয়ে বসে থাকি কিন্তু তার টিকিটাও দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে হরিপদ আমার বিপদ বোঝে। একসঙ্গে ছ'টা উপন্যাস আর পঁচিশটা গল্প লেখার যে কী ঝক্কি তা আমার চেয়ে হরিপদই বেশি বোঝে। বলে, আর আমার দ্বারা হবে না স্যার, আপনি এবার অন্য লোক দেখুন। যে-হারে আপনাদের পূজো-সংখ্যার হিড়িক বাড়ছে এরপর আমার দ্বারা আর হবে না—

কথাগুলো হরিপদ মুখে বলে বটে কিন্তু হরিপদর যে অফুরন্ত ভাঁড়ার তা হরিপদ যেমন জানে, তেমনি আমিও জানি। হরিপদর গুমোর ভাঙার জন্যে আমি অনেকবার অন্য লোক ডেকে এনে চেষ্টা করে দেখেছি। সবাই বলে তারাও নাকি গল্প সাপ্লাই করতে পারবে।

গল্প সাপ্লাই করার গোড়ার কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাকে মিশতে হবে। মিশতে হবে মানে তাকে ঘরে বসিয়ে একটার পর একটা বিড়ি বা সিগারেট খাওয়াতে হবে। তারপর পান কিংবা চা। যার যেমন নেশা। একটু আজে-বাজে গল্প করতে করতে যখন গল্প জমে উঠবে তখন তার মধ্যে থেকেই আসল কাজ সেরে নিতে হবে। অর্থাৎ হাজারটা কথার মধ্যে একটা হয়তো আমার কাজে লাগলো। গল্প সাপ্লাই-এর মূল কথা হলো একটু বাক্যবাগীশ লোক হওয়া চাই। যারা বেশি কথা বলে তারাই বেশি বাজে কথা বলে। লক্ষ-লক্ষ বাজে কথার ঝুড়ি থেকে আমাকে কাজের কথা বেছে নিতে হবে।

হরিপদই বাজে কথা বলতে সব চেয়ে বেশি পটু। এমন-এমন রাজা-উজির সে মারতে পারে যে অন্য কোনও ব্যাপার হলে আমি তাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিতাম না।

কিন্তু এ ব্যাপারে রাজা-উজির যতই মরুক সে ততই লাভ। রাজা-উজির মারতে মারতে কখন যে সে একটা ভালো প্লট আমাকে দিয়ে ফেলতো তা সে নিজেই জানতো না।

গল্পটা লেখা হয়ে যাবার পর কোনও কাগজে হয়তো সেটা বেরিয়েছে, তখন সেটা হরিপদর নজরে পড়ে যেতেই সে ছুটে আসতো আমার কাছে।

বলতো—স্যার, এ গল্পটা আপনি কোথায় পেলেন?

বলে গল্পটা প্লট্ বলে যেত। তারপর বলতো—এ তো আমার দেওয়া প্লট্ স্যার। কোন্ ফাঁকে আমি একটা প্লট্ বলতে-বলতে অন্য একটা প্লট্ তার ভেতরে বলে ফেলেছি, আর আপনি তা বেমালুম মেরে দিয়েছেন? এর জন্যে তো আমি কোন এক্সট্রা পাইনি?

তা এ-রকম হতো মাঝে মাঝে। বেশি বক্-বক্ করলে অনেক সময় একটা প্লটের বদলে দুটো প্লটও বেরিয়ে প'তো। হরিপদ কথা বলার নেশায় তা জানতে পারতো না। মাঝখান থেকে

লাভ হয়ে যেত আমার। আমি অবশ্য হরিপদর লোকসান করিয়ে দিতাম না। আমি তাকে আরো কিছু টাকা দিয়ে তার লোকসান পুষিয়ে দিতুম।

যা' হোক এবার আমার ডাক পেয়েই হরিপদ এল। সে আঁচ পেয়েছিল যে আমার জরুরী দরকার, নাহলে এত তাড়াতাড়ি এত জরুরী ডাক তাকে দিতুম না।

সে এসে একটা বিড়ি ধরালে। বললে—একটা পান খাওয়াতে পারেন স্যার?

শুধু পান নয়, চা বিড়ি সব কিছুই তাকে খাওয়াতে হতো। গরজ যখন আমার তখন তাকে একটু তোয়াজ করতেই হবে। চা খেয়ে হরিপদ একটু ধাতস্থ হলো। বললে—কী ব্যাপার স্যার? এত জরুরী তলব পেন? পুজো-সংখ্যা এসে গেছে বুঝি?

বললাম—হ্যাঁ, তুমি তো সবই জানো, তুমি তো আমার কাছে নতুন লোক নও—

হরিপদ বললে—ক'টা উপন্যাসের অর্ডার পেলেন?

বললাম—সবগুলো লিখবো না। লিখলে তো ছ'টা লিখতে হয়। তা অত লেখার সময়ও নেই আমার আর তোমারও মগজে অত প্লট্ নেই—

হরিপদর অহমিকায় বোধহয় আঘাত লাগলো।

বললে—সে কী বলছেন স্যার? হরিপদর মগজে প্লট নেই? আপনি ক'টা প্লট চান? নেহাৎ আমি লিখতে পারি না তাই, নইলে আমি আপনাদের মত রাইটারদের এক হাত দেখিয়ে দিতুম। আমি এখনও এমন প্লট দিতে পারি যে তা লিখলে সঙ্গে সঙ্গে বাংলা হিন্দি তেলেগু তামিল সব ভাষার সিনেমা-রাইট্ বিক্রি হয়ে যাবে।

হরিপদ বরাবরই এমনি বাক্যবাগীশ। হরিপদর ওই একটিই গুণ। হরিপদ বেশি কথা বলে বলেই ও আমার লেখক-জীবনে এত অপরিহার্য। যারা আমার সামনে এসে চুপ করে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে তাদের দিয়ে আমার কোনও লাভ হয় না। লাভ হয় এই হরিপদর মতন সমস্ত বাক্যবাগীশ লোকদের নিয়ে। হরিপদরা যেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণই শুধু গল্প করে যায়। শুধু গল্পই করে না, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা রসালো করে ঘোষণা করে। তার মধ্যে কত অমূল্য রত্ন থাকে তা কুড়িয়ে বেছে নেবার মত লোক আর ক'জনই বা থাকে। অনেক সময়ে এই বাক্যবাগীশরাও জানে না যে তারা অজান্তে কত উপন্যাস কত গল্পের প্লট বিলিয়ে দিচ্ছে।

জানতে পারলে হয়তো হরিপদরা সচেতন হয়ে পড়তো। আর কথা বলতো না।

এই রকম এক রাস্তার চায়ের দোকানের আড্ডা থেকেই আমি হরিপদকে খুঁজে বার করেছিলাম। তাকে আমার বাড়ি আসতে বলেছিলাম। তারপর নেহাৎ দয়া-পরবশ হয়ে প্রথম প্রথম তাকে দু'চারটে টাকা দিয়েছিলাম।

তারপর থেকেই হরিপদর নেশা লেগে গেল। নেশা লেগে গেল আমারও। অফুরন্ত গল্পের খনি ছিল ওই হরিপদ। আমি এক-একটা বই লিখেছি আর লোকে বাহবা দিয়েছে। আমার গাদা-গাদা টাকা হয়েছে আর হরিপদ প্রতি প্লট পিছু পাঁচটা করে টাকা পেয়েছে।

ইদানীং আমার চালাকিটা ধরতে পেরেছিল হরিপদ। হরিপদ বলতো—এবার রেট একটু বাড়ান স্যার, আর পারছি না। দেখছেন তো সব জিনিসের দাম বাড়ছে—

বললাম—পরের বারে বাড়াবো—

হরিপদ বললে—দশ টাকা করে দেবেন স্যার। আমিও আপনাকে ভালো প্লট দেব। একটা এমন প্লট পেয়েছি স্যার যে শুনে চমকে উঠবেন—

বললাম—কী রকম?

হরিপদ বললে—একেবারে নতুন ধরনের প্লট স্যার। ওই একঘেঁয়ে বিয়ের গল্প নয়। মেয়েছেলের প্রেম-ট্রেম নয়—

বললাম—প্রেম ছাড়া গল্প কি চলবে?

হরিপদ বললে—ও নিয়ে তো সবাই লেখে স্যার, সিনেমাতেও দেখেছি, এবার প্রেমের পরের প্লট নিয়ে লিখুন না—

বললাম—কী রকম?

হরিপদ বললে—এই ধরুন বিয়ে-টিয়ে হবার পর। বিয়ের পরের গল্প আপনারা কেউ লেখেন না কেন বলুন তো?

বুঝতে পারলাম না ঠিক তার কথাটা। বললাম—বিয়ের পরের গল্প মানে?

হরিপদ বললে—বিয়ের আগের গল্প তো এতদিন আপনি লিখে এসেছেন। কিন্তু এবার লেখাটা ঘুরিয়ে দিন না একেবারে—

বললাম—তুমি বলে যাও, দেখি আমার ভালো লাগে কিনা—

হরিপদ বললে—তাহলে আর এক কাপ চা আনতে বলে দিন স্যার, আমিও আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই—

বলে হরিপদ একটা বিড়ি ধরিয়ে হুশ্ হুশ্ করে খানিক প্রাণপণে টানতে লাগলো।

তারপর বললে—কোন্ গল্পটা বলি বলুন তো? আপনার পূজোসংখ্যার গল্প একটু নিরস হলে তো আপত্তি নেই?

বললাম—কেন? পূজো-সংখ্যায় গল্প বলে কি ফ্যাল্‌না?

হরিপদ বললে- -আজ্ঞে না, পূজো সংখ্যায় কেউ আপনাবা ভাল গল্প লেখেন না কিনা। আমি তো দেখেছি সবাই দায়সাবা লেখা লেখেন কিনা। তাই ও-কথা বলছিলুম—

আমি বললুম—না, আমার বেলায় তা চলবে না। পূজো-সংখ্যার লেখাই হোক আর বোশেখ-সংখ্যার লেখা হোক, যখন বই বেরোবে তখন তো আমার নামেই বই বেরোবে। তখন তো পূজো-সংখ্যার বেরিয়েছিল বলে সে-লেখাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

হরিপদ বললে—সে আর ক'টা লেখক বোঝেন বলুন! সবাই তো নগদ বিদেয় পেলেই খুশী। অথচ মশাই আমি তো সেদিন হরিসাধনবাবুকে তাই বলছিলুম—এখন আপনার নাম হয়েছে তাই সাপ-ব্যাঙ যা খুশী তাই লিখেছেন, কিন্তু যখন একদিন আপনার ভক্তরাই আপনাকে লাথি মারবে তখন গরীবের কথার মূল্য বুঝবেন!

বলেই আবার হরিপদ বলতে লাগলো—আমি তো আজ এ লাইনে নতুন নয় মশাই, আমি বড় বড় রাইটারদের গল্প সাপ্লাই করে এসেছি। দেখেছি যখন তাদের খুব নাম তখন চারদিকে খুব রব-রবা, তারপর যখন নাম-ধাম সব গেল তখনকার হালও তো দেখেছি। তখন সম্পাদক বলুন পাবলিশার বলুন কেউ একবার তাদের ধার-কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। এই-ই হচ্ছে দুনিয়া মশাই, এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম!

প্রথম দিকে হরিপদ এই রকম উপদেশ কিছু ঝাড়বে। এ ওর বরাবরের নিয়ম। কারণ গরজ তো আমারই। তারপর খানিকক্ষণ বকর-বকর করে তখন আসল গল্প ধরবে।

বললুম—কই, এখনও তো শুরু করলে না? ধরো। আমার যে এদিকে শিরে সংক্রান্তি।

হরিপদ বললে—মনটা বড্ড চঞ্চল রয়েছে স্যার, সেই জন্যেই ধরতে দেরি হচ্ছে, নইলে কি আর হরিপদর কাছে প্লটের অভাব?

কেন, মনটা চঞ্চল রয়েছে কেন?

হরিপদ বললে—এ হপ্তার র‍্যাশন আনা হয়নি টাকার অভাবে।

বললাম—ঠিক আছে, দু'টো গল্পের প্লট দাও, যদি পছন্দ হয় তো দশটা টাকা নগদ দিয়ে দেব এখনই! বলো আগেই দিয়ে দিচ্ছি—

বলে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে—

টাকা দেখে হরিপদর চোখ দুটো চক্-চক্ করে উঠলো। টাকাটা টপ্ করে আমার হাত থেকে নিয়েই পকেটে ফেললো। বললে—ট্র্যাজেডি, না কমেডি কী চান বলুন এবার?

বললাম—সে যা হোক তোমার খুশী। আমার ভালো গল্প হলেই হলো।

হরিপদ বললে—তাহলে ট্র্যাজেডিই বলি স্যার। আমার নিজের জীবনও তো ট্র্যাজেডি স্যার। ট্র্যাজেডিতে আমার হাতও ভালো খোলে—

বলে একটু থামলো। তারপর বললে—আমাদের হেমদাবাবুর গল্পটা বলবো স্যার?

আমি হেমদাবাবুকে চিনতে পারলাম না। বললাম—কে হেমদাবাবু?

হরিপদ বললে—আমার মালিক—

—তোমার মালিক মানে?

হরিপদ বললে—মানে আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক যিনি। মানে আমি যাঁর বাড়িতে থাকি। তিনিই আমা'কে, আমার পরিবারকে থাকতে দিয়েছেন কিনা। অথচ থাকবার জন্যে একটা আধলাও বাড়ি ভাড়া নেন না—

বললাম,—এ যুগে এ-রকম লোক তো বড় দেখা যায় না। তোমা'দের থাকতে দেন আর টাকা নেন না?

—না।

বললাম—তা হঠাৎ তোমার ওপর তাঁর এত দরদ কেন?

হরিপদ বললে—ওই তো, ওইটেই তো গল্প। ওই জন্যেই তো বলছি হেমদাবাবুকে নিয়েই লিখুন আপনি। লিখলে দেখবেন খুব নাম হবে আপনার। এইটে লিখলে ঝপাঝপ্ অনেকগুলো গল্পের অর্ডার পেয়ে যাবেন—

বললাম—বাজে কথা থাক, আসল গল্পে এসো। হেমদাবাবু কী করেন?

হরিপদ বললে—এককালে করতেন অনেক কিছু! লাখ-লাখ টাকার মালিক ছিলেন। আমি তো ছোটবেলা থেকেই ওঁর সঙ্গে আছি কিনা। একেবারে সেই আদিকাল থেকে। আগে তিনি যেমন কাজের লোক ছিলেন এখন একেবারে তেমনি অকম্মা হয়ে গেছেন।

অথচ এককালে সমস্ত দিন খাবার সময়ই পেতেন না। তখন ওঁর কী বোল-বোলা। ভোর বেলাই বেরোতেন গাড়ি নিয়ে, আর কোনও দিন ফিরতেন সেই রাত পুইয়ে গেলে।

আমি বলতুম—হুজুর আর কত দেরি করবেন? এবার বাড়ি যাবেন না?

বাবু বলতেন—আর একটু দাঁড়া রে, এই হয়ে এসেছে—

'হয়ে এসেছে' 'হয়ে এসেছে' বলতে বলতে কখন যে রাত দশটা-এগারোটা-বারোটা বেজেছে তার খেয়াল থাকতো না বাবুর। তারপর যখন খেয়াল হতো তখন বলতেন—উঃ বড্ড দেরি হয়ে গেল রে—

আমি আসলে ছিলুম তখন বাবুর যাকে বলে ল্যাং-বোট, বাবুব সঙ্গে ঘোরাই ছিল আমাব আসল কাজ। আমি বলতে গেলে কিছুই করতুম না। শুধু বাবুর সঙ্গে ছায়ার মতন পেছনে ঘুরতুম। ছোটবেলা থেকে বাবুর কাছে কাজে ঢুকেছিলুম। বাবু একবার কলকাতায এসেছিলেন কী একটা কাজে। আমার মামা একদিন বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন আমাকে।

মামা বললে—আমার এই মা-মরা ভাগ্নেটাকে নিয়ে এসেছি হুজুর, এর একটা কিছু করে দিন—

বাবু বললেন—এতটুকু ছেলে কী করবে?

মামা বললে—আজ্ঞে আপনার ফাই-ফরমাস খাটবে। আপনার জলের গেলাসটা এগিয়ে দেবে। আপনার দরকার হলে গা-হাত-পা টিপে দেবে—

বাবু ভালো করে পরীক্ষা করলেন আমাকে। আমার দ্বারা গা-হাত-পা টেপার কাজ হবে কিনা তাই-ই বোধহয় পরীক্ষা করে দেখলেন। আমাকে দিয়ে যে কোনও কাজই হবে না তা তিনি হয়ত আমাকে দেখেই বুঝতে পারলেন। কিন্তু তবু নিলেন আমাকে। আমাকে দিয়ে তাঁর কোন কাজ হবে কিনা তা না বুঝেই আমাকে নিলেন। বাবুর তখন অনেক টাকা। টাকার যাকে বলে

পাহাড়। তাই আমাকে নিয়ে লাভ হবে কি লোকসান হবে তা আর ভেবে দেখলেন না, আমাকে নিয়ে নিলেন। মাইনে-ফাইনের কথা আর উঠলো না। আমার তখন চরম অবস্থা একেবারে। পেট ভরে খেতে পাবো এইটেই আমার কাছে তখন বড় কথা। আর তা ছাড়া মামাও আমাকে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচে গেল।

আমি গেলুম তাঁর সঙ্গে। সে কি এখানে? যাকে বলে ধাব্‌ধাড়া গোবিন্দপুর। কোথায় কলকাতা আর কোথায় সেই সখেরগঞ্জ।

উড়িষ্যা চেনেন তো? আর মধ্যপ্রদেশও চেনেন নিশ্চয়ই। সে স্যার এমনই এক দেশ যেখানে পাণ্ডবরাও বনবাস করবার সময় যেতে ভয় পেয়েছে। মানে যাকে কথায় বলে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। বাবু আমার তখন কন্‌ট্রাক্টর মানুষ। লাখ-লাখ টাকা খাটছে তখন তাঁর কারবারে। তাঁর ওভারশিয়ার আছে, ইঞ্জিনীয়ার আছে, মিস্ত্রী, মজুর, কুলি-কামিন সবই আছে। কাজ হচ্ছে সিমেন্ট-কন্‌ক্রিটের পুল তৈরি করা।

সরকারী কাজে যে অনেক ল্যাঠা তা আমি সেই তখনই জানতে পারলুম স্যার। বাবুর তখন একখানা জিপ্ গাড়ি ছিল। সেই জিপ্ নিয়ে মাইলের পর মাইল বাবু চালিয়ে যেতেন। আর সে কী জোরে চালানো। আমি পাশে বসে থাকতুম। ভয় করতো বড্ড।

বাবু বলতেন—কী রে হরিপদ, ভয় করছে তোর?

বলতুম—বাবু একটু আস্তে চালান—

বাবু হেসে বলতেন—তোর যদি ভয়ই করবে তাহলে আমার সঙ্গে তুই আসিস কেন?

আমি বলতুম—আমার জন্যে বলছি না, মা আমাকে বলে দিয়েছে—

—মা! হেমদাবাবু অবাক হয়ে যেতেন। বলতেন—মা? মা কী করে জানলে যে আমি জোরে গাড়ি চালাই—

আমি বলতুম—আমি বলে দিয়েছি।

বাবু বলতেন—তা কেন তুই বলতে গেলি আমি জোরে গাড়ি চালাই?

আমি বলতুম—বা রে, মা আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো না?

—তোকে মা কী জিজ্ঞেস করে?

আমি বলতুম—মা আমাকে সব জিজ্ঞেস করে। কোথায় গেলুম, কী করলুম, কী খেলুম সব বাড়ি গেলেই জিজ্ঞেস করে। কার সঙ্গে দেখা হলো, কে কী বললে, সব কথা যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে আমাকে!

বাবু এসব জানতেন না। আমার কাছে শুনে যেন নতুন কিছু খবর পেয়ে যেতেন।

বলতেন—আমি যে তাস খেলি তাও বলিস নাকি মাকে?

—হ্যাঁ, তাও বলি। আপনি কত টাকা তাস খেলে হেরে যান তাও বলি!

শুনে বাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যেত। তারপরে বলতেন—দ্যাখ্, সব কথা তোর মাকে বলিস নি, জানিস। সব কথা মেয়েমানুষদের বলতে নেই।

আমি তখন খুব ছোট তো। ঠিক বুঝতুম না বাবর কথাগুলো। বুঝতুম না কেন মেয়েমানুষদের সব কথা বলতে নেই। তবু বলতুম—আচ্ছা ঠিক আছে, আর বলবো না—

বাবু বলতেন—বলবি, তবে কিছু কিছু বলবি। আমি তাস খেলে টাকা হেরে যাই এটা বলতে নেই, জোরে-জোরে গাড়ি চালাই এটাও বলতে নেই। মেয়েমানুষরা খুব ভীতু হয় কিনা তাই ওসব কথা শুনলে ভয় পেয়ে যাবে। বুঝলি?

আমি বলতুম—হ্যাঁ, বুঝেছি—

কিন্তু বুঝেছি বললেও আমি তখন কিছুই বুঝতুম না। আর বোঝবার চেষ্টাই করতুম না স্যার। আর বুঝেই বা কী হবে? আমি তো তখন ছেলেমানুষ! আমার তখন কেবল চারদিকে ঘুরে বেড়ানো ভালো লাগতো। বাবুর বাড়ি তখন ছিল জয়পুরে। জয়পুর হলো গিয়ে আজ্ঞে

উড়িষ্যার একটা শহর। শহর কিন্তু ছোট শহর নয়। বেশ বড়। জিনিসপত্র সব পাবেন সেখানে আপনি। নুন থেকে শুরু করে চুন-সুরকি-সিমেন্ট সব পাবেন। ওদিকে ভিজিয়ানাগ্রাম ইস্টিশানের নাম শুনেছেন? সেই ইস্টিশান থেকে হাঁটা রাস্তায় আসতে গেলে শ' দেড়েক মাইল। আর কাছেই কোরাপুট। সেখানেও বাবুকে যেতে হতো দফতরের কাজে। আর পশ্চিম দিকে সোজা চলে গেলে পড়বে জগদলপুর। সেটা হলো মধ্যপ্রদেশ।

কিন্তু জয়পুরে যেখানে আমাদের বাড়ি সেটা স্যার শহর থেকে একটু দূরে। কন্ট্রাকটারের থাকবার জন্যে গভর্নমেন্ট্ থেকে বাড়িটা দিয়েছিল। জয়পুরে এলে বাবু আর আমি ওই বাড়িতেই থাকতুম।

বাড়িটার একটা দোষ ছিল স্যার। বড্ড বড়। মানুষ তো নাস্তর দু'জন, বাবু আর মা। আর আমি। তা আমার কথা না বলাই ভালো। আমি তখন বলতে গেলে মানুষই নই। একটা পিঁপড়েও যা খায় আমিও তাই—

বাড়িটা বুঝি ছিল কোন্ রাজার। আদিকালে কোনও রাজা হয়ত রাজত্ব করতো ওই বাড়িতে বসে। সামনে ছিল একটা মস্ত ঝিল্। ঝিল্‌টা তখন অর্দ্ধেক মজে গেছে। যখন আগের যুগে ডাকাত আর গুণ্ডাদের রাজত্ব ছিল তখন তাদের সর্দার ছিল ওই রাজা। তারপর ইংরেজ-ফিংরেজ কত আমল গেছে। সে-সব ডাকাতও নেই তখন, তাদের সর্দারবাও নেই। বাবু বলতেন—সে-যুগে নাকি ডাকাতের সর্দাররাই রাজার মতন দেশের রাজ-কার্য চালাতো। তারপর যখন স্বদেশী আমল হলো তখন সেই সব রাজাদের সম্পত্তি সরকার নিয়ে নিলে। তখন নতুন করে শুরু হলো রাস্তাঘাট। নতুন করে তৈরি হতে লাগলো ইস্কুল-কলেজ। সাহেবদের জায়গায় দিশি সাহেবদের রাজত্ব শুরু হলো। সেই তখনি বাবু কন্ট্রাকটারির কাজ পেলেন ওইখানে।

আগে বাঘ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়াতো ওসব জায়গায়। বাবু বলতেন—আগে তো আসিসনি তুই, আগে এলে ভয়েই মরে যেতিস—এইখানে বাঘ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়াতে দেখেছি আমি—

শুধু বাঘ-ভাল্লুকই নয়, নদীতেও বড় বড় কুমীর। হেমদাবাবু প্রথম প্রথম যখন এখানে এসেছিলেন তখন হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরতেন। বন্দুক পাশে রেখে ঘুমোতে হত তখন! তখন তো জয়পুরের রাজবাড়িও ছিল না। প্রথম প্রথম একটা খড়ের চালের ঘরের মধ্যে থাকতেন আব বালিশের পাশে বন্দুক রেখে দিতেন। প্রথম-প্রথম মা যায়নি সেখানে। কে সেই জঙ্গলেব দেশে যায় বলুন তো? আশে-পাশে কথা বলবাব লোক কি আছে একটা?

মা যখন প্রথম গেল তখন চারদিকের সব কিছু দেখে অবাক হয়ে গেল!

বললে—এখানে থাকবো কী করে গো?

বাবু বলতেন—কেন, এত বড় বাড়ি, কত ঘর, সামনে কত বড় ঝিল্, ওই ঝিলে বড বড মাছ আছে, দেখ না, কত পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, কত বাহার চাবদিকে দেখ তো, এখানে এই বারান্দায় বসে বাহার দেখতেই তো দিন কেটে যায়—

বাবু বাড়িতে সময় কাটাবার জিনিসপত্তরের কোনও অভাব রাখেন নি। কলের গান থেকে আরম্ভ করে শাড়ি-গয়না-টাকাকড়ি পর্যন্ত সব কিছু দিয়েছিলেন।

বাবু সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে বাইরে যেতেন। আর ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করতেন—কী হলো, তোমার কিছু অসুবিধে হয় নি তো?

মা বলতো—না—

যেদিন জয়পুরে থাকতেন বাবু সেদিন মা'কে নিয়ে বেরোতেন। যে ক'টা দোকান ছিল সব দোকানে দোকানে ঘুরে জিনিসপত্তোর কিনে বাড়িতে পাহাড় করে তুলতেন। গানের রেকর্ড কিনতেন, আর সারা দিন ধরে গান শুনতেন। আমিও গান শুনতুম। বাড়িতে আরো লোকজন ছিল বটে, কিন্তু তারা থাকতো বাইরের বাড়িতে। আমি থাকতুম বাবুর ঘরের পাশের ঘরে।

তবে বাড়িতে তো বেশি দিন একসঙ্গে থাকবার সুবিধে হতো না। একদিন কি দু'দিন থেকেই বাবুর সঙ্গে বাইরে ছুটতে হতো।

কিন্তু ওই দু'দিন এলাহি রান্না-খাওয়া হতো। সকাল থেকেই হয়ত রান্না হচ্ছে। বাবু রাঁধছেন আবার মা'ও রাঁধছে। আবার কখনও আমিও রাঁধছি। দু' রকমের মাংস রান্না হচ্ছে, তারপর মাছ। তারপর পলোয়া, মাছভাজা, ডাল, দই, মিষ্টি—সে যেন আর শেষ নেই কিছুর। কত খাবো বলুন? খেতে খেতে পেট ফেটে যেত এক-এক সময়। সেই সময়েই সারা জন্মের মত পেট ভরে মনের সাধ মিটিয়ে খেয়ে নিয়েছি স্যার! এখন আর খেতে পাই না সে-রকম। কিন্তু রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক-একদিন তখনকার খাওয়ার কথাগুলো ভাবি।

কিন্তু সব কিছু একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল স্যার। এমন করে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। তাই তো বাবুর জন্যে দুঃখু হয়। যে-মানুষ জীবনে অত ভোগ করেছে, অত টাকা উপায় করেছে, সেই মানুষের যদি দশা দেখেন আজ তো আপনিও চম্‌কে যাবেন স্যার। যে মানুষ একলা একশো মাইল দেড়শো মাইল মোটর চালিয়েছে, সেই মানুষ কিনা এখন নিজের বিছানা ছেড়েই ওঠে না। দেখলে দুঃখু হবে না?

জিজ্ঞেস করলাম—তা কেন ও-রকম হলো?

হরিপদ বললে—ওই তো বললাম—ট্র্যাজেডি। গল্পতে তো আপনারা ট্র্যাজেডি চান, হেমদাবাবুর মতন ট্র্যাজেডি আপনি আর কখনো শোনেন নি—

বললাম—কী রকম! খুলে বলো তুমি—

হরিপদ বললে—এ প্লটের জন্যে আপনাকে কিন্তু বেশি টাকা দিতে হবে স্যার, এই আপনাকে আগে থেকে বলে রাখছি। এ যা-তা প্লট নয়। এটা যদি তেমন গুছিয়ে লিখতে পারেন তো দেখবেন আপনার কী রকম নাম হয়। আপনি স্যার প্রাইজ পেয়ে যাবেন—

—প্রাইজ? কী প্রাইজ?

হরিপদ বললে—ওই যে সব আপনাদের আজকাল সাপ-ব্যাঙ কী সব প্রাইজ দেয়, শুনেছি নাকি লাখ-লাখ টাকাও দেয়, আপনার কপালেও এই গল্পের জন্যে জুটে যেতে পারে স্যার, বলা যায় না—

বললাম—বাজে কথা থাক, তারপর কী হলো তাই বলো—

হরিপদ বললে—দাঁড়ান আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নেই—

বলে আর একটা বিড়ি ধরালে। তারপর বললে—দেখুন, অনেকদিন আগের ব্যাপার তো, তাই যাতে মনে পড়ে সেই জন্যে মনের গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বললে—জীবনে কত রকম লোকই দেখলুম, কত জায়গাতেই যে ঘুরলুম। কিন্তু জয়পুরের মত অমন জায়গা আর জীবনে দেখলুম না। সকাল হবার আগেই বাবু আর আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম। গাড়ি চলছে তো চলছেই। পঞ্চাশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী নদী। সেই নদীর ওপর বাবুর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। ব্রিজ পুরো তৈরি হবার আগেই হয়ত হঠাৎ নদীতে বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। তখন আবার গোড়া থেকে শুরু করো। তখন আবার নতুন করে লোহা-সিমেণ্ট এনে নতুন ব্রিজ বানাও। এই সব ব্যাপারে বাবুর খুব লাভ হতো।

নদীর ধারেই ছিল টিনের একটা গুদাম ঘর। সেখানে মিস্ত্রীদের যন্তর-পাতি থাকতো। বেশ উঁচু পাহাড়ের ওপর ঘরটা। তার মধ্যে থাকতো ওভারশিয়ার সুন্দরলাল কাপাডিয়া।

সুন্দরলালকে আমি দেখতুম আর অবাক হয়ে যেতুম। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ। খুব মদ খেতো। আমি সুন্দরবাবুকে জিজ্ঞেস করতুম—সুন্দরবাবু আপনার ভয় করে না? যদি বাঘ-টাঘ আসে এখানে?

সুন্দরবাবু বলতো—বাঘ তো রোজ আসে—

আমি চম্‌কে উঠতুম সুন্দরবাবুর কথা শুনে। রোজ বাঘ আসে?

—হ্যাঁ, রোজ বাঘ আসে।

আশ্চর্য। বাঘ নাকি সুন্দরবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে ঘুরে বেড়াতো। মাঝে-মাঝে দরজায় ধাক্কাও দিত। কিন্তু সুন্দরবাবুর কোনও ভয় করতো না। তিনি তখন খাটিয়ার ওপর বসে বোতল থেকে মদ ঢালতেন আর তাইতে চুমুক দিতেন। আর সঙ্গে থাকতো মাংস-ভাজা। মাংস-ভাজা দিয়ে মদ খেতে নাকি খুব ভালো লাগে, কে জানে! তখন তো আমি ছোট, ও-সব রস বুঝতুম না।

টিনের গুদাম ঘরটার মধ্যে ভাগ-ভাগ করা অনেকগুলো কামরা ছিল। একটা ঘরে কয়েকজন লোকে গাদাগাদি করে শুতো। সন্ধ্যের আগে সেই যে সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তো, আর বাইরে বেরোত না কেউ। বাঘের ভয়ে সবাই ঘরের ভেতরে সিক্‌ড়ি জ্বেলে চাপাটি-ডাল তরকারী বানাতো।

সন্ধ্যের আগেই আমবা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম জগদলপুরের দিকে। সেখানেই পি-ডবলিউ-ডির অফিস। সেই অফিসের কর্তার সঙ্গে বাবুর দেখা করা দরকার। জগদলপুবে আমাদের কাজের জন্যে প্রায়ই যেতে হতো। রাতটা কাটাতুম হোটেলে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়তুম। তারপর ভোরে উঠে আমি আবার বাবুর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতুম। তারপর যেতুম পি-ডবলিউ-ডি'র অফিসে।

সেখানে গিয়ে বিলের টাকা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তুম সেই ব্রিজের কাছে। হপ্তা দিতে হবে মজুরদের। এক সপ্তাহ্ কাজ করার পর তখন কুলি-কামিনরা মজুবির জন্যে ওত পেতে বসে থাকতো। সার বেঁধে সব বসে থাকতো তারা। তারপর ওভারসিয়ারের লোক এক-এক করে সকলের নাম ডাকতো আর সবাই ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টিপ ছাপ দিয়ে মাইনে নিয়ে যেত! এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেত। বর্ষা আসতো, গ্রীষ্ম আসতো, শীত আসতো, আর বাবু কাজের মধ্যেই ডুবে যেতেন।

তা কাজ তো আর একটা নয়। একটা কাজ যদি শেষ হয় তো আর একটা কাজ শুরু হয়ে যেত অন্যদিকে। এ-ব্রিজটা শেষ হলে আর একটা ব্রিজ। ব্রিজ যেমন আছে, তেমনি আছে আবার রাস্তা। যে-সব জায়গায় অজগর জঙ্গল ছিল, যেখানে মানুষ কোনও দিন ঢুকতো না, সেখানে রাস্তা হয়ে যেত। আর মানুষের যাতায়াতের জন্যে নতুন পথ তৈরি হতো এদেশ থেকে ওদেশে। এদিকে উড়িষ্যা, ওদিকে অন্ধ্র আর পশ্চিমদিকে মধ্যপ্রদেশ।

তখন ইংরেজরা চলে গেছে, বড় বড় কাজের অর্ডার আসছে। বাবু আর একলা পেরে উঠতেন না তখন। একদিকে বাবুর পকেটে অঢেল টাকা আসছে, আর ওদিকে খাটতে খাটতে বাবু খাওয়া-নাওয়ার সময় পাচ্ছে না। শেষকালে হয়ত হঠাৎ একদিন বাবু বলতো—ওরে হরিপদ, এবার চল, বাড়ি চল—অনেকদিন হলো বাড়ির মুখ দেখিনি—

তখন আবার বাড়ির কথা মনে পড়তো আমাদের। আবার আমাদের গাড়ি ছুটতো জয়পুরের দিকে। মা তখন একলা। আমরা বাড়িতে পৌঁছুলেই মা সামনে এসে হাজির হতো। বলতো—এতদিনে সময় হলো তোমার?

বাবু গায়ের জামা ছাড়তে ছাড়তে বলতেন—কী যে করি, যত ভাবি চলে আসবো, তত দেরি হয়ে যায়! এই হরিপদকেই জিজ্ঞেস করো না, যেদিকে নিজে না দেখবো সেই দিকেই গণ্ডগোল—

মা হাসতে হাসতে বলতো—আর হরিপদকে সাক্ষী মানতে হবে না। আমি তোমার মুখের কথাই বিশ্বাস করেছি—

বাবু বলতো—এই দেখ, তুমি দেখছি আমার কথা বিশ্বাসই করছো না মোটে—

মা বলতো—কে বললে বিশ্বাস করছি না? আমি তো বলছি তুমি কাজ করতেই ব্যস্ত ছিলে।

আমি কি বলছি তুমি কাজ না করে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলে?

বাবু বলতেন—না, না, তুমি হরিপদকে জিজ্ঞেস করো না একবার, করো জিজ্ঞেস—

তা আমাকে আর জিজ্ঞেস করতেন না মা।

আমি মা'র কাছে গিয়ে বলতুম—না মা আমরা কোথাও একদিনের জন্যেও বসে কাটাইনি। এখান থেকে সখেরগঞ্জ গিয়েছি, সখেরগঞ্জ থেকে কোরাপুট, আবার কোরাপুট থেকে সখেরগঞ্জ, তারপর আবার সখেরগঞ্জ জগদলপুর। এই ক'দিন কেবল এই-ই করেছি। শেষকালে জগদলপুরের খাজাঞ্চিখানা থেকে টাকা নিয়ে কুলিদের হপ্তা মিটিয়ে দিয়েছি। কুড়ি হাজার টাকা হপ্তা দিতেই সমস্ত দিন লেগে গেছে। নইলে কুলি-কামিন্‌রা হাট করবে কি করে?

মা'কে এত কথা বলবার দরকার থাকতো না আমার। তবু বলতাম। ভাবতাম সত্যিই তো আমরা বেশ আরাম করে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর মা বাড়িতে দিনেব পর দিন মাসের পর মাস একলা কাটাচ্ছে। বাবু বলতেন—এই সখেরগঞ্জের কাজটা শেষ হয়ে গেলেই আমি একটু হাল্‌কা হবো। বুঝতেই তো পারছো ছিয়াশি লাখ টাকার কন্‌ট্রাক্ট, সোজা কথা তো নয়! তখন আমি আর নতুন কাজ হাতে নেব না—

সত্যিই, আমি দেখেছি বাবু তখন আর নতন কাজ হাতে নিতে চাইতেন না। বাব ইন্‌জিনীয়ারিং পাশ করার পর সরকারি চাকরি করেছিলেন অনেকদিন। চাকরি করতে করতে ব্যবসার দিকে মন ঝুঁকেছিল। মনে হয়েছিল চাকরি করে সময়ও যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি আবার টাকার আমদানি হচ্ছে কম। অথচ খাটুনির দিকটা প্রায় সমানই। তার ওপর আছে ওপরওয়ালার হুম্‌কি। সকলের কি আর কারো তাঁবে থাকতে মন চায়? এক-একজন লোক থাকে যাদের হুকুম মানতে কষ্ট হয়, হুকুম করতে পারলেই খুশী হয়। আমার বাবু সেই জাতের লোক স্যার।

কিন্তু এখন বাবু বলেন—সেদিন চাকরি ছাড়াই আমার ভুল হয়েছিল রে হরিপদ, নইলে আজ আমার এত দুর্দশা হতো না—

গল্প বলতে বলতে হরিপদ থামলো। তারপর বললে—এক কাপ চায়ের অর্ডার দিন স্যার, গল্পটা এবার জমিয়ে দেব—

আমি বললাম—গল্প তোমাকে জমাতে হবে না হরিপদ, তুমি শুধু পয়েন্ট বলে যাও, জমাবার দরকার হলে আমি জমিয়ে দেব—

হরিপদ বললে—কিন্তু আমি মাল-মশলা সাপ্লাই না করলে আপনি জমাবেন কী দিয়ে? গরম-মশলা না দিলে রান্নায় স্বাদ হয়? তা মাল-মশলা বার করতে গেলে চা লাগবে না?

হরিপদকে চটিয়ে লাভ নেই। সুতরাং তখনই চায়ের অর্ডার দিলুম।

চা আসতেই হরিপদ চুমুক দিয়ে বিড়ি ধরালো।

বললে—আসলে কী জানেন স্যার, আমি ভেবে দেখছি, সুখ সবার কপালে হয় না। টাকা থাকলেও সয় না, টাকা না-থাকলেও সয় না, আমার বাবুর ব্যাপারটা দেখুন না, টাকা তো বাবুর কম ছিল না! সে যে কত টাকা তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এক-একদিন চল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পেতে আমরা দু'জন শুয়েছি। চারদিকে বন-জঙ্গল পাহাড় আব বাঘ ভাল্লুক আমরা তার ভেতরে একটা টিনের ঘরে রাত

কাটিয়েছি। এক-একদিন নদীতে বৃষ্টি হয়ে আমাদের ঘরের মেঝে জলে ভেসে গেছে। তবু নেশা। কীসের নেশা যে বাবুর তা বলতে পারবো না, হয়তো কাজের নেশা, হয়তো টাকার নেশা। আমরা মশাই একটা-না-একটা নেশায় মশগুল হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। অথচ সেই নেশাখোর হেমদাবাবুর জীবনটা দেখে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে!

বললাম—তারপর?

হরিপদ বলতে লাগলো—তা এমনি করেই তো আমাদের দিন কাটছিল। ঠিক এই সময়েই একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটলো। একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে আমার মা'কে ধরে নিয়ে গেল। আমরা তখন সখেরগঞ্জে। সখেরগঞ্জে কুলি-কামিন খাটাচ্ছি। সামনে বর্ষা আসছে, বর্ষার আগেই কাজ খতম্ করতে হবে।

আধখানা ব্রিজেব ওপর দাঁড়িয়ে আমাব বাবু ব্রিজের তদাবক করছেন। এমন সময় সুন্দরলালজী দৌড়ে এল। এসে বলল—হুজুব, জয়পুর থেকে আপনার টেলিগ্রাম এসেছে—

—কী টেলিগ্রাম? কে টেলিগ্রাম করেছে?

সুন্দরলালজী বললে—তা তো দেখিনি হুজুব—

ততক্ষণে আমার বাবু টেলিগ্রামের ভাঁজটা খুলে একমনে পড়ছেন। আমি পাশে দাঁড়িযে তাঁর মুখের চেহারাটা দেখছি। দেখলুম মুখটা কেমন লাল হযে উঠলো হঠাৎ। তারপর বাবু আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

তাড়াতাড়ি গুদাম-ঘরের দিকে চলতে চলতে আমায় বললেন—হবিপদ আয়—

আমি বুঝতে পারলুম না কী আছে টেলিগ্রামে। তাঁর পেছন-পেছন চলতে লাগলুম; জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারও তৈবি। বাবু সেখানে উঠে বসলো। আমিও উঠে বসলুম।

ড্রাইভারকে বাবু বললেন—চল্, বাড়িব দিকে চল্—

বাবু যে হঠাৎ কী জন্যে বাড়িতে যেতে মনস্থ কবেছেন তা বুঝতে পারলুম না। গাড়ি চলতে লাগলো হু-হু কবে। আমি চুপ করে পাশে বসে আছি।

বাবু আবার বলে উঠলেন—একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গিব চল্ বে— বড জরুবী কাজ আছে—

আমি বুঝতে পাবলুম একটা কিছু বিপদ-আপদ হযেছে! নইলে বাবুব মুখের চেহারা তো এমন হয় না কখনও। আমি জিজ্ঞেস করলুম—কীসের টেলিগ্রাম বাবু?

বাবু আমার কথার উত্তব দিলেন না। যেন আমাব কথা শুনতেই পেলেন না।

আমি আর কথা বললুম না। কিন্তু খানিকপরেই যেন বাবুব খেযাল হলো। জিজ্ঞেস কবলেন, তুই কিছু জিজ্ঞেস কবছিলি আমাকে? বললুম—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলুম কীসের টেলিগ্রাম?

বাবু বললেন—তোর মাকে পুলিশে এ্যারেস্ট করেছে—

আমি চমকে উঠেছি। মাকে পুলিশে ধরেছে! আমার কান্না পেতে লাগলো। মা'কে কেন পুলিশ ধরবে! মা কী করেছে!

বাবুর মুখেব দিকে চাইলুম। সে মুখে কোনও কিছু খুঁজে পেলুম না।

জিজ্ঞেস করলুম—মা'কে কেন পুলিশে ধরেছে বাবু? মা কী করেছিল?

বাবু ধমকে উঠলেন। বললেন—কেন পুলিশে ধরেছে তা আমি এখান থেকে কী কবে বুঝবো?

আমি আর কিছু কথা বললুম না। বাবুর মত আমি শুধু চুপ করে বসে বইলুম। আর গাড়িটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলতে লাগলো। কিন্তু সময় যেন আর কাটতে চায় না, রাস্তা যেন আব ফুরোয় না। সেই সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছি, তারপর রাত দশটা বাজলো। এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো। কিন্তু তখনও রাস্তা যেন আর ফুরোতে চায় না, সময়ও যেন আর কাটতে চায় না।

শেষ রাত্রের দিকে যখন কোরাপুটের দিকের আকাশটা একটু স্পষ্ট হতে শুরু করেছে, তখন

আমরা জয়পুরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। যখন শহরে ঢুকলুম তখন বেশ ফরসা হয়েছে চারদিকে। শহরের রাস্তায় তখন দু-একজন লোকজন চলছে।

আমাদের গাড়িটা বাড়ির দিকে গেল না। বাবু ড্রাইভারকে থানার দিকে চলতে হুকুম দিলেন।

থানার সামনে যেতেই বাবু এক লাফে নেমে পড়লেন। থানার দারোগা তখনও থানায় আসেনি। একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। বাবু তাকেই বলল দারোগাবাবুকে ডেকে দিতে।

পুলিশটা বোধহয় আমার বাবুকে চিনতো। বাবুকে নিয়ে থানার ভেতরে গেল।

থানার ভেতরে তখন ছোট দারোগা অফিসের ভেতরেই একটা টেবিলের ওপর ঘুমিয়েছিল।

বাবুকে দেখে ছোট দারোগা উঠে বসলো। বললে, আসুন স্যার—

বাবু বললেন—আমার স্ত্রীকে নাকি আপনারা এ্যারেস্ট করেছেন?

ছোট দারোগাবাবু বললে—হ্যাঁ—

বাবু বললেন—কেন! কী হয়েছে? কী করেছিল সে?

ছোট দারোগাবাবু সব জিনিসটা বুঝিয়ে বললে।

—চক্ বাজারের কমল চৌধুরী খুন হয়েছে! ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে মনে হলো বাবুর কাছে। বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, খবরটা শুনে পাশের চেয়ারটাতেই ধপ্ করে বসে পড়লেন। খবরটা আমার কাছেও একটা ভয়ের খবর! আমি পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আমারও খবরটা শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল।

কমল চৌধুরী সাহেবকে আমিও চিনতুম। জয়পুরের কমল চৌধুরী সাহেব ছিল জাতে রাজপুত। কী করে কোন্ সুবাদে যে রাজপুতানা থেকে তাদের পূর্বপুরুষ সেই জয়পুরে এসে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান করেছিল কে জানে!

আমি যখন থেকে দেখছি তখন দোকানের মালিক ছিল কমল চৌধুরী। চক্ বাজারের রাস্তার মোড়ের ওপরেই দোকান। কলকাতা থেকে গানের রেকর্ড এলেই চৌধুরী সাহেব সে-গুলো দোকানের ভেতরে বাজাতো। আর সেই গান শুনতে রাস্তার লোক ভিড় করতো দোকানের সামনে। হিন্দী-বাংলা গান শুনে লোকে আর সেখান থেকে নড়তে পারতো না।

বাবু যখন সখেরগঞ্জ থেকে ফিরে আসতেন তখন মাকে নিয়ে বাজারে কেনা-কাটা করতে বেরোতেন।

আমিও বাবু আর মার সামনে থাকতুম। শহরটা তো ছোট, তাই শহরের বাজারটাও ছিল ছোট। কিন্তু মোটামুটি সব রকম জিনিসই পাওয়া যেত সেখানে। কখনও কিনতো ক্যামেরা, কখনও ক্যামেরার ফিল্ম। কখনও বাড়ির জন্যে ফার্নিচার। আবার কখনও ঘরের আসবাব-পত্তোর। ঘরের পর্দা একটু পুরোন হয়ে গেলেই আবার নতুন পর্দা কেনা হতো। আর শাড়ী ব্লাউজ? শাড়ী-ব্লাউজ যে মার কত ছিল তা মা বোধহয় নিজেই জানতো না। শাড়ী-ব্লাউজ-জুতো ছাড়া ছিল গয়না। সোনার গয়না। চক্ বাজারে স্যাকরার দোকান ছিল দু'তিনটে। সেখানে গিয়ে বাবু একটা-বা দুটো গয়না কিনবেনই।

মা বলতো—ও-সব কিনছো কেন? ও কে পরবে?

বাবু বলতেন—কেন তুমি? তুমি ছাড়া আর কে পরবে?

মা বলতো—না, আমি আর গয়না নেব না।

বাবু বলতেন—নাও না, গয়না নিলে তোমার ক্ষতিটা কী?

মা বলতো—গয়না আমি পরবো কোথায়? গয়না পরবার জায়গা তো আর নেই আমার—

বাবু বলতেন—কেন, রোজ একই গয়না পরতে হবে তার কী মানে আছে? আজ একটা পরবে, কাল একটা পরবে! আর হয়ত এবেলা একটা পরবে, আবার ওবেলা আর একটা!

মা হাসতো। বলতো—গয়না পরে সেজে-গুজে বাড়িতে বসে থাকবো?

বাবু বলতো—বাড়িতে বসে থাকবে কেন? তোমার গাড়ি রয়েছে, বাজারে আসবে, যেটা দরকার হবে কিনবে—

মা বলতো—কী কিনবো তুমি বলে দাও—

বাবু বলতেন—কেন যা তোমার খুশী! তোমার কাছে তো চেক বই আছে। টাকা তো তোমার নামে ব্যাঙ্কে কিছু কম রখিনি—

মা বলতো—তা এত টাকা আমি যা-তা কিনে নষ্ট করবো? টাকা তোমার উপায় করতে বুঝি কষ্ট হয় না?

বাবু বলতেন—ও ছেড়ে দাও, টাকা উপায় করছি তো তোমার জন্যেই।

—আমার জন্যে? আমি অত টাকা কী করবো?

বাবু বলতেন—টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়ে রেখে দেবে। আমি যদি মারা যাই তো সেই টাকা খরচ করে তুমি আরামে দিন কাটাবে, কারোর কাছে হাত পাততে হবে না—

এ-সব কথা যখন হতো তখন আমিও পাশে থাকতুম। দু'জনের কথা-বার্তা শুনতে আমাব খুব ভালো লাগতো। সত্যি এত মিল ছিল দু'জনের মধ্যে যে কী বলবো। সত্যি, আমি যেন দু'জনের মধ্যে ঠিক ছেলের মতো ছিলুম স্যার। সে-সব কথা মনে পড়লে এখন খুব মনে কষ্ট হয় স্যার। জীবনে তো নিজের বাবা-মা'কে দেখিনি, ওঁরাই ছিল আমার বাবা-মা। ওঁদের আমি বাবা-মা'র মতই দেখতুম কিনা।

কিন্তু সেই মা'কেই কিনা পুলিশে ধরলে! ভাবুন, কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

তা বাবু জিজ্ঞেস করলে—কমল চৌধুরী যদি খুন হয়ে থাকে তো আমার স্ত্রীকে এ্যারেস্ট করেছেন কেন?

বড় দারোগাবাবু বললে—আপনার মিসেস, মিস্টার চৌধুরীকে মার্ডার করেছেন—

বাবু চমকে উঠলেন। বললেন—আপনি ভুল করেছেন নিশ্চয়ই ইনস্‌পেকটার। আমার মিসেসকে আপনি চেনেন না। তিনি কখনও কাউকে মার্ডার করতে পাবেন না—

দারোগাবাবু বললে—দেখুন, আমাদের হাতে প্রমাণ না থাকলে কি একজন রেসপেক্টেবল্ মহিলাকে এ্যারেস্ট করি? আমবা সব দেখে শুনেই তবে তাঁকে ধরেছি—

বাবু বললেন—আমি তাহলে জামিনের ব্যবস্থা করি—

বড় দারোগাবাবু বললে—জামিন তো এ-কেসে দেওয়া হবে না—

—কেন?

বড় দারোগাবাবু বললে—আইন নেই—

আইন তো বাবুর জানা নেই। বাবু আব কী করবেন! বাবুর তখন মাথা ঘুরছে। একে সারারাত ঘুমোয়নি। তার ওপর তার আগের দিনও খাটুনি গেছে বিস্তর।

কী আর করা যাবে!

বাবু খানিকক্ষণ কী ভাবলেন তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—চল্—

আবার আমি গাড়িতে উঠলুম বাবুও আমার আগে উঠে বসলেন। চললুম উকিলের বাড়ি। ভরদ্বাজ সাহেব ছিল শহরের সবচেয়ে বড় উকিল। তার বাড়িতে দু'জনে গিয়ে হাজিব। ভবদ্বাজ সাহেবের ওখানে তখন খুব নাম-ডাক। নাম-ডাক যার যত হবে তার তেমনি আবার মক্কেল। মক্কেলের ভিড়ে ভরদ্বাজ সাহেবের সময় হয় না।

কিন্তু বাবুর কথা আলাদা। বাবুর তখন জীবন-মরণ সমস্যা। সেই অত সকালবেলাই ডেকে পাঠানো হলো।

ভরদ্বাজ সাহেব এসে বৈঠকখানা ঘরে বসলেন। বাবুর মুখ থেকে সব ঘটনা শুনলেন।

বললেন—দেখি আমি কী করতে পারি—

বলে সেদিনকার মতো আমরা বাড়ি চলে এলুম। বাড়ি তখন খাঁ খাঁ করছে। চারদিক ফাঁকা।

আমি বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম। মা যে-ঘরে থাকতো সে-ঘরে গেলুম। মা'র জিনিস-পত্র তখন চারদিকে ছড়ানো। শাড়িটা তখনও ছাড়া রয়েছে। মা যে-আয়নায় মুখ দেখতো সেই আয়নাটাতে তখনও যেন মা'র মুখ খুঁজতে লাগলুম। কোথায় মা! অন্যদিন আমরা ফিরে এলেই মা হাসিমুখে এগিয়ে আসতো। কত কথা শুনতো। কিন্তু সেদিন আর কেউ কোথাও নেই।

মা'র কাজের জন্যে বাবু বাড়িতে অনেক ঝি-চাকর রেখেছিলেন।

সারদা এগিয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে। কথা বলবে কী, তার কান্নাই আর থামে না।

বললে—পুলিশ এসে মা'কে ধরে নিয়ে গেছে বাবু, আমি কী করবো? আমি বুড়ো মানুষ একলা কিছু করতে পারলুম না। আমার কথা কেউ শুনলে না। আমি বললুম যে বাবু আসুক তারপর ধরে নিয়ে যেও মা'কে, তা শুনলে না—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা, মা কী করেছিল যে তাকে ধরলে?

সারদা বললে—কী করেছে তা কী করে জানবো?

সারদা কথা বলে আর কাঁদে। আমাদের নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠলো তখন। খেতেও তখন ইচ্ছে করছিলো না কারো। মা'ই যখন নেই তখন খাবো কি করে?

মা জেলখানার মধ্যে খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না কে জানে।

যা হোক, বাবু আমাকে বললেন—এবার আমি একবার বেরোচ্ছি—

আমি বললুম—আমিও যাবো বাবু—

বাবু বেরোলেন। আমিও সঙ্গে চললুম।

একেবারে সোজা থানায়। হাজত-খানায় তখন মা'কে রাখা হয়েছে।

বড় দারোগাবাবু তখন থানায় ডিউটিতে এসেছে। বাবু জিজ্ঞেস করলে—আমি একবার আমার মিসেসের সঙ্গে দেখা করতে পারি? অন্ততঃ আধঘণ্টার জন্যে? আমি এক্ষুনি মিস্টার ভরদ্বাজের কাছ থেকে আসছি, এই মামলাটা আমি তাঁকেই দিয়েছি প্লিড্ করতে—

বড় দারোগাবাবু রাজি হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কনস্টেবলকে হুকুম দিয়ে গেল আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যে। সে পাহারা দেবে।

দু'একটা কামরা পেরিয়ে যখন আমরা ভেতরে ঢুকলুম তখন দেখলুম একটা ঘরের কোণে একটা খালি তক্তপোষ রয়েছে, তার ওপরে মা চুপ করে বসে।

বাবু সেদিকে এগিয়ে যেতেই মা বললে—তুমি এসেছো? কে খবর দিলে তোমাকে?

বাবু বললেন—সারদা কাকে দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—

মা বললে—ভালোই হয়েছে—আমি খুব ভাবছিলুম—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মা বললে—কি রে হরিপদ, কাঁদছিস কেন?

আমি মা'র কথা শুনে আরো কেঁদে ফেললুম। দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলুম।

মা আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—দেখ দিকিনি হরিপদর কাণ্ড, ও মনে করেছে আমি সত্যি-সত্যিই বুঝি খুন করেছি—ছিঃ, কাঁদে না, আমার কিচ্ছু হবে না দেখবি, আমাকে দিন কতক বাদেই ছেড়ে দেবে—

সে-কথায় কান না দিয়ে বাবু জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলো তো কী হয়েছিল?

মা বললে—সে কী, তুমি ভয় পেয়ে গেছ নাকি?

বাবু বললেন—না, আমাকে তো উকিলকে সব বলতে হবে—

মা বললেন—তোমাকে বলতে হবে না, এ খুব সহজ কেস, কোন উকিল দিয়েছ?

বাবু বললেন—মিস্টার ভরদ্বাজকে, উনিই তো এখানকার সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল উকিল। একশো টাকা ফিস্! তোমার খবরটা নিয়েই আমি একটু আগেই মিস্টার ভরদ্বাজের বাড়ি গিয়েছিলুম—

মা বললে—সত্যিই কি তোমার সন্দেহ হয় নাকি আমাকে? আমি কাউকে খুন করতে পারি?

বাবু বললেন—না, সে জন্যে নয়, আমি মিস্টার ভরদ্বাজের কাছে শুনলুম আমার বন্দুকটা নাকি কমল চৌধুরীর ডেড্-বডির পাশেই পাওয়া গিয়েছিল। আমার সেই বন্দুকটাও তো এখন পুলিশের হেফাজতে—পুলিশ সেটাও তো আটক করেছে।

—তাহলে তুমিও বিশ্বাস করলে, আমি কমল চৌধুরীকে খুন করতে পারি?

মা বললে—তুমিই তো বলেছিলে বন্দুকটা দোকানে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে রাখতে। ওটাতে কী দোষ ছিল তা তো তুমিই জানো—

বাবু বললেন—সে যাক, তারপর?

মা বললে, মিস্টার চৌধুরী আমার বাড়িতে সকালে এসেছিলেন, কয়েকটা খুব ভালো গানেব রেকর্ড নাকি তাঁর দোকানে এসেছে, তাই বলতে। আমি বললুম আমি আপনার দোকানে গিয়েই শুনবো। আমার চক্-বাজারে যাবার কথা আছে ওঁর বন্দুকটা সারাতে দেবার জন্যে—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

বাবুর মনে পড়লো বন্দুকটা তার ঠিক মত কাজ করছিল না ক'দিন ধরে। বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হয়, তাই বাবুর সঙ্গে বন্দুকটা থাকে সব সময়ে। কিন্তু সময় হচ্ছিল না সারাতে দেবার। মা'কে বলে রেখেছিলেন—তুমি যখন চক্‌বাজারে যাবে ওটা সারাতে দিও তো—

সে কয়েকদিন আগেকার কথা। বাবু নিজেও সে-সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হাজারটা কাজ যার মাথায় তার কি অত কথা মনে থাকে। মা বলতে তবে আমাব মনে পড়লো—

বললে—তারপর?

মা বললে—আমার কথা শুনে মিস্টার চৌধুরী বললেন, বন্দুক কী হয়েছে? তা আমি বললুম, তা জানি না। তখন মিস্টার চৌধুরী বললেন—আমাকে দেবেন আমিই সারিয়ে দেব, ও-সব ছোট-খাটো ব্যাপার, ওর জন্যে দোকানে কেন দেবেন, মিছিমিছি ওরা একগাদা টাকা নিয়ে নেবে—

বাবু উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। বললেন—তারপর?

মা বললে—তারপর মিস্টার চৌধুরীর কথা শুনে আমি হাসতে হাসতে বললুম, আপনি তো গানের রেকর্ড বিক্রি করেন, আপনি আবার কলকব্জার কাজ জানেন নাকি?

মিস্টার চৌধুরী বললে—আমার তো গ্রামোফোন সারানোও কাজ। কল-কব্জা নাড়া-চাড়া করতেই তো হয় আমাকে, আর তা ছাড়া আগে আমার নিজেরও বন্দুক ছিল, দরকার হলে আমার বন্দুকের ছোট-খাটো দোষ-টোষ আমি নিজেই সারাতুম—

বলে মিস্টার চৌধুরী আমার কাছে বন্দুকটা দেখতে চাইলেন। আমি সেটা এনে তাঁকে দেখালুম। উনি নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন—এ কিছু না, সামান্য ব্যাপার, এটা আমি নিজেই সেরে নিতে পারবো— মিছিমিছি কেন মিস্ত্রীদের কাছে দেবেন, তারা আপনাকে আনাড়ি পেয়ে অনেকগুলো টাকা খসিয়ে দেবে—

বলে তিনি বন্দুকটা নিয়ে চলে গেলেন। বললেন—আপনি তো বিকেলবেলা গান শুনতেই আসছেন ততক্ষণে এটা সারানো হয়ে যাবে, আমি এটা আপনাকে ফেরৎ দিয়ে দেব—

বাবু মা'র কথাগুলো শুনতে শুনতে আবার বললেন—তারপর?

তারপর যেমন কথা ছিল, আমি বিকেলবেলা মিস্টার চৌধুরীর দোকানে গিয়েছি, দোকানের সামনের দিকে কেউ ছিল না। আমি বাইরের রাস্তায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকলুম। ভাবলুম মিস্টার চৌধুরী হয়তো ভেতরে আছেন। পেছনেই তো ওঁর লাগোয়া বাড়ি। আমি বাইরে থেকে ডাকলুম—মিস্টার চৌধুরী—মিস্টার চৌধুরী—

মিস্টার চৌধুরী ঠিক পেছনের ঘরেই ছিলেন। তিনি বললেন—আসুন, মিসেস বোস—

মা বলতে লাগল—আমি তাঁর কথায় ভেতরে গেলুম। সেটা তাঁর গ্রামোফোনের যন্ত্র-পাতি সারানোর কারখানা—

আমি যেতেই মিস্টার চৌধুরী বললে—আসুন, বসুন, আপনার বন্দুকটা সারিয়ে দিয়েছি। আর একটু বাকি আছে। এই এখ্‌খুনি হয়ে যাচ্ছে—

বলে মিস্টার চৌধুরী আবার সারাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনার দোকানের সামনেটা একেবারে ফাঁকা, সেই ছোকরাটা কোথায় গেল আপনার?

মিস্টার চৌধুরী বললেন—তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে সে—

বললাম—আর আপনার ভাগ্নে ছিল না একজন?

মিস্টার চৌধুরী বললেন—সে বাড়িতেই ছিল এতক্ষণ, কোথাও বেড়াতে টেড়াতে গেছে বোধহয়। সেই তো আমার সংসারের গিন্নী, সে না হলে তো আমি উপোস করতুম। রান্না-টান্না সব সে-ই করে—

ততক্ষণে বন্দুকটা সারা হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার চৌধুরী সেটা নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করতে যেতেই হঠাৎ একটা দুম্ করে শব্দ হলো। আর তারপর ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেল ঘরটা। আমার মাথায় তখন বজ্রাঘাত। আমি কী করবো বুঝতে পারলুম না। সেই অবস্থাতে কিছু ঠিক করতে না পেরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম! ততক্ষণে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসতে শুরু করেছে। আমি আর কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা গাড়িতে এসে বসলুম। তারপর মঙ্গলকে বললুম—মঙ্গল শিগগির চালাও, বাড়ি চলো—

ততক্ষণে দেখা করার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাবু উঠলো।

মা বললে—আবার কখন আসবে?

বাবু বললেন—বিকেলে একবার উকিলবাবুর কাছে যাবো, দেখি তিনি কী বলেন। তোমার কিছু দরকার আছে? আর একটা শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ এরা দিতে দেবে কিনা পুলিশকে জিজ্ঞেস করে দেখি—

মা বললে—আমাকে জামিন দেবে না? জামিনে আমি তো খালাস পেতে পারি—তারপর মামলা যখন কোর্টে উঠবে তখন না-হয় আসবো—

বাবু বললেন—আমি তো মামলা-মকর্দমার কিছুই জানি না, উকিলবাবুকে জিজ্ঞেস করবোখন—

বলে বাবু চলে আসছিলেন। মা বললে—আমার ফুলগাছগুলোতে একটু জল দিতে বোল মালিকে বুঝলে? গোলাপের একটা নতুন চারা পুঁতেছি, সেটা যেন মরে না যায়।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—আর দ্যাখ্ হরিপদ, সারদাকে বলে দিস পাখিটাকে যেন খেতে-টেতে দেয়। আমি তো নেই, হয়ত কোনও দিকে কেউ খেয়াল রাখবে না—

বাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে এরা চা দিয়েছে? যদি না দিয়ে থাকে তো আমি এদের হাতে টাকা দিয়ে যেতে পারি, তোমার যখন যা দরকার হয় দেবেখন—

মা বললে—যদি ওরা দেয় তো দাও—

বাবু বাইরে বেরিয়ে বড় দারোগাবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। বড় দারোগাবাবুও তাতে আপত্তি করলে না।

এরপর থেকে সে যে আমাদের কী দিনই কাটতে লাগলো তা আর কী বলবো! বাড়ি যেন তখন শ্মশান হয়ে গেছে। মা না থাকলে কে আর ঘর-দোর দেখবে। বাবুর কন্ট্র্যাক্টারের কাজ মাথায় উঠলো। বাবুকে দেখতুম আর আমার কষ্ট হতো স্যার।

রাত্তিরবেলা একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, বাইরে বেরিয়েছি। দেখি বাবু বিরাট বাড়িটার বারান্দায় একলা-একলা পায়চারি করছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন—কী রে, তুই?

বললাম—আমার ঘুম ভেঙে গেল বাবু—

বাবু বললে—আমারও ঘুম ভেঙে গেল।

আমি বললুম—হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ে গেল আমার—

বাবু বললেন—মা'র কথা আর ভাবিসনি তুই—সংসারে কেউ কারো নয়। সবাই একলা, সবাই যে-যার ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে।

আমি একটু থেমে বললুম—আচ্ছা বাবু, মাকে পুলিশ ছাড়ছে না কেন? মা'তো কোন দোষ করেনি?

বাবু বললেন—পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, তুই শুনিস নি?

আমি বললুম—আজকে বাজার করতে গিয়ে কী শুনলুম, জানেন বাবু, লোকে বলাবলি করছে মা'কে নিয়ে। বলছে—মা'র নাকি দোষ। আমি শুনতে পেয়ে খুব গালাগালি দিয়েছি সকলকে। সবাই আমাকে তেড়ে মারতে এসেছিল, শেষকালে একজন থামায় তবে থামে—

বাবু বললেন—কী বলছিল লোকেরা?

—বলছিল কমল চৌধুরী সাহেবের যে ভাগ্নেটা আছে না, সে নাকি পুলিশকে বলেছে যে মা'ই চৌধুরী সাহেবকে খুন করেছে। তা শুনে আমি রেগে গেলুম। বললুম— মা'র কী দায় পড়েছে চৌধুরী সাহেবকে খুন করবার?

বাবু বললেন—লোকে সত্যিই বলছিল ওই কথা?

বললুম—হ্যাঁ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি ওদের কথা। তা আমি রেগে যাবো না? মিথ্যে কথা শুনলে মানুষের রাগ হয় না?

বাবু বললেন—না, তুই ওসব কথার মধ্যে থাকিসনি! মাথার ওপর যদি ভগবান থাকে তো তোর মা'র কোনও ক্ষতি হবে না।

বাবুর কথা শুনে আমি স্যার সেই দিন থেকেই রোজ ভগবানকে ডাকতুম। বলতুম, হে ভগবান, আমার মা কোনও দোষ করেনি। তুমি মা'কে বাঁচিয়ে দাও। আমি তো তখন ছেলেমানুষ ছিলাম স্যার, ভগবানকে বিশ্বাস করতুম। ভাবতুম ভগবান বলে নিশ্চয়ই একজন আছে। তার কাছে কোন জিনিস লুকনো থাকে না। ভগবান সব দেখতে পায়। কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না।

তাই যখন দেখতুম বাবু খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে তখন প্রাণপণে ভগবানকে ডাকতুম। কিন্তু তখন কি জানতুম আসলে ভগবান বলে কেউই নেই।

বাবু রোজ উকিল-বাড়ি যেতেন। প্রথম প্রথম উকিলবাবু তাঁকে খুব সাহস দিতেন। কিন্তু শেষে একদিন বললেন—কেসটা তেমন কিছু জটিল নয়, কিছু ভাববেন না মিস্টার বোস—

কিন্তু বাবু আমার বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—ভয় কেন পেয়েছিল?

হরিপদ বললে—বাইরে যে তখন অন্য কথা বলাবলি করছিল লোকেরা। কমল চৌধুরীর ভাগ্নে নাকি পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছে যে মিসেস বোসকে সে তার মামাকে খুন করতে দেখেছে।

—সে কী?

আমিও কথাটা চক্-বাজারে শুনছিলুম ক'দিন ধরে। সবাই বলছিল ঠিকাদার সাহেবের মেমসাহেব নাকি কমল চৌধুরী সাহেবের ওপর এমন রেগে গিয়েছিল যে নিজে বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে গিয়ে তাঁকে খুন করেছে!

—কেন? কমল চৌধুরীর ওপর রেগে গিয়েছিল কেন?

কেন যে রেগে গিয়েছিল সেইটের সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত ছিল। কেউ বলেছিল, মিসেস বোসের সঙ্গে কমল চৌধুরী লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতো। ঠিকাদার সাহেব তো চিরকাল বাইরে বাইরেই কাটাতো, সুতরাং কমল চৌধুরী সেই সুযোগটাই নিয়েছিল।

শহরময় সোরগোল উঠলো এই খুনের মামলা নিয়ে। জয়পুরের লোকজন, রিক্‌শাওয়ালা থেকে সুরু করে পান-বিড়িওয়ালা পর্যন্ত ওই নিয়ে তখন আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

কেউ বলতো—ঠিকাদার সাহেবের বিবিটাই খারাপ।

আবার কেউ বলতো—না রে, আসলে কমল চৌধুরী লোকটাই আসামী। কথা কাটাকাটিতে যখন বন্দুক দিয়ে ঠিকাদারের বিবিকে ভয় দেখাতে গেছে তখন কীভাবে গুলিটা নিজের বুকেই গিয়ে লেগেছে। খুন-খারাপি নয়, আসলে এটা একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট্।

বাবু একদিন আর থাকতে পারলেন না। যত দিন যেতে লাগলো ততই নিজের স্ত্রীর ওপরই সন্দেহ হতে লাগলো।

আমাকে একদিন বাবু বললেন—ওরে, মঙ্গল সিংকে একবার ডাক তো—

মঙ্গল সিং এমনিতে বাবুর সঙ্গে তেমন বাইরে যেত না। তার তখন বয়েস হয়ে গিয়েছিল খুব। বাবুর সঙ্গে গিয়ে একশো-দু'শো মাইল গাড়ি চালাতে পারতো না আর। কিন্তু বাবু তো আর তা বলে তাকে ছাড়িয়ে দিতে পারে না। তাই মঙ্গল সিং সাধারণত জয়পুরের বাড়িতেই থাকতো। আর মাঝে মাঝে দরকার হলে মা'কে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আনতো। মা তো আর বেশি বেরোত না। বেরিয়ে যাবেই বা কোথায়? ঘরেই তো অনেক কাজ ছিল মা'র।

মা'র বাগান ছিল। বাগানের গাছে মালী ঠিক ঠিক জল দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হতো। তারপর মা'র ছিল পাখির সখ। পাখি পোষার কি কম ঝামেলা! ভোর রাত্রিতে উঠে পাখিদের খেতে দিতে হবে। তাই জেল-হাজতে গিয়েও মা'র ভাবনা ছিল গাছপালা আর পাখির জন্যে।

আর বিকেল ও সন্ধ্যেবেলাটাই মা'র সময় কাটাতে কষ্ট হতো। তখন আর কোনও কাজ থাকতো না মা'র। তখন খানিকটা ছিল বই পড়া। বাবু মা'র জন্যে কলকাতা থেকে বই কিনে আনিয়ে দিতেন। যত পত্রিকা-টত্রিকা ছাপা হয় কলকাতায় সবগুলোর গ্রাহক করে দিয়েছিলেন বাবু।

কিন্তু বই পড়ে কি আর সময় কাটে সকলের? বাড়ি থেকে বেরোতেও তো ইচ্ছে করে মানুষের!

তখন মঙ্গল সিং-এর ডাক পড়তো। মঙ্গল সিং শেষ বয়সে একটু একটু আফিম্ খাওয়া ধরেছিল। বিকেল হলেই ঝিমোত। তা কাজ না থাকলে মানুষ কী করবে?

তখন মঙ্গল সিং মা'কে নিয়ে চক্-বাজারে কেনা-কাটা করতে যেত। কেনা-কাটারও তখন কিছু থাকতো না মা'র। বাবু সবই কিনে-টিনে দিয়ে যেত মা'কে। আসলে কেনা-কাটা মানে একটুখানি ঘুরে মানুষের মুখ দেখা।

মা কখনও কখনও সিনেমায় যেত অবশ্য। কিন্তু জয়পুরের চক্-বাজার তো আপনি দেখেননি। সে বড় বেয়াড়া জায়গা স্যার। ভদ্রলোকের আরাম করে বসে দেখার জন্যে সিনেমা-হাউস ছিল না সেখানে। হাউসের বাইরে কেবল পান-বিড়িওয়ালা, রিক্‌শাওয়ালাদের ভিড়। আর যত সব কেবল বোম্বাই-মার্কা হিন্দী ছবি। হিন্দী ছবি তো স্যার ভদ্র মেয়েছেলেদের দেখার মত নয়।

তা সময় কাটাবার কথা ভাবলে কি আর ভালো-খারাপ বিচার করলে চলে?

তাই মাঝে মাঝে মা সিনেমাতেও যেত। আবার কখনও যেত শাড়ি-গয়নার দোকানে, কখনও গানের রেকর্ডের দোকানে। মঙ্গল জানতো কোথায় কোথায় মা যায়, কবে কোথায় মা গেল। তা মঙ্গল সিং আসতেই বাবু জিজ্ঞেস করলেন—মঙ্গল তুমি মা'কে নিয়ে সেদিন কোথায় গিয়েছিলে?

মঙ্গলকে ক'দিন ধরেই এসব প্রশ্ন করছে সবাই। পুলিশও তার জবানবন্দী নিয়েছে।

কিন্তু আফিম্‌খোর মানুষ, যা বলে তাও মনে রাখতে পারে না, যা মনে জানে তাও ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারে না।

বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি তো মা'কে নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

মঙ্গল সিং বললে—চৌধুরী সাহেবের দোকানে।

—তা সেখানে যখন গিয়েছিলে তখন কী মা'র হাতে আমার বন্দুকটা ছিল?

মঙ্গল সিং খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো। মনে করতে চেষ্টা করলো। তারপর বললে—আজ্ঞে না—

বাবুর কেমন সন্দেহ হলো। বললেন—ঠিক মনে আছে মা'র সঙ্গে বন্দুক ছিল না?

মঙ্গল সিং একটু ঘাবড়ে গেল। বললে—আজ্ঞে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আমি তো পেছনের দিকে চেয়ে দেখিনি, সামনের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলুম—

বাব বললেন—পুলিশকে তুমি কী বলেছ? পুলিশ তো তোমার জবানবন্দী নিয়েছে, জবানবন্দীতে তুমি কী বলেছ যে মা'র সঙ্গে বন্দুক ছিল না?

মঙ্গল সিং আরো ঘাবড়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে বললে—আজ্ঞে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, আমি কি বলেছি—

বাবু রেগে গেলেন। বললেন—যাও, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, তুমি যাও—

মঙ্গল সিং বাবুর তাড়া খেয়ে চলে গেল। কিন্তু সেই দিন থেকে বাবুর মেজাজও কেমন কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। যে-লোক দিনের-পর-দিন বছরের-পর-বছর নিজের বাড়ির দিকে তাকায়নি, শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছে, সেই লোক কাজ ছাড়া হয়ে তখন একেবারে ছটফট করতে লাগলো।

আমি পাশে-পাশে থাকবার চেষ্টা করি সব সময়। বরাবরই পাশে পাশে থেকেছি। সুখের সময় ছিলুম বলে কি দুঃখের সময় পাশ ছেড়ে চলে আসবো?

দেখতুম বাবু একবার যাচ্ছেন ভরদ্বাজ সাহেবের বাড়ি, আর একবার যাচ্ছেন থানায়। আবার গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

মা বলতেন—কবে ছাড়া পাবো?

বাবু বলতেন—আর বেশি দেরি নেই, আর একটু কষ্ট করো—

মা বলতো—আমার নতুন পোঁতা গাছগুলোতে জল দেওয়া হচ্ছে তো ঠিক?

আমি বলতুম—হ্যাঁ ঠিক দেওয়া হচ্ছে, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জল দেওয়াচ্ছি, আপনি কিছু ভাববেন না মা—

—আর পাখিদের খেতে দিচ্ছিস তো ঠিক?

মা বলতো—যদি গিয়ে দেখি সব গোলমাল হয়ে গেছে তো দেখবি তোর সব মাইনে কেটে নেব আমি—

যতক্ষণ থাকতুম মা'র কাছে ততক্ষণই মা কেবল বাড়ির কথা বলতো। মা জানতো খুব শিগগিরই বাড়িতে চলে আসবে। মা বাড়িতে না থাকলে যে সংসারের সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে তা মা জানতো। তাই কেবল বার বার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতো।

তারপর যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেত তখন আমাদের আবার বাইরে চলে আসতে হতো। বাবুর মুখ আবার গম্ভীর হয়ে উঠতো। এমনি করেই আমাদের দিনগুলো কাটছিলো।

সেদিন দেখলুম ভরদ্বাজ সাহেবের মুখ বেশ গম্ভীর গম্ভীর।

বাবু যেতেই ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—কমল চৌধুরীর ভাগ্নে খুব খারাপ স্টেটমেন্ট দিয়েছে মিস্টার বোস।

বাবু চম্‌কে উঠলেন—কী স্টেটমেন্ট দিয়েছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—সে বলেছে যে সে নিজে সব ব্যাপারটা দেখেছে—

বাবু বললেন—দেখেছে মানে? আমাকে মিসেস বোস বলেছে, তখন বাড়িতে কেউই ছিল না—

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—চৌধুরীর ভাগ্নে বোধ হয় তখন ভেতরে ছিল, মিসেস বোস তাকে দেখতে পাননি—

বাবু চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—বাজে কথা! মিসেস বোস কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না—

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—আমি তা জানি, কিন্তু পুলিশের ব্যাপার তো, পুলিশ-কেসে নানা-রকম ফ্যাক্‌ড়া ওঠে, এ-সব আমার জানা আছে। তবু আপনাকে জানানো দরকার বলে জানিয়ে রাখছি—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওর ভাগ্নের নাম কী?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—জানকীপ্রসাদ—

জানকীপ্রসাদের নাম আমিও শুনিনি, বাবুও শোনেননি।

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—ভাগ্নেটা কী করে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—কী আবার করবে? শুনেছি সে তো একটা লোফার। কোনও কাজ-কম্ম নেই তার। ওই মামার কাছে থাকে, ভাত রাঁধে আর মামার পয়সায় সিনেমা দেখে বেড়ায়—আব মামা মারা গেলে ওই জানকীপ্রসাদই দোকানের মালিক হবে। কমল চৌধুরীর তো আর কেউ নেই, মা-বাবা ভাই-বোন কেউই নেই কমল চৌধুরীর, ওই বাপ-মা মরা ভাগ্নেটা তাই মামার কাছে পড়ে থাকে—

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা সেই জানকীপ্রসাদ কী স্টেটমেন্ট দিয়েছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—সে নাকি বলেছে যে মিসেস বোসকে সে তার মামাকে খুন করতে দেখেছে—

বাবু বললেন—শুধু দেখলেই তো চলবে না, প্রমাণ দিতে পারবে সে? সাক্ষী আছে তার কেউ?

ভরদ্বাজ বললেন—সে তো বলছে সে প্রমাণ দেখাবে।

কী প্রমাণ? আমার বন্দুকটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। আমি বরাবর বাইরে যাবার সময় বন্দুকটা আমার সঙ্গে থাকতো আমি ক'মাস বন্দুকটা নিয়ে যাচ্ছিলুম না। সবাই তো দেখেছে আমার সময় ছিল না বলে আমি মিসেস বোসকে বলেছিলুম বন্দুকটা দোকান থেকে সারিয়ে এনে রাখতে। আমি মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরি, আমার বন্দুকটা নিজেই সারিয়ে দেবে। সারাতে গিয়ে কী ভাবে ভেতর থেকে গুলি বেরিয়ে বুকে লেগে গেছে।

ভেতরে যে গুলি ছিল তা আমার মিসেস কিন্তু জানতো না, কমল চৌধুরীও জানতো না। এইটেই তো আসল ঘটনা। এ্যাক্‌সিডেণ্ট। আর সেই লোফার বলতে চায় কিনা এটা খুন!

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তাকে যা ইচ্ছা বলতে দিন না, আমি তো আছি। আর জজ তো আর ঘুষ খায় না। তা একটি কথা, আপনি যেন আবার মিসেস বোসকে এ-সব কথা বলতে যাবেন না, তিনি মিছিমিছি নার্ভাস হয়ে পড়বেন—

বাবু বললেন—না, আমি বলবো না, কিন্তু আমি ভাবছি কমল চৌধুরীর ভাগ্নেটা এত বড় স্কাউন্‌ড্রেল!

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—আপনি মাথা গরম করছেন কেন মিস্টার বোস, মিসেস বোস যে ইনোসেন্ট তা সবাই জানে। মিসেস বোস যে কমল চৌধুরীকে মার্ডার করতে পারেন না এ শহরের সব্বাই বলছে—

বাবু বললেন—কিন্তু জানকীপ্রসাদ যদি কোনও প্রমাণ দিতে পারে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—বাজে প্রমাণ সবাই দিতে পারে। কিন্তু জাজরা তো আর ঘাস খায় না। টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে, জানেন? আসলে ওই ছোকরাটা একটা লোফার—

বাবু বললেন—কীসে জানলেন লোফার?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—লোফার নয় তো কী? এতদিন মামার ঘাড়ে বসে কেবল খেতো, আর ফূর্তি করে বেড়াতো। এবার মামার সম্পত্তি পেয়ে এখন কিছু দাঁও মারতে চাইছে—

—দাঁও মারতে চাইছে? তার মানে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তার মানে ও জানে আপনি বড়লোক, সেই হিসেবে ভাবছে যদি ভয় দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু মোটা রকমের টাকা আদায় করতে পারে—

বাবু চমকে উঠলেন—আমার কাছে টাকা আদায় করবে? আমি টাকা দেব কেন?

বাবু কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আচ্ছা সেই জানকীপ্রসাদকে একবার আপনার কাছে ডাকতে পারেন না?

ভরদ্বাজ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কেন? তাকে ডেকে কী কববো?

—তাকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করবেন যে সে পুলিশের কাছে কী জবানবন্দী দিয়েছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—কী জবানবন্দী দিয়েছে তা তো জেরার সময়েই বেরিয়ে পড়বে। আগে জেনে কী হবে?

—আগে জানতে পারলে একটা দুর্ভাবনা চুকতো! যা শুনছি তা তো সত্যিও হতে পারে।

ভরদ্বাজ সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মিস্টার বোস? কী করে ওর কথা সত্যি হবে? আমি প্রমাণ করে দেব ঘটনার সময় ও বাড়িতে ছিল না—

—কী করে প্রমাণ করবেন?

—সে সাক্ষী আছে আমার কাছে। সে হল্‌ফ করে বলবে যে ঘটনার সময়ে সে শহরে সিনেমার হাউসে তাকে দেখেছে।

—সে রকম সাক্ষী আছে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—আছে বৈকি। না থাকলে কি আমি এত জোর করে বলছি?

—তা সে সাক্ষীকে একবার আমার সামনে ডেকে আনতে পারেন?

—তাকে এখানে ডেকে এনে কী করবো?

বাবু বললেন—তবু আমি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম। ভাবনাতে ক'দিন ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না মিস্টার ভরদ্বাজ, আর কতদিন আমি না-ঘুমিয়ে কাটাবো? আর মিসেস বোসই বা কতদিন হাজত-খানায় থাকবে? বাড়ি আসবার জন্যে ও ছটফট কবছে।

মিস্টার ভরদ্বাজ বললেন—আর একটু ধৈর্য্য ধরতে বলুন, পুলিশের ইন্‌ভেস্টিগেশন শেষ হলেই কেস শুরু হয়ে যাবে।

বাবু বললেন—কিন্তু আপনি একবার চেষ্টা করুন আপনার সাক্ষীকে ডাকবার। আমি না-হয় কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি আপনার কাছে।

বলে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করলেন। বললেন—এই চারশো টাকা রইল আপনার কাছে, পরে যা লাগে আমি আবার দেব, আপনি তাকে ডেকে আর একবার কথা বলুন—

বলে আমরা চলে এলুম। পরের দিনই হঠাৎ ভরদ্বাজ সাহেবের কাছ থেকে ডাক এল। বাবু আর আমি আবার গেলাম। গিয়ে দেখি ভরদ্বাজ সাহেবের ঘরে একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে উঠলো। ভরদ্বাজ সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন—এই হচ্ছে সেই সাক্ষী। এর নাম কান্‌হাইয়া।

বাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় থাকো? কী করো?

কান্‌হাইয়া বললে—আমি কিছু করি না।

—কোথায় থাকো?

—দাসপাড়ায়।

—কিছু করো না, তোমার চলে কী করে?

ছোকরাটা প্রথমে কিছু বলতে চাইছিল না। বোধহয় লজ্জা করছিল বলতে। এ রকম চেহারার ছেলে জয়পুরে তখন ছড়াছড়ি। রাস্তায়-ঘাটে তখন ওরা সব জায়গায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।

দেখে কেমন সন্দেহ হতে লাগলো আমাদের। এই ধরনের ছোকরাদের স্বভাব-চরিত্র জানা আছে। এরা টাকা পেলে সব কিছু করতে পারে।

বাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কই, তুমি কী করো বললে না?

কান্‌হাইয়া বললে—আমি সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করি।

বোঝা গেল ছোকরা বেকার। বাবু বললেন—তুমি কি জানকীপ্রসাদকে জানো?

—খুব জানি। সে আমার ফ্রেণ্ড। আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিই।

—যেদিন কমল চৌধুরী সাহেব খুন হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে?

কান্‌হাইয়া বললে—আমি তখন সিনেমা-হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে জানকীপ্রসাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ খবর এল চৌধুরী সাহেব খুন হয়েছে। লোকেরা দৌড়তে লাগলো চৌধুরী সাহেবের দোকানের দিকে। জানকীপ্রসাদ দৌড়ুলো, আমিও দৌড়লাম তার সঙ্গে। দৌড়তে দৌড়তে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলুম, তখন দেখি জায়গাটা ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে। জানকীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আমিও তার পেছন-পেছন গেলাম। গিয়ে দেখি জানকীপ্রসাদের মামা মেঝের ওপর পড়ে আছে তার গা দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। খানিক পরে পুলিশ এসে গেল। তারা জায়গাটা ঘিরে ফেললে। কাউকে কাছে যেতে দিলে না।

বাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর পুলিশের বড়-দারোগা সাহেব জানকীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলে সে কিছু জানে কিনা। জানকীপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ডাহা মিছে কথা বললে—

—কী বললে?

—জানকীপ্রসাদ বললে—হ্যাঁ হুজুর আমি বাড়ির ভেতরেই ছিলুম, আমি সব দেখেছি। বোস-মেমসাহেবকে বন্দুকটা নিয়ে আমি দোকানে ঢুকতে দেখেছিলুম। আমি দেখলুম দু'জনে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে—

—কী নিয়ে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে? পুলিশের লোক জিজ্ঞেস করলে।

জানকীপ্রসাদ বললে—তা আমি শুনিনি হুজুর। আমি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলুম। কাজ

করতে করতে হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে উঠে দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি মামা রক্তে ভাসছে আর বোস-মেমসাহেব বন্দুকটা ফেলে বাইরের দিকে দৌড়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠছে—

পুলিশ তারপর জিজ্ঞেস করলে—তুমি তারপর কী করলে?

জানকীপ্রসাদ বললে—আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, আমি বোস-মেমসাহেবের গাড়ির পেছন-পেছন দৌড়ুলুম, কিন্তু মোটর গাড়ির সঙ্গে দৌড়ে পারবো কেন? আমি ফিরে এলুম, কিন্তু ততক্ষণে আমার চেঁচানি শুনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল, আর তাবপরেই খবর পেয়ে আপনারা এসে গেলেন।

অতক্ষণ কথা বলে জানকীপ্রসাদ হাঁপিয়ে উঠল। পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মিসেস বোস তোমার মামাকে কেন খুন করতে গেলেন? তোমাব কী সন্দেহ হয়?

জানকীপ্রসাদ বললে—আমার সন্দেহ হয় বোস-মেমসাহেবের বাগ ছিল মামার ওপব।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—কেন রাগ থাকবার কারণ কী?

জানকীপ্রসাদ বললে—রাগ থাকবার কারণ আমার মামা বোস-মেমসাহেবেব কথা শুনতো না।

—কী কথা?

—বোস-মেমসাহেব চাইতো মামা তার বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাক। বোস-সাহেব ঠিকাদার মানুষ, রাত্তিরে বাড়ি থাকতো না, তাই। কিন্তু আমার মামা খুব ভালো মানুষ। মামা অনেকদিন কথা দিয়ে কথা রাখে নি তাই বোস-মেমসাহেবের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কথা কাটাকাটিব সময় মামা কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছিল তাইতে বোস-মেমসাহেব আর রাগ সামলাতে পারেনি, একেবারে মামাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেবেছে।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—তা তোমার মামার সঙ্গে যে বোস-মেমসাহেবের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল তার কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে?

জানকীপ্রসাদ বললে—হ্যাঁ, হুজুর, প্রমাণ আছে।

—কী প্রমাণ? প্রমাণটা দেখাতে পারো?

জানকীপ্রসাদ বললে—পারি।

—তা দেখাও?

জানকীপ্রসাদ বললে—এখন প্রমাণটা দেখাতে পারবো না হুজুর, খুঁজতে হবে।

কান্‌হাইয়া এতক্ষণ ধরে সব গল্পটা বলছিল। বাবু মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন।

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তা তুমি তো সব জানো কান্‌হাইয়া, তুমি তো সব জানো জানকীপ্রসাদ মিথ্যে কথা বলছে, তুমি এ-সব কথা সাক্ষী হয়ে কোর্টে গিয়ে বলতে পারবে? বলতে পারবে যে খনের সময় তমি আর জানকীপ্রসাদ সিনেমা হাউসের সামনে আড্ডা দিচ্ছিলে?

কান্‌হাইয়া বললে—তা বলবো হুজুর, কিন্তু জানকীপ্রসাদের কাছে একটা প্রমাণ আছে হুজুর, সেটা সে পুলিশকে দিয়েছে।

—কী প্রমাণ?

কান্‌হাইয়া বললে—একটা ছবি!

বাবু বললেন—ছবি? কীসের ছবি? কার ছবি?

কান্‌হাইয়া বললে—জানকীপ্রসাদের মামা আর বোস-মেমসাহেবের একটা জোড়া ছবি—

—জোড়া ছবি মানে?

কান্‌হাইয়া বললে—দু'জনে মুখোমুখি বসে আছে, এইরকম একটা ছবি, তার মামার বাক্স-প্যাঁটরার মধ্যে পাওয়া গেছে, সেইটে জানকীপ্রসাদ পুলিশকে দিয়েছে—

কথাটা শুনে ভরদ্বাজ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, বাবুও কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। আমিও কেমন ভয় পেয়ে গেলুম। ও-রকম ছবি যদি জানকীপ্রসাদ পুলিশকে দিয়ে থাকে তবে তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে মা'র সঙ্গে কমল চৌধুরীর ভেতরে ভেতরে একটা সম্পর্ক ছিল। তাহলে কী হবে? সে-ছবি কবে তোলালো মা? সে ছবি চৌধুরী সাহেবের বাক্সপ্যাঁটরার মধ্যে কী করে পাওয়া গেল? আমরা তো এসব খবর কিছুই জানতুম না—

ভরদ্বাজ সাহেব কান্‌হাইয়াকে বললেন—তুমি এখন যাও কান্‌হাইয়া, কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখন তোমাকে সাক্ষী হবার জন্যে ডাকবো। এখন যাও তুমি—

কান্‌হাইয়া চলে যাচ্ছিল। বাবু আবার তাকে ডাকলেন। বললেন—শোন—

কান্‌হাইয়া আসতেই বাবু নিজের পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলেন। বললেন—এইটে তোমার কাছে রাখো—মিষ্টি খেও—

টাকাটা পেয়ে কান্‌হাইয়া খুশী হয়ে সেলাম করে চলে গেল।

বাবু ভরদ্বাজ সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—এখন কী হবে মিস্টার ভরদ্বাজ?

ভরদ্বাজ সাহেব এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—মিসেস বোসের সঙ্গে কমল চৌধুরীর কি খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল?

বাব বললেন—তা তো আমি বলতে পারবো না। কারণ আমি তো আমার নিজের কন্‌ট্রাকটারি কাজ নিয়েই দিন-রাত মেতে থাকতুম, অর্দ্ধেক দিন বাড়িতে আসতেই পারতুম না। যদি সত্যিই প্রমাণ হয়ে যায় যে মিসেস বোসের সঙ্গে চৌধুরীর খুব যাতায়াত মেলা-মেশা ছিল তাহলে কী হবে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তাহলে কেসটা জটিল হয়ে যাবে—

—জটিল হয়ে যাবে মানে?

—মানে যত সহজে মিসেস বোস ছাড়া পেতেন তত সহজে ছাড়া পাবেন না।

বাবু ভয় পেয়ে বললেন—মিসেস বোস ছাড়া পাবে না? কন্‌ভিক্‌শন্‌ হয়ে যাবে?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তা ঠিক করে এখন বলদি পারছি না। এ-ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে মিসেস বোসের সঙ্গে আরো কথা বলতে হবে। দেখি মিসেস বোস এ-ব্যাপারে কী বলেন।

বাবু বললেন—কিন্তু যদি শোনেন যে খুব মেলা-মেশা ছিল?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—শুনতে হবে কী রকম মেলা-মেশা ছিল, কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল। দু'জনের মধ্যে রেগুলার যাতায়াত ছিল কিনা। সকলের চোখের আড়ালে মিশতেন কিনা। আপনি তো আমাকে এ-সব কথা বলেননি আগে। আগে জানতে পারলে আমি তো সে ব্যাপারে তখনই মিসেস বোসকে সব জিজ্ঞেস করে রাখতুম।

বাবু বললেন—কিন্তু আমি তো বলেছি আপনাকে, আমি এ-সব দিকে নজর দেবার সময়ই পেতুম না, আমার ছিল কেবল কাজ আর কাজ, আমার চারটে ব্রিজ, তিনটে টানেল তৈরি কবা চলছে, আমি বাড়ির দিকে দেখবার কখন সময় পেতুম, বলুন?

ভরদ্বাজ সাহেব বললেন—তা কাজ কি শুধু আপনি একলাই করেন? আর কেউ করে না?

বাবু বললেন—তা আমার মত কাজ আর কেউ করে? বাড়ি ছেড়ে বনে-জঙ্গলে আমার মত আর কাউকে ঘুরতে হয় বছরের পর বছর?

—তা আপনি অত কাজ করেন কেন? অত টাকা নিয়েই বা আপনার কী হবে? আপনারা তো দু'জন প্রাণী! বাড়ি আগে না আপনার কাজ আগে? আমরাও তো কাজ করি, তা বলে আমরা ঘরের ভেতরে কী হচ্ছে খবর রাখি না?

এ-কথার উত্তরে বাবু আর কিছুই বললেন না। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল স্যাব আমার। আপনি বুঝতে পারবেন না বাবু আর মাকে আমি কত ভালবাসতুম। আমার নিজের বাপ-মা ছিল না বলে আমি বাবু আর মাকেই আমার নিজের বাপ-মা'র মত দেখতুম। আমার তখন

কান্না পেয়ে গেছে স্যার। আপনাকে কী বলবো স্যার, আমি ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলুম। তবে কি খুনের দায়ে মা'র ফাঁসি হয়ে যাবে?

যাক, সেদিনটা তো কোনও রকমে কাটলো। পরের দিন সকাল বেলাই আমরা জেল-খানার হাজতে গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করলুম।

মা হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী রে, তুই অত কাঁদছিস কেন?

কথাটা শুনে আমার কান্নায় চোখ ফেটে আরো জল বেরোতে লাগলো।

মা বললে—ও কাঁদছে কেন?

বাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন—ওর কাঁদাটাই বুঝি দোষের হলো আর তুমি যখন দোষ করলে তখন তো আমাদের কথা তোমার মনে ছিল না—

মা থমকে গম্ভীর হয়ে গেল বাবুর কথা শুনে।

বললে—আমি দোষ করেছি?

—হ্যাঁ, তুমি দোষ না করলে আজ তোমাকে এই জেল-হাজতে পচতে দেয়? আর তোমার জন্যে আমাদেরও এই হয়রানি হয়? আমার কত টাকার লোকশান হয়েছে এতদিন তা জানো?

মা চুপ করে গেল বাবুর কথা শুনে।

তারপর বললে—হঠাৎ তুমি আমাকে এ-সব কথা শোনাচ্ছো কেন?

বাবু বললেন—বলছি তার কারণ তুমি। তুমিই আমাকে বুঝিয়েছ তোমার কোনও দোষ নেই, তুমি নির্দোষ। কিন্তু মিস্টার ভরদ্বাজ যখন সব জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তুমি তো কিছুই বলো নি—

মা বললে—সত্যি করে বলো তো কী হয়েছে? তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বাবু বললেন—মিস্টার ভরদ্বাজ তোমার কাছে আসবেন, তাঁর কাছেই সব শুনতে পাবে—

মা বললে—তা তুমিই বলো না তাঁর কথাগুলো। তোমার মুখ থেকেই না হয় শুনি—

বাবু বললেন—কমল চৌধুরীর সঙ্গে একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছ তা তো কাউকেই বলোনি, তোমার সঙ্গে কমল চৌধুরীর কীসের এত ঘনিষ্ঠতা যে একসঙ্গে তুমি ফোটো তোলালে!

—আমি ছবি তুলিয়েছি কমল চৌধুরীর সঙ্গে?

মা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বাব বললেন—নিশ্চয়ই তুলিয়েছ। নইলে তোমাদের দু'জনের একসঙ্গে তোলা ছবি পুলিশের হাতে গেল কী করে?

মা রেগে উঠলো। বললে—তুমি এসব কী বলছো?

বাবু বললেন—যা বলছি তা ঠিকই বলছি, কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখনই দেখতে পাবে!

মা বললে—কিন্তু যা-তা একটা প্রমাণ দিলেই হলো? একটা মিথ্যে প্রমাণ দিলেই সেটা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে হবে?

বাবু বললেন—বিশ্বাস অবিশ্বাস পরের কথা, ক্যামেরা তো মিথ্যে কথা বলে না। সেই ক্যামেরাতে যখন তোমাদের দু'জনের ছবি তোলা হয়েছে তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও সত্যি আছে!

সেদিন সেই হাজতখানার ভেতরে বাবু আর মা'তে দু'জনে যে কথা কাটাকাটি হলো তা আগে আর কখনও হয়নি। বাবু আর মা ভুলেই গেল যে আমি সেখানে হাজির রয়েছি। আমার সামনেই দু'জন দু'জনকে দোষ দিতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো যে মাটিটা দু'ফাঁক হয়ে যাক আর আমি তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকি। কিন্তু সে যে কী ঝগড়া তা আপনাকে কী বলে বোঝাবো স্যার আমি আজ বুঝতে পারছি না। একবার মা একটা কথা বলে তো বাবু তার জবাবে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। বাবু যে মার সঙ্গে অত ঝগড়া করতে পারে

তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু আমি কাকে দোষ দেব? বাবুর কি তখন মাথার ঠিক ছিল? ক'দিন ধরে বাবুর যে হেনস্থা চলছিল আমি অন্ততঃ সেদিন তার সাক্ষী ছিলুম। মা'র জন্যে ভেবে ভেবে রাত্তিরে বাবুর ঘুমই হতো না। এক-একদিন দেখেছি সারারাত জেগে জেগে বাবু বারান্দায় পায়চারি করছেন। সে যে কী যন্ত্রণা তা কেউ না বুঝুক আমি তো বুঝতে পারতুম।

বাবু তখন আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। বললেন—তোমার জন্যে আমার কী সর্বনাশ হয়েছে তা তো তুমি বুঝতে পারছো না। আমার টাকা তো গেছেই তার ওপর আমার সম্মানটাও তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। আমার অবস্থা এখন কী শোচনীয় হয়েছে তা যদি তুমি একবারও বুঝতে—

মা বললে—তুমি তোমার নিজের অবস্থাটার কথাই ভাবছো। আর আমার অবস্থাটার কথা একবার ভাবো—

বাবু বললেন—তা তোমার এই অবস্থার জন্যে কি আমি দায়ী?

—তুমি যদি দায়ী না-ই হও তো আমিই কী দায়ী?

বাবু বললেন—তোমারই যদি কোন দায়িত্ব না থাকে এ-ব্যাপারে তো কে দায়ী তুমিই বলো?

মা এ-অভিযোগের জবাবে হঠাৎ কিছু বলতে পারলে না। তারপর বললে—তুমি কি তাহলে আমাকেই সন্দেহ করো?

বাব বললেন—সন্দেহ করবার সুযোগ তো তুমিই করে দিয়েছ। নইলে এতদিন তো তোমাকে আম বিশ্বাসই করে এসেছি। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি তো নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কেবল ভবিষ্যত সংশোধনই করে যাচ্ছিলুম, যাতে জীবনে কোনও দিন তুমি আমি কোনও আর্থিক দুর্দশায় না পড়ি। কিন্তু আজ তুমি আমার এ-বিশ্বাসের মর্যাদা ভালো করেই রাখলে বটে! আমার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব ধুলোয় মিশিয়ে দিলে, ছিঃ—

মা বললে—তা হলে আমাকে বিয়ে করা তোমার ভুল হয়েছিল বলো?

বাবু বললেন—তোমাকে বিয়ে করা শুধু ভুলই নয়, জীবনে এক মস্ত অপরাধও হয়েছিল আমার—

মা বললে—এই কথাটা তোমার মুখ থেকে একদিন শুনতে হবে, এ আমি সন্দেহ করেছিলুম।

বাবু বললেন—আর সেই জন্যেই বুঝি কমল চৌধুরীর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে মেলামেশা করতে তোমাব বাধেনি!

মাও তেমনি। বাবুর বাগের কথায় কোথায় ঠাণ্ডা হবে, তা নয়, মা যেন আরো রেগে উঠলো। গলা আরো বাড়িয়ে বললে—চুপ করো, তোমার লজ্জা করে না নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অপবাদ দিতে?

বাবু বললেন—লজ্জা আমার করবে কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ করবে তুমি আর ধরা পড়ে গেলে লজ্জায় পড়বো আমি? তুমি কি মনে করো এখনও লজ্জার কিছু বাকি আছে তোমার? সাবা শহরের লোকের মুখে-মুখে আজ যে নির্লজ্জ আলোচনা চলছে তা তো তোমার কানে যায় না তাই তুমি আমাকে চুপ করতে বলছো। আমি চুপ করলেই কি তারা চুপ করবে? তাদের তুমি চুপ করাতে পারবে?

মা বললে—তারা যা ইচ্ছে বলুক, তারা বাইরের লোক, তারা কী বললে না-বললে তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু তুমি? তুমি কেন বলবে?

বাবু বললেন, আমি বলছি আমার নিজের দায়ে। আমি শহরের একজন গণ্য মান্য লোক, গভমেণ্টের অফিসারদের সঙ্গে আমাকে মেলামেশা করতে হয়, তাদের কাছে আমি এখন থেকে মুখ দেখাবো কেমন করে সেই ভাবনাতেই আমাকে বলতে হয়!

মা বললে—ও, বুঝেছি, তাহলে দরদটা আমার জন্যে নয়, দরদটা তোমার নিজের সুনামের জন্যে! তোমার সুনামে দাগ লেগেছে তাই তোমার এত দুর্ভাবনা! তাহলে তোমার যে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না সে আমার কষ্টের কথা ভেবে নয়, ঘুম হচ্ছে না তোমার নিজের সুনামহানির ভয়ে! তাহলে শোন, আমিও আজ তোমাকে খুলেই বলি আমি যা করেছি তা অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছি।

মা'র কথাটা শুনে আমিও স্তম্ভিত, বাবুও স্তম্ভিত! খানিকক্ষণ আমাদের কারো মুখেই কোনো কথা বেরোল না। মা কি তাহলে সত্যিই খুন করেছে কমল চৌধুরীকে? মা'র কি তাহলে ফাঁসি হয়ে যাবে? মা যদি কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলে তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

বাবু বললেন—তুমিই তাহলে কমল চৌধুরীকে খুন করেছ?

মা বললে—হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি কমল চৌধুরীকে।

বাবু বললেন—তাহলে যে সেদিন বলেছিলে বন্দুকটা সারাতে গিয়ে অসাবধানে গুলি ছিটকে গিয়ে কমল চৌধুরীর বুকে লেগেছে?

মা তখন যেন পাথর হয়ে গেছে। বললে—তখন আমি সব মিথ্যে কথা বলেছিলুম।

—কেন মিথ্যে কথা বলতে গিয়েছিলে কেন?

মা বললে—তখন আমি জানতুম না যে আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে মেলামেশার খবর এমন করে সবাই জানতে পেরেছে।

বাবু বললেন—তাহলে এখন শহরের লোকে যা-কিছু বলাবলি করছে সব সত্যি?

মা বললে—হ্যাঁ, সব সত্যি। এক বর্ণও মিথ্যে নয়, আমি আর বাড়িতে একলা থাকতে পারছিলুম না। গাছ-বাগান পাখি সংসার আমার কাছে সব কিছু বোঝার মত ভারি হয়ে উঠেছিল। করবার মত আমার আর কিছু ছিল না। তখন আমার সামনে এমন একজন ছিল যে আমি ডাকলেই আমার কাছে আসতো, তাকে আমি যা বলতুম তাই-ই সে করতো, আমার কোনও উপকার করতে পারলে সে নিজে কৃতার্থ হয়ে যেতো—

বাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মা'র কথা শুনে। বললেন—তা বলে তার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?

—তুমি? তুমি তখন কোথায়? তোমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবো তার জন্যেও তো তোমার কাছে থাকা চাই। কিন্তু তুমি তো তখন টাকা উপায় করতে ব্যস্ত, তোমাকে পাবো কি করে?

—তারপর?

—তারপর আমি কমল চৌধুরীকে ধরলুম।

—কমল চৌধুরীর মত একটা লোফার দোকানদারের পেছনে ছুটতে তোমার লজ্জা করলো না?

মা বললে—তখন লজ্জা করার কিছু থাকলে তবে তো লজ্জা করবে, তুমি যে তখন আমাকে একেবারে নির্লজ্জ করে তুলেছ! আমি যে তখন সব লজ্জার জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছি!

বাবুর সমস্ত শরীর তখন থর-থর করে কাঁপছে। বললেন--তারপর?

—তারপরই বাধলো গোলমাল। আমার লজ্জা না থাকলেও কমল চৌধুরীর বোধহয় লজ্জা-সরমের বালাই ছিল। একদিন সে বললে—আমি আর আসবো না—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কেন তুমি আসবে না?

সে বললে—শহরের লোকেরা আমাদের ব্যাপার নিয়ে কানা-ঘুষো আরম্ভ করেছে। মিস্টার বোসের কানে গেলে তোমারও ক্ষতি হবে, আমারও ক্ষতি হবে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আমার ক্ষতি হয় হোক, কিন্তু তোমার কী ক্ষতি হবে?

সে বললে—ব্যবসার ক্ষতি হবে, আমার দোকানে আর কোনও খদ্দের আসবে না।

আমি শুনে বললুম—তোমার ব্যবসার ক্ষতিটাই তোমার কাছে বড় হলো আর আমার ক্ষতিটা কিছু নয়? আমার চেয়ে তোমার ব্যবসাটাই বড়ো হলো?

সে বললে—হ্যাঁ।

তাই শুনেই আমার রক্ত গরম হয়ে গেল। ক'দিন ধরে যখন লক্ষ্য করলুম সে আসছে না। আমি সেদিন আর থাকতে পারলুম না। বন্দুকটা সারাতে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখানে আগে না গিয়ে পথেই তার দোকানে নেমে গেলুম, তখন সে একটা গ্রামোফোনের মেশিন সারাচ্ছে, সেখানে দু' একটা কথার পরেই আমি তাকে খুন করলাম।

—তুমি সত্যিই তাকে খুন করলে?

মা বললে—হ্যাঁ, খুন করলুম।

—কিন্তু পুলিশের কাছে তুমি তখন যা স্টেট্‌মেণ্ট দিয়েছিলে আর এখন যা বলছো, তাতে তো কিছু মিলছে না। একেবারে উল্টো! তুমি জানো এতে তোমার ক্ষতি হবে?

মা যেন তখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে।

বললে—ক্ষতি যা হবার তা আমার আগেই হয়ে গেছে, আর কত ক্ষতি হবে আমার?

—তাহলে জেরার সময় তুমি কোর্টে এই কথাই বলবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তার পরিণতি কী তা তুমি জানো?

—হ্যাঁ, জানি, ফাঁসি!

বাবু বললেন—দেখ তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ তুমি জেরার সময় এ-কথাগুলো বোল না। আগে যা বলেছিলে তাই-ই বলো। তাতে তোমার ভালোই হবে। কমল চৌধুরীর ভাগ্নে জানকীপ্রসাদ যা কিছু বলবে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রমাণ আছে। কান্‌হাইয়া বলে একজন সাক্ষী জোগাড় করেছি, তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি, সে প্রমাণ করে দেবে যে খুনের সময় জানকীপ্রসাদ বাড়িতে ছিল না। সিনেমা হাউসের সামনে তাব সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। আর তুমি জানো মিস্টার ভরদ্বাজ এখানকার সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল উকিল, আমি তাঁকে এই কেসটা দিয়েছি। আমি তাঁকে বলেছি তোমাকে ছাড়াবার জন্যে যত টাকা লাগে তা আমি খরচ করবো, তিনি যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আর শুধু একটা ব্যাপার রইলো—ওই ফোটোগ্রাফখানা। ওটা যদি পুলিশকে মোটা ঘুষ দিয়ে আদায় করে নিতে পারি তো আর কোনও ভাবনা নেই আমাদের—তোমাকে শুধু আমার একটা অনুরোধ তুমি যেন জেরাতে এই সব কথাগুলো বলো না।

সেদিন আর তখন কথা বলবার সময় ছিল না। মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমাদের চলে আসতে হলো।

এতক্ষণ পরে হরিপদ থামলো। বললে—স্যার, আর এক কাপ চা চাই, আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

গল্পটা এমন এক অবস্থায় ফেলে হরিপদ চা খেতে চাইলে যে তখন আর চা না দিয়ে উপায় নেই। চা খেয়ে আবার একটা বিড়ি ধরালো হরিপদ। ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—কেমন লাগছে স্যার আপনার?

বললাম—তারপর বলো।

হরিপদ বললে—তারপর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল কোর্টে। কোর্টে কেস ওঠে আর

আমরা সবাই মিলে যাই! সারা শহর ঝেঁটিয়ে লোক গিয়ে হাজির হয় মজা দেখতে। আপনি স্যার এসব কোর্টের খুঁটিনাটি লিখবেন না। এসব বড় ভজোকটো ব্যাপার। কোর্টকাছারির ব্যাপার আপনারাও জানেন না, পাঠক-পাঠিকারাও কেউ জানে না। শেষকালে কোথায় একটা ভুল করে বসবেন আর উকিল-মোক্তাররা হৈ-হৈ করে উঠবে। আপনি শুধু লিখবেন আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

আমি বললাম—সে কী? তোমার মা খালাস পেয়ে গেল।

হরিপদ বললে—হ্যাঁ স্যার, খালাস পেয়ে গেল। সেই ছবিখানার ব্যাপারটা ছিল গোলমেলে। তা সেটাও ফয়শালা হয়ে গেল ভরদ্বাজ সাহেবের জেরার মুখে। ভরদ্বাজ সাহেব প্রমাণ করে দিলে যে ফোটোখানা জাল। কমল চৌধুরীর একখানা মুখ আর আমার মা'র একখানা মুখ দু'খানা ছবি থেকে কেটে নিয়ে একসঙ্গে একটা ছবিতে লাগিয়েছিল। এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছিল যাতে ভুল হয় যে দু'জনে বসে বসে গল্প করছে। এসব ফোটোগ্রাফারের কারসাজি মশাই। আমরা আগে ওই জন্যেই যত ভয় পেয়েছিলুম সব মিছিমিছি। ভরদ্বাজ সাহেব জেরায় প্রমাণ করে দিলে যে ওটা ভুয়ো ছবি। জজ সাহেবও তাঁর রায়ে তাই বললেন। আসামীকে বেকসুর খালাস করে দিয়ে জজসাহেব বললেন—আসামী ভদ্রসমাজের সম্ভ্রান্ত সচ্চরিত্রা মহিলা, কমল চৌধুরী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছে, এটা মোটেই হত্যার ঘটনা নয়। সম্পূর্ণ একটা দুর্ঘটনা মাত্র, কমল চৌধুরীর ভাগ্নে জানকীপ্রসাদ একটা জঘন্য দুশ্চরিত্র যুবক, একজন নিষ্পাপ সম্ভ্রান্ত মহিলার নামে কলঙ্ক লেপন করে তাঁকে বেইজ্জত করে একটা রহস্যজনক উদ্দেশ্য সাধন করবার নীচ প্রচেষ্টা করেছিল। আমি আসামীকে সসম্মানে মুক্তি দিলাম।

তা মা ছাড়া পাওয়ার পর যে আমাদের কী আনন্দ হয়েছিল তা আপনাকে কী বলে বোঝাবো বুঝতে পারছি না। যখন কোর্ট বন্ধ হলো বাবু মা'কে নিয়ে বাড়িতে এলেন। শহরের আরো গণ্যমান্য লোক আমার বাবুকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। বাড়ি তখন লোকের ভিড়ে সরগরম। কতদিন পরে মা বাড়িতে এসেছে, আমরা আনন্দে তখন প্রায় লাফাচ্ছি।

তারই মধ্যে মা আমাকে আড়ালে ডেকে বললে—হরিপদ আমার জন্যে দোকান থেকে এই ওষুধটা কিনে আনতে পারবি?

বললুম—বলুন না কী ওষুধ কিনে আনতে হবে, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

মা একটা চিরকুটে ওষুধের নাম লিখে দিলে। আর একটা পাঁচ টাকার নোট দিলে।

আমি দৌড়ে শহরে গিয়ে একটা ওষুধের শিশি কিনে এনে মাকে দিলুম। তারপবে সেদিন খাওয়া-দাওয়া সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাবু খুশী হয়ে সেদিন খাওয়া-দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত করেছিলেন। এতদিন পবে মা বাড়িতে এসেছে, উৎসব না করলে চলে?

অনেক দিন ধরে কারো খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সেদিন সবাই পেট ভরে খাবে, ঘুমোবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে গেছি আমরা। তারপরে একেবারে এক ঘুমে রাত কাবার। ভোর তখন পাঁচটা কি ছ'টা, হঠাৎ শুনতে পেলুম বাবু আমাকে ডাকছেন—হরিপদ—হরিপদ—

আমি ধড়-মড় করে দৌড়ে ওপরে গিয়েছি। গিয়ে দেখি বাবু মা'র শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মা'কে ডাকছে—

অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে দরজায় ধাক্কা দিয়েও যখন মা'র সাড়া পাওয়া গেল না, তখন সবাই মিলে শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলা হলো। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি অবাক কাণ্ড! বিছানার ওপর মা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। কোনও সাড়া নেই তখন আর মা'র।

আমবা সবাই কাণ্ড দেখে চুপ করে রইলুম। এমন বীভৎস কাণ্ড যে হবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি। আমি চিৎকাব কবে ডাকতে লাগলুম—মা—মা—মা—

কিন্তু মা'র নিথর নিস্পন্দ শরীর তেমনি নিথর-নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। আমার ডাকাডাকিতে মা কোনও সাড়া-শব্দ দিলে না। সাড়া দেবে কে? মা কি আর তখন বেঁচে আছে?

তখন খবর পেয়ে পুলিশ এল, লোকজন এল। আমাদের জিজ্ঞেসবাদ করলে তারা। আমরা যা জানতুম তাই বললুম।

ভাগ্যিস মা মারা যাওয়ার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল তাই আর কোনও গণ্ডগোল হলো না।

মা বাবুর নামে লিখেছিল—'আমি ভেবে দেখলুম আমার আর বেঁচে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি তোমার জন্যে অনেক সহ্য করেছি! তুমি যখন তোমার নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্যে দিন-রাত কাজ করে চলেছ, আমি একলা তোমার সংসারের দিকটা সামলিয়েছি। সেদিন অনেক কষ্টে মুখ বুঁজে এই মনে করে সহ্য করেছি যে একদিন আমাদের অনেক কষ্ট লাঘব হবে টাকা হবে তখন তুমি আমি সেই টাকায় ভবিষ্যতের সুখ কিনে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবো। আমি তোমাকে কখনও বলিনি যে তুমি তোমার কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে থাকো। কখনও মুখ ফুটে বলি নি যে আমার একলা থাকতে খারাপ লাগছে। আমি সব কিছু সহ্য করে গিয়েছি শুধু আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে। কিন্তু তুমি আমায় সব চেয়ে বেশি আঘাত দিলে যেদিন তুমি আমাকে সন্দেহ করলে। যেদিন তুমি আমার চরিত্রে সন্দেহ করলে সেই দিনই আমি আমার জীবনের সব চেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পেলাম। ভেবে দেখলাম তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে গেছে। তুমি ভালোবেসেছ শুধু তোমার কাজকে আর তোমার টাকাকে। আমি শুধু তোমার নামে মাত্র স্ত্রী। আমার অস্তিত্ব তোমার কাছে উহ্য, তাই আমিও আজ নিজেকে তোমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলাম। আরো ভেবে দেখলাম একবার যখন আমার সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ ঢুকেছে তখন আর তর্ক করে তা দূর করতে চাই না। তেমন দৈন্য থেকে ঈশ্বর যেন আমাকে বাঁচান। আমি মরলাম বটে কিন্তু আর একদিক থেকে আমি বাঁচলামও বটে। তোমার সন্দেহের পাত্রী হবার অগৌরব থেকে তো আমি অব্যাহতি পেলাম। সেই তো আমার নতুন করে বাঁচা। জজ সাহেব আমাকে যে জীবন দিলেন সে ঠিক জীবন নয় মৃত্যু, তাই আমি আজ মৃত্যুকে আশ্রয় করেই আবার বেঁচে উঠলাম। আমাকে ক্ষমা করো।

ইতি তোমার মঞ্জু—'

গল্প বলা শেষ করে হরিপদ বললে—কী স্যার, কেমন লাগলো? ভালো?

বললাম—তুমি কোন ইংরিজী গল্প নিজের বলে চালিয়ে দিলে না তো? এ তোমার ঠিক নিজের জীবনের গল্প তো?

হরিপদ বলে উঠলো—হ্যাঁ স্যার, আমি এতদিন আপনাকে গল্প সাপ্লাই করছি, কখনও কোনও ভেজাল দিয়েছি, আপনিই বলুন? আমি গরীব লোক হতে পারি স্যার, কিন্তু তা বলে ঠকাবো না স্যার আপনাকে। আমি খাঁটি মাল দেব, খাঁটি পয়সা নেব। দিন স্যার, আরো পাঁচটা টাকা ফেলুন, আমায় আবার এখুনি রেশন কিনতে যেতে হবে।

গুলজারি বাঈ

যখন 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখি তখন এই গুলজারি বাঈ-এর কাহিনীটা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল ও-কাহিনীটার কোথাও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

নবাবী খান্‌দানি আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন রীতি-প্রকৃতি কয়েক বছর ধরে খুব পড়াশোনা করতে হয়েছিল। বলতে গেলে ওই বইটা লেখবার সময়ে মুসলমানি সংস্কৃতির মধ্যে একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলুম। গল্পটার জন্যে নয়। গল্পটা তো উপলক্ষ্য মাত্র। আসল হচ্ছে সেই যুগ। বই পড়তে পড়তে যদি সেই যুগের আবহাওয়ার মধ্যে না ডুবে যেতে পারি তো সে বই পড়েও লাভ নেই, লিখেও লাভ নেই।

সেই সময়েই এই গুলজারি বাঈ-এর ঘটনাটার কথা জানতে পারি।

কলেট সাহেব যখন কাশিমবাজারে এসেছিল তখনও জানতো না গুলজাবি বাঈ-এর কথা। তারিখ-ই-বাঙলা নামে যে ফার্শী বই আছে তাতে সব কথা লেখা আছে, কিন্তু গুলজারি বাঈ-এর নামের উল্লেখ নেই। বিরাজ-উম্‌-সালাতিনেও নেই। গোলাম হোসেনও অন্য সব কথা লিখে গেছেন, কিন্তু গুলজারি বাঈ-এর কথা লিখে যাননি।

কলেট সাহেব কাশিমবাজার কুঠির কর্তা।

ক্যাপটেন ড্রেক সাহেব যখন মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠাতো তখন কলেটকে গিয়ে মুর্শিদাবাদের সব রিপোর্ট দিতে হতো।

নবাব আলিবর্দী মারা যাওয়ার পর আরো বেশি করে ডাক পড়তো কলেটের।

ড্রেক জিজ্ঞেস করতো—মুর্শিদাবাদের হাল-চাল কী?

কলেট বলতো—হাল-চাল ভালো নয়, ওমরাওরা বোধহয় রিভোল্ট্ করবে এবার।

—কীসে বুঝলে তুমি রিভোল্ট্ করবে?

কলেট বলতো—সবাই আমাদের কাছে এসে তাই বলছে।

—সবাই মানে কে? কারা!

কলেট বলতো—যারা নবাবের আশে-পাশে ঘোরে, তারাই বলছে।

—কী বলছে তাই বলো?

কলেট বলতো—ইয়ার-লুৎফ্ খাঁ, একজন বড় মনসব্‌দার। সে আমাদের দলে আসতে চায়।

—আর কে?

—মহতাপচাঁদ জগৎশেঠ! নবাবের ব্যাঙ্কার। তারপর আছে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দর—

মাঝে মাঝে এই রকম সব খবর দিয়ে আসতো কলেট। কলকাতায় এলেই কলেট বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতো। খানা-পিনা করতো।

কাশিমবাজার আর কলকাতায় অনেক তফাৎ। কলকাতায় এলেই নানা ফূর্তিতে দিন কাটতো কলেটের। ইংরেজদের বড় পেয়ারের বন্ধু ছিল উমিচাঁদ। লোকটা দিলদার মেজাজের। বাড়িতে দিন-রাত এলাহি রান্না চলেছে। মোগলাই-খানা, ইংরেজী-খানা, হিন্দু-খানা। সব রকম খানা রান্নার বন্দোবস্ত আছে উমিচাঁদের বাড়িতে।

কলেট সেখানেও হাজির হতো।

—কী খবব সাহেব? মুর্শিদাবাদের হাল-চাল কী?

উমিচাঁদের বাড়িতে যদি কোম্পানীর কোনও সাহেব আসতো তো লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতো।

মুর্শিদাবাদের নবাবের বন্ধু উমিচাঁদ। শেষকালে নবাব জানতে পারলে উমিচাঁদ সাহেবেরও বিপদ, কোম্পানীরও বিপদ।

এখানেই আলাপ হয়েছিল ছাব্বিশ বছরের ছেলে ক্যাম্পবেল সাহেবের সঙ্গে।

জন্ ক্যাম্পবেল! এই গল্পের নায়ক।

কবে একদিন কী উদ্দেশ্য নিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছিল কে জানে!

কলেট জিজ্ঞেস করলে—একে কোত্থেকে জোগাড় করলে উমিচাঁদ সাহেব! কোম্পানীর লোক তো এ নয়।

ক্যাম্পবেল হাসতে লাগলো মিটি-মিটি।

বললে—আমি ডাক্তার—

উমিচাঁদ বললে—আমার পায়ে বাত হয়েছিল, ক্যাম্পবেল এক দাওয়াই দিয়ে সব সারিয়ে দিয়েছে, আমার বাত বিলকুল সেরে গেছে।

—কোত্থেকে ডাক্তারি শিখলে তুমি? লণ্ডন থেকে?

—ক্যাম্পবেল বললে—আমি লণ্ডনে কখনও যাইনি। পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি, কেবল জাহাজে-জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছি—

—তাহলে ডাক্তারিটা শিখলে কোথায়?

ক্যাম্পবেল বললে—লাহোরে। জাহাজে উঠে পড়েছিলুম একদিন ইংলণ্ডের এক পোর্ট থেকে, তারপরে জাহাজ যেখানে যায়। কিন্তু জাহাজটা আট মাস পরে ইণ্ডিয়ায় এসে পড়লো। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় এলুম। এসেই একেবারে দিল্লী। দিল্লী থেকে লাহোর। সেখানে এক হেকিমের সঙ্গে কিছুদিন ছিলুম—

সত্যিই সেই হেকিমের সঙ্গে থাকতে থাকতেই দেখতে লাগলো কী করে সে দাওয়াই বানায়। ক্যাম্পবেল হেকিমের কথামত হামান্‌দিস্তেতে হরতুকী কোটে, বড়ি বানায়, ওষুধগুলো আবার রোদে দেয়, তারপর সেগুলো পাথরের জারের ভেতরে পুরে রাখে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—তুমি পারা-রোগ সারাতে পারো?

—পারা-রোগ সারাতে না পারলে কি হেকিমি করা চলে? নবাব-বাদ্‌শা-ওমরাওদের তো পারা রোগই হয়। পারা রোগ হয়, গর্মিরোগ হয়, সুজাক্ হয়, মালেখুল্লিয়া দিমাগী হয়। কত রকম রোগ হয় নবাব বাদশাদের—

—মালেখুল্লিয়া দিমাগী কাকে বলে?

—ওই আমাদের ইউরোপের সিফিলিসের মত।

—তা তুমি কাশিমবাজারে যাবে? সেখানে আমাদের কোম্পানীর হাউস আছে। যাকে ইণ্ডিয়াতে বলে কুঠি।

ক্যাম্পবেল হাসলো। বললে—ইণ্ডিয়ায় যখন একবার এসে পড়েছি, তখন যেখানে বলবে সেখানে যাবো। জাহান্নমে যেতে বললে সেখানেও যাবো। আমি নরকেও যেতে তৈরি

তা তাই-ই হলো।

উমিচাঁদ বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও সাহেব। যখন দরকার পড়বে আমাকে খবর দি· আমার দরজা তোমার জন্য খোলা পড়ে রইল। আমি থাকি আর না-থাকি তুমি এখানে এসে উঠবে, থাকবে, খাবে, কেউ কিছু আপত্তি করবে না।

উমিচাঁদের চাকর জগমোহনকেও সেইরকম হুকুম হয়ে গেল।

কলেট সেবার অন্যবারের মত একলা ফিরলো না কাশিমবাজারে, সঙ্গে নিয়ে এল এক পাগলা সাহেবকে।

তা পাগলা সাহেবই বটে।

ক্যাম্পবেল সাহেবের কোনও লাজ-লজ্জার বালাই নেই। গরমের দেশ, ঘামের দেশ

বাংলাদেশে একটা প্যান্ট্ পরে খালি গায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় টো-টো করে। চাষা-ভুষোদের সঙ্গে বিড়ি খায়, তামাক খায়। হুঁকো নিয়ে কলকেয় টান দেয়। চাষীদের বাড়ি গিয়ে পান্তাভাত গেলে কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়ে।

আর কারো রোগ-টোগ করলে ওষুধ দেয়। বাতের ওষুধ, হাজার ওষুধ, খুশ্‌কির ওষুধ।

টাকা-পয়সার চাহিদা নেই। পাওনার কথা মুখে আনে না। সেরে গেলে সাহেবের আনন্দ। ওষুধে কাজ দিয়েছে।

কলেট মাঝে-মাঝে দফ্‌তরে কাজ করতে করতে সাবধান করে দেয়। বলে—এসব কী বেলেল্লাগিরি করছো বেল্?

বেল্ বলে—কেন? আমি তো হেকিমি করি—

কলেট বলে—কিন্তু ওদের সঙ্গে অত মাখামাখি করছো কেন? ওরা হলো গিয়ে রাজা-বাদশার জাত, আর আমরা হলুম বেণে। ওদের মধ্যে অনেক স্পাই ঘুরে বেড়ায়, তা জানো?

—স্পাই?

—হ্যাঁ স্পাই। নবাব আমাদের সন্দেহ করে। নবাব জানতে পেরেছে যে আমরা কলকাতায় ফোর্ট বসিয়েছি, কেল্লা বানানো তো ক্রাইম। আমরা ট্রেড করতে এসেছি কিন্তু ওরা মনে করে আমরা এম্পায়ার বসাতে চাই এখানে—

বেল্ বললে—কিন্তু আমি কে? আমি তো কোম্পানীর কেউ নই। আমি তো ডাক্তার, যার অসুখ হয় তার রোগ সারাই।

সত্যিই রোগ সারানো একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পবেলের। তামাক খেয়ে যদি কেউ কাশতো তো সাহেব একটা বড়ি বার করে দিত।

বলতো—খাও, বড়িটা খেয়ে নাও, কাশি বেমালুম সেরে যাবে।

শুধু কাশি নয়, মেয়েদের বাধক, সূতিকা, সে-সব রোগের অব্যর্থ দাওযাই দিত সাহেব। কুঠির সাহেবরাও নিশ্চিন্ত। রোগ-ভোগের জন্যে আর ইণ্ডিযান-কোয়াক্‌দের দরজায় ধর্না দিতে হবে না।

কলেট বললে—তুমি ওদের সঙ্গে মেশো বেল্, কিন্তু দেখো যেন ইংরেজদের ইজ্জৎ থাকে।

কিন্তু অনেক বই ঘেঁটেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে অমন অদ্ভুত চরিত্রের ইংরেজ আর একটাও খুঁজে পাইনি। চেহারা নয় তো যেন এ্যাপোলো। ফরসা টুক-টুক করছে গায়ের রং, তার ওপর গায়ে-গলায়-বুকে-পিঠে একটাও ঘামাচি নেই! এটা বড় দেখা যায় না।

—তোমার গায়ে ঘামাচি হয় না কেন, বেল্?

বেল্ বলতো—আমি যে রাত্তিরে গায়ে আমার হেকিমি দাওযাই মেখে শুই—

তারপর থেকে কুঠির সবাই হেকিমি-দাওযাই মেখে বিছানায় শুতে লাগলো। আর কারোর গায়ে ঘামাচি হয় না। বেশ তেল-তেলা গা হয়ে গেল সকলের। তেল মেখে শুলে বেঙ্গলের মশাও আর কামড়ায় না।

গাঁয়ের চাষা-ভুষো লোকেরাও ভিড় করতে লাগলো কুঠি বাড়িতে। এতদিন মশার উপদ্রবে সবাই ছট্-ফট্ করেছে। জ্বর-জারি হয়েছে।

সবাই বলে—আমাকেও একটু তেল দাও সাহেব, মশার তেল—

বলতে গেলে কাশিমবাজার গাঁ থেকেই রোগ-ভোগ সব দূর হয়ে গেল। সাহেব রোগ সারায়, দাওযাই দেয়, কিন্তু টাকা পয়সা নেয় না।

কিন্তু লোকগুলো তা বলে নেমকহারাম নয়। মিনি মাগনায় দাওযাই নিতে তাদের বাধে। তারা ওষুধের বদলে অন্য জিনিস ভেট দিয়ে যায়। কেউ আনে একজোড়া মুরগী, কেউ গাছের বেগুন, পুকুরের মাছ। কেউ নতুন গুড়ের পাটালি। কেউ আবার নতুন গামছা এনে দেয়। নিজের তাঁতের হাতে বোনা গামছা, তাঁতের ধুতি, মিহি পাতলা থান্।

ক্যাম্পবেল বললে—এ তো আজব দেশ ভাই, আমি লাহোর গেছি, দিল্লী গেছি, সব জায়গায় গেছি, কিন্তু বেঙ্গলের লোকদের মতো মাইডিয়ার মানুষ তো কোথাও দেখিনি

তারপর আবার বললে—ঠিক আছে ভাই, আমি এখানেই সেটেল করে গেলুম, এখান থেকে আর আমি নড়ছি না। এত ফুড, এত খাতির এমন ক্লাইমেট কোথাও নেই, এই-ই আমার হোম, এই আমার হোমল্যাণ্ড—লং লিভ্ বেঙ্গল—

কিন্তু যারা ইতিহাস পড়েছে তারাই জানে এ সুখের দিন কপালে বেশিদিন সহ্য হলো না ইংরেজদের। ইংরেজদের সহ্য হলো না, তার কারণ আলাদা। তার জন্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস দায়ী। কিন্তু ক্যাম্পবেলের কেন সহ্য হলো না, সেইটেই এ-উপন্যাসের কাহিনী।

আসলে 'গুলজারি বাঈ' যারা পড়বে, তাদের পক্ষে এই বেল্ সাহেবের চরিত্রটা বোঝা দরকার। যাদের পেছুটান বলে কিছু নেই, তারাই কেবল বিদেশ-বিভুঁইকে নিজের দেশ বলে মনে করে নিতে পারে।

আর নিজের দেশ না মনে করে নিতে পারলে কেউ ইংরেজ হয়ে খেজুর গাছে চড়ে বাঙালীদের মত খেজুর রস খেতে পারে?

আহা, বেল সাহেব খেজুর রস খেতে বড় ভালবাসতো।

সাহেব বলতো—যদি দেশে ফিরে যাই তো এই খেজুর গাছের একটা চারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ফ্রেণ্ডদের এই রস খাওয়াবো।

কত সব বন্ধু পাতিয়েছিল।

ইয়াসিন ছিল সাহেবের প্রাণের ইয়ার। ইয়াসিন খাঁ।

বলতো—ইয়াসিন, তুই আমার ডিয়ারেস্ট্ ফ্রেন্ড্ মাইরি, একটু খেজুর রস খাওয়া—

শেষকালে দুপুরবেলার খেজুর রসটাই বেশি পছন্দ করতো বেল্ সাহেব। সেই রসে একটু নেশার মত হয় বেশ। তার সঙ্গে একটু হেকিমি-দাওয়াই মিশিয়ে দিলে একেবারে ভড়কা।

কাশিমবাজার কুঠির সবাই সেই ভড়কা খাওয়া শুরু করে দিলে তারপর থেকে। ওদিকে ইংরেজদের কারবারও তখন রমরমা। সোরার কারবার, নুনের কারবার, তাঁতের কাপড়ের কারবার। কোম্পানীর আয় হচ্ছে খুব। প্রজারা এজেন্সির কমিশন হিসেবে মোটা-মোটা টাকা লুটছে।

সেই সঙ্গে বেলের নামও ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

রোগ কার না আছে। শুধু ডাক্তারেরই অভাব। আর যা-ও বা দু'চারজন আছে তারা হাতুড়ে গো-বদ্যি। তাদের দিয়ে কোনও রকমে কাজ চালানো যায়, কিন্তু রোগ তাড়ানো যায় না।

সেই সময়েই হঠাৎ নবাবের দরবার থেকে লোক এল কাশিমবাজার কুঠিতে।

—তুমি কে?

—আমি মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারের মীর মুন্সী। এখানে হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে এত্তেলা দিতে এসেছি।

—নবাব দরবারের খৎ আছে?

মীর মুন্সী জামার জেব্ থেকে সরকারী সীল-মোহর করা চিঠি বার করে দিলে।

কলেট সাহেব চিঠি পড়ে দেখলে তাতে লেখা আছে—হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেব বরাবরেষু -

মোদ্দা কথা তাতে এই লেখা ছিল যে, চেহেল-সুতুনে গুলজারি বাঈ-এর বেমার হইয়াছে।

হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে, তিনি যেন চেহেল-সুতুনে আসিয়া গুলজারি বাঈকে দেখিয়া দাওয়াই দিয়া যান। তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ তাঁহাকে তাঁর ন্যায্য স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক। ইতি...

ইয়াসিন খাঁ ক্যাম্পবেলের ইয়ার। খবরটা শুনে বললে—তোর ববাত ফিরে গেল ইয়ার—

ক্যাম্পবেল বললে—কেন?

ইয়াসিন বললে—অনেক মোহর পেয়ে যাবি, গুল্‌জারি বাঈ ভালো হযে গেলে ইনামও পাবি, চাই কি, নবাবের নজরে পড়ে গেলে সরকারি হেকিমি নোকরিও মিলে যেতে পারে। নবারের পেয়ারের দোস্ত হয়ে যাবি, তখন কি আর আমাদের ইয়াদ থাকবে?

ক্যাম্পবেল বললে—আবে দূর, মোহর পেলে নোকরি পেলে কি আমি শাহান্‌শা বাদশা হয়ে যাবো? আমার এই ভালো, এই তোদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াই আর ফূর্তি কবি—

কিন্তু ক্যাম্পবেল তো জানতো না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ভাগ্যের সঙ্গে জড়াবে বলেই সে দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এই এখানে এসে হাজির হয়েছিল। এই বেঙ্গলে।

বেঙ্গল তখন রাজনীতির ষড়যন্ত্রের হট্-বেড্ হয়ে আছে। এক কথায় বাঙলা ভাষায় যাকে বলে বারুদখানা।

শুধু একটা দেশলাই-কাঠির তোয়াক্কা।

একটা দেশলাই-কাঠি জ্বললেই সমস্ত বেঙ্গল ফেটে গুঁড়িয়ে চৌচির হয়ে যাবে।

তখনও খবরটা কানে যায়নি ক্যাম্পবেলের। সে মাঠ-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইয়াসিন তাকে নিয়ে বনে-জঙ্গলে গাছ-গাছড়া দেখিয়ে বেড়ায়। কোন্ গাছের পাতার কী গুণ, কোন্ গাছের শেকড়ের কী কার্যকারিতা তা সে চিনতে চেষ্টা করে। চিবিয়ে চিবিয়ে পরখ করে।

হঠাৎ সেদিন কুঠি-বাড়িতে এসে শুনলে খবরটা।

কলেট বললে—যাও, নবাব হারেমের ভেতরে গিয়ে বাঈ-সাহেবাকে দেখে এসো—

ক্যাম্পবেল বললে—কিন্তু বেগম-সাহেবারা কি আমার সামনে বেরোবে—?

কলেট বললে—না বেরোয় না বেরোবে, তোমার কী? তুমি মেডিসিন দিয়ে খালাস—

তা তাই-ই ঠিক হলো। ক্যাম্পবেল খবর পাঠিয়ে দিলে—সে যাবে—

চেহেল-সুতুন বড় অদ্ভুত জায়গা। কবে একদিন নবাব সুজাউদ্দীন এই প্রাসাদ তৈরি করে গিয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পরে। সে-কথা তখন লোকে ভুলে গিয়েছে। নবাব সুজাউদ্দীন গেছে, নবাব সরফরাজ খাঁ গেছে, নবাব আলিবর্দী খাঁও গেছে।

কিন্তু চেহেল-সুতুন তার গৌরব নিয়ে তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সকাল-সন্ধ্যেয় সেই প্রাসাদের মাথায় নহবৎ বাজে আর মুর্শিদাবাদের লোক বুঝতে পারে ক'টা বেজেছে। দূর থেকে যে-চাষা মাঠে-ক্ষেতে-খামারে কাজ করে সেও সন্ধ্যেবেলার নহবৎ শুনলে বুঝতে পারে এবার ঘরে ফিরতে হবে।

তারপর আর একবার বাজে রাত দশটার সময়।

তখন মুর্শিদাবাদের রাস্তায় লোকজন সব ঘরে ফিরে গেছে। চারদিক ফাঁকা। চক্-বাজারে যারা বেলফুল বিক্রি করে বেড়ায় তারাও তখন আর নেই।

যে-গণৎকারটা সন্ধ্যেবেলা মাটির ওপর ছক্ কেটে মানুষের ভাগ্য-গণনা করতে বসেছিল, সেও পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেছে।

তারই মধ্যে মাঝে-মাঝে হয়ত কোতোয়ালীর লোক পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এদিক-ওদিক। কোথাও কোনও চোর-ডাকাত কারো বাড়িতে সিঁধ কাটছে কিনা তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

আর তার সঙ্গে আছে চর। চরের উপদ্রব।

মুর্শিদাবাদের শহরের আনাচে-কানাচে চরদের উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে নবাব আলিবর্দীর আমলের পর থেকেই। চারদিকেই হুঁশিয়ারি জানানো হয়ে গেছে খুব সজাগ থেকো। টুপীওয়ালাদের চর আজকাল বড় ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে নবাব-দরবারের আমীর-ওমরাহ্‌দের বাড়ির ধারে-কাছে। তারা ইনাম দিতে আরম্ভ করেছে ওমরাহ্‌দের। তারা আশরফি ছড়াতে আরম্ভ করেছে সেখানে।

বিশেষ করে মহিমাপুরের দিকটাতেই বেশি নজর রাখে তারা। একটা তাঞ্জাম গেলেই হাঁক দেয়। চিৎকার করে বলে—কৌন্ হ্যায়?

ওধার থেকে তাঞ্জাম-ওয়ালাদের উত্তর আসে—জগৎশেঠজীর আওরৎ-বিবির—

বাস্, সঙ্গে সঙ্গে ছাড় হয়ে যায়। যাও।

সেদিন বিকেলবেলাই অমনি একটা তাঞ্জাম এসে থামলো চেহেল-সুতুনের সামনে।

পাহারাদার ফৌজী-সেপাই চেহেল-সুতুনের সামনে পাহারা দিচ্ছিল ঘোড়ার ওপর বসে। তাঞ্জামটা সিং-দরজায় আসতেই হাঁকলো—কৌন্ হ্যায়?

তাঞ্জামওয়ালা হাঁকলো—হেকিম ক্যাম্পবেল সাহাব—

—পাঞ্জা আছে?

—জী হুঁজুর!

তাঞ্জামওয়ালা পাঞ্জা বার করে দেখালে।

ফৌজী সেপাই সেখানা পরখ করে দেখে ছাড় করে দিলে।

—যাও!

আর সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেটখানা ফাঁক হয়ে গেল। তারপর তাঞ্জাম-ওয়ালারা হেকিম সাহাবকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

পশ্চিমের যে মেঘখানাকে প্রথমে তুচ্ছ মনে হয়েছিল সেখানা যে এমন করে সমস্ত ভারতবর্ষটা গ্রাস করে ফেলবে তা নবাব আলিবর্দী খাঁ আভাসে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন নাতিকে।

নাতি নবাব মীর্জা মহম্মদ।

নবাব বলেছিলেন—টুপীওয়ালারা বড় সর্বনেশে লোক, ওরা এখেনে একবার যখন কারবার করবার সনদ নিয়েছে তখন শুধু কারবার করে চুপ থাকবে না—

তিনি বুঝিয়েছিলেন—কারবার মানেই রাজ্য-অধিকার। দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে ভাল করে ব্যবসাও করা যায় না। ব্যবসা করতে গেলেও রাজ্যের ওপর রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা দরকার হয়ে পড়ে। সেই হস্তক্ষেপ ওরা করবে।

মা তখন পুরোদমে ইংরেজদের সঙ্গে কারবার আরম্ভ করে দিয়েছে, বেশ মোটা লাভ হচ্ছে সোনার ব্যবসায়। আমিনা বেগমের টাকা, আর ব্যবসা করে উমিচাঁদ। ইংরেজরা সোনা কেনে উমিচাঁদের কাছ থেকে। মোটা লাভ পায় নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উদ্দৌলার মা আমিনা বেগম।

কিন্তু নবাব আলিবর্দীর বিধবা বেগম তখন কোরাণ আর মসজিদ নিয়েই আছে।

মেয়ে ব্যবসা করে ইংরেজদের সঙ্গে সেটা পছন্দ হয় না নানীবেগমের।

বলে—কাজটা ভাল নয় রে, মীর্জা চায় না যে তুই ওই ইংরেজ-টুপীওয়ালাদের সঙ্গে লেন-দেন করিস—ও যা চায় না তা তুই করিস কেন?

কিন্তু মেয়ে শোনে না।

বলে—কিন্তু টাকা? টাকা না থাকলে কেউ আমাকে খাতির করবে?

—এত টাকা তোর কীসের দরকার শুনি? বিধবা মানুষ তুই, তোর টাকার দরকার কীসের? কত টাকা তোর চাই বল্ না, আমি দিচ্ছি—

—আমি তোমার টাকা নেব কেন বলো তো?

—তাহলে মীর্জার টাকা নে। মীর্জা তো তোর ছেলে। ছেলের টাকা নিতে তো তোর আপত্তি নেই!

আমিনা রেগে যেত। বলতো—ছেলে? ছেলের কথা বলছো? ছেলে কি আমার?

—ওমা, বলিস কী তুই? ছেলে তোর নয় তো কার?

—ও ছেলে তোমার। ছোটবেলা থেকে ওকে তো তুমি নিজের কাছে বেখে দিয়েছ, ও তোমার বাবার আদর পেয়ে পেয়ে তোমারই ছেলে হয়ে গিয়েছে। আমি শুধু নামে ওর মা—

নানীবেগম বলতো—এও আমার কপালে লেখা ছিল রে—

বলে আঁচলে চোখ মুছতো, নানীবেগম।

এ-সব চেহেল-সুতুনের ভেতরের কথা। এ কেউ জানতো না। বাইরের থেকে লোকে জানতো চেহেল-সুতুনের ভেতরে বেগমের রাশ। সেখানে শুধু মজা আর ফূর্তি। বাঁদীরা আছে, খোজারা আছে, সরাব, রূপ, রূপো আর জীবন-যৌবনের জোয়ার আছে। বাইরে থেকে লোকে বলতো—চেহেল-সুতুন ফূর্তির জায়গা। নবাব রাজ্য চালায় না, নবাব কিছু দেখে না। শুধু সুন্দরী-সুন্দরী বেগম নিয়ে তামাসা আর ফূর্তি করে।

তা কথাটা পুরোপুরি মিথ্যেও নয়।

ইংরেজ-কুঠিতেও সবাই তাই বলতো। বলতো—ইণ্ডিয়ার নবাবরা গোলাপ জলে চান করে, বেগমেরা দুধ দিয়ে গা পরিষ্কার করে। দুধে নাকি চামড়া নরম থাকে। ভেতরে যে-সব সুন্দরী থাকে তারা কখনও সূর্য দেখতে পায় না। সোনা-হীরে আর মুক্তো দিয়ে মোড়া তাদের গা। তারা যখন চলে তখন ময়ূরের মত নাচে। তাদের জন্যে যে-সব বাঁদী থাকে তারাও নাকি অপূর্ব সুন্দরী। তাদের সঙ্গেও বাইরের লোকে দেখা করতে পারে না। পুরুষ-মানুষ যদি কেউ ভেতরে যেতে পারে সে শুধু খোজারা, যাদের পৌরুষ বলে কিছু নেই।

কলেট সাহেবও তাই বুঝিয়ে দিয়েছিল ক্যাম্পবেলকে।

ক্যাম্পবেল জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে রোগীকে পরীক্ষা করবো কী করে?

কলেট বলেছিল—আড়াল থেকে—

—আড়াল থেকে কখনও রোগী দেখা যায়?

—দেখা না গেলেও দেখতে হবে। সেইটেই যে কানুন।

ক্যাম্পবেল বলেছিল—তাহলে আমার দ্বারা রুগী দেখা হবে না—

কলেট বলেছিল—না না—ও-কাজ কোর না, যাও, আমাদের হেড-কোয়ার্টাব থেকে অর্ডার এসেছে নবাবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে হবে। সেইজন্যেই তো তুমি যখন ইণ্ডিয়ানদেব সঙ্গে মেশো, আমি তোমাকে এন্‌কারেজ করি—

ক্যাম্পবেল বলেছিল—তাহলে কি স্পাইং করতে যাবো আমি?

কলেট বলেছিল—একরকম তাই—স্পাইং করবে দোষ কী? আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, ব্যবসার সুবিধের জন্যে দরকার হলে স্পাইংও করবে।—ওরা তো আমাদের পেছনে স্পাই লাগিয়েছে—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—ওই যে ইয়াসিন, তোমার ফ্রেণ্ড ও যে স্পাই নয় তা তোমায় কে বলল?

চম্‌কে উঠেছিল ক্যাম্পবেল কথাটা শুনে।

বলেছিল—না, না, ওটা বাজে কথা। ইয়াসিন কখনও স্পাই হতে পারে না—

কলেট বলেছিল—পলিটিক্স-এ সবই সম্ভব বেল্, সবই পসিব্‌ল্।

কথাটা শুনে ক্যাম্পবেলের মনে বড় ধাক্কা লেগেছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। ডাক্তারি করে লোকের রোগ সারিয়ে আনন্দ পায় ক্যাম্পবেল, তার মধ্যে এত মতলব থাকতে পারে, তা সে ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু সে-সম্বন্ধে ইয়াসিনকে কিছু বলেনি। চোদ্দ বছর বয়সে ইণ্ডিয়াতে এসেছিল সাহেব, তারপর অনেকদিন কেটে গেল, এখনও ইণ্ডিয়াকে ভাল করে চিনতেও পারলে না। কোথায় সেই লাহোর, কোথায় সেই দিল্লী, আর কোথায় এই কাশিমবাজার।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরে-ঘরে তখন রোশনাই জ্বলে উঠেছে চেহেল-সুতুনে। বেগমদের ঘরে ঘরে সাজ-গোজের ধুম পড়ে গেছে।

হঠাৎ খোজা-সর্দার পীরালির ডাকে চমকে উঠলো মুমতাজ।

বললে—কে? পীরালি?

—জী হাঁ, বেগম-সাহেবা!

—কী খবর?

—হেকিম সাহাব আসছে। তসরিফ ওঠাতে হবে!

তাড়াতাড়ি মুমতাজ পোষাকটা বদলে নিলে। বাইরেব লোক!

বাইরের লোক বড় একটা চেহেল-সুতুনে আসে না। এলে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সাহেব-হেকিম আসবার কথা ছিল কাশিমবাজার থেকে। তাহলে এসেছে সে? তাড়াতাড়ি পায়জামা, পেশোয়াজ আর জুতো পরে নিল মুমতাজ।

বললে—তুমি যাও পীরালি খাঁ, আমি এখনি আসছি—

পীরালি খাঁ খবরটা দিয়ে চলে গেল।

একটা মখ্‌মল-মোড়া ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো পীরালি খাঁ হেকিম-সাহেবকে।

ক্যাম্পবেল সাহেব চারদিক চেয়ে দেখলে। সারা রাস্তাটাই দেখতে দেখতে এসেছে। মনে

হয়েছে যেন দুনিয়ার বাইরে অন্য কোন দুনিয়াতে এসেছে সে। এরই তো নাম শুনেছে সে এত। এর কথাই তো কলেট বলে দিয়েছিল।

কোথা থেকে যেন গানের শব্দ আসছিল। গানের সঙ্গে তারের মিউজিক বাজছে। আরো দূর থেকে যেন নামাজ পড়ার শব্দ কানে এল।

কী করবে বুঝতে পারলে না ক্যাম্পবেল।

পীরালিকে বললে—কই, গুলজারি বাঈ কোথায়? কার বেমার হয়েছে?

পীরালি খাঁ বললে—একটু সবুর ধরুন হাকিম-সাহেব, আসছে গুলজারি বাঈ।

ওপাশ থেকে যেন একটা আওয়াজ হলো। ঘণ্টা বাজার মতন। সেই শব্দটা পেতেই পীরালি খাঁ মখ্‌মলের পর্দাটা টেনে দিলে। টানতেই ভেতরটা দেখা গেল। ভেতরে রূপোর খাঁচার মধ্যে একটা বেড়াল বসেছিল। সত্যিকারের সিলভার, পিওর।

আর তার ওপাশে নেটের পর্দা। পাত্‌লা জালি। সেখানে একজন মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বড় সুন্দরী মেয়েটা। খুব বিউটিফুল মনে হলো ক্যাম্পবেলের চোখে।

ওকেই দেখতে হবে নাকি? ওরই অসুখ হয়েছে? ওই মেয়েটার? ওরই নাম গুলজারি বাঈ?

পীরালি খাঁ রূপোর খাঁচার দরজা খুলে ভেতর থেকে বেড়ালটাকে কোলে করে বাইরে নিয়ে এসে ক্যাম্পবেলের সামনে রাখলো।

ক্যাম্পবেল অবাক হয়ে গেছে।

বললে—এ বিল্লি নিয়ে কী করবে খোজা-সর্দার?

পীরালি বলল—এর-ই তো বেমার হেকিম-সাহেব। এই-ই তো গুলজাবি বাঈ?

ক্যাম্পবেল সাহেব আকাশ থেকে যেন মাটিতে পড়ে গেল। এরই নাম গুলজারি বাঈ, এরই অসুখ করেছে? একে দেখতে এসেছে সে?

সাহেব পর্দার ওপারে চেয়ে দেখলে মেয়েটা তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করে—বেমার কার? এই বিল্লির?

—জী হাঁ।

এবাব উত্তর দিলে সেই মেয়েটা। বড় মিষ্টি গলার সুর।

বললে—গুলজারি বাঈ নানীবেগমের বড় পেয়ারের বিল্লি। ওকে আপনি কিছু দাওযাই দিয়ে দিন।

ক্যাম্পবেল বড় মুশকিলে পড়লো।

বললে—দেখুন বেগম-সাহেবা, আমি মানুষের রোগ দেখি, বেড়ালের হেকিমি তো করি না।

মুমতাজ বললে—মুর্শিদাবাদের অনেক হেকিম দেখে গেছে গুলজারিকে, কিন্তু কিছুতেই বেমার সারেনি। নানীবেগম বড় ভাবনায় পড়েছে, আপনি ওকে একটু ইলাইজ করে দিন মেহেরবানি করে—

সাহেব মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে এর?

—বেমার হয়েছে।

—কী বেমার? তক্‌লিফ্‌ কী হচ্ছে?

মুমতাজ বললে—কিছু খায় না আজ একমাস ধরে। কাবুলমুলুকের বিল্লি। নবাব আলীবর্দী খাঁ নানীবেগম সাহেবার জন্যে ওকে কাবুল-মুলুক থেকে আনিয়েছিলেন। বড় আয়েসী বিল্লি, খালি দুধ খায়, আর মেওয়া খায়—

বেড়ালটাব দিকে চেয়ে দেখলে সাহেব। বড় সুন্দর দেখতে। সোনালি-রূপোলি গায়ের রং। ছোট ছোট পা। বাদামী গোল-গোল চোখ। গায়ে পুরু লোম। লোমে সমস্ত মুখ প্রায় ঢেকে গেছে।

ক্যাম্পবেল বললে—ক'দিন ধরে এর এমন বেমার হয়েছে বেগম সাহেবা?

মুমতাজ মিষ্টি গলায় বললে—আমি বেগমসাহেবা নই হেকিমসাহাব, আমি নানীবেগমসাহেবার খেদমদ্‌গারনী।

অবাক হয়ে গেল সাহেব। বুঝতে পারলে না কথাটা।

জিজ্ঞেস করলে—তার মানে?

মুমতাজ এবার পীরালির দিকে ফিরলে।

বললে—পীরালি, তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তো।

পীরালি বললে—জী হাঁ—

বলে বাইরে চলে গেল মুমতাজ এবার পর্দাটা সরিয়ে সামনে এল।

সাহেব এবার মুখোমুখি চেয়ে দেখ্‌লে। সাহেব একটু সম্মান দেখাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

মুমতাজ বললে—তকলিফ করে দাঁড়ালেন কেন, বসুন। আমি বেগমসাহেবা নই।

—বেগমসাহেবা নন্‌ তো আপনি কী?

—আমি তো বললুম আপনাকে, আমি নানী বেগমসাহেবার খেদমদগারনী মুমতাজ।

সাহেব আরো হতবাক হয়ে গেল।

মুমতাজ বললে—এই গুলজারি বাঈ-এর খেদমদ্‌ করাই আমার কাজ। আমি দরবার থেকে তন্‌খা পাই এই কাজের জন্যে। আপনি আমার দিকে অমন করে চাইবেন না, গুলজারির দিকে চেয়ে দেখুন।

সাহেব এতক্ষণে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলে। বললে—আমাকে মাফ করবেন—

মুমতাজ বললে—কিছু মনে করবেন না হেকিম সাহেব, টোপিওয়ালাদের ওপর চেহেল-সুতুনের নবাবের বড় গোসা। আপনি কিছু বেয়াদপি করলে তাতে আপনারই লোকসান হবে। তাই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—

ক্যাম্পবেল অনেকদিন ইণ্ডিয়ায় এসেছে, অনেক লেডীর চিকিৎসা করেছে, কিন্তু এমন ব্যবহার কখনও পায়নি, আর এমন করে বেড়ালের চিকিৎসার জন্যেও কেউ কল দেয়নি।

—পীরালি খাঁ!

হঠাৎ মুমতাজ খোজা-সর্দারকে ডেকে বসলো।

পীরালি খাঁ আসবার আগেই মুমতাজ আবার জালি-পর্দার ভেতরে চলে গেছে।

—হেকিম সাহেবকে বল গুলজারিকে যেমন করে হোক ভালো করতেই হবে।

ক্যাম্পবেল বুঝতে পারলে। বললে—কিন্তু আমি তো ম্যাজিক জানি না ভেল্কিবাজি জানি না, ইলাইজ করতে চেষ্টা করবো—

—না হেকিম সাহেব, আমাদের গুলজারি বাঈ যদি না ভালো হয়ে যায় তো নানীবেগম বড় কষ্ট পাবেন। বড় পেয়ারের বিল্লি নানীবেগমসাহেবার।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলুন।

—এর জুড়ি আছে আপনাদের কাছে?

—জুড়ি মানে?

—জুড়ি মানে এর মরদ বেড়াল আছে?

মুমতাজ বললে—না। আলিভাঁহা ওই গুলজারিকে একলাই নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে জোড়া আনেনি।

—কিন্তু এখন এর জুড়ি একটা জোগাড় করতে হবে মুমতাজ বাঈ। যখন একে আনা হয়েছিল তখন এর বয়েস ছিল কম, এখন বড় হয়েছে, জুড়ি না হলে এর তবিয়ত খারাপ হবেই।

মুমতাজ বললে—কিন্তু তার কোনও দাওয়াই নেই?

—এ তো মেয়ে বেড়াল, মরদ-বেড়াল না হলে কী করে থাকবে? আপনি আপনার নানীবেগমসাহেবাকে সেই কথা বলে দেবেন!

—কিন্তু মরদ-বেড়াল এখন কোথায় পাবেন তিনি?

ক্যাম্পবেল বললে—বাঙলার মসনদের নবাবের গ্র্যাণ্ডমাদার যদি না জোগাড় করতে পারেন তো আমি কোত্থেকে জোগাড় করবো মুমতাজ বাঈ?

—আপনাদের ফিরিঙ্গি-কুঠিতে নেই?

ক্যাম্পবেল বললে—না।

—নানীবেগমসাহেবা দাম দেবে, যত দাম লাগে দেবে, আপনি জোগাড় করে দিন না?

—হেকিম-সাহাব!

হঠাৎ পীরালি সর্দার কথার মাঝখানে বাধা দিলে।

বললে—হেকিম-সাহাব, শহরকা মরদ-বিল্লী হলে চলবে?

—কোন্ শহর?

পীরালি বললে—মুর্শিদাবাদ শহর?

—দেশী বিল্লি?

মুমতাজ পর্দার আড়াল থেকে আবার বললে—দেশী বিল্লী আমাদের চেহেল-সুতনেব ভেতরেও আছে হেকিম-সাহাব, কিন্তু তাদের সঙ্গে জোড়-বাঁধতে দিই না আমি, নানীবেগমসাহেবাব বারণ আছে—

—তা না কবাই ভালো, ওরাও তো মানুষের মতো—

মুমতাজ বললে—আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন?

—আমি আর চেষ্টা করে কোথায পাবো! তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় চেষ্টা করবো।

আর দাওয়াই? দাওয়াই দেবেন না?

—আপনি যদি বলেন তো দাওযাই আনতে পাবি।

—কবে আনবেন?

—যেদিন তাঞ্জামেব ব্যবস্থা কবে দেবেন।

—তাহলে জুম্মাবারেই তাঞ্জাম পাঠাতে বলবো নানীবেগমসাহেবাকে।

তাই ঠিক বইল। ক্যাম্পবেল সাহেব সেদিনকার মত চলে এল চেহেল-সুতুন ছেড়ে। আবার বাইরে এসে তাঞ্জাম উঠলো। তারপর, ঘোড়াব পিঠে চড়ে সাহেব পৌঁছে গেল কাশিমবাজার কুঠিতে।

সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল ক্যাম্পবেলের জন্যে। কাশিমবাজার কুঠিতে সাহেবরা সেদিন আর কাজে বেরোযনি। কুঠির ছোট সাহেবেব যাবাব কথা কলকাতাতে। কলকাতার জরুরী ডেসপ্যাচ নিয়ে যাবাব শেষ দিন।

কলেট বললে—আব একটু দাঁড়াও স্মিথ, দেখি বেল্ ফিরে এসে কী বলে—

স্মিথ বললে—কিন্তু ডেস্‌প্যাচ নিয়ে যেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ফোর্ট উইলিযমের ক্যাপটেন বড় ঝামেলা করে দেরি হলে।

—তা হোক, ডিপ্লোমেটিক ব্যাপাবে শেষ-খবরটাও পাঠানো উচিত।

—পরের উইকে পাঠালে চলবে না?

কলেট বললে—ক্যাপটেন তখন বলবে ইম্‌পর্ট্যান্ট নিউজ কেন এত পরে পাঠালে। ক্যাপটেন যে আবার কোম্পানীর হেড্-অফিসে সেই রকম ডেসপ্যাচ্ পাঠাবে!

এই ডেস্‌প্যাচই হচ্ছে কোম্‌পানীর আসল কারবার। চারদিক থেকে রিপোর্ট এনে তার থেকে আসল পয়েন্ট নিয়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হয় ইংলণ্ডে, কোম্‌পানীর হেড-অফিসে। রিপোর্ট যেতে ছ'মাস, তার উত্তর আসতেও ছ'মাস। ততদিনে দেশের হাল-চাল মতি-গতি সব কিছু বদলে গেছে। সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে।

হঠাৎ এসে হাজির হলো ক্যাম্পবেল।

ঘোড়া থেকে নেমেই এল কুঠির দফতরে।

—কী হলো? কী খবর বেল্?

বেল্ বললে—আরে ফর নাথিং আমাকে এত ট্রাবল্ দিলে ওরা। কিছু হয়নি কারো—

—কিছু হয়নি মানে, ফিস দিয়েছে?

—হ্যাঁ, বলে পকেট থেকে একটা সোনার মোহর বার করে দেখালে।

বললে—মীর মুনসী সাহেব খাজাঞ্চীখানায় নিয়ে গিয়ে এটা দিলে। বললে, আবার ডেকে পাঠাবে। আবার যেতে হবে চেহেল-সুতুনে।

—কার অসুখ? কোন বেগমের?

—গুলজারি বাঈ-এর।

—নবাবের বেগম নাকি?

--আরে দূর, নবাবের বেগম হলে কি আব এক মোহর ফিস্ দেয়?

—তাহলে চেহেল-সুতুনের কোনও বাঁদীর?

—না, নবাবের গ্র্যাণ্ডমাদারের একটা ক্যাট্ আছে, বেড়াল।

—বেড়াল? ক্যাট্?

বেল্ বললে—হ্যাঁ, সেই বেড়ালটারই আদরের নাম গুলজারি বাঈ।

কলেট হতাশ হয়ে পড়ল। কলেট ভেবেছিল যখন ক্যাম্পবেলকে বেগমেব অসুখের জন্যে ডেকেছে, তখন বেগমের সঙ্গে দেখা করবাব জন্যে তাকে চেহেল-সুতুনের ভেতরে যেতেই হবে। হয়ত সেই সূত্রে নবাবেব সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আর নবাবের সঙ্গে যদি দেখা না-ও হয় তো নবাবের আমীর-ওমরাও কারো সঙ্গে দেখা হবে। দুটো কথা হবে এবং যদি কোনও খবর আনতে পাবে ক্যাম্পবেল তো সেটা ক্যাপটেনকে জানিয়ে দেবে।

স্মিথ তখনও দাঁড়িযেছিল।

কলেট বললে—তমি আর দাঁড়িয়ে আছো কেন, তুমি স্টার্ট করো, যাও—বেড়ালের খবর পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই ক্যাপটেনের কাছে।

সত্যিই, চেহেল-সুতুনের বেড়ালের অসুখেব খবর নিয়ে কারো শিরঃপীড়া থাকার কথাও নয়। শিবঃপীড়া যদি কারো থাকে, সে নানীবেগমসাহেবার। নানীবেগমসাহেবা এমনিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। আর কোনও কিছুতে তাঁর টান নেই। নাতি মীর্জার জন্যে প্রথম-প্রথম ভাবনা হতো। রগচটা মানুষ। হঠাৎ ঝোঁকের বশে কিছু করে ফেললে তখন সারা চেহেল-সুতুন নিয়েই টানাটানি পড়বে। বাইরে যেমন মীর্জার দুষমন রয়েছে, ভেতরেও তেমনি।

যখন সবাই যে-যার মহলে ফূর্তি করছে তখন নানীবেগমসাহেবার মনে অশান্তির ঝড বয়ে চলে।

একলা-একলাই কোরাণখানা খুলে পড়তে বসে।

কিন্তু তাতেও সব সময়ে মনটা বসে না। আস্তে আস্তে মহাল থেকে বেরোয়। তারপর টহল দিতে দিতে যায় নাতবৌয়ের ঘরে। সেখানে লুৎফা চুপচাপ শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। আলো জ্বলছে, আর বউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নানীবেগমসাহেবাকে দেখতে পায়নি সে। না দেখক, নানীবেগমসাহেবা আবার সেখান থেকে মেয়ের মহলের ঘরের দিকে যায়।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা!

খোজা সর্দার পীরালি খাঁ! নানীবেগমসাহেবা ফিরে দাঁড়ালো।

—কী খবর পীরালি? চারদিকের সব খয়রিয়াত্ তো?

—জী নানীবেগমসাহেবা, সব খয়রিয়াত্।

—গুলজারি বাঈ-এর তবিয়ত্ কেমন?

—পীরালি বললে—কাশিমবাজার কোঠি থেকে ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব এসেছিল, ইলাইজ করে গেছে।

—দাওয়াই দিয়ে গেছে?

পীরালি বললে—না, আগ্‌লে হপ্তায় আবার হেকিমজী আসবে বলেছে দাওয়াই নিয়ে।

—মুমতাজ কোথা?

—হুজুর বেমার-মহলে!

নানীবেগমসাহেবা যাচ্ছিল অন্যদিকে। কিন্তু মনে পড়তেই বেমারমহলের দিকে চলতে লাগলো।

—আচ্ছা, তুম যাও—

বেমার-মহলে বেমারীরাই থাকে। চেহেল-সুতুনে কারো অসুখ হলেই তাকে বেমার মহলে পাঠানো হয়। বেমার-মহলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে দেখবার জন্যে চেহেল-সুতুনের হেকিমকে পাঠানো হয়। তার জন্যে পাঞ্জা বেরোয় মীর মুনসীর দফ্‌তর থেকে হেকিম যদি ইলাইজ করতে না পারে তো তখন বৈদ্য আসে চক্-বাজার থেকে। চক্ বাজারে বৈদ্যজীদের আড্ডা। তারা বেমারির নাড়ি টেপে, রোগ ধরে। তারপর জবি-বুটি দেয়। তাতেও যদি না সারে, তখন আসে ফিরিঙ্গি হেকিম। কাশিমবাজার কুঠিতে ফিরিঙ্গিদের আড্ডা। তাই শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজারেই মীর মুনসীকে পাঠানো হয়েছিল ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেবের জন্যে।

নানীবেগমসাহেবা চেহেল-সুতুনের গলিপথ দিয়ে বেমার-মহলের দিকেই পা বাড়ালো।

এ এক অদ্ভুত দুনিয়া। এই চেহেল-সুতুন। কে কোথায় কখন যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে ঝগড়া করছে, সব দেখাশোনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু এককালে নিজে এই সমস্ত দেখাশোনা করেছে নানীবেগমসাহেবা, কিন্তু নবাব আলিবর্দী খাঁ মারা যাওয়ার পর যেন কীরকম হয়ে গেল সব! এখন আর কিছু দেখে না নানীবেগমসাহেবা। যেমন চলছে চলুক। এখন যে-ক'দিন আল্লার নাম করে চালিয়ে নেওয়া যায়।

—মুমতাজ!

নানীবেগমসাহেবার ডাক শুনেই মুমতাজ ঘরের মধ্যে সোজা হয়ে বসলো। বড় ক্লান্ত লাগছিল সাহেব চলে যাওয়ার পর থেকেই। কোথা কোন আমীর ঘরের ঘরণী ছিল মুমতাজ, আজ হতে হয়েছে চেহেল-সুতুনে নানীবেগমসাহেবার খেদ্‌মদ্‌গারনী।

আমীর সাহেব বড় পেয়ার করতো মুমতাজকে।

আমীর খুশ্রু ছিল আলিবর্দীর আমীর। কিন্তু আমীর খুশরু যখন ওড়িষ্যায় নবাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল তখন জখম হয়ে যায়। জোয়ান আমীর, আমীরের রিস্তাদাররা ঠকিয়ে নিয়েছিল বিধবার সম্পত্তি। সেই সময়ের নবাবের বেগম বিধবা মুমতাজকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে আসে।

আলিবর্দীর বেগমসাহেবা বলেছিল—তুমি এখানে থাকো বহেন, তোমার কোন ভয় নেই—
সুন্দরী মেয়েদের ভয় নেই এ-কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।
মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাও মহলে সুন্দরী মেয়েদের নাম নখের ডগায়। তারা খবর রাখে কার বাড়িতে কোথায় কোন্ কোণে একটা খুব্‌সুরত আওরত্ আছে।
আমীর খুশরুর বিধবা বেগমকে নিয়ে তখন তোলপাড় চলেছে মুর্শিদাবাদে। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দৌল্লার ইয়ার-বক্সীরা মতলব করতে শুরু করে।
সফিউল্লা সাহেব অনেকদিন ধরে তাগ্ করে বসেছিল।
উড়িষ্যা থেকে যখন খবরটা এল যে আমীর খুশরু মারা গেছে তখনই আনন্দের চোটে সমস্ত দিন ধরে মদ খেতে লাগলো।
আনন্দের চোটে বলে উঠলো—শোভানাল্লা—
মীর্জা মহম্মদ তখনও নবাব হয়নি। ইয়ার-বক্সী নিয়ে তখন চারদিকে হৈ-হল্লা করে বেড়ায়।
বড় ইয়ার মেশার মহম্মদ!
মেজ ইয়ার সফিউল্লা। সবচেয়ে ছোট ইয়ার, ইয়ার জান।
সফিউল্লা বললে—মুমতাজ বাঈকে আমি সাদি করবো ইয়ার—
মীর্জা মহম্মদ বললে—তা কর্।
সফিউল্লা বললে—করবো কী করে? নানীবেগম যে তাকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে গিয়ে তুলেছে।
মীর্জা বললে—একটু সবুর কর—দেখি আমি কী বন্দোবস্ত করতে পারি।
কিন্তু সফিউল্লা [illegible]তো মীর্জা মহম্মদকে বিশ্বাস নেই। সুন্দরী আওরাত্ যদি একবার চেহেল-সুতুনে গিয়ে ওঠেতো [illegible]র্জার নজরে পড়বেই। আর একবার মীর্জার নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই।
নানীবেগমসাহেবাও তা জানতো।
মুমতাজকে ডেকে নানীবেগম বললে—তোমার কেউ আপনজন আছে? কোনও রিস্তাদার?
মুমতাজ বললে—নেই।
—তা কেউ যদি তোর না থাকবে তো এত রূপ নিয়ে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিলি কেন?
এ-কথার উত্তরে মুমতাজ আর কী বলবে?
নানীবেগম অনেক করে তাকে লুকিয়ে রাখতো প্রথম-প্রথম। নিজের কাছে কাছে নিয়ে শুতো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। একলা ছাড়তো না চেহেল-সুতুনের মধ্যে।
খোজা সর্দারকে ডেকে বলে দিয়েছিল—মুমতাজকে খুব চোখে চোখে রাখবে পীরালি—
—জী বেগমসাহেবা!
নানীবেগম আরো বলে দিয়েছিল—বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তো তার কাছে কাছে থাকবে, যেন মুমতাজ বাঈ-এর কাছে ঘেঁষতে না পারে।
পীরালি খাঁ বললে—জী!
পীরালির সব কথাতেই ওই একই উত্তর—জী!
তখনও কোনও কাজ দেয়নি নানীবেগম। সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যেত। কোরাণ পড়ে শোনাতে বলতো।
জিজ্ঞেস করতো—তোর এ-সব কাজ ভালো লাগে তো?
মুমতাজ বলতো—হ্যাঁ, বেগমসাহেবা—
—ভালো না লাগলে আমাকে বলবি।
তারপর বলতো—একলা-একলা থাকতে তোর খুব খারাপ লাগছে, না রে?
মুমতাজ বলতো—না বেগমসাহেবা।

—না রে, খারাপ তো লাগবেই। যার আদমী মারা যায় তার মনে কি সুখ থাকে রে? সুখ থাকে না।

এমনি কত করে বোঝাতো নানীবেগম।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—তুই সাদি করবি মুমতাজ?

মুমতাজ চোখ নিচু করে ফেলেছিল—সে-কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

ননীবেগম আবার জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি বল তুই, সাদি করবি?

মুমতাজ বলেছিল—না—

—লজ্জা করিসনি আমার সামনে। যদি তোর কাউকে পছন্দ হয়ে থাকে তো বল, আমি তাকে চেহেল-সুতুনে আনিয়ে মোল্লা ডাকিয়ে সাদি দিয়ে দেব—

মুমতাজ বলেছিল—না বেগমসাহেবা, আমি সাদি করবো না।

শেষে একদিন মীর্জাই কথাটা তুললো।

বললে—নানীজী, তোমাকে একটা কথা বলবো?

নানীজী বলল—কী বল্ না?

—সফিউল্লা মুমতাজকে বিয়ে করতে চায়।

—কে সফিউল্লা?

মীর্জা বললে—আমার ইয়াব।

—তোর ইয়ার আমার মুমতাজকে দেখলে কী করে?

—দেখেছে নানীজী। যখন আমীর শ্বশুর সাহেব বেঁচে ছিল তখনই দেখেছে, দেখে দিল্ বিগড়ে গেছে। কিন্তু এখন তোমাব মেহেববাণী!

সে-সব অনেকদিন আগের কথা। সে-সব দিনেব কথা হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল মুমতাজের।

নানীবেগম একদিন এসে জিজ্ঞেস করলে—মুমতাজ, তুই সাদি কববি?

মুমতাজ বললে—আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছি নানীজী!

—ওরে, মেযেরা কি মুখ ফুটে বিযের কথা বলতে পারে?

মুমতাজ বললে—কেন ও-কথা বলছো তুমি নানীজী। আমি সাদি কববো না।

—সাদি না করে জীবন-ভোর এই চেহেল-সুতুনে পড়ে থাকবি নাকি?

—তা পড়ে থাকলে দোষ কী?

নানীবেগম বললে—কিন্তু চিরকাল তো আমি থাকবো না রে—

মুমতাজ বললে—তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকবো নানীজী, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—

নানীজী মুমতাজের মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে আদব কবতে লাগলো।

বললে—ওরে, তা নয় বেটি, তা নয়, আমারও তো একদিন শেষ হবে! চিরকাল তো দুনিয়ায় কেউ বাঁচতে আসে নি। আমি মরে গেলে তোর কী হবে সেটা একবার ভেবেছিস?

মুমতাজ তখন নানীজীব কোলের ভেতবে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। চোখ তাব জলে ভরে গেছে।

বললে—তুমি না থাকলে আমিও থাকবো না নানীজী—আমাবও বেঁচে দবকার নেই—

নানীজী বলতো—দূর্, দুনিযাদাবিব তুই কিছুই বুঝিস না বে বেটি, দুনিযাদারি আলাদা চিজ্। সেখানে কেউ তোকে খাতির খেদমত্ কববে না। দুনিয়া তার পাওনা-গণ্ডা কডায-গণ্ডিতে উশুল কবে নেবে। সে কেউ আটকাতে পারবে না—দিল্লীর বাদশাই বলে দুনিযাদাবিব হাত থেকে রেহাই পার্যনি, আব তুই তো কোন্ ছার!

মুমতাজ নানীবেগমের কথাগুলো বসে বসে তখন কেবল শুনতো আব আড়ালে লুকিযে লুকিয়ে কাঁদতো।

মনে হতো এই নানীবেগমের আশ্রয়ের বাইরে গেলেই তাকে সবাই ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। মনে হতো যেন সবাই তাকে গ্রাস করবে, সবাই যেন গিলে ফেলবে।

মাঝে মাঝে চেহেল-সুতুনের মধ্যে ভীষণ ভয় পেত মুমতাজ। কী যেন এক অজানা ভয়। মনে হতো এখানে সবাই তার শত্রু। আরো কত বেগম রয়েছে চেহেল-সুতুনে। পেশমন বেগম, মরিয়ম বেগম, গুলসন বেগম, বব্বু বেগম।

একদিন পেশমন বেগম ধরেছিল তাকে।

জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে ভাই? নতুন এসেছ?

মুমতাজ বললে—না।

—তোমার নাম কী?

—মুমতাজ বাঈ?

—তোমার দেশ কোথায়?

মুমতাজ বললে—মুর্শিদাবাদ।

—মুর্শিদাবাদ?

পেশমন বেগম অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল—মুর্শিদাবাদ থেকে কেন তুমি ভাই মরতে এলে এখানে? কে নিয়ে এল? নবাবের আড়কাটি?

মুমতাজ বললে—না, নানীবেগমসাহেবা আমাকে নিয়ে এসেছে—

—নানীবেগমসাহেবা? নানীবেগমসাহেবা কী করে তোমার তালাশ পেলে? কী মতলব?

মুমতাজ বললে—আমার আদমী আমীর খুশরু।

—তুমি আমীর খুশরু সাহেবের বিবি? তা এখানে এলে কেন ভাই?

সবারই ওই এক প্রশ্ন। সবাই যেন মন-মরা হয়ে থাকতো চেহেল-সুতুনের ভেতরে। সরাব ছিল, আরক ছিল, বাঁদী খোজা সব ছিল, তবু যেন কারো মন ভরতো না।

তবু সন্ধ্যে হবার পরেই যেন অন্য চেহারা হয়ে যেত চেহেল সুতুনের। বাইরে নহবৎখানা থেকে নহবৎ বাজতে শুরু করতো আর ভেতরে তখন আতর-ওড়নী-জেবর-সরাবের বন্যা বয়ে যেত। মহলে মহলে রোশনাই জ্বলে উঠতো। ধুপ-ধুনো-গুলগুলের গন্ধে ভরে উঠতো বেগম-মহল। গানের সুর ভেসে আসতো, নাচের ছন্দে।

যারা আরো অনেক বুড়ি হয়ে গেছে, তারা গড়গড়ায় শুয়ে শুয়ে তামাক খেত। নবাব সুজাউদ্দীনের আমলের বেগম সব। এককালে রূপসী ছিল, খুবসুরত ছিল। এককালে রূপের জুলুস দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল নবাব-আমীর-ওমরাওদের।

তখনও নেশা ছাড়তে পারেনি অনেকে। বুড়ি হয়ে গেছে, মুখের মাংস ঝুলে গেছে, বাতের দাওয়াই নিয়ে চলা-ফেরা করে, ভালো করে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না তখন। কিন্তু নেশা ছাড়েনি, বাঁদীরা শিয়রে বসে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আর খোজারা রূপোর গড়গড়ার ওপর ঘন ঘন কলকে বদলে দিয়ে যায়।

একটু কানে শব্দ এলেই সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করে।

বলে—কে যায়? কৌন্?

মুমতাজ ভয়ে ভয়ে বলে—আমি।

—আমি কে? তুমরা নাম কেয়া? কাঁহাসে তুম আতি হো?

তারপরে যখন সব শোনে তখন বলে—কেঁও আয়ি বেটি? ইধার কেঁও আয়ি?

সকলেরই এক কথা। জীবনে যে একদিন কত আরাম করেছে, কত ফূর্তি করেছে, কত মেহ্‌ফিল উড়িয়েছে, সে-সব কাহিনী যেন তখন দুঃস্বপ্নের মতো তাদের জর্জরিত করে দেয়।

—না বেটি, তুই আর ওদিকে যাস্‌নে! তুই আমার গুলজারি বাঈকে দেখ, গুলজারির খেদমত্ কর। একটা তবু কাজ হবে তোর।

নানীবেগমের বড় পেয়ারের বিল্লি।

গুলজারি বাঈ এককালে সৌখীন বেড়াল ছিল চেহেল-সুতুনে। এককালে তার জন্যে দিল্লি থেকে দামী আতর আসতো। নবাব আলিবর্দী যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন খাবার আগে গুলজারি বাঈকে ডাকিয়ে আনতো।

যেন একটা পশমের গোলা। সোনালী-সবুজ-রূপালী পশমের ডেলা একটা। নবাব খানা খেত। আর পাশে বসে থাকতো গুলজারি।

নবাব কথা বলতো গুলজারির সঙ্গে।

একপাশে বসতো বেগমসাহেবা আর একপাশে গুলজারি বাঈ।

নবাব গুলজারিকে জিজ্ঞেস করতো—এত গোসা কেন রে গুলজারি? কার ওপর গোসা?

নানীবেগম বলতো—ও আলি জা'হার ওপব গোসা করেছে।

নবাব হাসতো। বলতো—কেন, আমি আবার কী কসুর করলাম?

—বা রে! তুমি যে ওর সঙ্গে দিনভর কথা বলোনি!

—ও, তাই বটে!

কিন্তু গুলজারি একটা অবলা বেড়াল। ও কী করে বুঝবে নবাবি চালানো কী খতরনাক কাজ! ও কী করে বুঝবে দুনিয়াদারি কী জিনিস! চারদিকে দুষমন নিয়ে যে নবাব খাওয়ার সময় পান সেইটেই খোদাব মেহেববানি। আর শত্রু কি শুধু বাইরের? শত্রু ঘরের ভেতরেও যে আড়ালে লুকিয়ে আছে।

তারপব কতদিন কেটে গেছে। সে নবাবও নেই, সে চেহেল সুতুনও নেই। সেই নানীবেগমও আর সে-নানীবেগম নেই। এখন সব বদলে গেছে। বাইরের ঠাট্ ঠিক তেমনি আছে। তেমনি করেই সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয় সদর দরওয়াজার মাথায় নহবৎ বাজায় সরকারি নহবতিয়া। ভেতরে পীরালি খোজা-সর্দ্দার তেমনি করেই খোজার দলকে নিয়ে পাহারা দেয়। কিন্তু মীর্জা মহম্মদ নবাব হওয়ার পরই তার ভেতরের চেহারা বদলে গিয়েছে।

মুমতাজ সেটা বুঝতে পারে।

নানীবেগমের মুখের চেহারাখানা দেখলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

অনেকদিন রাত্রে নানীবেগমসাহেবার মহলে গিয়ে দেখেছে তার বাঁদী জুবেদা দরজাব সামনে মেঝের ওপর পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর নানীবেগমসাহেবা তখন আলোর সামনে বসে মুখ নিচু করে কোরাণ পড়ছে।

আস্তে আস্তে মুমতাজ আবার নিজের মহলের দিকে ফিরে আসে। এসে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দেয়।

কিন্তু মুশ্‌কিল বাধলো গুলজারি বাঈ-এর বেমার হয়ে।

একদিন সোজা গিয়ে হাজির হলো নানীবেগমের কাছে!

—কী রে বেটি? কি হয়েছে?

মুমতাজ বললে—গুলজারি বাঈ-এর বেমার হয়েছে নানীজী!

—কই দেখি?

নানীবেগমসাহেবা উঠলো। গুলজারি বাঈ-এর মহালের দিকে যেতে যেতে বললে—কী হয়েছে?

মুমতাজ পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

বললে—কিছু খাচ্ছে না নানীজী, দুধ খাচ্ছে না, গোস্ ভি খাচ্ছে না—

—মেওয়া? শুখা মেওয়া?

মুমতাজ বললে—তাও খাচ্ছে না, আমি সব রকম কোশিস্ করেছি—

—চল্ দেখি!

গুলজারি বাঈ-এর মহালে রূপোর খাঁচার ভেতরে তখন চুপ করে ঝিমোচ্ছিল গুলজারি।

নানীবেগম কাছে গিয়ে ডাকলে—গুলজারি—

গুলজারি চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় তুলে একটু চাইলে।

নানীবেগম গুলজারিকে কোলে তুলে নিলে।

—কেয়া হুয়া তুম্‌রা গুলজারি? কেয়া তখ্‌লিফ্‌?

অনেকক্ষণ ধরে অনেক আদর অনেক খাতির করলে নানীবেগম। কিন্তু গুলজারির মন গললো না তবু। আবার গুলজারিকে রেখে দিলে খাঁচার ভেতর।

তারপর খোজা সর্দার পীরালিকে ডেকে বললে—মীর মুনশীকে খবর দে, হেকিম-সাহেবকে এত্তেলা দেবে। এসে যেন গুলজারিকে ইলাইজ করে।

বলে নানীবেগম আবার নিজের মহালের দিকে চলে গেল।

এরপর হেকিম-সাহেব এসেছে, মুর্শিদাবাদ চক্‌-বাজার থেকে কাফের বৈদ্‌জী এসেছে, মোটা টাকা নিয়ে গেছে মীর মুনশীর কাছ থেকে। দাওয়াইও দিয়েছে। কিন্তু গুলজারির অসুখ সারেনি। আরো গম্ভীর হয়ে গেছে গুলজারি বাঈ। আরো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

শেষকালে কাশিমবাজার কুঠি থেকে এল ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব।

নানীবেগমসাহেবা এসে ডাকলে, মুমতাজ—

—কী নানীজী!

—ফিরিঙ্গি হেকিম এসেছিল?

—হ্যাঁ, নানীজী।

—দাওয়াই দিয়েছে?

মুমতাজ বললে—দাওয়াই পাঠিয়ে দেবে বল?

—কী বললে দেখে ফিরিঙ্গি হেকিম?

কী বলবে মুমতাজ, বুঝতে পারলে না।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করলে—সারবে? বেমার ভালো হবে?

মুমতাজ বললে—হ্যাঁ, নানানীজী। সাহেব বলে গেল এর একটা জোড়া চাই—

—কীসের জোড়া?

—একটা মরদ বিল্লি আনতে হবে।

নানীবেগম বললে—মরদ বিল্লি তো চেহেল-সুতুনে অনেক আছে। মুর্শিদাবাদ সহরেও আছে। মতি-ঝিলেও আছে।

মুমতাজ বললে—তাতে চলবে নানানীজী! হেকিম-সাহেব বলেছে খাস-কাবুলের জাত্‌-বিল্লি আনতে হবে।

—সে কে আনবে?

—বললে—তা জানি না নানীজী!

নানীবেগমও বুঝতে পারলে না সে বেড়াল কোথা থেকে আসবে। কে আনবে। দিল্লির ভকীল-সাহেবকে খবর দিলে হয়ত কাবুল থেকে আনিয়ে দিতে পারে।

ভাবতে ভাবতে নানীবেগম আবার তার নিজের মহালের দিকে চলে গেল।

কিন্তু ক্যাম্পবেল সাহেব আসার পর থেকেই আবার যেন সব ভালো লাগতে লাগলো মুমতাজের। আবার যেন চেহেল-সুতুনের সব কিছু অন্যরকম চেহারা নিলে। মনে হলো সাহেব আর একবার এলে যেন ভালো হয়।

নানীবেগমসাহেবার কাছে গিয়ে ভাবলে বলবে। নানীবেগমসাহেবার মহলে পর্যন্ত গেল।

নানীবেগম জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কিছু বলবি?

মুমতাজের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েও বেরোল না যেন।

—গুলজারি কেমন আছে রে আজ?

মুমতাজ বললে—ভালো নেই নানীজী।

নানীবেগম বললে—তুই মন খারাপ করিস নি। আমি আর গুলজারির কথা অত ভাবতে পারি নে। আমার নিজের কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই! আমি কতজনের কথা ভাববো? মীর্জার কথা ভাববো না ঘসেটির কথা ভাববো?

সত্যিই তো, তিন মেয়ে, তিন মেয়েই যেন শত্রু হয়ে উঠেছে আজ। সবাই মীর্জার দুষমন হয়ে উঠেছে। মীর্জার নিজের মা-ও যেন ছেলের নবাব হওয়া সহ্য করতে পারছে না।

—নানীজী।

—কী রে, আবার কিছু বলবি?

আচ্ছা নানীজী, ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে আর একবার ডেকে পাঠাবে?

তা ডাক্ না। পীরালিকে বল্ মীর মুনশীকে খবর দেবে!

কথাটা বলেই যেন বড় লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে পড়লো মুমতাজ! যেন আবার চোখাচোখি হয়ে গেল ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে। চোখের সামনেই যেন ভেসে উঠলো চোখ দুটো। যেন সাহেব তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার সর্বাঙ্গ দেখছে।

—নানীজী!

নানীবেগম এবার অবাক হয়ে গেছে। কোরাণ ছেড়ে কাছে এল। চিবুকটা ধরে মুখটা উঁচু করে দেখলে।

বললে—কি হয়েছে রে তোর? তোরও বেমার হলো নাকি? চোখমুখ এত লাল কেন রে?

মুমতাজ নানীবেগমের বুকের ওপর নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে। মনের যত কথা ছিল সব যেন কান্না হয়ে উজাড় করে দিলে নানীসাহেবার বুকের ওপর।

—তোরও বুখার?

কপালে হাত দিয়ে দেখলে মুমতাজের গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে।

তুইও আবার বোখার বাধিয়ে বসলি? তাহলে আমার গুলজারিকে কে দেখবে?

মুমতাজ নানীবেগমের বুকে মুখ গুঁজেই বললে—আমার বুখার হয়নি নানীজী, বুখার হয়নি।

—হয়নি বলছিস কেন? এই তো আমি দেখছি হয়েছে!

তারপর মুমতাজকে ধরে বেমার-মহলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে—তুইও আমাকে শেষ পর্যন্ত জ্বালালি? আমাকে কি কেউ একটু শান্তি দেবে না? নিজের মেয়ে-জামাই-নাতি তুই সবাই মিলে আমাকে জ্বালাবি?

চলতে চলতে বেমার-মহলে গিয়ে একটা ঘরের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে মুমতাজকে।

তারপর পীরালি খাঁকে ডেকে বললে—চেহেল-সুতুনের হেকিমসাহেবকে ডেকে নিয়ে আয় তো—

—জী বেগমসাহেবা! বলে পীরালি খাঁ চলেই যাচ্ছিল।

কিন্তু মুমতাজ বললে—না নানীজী, তোমার পায়ে পড়ি হেকিম-সাহেবকে ডাকতে হবে না।

নানীবেগম রেগে গিয়ে বললে—হেকিম-সাহেবকে ডাকতে হবে না তো তোর অসুখ সারবে কী করে?

—না নানীজী, তুমি সেই ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেবকে ডাকাও। কাশিমবাজার কুঠির—সে ভালো হেকিম, আমার রোগ ধরতে পারবে!

নানীবেগম অবাক হয়ে গেল। বললে—কী করে বুঝলি?

—আমি জানি নানীজী, ওরা ফিরিঙ্গিরা বেশি জানে!

—ঠিক আছে, তাহলে তাই ডাকাই। বলে পীরালি খাঁকে বললে—তুই মীর মুনশিকে খবর দে, সেই কাশিমবাজার কুঠি থেকে ফিরিঙ্গি হেকিমকে ডেকে আনবে।

পীরালি খাঁ হুকুম পেয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

সে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো দু'জনের মধ্যে। একজন সুদূর কোন্ এক দ্বীপ থেকে ভবঘুরের মত একদিন বেরিয়ে পড়েছিল নিরুদ্দেশে পাড়ির উদ্দেশে, তারপর সে অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এটা বাঙলাদেশে এসে আটকে পড়লো।

আবার ডাক পড়ে চেহেল-সুতুন থেকে, আবার সাহেব এসে হাজির হয় তাঞ্জামে। চেহেল-সুতুনের সবাই জেনে গেছে। সাহেবও জেনে গেছে, মুমতাজও জেনে গেছে।

সাহেব এলেই মুমতাজ বেমার মহলের মধ্যে উঠে বসে।

সাহেব জিজ্ঞেস করে—কেমন আছো তুমি? হাউ আর ইউ?

অনেকদিন এসে সেই প্রথম দিনের আড়ষ্টতা কেটে গেছে দু'জনেরই।

মুমতাজ বলে—আমার কথা কাউকে তুমি বলো নি তো সাহেব?

ক্যাম্পবেল্ তখন বুঝে নিয়েছে যে চেহেল-সুতুনের কথা বাইরের কাউকে বলতে নেই। তবু বললে—কাকে আবার বলবো?

মুমতাজ বলে—সেবার যে বললে কাকে তুমি বলে দিয়েছিলে?

—সে তো ইয়াসিন, আমার বন্ধু।

মুমতাজ বললে—কী বলেছিলে?

—বলেছিলুম তুমি খুব বিউটিফুল!

—বিউটিফুল মানে?

সাহেব একটা একটা করে ইংরিজী কথা শিখিয়ে দিয়েছিল।

বললে—বিউটিফুল মানে জানো না? বিউটিফুল মানে সুন্দর খুবসরত।

—তুমি আমার চেয়ে কিন্তু আরো সুন্দর! আরো খুবসুরত!

দু'জনেই হাসে।

ইয়াসিন প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করেছিল—কী রকম দেখতে?

—খুব বিউটিফুল!

—তোকে কেন ডেকেছিল? বেড়ালের রোগ তুই সারাতে পারবি বলেছিস?

—বলেছিলুম পারবো।

—কী করে সারাবি! বেড়ালের রোগের ওষুধ জানিস?

কাশিমবাজার কুঠির সাহেবরাও বলেছিল—তুমি যে বলে এলে রোগ সারিয়ে দেবে, তা সারাতে পারবে তো বল?

ক্যাম্পবেলের নিজেরও সন্দেহ ছিল সারাতে পারবে কি না। না পারে না পারবে। রোগ যদি নাও সারে দেখতে তো পাবে মুমতাজকে!

প্রথম দিন মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে গিয়েই খানিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর একা একা কোথায় বেরিয়ে গেল টের পেল না কেউ।

ইয়াসিন এসেছে দেখা করতে।

কলেট জিজ্ঞেস করলে—কী নিউজ ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললে—খবর তো সাহেবের কাছে। সাহেব কোথায়? সাহেব আসেনি?

কলেট বললে—এসেছে।

—তাহলে গেল কোথায়?

—এই তো এখানে ছিল এতক্ষণ। নবাবের সেরেস্তা থেকে একটা মোহর ফিস্ পেয়েছে। খুব আহ্লাদ।

—আর কী হলো সেখানে? কার অসুখ?

কলেট বললে—একটা বেড়ালের!

—বেড়ালের অসুখের জন্যে সাহেবকে ডাকা? তাহলে গুলজারি বাঈ কে?

কলেট বললে—লেট নবাবের বেগমের ক্যাট্। সেই ক্যাটের নাম গুলজারি বাঈ। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। তোমরাও তো কেউ জানতে না। আমি হোম-ডেস্প্যাচে তাই লিখে দিয়েছি।

—তা সাহেব গেল কোথায়? জিজ্ঞেস করলে ইয়াসিন।

কেউ জানে না কোথায় গেল। সেদিন সাহেবকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি। সাবাদিন গঙ্গার ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে কেবল!

ইয়াসিন পরের দিনও এল। সেদিনও জিজ্ঞেস করলে—বেল্ সাহেব কোথায়?

কলেট বললে—সে এখন খুব ব্যস্ত।

কেন, বেল্-সাহেবকে তো কখনও ব্যস্ত দেখিনি! কিসের এত রাজ-কার্য তার?

কলেট বললে—সে বেড়াল খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা—

—বেড়াল? বিল্লি?

কলেট বললে—হ্যাঁ, একটা মদ্দা বেড়াল।

ইয়াসিন বললে—সে তো হাটে-মাঠে-বাজারে ছড়ানো আছে কাশিমবাজারে। ক'টা চাই?

কলেট বললে—হারেমের খেয়াল যখন হয়েছে তখন তা চাই-ই। আর যে-সে ক্যাট নয়, একেবারে কাবুল-ক্যাট্—

তা সত্যিই সে ক'দিন খবই খঁজছে। মাঝখানে কলকাতাতেও গিয়েছিল। উমিচাঁদের বাড়িতেও গিয়েছিল একদিন।

উমিচাঁদ সাহেবকে দেখে অবাক। বললে—কী হলো সাহেব, আবার ফিরলে যে? কাশিমবাজার ভালো লাগলো না?

ক্যাম্পবেল্ বললে—আমি একটা কাজে এসেছি মিস্টার উমিচাঁদ, আমাকে হেলপ্ করতে হবে, পারবে?

—কী হেলপ্, বলো?

—একটা মদ্দা কাবুলি বেড়াল জোগাড় করে দিতে পারো?

—সে কী, বেড়াল কী করবে?

—আমার জন্যে নয়, চেহেল-সুতুনের হারেমের বেগমের জন্যে!

উমিচাঁদ বললে—আমি আনিয়ে দিতে পারি। আমার এজেন্ট আছে সেখানে। কিন্তু সে তো আসতে দেরি হবে।

—কত দেরি?

—তা তিন মাসের আগে নয়।

—অত দেরী করলে চলবে না, আমার আরো তাড়াতাড়ি চাই।

উমিচাঁদের কেমন সন্দেহ হলো। বললে—তোমার এত কিসের তাড়া সাহেব?
ক্যাম্পবেল্ বললে—আমি যে রোগী দেখছি—
—রোগী কে? কোন্ বেগম?
—বেগম নয় গুলজারি বাঈ!
—নানীবেগমের বিল্লি? তাই বলো! সেইজন্যেই তোমার এত তাড়া! আমি তাড়াতাড়ি আনিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। কত টাকা দেবে?
ক্যাম্পবেল্ বললে—টাকা আমি দেব না, নানীবেগমসাহেবাই দেবে কত লাগবে বলো তুমি?
—একশো আশরফি!
—তা তাই-ই দিতে বলবো নবাবের তো টাকার অভাব নেই।
—তাহলে কথা দিচ্ছ ঠিক?
—টাকা কি আগে দিতে হবে?
উমিচাঁদ বললে—আগে দিলেই ভালো হয়। কারবারি লোক আমরা, টাকা আগে দিলে কাজের সুবিধে হয়।
—ঠিক আছে, আমি আগাম টাকাই চাইবো নানীবেগমের কাছে।
বলে সেইদিনই কলকাতা থেকে আবার কাশিমবাজার কুঠিতে ফিরে এল সাহেব। এবার খুশী খুশী ভাব।
কলেট চেহারা দেখে অবাক।
জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, ক্যাট্ পেয়েছ?
—পেয়েছি। উমিচাঁদ সাহেব জোগাড় করে এনে দেবে বলেছে।
কলেট বললে—উমিচাঁদের পাল্লায় পড়েছ তো, তাহলেই হয়েছে। লোকটা ডিস্অনেস্ট্, কত টাকা চেয়েছে?
—একশো গিনি। তা আমার কী? টাকা তো আমি পকেট থেকে দেব না, টাকা দেবে যার বেড়াল সে। নানীবেগমসাহেবার কি টাকার অভাব?
সেদিন ওই পর্যন্তই।

কিন্তু হঠাৎ মীর মুনশী আবার ডাকতে এল। আবার তলব হয়েছে চেহেল-সুতুনে।
—কী হলো মীর মুনশী? গুলজারি বাঈ কেমন আছে?
—আবার তলব হয়েছে, আর একবার যেতে হবে আপনাকে।
—তা ভালোই হলো। আবার সেই তাঞ্জাম, আবার সেই পাঞ্জা।
বেমার-মহলে ঢুকেই কিন্তু অবাক হয়ে গেল ক্যাম্পবেল্।
—মুমতাজ সেদিন হাসলো একটু।
সাহেব জিজ্ঞেস করলে—হাসছো কেন? অসুখ নয়?
—অসুখ না হলে কি তোমাকে মিছিমিছি ডেকেছি সাহেব।
—কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না শরীর খারাপ।
পর্দার আড়ালে বসেই কথা হচ্ছিল।

সাহেব বললে—হাতটা বাড়িয়ে দাও তো, দেখি—

মুমতাজ তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে জালি-পর্দার বাইরে। সাহেব নিজের হাত দিয়ে ধরলে তার হাতটা। বড় নরম ঠেকলো সাহেবের কাছে। মাখনের মত নরম আর সাদা হাত তার।

সাহেব বললে—এতক্ষণ ধরে হাতটা চেপে ধরে রইল।

মুমতাজ বললে—এতক্ষণ ধরে কী দেখছো?

সাহেব বললে—তোমার তো কিছু হয়নি!

—সত্যি আমার অসুখ হয়েছে, বিশ্বাস করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সাহেব বললে—ও-কথা বোল না আমাকে, বলতে নেই।

—কেন তোমার ভয় করছে?

সাহেব বললে—আমি তো ইণ্ডিয়ান নই, আমাকে ও-কথা বোল না। কেউ শুনতে পেলে তোমার ক্ষতি হবে!

—কেউ যাতে শুনতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি।

—কি ব্যবস্থা?

—চেহেল-সুতুনে যে আমাদের খোজা সর্দার পীরালি খাঁ আছে তাকে রিশবত দিয়েছি।

—কেন মিছিমিছি ঘুষ দিতে গেলে? তোমার টাকা নষ্ট হলো!

মুমতাজ বললে—আমার কি টাকার অভাব সাহেব? আমার অনেক টাকা আছে। আমার স্বামীর অনেক টাকা ছিল, সে সব আমি সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি, লাখ-লাখ টাকা। সে কেউ জানে না!

—তোমার যদি অত টাকা তো এই চেহেল-সুতুনে এলে কেন?

—ওই টাকার ভয়ে।

—শুধু টাকার ভয়?

মুমতাজ বললে—কিছু মনে কোর না সাহেব, টাকার ভয় তো ছিলই, আমার রূপেরও ভয় ছিল। আমি ইচ্ছে করলে আমার এই রূপ দিয়ে এই চেহেল-সুতুনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারতুম। আমার স্বামী থাকলে আমার কোন ভয় ছিল না, কিন্তু এখন যে আমি বিধবা।

সাহেব বললে—কিন্তু এখন কি ইচ্ছে করলেই এই চেহেল-সুতুন থেকে বেরোতে পারবে?

মুমতাজ বললে—না, এখন আর উপায় নেই।

তারপর একটু থেমে বললে—সেই জন্যেই তো তোমায় ডেকেছি সাহেব। তুমি আমাকে বাঁচাও—

সাহেব ভয় পেয়ে গেল। চারিদিকে অসহায়ের মত চাইতে লাগলো।

মুমতাজ বললে—তোমার কোনও ভয় নেই, এখানে কেউ আসবে না, আমি টাকা কবুল করে খোজাদের সরিয়ে দিয়েছি—সর্দার-খোজা বেমার মহলের খিড়কীতে পাহারা দিচ্ছে—

সাহেব বললে—তুমি আমাকে আর লোভ দেখিও না মুমতাজ, আমি রাস্তার লোক, আমার টাকা-পয়সা-চাকরি কিছুই নেই। আমি কাশিমবাজার কুঠির সাহেবদের দয়ায় খেতে পাই।

—কিন্তু তুমি তো হেকিম, তুমি তো হেকিমি করো, ওদের দাওয়াই দাও।

সাহেব বললে—আমি হেকিম, কিন্তু টাকা তো নিই না কারো কাছ থেকে—আমি ইণ্ডিয়াতে এসেই হেকেমি শিখেছি, তাই টাকা নিতে লজ্জা করে।

—তোমার টাকার দরকার?

সাহেব হাসলো। বললে—আমার বন্ধু আছে কলেট, সে-ই আমাকে খাওয়ায়, পরায়—আমার টাকার দরকার নেই।

মুমতাজ বললে—এক কাজ করবে?

—কী কাজ?

মুমতাজ বললে—আমি আর এখানে থাকবো না। এখান থেকে চলে যাবো—

—কেন?

—আমার আর ভালো লাগছে না এখানে থাকতে!

সাহেব অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু গুলজারি বাঈ? তার জন্যে যে আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছি—

—কী ব্যবস্থা করেছ?

—উমিচাঁদকে বলে কাবুল থেকে একটা জুড়ি আনতে বলে দিয়েছি!

মুমতাজ বললে—কে তোমাকে তা করতে বললে?

—তুমি তো বলেছিলে, মনে নেই?

মুমতাজ বললে—কই, আমার কিছু মনে পড়ছে না। আমি সব ভুলে গেছি।

সাহেব বললে—তুমি ভুলে যেতে পারো, আমি কী করে ভুলবো? আমি এখান থেকে যাওয়ার পর থেকেই তো গুলজারি বাঈ-এর ব্যাপার নিয়ে ভাবছি—

—আশ্চর্য!

মুমতাজ বললে—সত্যিই আশ্চর্য—

—কেন, আশ্চর্য কেন?

মুমতাজ বললে—আশ্চর্য নয়? আমি একটা জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ পড়ে রইলুম, আর তুমি কিনা একটা বিল্লিকে নিয়ে ভেবে অস্থির?

সাহেব বললে—তোমার কথাও তো ভেবেছি। যখনই গুলজারি বাঈ-এর কথা ভেবেছি তখনই তোমার কথা মনে পড়েছে—

—কেন, গুলজারি বাঈ এর কথা ভাবলে আমার কথা মনে পড়তো কেন?

সাহেব হাসলো। বললে—আমার মুখ থেকেই কথাটা শুনতে চাও?

মুমতাজ বললে—এখানে তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না, বলো না। আমি তো পীরালি খাঁকেও এখানে আসতে বারণ করে দিয়েছি। বেমার-মহলে এখন কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি।

—কেন, গুলজারি বাঈ-এর তো অসুখ, সে-ও তো আছে!

—ওর কথা ছেড়ে দাও, ও কি মানুষ?

সাহেব বললে—মানুষকেই তুমি বুঝি ভয় করো?

মুমতাজ বললে—মানুষই আমার শত্রু, তা জানো? আমি বিধবা হবার পর মুর্শিদাবাদের মানুষই আমাকে সবচেয়ে বেশি জ্বালিয়েছে। বিশেষ করে যারা বড়লোক।

—কে? তারা কারা?

মুমতাজ বললে—নবাবের ইয়ারবক্সীর দল, সফিউল্লা খাঁ, মহম্মদ নেশার, ওরা—সেদিন চেহেল-সুতুনে না এলে আমি তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতুম না। আমি জানতুম যে একবার এখানে এলে আর বেরোন যায় না, তবু অন্য কোনও উপায় না পেয়ে এখানে এসেছি।

—এখন তো আর তারা তোমার নাগাল পায় না?

মুমতাজ বললে—এখনও সফিউল্লা সাহেব হাল ছাড়ে নি।

—সে কী?

—হ্যাঁ, সফিউল্লা সাহেব মনে করে আমি তো বেওয়ারিশ মাল, না-ঘাটকা—না-ঘরকা, আমার ওপর এখনও তাই তার এক্তিয়ার আছে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি কী করবে?

—সেইজন্যেই তো বলছি সাহেব, আমায় তুমি বাঁচাও। আমার বেমার হোক আর না হোক, আমার কাছে মাঝে মাঝে তুমি এসো, আমি নানীবেগমসাহেবাকে বলে মীর মুনশীকে দিয়ে তোমার কাছে পাঞ্জা পাঠাবো।

হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ হলো পর্দার ওপাশে।
কে?
মুমতাজ ভয় পেয়ে গেছে। ওখানে কে?
—মুমতাজ?
গলা শুনেই মুমতাজ চমকে উঠেছে। বললে—তুমি যাও সাহেব, আমি তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো মীর মুনশিকে দিয়ে।
সাহেব সেদিনও চলে এল চেহেল-সুতুনের বাইরে।

ঘটনাটা এমন করেই গড়াচ্ছিল। কিন্তু আর এগোল না। হঠাৎ কলকাতায় কোম্পানীর দপ্তর থেকে খবর এল ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বেঁধে গেছে ইউরোপে।
কলেট সেদিন সোজা চলে গেল কলকাতায়। যাবার আগে ডাকল ক্যাম্পবেলকে।
বললে—তুমি কলকাতায় যাবে বেল?
—কেন, আমি কলকাতায় গিয়ে কী করব?
কলেট বললে—দেখ বেল, আগে আমাদের একটা এনিমি ছিল, একজনের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল, এবার দু'টো ফ্রনট হয়ে গেল আমাদের—ড্রেক বড় ভাবনায় পড়েছে, ওদিকে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন বলে একজন আসছে, আর সঙ্গে আছেন ক্লাইভ—
—ক্লাইভ? সে আবার কে?
—ম্যাড্রাসের কুঠির লোক। ম্যাড্রাসের সেট ফোর্ট ডেভিড কন্‌কার করবার পর তার খুব নাম-ডাক হয়েছে।
সত্যিই কলেটের মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছিল ক্যাম্পবেল তার খুব ভয় হয়েছে। ফ্রেঞ্চরা মুর্শিদাবাদের নবাবের ফ্রেণ্ড, তারা যদি চেষ্টা করে তো ফিরিঙ্গিদের হটিয়ে দিতে পারে কলকাতা থেকে।
—যাবে না?
—আমি ভাই যেতে পারবো না।
—কেন কাশিমবাজারে তোমার কী?
—জায়গাটা আমার ভালো লেগে গেছে।
—কেন, কাশিমবাজারে ভাল লাগবার কী আছে?
সে-কথার উত্তর না দিয়ে ক্যাম্পবেল বললে—এখানে অনেক ডাক্তারি ওষুধ আছে, অত পলিটিক্স নেই কলকাতার মতন। কলকাতায় কেবল কে কার সর্বনাশ করবে তারই ষড়যন্ত্র চলছে দিনরাত।
তারপর হঠাৎ বললে—একটা কাজ করতে পারবে কলকাতায় গিয়ে?
কী?
—মিস্টার উমিচাঁদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে?
কলেট বললে—দেখা হবেই, সে-ই তো এই সব কনসপিরেসি চালাচ্ছে। সে নবাবেরও ফ্রেণ্ড আবার আমাদেরও ফ্রেণ্ড। সে নবাবের সব মুভমেণ্ট আমাদের জানাচ্ছে।
—তাহলে এক কাজ কোর, তাকে বলে দিও সেই কাবুলি-ক্যাট আর দরকার হবে না।
—কেন? গুলজারি বাঈ ভালো হয়ে গেছে?
—না, ভালো হয়ে যায় নি, কিন্তু তার আর দরকার নেই!
—দরকার নেই কেন? সেদিন যে চেহেল-সুতুনে গেলে? সে কাকে দেখতে—
—[illegible] গুলজারি বাঈ নয়, মুমতাজ বেগমকে দেখতে।
—মু[illegible] বেগম? সে আবার কে?

—সে গুলজারি বাঈয়ের কেয়ার-টেকার!
—কী অসুখ তার?
—অসুখ নয়। অসুখের নাম করে সে আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠায়।
—তার মানে?
—তুমি কাউকে বোল না কলেট, সে আমাকে ভালবাসে—সি লাভস মি—
—হোয়াট ডু ইউ মীন? চমকে উঠেছে কলেট।
—ইয়েস, আই মীন হোয়াট আই সে—
—আর তুমি? তুমিও তাকে ভালবাস নাকি?
—ইয়েস আই ডু—
কলেট চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, কিন্তু কথাটা শুনেই আবার বসে পড়লো।
বললে—সত্যি?
—হ্যাঁ, সত্যি—
কলেট বললে—তুমি খুব অন্যায় করেছ বেল। ইট ইজ অ্যান অফেন্স, এ ক্রাইম। তুমি ইউরোপীয়ান, আর সে একজন ইণ্ডিয়ান। শুধু তাই নয়, সে নবাবের প্রপার্টি। তাকে নিয়ে ইলোপ করলে তোমারই শুধু ফাঁসি হবে তাই নয়, আমাদের কোম্পানীরও ক্ষতি হবে—কোম্পানীকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।
ক্যাম্পবেল চুপ করে রইল।
—আমি রিকোয়েস্ট্ করছি তুমি আর চেহেল-সুতুনে যেও না। ডোণ্ট্ গো দেয়ার।
ক্যাম্পবেল্ মাথা নিচু করে রইল।
—আর, যদি তুমি যেতে চাও তাহলে আমার এখানে আর তোমার থাকা চলবে না। কোম্পানী যদি জানতে পারে তো তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলবে, আমি হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে এখানে রাখতে পারবো না!
ক্যাম্পবেল তখনও মাথা নিচু করে রয়েছে।
কলেট বললে—কী হলো, যাবে? উত্তর দাও—
ক্যাম্পবেল কিছুই উত্তর দিলো না। তখনও ঠিক তেমনি করে চুপ করে রইল।
কলেট সেই দিনই চলে গেল কলকাতায়।

কলেট নেই, কেউ নেই, সমস্ত কুঠি-বাড়িটা সেদিন বড় ফাঁকা মনে হলো ক্যাম্পবেলের কাছে। কাশিমবাজারের আকাশে সেদিনও অনেক তারা উঠলো, অনেক ভাবনা পাখা মেলে আকাশে উড়তে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বড় সুন্দর হয়ে উঠলো ক্যাম্পবেলের চোখের সামনে।
—সাহেব, সাহেব—ইয়াসিনের গলা। ইয়াসিনের সঙ্গে আর তখন কথা বলতে ইচ্ছা হলো না সাহেবের। ডাকুক, সে সাড়া দেবে না আর। অনেক দিনের সঙ্গী ইয়াসিন। অনেক আড্ডার শরিক সে।
কুঠির দরোয়ান বললে—কে?
ইয়াসিন জিজ্ঞেস করলে—সাহেব আছে, বেল সাহেব?
দারোয়ান বললে—সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছে—
—এত সকালে শুয়ে পড়েছে?
—জী হাঁ।
—আর কলেট সাহেব?
—কলেট সাহেব কলকাতায় চলে গেছে—
ইয়াসিন অগত্যা ফিরে গেল। সাহেবের কানে সব কথা পৌঁছুল। কিন্তু তবু উঠলো না, তবু

নড়লো না বিছানা থেকে। মনে হলো সবাই মিলে যেন মুমতাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করেছে। সবাই তার শত্রু, তারও শত্রু।

কিন্তু ইয়াসিন অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সাড়া না পেয়ে রাত্রে চলে গেল নিজের বাড়িতে।

বাড়িতে গিয়েও ঘুম হলো না তার। আবার বেরোল।

মেমুদকে ডাকলে। বললে—দেখ, আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি, কাল ফিরবো।

মেমুদ বললে—ঠিক আছে হুজুর—

রাত্রের মুর্শিদাবাদ। কোতোয়াল হুকুম দিয়ে দিয়েছে সহরে কড়া পাহারা দিতে হবে। দিন-কাল ভাল নয়। যে কোনও মুহূর্তে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলা করতে রওনা হতে পারে নবাব।

রাস্তায় যে যায় তাকে খাড়া করে দেয়। জিজ্ঞেস করে—কে?

তারপর নামধাম কুলুজী জেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়। সন্দেহ হলেই রাতটার মত কোতোয়ালিতে আটক করে রাখে। বড় হুঁশিয়ার হয়ে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা মুলুক। সে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এখানে নবাব কমবয়েসী বলে তোমরা ওঁৎ পেতে আছো কখন মসনদ কেড়ে নেবে, কখন নবাবকে খুন করে মতিঝিল দখল করবে।

কিন্তু চারদিকে ফিরিঙ্গিদের চরও ঘুরছে, তারাও ওঁৎ পেতে আছে সব জায়গায়। কেউ হেকিম সেজে, কেউ ফকির সেজে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—সফিউল্লা সাহেব?

সফিউল্লা সাহেব এমনিতেই বাড়ি থাকে না। বাড়ি থাকলে চলেও না সফিউল্লা সাহেবের। নবাবের দিন কাল খারাপ চলেছে এখন। ইয়ার বক্সীদের পাশে থাকা চাই। মেহেদী নেশার, সফিউল্লা, ইয়ার জান ওরাই হলো তার দিন রাত্রির সঙ্গী! মতিঝিলের দরবারে যতক্ষণ না নবাব ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তার পাশে থাকতে হয়।

তারপর যদি বাড়ির কথা মনে পড়ে তো তখন বাড়ি আসে। নইলে বাড়ি আসার দরকারও হয় না তাদের কারো।

সেদিনও অনেক রাত্রে বাড়ি এসেছিলো সফিউল্লা সাহেব। হঠাৎ মনে হলো বাইরে কে যেন ডাকলে।

—কে?

জানালা দিয়ে সাড়া দিলো সফিউল্লা সাহেব।

—আমি সাহেব, আমি ইয়াসিন, ইয়াসিন খাঁ—

—কৌন ইয়াসিন? কাঁহাকা ইয়াসিন?

—কাশিমবাজারের ইয়াসিন খাঁ মহম্মদ!

—কী খবর? এত রাত্তিরে?

—খোদাবন্দের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসেছে গরীব। একটা জরুরী কথা ছিল। জরুরী কথা শুনেই ঘুম ছুটে গেল সফিউল্লা সাহেবের। জরুরী খবর একটা পেলে নবাবকে তা দিয়ে খুশী করা যায়। যত ষড়যন্ত্রের খবর চারদিক থেকে আসছে সব মীর্জার শোনা চাই।

তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দরওয়াজা খুলে দিয়ে বাইরে এল সফিউল্লা সাহেব। বললে—এসো, দুনিয়ার হাল-চাল বাতাও—

—হাল-চাল বড়ি খারাপ জনাব। সব বরবাদ করে দিতে চায় ফিরিঙ্গি কোম্পানী।

—কী রকম? বোস বোস, আয়েস করে বোস। কুঠিওয়ালা সাহেব কোথায়?

ইয়াসিন ততক্ষণে আয়েস করে চৌকির ওপর বসেছে।

বললে—সেই খবর বলতেই তো এসেছি জনাব। ভাবলাম রাতে-রাতে আসাই ভালো। চারিদিকে যেমন ফিরিঙ্গিদের চর ঘুরছে দিন রাত, কেউ আবার দেখে ফেলতে পারে।

—বলো, কী খবর? জবর খবর তো?

ইয়াসিন বললে—কুঠিওয়ালা কলেট সাহেব কলকাতায় গেছে—

—কেন?

—মনে হচ্ছে উমিচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ফিরিঙ্গিরা শায়েদ মুর্শিদাবাদে হামলা করতে পারে।

সফিউল্লা বললে—কী যে বেওকুফের মত কথা বলো তুমি ইয়াসিন। চন্দননগরে ফ্রেঞ্চরা আছে কী করতে? ফ্রেঞ্চরা তো নবাবের দোস্ত।

—তা জানি জনাব, লেকিন কলেট সাহেব কাশিমবাজারে নেই!

সফিউল্লাও ভাবতে লাগলো কলকাতায় চলে যাওয়ার পেছনে কলেট সাহেবের কী মতলব থাকতে পারে।

ইয়াসিন বললে—আর একটা খবর হুজুর, ক্যাম্পবেল সাহেবকে মনে পড়ে?

খুব মনে পড়ে—বললে সফিউল্লা। সেই শালা হেকিমটা?

—জী হাঁ জনাব।

তারপর একটু থেমে বললে—জনাবের সব ইয়াদ আছে দেখছি। আর আমীর খুশরুর বিধবা বেগমকে ইয়াদ আছে? সেই মুমতাজ বেগম?

—খুব মনে আছে ইয়ার। মনে আবার নেই?

—সেই তারই খবর বলছি। ক্যাম্পবেল সাহেব তো হেকিমি করতে গিয়েছিল চেহেল-সুতুনে। জানেন তো? সে খবর তো আপনাকে বলেছি।

—হ্যাঁ সে তো নানীবেগমসাহেবার বিল্লি গুলজারি বাঈ-এর বেমারের জন্যে।

ইয়াসিন বললে—নেহি হুজুর, বেমারের বাত পুরো ধাপ্পা।

—ধাপ্পা?

—জী হাঁ জনাব। আসলি বাত হচ্ছে মুমতাজ বাঈ। তাকে সাহেব পেয়ার করতে আরম্ভ করেছে। সাহেবের দিল বিগড়ে গেছে তার জন্যে।

—কৌন কহা তুমকো?

—কলেট সাহেব।

—সাচ বাত?

—জী হাঁ জনাব, একদম আসলি সাচ বাত।

সফিউল্লা সাহেব কথাটা শুনে কী যেন ভাবলে আপন মনে। তারপর গাড়ির ভেতর গেল। সেখান থেকে যখন ফিরলো তখন তার হাতে এক মুঠো মোহর।

ইয়াসিনের দিকে মোহরগুলো এগিয়ে দিয়ে বললে—এগুলো নাও, পিছে ঔর মিলেগা। আরো জবর খবর দিয়ে যেও, আমার আরো খবর চাই—

ইয়াসিন মোহরগুলো নিজের কুর্তার পকেটে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—তকলিফ, মাফ করবেন জনাব, জরুরী খবর বলেই এত রাতে জনাবের ঘুম ভাঙিয়ে তকলিফ দিলুম।

তারপর আর দাঁড়ালো না সেখানে। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় পড়ে টাকাগুলো পকেট থেকে বার করলে। গুণতে লাগলো এক-এক করে। কত দিলে জনাব।—এক-দো-তিন-চার.....

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আবার যথারীতি ডাক পেয়ে ক্যাম্পবেল এসেছে চেহেল-সুতুনে।

মুমতাজের তখনও বেমার সারেনি। বেমার হলেই সুবিধে বেশি। বেমার হলেই ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেবকে ঘন ঘন ডাকা যায়। বেমার-মহলে ^কলেই একটু নিরিবিলি কথা বলা যায় হেকিম সাহেবের সঙ্গে—

সেদিন সব ঠিক-ঠাক বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। অনেক মোহর, অনেক জেবর, অনেক সোনা চাঁদি একটা পুঁটলিতে বেঁধে কাছে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সাহেব এলেই তার হাতে সব তাকে দিয়ে দেবে।

ক্যাম্পবেল কিন্তু এর জন্যে তৈরি ছিল না।

বললে—এ সব কী হবে?

মুমতাজ বললে—তোমার টাকা-কড়ি নেই বলছিলে, তাই তোমাকে দিলাম। আমাদের সংসার চালাতে তো অনেক টাকা খরচ হবে—

—আমাদের সংসার মানে?

মুমতাজ হাসলো।

বললে—বারে, তুমি সত্যিই একটি বোকা। যখন তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে তখন সংসার করতে টাকা খরচ হবে না?

—তুমি আমাকে সাদি করবে?

—এত কথার পর তুমি এই কথা বলছো? সাদি না করে কি তোমার রাখেল হয়ে থাকবো? আমি যে তোমার বিবি হতে চাই।

ক্যাম্পবেল সাহেব এবার ভয় পেয়ে গেল। বললে— কিন্তু এ যে অনেক টাকা।

মুমতাজ বললে—অনেক টাকা না হলে তুমি দেশে ফিরে যাবে কী করে? জাহাজ-ভাড়ার টাকা লাগবে না? বাকি টাকা দিয়ে তুমি একটা জাহাজ কিনবে।

—জাহাজ কিনে কী করবো?

তারপরের কথা ভাবতেও যেন ভয় করছিল ক্যাম্পবেলের। মুমতাজের সামনে বসেই থর থর করে কাঁপতে লাগলো সে। এ ব্যাপার যে ঘটবে তা তো কল্পনাও করে নি সে।

মুমতাজ বললে—তুমি তোমার জাহাজ নিয়ে ডাকাতি করবে সেই জাহাজে। পারবে না? হজযাত্রীর জাহাজ আটক করতে পারবে না?

—তুমি বলছো কী?

মুমতাজ এবার উঠে বসলো। আর যেন তার লজ্জা-সরমের বালাই রইলো না। বললে—তুমি যদি আপত্তি করো আমি এই চেহেল-সুতনের মধ্যেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হবো!

ভয় পেয়ে ক্যাম্পবেল একটু পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করলে।

—বলো, টাকা নেবে তুমি?

একেবারে দুহাতে সাহেবের হাতটা চেপে ধরেছে মুমতাজ। —বলো, কথা বলো, উত্তর দাও।

—আমাকে দুদিন ভাবতে দাও তুমি, দুটো দিন একটু সবুর করো! আমাব বন্ধু কলেটকে জিজ্ঞেস করি, আর এক বন্ধু আছে ইয়াসিন, তাকেও জিজ্ঞেস করতে হবে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

—খবরদার! বলে মুমতাজ সাহেবের মুখটা চেপে ধরলে।

—তোমার কি কিচ্ছু বুদ্ধি নেই? এসব কথা কি কাউকে বলতে আছে? এসব ব্যাপারে কি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়? চেহেল-সুতুনের খবর কি বাইরের কাউকে দিতে আছে? তাতে যে তুমিও খুন হয়ে যাবে, আমাকেও ওরা খুন করে ফেলবে।

—কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে সময় দেবে তো!

—ভাববার যে আর সময় নেই।

—দুটো দিন, দু'দিনের মধ্যেই আমি তোমায় জানিয়ে দেব।

—কিন্তু তুমি জানো না, আমি কী বিপদে পড়েছি—

—কী বিপদ?

মুমতাজ বললে—সফিউল্লা খাঁ খবর পেয়ে গেছে—

—কীসের খবর? কে সফিউল্লা খাঁ?

—নবাবের দোস্ত, খবর পেয়েছে যে আমি হজ করতে যাবার চেষ্টা করছি, নানীবেগমসাহেবাকে বলেছি, তিনিও রাজী হয়েছেন।

ক্যাম্পবেল বড়ো মুশকিলে পড়লো। বললে—কিন্তু আমি যে জাহাজ কিনবো, জাহাজের যে আমি কিছুই জানি না।

—তুমি ফিরিঙ্গি, তার ওপর পুরুষ মানুষ, তুমি একটা জাহাজও কিনতে পারবে না?

—আমি যে কখনো জাহাজ কিনিনি, জাহাজে চড়ে হিন্দুস্থানে এসেছি শুধু—আর ডাকাতি কী করে করবো তাও বুঝতে পারছি না।

—তা হোক তুমি এগুলো নাও, এ তোমাকে নিতেই হবে।

—আর দুটো দিনও সময় দেবে না?

—দুটো দিন সময় দিলে টাকাগুলো সব সফিউল্লা খাঁ খেয়ে ফেলবে—আমি তার ভয়েই বেমার-মহলে পড়ে আছি অসুখের ভান করে।

—তাহলে ঠিক আছে, তুমি দিচ্ছ তাই নিচ্ছি—বলে পুঁটলিটা নিলে নিজের কাছে।

মুমতাজ বললে—আমি খোজা সর্দার পীরালি খাঁকে দিয়ে খবর দেব কবে আমি হজে যাচ্ছি, কোন তারিখে জাহাজ মুর্শিদাবাদ থেকে ছাড়ছে—

তুমি একলা হজে যাবে?

মুমতাজ বললে—না, নানীবেগমসাহেবাকেও রাজি করিয়েছি, নানীজীও সঙ্গে যাবে।

—ঠিক আছে, আজ তাহলে আমি উঠি—

—তোমাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না সাহেব, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে আর পারছি না। তাহলে তোমাকে আমি খবর দেব, বুঝলে? তুমি ওই টাকা নিয়ে একটা জাহাজ কিনে ফেলবার চেষ্টা করো। ও আমার নিজের টাকা, এ টাকা তুমি তোমার টাকা বলেই মনে করো। বলে সাহেবের সঙ্গে বেমার-মহলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

সাহেব পেছন ফিরে বলল—সেলাম আলাইকুম—

মুমতাজ হাসলো। বড় করুণ সে হাসি। কিন্তু সেলাম করতে ভুলে গেল সে।

তাঞ্জামটা দাঁড়িয়েছিল। সাহেবকে নিয়ে আবার চলতে লাগলো চেহেল-সুতুনকে পেরিয়ে বাইরের দিকে।

বাঙলা-মুলুকের সে এক বড় দুর্দিন। মুর্শিদাবাদের মানুষ অস্থির হয়ে দিন কাটায়। এক- একদিন এক-এক রকম গুজব রটে। এক-একদিন রটে ফিরিঙ্গিরা মুর্শিদাবাদে হামলা করতে আসছে। আবার এক-একদিন রটে যায়—নবাব কলকাতায় যাচ্ছে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে—

ভয়ে-ভয়ে কাটে দিন, ভয়ে-ভয়ে কাটে রাত। নবাব আলিবর্দী মারা যাওয়ার পর থেকেই যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।

হঠাৎ কোনও কোনও দিন মাঝ রাতে হৈ হৈ আওয়াজ ওঠে ফৌজী সেপাইদের ছাউনীতে। লোকেরা ভয়ে আঁৎকে ওঠে—ওই বুঝি ফিরিঙ্গিরা এল।

বাপেরা মেয়েদের ডাকে—ওরে, ওঠ ওঠ—

ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই ঘুম ভেঙে উঠে থর থর করে কাঁপতে থাকে। আবার হয়ত সেই বর্গীদের আসার মত ঘর বাড়ি সব ছেড়ে ছুড়ে পালাতে হবে।

সফিউল্লা, মেহেদী নেশার, ইয়ারজান ওদের অত ভয় করে চলাফেরা করতে হয় না। মাঝ রাতেও ওরা বুক ফুলিয়ে হাঁটে।

সেদিন নানীবেগমসাহেবার দরবারে খোজা সর্দার পীরালি খাঁ গিয়ে দাঁড়ালো।

—কৌন?

—পীরালি খাঁ নানীসাহেবা—

—সফিউল্লা সাহেব এসেছে?

—জী হাঁ।

নানীবেগমসাহেবা উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে দরবার মহলের দিকে চলতে লাগলো। সফিউল্লা সাহেব কদিন থেকেই এগুলো পাঠাচ্ছিল।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা।

—কী খবর সফিউল্লা?

—আমি নানীবেগমসাহেবার কাছে অনেকবার দরবার করেছি, এবার একটা খবর দিতে এসেছি।

—কীসের খবর বলো?

—মুমতাজ বেগমের খবর।

নানীজী বললে—তা সে তো মীর্জার কাছেই বলতে পারতে বাবা তুমি। আমার কাছে কেন? আমি তো আর কিছুই দেখি না এখন।

—মীর্জা মামুদ এখন খুব ব্যস্ত নানীজী, তাই আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।

—কী দরবার বলো?

—আপনি কী মক্কায় হজ করতে যাবেন নানীবেগমসাহেবা?

—কে বললে?

—আমি সব শুনেছি, আপনার সঙ্গেই মুমতাজ বাঈও যাচ্ছে তো?

নানীজী বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কী করে জানলে?

সফিউল্লা বললে—আমায় কাশিমবাজারের কুঠির চর ইয়াসিন খাঁ সব বলেছে।

—কিন্তু হজ করতে যাওয়া কি অন্যায়?

—অন্যায় নয় নানীজী! কিন্তু শুনলুম মুমতাজ বাঈ অন্য মতলব করেছে?

—কী মতলব?

—কাশিমবাজারে কুঠির ফিরিঙ্গি হেকিম ক্যাম্পবেল সাহেবকে সব টাকা দিয়ে দিয়েছে জাহাজ কেনবার জন্যে।

—জাহাজ কিনবে কেন? জাহাজ কিনে কী হবে?

—ডাকাতি করে মুমতাজ বাঈকে নিয়ে পালাবে। সাদি করবে—

নানীবেগমসাহেবা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বললে—সব সত্যি কথা?

—হ্যাঁ, সব ঠিক!

সব ইয়াসিন খাঁ বলেছে?

—জী হাঁ, আমাদের সরকারী চর, কাশিমবাজারের ইয়াসিন খাঁ।

নানীবেগমসাহেবা বলল—তাকে ডেকে আনতে পারো?

—জী হাঁ, সে তো সদরেই দাঁড়িয়ে আছে—

—ডাকো তাকে।

সফিউল্লা খাঁ তাকে ডাকতে গেল চেহেল-সুতুনের বাইরে।

কিন্তু কোথা থেকে যে কী কাণ্ড হয়ে গেল তা মুমতাজও জানতে পারলে না, কাশিমবাজার কুঠির ক্যাম্পবেল সাহেবও জানতে পারলে না।

একটা জাহাজ। একটা জাহাজ কেনবার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো সাহেব।

কলেট বললে—জাহাজ কিনে কী করবে তুমি? এত জিনিস থাকতে জাহাজ?

ইয়াসিনকেও বলেছিল জাহাজের কথা। ইয়াসিনও প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—জাহাজ? জাহাজ কিনে তুমি কী করবে সাহেব? এত জিনিস থাকতে জাহাজ? ডাকাতি করতে বেরোবে নাকি? ডাক্তারি ছেড়ে ডাকাতির পেশা ধরবে?

ক্যাম্পবেল বলেছিল—হাঁ, জাহাজ আমার চাই।

শেষে জাহাজের খোঁজে কলকাতায় চলে গেল একদিন। কলকাতায় পৌঁছে একেবারে উমিচাঁদ সাহেবের বাড়ি। উমিচাঁদ দেখে অবাক।

—তুমি? এ্যাদ্দিন কী করছিলে? কোথায় ছিলে?

ক্যাম্পবেল্ বললে—আমায় একটা জাহাজ কিনে দিতে পারো উমিচাঁদ সাহেব?

—জাহাজ? জাহাজের কথা শুনে উমিচাঁদ অবাক হয়ে গেল।

বললে—জাহাজ কিনে কী করবে তুমি? ডাকতারি ছেড়ে তুমি ডাকাতি করবে নাকি?

—না উমিচাঁদ সাহেব, জাহাজ আমার একটা জরুরী দরকার। যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার কাছে অনেক টাকা আছে, টাকার অভাব আমার নেই। এই দেখ—

বলে পোঁটলাটা উমিচাঁদের চোখের সামনে খুলে ফেললে।

—এ কী, এত মোহর, এত গয়না? এসব কার? কোত্থেকে পেলে?

ক্যাম্পবেল্ বললে—সে-সব কাউকে বোলবো না, এ এখন আমার প্রপার্টি, এ টাকা দিয়ে আমাকে একটা জাহাজ কিনে দাও—

উমিচাঁদ বললে—কিন্তু জাহাজের তো অনেক দাম—

—কত দাম?

উমিচাঁদ বুঝতে পারলে সাহেব কোথাও মজেছে।

বললে—তোমার সেই কাবুলি-ক্যাট্ আর কিনবে না?

—না, এখন জাহাজ কিনবো, ক্যাটের আর দরকার নেই।

—ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে টাকাগুলো রেখে যাও, যা দাম লাগে রেখে, বাকিটা তোমাকে ফেরত দেব—

সাহেব উঠলো। তখনি আবাব ফিবে যেতে হবে কাশিমবাজারে। বললে—গুড্ বাই—গুড্ বাই—

উমিচাঁদ তখন গয়নার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়েছে। বললে—আর একটু বসবে না? ভাল ড্রিঙ্ক ছিল আজ—

সাহেব তখন উঠে পড়েছে। বললে—না সাহেব, আমাব আর সময নেই, হয়ত চেহেল-সুতুন থেকে আবাব ডাক আসবে—

—গুলজারি বাঈ-এর বেমার সেবেছে?

ক্যাম্পবেল্ যেতে যেতে পেছন ফিরে বললে, না—

উমিচাঁদ তখন সকলেব আড়ালে নিজের ঘবে ঢুকেছে। অন্ধকার ঘরে আলোটা নিজের হাতেই জ্বাললে। তারপর সিন্দুকটা খুললে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে!

—কে?

—আমি জগমোহন হুঁজুর!

তাড়াতাড়ি সিন্দুকটা আবার বন্ধ করে দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখে জগমোহন দাঁড়িয়ে আছে।

—হুঁজুর, সেই ফিরিঙ্গি হেকিম-সাহেব আবার এসেছে—

—ফিরিঙ্গি হেকিম সাহেব?

বাইরে আসতেই দেখে ক্যাম্পবেল্ সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

—কী খবর?

ক্যাম্পবেল্ হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—সাহেব, নবাব আসছে কোম্পানীব সঙ্গে লডাই করতে—

—সে কী?

সাহেব বললে—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম কলকাতা থেকে সব লোক পালাচ্ছে, নবাবের ফৌজ আসছে কলকাতা কেল্লার দিকে, হালসীবাগানের দিকে আসছে—

উমিচাঁদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বললে—আচ্ছা তুমি ভেতরে এসো, দেখি কী করতে পারি!

ক্যাম্পবেল্ সাহেব বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। আর ওদিক থেকে নবাবের ফৌজ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে কলকাতার দিকে।

চেহেল-সুতুনের ভেতরে তখন আর এক উৎসব চলেছে। সফিউল্লা সাহেব বর সেজে এসেছে। চেহেল-সুতুনের ভেতরেই সাদির বন্দোবস্ত করেছে নানীবেগমসাহেবা।

মৌলভী হাজির।

মুমতাজ বাঈ নিজের মহলে তখন সাজছে। সাজতেই তার সময় লাগছে অনেকক্ষণ।

আজ বেগমদেরও উৎসব। নহবৎখানায় লগনের রাগ বাজাচ্ছে নহবতিয়া। পেশমন বেগম, বববু বেগম, লুৎফা বেগম সবাই সেজেছে মুমতাজ বেগমের সাদির জন্যে! আবার অনেকদিন পরে একটা উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে চেহেল-সুতুনে।

খোজা-সর্দার পীরালি খাঁর কাজের আর শেষ নেই।

মৌলভী সাহেব আবার তাগাদা দিলে—কই, কাঁহা, নয়ি বিবি কাঁহা—

নানীবেগমসাহেবা জুবেদাকে তাগাদা দিলে! বললে—ওরে, মুমতাজকে ডেকে নিয়ে আয়, এত দেরি করছে কেন সাজতে?

সফিউল্লা, মেহেদী নেশার, ইয়ারজান, তারাও এসেছে। সফিউল্লা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মুমতাজের জন্যে।

হঠাৎ জুবেদা এসে খবর দিলে—নানীজী সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কী সর্বনাশ রে?

—মুমতাজ বাঈ জহর খেয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের বাঙলা-মুলুকের একটা মেয়ের জীবন শেষ হয়ে গেল নিঃশব্দে। একদিন কোন্ দূর থেকে একটা ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল। কোথায়ই বা রইল সে, আর কোথায়ই বা রইল সেই মুমতাজ বাঈ। সামান্য গুলজারি বাঈকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী শুরু হয়েছিল তা সেই মর্মান্তিক পরিণতিতেই বুঝি সমাধিলাভ করলো।

যখন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার আক্রমণে ফিরিঙ্গি-ফৌজ কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, তখন উমিচাঁদের বাড়িটাও আগুন লেগে দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তখন কেউ জানতে পারলো না আর একজনের দাবদাহর যন্ত্রণা! সে মুমতাজ বাঈ। মুমতাজ বাঈ ততক্ষণে সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে শান্তির সন্ধান পেয়েছে। ইতিহাসে তাই মুমতাজ বাঈ-এর নাম কেউ লিখে যায় নি। ক্যাম্পবেল্ সাহেবের নামেরও উল্লেখ করেনি। এমনকি যাকে উপলক্ষ্য করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে, সেই গুলজারি বাঈ-এবও উল্লেখ নেই কোথাও। চেহেল-সুতুনেব সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্মৃতিও সকলের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে।

ব্যক্তিগত বিষয়

হারাধনবাবুর নাম কে যে রেখেছিল কে জানে। অনেক সময় নামটাও লোকের চরিত্র গঠন করে হয়তো। নামের সঙ্গে মানুষের চরিত্রের কোনও যোগাযোগ আছে কি না এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিন্তু দু' একটা ক্ষেত্রে এমন মিলে গেছে যে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মানুষের নাম জিনিসটা একেবারে তুচ্ছ নয়। এই যেমন আমাদের হারাধনবাবু।

ভোলানাথবাবু গেটের পাশের ঘরটাতেই বসতেন। বৃদ্ধ, বিরাট একজোড়া গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। তাঁর ঘরেই সকলকে যেতে হতো নাম সই করবার জন্য। এ্যাটেন্‌ডেন্স-খাতায় সই করা দৈনন্দিন নিয়ম। দশটা বেজে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ওই হাজ্‌রে খাতাটা আমাদের সেকশানেই থাকতো। তারপর বড়বাবু ওটা পাঠিয়ে দিতেন ভোলানাথবাবুর ঘরে।

বাস্টা যখন অফিসের সামনে থামতো তখন নামবার জন্যে আমাদের হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। আমাদের কেবল ভয় হতো হাজরে খাতা বুঝি ভোলানাথবাবুর ঘরে চলে গেল।

আর ভোলানাথবাবুর ঘরে খাতা যাওয়া মানেই নামের পাশে লাল চিকে। সাড়ে দশটা বাজলে আর রক্ষা নেই।

ভোলানাথবাবু খাতাটা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—কেন, আজকে দেরি কেন হরেনবাবু?

হরেনবাবু ট্রানজিট সেকশানের ক্লার্ক। ঘাড় নিচু করে বলতো—স্যার, স্ত্রীর বড় অসুখ—

ভোলানাথবাবু গম্ভীর হয়ে কথা বলতেন। উত্তরে বলতেন—তাহলে চাকরি আর না-ই বা করলেন, বাড়িতে বসে বসে স্ত্রীর সেবা করলেই পারেন। বলে নিজের ফাইলের দিকে চেয়ে কাজ করতে লাগলেন।

আমাদের সমীর বলতো—শালা ভোলানাথ মরবে কবে বল্ দিকিনি? মরলে মাইরি কালীবাড়ীতে পুজো দিয়ে আসি!

তা ভোলানাথবাবু মনে প্রাণেই ছিলেন ভোলানাথ। ভোলানাথবাবুর বাপ-মাও বোধহয় ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাঁর বোধহয় জন্মের সময়েই বুঝেছিলেন যে ছেলে বড় হয়ে রেলের আফিসের সুপারিনটেনডেন্ট্ হবে আর হাজরে খাতায় লাল চিকে দেওয়ার জন্যে কেরানীদের গালমন্দ-অভিশাপ খাবে। যার ওই রকম চাকরি তার তো মেজাজ গরম হলে চলে না। মেজাজ গরম হলে আর যা-ই হোক রেলের আফিসের সুপারিনটেনডেণ্টের চাকরি করা চলে না। অর্থাৎ দেবাদিদেব ভোলানাথের মত নির্বিকার হতে হবে।

তা আমাদের নিয়ে ভোলানাথবাবুর তেমন কিছু দুর্ভাবনা ছিল না। কারণ আমরা লেট হতাম বটে, কিন্তু বরাবর নয়। কখনও লেট, আবার কখনও ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় গিয়ে পৌঁছুতাম। দ্বিজপদ হয়ত তখন খাতাপত্র নিয়ে ভোলানাথবাবুর ঘরে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজপদকে ধরতাম। বলতাম—দে বাবা দ্বিজপদ, তোকে আমি চা খাবার পয়সা দেব, দে, সই করি—হুড়মুড় করে আরো পনেরো জন হয়ত একসঙ্গে খাতাখানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো। আর দ্বিজপদ বিরক্ত হতো। বলতো—ছাড়ুন বাবু, খাতা ছাড়ুন, ভোলানাথবাবু খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। আগে ইজ্জৎ, না আগে প্রাণ! দ্বিজপদকে খেয়ে ফেললে আমাদের কীসের লোকসান? আমরা যতক্ষণ সই করা শেষ না করতাম, ততক্ষণ দ্বিজপদ খাতা নিয়ে যেতে পারতো না।

দ্বিজপদ খাতাখানা নিয়ে সোজা ভোলানাথবাবুর টেবিলে গিয়ে রেখে দিয়ে আসতো, সেদিকে ভোলানাথবাবুর এমনিতে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো তিনি নির্বিকার, নির্বিকল্প, নিরবলম্ব। কোনও দিকে কোনও নিয়ম-অনিয়মের প্রতি বুঝি তার মনোযোগ নেই। বিরাট গোঁফ-জোড়ার সুবিরাট ঔদাসীন্যের বেড়াজালে তিনি নিজেকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়।

আসলে সবদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। অফিসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে অতি বৃহৎ বিষয়গুলো পর্যন্ত ছিল তাঁর নখদর্পণে। কে সিল্কের জামা পরে অফিসে আসছে, আর কে সকাল-সকাল ঘণ্টা বাজবার পাঁচ মিনিট আগেই অফিস ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার সমস্ত খুঁটিনাটি খবর পর্যন্ত তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছুতো।

তবে সব চেয়ে রাগ ছিল হারাধনবাবুর ওপরে। হারাধনবাবু সকলের শেষে ধীর-স্থির পায়ে এসে পৌঁছুতো, তার কোনও তাড়া নেই যেন। যেন অফিসে আসতে হয় তাই আসা! বাস থেকে নামবার সময়ও কিছু তাড়া ছিল না। অন্য লোকেরা দৌড়-ঝাঁপ করে অস্থির, তখন হারাধনবাবুর কোনও তাড়া নেই, গরজও নেই।

তারপর বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে অফিসের গাড়ি-বারান্দার ভেতরে ঢোকে।

ভোলানাথবাবু ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতে মাথা তুলতেন। বলতেন, হারাধনবাবু—

লাল চিকের ওপর সই করতে করতে হারাধনবাবু বলতো—আজ্ঞে, বলুন—

ভোলানাথবাবু ততক্ষণে আবার নিজের কাজে মন দিয়েছেন।

কাজ করতে করতেই বলতেন—ক'টা বাজলো?

হারাধনবাবু ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে সাড়ে এগারোটা।

—তা আমাদের অফিস ক'টায় বসে?

—আজ্ঞে সাড়ে দশটায়!

—তাহলে এক ঘণ্টা লেট? হিসেব কী বলে?

—আজ্ঞে আপনার হিসেবই ঠিক।

—আচ্ছা যান্।

হারাধনবাবু আর দ্বিরুক্তি করবার লোক নয়। ছাতি আর ঝোলা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভোলনাথবাবুও আর কিছু বললেন না। নিজের মনে আরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলেন। আর ট্রানজিট সেকশানে তখন পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেল।

হারাধনবাবু নির্বিকার চিত্তে ছাতা ঝোলা নিয়ে বড়বাবুর পাশ দিয়েই নিজের জায়গায় গিয়ে ঢুকলো। বড়বাবু একবার তার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর আবার নিজের কাজ করতে লাগলো। হারাধনবাবুকে কিছু বলা ছেড়ে দিয়েছিল বড়বাবু। প্রথম প্রথম বলতো।

হারাধনবাবুর কাজটাও ছিল তেমনি। অফিসে এলেও অফিস চলতো, না এলেও চলতো। কেউ তার জন্যে মাথা ঘামাতো না। বড়বাবু একবার চেয়ে দেখলে হারাধনবাবুর দিকে। কোনও অভিযোগ নয়, অনুযোগ নয়। শুধু মন্তব্য করলে—এ্যাই, এতক্ষণে বাবু এলেন।

ত হারাধনবাবুর তাতে লজ্জা নেই। ঝোলা আর ছাতিটা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে নিজের চেয়ারটায় গিয়ে বসতো। তার বসবার চেয়ারটা এমনই একটা জায়গায় যেখানে রোদ ঢোকে না। সাধারণতঃ অফিসের বড়-সাহেব ঘরে ঢুকলে তাকে দেখতে পাবার কথা নয়। সে তখন চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে না কাজ করছে, তাও কারো জানবার কথা নয়।

যখন দুপুরবেলা টিফিন-টাইম, তখন তার কাছে যেতাম। বলতাম—কী হারাধনবাবু অত দেরি করেন কেন রোজ?

সে বলতো—তুমি ভাই নতুন এসেছো, বুঝতে পারবে না।

আমি সত্যিই প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। বলতাম—এতে তো আপনারই ক্ষতি, আপনারই প্রমোশন হবে না।

—আরে প্রমোশন কে চায় হে? প্রমোশন তো আমি চাই না।

আমি আরো অবাক হয়ে যেতাম হারাধনবাবুর কথা শুনে। অফিসে চাকরি করে অথচ প্রমোশন চায় না, এমন তো সচরাচর দেখা যায় না। বলতাম—প্রমোশন চান না তো চাকরি করছেন কেন মশাই? চাকরি ছেড়ে দিলেই পারেন।

হারাধনবাবু হাসতো! হেসে বলতো—তোমরা ছেলেমানুষ, আগে আমার মতো বয়েস হোক তখন বুঝবে।

সত্যিই গোড়ার দিকে আমি বুঝতাম না। নতুন ঢুকেছি তখন অফিসে, কত রকম বিচিত্র লোক পেয়েছি। বিরাট রেলের অফিস। পুরো বলতে গেলে বিরাট মহাভারত হয়ে যায়। যেন একটা আস্ত চিড়িয়াখানা। সে-সব কথা যদি কখনও সময় পাই তো বলা যাবে।

এবারে শুধু হারাধনবাবুর কথাই বলি। তার কথা বলতে গেলেই সাতকাহন হয়ে যাবে।

দুপুববেলা যখন টিফিন-টাইম হতো তখন যেতাম তার কাছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম— আজ কী এনেছেন হারাধনবাবু?

হারাধনবাবু ঝোলাটা বাব করতো। একটা ছোট মাটিব হাঁড়ি। মুখটা শালপাতা দিয়ে মোড়া। মুখের শালপাতার মোড়কটা খুলতেই দেখলাম, হাঁড়ি ভর্তি মিহিদানা।

বললাম—এত মিহিদানা? এত মিহিদানা কিনেছেন কার জন্যে?

—এই ভাই তোমাদের জন্যে।

আমাদের জন্যে, মিহিদানা আনার জন্যে অফিস শুদ্ধ লোক খুশী। খবর পেয়ে সবাই এসে হাজির হলো। হারাধনবাবু বললে—চার পয়সা করে দাও ভাই আমাকে।

তা একটা শালপাতায় একমুঠো করে মিহিদানা চার-চার পয়সায় সব বিক্রি হয়ে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

মিহিদানাগুলো ভালো। কলকাতার মিহিদানার মতো শুকনো নয়। বেশ রসালো। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমাব নেশা লেগে গেল। আমরা রোজ গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, আজকে কী আনলেন হারাধনবাবু?

তা কোনও দিন মিহিদানা, কোনও দিন এক নাগরি খেজুবেব গুড়, কোনও দিন বা এক ঝুড়ি আম। হারাধনবাবু দেবি করে আসতো বটে। বকুনিও খেত। কিন্তু আমরা তার জন্যে কিছু বলতাম না।

সমীর বলতো—আসলে কিন্তু হারাধনবাবু এসব কিছুই কিনে আনে না, সব চোরাই মাল।

আমি তখন সবে নতুন অফিসে ঢুকেছি। অফিসের সব লোককে চিনতাম না। পরে আস্তে আস্তে অবশ্য সবই চিনলাম। কিন্তু হারাধনবাবুই বলতে গেলে আমার প্রথম আবিষ্কার।

এই হারাধনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হলো প্রথম কেন যেন মনে হলো অফিসের অত লোকের মধ্যে হারাধনবাবু ছিল ব্যতিক্রম। ক্রমে সময় পেলেই হারাধনবাবুর সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করতে লাগলাম। আমাকেও সে একটু একটু করে পছন্দ করতে লাগলো। আমি গেলেই সে বলতো- বোসো বোস রে, বোসো।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—আচ্ছা, হারাধনবাবু, এত লোকের চাকরিতে প্রমোশন হয়, আপনার প্রমোশন হয়নি কেন?

—প্রমোশন চাইনি ভাই কখনও আমি। প্রমোশন চাওয়াটাই বিপদ—কেন? প্রমোশন চাইলেই তোমার শত্রু বাড়বে। প্রমোশন চেওনা, সবাই তোমার বন্ধু থাকবে।

কথাটা মিথ্যে বলতো না হারাধনবাবু। তার কেউই শত্রু ছিল না। সে দেরি করে আসে বলে তাই ভোলানাথবাবুও কিছু বলতেন না। তিনি এককালে বোধহয় বিরক্ত হয়েছিলেন। তখন কিছু বকাবকি করেছিলেন। তারপর কতদিন ফাইন করেছেন। এমন অনেক মাস গেছে, যখন মাইনে থেকে পাঁচ সাত টাকা কেটে নিয়েছেন।

কিন্তু সেই ভোলানাথবাবুকে একদিন হারাধনবাবু হাত করে নিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। হারাধনবাবু একদিন এক হাঁড়ি কই মাছ নিয়ে ভোলানাথবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির।

ভোলানাথবাব রেগেই ছিলেন হারাধনবাবর ওপরে! কিছু একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই হারাধনবাবু হাঁড়িটা ভোলানাথবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

ভোলানাথবাবু কাজ করতে করতে হাঁড়ি দেখে অবাক।

—বললেন—এটা আবার কী?

—আজ্ঞে, এটা আপনার জন্যে এনেছি।

—এতে কী আছে, কী?

—কই মাছ। খুব বড় বড় কই। পাঁচটাতে এক কিলো।

—তা অফিসে কই মাছ এনেছেন কেন?

—বাড়ির পুকুরটায় খ্যাপ্‌লা জাল ফেলেছিলুম কিনা তাই কিছু কই, মাগুর উঠলো, ভাবলাম তার মধ্যে থেকে কিছু আপনাকে দিয়ে আসি।

—তা আপনি সেই অত দূরের দেশ থেকে এই মাছ ভর্তি মাটির হাঁড়ি বয়ে নিয়ে এলেন?

—তা আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, হলোই বা একটু কষ্ট।

—বাসে ট্রামে এই হাঁড়ি তুলতে দিলে?

—একটু কষ্ট হলো বৈকি স্যার। সেই জন্যেই তো আধ ঘণ্টা দেরি হলো আসতে। তা একটু কষ্ট হওয়া ভালো। এটা আপনার বাড়িতে দিয়ে আসি স্যার—

বলে হাজরে খাতায় সইটা করে সোজা ভোলনাথবাবুর কোয়ার্টারে চলে গেল হারাধনবাবু। তখনকার রেলের সব কোয়ার্টার সারি সারি তিনতলা বাড়ি। এক একটা বাড়িতে অমন দশ-দশটা ফ্যামিলির বাস। সেইখানে গিয়ে ভোলানাথবাবুর চাপরাশির হাতে দিয়ে এল। এরপর থেকেই ভোলানাথবাবুর রাগটা বকুনিটা যেন একটু কমতে লাগলো, তারপর থেকেই ফাইন করা কমে গেল। তিনি বেজার হতেন বটে কিন্তু তেমন রাগারাগি আর করতেন না।

আর শুধু কি সেই একদিনের কই মাছ? একবার সন্দেশও নিয়ে এসেছিলেন এই রকম করে। এমনি করেই আমাদের অফিসে হারাধনবাবু তার চাকরিতে বিয়াল্লিশ বছর পাকা হয়ে রইলো। আর শুধু পাকা হয়েই রইল না। একেবারে অক্ষয় অব্যয় হয়ে রইল।

এ-জীবনে অনেক রকম মানুষ, অনেক রকম চরিত্র দেখলাম। সব ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করে মানুষকে যেমন সংসার পরিত্যাগ করতে দেখেছি, তেমনি আবার সংসারকে জড়িয়ে ধরেও কত মানুষকে মহাপুরুষ হতে দেখেছি তার কি ইয়ত্তা আছে?

এক এক সময় ভাবি সত্যিই তো কী-ই বা পেলাম জীবনে? আর জীবনে কি কিছু পেতেই হবে? আর পাওয়ার মত বস্তুই বা সংসারে ক'টা আছে? হারাধনবাবুও বোধহয় ওই একটা

জিনিসই চেয়েছিল। ওই সন্ধান। সে সারাজীবন শুধু সন্ধান করেই গেল কোথায় কোন বস্তু পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কত লোক তো কত কিছু খোঁজে সবাই কি সূর্যোদয় দেখতে চায়? সবাই হোটেল থেকে বেরিয়ে সূর্যোদয় দেখতেই তো আসে ওখানে। কিন্তু সূর্যোদয় দেখার ভাগ্য কি সকলের হয়? কেউ দেখে, কেউ ঢেউ গোনে, কেউ ঝিনুক কুড়োয়, কেউ বা আবার শুধু বালির ওপর নিজের পায়ের ছাপ রেখে হেঁটে চলে যায়।

কিন্তু সূর্যোদয়? সূর্যোদয় সবাই দেখতে পায় না। সবাই দেখতে চায়ও না। তা বলে দুঃখ করে লাভ কী? সূর্যোদয় যদি না-ই বা দেখতে পেলাম, পাহাড়-পর্বত-মাঠ-ঘাট তো দেখা হবে, অন্ততঃ কিছু না হোক পাথরের নুড়ি কুড়ানো তো হবে।

সেই জন্যেই হারাধনবাবু লোকটাকে আমার শুরু থেকেই কেমন যেন ভালো লাগতো। যেদিন থেকে অফিসে ঢুকেছি সেইদিন থেকেই লেগেছে। অফিসে অন্য লোকের কি অভাব ছিল? কত বিচিত্র সব লোক তারা, কত বিচিত্র সব ঘটনা, কত বিচিত্র তাদের কাহিনী। সব কথা বলবার অবকাশ এখানে নেই। শুধু হারাধনবাবুর কথা বললেই হয়ত তাদের কথা বলা হয়ে যাবে। তাই আজ এতদিন পরে সেই হারাধনবাবুকে নিয়ে লিখতে বসেছি।

আগে অবশ্য হারাধনবাবু সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। পরে সমস্ত কিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন বুঝলাম আমরাও যা হারাধনবাবুও তাই। আমরাও সবাই এক একটা হারাধনবাবু। দোষ করেছে শুধু একা হারাধনবাবু। প্রথম প্রথম হারাধনবাবু আর সকলের মতই স্বাভাবিক মানুষ ছিল। সে যুগে যেমন ভাবে লোকে চাকরি পেত, সেই রকমভাবেই এই রেলের চাকরি পেয়েছিল। তখন না ছিল পরীক্ষা, না ছিল নাম রেজিস্ট্রি করার নিয়ম।

শহরে শহরে কোম্পানীর লোক ঢ্যাঁড়া পিটোত। রেল কোম্পানীর অফিসে চাকরি খালি আছে আপনারা দরখাস্ত করুন।

তা দেশের জমি জমা ছেড়ে কে বিদেশ বিভুঁইয়ে চাকরি করতে যাবে? কার এত মাথা ব্যথা কোথায় কোন্ বন-জঙ্গলে গিয়ে ইস্টিশান মাস্টারের চাকরি হবে, সেখানে না আছে একটা আত্মীয়-স্বজন না আছে মেশবার মতন একটা মানুষ! তারপর তীর্থধর্ম আছে। পূজো আর্চা আছে। আছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে-থা। দুটো টাকার জন্যে তো সমাজ-সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে পারি না। দিনের মধ্যে যখন একখানা ট্রেন এলো তখনই যা একটু রবরবা। লোকজন নামা ওঠা। দুচারটে মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া। কেউ যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি। কেউ বা আবার চাকরির জায়গায়। তারা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে। ইস্টিশান মাস্টারের বউ হয়ত তখন জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরের ট্রেনখানার যাত্রীদের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কোথায় বউটার দেশ, কোথায় বাঙলা দেশের কোন সুদূর গ্রামে বউটার বাবা-মা থাকে, আর কোথায় পশ্চিমের কোন্ পাণ্ডব-বর্জিত দেশের কোন এক অখ্যাত ইস্টিশনে স্বামীর সঙ্গে এসে বন্দী হয়ে আছে। ট্রেনখানার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হয়ত একটুখানির জন্যে বউটার মন বিকল হয়ে যায়। আর ট্রেনটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ছোট সংসারের জাঁতাকলের ভেতর কখন পিষে যেতে শুরু করে তা সে টেরও পায় না। স্বামীটি তখন হয়ত প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সবুজ পতাকাটা হাওয়ায় ওড়াতে থাকে চাকরির খাতিরে। এ-সব সকলেরই দেখা।

কিন্তু হারাধনবাবুর তখন উঠতি বয়েস। গ্রামেই আর পাঁচ জনের মত তাশ-পাসা-দাবা খেলে, মাছ ধরে সময় আর কাটছিল না। আর অবস্থাও তখন তেমন ভাল নয়। মাথার ওপর বাপ নেই। বিধবা মা। বাগানে বাঁশঝাড়ে কাঠ-কুটা কুড়িয়ে গাছের ফল-মূলটা পেড়ে এনে সংসার চালাচ্ছে। সেই অবস্থায় হারাধনবাবু একদিন বাড়ি ছেড়ে বেঘোরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক ভাবলো ছেলেটা বিবাগী হয়ে গেছে।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। জমি-জমা সব গোল্লায় গেল। কোথায় গেল হারাধনবাবু, আর কোথায় গেল তার দেশ।

হঠাৎ একদিন গ্রামে এসে হাজির হলো হারাধনবাবু। সঙ্গে বউ।

নলিনী অধিকারী গ্রামের মোড়ল। জমিদার বলেও বটে, আবার অনেক টাকার মালিক বলেও বটে? লোকের বিপদে আপদে যেমন, তেমনি আবার সুখের দিনে।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িটা যাচ্ছিল। অধিকারীমশাই হাঁক দিলেন—কে যায়?

গাড়ি থামলো হারাধনবাবু বেরিয়ে এসে অধিকারীমশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—কে তুমি?

—আজ্ঞে, আমি হারাধন। হারাধন সরকার।

—ও, তুমি অম্বিকা সরকারের ছেলে? তা কোত্থেকে আসছো? এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাধন বললে—আজ্ঞে আমি রেলে চাকরি পেয়েছি।

—রেলে? রেল কোম্পানীতে? কত টাকা মাইনে পাও?

—হারাধন বললে—পনের টাকা। আর রেলের ফ্রি পাস আছে। রেলগাড়ি চড়তে ভাড়া লাগে না।

—পনের টাকা? বেশ বেশ, খুব ভালো। তোমার মা বেঁচে থাকলে খুব খুশী হতো। গাড়ির ভেতর কে?

—আজ্ঞে, আমার বউ।

—বৌমা? তা তুমি বিয়েও করেছ? কই, কিছুই তো জানি না। কোথায় করলে?

—আজ্ঞে মুড়োগাছাতে।

—ভালো। ভালো। তা যাও এখন, তেতে পুড়ে এসেছ, বিশ্রাম করেগে যাও।

তা সেই হলো শুরু। হারাধন সরকার বিয়ে করে বউ নিয়ে এসে সেই রাণাঘাটের গ্রামে নিজের পৈত্রিক ভিটেয় স্থিতু হলো। আর সেই দিন থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করলে।

হারাধনবাবু বলতো—ভাই, সেই আরম্ভ করলাম ডেলি-প্যাসেঞ্জারি, আর সেই আমার কাল হলো?

আমি জিজ্ঞেস করতাম—কেন? কাল হলো কেন?

হারাধনবাবু সেই কাহিনীই বলতেন রসিয়ে রসিয়ে। সে কতকাল, কত বছর আগেকার কথা, তখন রাণাঘাট থেকে শেয়ালদা স্টেশনের মান্থলি টিকিটের দাম ছিল কন্‌শেসনে আট আনার মতন।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—তা, কলকাতার মেসে থাকতেন না কেন?

হারাধনবাবু বলতো আগে তো মেসেই থাকতুম হে! পাঁচ টাকা ছিল মাসে খরচ। তার ওপর পূর্ণিমে আর একাদশীতে লুচি-মাংস। কিন্তু দেশে নিজের বাড়ি থাকতে কেন মেসে পড়ে থাকবো? তাই দেশের বাড়িটা সারিয়ে-সুরিয়ে সেইখানেই বাস করতে লাগলুম আর মান্থলি টিকিট করে আপিসে যাতায়াত করতে লাগলুম। সেই আসা যাওয়াই আমার কাল হলো হে।

কেন যে কাল হলো সেই কথাই আমাকে বলতো। বিয়াল্লিশ বছর ধরে চাকরি করেছিল হারাধনবাবু—বিয়াল্লিশ বছরের সেই মর্মান্তিক কাহিনী একা আমিই শুধু জানতাম। সত্যিই তো, আমরা সারা জীবন কী চেয়েছি আর কী পেয়েছি? কী যে চেয়েছি তাও কি কখনও জানতে পেরেছি। কেবল চেয়েছি আরো মাইনে বাড়ুক। আরও প্রমোশন পাই। মাইনেও বেড়েছে, প্রমোশনও হয়েছে, কিন্তু শেষকালে কী পরমার্থ পেয়েছি জীবনে তা আজ আর স্পষ্ট করে বলতে পারি না।

প্রথম দিনই ঘটনাটা ঘটলো। সকালবেলা খেয়েদেয়ে হারাধনবাবু বাড়ি থেকে বেরোল। সাতবার

দুর্গা নাম জপ করে স্টেশনের রাস্তায় আসতেই নলিনী অধিকারীমশাই-এর সঙ্গে দেখা। বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলেন অধিকারীমশাই।

জিজ্ঞেস করলেন—কী হারাধন, কোথায়? আপিসে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চলি, দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে ছ'টায় ট্রেন।

নলিনী অধিকারীমশাই ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—যাও, আর দেরি করো না, যাও—

হারাধনবাবু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। ছুটে যাওয়ার সুবিধে এই যে আগে-ভাগে খালি কামরায় কোণ্ ঘেঁষে বসা যায়। যখন নৈহাটিতে কি কাঁচরাপাড়ায় গাড়ি প্যাসেঞ্জারে ভর্তি হয়ে যাবে, তখন আর গায়ে ভিড়ের আঁচ লাগবে না।

যাহোক সেদিনই প্রথম শিক্ষাটা হলো। শেয়ালদা স্টেশনে লোকালটা এসে পৌঁছতেই সবাই হুড় হুড় করে নেমে পড়লো। কে আগে নামবে তারই জন্যে কাড়াকাড়ি। হারাধনবাবুও হুড়োহুড়ি করে নামতে গেল। কিন্তু অন্য লোকদের সঙ্গে পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত সবাই যখন নেমে গেছে তখন ফুরসৎ মিললো। কিন্তু নামা হলো না। হঠাৎ নজরে পড়লো গাড়ির কোণের দিকে বেঞ্চির নিচেয় কী যেন পড়ে আছে।

গাড়ির ইঞ্জিন তখন বহুদূর থেকে এসে পৌঁছে হাঁস-ফাঁস করছে। ট্রেন থেকে কুলিরা মালপত্র নামাচ্ছে, এমন সময় হারাধনবাবু নামতে গিয়েও নামলো না। তাড়াতাড়ি চারদিকে চেয়ে নিয়ে বেঞ্চিটার তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলে।

একটা পোঁটলা পড়েছিল সেখানে। কোনও প্যাসেঞ্জার হয়ত ফেলে চলে গেছে।

পোঁটলাটা বার করে নিলে হারাধনবাবু। ভেতরে যে কী আছে মালুম হলো না। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলে। হাতে যা ঠেকলো তাতে মনে হলো আলু। প্রায় সের তিনেক ওজন হবে। কেউ হয়ত কিনে আনছিল বাড়ির জন্যে, তাড়াতাড়িতে ভুলে ফেলে গেছে।

প্রথমে একটু ভয় হলো যদি আলুর মালিক আবার এক্ষুণি ফিরে আসে। ফিরে এসে বলে—এ কি মশাই, আমার আলু যে ওটা, আপনি নিচ্ছেন কেন?

পোঁটলাটা নিয়ে হারাধনবাব খানিকক্ষণ প্ল্যাটফরমের ওপর চপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো কেউ আসছে কি না। কিন্তু না, সবাই তখন হু-হু করে গেটের দিকে চলে যাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে দেখবার দায় নেই কারো। একবার মনে হলো পুলিশের থানাতে জমা দিলে হয়। থানার দিকেই সে এগোল পোঁটলাটা নিয়ে।

কিন্তু যেতে গিয়েও থম্‌কে দাঁড়ালো! ওদিকে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিন সের ওজনের মাল নিয়ে চলাফেরা করতেও কষ্ট লাগে! আর কিছু না বলে সোজা বাসে গিয়ে উঠলো। শুধু বাসে উঠেই অফিসে গিয়ে নামা তো হয় না। মাঝখানে ধর্মতলায় একবার বাস বদলানো। রাস্তার মোড়ের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেই চম্‌কে উঠলো। ঘড়ির বড় কাঁটাটা ততক্ষণে ছ'টার ঘরের ওপর ঝুলে পড়েছে। অফিসে পৌঁছতে যার নাম আরো আধ ঘণ্টা।-লেট হওয়া মানেই ভোলানাথবাবুর ঘরে হাজরে খাতা চলে যাওয়া। তা মনে আছে হারাধনবাবু সেই পোঁটলাটা নিয়েই সেদিন বাসে উঠলো। তারপর সেই অবস্থাতেই সোজা অফিস।

অফিসে যেতেই ভোলানাথবাবু বললেন—এ কি, এত দেরি তোমার যে হারাধনবাবু?

হারাধন সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে স্যার, ট্রেন লেট ছিল—

ভোলানাথবাবু বললেন—তাহলে ওখানে লিখে দাও ট্রেন লেট।

সেদিন প্রথমবার। কলকাতার অফিসে প্রথম বদলি হয়ে ওই-ই প্রথম লেট। সুতরাং মুকুব হয়ে গেল। অফিসেও বিশেষ কেউ কিছু বললে না।

সেদিন ফেরার সময় আবার সেই রানাঘাট লোকাল। তিন সের আলু নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতেই তরলা বললে—এ কী এনেছ গো?

হারাধনবাবু গেঞ্জি জামা ছাড়তে ছাড়তে বললে—আলু।

আলু শুনে অবাক হয়ে গেল তরলা। বললে—হঠাৎ আলু আনলে যে? বলে পোঁটলাটা খুলে ফেলে। দেখলে সত্যি আলু। তারপর জিজ্ঞেস করলে—তা এত আলু আনলে কেন?

হারাধনবাবু বললে—এই শেয়ালদা' দিয়ে আসি তো, পাশেই বৈঠকখানা বাজার। বাজারে গিয়ে দেখলুম খুব সস্তায় আলু বিক্রি হচ্ছে, তাই ভাবলাম নিয়ে আসি। আলু তো লাগেই।

তরলা আর কিছু বললে না। হারাধনবাবু বললে—আজকে আলুর দম করো।

সেদিন আলুর দম দিয়েই ভাত উঠে গেল দুজনের। তখন সবে নতুন বিয়ে করে বউ এনেছে। বিনা খরচে আলুটা এসে গেল। বাজারের পয়সা যা-হোক কিছু বাঁচলো।

এই হলো সূত্রপাত।

এ-জীবনে অনেক দেখে এইটুকু সার বোঝা হয়ে গেছে .য, যে-যা চায়, তাই-ই সে পায়। চাওয়ার পেছনে যে আন্তরিকতা দরকার, তেমনি রকমফেরও তো দবকার। সংসারে কেউ অর্থ চায়, কেউ তো আবার পরমার্থও চায়। পরমার্থ চাওয়ার লোকও তো আছে এ সংসারে।

অফিসেও তো আমাদের অনেক বকম লোক ছিল। কেউ চাইতো প্রমোশন, কেউ মেয়েমানুষ, কেউ খাওয়া, কেউ বা টাকা। আবার এমনও দেখেছি একজন টিফিন টাইমে ঝোলা থেকে একখানা পকেটগীতা বার করে পডতো।

হারাধনবাবুর কোনও দিকে খেয়াল থাকতো না ওই একটা জিনিস ছাড়া। ভোরবেলা সেই যে দুর্গা নাম জপ করে ট্রেনে উঠে বসতো, তারপর আর কোনও দিকে খেয়াল থাকতো না। ট্রেনখানা প্ল্যাটফরমে আসতেই সেদিন আবার হারাধনবাবু একটা কোণ দেখে বসে পড়লো।

• তারপর ট্রেন ছেড়ে দিল।

তখন ঘুম এল হারাধনবাবুর। ভিড়ের মধ্যে ঘুমই একমাত্র আশ্রয়। একটার পর একটা স্টেশন আসছে আর যাচ্ছে। বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার নেই। ডেলি-প্যাসেঞ্জার হওয়ার এই একটা অসুবিধে। ট্রেনে চড়ার আনন্দ আর থাকে না। এক-একটা স্টেশন আসে, আর ভিড় ক্রমশঃ বাড়ে। বাড়তে বাড়তে শেষে আর বসবার জায়গা থাকে না গাড়িতে। সেদিকে দেখবার আগ্রহও থাকে না হারাধনবাবুর। ততক্ষণ ঘুমোলে স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে। এবার যখন নৈহাটি স্টেশন এল তখন আর তিল ধারনের জায়গা নেই।

হারাধনবাবু একবার চোখের কোন দিয়ে দেখলে। সবাই ডেলি-প্যাসেঞ্জার! তারপর এক সময়ে শেয়ালদা। বিরাটা স্টেশন। ট্রেনটা পৌছবার সময় গম্-গম্ শব্দ হয় একটা।

সেদিন নামবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল প্যাসেঞ্জাবদের মধ্যে। তা পড়ুক। হারাধনবাবুর সেদিকে আগ্রহ নেই। যখন সবাই নেমে গেল হারাধনবাবু উঠলো। চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথাও কিছু আছে নাকি! বাঙ্কের ওপর চেয়ে দেখলে উঁচু হয়ে। বাঙ্ক একেবারে ফাঁকা। বেঞ্চির নিচেয় মাথা নিচু করে দেখলে। কোথাও কিছু নেই। মনটা যেন একটু বিরস হয়ে গেল। সেদিন আলুটা ভালো ছিল। বেশ টাটকা। আলুর দমটাও বেশ রেঁধেছিল তরলা। তরলার রান্নার হাত ভালো। গোড়ার দিকে বড় কষ্ট গেছে হারাধনের। মেসে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল।

সে সব কষ্টের দিনের কথা ভাবলেই কষ্ট হতো।

হারাধনবাবু বলতো—সে সব কী কষ্টের দিন গেছে ভাই। মেস খরচ পাঁচ টাকা, হাতে থাকতো দশ টাকা। সেই দশ টাকায় জামা কাপড় ধোপা নাপিত সব কিছু। তারপর আর হাতে কিছু থাকতো না। মাসের শেষের দিকে হাত একেবারে খালি। তখন আর ট্রামে চড়ার পয়সা থাকতো না। একেবারে সোজা হণ্টন। সাত মাইল রাস্তা হেঁটে অফিসে আসতুম।

এসব সেই পুরোন আমলের কথা।

সে যুগটাই ছিল আলাদা। অফিসের দরজার সামনে কাবুলিওয়ালারা লাঠি নিয়ে বসে থাকতো। বিশেষ করে মাইনে পাবার দিনগুলোতে। গেটের উল্টোদিকের ফুটপাথের মাটির ওপরেই ছিল তাদের আড্ডা। কাকের মত ঘাড় কাত্ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো গেটের দিকে।

এক-একজন মাইনের টাকা নিয়ে বেরোত আর এক-একটা কাবুলিওয়ালা কাছে গিয়ে খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলতো। বলতো—কাঁহা? রুপিয়া কাঁহা বাবু?

এমন অনেকবার হয়েছে যখন মাসের সমস্ত মাইনেটা কাবুলিওয়ালার হাতে তুলে দিয়ে অনেকে বাড়ি চলে গেছে। তারপর সারাটা মাস একেবারে উপোষ।

আর এখন? এখন তবু দুটো খেতে পাচ্ছি হে! পৈত্রিক ভাঙা ভিটের ওপর নতুন পাকা দালান তুলেছি। দু'টো ছেলে রানাঘাটে দোকান করে মোটামুটি রোজগার করে ঘরে টাকা আনছে। একটি মেয়ে ছিল ভাল জামাই দেখে তার বিয়ে দিয়েছি। এখন সব ঝক্কি শেষ। তা এ বয়েসে আমি ভোলানাথবাবুব মুখ ঝাম্টা সহ্য করতে যাবো কেন বলো দিকিনি বাপু? আর চাকরিতে উন্নতি করেই বা আমার লাভ কী হবে বলো?

তা সত্যিই হারাধনবাবুর বাহাদুরি আছে বলতে হবে। সেই পনের টাকা মাইনেতে জীবন শুরু। তারপর বহু ঘাটের জল খেয়ে শেষে এসে ঠেকেছেন এই রেল-আপিসের রেকর্ড সেকশানে। আমি বলতাম—তা আপিসে আসতে লেট করতেন কেন?

—আমি ভাই চিরকাল লেট। কত সাহেব এল গেল, কেউ এই লেট বন্ধ করতে পারেনি।

—তা আগের ট্রেনে এলেই পারেন। একটু সকাল-সকাল বাড়ি থেকে বেরোলেই হয়।

—কেন আগে বেরোব? আমার কিসের দায়?

আমি বলতাম—তা হলে আর ভোলানাথবাবুর গোমড়া মুখ দেখতে হতো না। সোজা গট্-গট্ করে একেবারে নিজের সেকশানে বসতে পারেন।

হারাধনবাবু বলতো—আরে তাতে গায়ে ফোস্কাও পড়ছে না, চাকরিও যাচ্ছে না। কেন অত কষ্ট করতে যাবো? বউকে তাহলে রাত তিনটের সময় উঠে ভাত চড়াতে হয়—এই বুড়ো বয়সে কাজ কী অত ঝঞ্ঝাটে।

আমি বলতাম—তা আপনার ট্রেন তো শেয়ালদায় এসে পৌছায় সকাল সাড়ে আটটায়, আর অফিস বসে সাড়ে দশটায়। এই দু'ঘণ্টা সময়েও আপনার কুলোয় না? ততক্ষণ আপনি করেন কী?

হারাধনবাবু বলতো—আরে ভাই, তোমরা ছোকরা মানুষ, তোমরা কী বুঝবে? শেয়ালদা থেকে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত হেঁটে এসে যে পয়সা বাঁচাই। যাতায়াতের রোজ যে চার গণ্ডা পয়সা বাঁচাই। রোজ যদি চার গণ্ডা পয়সা বাঁচে তো মাসে কত টাকা হলো হিসেব করো!

একেবারে অকাট্য যুক্তি। এর আর জবাব নেই। পাড়াগাঁয়ের লোক, হাঁটতে তাদের ব্যাজার নেই। হেঁটে এসে যদি হারাধনবাবু গাঁটের পয়সা বাঁচায় তো তাতে বলবার কিছু থাকতে পারে না। আর রেলের চাকরি, সে তো কারো যায় না। বরং যাওয়ানোটাই শক্ত। হারাধনবাবু হাজার চেষ্টা করলেও চাকরি তার যাবে না।

কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। সেটা অনেক পরে শুনলাম।

দু'তিন দিন পরেই আবার সুযোগ এল হারাধনবাবুর। ঐদিন থেকেই মনটা খারাপ হচ্ছিল। মন খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল। বউ যেমন যথারীতি ভোরে উঠে রান্না চড়াতো তেমনি চড়িয়েছে। কিন্তু সকাল ছ'টার সময়ই তাগাদা। বললে—কী গো? ভাত হলো?

তরলা বললে—এই হলো বলে, আর দেরি নই। ডালটা সাঁতলেই ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

হারাধনবাবুর মেজাজ বিগড়ে গেল। বললে—ডাল-ফাল চাই না। শুধু ভাতেভাত হলেই চলবে আমার। তোমার জন্য দেখছি আজকে আমার অফিসে বকুনি খেতে হবে।

বউও চেঁচিয়ে উঠলো—তুমি আপিসে বকুনি খাবে তাতে আমার কী? আমি কি তোমার কেনা বাঁদী যে ভোর চারটায় উঠে রান্না করে দেব? আমি পারবো না। আমি আর অত খাটুনি খাটতে পারবো না।

হারাধনবাবু হঠাৎ আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—আমিও আর ভাত খাবো না, এই চললুম—। বলে ধুতির ওপর জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ধুত্তোর। সংসারের নিকুচি করেছে। কার জন্যে সংসার? কীসের কী? যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়বো। আর বাড়িতেই রোজ ফিরবো না। যেমন মেসে থাকতাম তেমনি থাকবো। সংসার খরচের টাকা মাসে মাসে পাঠিয়ে দিলে খালাস। বাড়ি থেকে ইস্টিশান আধ ঘণ্টার রাস্তা। তাও রাস্তাটা শর্টকাট। বড় রাস্তা দিয়ে ইস্টিশানে গেলে যার নাম চল্লিশ মিনিট!

পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন মেয়েলি গলায় ডাকলে—ও বাবা—ও বাবা—

হারাধনবাবুর প্রথম সন্তান মেয়ে। হারাধনবাবু অনেক সাধ করে নাম রেখেছিল শিবানী। শিবানীবই গলা। বললে—বাবা, ভাত খেয়ে গেলে না? মা যে ডাকছে তোমাকে।

হারাধনবাবু দাঁড়িয়ে পড়লো। পেছন ফিরে দেখলে শিবানী দৌড়ে দৌড়ে তার দিকেই আসছে। হারাধনবাবু বললে—কী রে?

শিবানী এসে বাবার হাতটা চেপে ধরলে। বললে—মা বলছে তুমি ভাত খেয়ে যাও।

—তুই বাড়ি যা, আমি ভাত খাবো না। আমার ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বলে আর দাঁড়ালো না। সত্যিই রাগ হয়েছিল হারাধনবাবুব। তাড়াতাড়ি যদি ভাতই না পাওয়া গেল তো বিয়ে করে লাভটা কী? তাড়াতাড়ি ভাত পেলে তবেই তো ঠিক সময়ে ট্রেন ধরতে পারবে, ঠিক সময় কাজ-কর্ম চলবে। রাস্তায় নলিনী অধিকারী মশাই হঠাৎ ডাকলেন—কী গো হারাধন, অফিস যাচ্ছো নাকি?

হারাধন ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকাবাবু।

—তা এত সকাল-সকাল কেন? ট্রেনের তো এখনও দেবি আছে হে।

—একটু আগে আগে যাওয়া তো ভালো, তাই যাচ্ছি—

নলিনী অধিকারী বললে—হ্যাঁ তাই যাও, মন দিয়ে কাজ করা ভালো, পরে উন্নতি হবে। এখন কত মাইনে হলো?

—এই তো ইন্‌ক্রিমেণ্ট নিয়ে এবার কুড়ি টাকা হলো।

নলিনী অধিকারী মশাই বললেন—বাঃ, খুব ভালো, আরো মন দিয়ে কাজ করে যাও, উন্নতি করো। তোমার বাবা খুব কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করে গেছেন, তাঁর নাম রেখো।

অত্যন্ত সৎ উপদেশ সব। সৎ উপদেশ দিতে নলিনী অধিকারী মশাই-এর জুড়ি নেই। কিন্তু তখন আব উপদেশ শোনবার সময় নেই। অত উপদেশ শুনতে গেলে ওদিকে ট্রেন চলে যাবে। হন্ হন্ করে হারাধনবাবু স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালো! ঘড়ির দিকে চেয়ে সময়টা একবার দেখে নিলে। প্ল্যাটফরমে তখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। হারাধনবাবু তার নিজের জায়গাটা নিয়ে দাঁড়ালো। ওই জায়গাটা হারাধনবাবুর নিজস্ব। নিজস্ব মানে ওই জায়গাটাতে কেউ দাঁড়ায় না। ওই জায়গাটা হারাধনবাবুর একলার। তারপর যখন ট্রেনটা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ায় তখন টপ্ কবে উঠতে হয়। টপ্ করে উঠেই কোণের দিকের জায়গাটা দখল করার কথা। ওইটে যদি একবার বেদখল হয়ে যায় তো মুশকিল। গাড়ি ছাড়বার দশ মিনিট আগে প্ল্যাটফরমে এসে খালি গাড়িটা দাঁড়ায়। হারাধনবাবু তাক্ করে ছিল। ঠিক কামরাটা কাছে এসে দাঁড়াতেই লাফিয়ে উঠে কোণের জায়গাটা দখল করে বসে পড়লো।

রানাঘাটের অনেক লোক ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। কেউ যায় কাঁচরাপাড়ায় কেউ নৈহাটিতে, কেউ বেলঘরিয়া। সব জায়গাতেই অফিস কাছারি কারখানা আছে। সকলেরই তাড়া!

—এই যে হারাধনবাবু, কাল কোন্ ট্রেনে ফিরলেন? কাল যে দেখতে পাইনি আপনাকে?

—আমাকে এই একই কামরায় পাবে রোজ। তোমাদের মত আমি কামরা বদলাই না হে।

আরো দু'চার জন নানা রকম জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। কেউ দেশের অবস্থা, চালের দর, ছেলের অসুখ। আবার কেউ অফিসের বড়বাবু। অসংখ্য সকলের অভিযোগ, অসংখ্য তাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু।

এখন হারাধনবাবু থলি থেকে আর একটা ছোট থলি বার করলে। সেটা গোল করে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। পেটে ভাত নেই। পেটে ভাত পড়লে ঘুমটা ভালো করে জমে। কিন্তু খালি পেটে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়? ঘুমের মধ্যেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ধুত্তোর।

পাশ থেকে ভদ্রলোক বললে—কী হে, ধুত্তোর বলছো কাকে?

লজ্জায় পড়লো হারাধনবাবু। বললে—না ভাই, আর পারছি না।

—কেন, কীসের কী পারছো না?

—সংসার হে সংসার। সংসারের জ্বালায় আমি আর পারছি না। সকাল সকাল একটু রেঁধে উপকার করবে তাও পারে না। তাহলে বিয়ে করাটা কীসের জন্যে বলো?

হারাধনবাবু কথাটা বলে আবার চোখ বুঁজলো। সে-ঘুমটা যখন ভাঙলো তখন একবারে কামরা খালি হয়ে গেছে। হারাধনবাবু চার দিকে চেয়ে দেখলে। রাণাঘাটের জানা শোনা লোক কামরার মধ্যে তখন কেউ নেই। আরো সব নতুন লোক উঠেছে। কখন উঠেছে তারা তার খেয়াল নেই। আরো অনেক মোট-ঘাট উঠেছে। কেউ উঠেছে চাক্‌দা থেকে ; কেউ শিমুরালি থেকে। কেউ আবার হালিশহর থেকে। সবাই মফঃস্বল থেকে নানা জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতার কোনো মার্কেটে চলেছে। হয়ত বৈঠকখানার বাজারে।

ততক্ষণে দমদম্ জংশন এসে গেছে। তখন একটু চাঙ্গা হয়ে বসতে হয়। ভালো করে কামরার বাঙ্ক আর বেঞ্চির তলাগুলো দেখে নিলে। অনেক জিনিস-পত্র ঠাসা! সেদিনের মত যদি আলু-টালু ফেলে যায় তো তবু কিছু সুরাহা হয়।

শেয়ালদা স্টেশনে এসে ট্রেনটা পৌঁছোবার আগেই সবাই তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেন এক মিনিট দেরি না হয়। যারা অফিসে যাবে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে তাদের তাড়াই সব চেয়ে বেশি। তাদের অফিস পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে লাল চিকে পড়ে যাবে। আর যারা ব্যাপারী তাদেরও দেরি হলে লোকসান। বাজারে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে ততই তাদের লাভ। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে দরজার সামনে ভিড় করে আছে। ট্রেনটা থামলেই সবাই লাফিয়ে নামবে। কিন্তু হারাধনবাবু চুপ করে বসে রইল। সবাই নামুক, তারপরে নামা যাবে। যখন সবাই নেমে গেছে তখন হারাধনবাবু লক্ষ্য করলে একটা মাটির তিজেল হাড়ি তখনও বেঞ্চির তলায় পড়ে রয়েছে। একবার এদিক-ওদিক চাইলো হারাধনবাবু। সবাই নেমে চলে গেছে। প্ল্যাটফরমের ওপরে তখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের স্রোত বয়ে চলেছে। সেবার এমনি করেই তিন'সেরটাক আলুর পোঁটলা পাওয়া গিয়েছিল। এবার হাঁড়ির মধ্যে কী আছে জানা নেই।

স্টেশনের কতকগুলো লাল-জামা পরা কুলি হুড়-মুড় করে ঢুকে পড়লো। এদিক-ওদিক ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর বেঞ্চির তলায় হাঁড়িটা পড়ে থাকতে দেখেই সেটার দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, হারাধনবাবু সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে উঠলো।

বললে—ওটো হামারা মাল হ্যায়—তোম্ কেও লেতা হ্যায়?

হারাধনবাবুর ভাঙা-হিন্দী শুনে কুলীগুলো তাড়াতাড়ি কামরা থেকে অন্য কামরার দিকে চলে গেল। হাঁড়ির ভেতরে কী আছে তখনও জানা নেই। ভয়ে ভয়ে হাঁড়িটা বাইরে টেনে বার করে আনলে। মুখটা মাটির সরা দিয়ে বাঁধা। হাতে ঝোলাবার মত একটা দড়ি বাঁধা আছে। দড়িটা হাতে ঝুলিয়ে হারাধনবাবু কামরা থেকে প্ল্যাটফরমের ওপর নামলো। তখন আর সঙ্কোচ-লজ্জা ভয় থাকলে চলবে না। তখন সঙ্কোচ করলেই লোকে সন্দেহ করবে।

স্টেশনের বাইরে তখন তুমুল ভিড়। ভিড়ের মধ্যে হারাধনবাবু হাঁড়িটা নিয়ে চলতে লাগলো। এক হাতে ছাতা ঝোলা, আর এক হাতে হাঁড়ি। ট্রামের প্যাসেঞ্জাররা দেখেই হৈ-হৈ করে উঠলো।

—উঠবেন না মশাই, উঠবেন না, ট্যাক্সি করুন।

হারাধনবাবু দমবার পাত্র নয়। বললে—দয়া করে একটু জায়গা দিন, বেশিদূর যাবো না—

বেশিদূরে যাবো না বলতে হয়। নইলে মাল নিয়ে কেউ উঠতেই দেয় না। অফিস টাইমে শুধু হাতে ওঠাই শক্ত, তার ওপর হাঁড়ি, ছাতা, ঝোলা।

ধর্মতলায় ট্রামটা বদলাবার দরকার হয়। সেখানে অন্য ট্রাম ধরতে হবে। কিন্তু হারাধনবাবু তা করলে না। কার্জন পার্কের বাগানের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে গিয়ে একটা ঝোপ দেখে বসলো। সেখানে আস্তে আস্তে হাঁড়ির মুখের সরাটা খুলে ফেলল।

খুলতেই সে উঁকি মেরে দেখলে—এক হাঁড়ি ভর্তি মিহিদানা।

সকালে বউ ভাত রেঁধে দেয়নি, পেটটা চোঁ চোঁ করছে এখনও। এক মুঠো মিহিদানা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল। আঃ, মুখটা যেন জুড়িয়ে গেল! আর একমুঠো খেলে। মিষ্টি খেতে বরাবরই ভালোবাসতো সে! সেই মিষ্টিই বিনা-পয়সায় মিলে গেল। এরই নাম ভাগ্য। প্রথমবারে পেয়েছিল আলু, এবারে মিহিদানা।

কয়েকটা কাক তখন মিহিদানাব গন্ধ পেযে আশে-পাশে জুটেছে। কা-কা করে চিৎকার করছে। সে হাত তুলে তাড়া করে উঠলো—হুশ্-হুশ্—ভাগ্ এখান থেকে। সকালবেলা পেটে ভাত পড়েনি, তার ওপর কাকের অত্যাচার। কারো ভালো লাগে?

ওদিকে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে যেন কার গলা শোনা গেল—এই যে ভায়া, এখানে?

হারাধনবাবু মুখ তুলে চাইলে। বললে—বিনয়বাবু না?

বিনয়ভূষণ সরকার। ইনিই একদিন হারাধনবাবুকে বেলে চাকরি করে দিয়েছিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে বিনয়বাবুর পায়ে হাত দিযে মাথায় ঠেকালে।

—থাক্ থাক্, হাত দিতে হবে না—বলে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন—অফিস নেই? এখানে এত বেলা পর্যন্ত বসে বসে কী কবছো? এতে কী?

একটু লজ্জায় পড়ে গেল হারাধনবাবু। বললে—আজ্ঞে, এ মিহিদানা!

—এক হাঁড়ি মিহিদানা যে একেবারে।

—বললে—এই নৈহাটি স্টেশনে সস্তায় পেলুম তাই কিনলুম—

—একেবারে এক হাঁড়ি মিহিদানা কিনে ফেললে? এত মিহিদানা খাবে কে? বাড়িতে ছেলেমেযে কটা?

হারাধনবাবু বললে—বড়টি মেয়ে, এই আট বছব হয়েছে, আর পবেরটা ছেলে এখনও হাঁটতে শেখেনি—

—তা এত বেলা পর্যন্ত এই কার্জন-পার্কে বসে আছো কেন? অফিসে কাজ নেই?

হারাধনবাবু বললে—আজ সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে বেবিযেছি, ভাত খাওয়া হয়নি। তাই এখানে বসে একটু জল খেয়ে নিচ্ছি আর কি—

—ভালো, বলে বিনয়বাবু সেই ঘাসের ওপর বসে পড়লেন!

হারাধনবাবুকে এই বিনয়ভূষণ সরকার একদিন চাকরি করে দিযেছিলেন। সেই জন্যেই হারাধনবাবু বিনয়বাবুর ওপর কৃতজ্ঞ। বিনযবাবু কয়েক বছর হলো রিটায়ার কবে গেছেন।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন?

বিনয়বাবু বললেন—এই যাচ্ছি ইনসিয়োরেন্স অফিসে প্রিমিয়াম দিতে। রিটায়ার করার পর থেকেই যত কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে ভাই। তা অফিসের সব কী খবর? কালিকাবাবু কোথায়? রিটায়ার করেছেন নাকি?

—না সেই চাকরিতেই আছেন। খুব হম্বিতম্বি করছেন।

—তুমি এখন কোন্ সেক্‌শানে কাজ করছো? প্রমোশন-টমোশন হলো? হারাধনবাব বললে—আপনি নেই, কে আর প্রমোশন দেবে?

—তাহলে সেই রেকর্ড সেকশানেই আছো এখনও? সেই গুদামঘরের ভেতরে?

হারাধনবাবু বললে—ঠিকই বলেছেন আপনি। গুদামঘরই বটে। রেল কোম্পানীর অত টাকা অথচ রেকর্ড সেকশানটা ও রকম করেছে কেন? একটা জানলাও নেই কোথাও। দিনের বেলাতেই ইলেকট্রিকের আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়—

বিনয়বাবুর কাছে এই হারাধনবাবু কৃতজ্ঞ। এই বিনয়বাবুই একদিন হারাধনবাবুকে হাতে ধরে চাকরি করে দিয়ছিলেন। তখন মানুষের মত মানুষ ছিল অফিসে।

চাকরিতে ঢোকার দিন বিনয়বাবু বলে দিয়েছিলেন—খুব মন দিয়ে কাজ করবে হারাধন, সময়মত আপিসে আসবে। কোনও ঝামেলার মধ্যে থাকবে না। সেদিন ঘাড় নেড়ে বিনয়বাবুর কথায় হারাধনবাবু সায় দিয়েছিল।

তখন কলকাতার মেসে থাকতো। হেঁটেই অফিসে আসতো আর হেঁটেই অফিস থেকে মেসে ফিরতো। হারাধনবাবুর কাজে কেউ কখনও ফাঁকি পায়নি, কিন্তু বিনযবাবু চলে যাবার পর থেকেই অফিসের হালচাল্ সব কেমন বদলে যেতে লাগলো।

বিনয়বাবু বললেন—এখন ডি-টি-এস কে আছে? মরিস সাহেব তো রিটায়ার—

হারাধনবাবু বললে—হ্যাঁ, সাহেবেব আবার ফেয়ারওয়েল হলো, আমরা সবাই একটাকা করে চাঁদা দিলাম।

– তা এখন ডি-টি-এসের চেয়ারে কে বসেছে?

হারাধনবাবু বললে—মজুমদার সাহেব।

বিনয়বাবু বললেন—ভালো, মজুমদার সাহেবের লাক্‌টা ভালো হে! দেখ না, ওই মজুমদার আর আমি একসঙ্গে চাকরি পাই একই দিনে। এখন সে কোথায় উঠে গেল, আর আমি আজ কোথায় বলো দিকিনি! সবই কপাল হে! তারপর একটু থেমে বললে—আর ভোলানাথ? ভোলানাথ এখন কোথায়?

হারাধন বললে—আজ্ঞে, উনিই এখন আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সুপারিটেনডেণ্ট।

বিনয়বাবু বললেন—ওরও কপাল। তিরিশ টাকায় ঢুকেছিল, জানো? সেই তিরিশ টাকা থেকে এখন সাড়ে সাতশো টাকার গ্রেড্! একেই বলে কপাল। অথচ কাজকর্ম কিছুছু জানে না! আমার কাছে এককালে কত বকুনি খেয়েছে ভোলানাথ। তা কাজকর্ম চালাতে পারছে?

—ও সব তো আমি জানি না। আমি রেকর্ড সেকশানে থাকি, হাজরে খাতায় সই করি আর বাড়ি চলে আসি।

বিনয়বাবু বললেন—এখন তাহলে আর অফিসে কাজকর্ম কিছু হয় না, কী বলো? এখন তো শুনেছি অফিসে চিঠি দিলে নাকি রিপ্লাইও পাওয়া যায় না।

—আজকাল রেকর্ড সেকশান থেকে ডেশপ্যাচ সেকশানে চিঠি যেতে চোদ্দদিন লাগে।

বিনয়বাবু বললেন—আমি চলে আসার পরই তাহলে দেখছি অফিসটা গোল্লায় গেছে।

—আরে গোল্লায় যাবে। এখন হয়েছে কী?

—তা তুমি যে এই দেরি করে যাচ্ছো তাতে ভোলানাথ কিছু বলবে না? হারাধনবাবু হেসে ফেললে। বললে—রোজই বলেন। রোজই বকুনি খেতে হয়। তা লেট হলে তো আর কারো চাকরি যায় না আজকাল।

—ফাইন টাইন করে নাকি ভোলানাথ?

হারাধনবাবু বললে—তাও করে।

বিনয়বাবু বললে—অথচ দেখ, আমি তোমাদের কোনও দিন ফাইন করেছি? কত লোক লেট করে আসতো, আমি কিছু বলেছি?

—কী যে বলেন আপনি? আপনি আর ভোলানাথবাব? বিনয়বাবু উঠলেন। বললেন—যাই, তোমারও দেরি হচ্ছে, আমিও উঠি। তবু অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, অফিসের খবরাখবর সব পেলুম। হারাধনবাবুও উঠলো মিহিদানার হাঁড়িটা নিয়ে। বাঁ হাতে ছাতি আর ঝোলাটা তুলে নিয়ে। বললে—আপনার কথা আমি কখনও ভুলবো না বিনয়বাবু। সেদিন আপনি যদি চাকরিটা না দিতেন তাহলে আমি কবে উপোস করে মরতুম।

বিনয়বাবু উদার সৌজন্যে বললেন—পৃথিবীতে কে কার জন্যে করে হে? ইচ্ছে করলেই কেউ কি কারো জন্যে কিছু করতে পারে? তোমারও গত জন্মের সুকৃতি ছিল, তাই চাকরি পেয়েছ, আর আমারও বোধহয় কিছু ঋণ ছিল তোমার কাছে, সেটা শোধ হল। সবই ভবিতব্য, ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চালিয়ে যাও, দেখবে কিছুই আটকাবে না।

বলে বিনয়বাবু ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে চলে গেলেন। হারাধনবাবু তখনও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপর আস্তে আস্তে বোঝা নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলতে লাগলো। সঙ্গে প্রায় চার পাঁচ সের মিহিদানা।

মাটির হাঁড়ি কি বাসের কন্‌ডাক্‌টাররা তুলতে দেয়?

—আরে, অফিস-টাইমে মাটির হাঁড়ি নিয়ে কোথায় উঠছেন? যদি ভেঙে যায়?

হারাধনবাবু একটু কাকুতি-মিনতি করে বলে—এগারোটা বাজতে চললো, এখন আর অফিস টাইম কোথায় বাবা? খাবার জিনিস আছে এতে, কোথায় ফেলবো?

বলে বেঞ্চির নিচে হাঁড়িটা টেনে নিরাপদে রেখে দিলে। দু'একজন যাত্রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। তাদের লক্ষ্য করে হারাধনবাবু বললে—সামান্য জিনিস মশাই, এর জন্যে ট্যাক্সি করবো? তাহলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে—

তা এ-কথায় কেউ কোনও মন্তব্য করলে না। সকলেরই নানান রকম ঝামেলা, সকলেরই মধ্যবিত্ত অবস্থা। অন্যের ঝামেলার দুঃখটাও সবাই বোঝে। সবাই জিনিসটা হজম করে নিলে।

তারপর অফিসের সামনে বাসটা যখন এলো তখন হাঁড়ি নিয়ে নামা এক সমস্যা। তাও দয়া করে লোকজন একটু রাস্তা করে দিলে। দু'একজন একটু টিপ্পনি কাটলে—একি মশাই, হাঁড়ি নিয়ে বাসে উঠেছেন? এ তো বড় উৎপাত—ও-সব কথায় কান দিতে নেই। সংসারে ও-রকম কত কথা কি হারাধনবাবু কানে তোলে? অফিসের বড়বাবুও তো কোনোদিন মিষ্টি কথা বলেনি। ভোলানাথবাবু তো হারাধনবাবুকে দেখলেই মুখ গম্ভীব করে ফেলেন। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? তাতে কি হারাধনবাবু চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে?

হাঁড়িটা বাইরের করিডোরে রেখে হারাধনবাবু ভোলানাথবাবুর ঘরে ঢুকলো। ভোলানাথবাবু তখন একমনে কাজ করছিলেন। হারাধনবাবুকে ঢুকতে দেখেই দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাইলেন, আর তারপর যেমন কাজ করছিলেন, আবার তেমনি কাজ করতে লাগলেন।

টেবিলের কোনার দিকে হাজ্‌রে খাতাখানা খোলা পড়েছিল। পাশে রাখা কলমটা নিয়ে লাল-চিকের ওপর নিজের নামটা লিখে তাতে সময় লিখে দিলে। তারপর অপরাধীর ভঙ্গিতে যেন নিজের মনেই বলে উঠলো—ট্রেনটা স্যার নৈহাটি স্টেশনে আটকে গিয়েছিল।

ভোলানাথবাবু সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন—ঠিক আছে, আপনি যান্—আর কোনও কথা নয়। ঘরের বাইরে এসে হাঁড়িটা হাতে নিয়ে নিজের সেকশানে গিয়ে ঢুকলো।

হবলাল পাশের চেয়ারে বসে। বললে—কী হারাধনদা, এত দেরি যে?

হারাধনবাবু ঘাম মুছতে মুছতে বললে—আরে ভাই, সে এক মহাবিপদ হলো। হরলাল বললে—কী বিপদ?

—আবে নৈহাটিতে এসে ট্রেন আর চলে না। শেষকালে এগারোটার সময় এসে ট্রেনটা শেয়ালদা পৌঁছুলো...

—এতে কী? এই হাঁড়িতে?

হারাধনবাবু বললে—এ ভাই নৈহাটিতে এক মিষ্টিওয়ালার পাল্লায় পড়ে গুনেগার দিতে হলো। কিছুতেই ছাড়ে না। পাঁচটা টাকা গচ্চা গেল। হরলাল বলল—কী মিষ্টি? রসগোল্লা?

—আরে না, রসগোল্লা হলে তো বাঁচতুম, এ হলো মিহিদানা?

হরলাল অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? পাঁচটাকার মিহিদানা কিনে বসলেন?

হারাধনবাবু বললে—কী করবো, লোকটা তিনদিন খেতে পায়নি বলে কান্নাকাটি করতে লাগলো, আমারও কেমন দয়া হলো লোকটার চেহারা দেখে। আরে ভাই, দুনিয়ায় টাকাটাই কী সব? লোকে দান-খয়রাতও তো করে! ভাবলাম টাকাটা না হয় পকেট-মার হয়ে গিয়েছে—

খবর পেয়ে আরো দু'চারজন তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের আগ্রহ হাঁড়ির ভেতরে কী আছে। হরলাল বলল—দেখি হাঁড়ির মুখটা খোল তো হারাধনদা, দেখি কী রকম মিহিদানা?

হাঁড়ির মুখের সরাটা খুলে ফেলা হলো। সবাই উকি মেরে দেখলে ভেতরে। প্রায় হাঁড়ির মুখ পর্যন্ত ভর্তি মিহিদানা। সবাই হাঁক-পাঁক করে উঠলো।

বললে—এ যে অনেক মিহিদানা—

হরলাল বললে—প্রায় দশ সের হবে রে—

একজন জিজ্ঞেস করলে—কত নিলে হারাধনদা?

হারাধনবাবু বললে—পাঁচ টাকা।

হরলাল বললে—অত মিহিদানা আপনি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কী করবেন? তার চেয়ে আমাদের কিছু দিয়ে দিন না। দু'আনা করে সবাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিচ্ছি—

তা তাই-ই ঠিক হলো টিফিন-টাইমে একে-একে সবাই এল। এক-একটা শালপাতায় সবাই কিছু কিছু করে কিনে নিলে। সব চার আনা করে ভাগা। দেখতে দেখতে অর্দ্ধেক হাঁড়ি উঠে গেল। চার আনায় সবাই টাটকা মিহিদানা খেতে পেল। এখনও হাঁড়ির ভেতর অনেক রয়েছে। ওটা বাড়ির জন্যে থাক্।

হারাধনবাবু বলেন—জিনিসটা ভালো করেছে, কী বলো?

সবাই খুশী তখন। সস্তায় টিফিন সারতে পারলে খুশী কে না হবে?

বিকেল যখন পাঁচটা তখন আবার হাঁড়িটা নিয়ে অফিস থেকে বেরোল হারাধনবাবু। আবার সেই ধর্মতলার মোড়ে নামা। আর তারপর ট্রামে শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছোন।

রাত্রে বাড়ি পৌঁছতেই শিবানী দৌড়ে এল। তরলাও এল পেছন পেছন। হাতে হাঁড়ি দেখে শিবানী বললে—এতে কী এনেছ বাবা?

—মিহিদানা।

তরলা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বললে—সকালবেলা ভাত না খেয়ে যে চলে গেলে, সারাদিনটা উপোষ গেল তো?

শিবানী বলে উঠলো—জানো বাবা, মা-ও আজকে সারাদিন খায়নি।

—কেন? তুমি খাওনি?

শিবানী বলে উঠলো—না বাবা, তুমি খাওনি বলে মা-ও খেলো না।

হারাধনবাবু বললে—কী কাণ্ড দেখ দিকিনি। এতো মহা মুশকিল হলো দেখছি। আমি খেলুম না বলে তুমিও খেলে না? আরে, আমি তো সেই জন্যে নৈহাটি স্টেশন থেকে মিহিদানা কিনে নিলুম।

—এক হাঁড়ি মিহিদানা কিনলে?

—সস্তায় পেলুম তাই কিনলুম।

—সস্তায় পেলে বলে একেবারে এক হাঁড়ি মিহিদানা কিনতে হয়?

—মিষ্টিওয়ালাটা যে কান্নাকাটি করতে লাগলো, বললে তিনদিন খেতে পায়নি, তাই পাঁচ টাকায় এক হাঁড়ি মিহিদানা দিয়ে দিলে—

—তারপর?

—তারপর শেয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রামে চড়ে ধর্মতলায় গিয়ে একটা নির্জন পার্কের মধ্যে বসে খানিকটা মিহিদানা খেলুম। পেটটা ভরলো। তারপর অফিসে গিয়ে চার আনা করে সকলকে বেচে দিলুম। আমার খরচ উঠে গেল।

তরলা বললে—তা এখন ভাত খাবে তো?

—কেন? ভাত রাঁধোনি নাকি?

—না, রেঁধেছি। আমার সকালবেলার ভাত ক'টা জল দিয়ে রেখেছিলুম। আমি জল দেওয়া ভাতই খাবো। তোমাদের নতুন করে ভাত রেঁধেছি।

হারাধনবাবু বললে—একটু মিহিদানা মুখে দিয়ে দেখ না। এত কষ্ট করে আনলুম। ও রেখে দিলে গন্ধ হয়ে যাবে।

সকালবেলার মেঘলা আবহাওয়াটা খানিক পরেই কেটে গেল। সামান্য কুড়িয়ে পাওয়া মিহিদানার যে এত গুণ তা সকালবেলা কল্পনা করতেও পারেন নি। প্রথম দিন আলু, দ্বিতীয়বার মিহিদানা। হারাধনবাবুর মনে হলো তার জীবন যেন সার্থকতার পথেই দশ হাত এগিয়ে গেল।

এরপর থেকে যেন একটা নেশা হয়ে গেল। লোকের নানা রকম নেশা থাকে। কারো বিড়ি, সিগারেট, কারো মদ-ভাঙ্। আরো কত রকমের নেশা আছে সংসারে। সেই নেশার টানেই মানুষ উজান ঠেলে এগিয়ে চলে। সেই নেশায় মানুষ বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। সংসার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, চাকরি জীবিকা সব কিছুর ওপরেও আর একটা নেশা থাকে। সেই নেশাটা হারাধনবাবুর হলো। মদ নয়, মেয়েমানুষ নয়, বিড়ি নয়, সিগারেট নয়। ওই শুধু ট্রেনে বসে চলতে চলতে নজর রাখা কে কোথায় কী জিনিস রাখলে, কোন্ জিনিসটা ফেলে গেল।

তারপর থেকেই নেশাটা যেন বেড়ে যেতে লাগলো। মানুষ অফিসে যেতে একটু আলিস্যি করে গড়িমসি করে। কামাই করতে পারলে আর ছাড়ে না। কিন্তু হারাধনবাবুর যেন অফিসে যেতেই যত আগ্রহ। রবিবার দিনগুলোতে মন-মরা হয়ে যায়।

রানাঘাটের অন্য অন্য ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা শনিবার থেকেই রবিবারের আশায় বসে থাকে। কোনও রকমে শনিবারটা অফিস করেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে—আঃ, বাঁচলুম, কালকের দিনটা বাড়িতে আরাম করে ঘুমোব। আর ট্রেনে চড়তে হবে না—

কিন্তু হারাধনবাবুর মনে হয় যেন একটা দিন নষ্ট হলো।

রবিবারের দিনগুলোতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের বড় আরাম। সেদিন আর তাদের বউদের ভোর রাত্তিরে উঠে উনুনে আঁচ দিতে হবে না। বাবুদেরও সেদিন শীতে কাঁপতে-কাঁপতে পুকুরে ডুব দিতে হয় না। আরাম করে বেলা পর্যন্ত ঘুমোও, তারপর চা খেয়ে পাড়ায় আড্ডা দিতে যাও। তারপর বেলা করে ভাত খেয়ে দিবা নিদ্রা যাও। আর সন্ধ্যেবেলা? সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে হলে বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বোস, আর নয় তো পাড়ায় নলিনী অধিকারী মশাইয়ের বাড়ির তাসের আড্ডায় গিয়ে তাস খেলে রাত দশটা বাজিয়ে দাও। তারপর সোমবারের কথা সোমবারে ভাবা যাবে।

কিন্তু হারাধনবাবু এই ডেলি-প্যাসেঞ্জারির মধ্যেই কোথায় যেন একটা নেশা জোগাড় করে বেঁচে গেল। বড় শান্তি যেন ওই ডেলি-প্যাসেঞ্জারির মধ্যে। এত শান্তি যেন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেও পাওয়া যায় না। ট্রেনে উঠলেই নিশ্চিন্ত। তারপর যখন খুশী সে চলুক। তার জন্যে কোনও দুশ্চিন্তা থাকে না তার। সে যেন তার জীবনের সমস্ত দায়িত্বভার ট্রেনের ইঞ্জিনের ড্রাইভারের ওপর ছেড়ে দিয়েই দায়মুক্ত। ট্রেন যদি দেরিতে পৌঁছায় তার জন্যে তাকে দায়ী করা চলবে না, দায়ী যদি কাউকে করতে হয় তো দায়ী করো রেলকোম্পানীকে। আমি কি জানি?

এক-একবার হারাধনবাবুর মনে হয় সারা জীবনটা ট্রেনের কামরার মধ্যে কাটাতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু মুশকিল হয় এক-সময়-না এক সময় ট্রেন স্টেশনে পৌঁছোবেই তখন অফিস যাওয়ার কথা ভাবলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়।

ট্রেনে ওঠবার সময় প্রথমটা একটু ভাবনা থাকে শুধু। ঠিক জায়গাটায় বসতে পাবে তো? মানে এমন একটা বসবার জায়গা যেখান থেকে সমস্ত কামরার লোকগুলোকে দেখা যায়। কে কোন্ মাল কোথায় রাখলো, কে কোন্ মালটা নিয়ে নামতে ভুলে গেল এ-সব দেখার মধ্যে যে কী রোমাঞ্চ তা তো কোনও শালা বুঝবে না। তোরা চাকরিতে উন্নতি কর্, তোরা সাহেবের

পায়ে তেল দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে নে। আমি ওর মধ্যে নেই। আমার এই-ই ভালো। এই ডেলি-প্যাসেঞ্জারির প্রথমে তিন সের আলু, তারপর দশ কিলো মিহিদানা, এতেই তো তিন মাসের মান্থলি টিকিটের দাম উঠে গেছে। তারপর যদি কপালে থাকে তো কারো ফেলে যাওয়া গয়নার বাক্সও পেয়ে যেতে পারে। কার ভাগ্যে কী আছে কেউ বলতে পারে?

রানাঘাটের এ-এস-এম হরিপদবাবুর সঙ্গে মুখ চেনা ছিল বরাবর। হারাধনবাবুকে দেখলে আর টিকিট দেখতে চাইতো না। সেদিন সরাসরি কথা বললে।

জিজ্ঞেস করল—এ কি, আপনার এত দেরি?

হারাধনবাবু বললে—আজ্ঞে, এই আর কি একটু কেনাকাটা করছিলুম বৈঠকখানায়—

—কী কিনলেন?

—এই এক ঝুড়ি ফুলকপি।

হরিপদবাবু কপির ঝুড়িটার দিকে চাইলে। বললে—কত নিলে?

হারাধনবাবু বললে—খুব সস্তায় পেলুম। পাঁচ টাকা শ'—

—সে কী?

চম্‌কে উঠেছে হরিপদবাবু। পাঁচ টাকায় একশো ফুলকপি?

—এত কপি কী করবেন?

হারাধনবাবু বললে—কী আর করবো? একে-ওকে দেব। সস্তা দরে পেলে সবাই নিয়ে নেবে, আপনি নেবেন?

হরিপদবাবুর টিকিট চেক্ করা মাথায় উঠলো। গেট ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বললে—দিন না একটা—দেবেন?

হারাধনবাবু পাশে গিয়ে কপির ঝুড়িটা নামালো। টিকিট চেকার কপির ঝুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আরো কিছু কিছু লোক জুটে গেল।

সবাই কপি দেখে অবাক। অসময়ের কপি বলে সকলেরই লোভ তার ওপর। কত করে দর দাদা? হরিপদবাবু বললে—এ তো বিক্রির জন্যে নয়, এই হারাধনবাবু শেয়ালদা থেকে কিনে এনেছেন, আমাকে একটা দিচ্ছেন দয়া করে—

সকলে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো কপির ঝুড়ির ওপর।

একজন বললে—আমি একজোড়া নিলাম—

বলে দু'টো কপি তুলে নিলে। তারপর একটা আধুলি গছিয়ে দিলে হারাধনবাবুর হাতে। হারাধনবাবু আধুলিটা নিয়ে কী করবে প্রথমটায় বুঝতে পারলে না। তারপর দেখতে দেখতে আরো লোক পয়সা এগিয়ে দিলে। পকেট ভর্তি হয়ে গেল। চেকার হরিপদবাবু পয়সা দিতে যাচ্ছিল, হারাধনবাবু তাঁর হাত চেপে ধরলে।

বললে—আপনার কাছে আর পয়সা নিতে পারবো না, মাফ করবেন আমাকে—

হরিপদবাবু বললে—সে কী? আপনি তো আর দান-ছত্তর করতে বসেননি, আপনি তো পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে এসেছেন।

শেষ পর্যন্ত হরিপদবাবুর থেকেও পয়সা নিতে হলো বাধ্য হয়ে। যখন সবাই কপি নিয়ে চলে গেছে তখন ঝুড়িতে বাকি পড়ে আছে মাত্র গোটা কয়েক। কিন্তু দু'পকেট তখন খুচরো পয়সাতে ভর্তি হয়ে গেছে। মাগনায় পাওয়া কপি থেকে কয়েকটা টাকা লাভ হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই বউ এল, বললে—ঝুড়ি কীসের?

ঝুড়ির ভেতরে গোটা কয়েক মাত্র কপি দেখে অবাক।

বললে—এ কি, এত বড় ঝুড়ি আর চারটে কপি মোটে?

হারাধনবাবু বললে—এনেছিলুম এক ঝুড়ি ভর্তি, সস্তায় পেয়েছিলুম, ভাবলুম অসময়ের কপি খাবো। কিন্তু সবাই কেড়ে নিলে—

—সবাই মানে?

—আরে টিকিট চেকার হরিপদবাবুকে কি 'না' বলতে পারি! তারপর সবাই কাড়াকাড়ি করতে লাগলো কাউকে কিছু বলতে পারলুম না। শেষকালে চারটে কপি যখন রইল তখন হাত জোড় করলাম। বললাম—না, আর বেচতে পারবো না, আমার ছেলেমেয়ে খাবে।

বলে হাত-মুখ ধুতে চলে গেল।

রাত্রে যখন বউ মেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন হারাধনবাবু উঠলো। এটা হারাধনবাবুর নিয়ম। তখন একটা নোটবই বার করে তাতে লিখতে লাগলো। ওটা হিসেবের খাতা। ওতে দুটো পয়সা আয় হলেও লেখা থাকে, ব্যয় হলেও তা লিখতে হয়। মাসের শেষে তা যোগবিয়োগ হয়। তাতে জীবনেব ডেবিট-ক্রেডিট হয়ে যায়। ডেবিট থাকলে ডেবিট, আর ক্রেডিট থাকলে ক্রেডিট। তা ক্রেডিট থাকে সাধারণতঃ হারাধনবাবুর।

বসে বসে মিহিদানার হিসেবটা হারাধনবাবু লিখতে লাগলো। আগের বারে আলুতে লাভ ছিল পাঁচ টাকা বারো আনা। দশ দিনের বাজারের আলু কেনা বেঁচে গিয়েছিল। এবারে কপির হিসেবটা নিয়ে বসলো। পকেটের একগাদা খুচরো পয়সা বার করে মেঝের ওপর রাখলে। তারপর সিকি দু'আনি, পয়সা সব গুণে গুণে এক দিকে রাখতে লাগলো। মোট বারো টাকা ক্রেডিট। ইনভেস্টমেণ্ট করতে হলো না একটা পয়সাও। লাভ পুরোপুরি।

যখন সব হিসেবপত্র হলো, নোট খাতায় লিখে টোটাল টানা হলো তখন ছুটি। আলো নিভিয়ে আবার নিঃশব্দে গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বউ তখন জেগে উঠেছে। তক্তপোষটা বোধ হয় একটু নড়ে উঠেছিল। ঘুমেব ঘোরেই জিজ্ঞেস করলে—কে? কে?

হারাধনবাবু সসঙ্কোচে বললে—কেউ না, আমি।

—তুমি? তুমি কী করছিলে?

—এই বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছিল একটু জল খেয়ে এলুম।

—ও—বলে বউ আবার পাশ ফিরে শুলো। শুয়েই আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

হারাধনবাবুও আব দেরি করলে না। সারাদিন বড় ধকল গেছে। চোখ দুটো যেন ঘুমে জুড়ে আসছে। দুচোখ এক করতে যা দেরি। তারপরেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তার আর খেয়াল রইল না।

সেদিন ওই রকম আর একটা জিনিস পেয়ে গেল।

এক এক সময় হারাধনবাবুর হাসিও আসতো। হাসি আসতো মানুষের ভুলো মন দেখে। এত ভুলো মন। এত ভুলো মন হলে কি চলে গো? ট্রেনে উঠবে, উঠে জিনিস-পত্র বেঞ্চির তলায় রাখবে, কিম্বা বাঙ্কের ওপরে। কিন্তু নামবার সময় কেন খেয়াল থাকে না বাপু?

অবশ্য লাভ তাতে হারাধনবাবুরই। মাসে যদি এমনি করে দশ পনেবো টাকার মালও হাতে আসে তাতেই কি কম লাভ? মাসে দশ-পনেরো টাকা হলে বছরে দাঁড়ায় একশো পঞ্চাশ কি একশো আশি টাকার মতন। তাই-ই বা কম কী? মাসে দু'টাকা মাইনেও তো বাড়বে না। দুটাকা দূরে থাক। আট আনা মাইনে বাড়াবার জন্যে বললে ভোলানাথবাবু রেগে কাঁই হয়ে যাবে। মুখ খিঁচিয়ে বলবে—অফিসে লেট করে আসার সময় তো মনে থাকে না? আবার মাইনে বাড়াবার কথা বলছো?

তার চেয়ে এই-ই ভালো। এতে তবু দুটো বাড়তি পয়সার মুখ দেখছে। তাই তো সবাই যখন ট্রেনের ভিড় নিয়ে আলোচনা করে তখন হারাধনবাবু রেগে যায়।

বলে—ভিড় হলো তো দোষের কী মশাই? মানুষ ট্রেনে চড়বে না তা বলে? একজন মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে—তা বলে এত ভিড়? এ মানুষ না পঙ্গপাল? হারাধনবাবু বললে,—ও কথা বলবেন না, মানুষ হলো লক্ষ্মী।

মানুষ না হলে পৃথিবী চলতো? আছে বলেই ট্রেন চলছে। নইলে কে ইঞ্জিন চালাতো?

মানুষ যে লক্ষ্মী তা সবাই বোঝে, তবু সব কিছু বুঝে মানুষ অবুঝ হয়ে যায়। কেউ নতুন

জুতো ময়লা পা দি ...র্ডিয়ে দেবে। নতুন জামা পরবার উপায় নেই কারো, কারো ছাতার খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যাবে। অফিস টাইমে ট্রেনের ভেতরকার চেহারা আরো ভয়ানক। ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে প্যাসেঞ্জাররা দাঁড়িয়ে থাকবে অন্য লোকের ঘামে নিজের জামা ভিজে যাবে। কেশে গয়ের ফেলবার জায়গা থাকে না একতিল। এত ভিড়ে বিরক্ত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু নির্বিকার মানুষ হারাধনবাবু। ভিড় না হলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় হারাধনবাবুর। খেয়ে দেয়ে প্ল্যাটফরমে গিয়ে যদি দেখে লোকজনের ভিড় নেই তো বড় মন খারাপ লাগে।

একবার হরিপদবাবুকে দেখে জিজ্ঞেস করে—কী ব্যাপার, আজকে প্ল্যাটফরমে ভিড় নেই কেন বলুন তো?

হরিপদবাবু বলে—আজ যে ছুটি?

—ছুটি?

ছুটি শুনে চমকে যায় হারাধনবাবু। তার অফিসেরও ছুটি নাকি? কই, কিছু তো সারকুলার বেরোয়নি।

—কীসের ছুটি বলুন তো?

—জামাই ষষ্ঠি যে!

—তা অফিসে কি জামাই ষষ্ঠিরও ছুটি হচ্ছে নাকি আজকাল? আমাদের অফিস তো ছুটি দেয়নি।

হরিপদবাবু বললে—ছুটি কি আর দেয়? অফিসে না-গেলেই ছুটি। কেউ যাবে না অফিসে। বিকেলবেলায় ট্রেনে সবাই শ্বশুর বাড়ি যাবে। তারা তো আর আমাদের মতো নয়। আমাদের ছ্যাঁচড়া চাকরি, তাই আসতে হয়। কিন্তু ব্যাপারিরা? ব্যাপারিদের তো আর জামাই-ষষ্ঠি নেই।

হরিপদ বললে—ব্যাপারিরা যাবে ঠিক। দেখুন না, তারা এসে পড়লো বলে—

সত্যিই খানিক পরে ব্যাপারিরা এসে পড়লো। এরা সকাল বেলা এখান থেকে কলকাতায় যায়। সারাদিন বড়বাজারে কেনা বেচা করে, আর শেষ ট্রেনে আবার ফেরে, এদের সঙ্গে মালপত্রও থাকে, আবার নিজেদের সংসারের খুঁটিনাটি জিনিসও থাকে। কখনও জামা-ফ্রক, কখনও বা জুতো-কাপড় গেঞ্জি। কলকাতা শহরের জিনিসপত্রের ওপর রাণাঘাটের মানুষদের অনেক লোভ। তা সেদিন হঠাৎ এক জোড়া নতুন জুতো দেখে বউ অবাক।

জুতোর বাক্স দেখে বউ বললে—এ জুতো নাকি? জুতো আনলে কার, তোমার? তুমি তো এই সেদিন জুতো কিনলে?

হারাধনবাবু বললে—না, আমার নয়।

—তবে, খোকার?

বাক্সটা খুলে অবাক। এ কার পায়ের জুতো গো?

হারাধনবাবু বললে—কার আবার? কারোই নয়।

—কারোর জন্যেই নয়? তাহলে কিনলে কেন?

—বললে—আরে সস্তায় পেলাম তাই কিনলাম।

—সস্তায় মানে? কত দাম নিলে?

—বললে—পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকা সস্তা হলো? পাঁচ টাকায় এক সের মাংস হতো। এ জুতো কারোর পায়ে হবে না, শুধু শুধু পাঁচ টাকা দিয়ে জুতো কিনতে গেলে কেন?

—বললে—বাক্স্ স্কিনের জুতো, এ তুমি পাঁচ টাকায় কোথায় পাবে? কেউ দেবে তোমার মুখ-দেখে? অন্ততঃ কিছু না-হোক পঁচিশটা টাকা গালে চড় মেরে নিয়ে নেবে।

বউ রাগ করতে লাগলো। তার মাথায় এ-সব ঢোকে না। কখনও তো টাকা উপায় করতে হয়নি নিজেকে। তাই জিনিসের মর্ম বোঝে না। হাজার হোক, মেয়েমানুষের মাথায় আর কত বুদ্ধি থাকবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আর দেরি করলে না হারাধনবাবু। বললে—ভাত দাও।

বউও আর দেরি করলে না। তাড়াতাড়ি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিয়েই সংসারের কাজগুলো সেরে নিলে। ততক্ষণে স্নান সেরে নিলেন হারাধনবাবু।

বউ শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে—আজ এত তাড়াতাড়ি কেন যাচ্ছো?

হারাধনবাবু রেগে গেল। বললে—সব কথাতে তোমার থাকা কেন বলো দিকিনি? তোমার ঘর-সংসারের ব্যাপারে আমি থাকি?

বলে রেগে-মেগে তাড়াতাড়ি ভাত গিলে নিয়ে উঠলো। তারপর গায়ে জামা গলিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো স্টেশনের দিকে।

কিন্তু নলিনী অধিকারী মশাই ধরে ফেলেছে। বৈঠকখানাতেই বসে ছিলেন তিনি।

বললেন—কী গো হারাধন, আজ এত সকাল সকাল যে, ছ'টা সাতচল্লিশ ধরতে বুঝি?

—দাঁড়ালো। বললে—আজ্ঞে না, এই জুতো কিনে মুশ্‌কিলে পড়েছি—

বলে হাতের জুতোর বাক্সটা উঁচু করে দেখালে। নলিনী অধিকারী মশাই বললে—জুতো? জুতো কীসের? জুতো কিনলে নাকি? দেখি, কী জুতো কিনলে?

—খানিক দাঁড়ালো।

জুতোর বাক্সটা উঁচু করে দেখালো।

নলিনীবাবু একটু আগ্রহ দেখালেন। দাঁড়ালেন—বললেন—দেখি, কী রকম জুতো?

—বললে—আমার আবার ট্রেন লেট হয়ে যাবে।

জুতো দেখে নলিনীবাবু বললেন—কত নিলে?

হারাধনবাবু বললে—দশ টাকা—

—দশ টাকা!

শুনে চম্‌কে উঠলেন নলিনীবাবু। দশ টাকায় এত ভালো জুতো!

বললেন—দেখি দেখি,—

বলে জুতো-জোড়াটা উল্‌টে-পাল্‌টে টিপে দেখতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো জুতোটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। বললেন—কোন দোকান থেকে কিনলে?

হারাধনবাবু বললে—কোনও দোকান-টোকান থেকে নয়। এমনি একজন শেয়ালদা স্টেশনে ধরলে। খুব অভাবগ্রস্ত লোক। বললে খেতে পাচ্ছে না। তাই দয়া হলো, দশ টাকা দিয়ে নিয়ে নিলুম—

—তা এখন ফেরত দিতে যাচ্ছো কেন?

বললে—পায়ে হচ্ছে না। আমার পায়ে হচ্ছে না। তাই আপিসে নিয়ে যাচ্ছি, যদি কাঁরোর পায়ে হয়, বেচে দেব।

নলিনী অধিকারী মশাই বললেন—তাহলে দাও তো, আমার পায়ে হয় কি না দেখি—

হারাধন জুতোটা বাড়িয়ে দিলে।

নলিনীবাবু একটা জুতো নিয়ে পায়ে গলালেন। তারপর আর একটা জুতোও পায়ে গলালেন। জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের মেঝের ওপর খানিকক্ষণ পায়চারি করে বেড়ালেন। হাত দিয়ে টিপলেন। নানাভাবে পরীক্ষা করলেন।

তারপর বললেন—আমার পায়ে তো বেশ ফিট্ করেছে মনে হচ্ছে।

হারাধনবাবু এতক্ষণ নজর দিয়ে দেখছিল।

বললে—হ্যাঁ, আপনার পায়ে তো বেশ ফিট করেছে—

—তাহলে এটা আমাকেই দিয়ে দাও না হারাধন!

বললে—তা নিন্ না আপনি। আমার নিজের পায়ে তো ঠিক হচ্ছে না। তখন ইষ্টিশানে তাড়াতাড়িতে ভালো করে দেখে নেওয়া হয়নি।

—যে টাকায় কিনেছি, সেই টাকাতেই দিয়ে দেব। আমি তো লাভ করবার জন্যে বেচছি না। দশ টাকায় কিনেছি, দশ টাকাই দেবেন—

নলিনীবাবুর জুতো জোড়া পছন্দই হয়েছিল প্রথম থেকে। ভেতর থেকে দশটা টাকা এনে দিতে বললেন চাকরকে, টাকা দিয়ে জুতো জোড়া রেখে দিলেন।

শেষকালে অফিসসুদ্ধ লোক হাল ছেড়ে দিয়েছে। রেল অফিস যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। কারো জন্যে তো কোনও জিনিস কখনও আটকায় না। রেলও আটকালো না। গড়-গড় করে লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলতে লাগলো। কত লোকের প্রমোশন হলো, বদলি হলো, কত লোকের কত কী হলো তার ইয়ত্তা নেই।

মানুষের জীবন একটা বিন্দু থেকে শুরু হয়ে কত উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আবার একটা ছোট বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়। মাঝখানটার নাটকে জড়িয়ে পড়ে কেউ মাথা উঁচু করে ওঠে, আবার কেউ বা অতলে তলিয়ে যায়। রেল-অফিসেও তাই হলো। আমাদের সমীর ছোট চাকরিতে ছোট মাইনেয় ঢুকেছিল। সে ইন্‌স্পেক্টর হয়ে বড় মাইনের ডিসট্রিক্টে বদলি হয়ে গেল। ভোলানাথবাব রিটায়ার করলেন। বিনয়বাবুর জায়গায় এসেছিলেন ভোলানাথবাব। সেই ভোলানাথবাবুও চলে গেলেন একদিন। তার জায়গায় এলেন রামলিঙ্গমবাবু।

কিন্তু হারাধনবাবুর সেই একই মাইনে, একই চেয়ার। একই ঘর। তার কাজও নেই, কামাইও নেই। রামলিঙ্গমবাবুও হারাধনবাবুকে ঘাঁটালেন না। বললেন—ওকে যেতে দাও হে, ওকে আর ঘাঁটিও না--

ঘটনাচক্রে আমিও একদিন বদলি হয়ে বাইরে চলে গেলাম। হারাধনবাবুর সঙ্গে আমারও আর কোনও যোগাযোগ রইল না।

কিন্তু যোগাযোগ না-রাখলে কী হবে। কলকাতাতে তো আসতে হতো মাঝে মাঝে। যখনই আসতুম গিয়ে দেখা কবতুম হারাধনবাবুর সঙ্গে। সেই চেয়ার, সেই পাশে থলিটা থাকতো।

জিজ্ঞেস করতুম—আজকে কী এনেছেন হারাধনবাবু? থলিতে কী আছে?

হারাধনবাবু লজ্জার হাসি হাসতো। বলতো—আরে ভাই, রোজ কি আর থলিতে কিছু থাকে? সস্তা কিছু পেলে তবে কিনি। ওই নেশা আর কি—

বললাম—আজকে কী আছে, তাই বলুন না।

—এই ভাই এক নাগরি গুড় আছে।

কখনও গুড়, কখনও মিহিদানা, কখনও আলু, কখনও জুতো, আবার কখনও বা ফুলকপি। সেই তখনও অভ্যেস দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। অনেক মানুষই অভ্যেসের দাস। সুতরাং হারাধনবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ কী? এক এক সময় নিজেই ভাবতাম, শুধু তো হারাধনবাবু নয় আমরাও তো এক একজন আস্ত হারাধনবাবু। আমরা যেখান থেকে পারি কত কী কুড়িয়ে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে বেড়াই। ভাবি পরমার্থ পেলাম। কিন্তু তারপর?

তারপরের কথা পরে বলবো। এবার হারাধনবাবুর জীবনের আর এক দিনের ঘটনা বলি।

সেদিন হঠাৎ ট্রেনের কামরার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রানাঘাট থেকে ছাড়বার সময় তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু ভিড়টা বাড়লো নৈহাটি থেকেই। শেষকালে আর বসবার জায়গা নেই একতিল। বাকি লোক দাঁড়িয়ে রইল। পরের স্টেশনে আরো লোক উঠলো।

পাশের লোকটা বলল—আজকে এত ভিড় কেন মশাই—জ্বালাতন করলে তো দেখছি—

শুধু লোক নয় লোকের সঙ্গে আবার তেমনি মাল-পত্র। হারাধনবাবু প্রথম থেকেই চোখ বুঁজে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল। তারপর থেকে সজাগ দৃষ্টি কে কোথায় কী জিনিস রাখলো। একজনের সঙ্গে একটা সুটকেস। মনে হচ্ছে সুটকেসের ভেতরে দামী কিছু আছে।

কড়া নজর রাখতে হবে। তাব পাশের আর একটা লোকের হাতে একটা গুড়ের নাগরির তলায় একটা বিঁড়ে। লোকটা সেটাকে বেশ নিরাপদে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। তারপর ব্যাগটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরেই গণ্ডগোলটা বাধলো। জায়গা নিয়ে সূত্রপাত। তাই থেকে চেঁচামেচি গালাগালি।

একজন বললে—তা বলে আপনি আমার পা মাড়িয়ে দেবেন?

অন্য লোকটা বলে উঠলো—একটু সাবধান হয়ে পা রাখতে পারেন না?

আগেকার ভদ্রলোক বললে—মশাই আমার পা কোথায় রাখবো সে আমি ভাববো, আপনি আমাকে শেখাতে আসবেন না—

অন্য লোকটা বললে—আলবাৎ শেখাবো, আপনি বেশি বক্‌বক্‌ করবেন না—

—বেশ করবো বক্‌বক্‌ করবো।

—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবেন।

আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলো। গাড়ি শুদ্ধ লোক ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠলো। দু'একজন এই ঝগড়ার মধ্যে মাথা গলালো। একজন বললে—মশাই, আপনারই তো দোষ। আপনিই তো প্রথমে গালাগালি দিলেন—

—কী বলছেন আপনি? আমি গালাগালি দিলুম না, উনি প্রথম আমাকে গালাগালি দিলেন?

—না মশাই, আমরা তো গোড়ার থেকে শুনছি, আপনারই তো দোষ!

ভদ্রলোক চটে গেল। বললে—আপনি কেন কথা বলতে আসেন মশাই আমাদের মধ্যে? আপনি কে?

এবার গাড়ি সুদ্ধ লোক যোগ দিলে।

একজন বললে—আপনি তো অন্যায় কথা বলছেন মশাই—

—অন্যায় তো আপনারই, আপনি কেন পা মাড়িয়ে দিলেন ওর?

বলতে বলতে সবাই যেন মারমুখী হয়ে গেল। কে একজন বুঝি ঘুঁষি তুলেছিল আর একজন সত্যি-সত্যিই ঘুঁষি মেরে দিল একজনকে।

তারপরই শুরু হয়ে গেল দাঙ্গাবাজি। সে এক তুমুল কাণ্ড। ট্রেন তখন হু-হু করে চলেছে। ট্রেনও চলেছে, দাঙ্গাও চলেছে। কামরা শুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। ছাতা-জুতো ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেছে। একজন কিছু উপায় না পেয়ে ট্রেনের চেন্‌ টেনে দিলে।

কিন্তু ট্রেন থামলো না। হারাধনবাবু এক কোণে বসে সব দেখছিল। কোনও উচ্চবাচ্য করলে না। মজা দেখছিল গোড়া থেকে। খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল আরো চলুক। যতক্ষণ না ট্রেন শেয়ালদায় পৌঁছায় ততক্ষণ চলুক।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। যা ভেবেছিল হারাধনবাবু ঠিক তাই। শেয়ালদায় ট্রেন পৌঁছতেই পুলিশ এল। পাঁচ-সাত জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরলো।

সকলের শেষে উঠলো হারাধনবাবু। দেখলে সুটকেসটা আর সেই গুড়ের নাগরিটা তখনও পড়ে আছে। কামরা ফাঁকা হয়ে গেছে। হারাধনবাবু ডাকলে—এই কুলি, কুলি—

একজন লাল কুর্তা পরা কুলি আসতেই হারাধনবাবু বললে—এই মাল দু'টো ওঠা—চল্‌—

কুলিটা মাল দু'টো মাথায় তুলে নিয়ে প্ল্যাটফরম পার করিয়ে দিলে। বললে—কীসে যাবেন রিকসা, না ট্যাক্‌সি?

মহা মুশকিলে পড়লো হারাধনবাবু। এখন এত মাল নিয়ে কোথায় যায়?

অফিসে এত মাল নিয়ে গেলে সবাই-ই কী বলবে?

বললে—দাঁড়া বাবা, একটু ভাবি—

বাসে তখন ভীষণ ভিড়। ট্রামেও তাই। লোকই পা রাখবার জায়গা পাচ্ছে না। তার ওপর সুটকেস আর গুড়ের নাগরি দেখলে মারতে আসবে। এমন সময় এক রিক্‌শাওয়ালা এল।

—বাবু, কাঁহা যাইয়ে গা?

—ধর্মতলা যাবো, কত নিবি?

বেটারা যা হেঁকে বসে তাতে কথা বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত আট আনায় রফা হলো। বৌবাজার পর্যন্ত। বৌবাজার থেকে আর একটা রিক্‌শায় ধর্মতলা। ধর্মতলা থেকে আবার রিক্‌শা।

এই রকম করে পাঁচ খেপ্-এ অফিসের দরজায়। রিক্সায় বসে বসেই হারাধনবাবু সাবধানে সুটকেসটা খোলে। ভেতরে কাপড়ের থান। খুব দামী থান। অন্ততঃ দশ থান কাপড়। কিছু কম করেও সাত টাকা করে গজ হবে থানের। বেচলে দু'তিনশো টাকার মাল হবে বেকসুর।

আর গুড়টা? দু'টাকা করে সের হলেও দশ সেরের দাম কুড়ি টাকার মতন

অফিসের গুর্খা দারোয়ানটাও অবাক। বললে—বাবুজী, এ সব কেয়া হ্যায়?

হারাধনবাবু বললে—আরে বাবা, মাল হ্যায় মাল, দেশ সে আতা হ্যায়—

অর্থাৎ দেশ থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে আসছে। দেশ থেকে যখন আসছে তখন হাতে তো জিনিস-পত্র থাকবেই।

সেকশানে আসতেই সবাই ধরে বসলো এতখানি থান নিয়ে কী করবে হারাধনবাবু?

তারা বললে—আপনি এত কাপড় কী করবেন মশাই? আপনি কি বুড়ো বয়েসে কোট প্যান্ট পরে সাহেব সাজবেন?

তা শেষ পর্যন্ত তাই হলো। আট টাকা করে গজ দিয়ে সবাই কিনে নিলে। কিন্তু টাকা কেউ নগদ দিলে না। মাইনের দিনেই দেওয়া নিয়ম এসব ব্যাপারে। দশ ইনটু আট টাকা মানে আশি টাকা। একদিনে আশি টাকা শুধু কাপড় বেচেই। আর বাকি রইল গুড় আর সুটকেস।

গুড়টাও খানিকটা বিক্রি হয়ে গেল। তিন টাকা করে গুড় থেকে এল। মোট তিরাশি টাকা। তখন বাকি রইল খালি সুটকেসটা, আর সের দু-য়েক গুড়। সের দুয়েক গুড় বাড়িতেই খেয়ে নেবে।

সেদিন বাড়িতে গিয়ে বউও অবাক।

অনেক দিন অনেক রকম জিনিস এনেছে কর্তা, কিন্তু পুরোন সুটকেস কখনও আনেনি। এক হাতে সুটকেসটা আর এক হাতে গুড়ের নাগরি।

—এ কি, সুটকেস কীসের?

—কিনলুম আমি।

—পুরোন সুটকেস কিনলে?

হারাধনবাবু বললে—পুরোন সুটকেস হলে কী হবে? জিনিসপত্র রাখবার জায়গা ছিল না, তাই কিনলাম।

—কত নিলে?

—তিন টাকা। কত সস্তায় পেলুম বলতো! তিন টাকায় আটাশ ইঞ্চি সুটকেস কেউ পাবে? নতুন একটা সুটকেসের দাম কত জানো? চল্লিশ টাকার কমে কেউ ছাড়বে না—পুরোন সুটকেস হলে ক্ষতিটা কীসের? বাইরে কেউ জানতে পারছে না তো যে সুটকেসটা পুরোন—

বউ যেন কি বললো। বললে—তা ঐ গুড? গুড়টা কত নিলে?

হারাধনবাবু বললে—গুড়ের কথা আর বলো না। এখন নলেন গুড় কোথায় পাবে লোকে? চোখেই কাড়াকাড়ি করে দিলে সবাই! অফিসে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, 'না' বলি কেমন করে?

বউ গুড়ের নাগরিটা খুলে ভালো করে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। নাক কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো। তারপর বললে—আহা, বেশ গন্ধ—

কিন্তু দিন তো কারো বসে থাকে না। হারাধনবাবুর দিনও বসে রইল না। দিন বেড়ে চললো, পৃথিবীও এগিয়ে চললো হারাধনবাবুর সংসার তখন বেড়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে হয়ে সংসারের ঝামেলাও তখন বেড়ে গেছে। বউ-এর সময় নেই। সবগুলোর পেটের খোরাকের ব্যবস্থা করতে বউ নাজেহাল। যখন মেজাজ ভালো থাকে না তখন যত চাপ পড়ে হারাধনবাবুর ওপর। আর হারাধনবাবুর ওপর ছাড়া কার ওপরেই বা চাপ পড়বে।

রাগের ওপর বলে ফেলে—আমি আর পারবো না সংসার করতে। সংসার তোমার রইল, আমি যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো—

হারাধনবাবু বলে—তা যাবে তো, কিন্তু সেখানে গিয়ে খাবে কী?

বউ-এর তখন মাথা গরম। বললে—কচু খাবো, ঘেঁচু খাবো—

হারাধনবাবু হো-হো করে হেসে ওঠে। বললে—কচু ঘেঁচু তো খাবে, কিন্তু অসুখ হলে তখন কী করবে? তখন কে ডাক্তার দেখাবে? ডাক্তারের টাকা কে দেবে?

বউ রেগে যায়। বলে—তুমি আর হেসো না। তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়, কোনও কাজে-কম্মে নেই, কেবল কথা!

হারাধনবাবু বললে—তা আমি কী করবো বলো? আমি তো আপিস কামাই করতে পারি না তাহলে? তুমি তো আপিসে কাজ করোনি কখনও। কাজ করলে বুঝতে আমার কত জ্বালা। বাড়িতে যেমন তোমার জ্বালা, তেমনি জ্বালা আমার আপিসে—

—রাখো তোমার আপিস। বাপের জন্মে আমি অমন আপিস দেখিনি। এই তো এ দেশে কত লোক আপিসে কাজ করে, কে তোমার মত এত সকালে আপিসে যায়? তোমার কি ছুটি বলেও একটা জিনিস নেই। মুখপোড়ার আপিসে কি ছুটিও দিতে নেই? এত আপিস থাকতে ও আপিসে ঢুকলে কেন? অন্য আপিসে ঢুকতে পারলে না?

কথাটা বউ মন্দ বলেনি। শুধু বউ কেন, ও-কথা অনেকেই বলে।

সবাই বলে—এ তোমাদের কী রকম আপিস হে? ছুটি নেই?

হারাধনবাবু বলে—রেলের আপিস যে, ছুটি হলে রেল চলে। রেলের আবার ছুটি কী? শ্মশানে যাদের চাকরি তাদের কি ছুটি আছে? বাইরে যে যা-জানুক, ছুটি হলে কি হারাধনবাবুই বাঁচতো? ছুটি মানেই তো লোকসান। দিন গেলে বাড়িতে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এতগুলো লোক খেতে, এতে শুধু শুখো মাইনেতে কি পেট ভরে?

এসব কথা মেয়েমানুষে বুঝবে না। মেয়েমানুষ শুধু হাঁড়ি-কুড়ি ঠেলতেই জানে। কত ধানে যে কত চাল তা তো জানে না ওরা, শুধু মুখ-ঝামটাই দিতে পারে। মাইনের টাকা তো সাতদিনের মধ্যেই ফরসা। তারপরে বাকি মাসটা চলে কী করে?

—তা বলুক তো, ও-রকম কত লোকে কত কী বলবে, তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে?

বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু যত দিন যায় ততই যেন শরীরে ক্লান্তি লাগে। আগেকার মত শরীরে আর জোর পায় না হারাধনবাবু, ভোরবেলা উঠতে হয় সকাল-সকাল ট্রেন ধরবার জন্যে। তার আগে বাজার করা আছে, চান করা আছে। তারপর এতখানি রাস্তা। খেয়ে উঠে জোরে জোরে হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে।

তবু নেশার ঘোরে যেটুকু ঘোরা। মাতালের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। তখন মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করে। মাথার ওপর সূর্যটা টা টা করে। কিন্তু তবু শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। সোজা ইস্টিশানের দিকে হেঁটে যায়। চেকারবাবু তারপর থেকে চিনতে পারতো। বলে- কী হারাধনবাবু, চলছেন?

শুধু ওইটুকু কথা। হারাধনবাবুও নমস্কার করতো—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দিনগত পাপক্ষয়—

তারপরে যথারীতি ট্রেন। আর ট্রেনে উঠেই সেই এককোনে বসে ঘুম। শেষকালের দিকে আর তেমন ঘুম আসতো না। চোখ বুঁজে পড়ে থাকতেন ঘাপটি মেরে। একটু ঘুম হলে তবু কিছুটা শান্তি হতো। কিন্তু তা আর হবার নয়!

একদিন রেলের ডাক্তারখানায় গিয়ে হাজির হলো হারাধনবাবু।

বুড়ো কম্পাউণ্ডার বললে—কী হয়েছে?

হারাধনবাবু বললে—ডাক্তারবাবুকে একবার দেখাবো?

—কার অসুখ? আপনার না ছেলে-মেয়ের?

—আমার।

—ভেতরে যান—

ভেতরে ডাক্তারবাবু বড় ব্যস্ত তখন। দশটা রোগী ঘিরে রয়েছে তখন তাকে। একটার হাতের নাড়ি টিপে রয়েছে, অন্যটার জিভ পরীক্ষা করছে। সেই অবস্থাতেই হারাধনবাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী অসুখ?

হারাধনবাবু বললে—আজ্ঞে ঘুম হয় না—

ডাক্তারবাবুর অত সময় নেই যে সকলের কথা মন দিয়ে শোনে, রেলের চাকরি ডাক্তারবাবুর। রোগী মরলো কি বাঁচলো তার দায়-দায়িত্ব ডাক্তারের নয়। তার চাকরি বজায় থাকলেই হলো। রোগী মরলেও তার চাকরি থাকবে। তার চেয়ে বরং বাড়িতে কল্ দাও, আমি ফিস্ নিয়ে ভালো করে মন দিয়ে রোগীকে দেখে আসবো।

খানিক পরে ডাক্তারবাবু আর কথা বললে না। অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। হারাধনবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর ডাক্তারবাবু খাতায় কী যেন লিখলে। তারপর একটা কাগজ লিখে দিলে এগিয়ে। হারাধনবাবু কাগজটা নিয়ে কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে দিলে।

বললে—কী লিখে দিলে মশাই ঘষ্ ঘষ্ করে, দেখুন তো—

কম্পাউণ্ডারেরও কাজের শেষ নেই। এক হাতে ওষুধ দিচ্ছে আর মুখে দু'একটা কথা বলছে। বললে—হবে, হবে, অসুখ ভালো হবে—

হারাধনবাবু জিজ্ঞেস করলে—ঘুম হবে?

কম্পাউণ্ডারবাবু বললে—ডাক্তারবাবু যখন বলেছে তখন তো হবেই—

ওষুধটা নিয়ে হারাধনবাবু চলে এলো। কিন্তু সন্দেহ হলো একটু। ভালো করে দেখলে না ডাক্তার, এ ওষুধে কি কাজ হবে?

রাত্রে ওষুধটা খেয়ে চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল।

তরলা বললে—কী হলো, আজকে কথা বলছো না যে?

হারাধনবাবু বললে—ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, তাই ঘুমোতে চেষ্টা করছি—

এর পর আর কোনও কথা হলো না। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব শুধু এল ঘণ্টা দু-একের জন্যে। তারপর শেষ রাত্রের দিকে আবার যে-কে সেই। আর ঘুম এলো না। চোখ দু'টো অন্ধকারের মধ্যেই খুলে রাখলে। আর মাথার মধ্যে যত রাজ্যের চিন্তা। দুটো ভগবানের নাম নয়, চাকরির চিন্তা নয়। কেবল মনে হতে লাগলো লোকাল ট্রেন ঝিক্‌মিক্ করে চলেছে। আর প্যাসেঞ্জারে ভরে গেছে সারা কামরাটা। আর হারাধনবাবু যেন চোখ পিট্-পিট্ করে বেঞ্চির তলাগুলো দেখছে, বাঙ্কের মাথাগুলো দেখছে। কিন্তু আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলে না।

পাশে বউকে ঠেলতে লাগলো—ওগো, ওঠো-ওঠো—

বউ ধড়মড় করে উঠলো। চারদিকে চেয়ে দেখলে। অন্ধকার তখনও ভালো করে কাটেনি।

বললে—এত রাতে ডাকছো কেন?

হারাধনবাবু বললে—রাত কোথায়? ভোর হয়ে গেছে—

—ভোর? তবে এত অন্ধকার কেন?

হারাধনবাবু বললে—মেঘ করেছে হয়ত। ওঠো ওঠো, আজকে ভোরের লোকাল ধরবো—

আর দেরী করলে না তরলা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। উঠেই হাজারটা কাজের তাড়া। কাজগুলো যেন বাঘের মত সামনে হাঁ করে থাকে। কোন্ কাজটা ফেলে কোন কাজটা করবে সেইটেই হলো এবার আসল সমস্যা। আগের দিনের এঁটো বাসন সেগুলো পুকুরে নিয়ে গিয়ে মেজে আনতে হবে। তারপর উনুনে আগুন দেওয়া, চাল ধোওয়া, তরকারি কোটা। ততক্ষণে ছেলে-মেয়েগুলো ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ। তখন আর নিঃশ্বেষ ফেলবার সময় থাকে না তার। ওদিকে হারাধনবাবুর তাগাদা, কী গো, ভাত হলো?

কিন্তু সেদিন এক কাণ্ড হলো। হঠাৎ বাড়ির সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—কে?

শিবানী দৌড়ে গেল। দরজা খুলতেই দেখলে—কে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে অচেনা লোক।

—আপনি কাকে খুঁজছেন?

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—এটা হারাধনবাবুর বাড়ি তো?

—হ্যাঁ।

—তা তোমার বাবা কেমন আছেন?

শিবানী বললে—বাবা তো কলকাতায় গেছে।

—কলকাতায় মানে? আপিসে?

—হ্যাঁ। ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু আমি তো আপিস থেকেই আসছি। আজ তিন দিন থেকে তো তোমার বাবা আপিসে যাচ্ছে না, আমি ভাবলাম অসুখ-বিসুখ হলো কিনা দেখতে এলুম—

শিবানীও অবাক ভদ্রলোকের কথা শুনে। বললে—বাবার অসুখ কেন হতে যাবে। বাবা তো বেশ ভালো আছে—রোজ আপিসে যায়—

—আশ্চর্য তো!

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—অফিসে আমাদের সবাই ভাবছে হারাধনবাবুর জন্যে। একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি। আমি এদিকে একবার এসেছিলুম তাই খবর নিয়ে চলে গেলুম আর কি—

ভদ্রলোক খানিকটা অবাক হয়ে চলে গেল। তরলা পেছন থেকে কথাগুলো শুনছিল। অবাক সেও হলো। তবে যে বলে অফিসে খুব কাজ, অফিসে না গেলে বড়বাবু বকাবকি করবে। তাহলে অফিসে না গিয়ে কোথায় যায় মানুষটা?

কিন্তু রাত যখন দশটা বেজে গেছে তখন হারাধনবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। হাতে বিরাট একটা বোঝা। তরলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো হারাধনবাবুর মুখের দিকে।

হারাধনবাবু হাতের বোঝাটা নামিয়ে বললে—উঃ, আজকে আপিসে যা খাটুনি গেছে, খেটে খেটে একেবারে মরে গিয়েছি—

তারপর একটু হেসে বললে—দাও, এক গেলাস জল দাও—

তরলা রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে দিলে। ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে নিয়ে খালি গ্লাসটা আবার বউ-এর হাতে ফেরত দিল।

বললে—কী বেঁধেছ আজকে? এই দেখ কী এনেছি—

বলে হাতের বোঝাটার দড়ি খুলতে লাগলো। দড়ি খুলতেই একগাদা বেগুন উঁকি মারতে লাগল। তা প্রায় সের দশেক হবে।

বেগুনগুলো দেখে হারাধনবাবুর নিজের চোখই চক্ চক্ করে উঠলো। বললে—দেখেছ কী চমৎকার বেগুন? এখানে এক টাকার কমে কিলো দেবে না এরা। সস্তায় পেলুম তাই নিয়ে এলুম। কত করে নিয়েছি বলো তো?

বলে বউ-এর মুখের দিকে চাইলে। বউ-এর কিন্তু তখনও মুখ ভার! কীরকম যেন মনে হলো হারাধনবাবুর। এ-রকম তো করে না কখনও তরলা। অন্যদিন কিছু আনলে নাড়া-চাড়া করে, দর জিজ্ঞেস করে। কখনও বা বকুনিও দেয়। কিন্তু আজ কিছুই বলছে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর চাইলেন না বউ-এর মুখের দিকে। বেগুনগুলো তুলতে তুলতে বলতে লাগলো—একেবারে কচি ফল, জানো? এ বেগুন ভাজা খেতে খুব ভালো লাগবে, বেশ আল্গা তেলে একখানা করে ভাজবে আর একখানা করে লুচি ভেজে দেবে, তবে খেতে ভালো লাগবে। আর সেসব দিনও নেই, সে সব খাওয়াও নেই। এখন যত সব চালানি বেগুন, তার না আছে সোয়াদ না আছে—

তরলা কথার মাঝখানেই বাধা দিল। বললে--তুমি থামো!

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। হারাধনবাবু অবাক। এ কী হলো। এমন তো হয় না। অন্য দিন যখন জিনিস-পত্তর নিয়ে আসে তখন তরলা সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। পছন্দমত জিনিস হলে খুশী হয়। আজ তো সেরকম হলো না।

তরলা তখন রান্নাঘরে থালায় ভাত বাড়ছিল।

হারাধনবাবু সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে – কী হলো তোমার? শরীর খারাপ নাকি?

তরলা সে কথার উত্তর না দিয়ে ভাতের থালাটা নিয়ে সোজা এসে মেঝের ওপর ঠক্ করে রেখে দিল। যেন মেঝের উপর রাখলে না তরলা, হারাধনবাবুর কপালের ওপর রাখলো। বুড়ো মানুষ হয়েছে হারাধনবাবু। শব্দ হলে মেজাজও বিগড়ে যায় আজকাল।

বললে---কী হলো কী তোমার?

তরলা বললে---কিছু হয়নি। হবে আবার কী? আর আমার যদি কিছু হয়ই তো তোমার কী? তুমি কেবল তোমার আলু বেগুন-পটল নিয়েই থাকো। আমি যখন মরবো তখন ওই আলু-বেগুন-পটল দিয়ে আমাকে পুড়িও –

মুখের খাওয়া মুখেই রইলো। হারাধনবাবু যেন বিষ খাচ্ছে মনে হলো। বললে---কী হলো বলো দিকিনি তোমার? আমি মরে মরে সংসারের জন্যে সাশ্রয় করছি, আর আমাকে কিনা ওই কথা বলছো? আমি তাহলে কার জন্যে খাটছি? আমার নিজের জন্যে?

এবার তরলাও গলা চড়িয়ে দিলে। বললে –তাহলে রোজ কোথায় যাও শুনি? আপিসে যাবার নাম করে কোথায় যাও শুনি?

হারাধনবাবু বললে—কোথায় আবার যাই! অফিসে যাই। সংসারের পিণ্ডি গেলাবার জন্যে অফিসে যেতে হবে না?

তরলা বললে—বুকে হাত দিয়ে তুমি বলতে পারো যে আপিসে যাও তুমি? আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে তুমি যা বলবে তাই আমি বিশ্বাস করবো ভেবেছ?

—তার মানে?

তরলা বললে—তুমি আর কথা বোল না। তোমার জারি জুরি সব আমি চিনে নিয়েছি। আমার মরণ হলে বাঁচি। আমাকে আলু-বেগুন দিয়ে ভোলালে আর ভুলছি নে—

বলে সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

—খাওয়া আর হলো না। উঠলো পিঁড়ি ছেড়ে। বউ-এর কাছে গিয়ে বললে—তোমার জ্বালায় আমি তো আর থাকতে পারছি না। শেষে কি আমি বিবাগী হয়ে যাবো বলতে চাও?

তরলা বললে—চেঁচিয়ো না। ছেলে-মেয়ে ঘুমোচ্ছে, চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারি করো না।

হারাধনবাবু এবার গলা নিচু করলো।

বললে---কী হয়েছে বলো তো সত্যি করে? তোমাদের জন্য আমি এত খেটে মরছি আর তুমিই কিনা বেঁকে বসলে। একেই বলে---যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

তরলা উঠলো বিছানা থেকে।

উঠে ঘরের বাইরে এলো। বললে---তুমি আপিসে যাও কিনা সত্যি করে বলো তো?

বললে---অফিসে যাই না কোথায় যাই?

—তাহলে তোমাদের আপিস থেকে আজ লোক এসে অন্য কথা বলে গেল কেন? সে লোকটা কি মিথ্যে কথা বলে গেল বলতে চাও?

মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। বললে আমাদের অফিস থেকে লোক এসেছিল? ক এসেছিল? কেন এসেছিল? নাম কী তার? কী বলে গেল সে?

তরলা বললে –এতদিনে বুঝেছি তোমার এতদিনকার কথা সব মিথ্যে। তুমি কোথায় যাও বলো দিকিনি সত্যি করে?

হারাধনবাবু বললে—কোথা থেকে কে এসে কী বলে গেল আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে? আমি অফিস যাইনি তো কোথায় গিয়েছিলুম?

—কোথায় যাও তা তুমিই জানো!

—অপিসে যদি না-যাই তো মাসে মাসে টাকা আসে কোত্থেকে? এই যে আলু-বেগুন-পটল-গুড়-জুতো-জামা, এসব কোত্থেকে হচ্ছে? কোত্থেকে এতগুলো পেট চলছে?

তরলা বললে—আমি অত-শত জানিনে বাপু, লোকটা আমাকে যা বলে গেল তাই বললুম। এখন তোমার যা-খুশী তাই করো। আমি আর পারছিনে, আমার ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন খেটে-খুটে তোমার সাথে আর বক্-বক্ করতে পারি নে।

বলে তরলা চলে গেল। আর কোনও কথা বললে না। হারাধনবাবুও আর কিছু না বলে নিজেও শুতে চলে গেল। কিন্তু মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো কথাগুলো। অফিস থেকে কে এসেছিল তার বাড়িতে।

সেদিন অফিসে যেতেই সবাই ছেঁকে ধরলে। সবাই বললে—কোথায় ছিলেন এতদিন হারাধনবাবু? কী হয়েছিল?

হারাধনবাবু বললে—আরে ভাই, শরীর খারাপ হলে কী করবো? শরীর তো আমার হাতে নয়!

আমি বললুম—কিন্তু অবিনাশবাবু যে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন আপনি বাড়ি নেই, আপনার মেয়ে যে বলেছে দেখ দিকিনি কাণ্ড! মেয়ে জানবে কী করে আমি কোথায় গেছি? আমি তো সকালবেলায় বেরিয়ে গেছি ডাক্তারের কাছে।

অবিনাশবাবুকে ডাকা হলো সঙ্গে সঙ্গে। হারাধনবাবু বললে—তুমি কী হে? বলা নেই কওয়া নেই, সেই রানাঘাটে গিয়ে হাজির হলে? সেই যদি গেলে তো বিকেলবেলার দিকে গেলে না কেন? দেখতে আমি চিৎপাত হয়ে আছি।

তা হতে পারে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত। হারাধনবাবুর কথায় সবাই চুপ করে গেল।

হারাধনবাবু আর কোনও কথা না বলে র‍্যাক্ থেকে ফাইল পেড়ে নিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলে। যত সব লোকের ভিড় হয়েছে অফিসে।

আমি টিফিনের সময় কাছে যেতেই দেখি হারাধনবাবু এক মনে ফাইল নিয়ে ব্যস্ত।

বললুম—খুব মন দিয়ে কাজ করছেন দেখছি।

হারাধনবাবু কাজ করতে করতে মুখ না তুলে বললে—না ভাই, তুমি আর আমার কাছে এসো না। তোমাদের সকলকে চিনে নিয়েছি আমি। তোমরা আমার পেছনে স্পাই লাগিয়েছ বুঝতে পারছি। তোমাদের সঙ্গে ভাই আমার সম্পর্ক কাট্-অফ্ হয়ে গেল আজ থেকে, এই বলে রাখলুম। এ সংসারে কেউ কারো নয়, এইটে সার জেনে নিয়েছি।

দেখলুম হারাধনবাবুর মুখটা অন্যদিনের চেয়ে একটু ভার-ভার। এরপর একদিন রিটায়ার করবার দিন এল। যেদিন শেষ অফিসে এল সেদিন আর কোনও কাজকর্ম নয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা, গ্রাচুইটি, এই সব নিয়েই ব্যস্ত রইল সারাদিন। এসট্যাবলিশমেণ্ট সেকশানেই তার সমস্ত দিন কেটে গেল। এতদিনকার অফিস এখানে আসা চিরকালের মত বন্ধ হলো।

যখন বেলা পাঁচটা বাজে-বাজে তখন এল বড়বাবুর কাছে। বললে—যাই—বড়বাবু—

বড়বাবু বিপিনবাবু। চাইলেন হারাধনবাবুর দিকে। বললেন—তাহলে চললেন?

হারাধনবাবু বললে—চলি। অফিস যখন এক্সটেনশান দেবে না তখন আর উপায় কী বড়বাবু? আপনাদের অনেক জ্বালিয়েছি। বরাবর লেট্ করে অফিসে এসেছি। কত ফাইন

নিয়েছি তারও ঠিক নেই। সেই বিনয়বাবু একদিন চাকরি দিয়েছিলেন, তারপর থেকেই এতকাল এক চেয়ারে বসে কাটালুম। আর দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের ব্যাপার।

বিপিনবাবু শেষকালে বললেন—এবার বাড়িতে বসে আরাম করুন গে—

—আরাম আমার কপালে নেই বাবু। দুটো মেয়ে গলায় ঝুলছে, ছেলেটাও নাবালক, আরাম করলে কি চলে আমার?

বলে সকলকে নমস্কার করলে হারাধনবাবু। তার পর ঝোলাটা নিয়ে হন্ হন্ করে সেকশানের বাইরে চলে গেল। সামনেই বাসের রাস্তা। একটা বাস আসতেই তার ভেতরে উঠে পড়লো। সেখান থেকে সোজা ধর্মতলায় বাস বদলে একেবারে শেয়ালদা।

তারপর আমাদের সঙ্গে হারাধনবাবুর সমস্ত সম্পর্ক শেষ।

সম্পর্ক শেষ বটে—কিন্তু কাহিনীর শেষ নয়। এ-কাহিনী যে আবার অন্য পথে মোড় ঘুরবে তা আমরাও জানতাম না।

সামন্তবাবু এসেই খবরটা আমাদের প্রথম দিলে। বললে—আরে আমি যাচ্ছিলুম খড়দায় আমার শালীর বাড়ি। ট্রেনে দেখি আমাদের হারাধনবাবু। হাতে সেই ছাতা আর ঝোলা। সেই এক চেহারা, প্রথমে তো বিশ্বাস হয়নি। উইক-ডেতে কোথায় চলেছে। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—হারাধনবাবু না?

হারাধনবাবু আমাকে দেখে চমকে উঠেছে! বললে—সামন্ত?

আমি বললুম—আপনি যে আবার ঝোলা নিয়ে বেরিয়েছেন? আপনি তো রিটায়ার করে অফিস থেকে চলে এলেন। প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ড গ্রাচুইটি সব কিছু চুকিয়ে নিলেন। এর পরেও বেরিয়েছেন?

হারাধনবাবু যেন লজ্জায় পড়ে গেল। সামলে নিয়ে বললে—কিন্তু তোমার অফিস তুমি কোথায় যাচ্ছো?

আমি বললুম—আমি অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়েছি. কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি?

কী-রকম যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বললে—আমি কাকা ... যাচ্ছি একবার এই এদিকে। সামনের স্টেশনে একটা কাজ আছে। তা তোমাদের সব খবর ভালো? বিপিনবাবু কেমন আছেন? আর রামলিঙ্গমবাবু? কাজকর্ম সব ভালো চলছে-টলছে তো? আর ভাই আমি তো রিটায়ার করে বসে আছি, এখন আমাদের দিন কাল তো ফুরিয়ে গেল...

বলতে বলতে একটা স্টেশন এসে গেল। হারাধনবাবু আর দেরি করলে না। হন্তদন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে গেল।

সামন্তবাবুর কাছ থেকে খবর পাবার পরও অতটা বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হলো আরো কয়েকজনের কাছ থেকে শোনবার পর। কেউ না কেউ ঠিক ওই অবস্থাতেই দেখেছে হারাধনবাবুকে। পরিতোষবাবু দেখেছে, কান্তিবাবু দেখেছে। সকলেরই ওই একই কথা! হাতে ছাতা আর ঝোলা। ট্রেনের মধ্যে এক কোণে বসে থাকা সেই চেহারা।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ধারে একদিন টিকিট কালেক্টার ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা।

বললে—এ কি হারাধনবাবু, আপনি যে এখন অফিস যাচ্ছেন? আমি যে শুনলুম আপনি রিটায়ার করেছেন?

হারাধনবাবুর ট্রেন তখন ছাড়ো-ছাড়ো। কথা বলবার সময় নেই। বললে—না, রিটায়ার করলুম কোথায়? আবার এক্সটেনশান দিলে সাহেব, ছাড়লে না কিছুতেই। সাহেব বললে—হারাধন, আরো কিছুদিন কাজ চালিয়ে দাও তুমি, তুমি চলে গেলে অফিসের কাজকর্ম চলবে না। তা ভাবলুম সাহেব অত করে বলছে, তাই।

বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরে।

তারপর শেয়ালদা স্টেশনে নেমে কোনও দিন যেত ব্যাণ্ডেল, কোনও দিন খড়দা, কোনও দিন বজ্‌বজ্, কোনও ঠিকানা নেই। যখন যে ট্রেনে পারতো উঠে পড়তো। সঙ্গে সেই ছাতা আর ঝোলা। তারপর ট্রেনে উঠেই একটা কোন দেখে বসে পড়তো।

একদিন তরলা আর পারলে না। বললে—পুজোব ছুটির দিনেও তা বলে তোমার আপিস? তুমি আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ভেবেছ যা বোঝাবে আমি তাই বুঝবো?

হারাধনবাবু বললে—তুমি মেয়েমানুষ, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোল না। ছুটির দিনে কি রেল চলবে না? পুজো বলে কি অফিসের কাজ থাকবে না? কী যে বলো তুমি তার ঠিক নেই। তুমি অফিসে থাকলেই পারতে?

হারাধনবাবু তখন রেগে গেছে খুব। আর [illegible]ালো না। তাড়াতাড়ি ছাতি আর ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যাবার সময় শুধু বউ-এব দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে—ওই তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। আব কোনও দিকে তাকালো না। সামনেব একটা ট্রেন দেখতে পেয়েই উঠে পড়েছে হারাধনবাবু। তাবপরে সেখান থেকে শেয়ালদা। শেয়ালদা স্টেশনে এসে একবাব ভেবে নিলে কোথায় কোন্‌দিকে যাবে? মান্থলি টিকিট ছিল রাণাঘাট থেকে শুধু শেযালদা পর্যন্ত। কিন্তু তাতে তার কোনও অসুবিধে নেই, ডেলিপ্যাসেঞ্জাবদেব চেহাবা দেখলেই টিকিট কালেক্‌টাররা বুঝতে পাবে। কোথায় খড়দা, বোলপুর, ব্যাণ্ডেল লোকাল ট্রেন তাতে উঠে পড়ে হাবাধনবাবু।

পুজোর ছুটি চলছে। সকলেরই খুশী-খুশী ভাব যেন। অনেক মালপত্র নিয়ে চলেছে। এ-সব [illegible]বাবুর মওকার টাইম। কার মাল কোথায় কে রাখলে সেই দিকেই নজর [illegible] হারাধনবাবুর, [illegible] যেন হারাধনবাবুর আব তর্ সইছে না। আর কোনও ভাবনা নেই। প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টা[illegible] পোস্টাফিসের ব্রাঞ্চে রেখে দিয়েছে। কেউ জানতে পারেনি। ওদিকে বয়েসও হয়ে যাচ্[illegible]গিব শিগ্‌গিব কাজগুলো গুছিয়ে নিতে হবে সব। দুটো মেয়ে। দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েই [illegible] দায়িত্ব শেষ। তারপর? তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করবে। আর আ[illegible]ব মত শক্তিও নেই। এখন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে কষ্ট হয়।

ট্রেন চলেছে। প্যাসেঞ্জার[illegible] কেউ উঠছে কেউ নামছে। একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে হারাধনবাবু। কোন্ স্টেশন [illegible]লো? নামটা পড়া গেল না। যাকগে মরুক গে। যে স্টেশনই আসুক, তাতে তার কী এসে যায়? যেখানে হোক গিয়ে থামলেই হলো। আর যদি কোথাও গিয়ে রাত হয়ে যায় তো স্টেশনেরা ওয়েটিংরুমে পড়ে থাকলেই হলো। আর ওয়েটিং-রুম না থাক স্টেশনের বেঞ্চি তো আছে। বেঞ্চি জোড়া থাকে তো প্ল্যাটফরমের সিমেণ্ট বাঁধানো মেঝের ওপর থলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পডলেই হলো। খোলা আকাশের নীচে বেশ আকাশের তারা দেখতে দেখতে ঘুমোও। আর, বৃষ্টি পডলে শেড্ আছে। শেডের তলায় গিয়ে শোও। চোর ডাকাত এলে ভয় নেই হারাধনবাবুর। পয়সা কড়ির বালাই থাকে না হারাধনবাবুর কাছে। থাকবার মধ্যে কয়েক আনা খুচরো পয়সা থাকে কাছে। আর কিছুই থাকে না সঙ্গে। তাবপর ভোরবেলা যদি ট্রেন থাকে তো সেই ট্রেনেই উঠে আবার শেয়ালদা স্টেশনে আসা। এবার

স্টেশনে আসতে পারলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। শেয়ালদা স্টেশনে বাড়ির চেয়েও বেশি কল্-পায়খানা জল খাবার কিছুরই অভাব নেই। যেমন করে উদ্বাস্তুরা রয়েছে তেমনি তাদের সঙ্গে মিশে গেলেই হলো। তখন তোমাদের মত আমিও উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের যখন র দিতে আসে লোকেরা, তখন হারাধনবাবুও তাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনও দিন দুধ-পাঁউরুটি, কোনও দিন খিচুড়ি, কোনও দিন বা অন্য কিছু। কিন্তু যা দেয় তারা, তাদের পেটটা বেশ ভরে যায়। বাড়ির চেয়ে বেশি আরাম শেয়ালদা স্টেশনে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার একটা ট্রেনে উঠে বসে। যখন বাড়িতে ফেরে তখন তরলা ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। বলে—তুমি কী বলো দিকিনি? কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন? একটা খবর পর্যন্ত দাওনি, আমি ভয়ে একেবারে আধমরা—ষষ্ঠী পুজোর দিনে তুমি আমাকে কী ভাবিয়ে তুলেছিলে বলো তো?

হারাধনবাবু খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে ওঠে। বলে—খবর আবার দেব কী? অফিসের কাজ পড়লে আমি কী করবো? অফিসের কাজ আগে, না বাড়ি আগে? অফিস আছে বলে তবু তো তোমরা দু'বেলা খেতে পাচ্ছো। অফিস না থাকলে কী হতো বলো দিকিনি? ওই জন্যেই তো বলে মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ কি আর গাছে ফলে?

কিন্তু সর্বনাশটা বড় হঠাৎ এলো। সর্বনাশ বোধহয় সকলের জীবনে হঠাৎই আসে। নইলে আমরা তো সবাই আমাদের জীবন-যাত্রা নিয়েই ব্যস্ত। কেউ তো কারো খবর রাখি না। আমরা মনে করি এমনি করেই বুঝি সব চলবে। চিরকাল এমনি করেই আমরা টাকা সংগ্রহ করবো, সুখ সংগ্রহ করবো, সংসার পরিচালনা করবো। আমাদের বুঝি শেষ হতে নেই, আমাদের বুঝি আর কোনওদিন সর্বনাশও হতে নেই!

পরিতোষবাবুই খবরটা আনলে প্রথমে। সে চাক্দায় থাকে। অফিসে এসেই দৌড়ে আমাদের সেকশানে এসেছে। বললে—শুনেছেন? হারাধনবাবু মারা গেছে!

থমকে গেলাম খবরটা শুনে। মুখ দিয়ে একটা 'আহা' শব্দ বার করতেও ভুলে গেলাম। অনেকদিনের পরিচিত মানুষ! কিন্তু শেষ তো একদিন সকলেরই হবে। আমরাই কি অশেষ! কিন্তু তা বলে ওই রকম মৃত্যু?

পরিতোষবাবু বললে—বেলুড়ে একটা ট্রেনের মধ্যে তার ডেড্বডি পাওয়া গেছে—

—তারপর?

খানিকক্ষণ কারোর মুখেই আমাদের কোনও কথা বেরুল না। এমনও হয়! এও তো এক রকমের নেশা!

পরিতোষবাবু বলতে লাগলো—তারপর খবরটা শুনে গেলাম হারাধনবাবুর বাড়িতে। ছেলে-মেয়েরা খুব কান্নাকাটি করছে। হারাধনবাবুর বউ-এর সঙ্গেই দেখা করলুম। বউ আমাকে প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টাকার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমি তো শুনে অবাক। আমি বললুম—হারাধনবাবু তো অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন, প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেছে প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টাকাকড়ি সব তো নেওয়া হয়ে গেছে—

হারাধনবাবুর বউ আমার কথাগুলো শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কিন্তু আমরা তো জানতুম না, এই তো পরশুও ভাত খেয়ে আপিসে গেলেন—বললেন আপিসে কাজ আছে।...

আমার কানে তখন সে-কথাগুলো ঢুকছে না। আমার কেবল মনে হচ্ছিল আমরা সবাই-ই তো এক-একজন হারাধনবাবু! ছোটবেলা থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমরা তো সবাই-ই কেবল বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। কেউ পাপ সংগ্রহ করছি, কেউ পুণ্য সংগ্রহ করছি,

কেউ বা আবার চাল-ডাল-গয়না-টাকা-খ্যাতি-প্রতিপত্তি সংগ্রহ করছি। সবাই আমর আপনি সুখ-সুবিধে আহরণের জন্যে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছি! আ ার সবাই-ই এক-একজন মূর্তিমান হারাধনবাবু।

আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো হারাধনবাবুর জন্যে নয়, পরি আমারই নিজের জন্যে। এ যেন আমারই ব্যক্তিগত দুঃখ, আমারই ব্যক্তিগত বিষয়।

কিন্তু আসল খবরটা আরও আশ্চর্যের। পরিতোষবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল। বললে—একটা কথা তোমাকে ভাই চুপি চুপি বলি। কাউকে বলো না যেন। হারাধনবাবুর বউটাও শুনলুম নাকি বিয়ে করা বউ নয়—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বললুম—কে বললে?

পরিতোষবাবু বললে—পাড়ার লোকেই বললে। ট্রেনে ঘুবতে ঘুরতেই নাকি কোত্থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাকেই ফুল-বেলপাতা আর ধান-দুব্বো দিয়ে বউ করে নিয়েছিল।

কথাটা শুনে আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলুম। তারপর মনে হলো—হারাধনবাবু আর কি এমন অন্যায় করেছে। আমরা সবাই-ই তো তাই। নামেই আমবা কেবল বলি সংসার। কিন্তু এ-সংসাবের সবটুকুই তো কুড়িযে পাওযা। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসেব পাহাড়।